মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী

ইতিহাসের পুনর্পাঠ

আলতাফ পারভেজ

যুদ্ধের ভেতরের যুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে অনালোচিত অংশে আলো ফেলেছেন লেখক এ গ্রন্থে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু কোথায় covert operation-এর শুরু এবং কোথায় যুদ্ধের শেষ সে হদিস সযত্নে আড়াল হয়েছিল এতদিন।

একাত্তরের যুদ্ধের শুরু যে কেবল ২৬ মার্চ নয় এবং এ যুদ্ধ যে ১৬ ডিসেম্বর শেষও হয়নি তারই নির্মোহ উপস্থাপন ঘটেছে এখানে। বহুল আলোচিত 'বিজয়'-এর পরও বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে কীভাবে এবং কেন আরেক দফা গৃহযুদ্ধের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল এবং তার সঙ্গে যুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির যোগসূত্র কী– তার ফলই বা কী দাঁড়াল, সেটাই এখানে খতিয়ে দেখা হয়েছে।

বাংলাদেশের রক্তাক্ত প্রথম পাঁচ বছরের পুরোদস্তুর এক পুনর্পাঠ এটা। বিপুল তথ্যরাজিতে যেখানে উঠে এসেছে সমাজতান্ত্রিক উচ্ছ্বাসের আড়ালে সমাজতন্ত্র বিলীন হওয়ার এক দক্ষিণ এশীয় আখ্যান।

'আনসার বিদ্রোহ' ও 'কারা বিদ্রোহ'-এর পর আলতাফ পারভেজ আবারও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ 'কাউন্টার রিপোর্ট' নিয়ে হাজির হয়েছেন বিশাল এক ক্যানভাসে। এবার তাঁর তালাশ 'যুদ্ধের ভেতরের যুদ্ধ' নিয়ে।

আপাতত তার প্রথম কিস্তি।

মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী
ইতিহাসের পুনর্পাঠ

এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী

ইতিহাসের পুনর্পাঠ

আলতাফ পারভেজ

ঐতিহ্য

মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ
আলতাফ পারভেজ

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪২১
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
নয়শত নব্বই টাকা

FROM MUJIB BAHINI TO GONO BAHINI : HISTORY REVISITED
by Altaf Parvez
Published by Oitijjhya
Date of Publication : February 2015

Email: oitijjhya@gmail.com

Copyright©2015 Altaf Parvez
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form

Price: Taka 990.00 US$ 25.00
ISBN 978-984-776-205-0

আম্মাকে

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ড. আহমেদ কামাল, ডা. মুশতাক হোসেন, জাকির হোসেন,
ড. আবুল হোসেন, রইসউদ্দীন আরিফ, গোলাম মাহমুদ, সৈয়দ জিয়াউদ্দীন আহমেদ,
সাযযাদ কাদির, মাহবুব আলম, মাসুদ রানা, ড. মোস্তাফিজুর রহমান,
আনোয়ার পারভেজ হালিম, এজাজ মাহমুদ, রমেন বিশ্বাস, খন্দকার কামাল উদ্দীন পিন্টু,
শামসুদ্দোহা শোয়েব, মাজহার জীবন, শামীমুল ইসলাম শিমুল, একরাম হোসেন,
জাভেদ হুসেন, হোজ্জাতুল ইসলাম, রিপন আচার্য, আলমগীর নিষাদ, রোকন রহমান,
শফিক রহমান, জাহিদ রহমান, জিয়াউল হক, ফেরদৌস আরা রুমী, মেহেদী হাসান,
সেলিম খান ও নাম প্রকাশে আপত্তি রয়েছে এমন একজন বন্ধু

শব্দ সংক্ষেপ

বাংলা

আইএসআই	ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স, পাকিস্তান
আইবি	ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, ভারত
আর এন কাও	রামেশ্বর নাথ কাও
আরএসপি	রেভ্যুল্যুশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া
ইপিসিপিএমএল	পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে)
এজি	এডজুটেন্ট জেনারেল
এনএসআই	ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টিলিজেন্স, বাংলাদেশ
এসএফএফ	স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, ভারত
এসএসজি	স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ, পাকিস্তান
এসএনসি	সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস
খাদ (KhAD)	খাদামাল-ই আতিয়াত-ই দৌলাতি (পশতু)
জাসদ	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
জেআরবি	জাতীয় রক্ষীবাহিনী
ডিএলআর	ঢাকা ল' রিপোর্ট
ন্যাপ	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশ
পিএসসি	পাবলিক সার্ভিস কমিশন
বাকশাল	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ
বিএসএফ	বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, ভারত
বিএলএফ	বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট
বাসদ	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল
মোসাদ (হিব্রু শব্দ, অর্থ: The Institute)	ইন্সটিটিউট ফর ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্পেশাল অপারেশনস্, ইসরায়েল
এমএনএ	মেম্বার অব ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি
এমপিএ	মেম্বার অব প্রোভেন্সিয়াল অ্যাসেম্বলি
র (RAW)	রিসার্চ অ্যান্ড এনালাইসিস উইং, ভারত
সিআইএ	সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, যুক্তরাষ্ট্র
সিআরপিএফ	সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, ভারত
সিএসপি	সেন্ট্রাল সার্ভিস অব পাকিস্তান
সিজিএস	চিফ অব জেনারেল স্টাফ
সিপিআইএম	কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া-মার্কসবাদী
সিপিবি	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

ইংরেজি

ALN	Ação Libertadora Nacional, Brazil
AFSPA	Armed Forces Special Power Act, India
BOFE	Bangladesh Organization for Functional Education
CoBRA	Commando Battalion for Resolute Action, India
CAO	Civil Affairs Organization, Indian Army
CBA	Collective Bargaining Agency
CPA	Coalition Provisional Authority, Iraq
Gestapo	Geheime Staatspolizei, Germany
JRB	Jatiya Rakkhi Bahini
JSD	Jatiya Samajtantrik Dal, Bangladesh
MPLA	People's Movement for the Liberation of Angola
MISA	Maintenance of Internal Security Act, India
PCB	Partido Comunista Brasileiro (One of the Communist Party of Brazil)
PO	Pasident's Order
SKS	Samozaryadnyj Karabin sistemy Simonova [Self-loading Carbine of (the) Simonov system]
SAD	Special Activity Division, USA
SSKM	Seth Sukhlal Karnani Memorial Hospital, Calcutta, India
UNITA	National Union for the Total Independence of Angola
Contras	*La contrarrevolucion* (the counter-revolution)

বিষয়সূচি

ভূমিকা/১৩

১. অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিকতা, পরিধি, পদ্ধতি, কাঠামো ও সীমাবদ্ধতা/১৯

২. দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রের পুনর্বিন্যাস : *যুদ্ধ যখন নিয়তি হয়ে ওঠে/৩৪*

ক. 'মুজিব বাহিনী'র জন্ম : নেতৃস্থানীয় সংগঠকদের দাবি/৩৪

খ. উত্তাল মার্চে ছাত্রলীগের 'নিউক্লিয়াস': যুদ্ধ যেভাবে পূর্ববাংলার নিয়তি হয়ে উঠল/৪৬

৩. স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স যেভাবে পানছড়ির চাকমা গ্রামে এল : 'বাংলাদেশের যুদ্ধ'-এ সিআইএ, 'র' এবং ইসরায়েল/৬১

ক. 'মুজিব বাহিনী' সম্পর্কে ঐতিহাসিক কিছু ভাষ্য /৬১

খ. মুজিব বাহিনী ও স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স : বহুমুখী আন্তর্জাতিক স্বার্থের সম্মিলন/৬৮

গ. যুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের প্রতি মুজিব বাহিনীর আনুগত্যহীনতা ও বৈরিতা/৮৪

ঘ. মুজিব বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো ও 'অপারেশন মাউন্ট ঈগল'/১০২

ঙ. মুজিব বাহিনী বিভক্তির পটভূমি : সিরাজুল আলম খান ও শেখ মণি'র দ্বন্দ্ব/১১৪

৪. একাত্তরের 'স্বপ্নের অপহরণ' : হত্যালীলার নতুন তরঙ্গ মুজিববাদ বনাম বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র/১২২

ক. ভারতের বলয় থেকে বেরোতে মুজিবের স্ববিরোধী বিবিধ চেষ্টা; জাসদের জন্ম/১২২

খ. 'জাতীয় মিলিশিয়া' : বাংলাদেশকে 'নিরস্ত্র করা'র প্রথম ব্যর্থ চেষ্টা/১৫৫

গ. 'গণবাহিনী' ও 'রক্ষীবাহিনী'র সংঘাতের বীজ ও দ্বিতীয় তরঙ্গের হত্যালীলা/১৬৪

ঘ. বাহাত্তরের বাংলাদেশ : স্বপ্নের অপহরণ/১৭১

ঙ. 'মুজিববাদ' বনাম 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'/১৮১

চ. প্রথাগত শ্রমিক ও কৃষক রাজনীতিতে সিরাজুল আলম খান/১৯০

ছ. ২৩ জুলাই ১৯৭২; শেখ মুজিবুর রহমান ও সিরাজুল আলম খান যখন দু'দিকে/১৯৮

৫. মুজিব বাহিনী থেকে রক্ষীবাহিনী : পটভূমি, বিকাশ ও বিস্তৃতি/২০৯

ক. ভারতে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণের প্রধান দিক :
রাজনৈতিক প্রশাসন দখল ও কমিউনিস্টদের মোকাবেলা/২০৯

খ. স্বাধীনতা-উত্তর মুজিব বাহিনী : রক্ষীবাহিনীর গঠন ও
আত্তীকরণ প্রক্রিয়া/২১৭

গ. মুজিব বাহিনীর অন্তর্বিরোধ যখন সংবাদপত্র শিল্পে :
বাংলার বাণী বনাম গণকণ্ঠ/২৪৭

ঘ. রক্ষীবাহিনী, সামরিক আমলাতন্ত্র ও একটি 'অসফল
অভ্যুত্থান'-এর কাহিনী/২৫৭

ঙ. রক্ষীবাহিনী আইন : *একদিকে স্বাধীনতার মৌল
চেতনার বিপর্যয়–অন্যদিকে ভয় ও অবিশ্বাসের উৎস*/২৬৬

চ. রক্ষীবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর অভিযানের বাস্তব ধরন যাচাই;
কেসস্টাডি বাজিতপুর, তানোর ও কালীগঞ্জ/২৮০

ছ. রক্ষীবাহিনী ও নাগরিক অধিকারের বিপর্যয়; *কেসস্টাডি
চঞ্চল সেন, সিরাজ সিকদার এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন*/২৯১

৬. মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী :
ঢাকায় ম্যারিগেল্লার 'মিনিম্যানুয়েল'/৩০৩

ক. শিবদাস ঘোষের 'গাইড লাইন' : বিপ্লবের
স্তর যখন 'সমাজতান্ত্রিক'/৩০৩

খ. বাহাত্তরের জনসমাজে সমাজতন্ত্র ও শ্রেণি সংগ্রাম
যেভাবে ভীতিকর এক বিষয় হয়ে ওঠে/৩১০

গ. জাসদ গঠনের জ্বালানী : ধ্বংস ও দারিদ্র্যের
মাঝে শাসক এলিটদের লুণ্ঠন প্রবণতা/৩৪৬

৭. রক্ষীবাহিনী-গণবাহিনী–নকশাল : একাত্তর পরবর্তী ত্রিমুখী গৃহযুদ্ধ
নয়টি জেলার কেসস্টাডি/৩৫৭

ক. কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের আগেই সশস্ত্র আত্মরক্ষায় জাসদ কর্মীরা
গণবাহিনীর সশস্ত্রতার সামাজিক পটভূমির খোঁজে জেলাভিত্তিক অনুসন্ধান/৩৫৮

খ. জাসদ ও গণবাহিনী যেভাবে প্রতিপক্ষের হাতকে শক্তিশালী করে চলেছিল/৩৯৯

৮. উপসংহারের পরিবর্তে :
কে মারলো শেখ মুজিবুর রহমানকে/৪১৪

৯. সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জি : ২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫/৪১৮

১০. সংযুক্তি/৪২৯

এক.

বিশেষ গোপন বাহিনী/৪২৯
রফিকুল ইসলাম, সেক্টর কমান্ডার
দুই.
'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' : একটা পর্যালোচনা/৪৩৪
আ ফ ম মাহবুবুল হক; আহ্বায়ক, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল
তিন.
The Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972./৪৩৯
চার.
The Jatiya Rakkhi Bahini (Amendment) Ordinance, 1973/৪৪৪
পাঁচ.
The Jatiya Rakkhi Bahini (Amendment) Act, 1975/৪৪৭
ছয়.
The Jatiya Rakkhi Bahini (Absorption in the Army) Ordinance, 1975/৪৫৫
সাত.
জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের তালিকা/৪৫৮
আট.
'জাতীয় মিলিশিয়া' সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা/৪৬৫
নয়.
রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন সম্পর্কে অরুণা সেনের বিবৃতি/৪৬৮
দশ.
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর প্রথম ঘোষণাপত্র/৪৭৪
এগারো.
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রথম কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্মেলনের ঘোষণা/৪৭৭
বারো.
'সাম্যবাদ' প্রথম সংখ্যা/৪৮৪
তেরো.
'সাম্যবাদ' দ্বিতীয় সংখ্যা/৪৯৫
চৌদ্দ.
The man behind the mask/৫০৩
Profile **Serajul Alam Khan**
পনেরো.
রাজনৈতিক সংঘাতে নিহত জাসদের নেতা-কর্মীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা/৫০৮
ষোলো.
রাজনৈতিক সংঘাতে নিহত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা/৫২৩
সতেরো.
১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে তানোরে নিহত মুক্তিযোদ্ধা ও
রাজনৈতিক কর্মীদের তালিকা/৫২৯
আঠারো.

পিটার কাস্টার্স-এর সাক্ষাৎকার/৫৩১

উনিশ.

লে. ক. জিয়াউদ্দীনের যে লেখা বাহাত্তরে সেনাবাহিনীতে আলোড়ন তোলে/৫৪১

Hidden Prize
Lt. Col. Ziauddin

বিশ.

I Can't Die Twice/৫৪৩
Major M A Jaleel

একুশ.

মুজিব শাসন : একজন লেখকের অনুভব/৫৪৫
আহমদ ছফা

বাইশ.

'জাতির পিতা'র বুলেট-বৃষ্টি নববর্ষে/৫৬৪
মাসুদ রানা

তেইশ.

'বাংলাদেশ : বেঁচে থাকার সংগ্রাম'/৫৭১

চব্বিশ.

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষকালে খ্যাতি পাওয়া রফিক আজাদের কবিতা
'ভাত দে হারামজাদা'/৫৭৭

পঁচিশ.

**১৯৭৫-এর আগস্টের পর সীমান্তে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে
সংঘর্ষে লিপ্ত কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর নিহত যোদ্ধাদের তালিকা/৫৭৮**

ছাব্বিশ.

**মুক্তিযোদ্ধাদের কেবল মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশাসনের
উচ্চতর পদে নিয়োগে পিএসসির বিজ্ঞাপন/৫৮০**

সাতাশ.

**মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা সৃষ্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (আইএমএস)
সম্পর্কে পিএসসি'র মন্তব্য/৫৮১**

আটাশ.

'মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা'দের তালিকা প্রণয়নে ব্যর্থতায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের হতাশা/৫৮৪

উনত্রিশ.

**প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রার্থনা করে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা
লে. কর্নেল আবু তাহের-এর চিঠি/৫৮৬**

১১. নির্ঘণ্ট/৫৮৭

ক. ব্যক্তি/৫৮৭
খ. বিষয়/৫৯৩
গ. স্থান/৫৯৮

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সত্য বিজয়ী হবে

> সব রচনারই উৎস দায়িত্ববোধ, দায়িত্ব-চেতনা। নিজের দেশের প্রতি, নিজের যুগের প্রতি, সেইসঙ্গে নিজের বিবেক ও লেখক সত্তার প্রতিও এ দায়িত্ব বর্তায়।
>
> –আবুল ফজল, লেখক, শিক্ষাবিদ।[১]

১৯৯৫ সালে 'অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ, কর্নেল তাহের ও জাসদ রাজনীতি' নামে একটি গ্রন্থ লিখি আমি। ঢাকার শাহবাগের 'আজিজ মার্কেট' কেন্দ্রিক আড্ডার গোড়াপত্তনকারী *পাঠক সমাবেশ* সে গ্রন্থ প্রকাশ করে। ১৯ বছর পর অনুরূপ বিষয়ে আবার এই লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু কেন? তারই ব্যাখ্যা হিসেবে শুরুতে দু'টি কথা বলে নেওয়া জরুরি। কারণ শিরোনাম ভিন্ন হলেও উভয় প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে অনেক অভিন্নতা।

জাসদ ও আবু তাহেরকে নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয় আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে পড়ছি। ডিপার্টমেন্টের চেয়েও ব্যস্ত বেশি মধুর কেন্টিনে। দেশের টুটি চেপে ধরে আছে তখন সামরিক জান্তা। আর আমরা কিছু তরুণ ভাবছি জান্তার কবল থেকে দেশকে উদ্ধারের দায়িত্ব কেবল আমাদেরই। ফলে মনোযোগের পুরোটা লুফে নেন জেনারেল এরশাদ।

মিছিল-মিটিং ছাড়াও এ সময়, সামরিক স্বৈরাচারের শেষের দিকে, সংগ্রামের আরেকটি ফ্রন্ট খুলে যায়– সাংবাদিকতা। অনেকগুলো সাহসী সাপ্তাহিক চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছিল। মিনার মাহমুদ ছিলেন এই রকম এক ক্যাম্পের কমান্ডার। যুক্ত হয়ে গেলাম এমনি এক গ্রুপে। ইতোমধ্যে অনার্সের রেজাল্ট বেরিয়েছে, এমএও শেষ এবং এরশাদও বিদায় নিলেন। 'পার্টি'র আবেদন ততদিনে ফুরিয়ে গেছে। মনে হচ্ছিলো তাবৎ এস্টাবলিশমেন্টকে মোকাবেলায় কলমই যথেষ্ট।

এই সময়ই নিঃশঙ্কচিত্ত লে. কর্নেল তাহেরের দিকে দৃষ্টি পড়ে। হায়! লরেন্স লিফশুলৎজ (Lawrence Lifschultz)-এর ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি (TAHER'S LAST TESTAMENT : Bangladesh The Unfinished Revolution) ছাড়া আর তেমন কোনো উপকরণই নেই! শুরু হলো জাসদ ও আবু তাহেরকে নিয়ে অনুসন্ধানপর্ব। তারই খসড়া হিসেবে তেজগাঁও থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'বাংলাবাজার পত্রিকা'য় ৫০ কিস্তিতে একটি লেখা বের হলো। কাগজটির সম্পাদক তখন মতিউর রহমান চৌধুরী। সম্পাদকীয় বিভাগের জালাল আহমেদ ও শামসুদ্দোহা শোয়েবের আগ্রহ ছিল খুব। বোধহয় দৈনিকের ঐ ধারাবাহিকটি নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা সংস্থা 'পাঠক

---

১ আবুল ফজল, 'কৈফিয়ৎ', *শেখ মুজিব: তাঁকে যেমন দেখেছি*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৭৮, ঢাকা, পৃ. ৩। উল্লেখ্য, শেখ মুজিবুর রহমান শাসনামলে আবুল ফজল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

সমাবেশ'-এর স্বত্ত্বাধিকারী সাহিদুল ইসলাম বিজু'র নজরে পড়েছিল। একদিন বললেন, আমি এটা বই আকারে ছাপবো। প্রকাশের পরই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গেল বইটি। বিজুর জন্য এডভেনচারটি ছিল বাণিজ্যিকভাবে স্বস্তির।

কিন্তু লেখকের অস্বস্তি তখন থেকেই। নানান সূত্র থেকে মন্তব্য পেতে থাকলাম। একদল বলতেন, এত সংক্ষিপ্ত কেন? দ্বিতীয় মত ছিল অতি তীব্র, 'বিষয়টি ক্রিটিক্যালী দেখলে ভালো হতো।' চিরতরুণ এবং চিরকুমার আহমদ ছফা তখন আজিজ মার্কেটের দোতলায় বসতেন। সেখানে আড্ডা দিতে যেতাম। তিনি নিজেও জাসদের ইতিহাসের এক চরিত্র। কিন্তু একদিন প্রসঙ্গ উঠতেই ধমক দিলেন, 'সাতই নভেম্বর সফল হলে কী হতো ভেবেছেন? কী লিখেছেন এসব!' এভাবেই ব্যবসা সফল হলেও 'প্রথম বই' অতি নবীন এক লেখকের আত্মবিশ্বাসকে উল্টো বরং দুর্বল করে দিল। সেই থেকে জাসদ নিয়ে আগ্রহের আরেক দফা গোড়াপত্তন। আরেক অভিযাত্রা। সুনির্দিষ্টভাবে বললে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর নিয়ে আরও গভীর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের তাগিদ তৈরি হলো। ধীরে ধীরে উপলব্ধি হচ্ছিলো নেহায়েত ছেলেমানুষী হয়ে গেছে প্রথম দফা। ইতিহাসের রণক্ষেত্রে নানান যোগসূত্র আরও খতিয়ে দেখা দরকার।

ইতোমধ্যে সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, গবেষণা আর জীবনযুদ্ধের নিরন্তর টানাপোড়েন। এস্টাবলিশমেন্ট চেপে ধরেছে হরহামেশা। গণঅভ্যুত্থানের এক দশকের মধ্যে রাজনীতি তো বটেই, সাংবাদিকতাকেও খেয়ে ফেলে বাংলাদেশের 'গণতন্ত্র'। ফলে তারুণ্যের সে-ই প্রথম প্রেম– অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ঝাঁঝালো আবেদন কিছুটা ফিকে হয়ে গেছে বইকি।

তারপরও মাঝে মাঝে 'আনসার বিদ্রোহ', 'যশোর কারা বিদ্রোহ' ইত্যাদি নানা বিষয়ে কাজ করেছি। কিছু তার প্রকাশিত হয়েছে, কিছু তার রাষ্ট্রের থাবায় পড়েছে। কিন্তু প্রথম প্রকাশনার সেই অতৃপ্তি বরাবরই তাড়া করেছে একান্ত মুহূর্তে। বিশেষত অনেক বন্ধুর অনুরোধ পিছু ছাড়েনি। পুরানো বইটির কপিও হারিয়ে গিয়েছিল। বিজু একদিন ফটোকপি এনে দিলেন। ভাবলাম, পুরো বই না পারি, একটি অধ্যায় নিয়ে জানিয়ে দিই না কেন– আমি কী ভাবছি, কী দেখছি এবং কী পাচ্ছি। সেই ভাবনা থেকেই প্রথম বইটির নবম অধ্যায়ের সম্প্রসারিত রূপ বর্তমান গ্রন্থ। 'মুজিব বাহিনী ও সিরাজুল আলম খানের নিউক্লিয়াস'–এ রকম একটা নাম ছিল তখন ঐ অধ্যায়ের; আয়তন ছিল ছয় পাতা। আর এখন হয়েছে প্রায় ৫০০ পাতা! আসলে জাসদের ইতিহাস এমনি এক আদিঅন্তহীন কাহিনী মনে হয় আমার কাছে– বিশেষ করে দলটির যাদুকরি সংগঠক সিরাজুল আলম খানের জীবন ও কর্ম। যদিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্য তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ দিয়েছে বলে মনে হয় না। এমনকি সম্প্রতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখিত যেসব গবেষণাগ্রন্থ নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুমুল আলোচনা চলছে সেগুলোর কোনো কোনোটির নির্ঘণ্টে তাঁর নামটিও নেই! এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে Gary J. Bass এবং Srinath Raghavan এর যথাক্রমে *The Blood Telegram* ও *1971 : A Global*

History of the Creation of Bangladesh এর উল্লেখ করছি। এসব লেখকরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে যেয়ে আন্তঃদেশীয় অনেক মহাফেজখানার সাহায্য নিয়েছেন– যা তাঁদের গ্রন্থকে তথ্যপূর্ণ করেছে এবং অসামান্য স্বীকৃতি এনে দিয়েছে– কিন্তু সিরাজুল আলম খানের কোনো তথ্য তাঁরা পাননি– কারণ তিনি তো মহাফেজখানায় সংরক্ষণের মতো কোনো তথ্য কোথাও রেখে যাননি! তাঁকে অনুসন্ধানের যে দায় রহস্যময়তার ছলে তিনি পুরোপুরি সাংবাদিক, গবেষক ও ইতিহাসবিদ্‌দের দিকে ঠেলে দিয়েছেন সে চ্যালেঞ্জ আজও কেউ পেশাদারিত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে বলে দেখা যায় না।

কেবল সিরাজুল আলম খান ও তাঁর কর্মীবাহিনীর প্রতি সচেতন উদাসীনতাই নয়– বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্য, একাত্তর ও একাত্তর-পরবর্তী ঘটনাবলিকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করতেও কম আগ্রহী– যদিও ঘটনাবলির কৌতূহলোদ্দীপক সূত্রগুলো রয়েছে সেখানেই। চলতি অনুসন্ধান সেদিকে অধিক মনোযোগী হতে চেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, চলতি কাজের অংশ হিসেবে আমি যখন লাইব্রেরিতে জাসদের মুখপত্র হিসেবে দৈনিক গণকণ্ঠের '৭৫ পূর্ব পুরানো কপিগুলো দেখছিলাম– তখন মাসের পর মাস ঘেঁটেও ঐ কাগজে কখনো কোনো উপলক্ষ্যে সিরাজুল আলম খানের নাম বা ছবি বা কোনো লেখা দেখিনি, অথচ তিনিই দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। এসব রহস্য তাৎপর্যময় বৈকি!

জাসদ ও সংশ্লিষ্ট ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো লরেন্স লিফশুলৎজের 'বাংলাদেশ : দ্যা আনফিনিশড রেভ্যুলুশন।' লিফশুলৎজের নাতিদীর্ঘ ঐ পুস্তিকা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের এক উত্তাল সময়ের অসামান্য ডকুমেন্টেশন। কিন্তু একই সঙ্গে সেই সময়ের ইতিহাস অনুসন্ধানে এই ডকুমেন্টেশন এক মনস্তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগত প্রতিবন্ধকতাও। ঘটনাবলির বয়ানে লিফশুলৎজ প্রচুর আবেগও মিশিয়ে দিয়েছেন– যা ঐ সময়ের ইতিহাস অনুসন্ধানে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও তাবৎ পাঠককে অন্ধকে হাতি দেখানোর মতো দশকের পর দশক পথ দেখিয়ে চলেছে। এছাড়া মাসকারেণহাসসহ আরও কয়েকজন বিদেশি লেখকও পঁচাত্তরকেন্দ্রিক অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার বয়ানে একইভাবে 'পথনির্দেশক'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আছেন। এসব ঐতিহাসিক কুহক থেকে বের হওয়া যে কোনো নবীন অনুসন্ধানকারীর জন্য সহজ নয়– বর্তমান লেখকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বর্তমান গ্রন্থটিকে পুরানো গ্রন্থের নতুন সংস্করণ নয় বরং পুরোদস্তর এক পুনর্পাঠ হিসেবে গ্রহণ করতে অনুরোধ করব। জানি না পুরানো বইয়ের অন্য অধ্যায়গুলো নিয়ে এমনতর কিছু কখন লেখা হবে। যদি প্রাত্যহিক জীবন তেমন অনুমতি দেয় কোনো দিন! বিশেষত এই পর্বে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান, ৭ নভেম্বরের সিপাহী অভ্যুত্থান, সেনাপতি ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা সম্পর্কে পুনর্পাঠ ও পুনর্ভাবনার কিছুই বলা হয়নি। ইতিহাসের ঐ পর্যায়ে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ কীভাবে ধ্বংসের কিনার থেকে ফিরে আসতে পারলো– আদৌ পেরেছিল কি না– সেটাও গুরুত্বপূর্ণ এক বিবেচনা। পরিকল্পনা রয়েছে, বর্তমান গ্রন্থের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রেখে পরবর্তী দুটি খণ্ডে সেসব বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

আমাদের ইতিহাসে মুজিব বাহিনী, জাসদ, রক্ষীবাহিনী এবং বিশেষভাবে বহিঃশক্তির ভূমিকা কিংবা অতীত ভূমিকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিশ্চিতভাবে ১৯৭৫ সালের আগস্টে শেষ হয়ে যায়নি– যেমনটি শেষ হয়েছে এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় ও শেষ বাক্য। যে কারণে তিন খণ্ডে প্রকাশিতব্য আমার লেখার 'প্রথম খণ্ড' হিসেবেই বর্তমান বিবরণকে বিবেচনার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। তবে প্রথম খণ্ডকে একটি পুরোপুরি স্বতন্ত্র অনুসন্ধান হিসেবে মূল্যায়নেরও সুযোগ থাকছে।

বহু বছর আগে লিখিত একটি গ্রন্থের ছয় পৃষ্ঠা আয়তনের একটি অধ্যায়ের পুনর্পাঠ ও পুনর্লিখন এই গ্রন্থ। ইতিহাসের ঐ কালপর্ব সম্পর্কে আগের ও পরের গ্রন্থে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়তো সকলের চোখে পড়বে। প্রথম গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা থেকে নতুন করে দায় তৈরি হয়েছিল জাসদের রাজনীতি ও আবু তাহেরের বিপ্লবী প্রচেষ্টার পূর্বাপর খতিয়ে দেখার। তারই ধারাবাহিকতায়– বর্তমান গ্রন্থে আমার সর্বশেষ পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একই বিষয়ে দেশের মূলধারার প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের দূরত্ব লক্ষ্য করবেন পাঠক। এক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ হয়েও বলবো, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চালু ইতিহাসে– এর রচয়িতারা যা লিখেছেন, ভাবীকালে তা, আরও গভীর প্রশ্নের মুখে পড়বে বলেই মনে করি।

রাজনীতির কোথায় শেষ এবং ইতিহাসচর্চার কোথায় শুরু সেই ব্যবধান ও ব্যাকরণটুকু অনেক সময় আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্যে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়– সমকালীন বাগাড়ম্বরের সঙ্গে তাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে গিয়ে। এভাবে মেঠো রাজনীতির স্বার্থে ইতিহাসচর্চার বিকৃতি ঘটিয়েছেন বাংলাদেশের তারকা ইতিহাসবিদ্‌রা। তবে নতুন প্রজন্ম ওখানে আটকে থাকবে না বলেই বোধ করি। প্রশংসা করার মতো পেশাদার একটি ভঙ্গী রয়েছে তাদের। বিশেষ করে অতীতের বিপ্লবী প্রচেষ্টাগুলোর শিক্ষা, প্রাসঙ্গিকতা, পরিণতি ও ভ্রান্তিগুলো খুঁজে দেখার আগ্রহ নিশ্চয়ই জারি থাকবে ভবিষ্যৎ তারুণ্যের মাঝেও।

পাশাপাশি অতীতে তথাকথিত সমাজতন্ত্রের নামে কী কী বিধ্বংসী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এ দেশে এবং কারা নবীন দেশটিকে সমাজতন্ত্রের নামে বাঘের পিঠে সওয়ার করে দিয়েছিল– তারও নিকাশ না করে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক পথানুসন্ধান হবে আরেকপ্রস্ত বোকামি। অন্যকোন রূপ ধরে এবং অন্যকোন মতাদর্শকে কেন্দ্র করে আসন্ন দিনগুলোতে একই ধরনের প্রকল্প-প্রচেষ্টা হবে না, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। নির্মোহ রাজনৈতিক সাহিত্য এক্ষেত্রে বিরাট সতর্কতামূলক ভূমিকা রাখতে পারে।

ভুলে গেলে চলবে না– দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে বাঙালি সর্বপ্রথম নিজের রাষ্ট্রচিহ্ন তৈরি করতে পেরেছে। এটা পুরো অঞ্চলের জন্যই অনন্য এক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার আবেগবর্জিত, নৈর্ব্যক্তিক সত্য ইতিহাস রচনা এখন বাংলাদেশের ইতিহাসবিদ্‌দের সামনে মূল চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার যে দৈন্যতা– তার বিশেষ যোগ রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী আর্থসামাজিক দিশাহীন অবস্থারও। উল্লিখিত ব্যর্থতার কারণেই বোধকরি বাংলাদেশের আবির্ভাবের চার দশক পরও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য নিপীড়িত জাতিগুলোর সামনে তার উত্থান ভবিষ্যতের জন্য কোনো রাজনৈতিক শিক্ষা আকারে

হাজির হতে পারেনি– যেমনটি আশা কিংবা আশঙ্কা করা হয়েছিল। ফলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এবং যুদ্ধ পরবর্তী গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে অনুসন্ধান বহুদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ এক মননশীল কর্তব্য আকারে রয়ে গেছে আমাদের সামনে।

চলতি প্রচেষ্টায় আমার পর্যবেক্ষণে অনেক 'ভুল'-এর সন্ধান পাওয়া স্বাভাবিক। আমি নিজেও সম্ভাব্য ভুলগুলো শুধরাতে রাজনীতির তৎকালীন কুশীলবদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। কেউ কেউ তাঁরা রাজনীতি ছেড়ে বহুদূরের নির্বিঘ্ন এক ব্যক্তিগত জীবনে আছেন। অনেকে আবার রাজনীতিতে থেকেও বাহাত্তর-তিহাত্তর থেকে বহু দূরে। স্বেচ্ছামূলক এসব 'দূরত্ব' ভেঙ্গে ইতিহাসের সঙ্গে কথোপথনে আমি তাঁদের রাজি করাতে পারিনি। এই ব্যর্থতা একান্তই আমার। তবে একই কারণে 'ভুল'গুলোর দায় কিছুটা তাদের ওপরও নিশ্চয়ই বর্তায়। এই গ্রন্থ প্রকাশের পরও বাংলাদেশের ঐ সময়ের ইতিহাস নিয়ে চলতি অনুসন্ধান জারি থাকবে– কারণ এর মাঝে এখনও বিস্তর অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। এ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য 'ভুল'গুলোও অদূর ভবিষ্যতে হয়তো শোধরাতে পারবো– যদি সংশ্লিষ্টদের মুখ খুলতে রাজি করাতে পারি।

এ পর্যায়ে রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহকারীর চলতি প্রচেষ্টায় আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার সামান্য অংশ শোনাতে চাই। গ্রন্থের শুরুতে, একেবারে প্রথম পাতায় আমি জাসদকে বর্তমানে একটি ক্ষয়িষ্ণু দল হিসেবে উল্লেখ করেছি। তবে এ দলের পুরানো বিশাল কর্মী বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠই এখনও বেঁচে আছেন। ব্যাপক রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতায় তাঁরা সমৃদ্ধ– কিন্তু বহু বিচিত্র তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান। কেউ কেউ চরম আওয়ামী লীগ বিরোধী, কেউ আবার বিএনপি বিরোধী এবং অনেকে আছেন জাতীয় পার্টিতে। জাসদ থেকে সৃষ্ট বাসদ নামে দু'টি দলেও তাঁদের অস্তিত্ব বিরাজমান। তবে নিষ্ক্রিয়দের সংখ্যাই সর্বাধিক। দীর্ঘ দু'দশক ধরে আমি এমন অনেকের সঙ্গেও সম্পর্ক রক্ষা করেছি– যাদের শরীরে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের চিহ্ন এখনও মুছে যায়নি, কিন্তু এখন তাঁরা আওয়ামী লীগের প্রবল সমর্থক, এমপি। আবার কারো কারো সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছি– যখন তাঁরা বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক– কিন্তু জিয়াউর রহমানের শাসনামলে কারাগারে কাটিয়েছেন দীর্ঘ সময়। বলা বাহুল্য, একই ঘটনাবলির রাজনৈতিক ধারাবিবরণী দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক গরমিল আছে এদের ভাষ্যে। আবার একক ব্যক্তির ভাষ্যও পাল্টেছে বারবার– যখন তিনি রাজনৈতিক অবস্থান পাল্টেছেন। নির্মোহ ভঙ্গিতে এ রকম জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা দুরূহ এবং সত্যকে শনাক্ত করাও দুরূহ। যেহেতু এই অনুসন্ধানের অন্যতম ভিত্তি ছিল সাক্ষাৎকার– সে কারণে উপস্থাপিত বিবরণীতে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের আবেগ-অবস্থান-বিশ্বাস ইত্যাদির পরোক্ষ ছাপ থাকা স্বাভাবিক। যদিও তার কারণে গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতার যা কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে– সে দায় লেখকেরই।

পরিশেষে, সেসব বন্ধুদের অভিনন্দন, যারা দশকের পর দশক ধরে যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত রাজনৈতিক দলিলপত্রের নিজস্ব সংগ্রহশালা আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন উদারভাবে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিহাসের এ অধ্যায়কে দেখার আমার পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভীষণ রকমে ভিন্নমত পোষণ করেও এ কাজে উৎসাহ দিয়েছেন; সাহায্য করেছেন। বন্ধুত্বের ঐ আধুনিকতাটুকুই আমার

প্রেরণা। তারা নিশ্চয়ই জানবেন, আমার লেখা ইতিহাসের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চেয়েছে– এর বেশি কিছু নয়। গবেষণা সাহিত্য মাঠের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে– এটা আমি বিশ্বাস করি না। অতিক্রম-অযোগ্য সীমানায় যার যার অবস্থান। তবে মাও সেতুঙ যেমনটি বলেছেন, 'সত্য ও মিথ্যার লড়াইও তীব্রভাবে এক রাজনৈতিক লড়াই', সেটা বোধহয় সত্যি এবং সে অর্থে সকল গবেষণাই এক একটি রাজনৈতিক পণ্য ও প্রকল্পও বটে।

গবেষণা জগতে পদ্ধতিগত অনুসন্ধান ও দৃষ্টিভঙ্গিগত নিরপেক্ষতার ওপর বরাবর জোর দেওয়া হয়– এ গ্রন্থেও তার সাধ্যমত কসরত রয়েছে। তবে তার ব্যত্যয়ও মিলবে ব্যাপক। ইতিহাস রচনার পদ্ধতি যাঁদের চর্চার বিষয় তাঁরা বর্তমান গ্রন্থের উপস্থাপন পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন– এটা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে প্রচলিত গবেষণার শুরুতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিদ্যমান সাহিত্যগুলো পর্যালোচনার যে রেওয়াজ রয়েছে এখানে তাকে হুবহু অনুসরণ করা হয়নি বরং পুরো গ্রন্থ জুড়ে তার রেশ ছড়িয়ে আছে। এ ছাড়া উচ্চতর গবেষণায় অধ্যায়গুলো গঠনের ক্ষেত্রে যেসব কাঠামোগত নির্দেশনা অনুসরণ করা হয় এক্ষেত্রে তারও কিছু ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। মূলত গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য রাখার জন্যই এসব ব্যতিক্রম। তাছাড়া এই অনুসন্ধান প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল পাঠক এবং একমাত্র পাঠক– কোনো ডিগ্রি বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নয়। সে কারণে একাডেমিক নিয়ম-শৃঙ্খলা থেকে স্বাধীনতা নেয়া হয়েছে সাধ্যমত।

ঐতিহাসিক কোনো বিবরণই বোধহয় বিতর্কমুক্ত নয়; বর্তমান অনুসন্ধানেরও সে দাবি করার সুযোগ নেই। স্বাধীনতাযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালের রাজনীতি সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। নিশ্চিতভাবে তা আবার অনেক নতুন প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে। ভবিষ্যতে অনুসন্ধানী তথ্যের আলোকে বর্তমান পর্যবেক্ষণ পাল্টে গিয়ে হলেও নতুন ও অমীমাংসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর আসুক– তেমনটিই চাইবো। যত বিলম্বই হোক– *নিশ্চয়ই সত্য বিজয়ী হবে*; যদিও জীবনানন্দ দাশের সে কথাও ভোলার নয় : 'যে জিনিস অভ্যস্ত বুদ্ধি বিচার কল্পনাকে আঘাত করে– যা পরিচিত নয়, তার অপরাধ ঢের।'[২] হয়তো আমিও 'অপরাধী' হয়ে গেলাম।

– আলতাফ পারভেজ, ঢাকা।

পুনশ্চ : এক

মূল লেখায় যদি ভুলবশত কোন উদ্ধৃতির তথ্যসূত্র বাদ পড়ে থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট লেখকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। কেউ যদি এসব ভুল শনাক্ত করতে সহায়তা করেন কৃতজ্ঞ থাকবো।

পুনশ্চ : দুই

এই পুস্তকের শেষে এমন কিছু তথ্য, দলিলপত্র সংযুক্ত হয়েছে যা মূলত অন্যান্য লেখকের পুস্তকের পরিশিষ্ট থেকে সংগৃহিত। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আবার তুলে ধরা হচ্ছে। নির্দিষ্ট স্থানে তার স্বীকারোক্তিও রয়েছে। তারপরও সেই সব লেখকের কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

---

২ জীবনানন্দ দাশ তাঁর বিখ্যাত 'ক্যাম্পে' কবিতার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে এই মন্তব্যটি করেছিলেন। দেখুন, ক্লিন্টন বি সিলি, *অনন্য জীবনানন্দ*, অনুবাদঃ ফারুক মঈনউদ্দীন, প্রথমা, ২০১১, ঢাকা, পৃ. ১২৮।

১
অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিকতা, পরিধি, পদ্ধতি, কাঠামো ও সীমাবদ্ধতা

> আমাদের ইতিহাস নেই। যেসব কথা শ্রুতিস্মৃতিরূপে প্রচলন রয়েছে, তাকে ইতিহাসের কায়া তো নয়ই, কঙ্কালই বলা চলে না। কেননা, তা বিচ্ছিন্ন, খণ্ড, ক্ষুদ্র তথ্য মাত্র। ওতে ইতিহাসের ছায়া আছে, প্রাবাদিক তথ্য আছে, পল্লবিত কিংবদন্তি আছে, কিন্তু সঙ্গতি, সামঞ্জস্য কিংবা ধারাবাহিকতা নেই।
>
> –আহমদ শরীফ, *বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি*[৩]

> মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিশ্চয়ই একদিন কেউ না কেউ সঠিকভাবেই লিপিবদ্ধ করবে। হয়তো শতবর্ষ পরে। তখন আজকের প্রগতিশীলরা থাকবেন না। প্রতিক্রিয়াশীল বলেও কেউ হয়তো আর থাকবেন না। শুধু থাকবে ইতিহাসের কঠোর বাস্তবতার বলিরেখাযুক্ত মুখায়ব।
>
> –আল মাহমুদ, *কবির মুখ*[৪]

বাংলাদেশের দু'জন খ্যাতনামা ব্যক্তির দুটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে এই অনুসন্ধানপর্বের শুরু হচ্ছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গদ্যকারদের একজন; দ্বিতীয়জনের ঠাঁই হয়েছে শ্রেষ্ঠ কবিদের সারিতে। দু'জনের বক্তব্যেই রয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চা নিয়ে গভীর হতাশার ছাপ– যা এ মাধ্যমের যে কোনো নবীন লেখকের জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জস্বরূপও বটে। উপরোক্ত দু'জনই জীবনের কোনো এক সময়ে কোনো না কোনোভাবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর রাজনীতির সংস্পর্শে এসেছিলেন; আহমদ শরীফ ছিলেন কর্নেল তাহের সংসদের সভাপতি; আল মাহমুদ ছিলেন জাসদের মুখপত্র 'গণকণ্ঠ'-এর সম্পাদক। এই উভয় সাহিত্য-তারকার কারো সঙ্গেই দলটির সম্পর্ক বেশি দিন স্থায়ী হয়নি এবং সে সম্পর্ক এখন আর কোথাও স্মরিতও হয় না।

---

৩ আহমদ শরীফ এই লেখাটি লিখেছিলেন 'কর্নেল তাহের স্মারক বক্তৃতা' আকারে। এটি ছিল এরূপ প্রথম স্মারক বক্তৃতা। ১৯৮৯ সালে এটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমান উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে কর্নেল তাহের সংসদ কর্তৃক ২০১২ সালে বীণা শিকদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই বক্তৃতার দ্বিতীয় মুদ্রিত প্রকাশ থেকে, পৃ. ১।

৪ আত্মজৈবনিক গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল মাহমুদ এ মন্তব্য করেন। দেখুন, *কবির মুখ*, আদর্শ, ২০১২, ঢাকা, পৃ. ২২৮।

বস্তুত স্বাধীনতা-উত্তর সমাজে জাসদ-এর ব্যানারে বাংলাদেশে যে নতুন বামপন্থী রাজনৈতিক ধারার অভ্যুদয় ঘটে– সামান্যই এখন অবশেষ আছে তার।[৫] তবে জাসদের উত্থান ও অবক্ষয় বাংলাদেশের ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞানের জন্য শিক্ষণীয় এক অধ্যায়। এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতির মনোযোগী পাঠকের জন্যও এ দলের ইতিহাস বিশেষ প্রাসঙ্গিক। ফলে আহমদ শরীফ উল্লিখিত 'শ্রুতি ও স্মৃতি' ঘেঁটে এবং আল মাহমুদ কথিত 'ইতিহাসের কঠোর বাস্তবতা' খুঁজতেই এই অনুসন্ধান।

সাধারণভাবে জাসদে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন তিনটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক স্রোতের সম্মিলন ঘটেছিল। সিরাজুল আলম খান, লে. কর্নেল আবু তাহের এবং মেজর এম এ জলিলকে এই তিন ধারার প্রতিভূ বলা যায়। ১৯৭১-এর আগে পরস্পরের কাছে প্রায় অপরিচিত এই তিন ধারার মধ্যে আবু তাহের তাঁর মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা ও অবদানের কারণে যুদ্ধকালে বিশেষ পরিচিতি পান।[৬] অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারের পাশাপাশি যুদ্ধকালে তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক স্বাতন্ত্র্য ছিল স্পষ্ট। তাহেরের সমাজতান্ত্রিক উচ্চাশা যুদ্ধের সময় কোন গোপন ব্যাপার ছিল না। ইতিহাসশাস্ত্রের যে কোনো অনুসন্ধানকারীর পক্ষে ১৯৭৪-৭৫ সালের বিপ্লবী এই কর্নেলকে ১৯৭১ সালের রণাঙ্গনে[৭] আবিষ্কার করা

---

৫ ২০১৩ সালে সমাপ্ত জাতীয় সংসদে এ দলের তিন জন সংসদ সদস্য [হাসানুল হক ইনু (কুষ্টিয়া), মইনউদ্দিন খান বাদল (চট্টগ্রাম) ও শাহ জিকরুল আহমেদ (বি. বাড়িয়া)] ছিলেন এবং তাঁরা সকলে নির্বাচিত হয়েছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের 'নৌকা' প্রতীকে এবং প্রত্যক্ষ সমর্থনে। ২০১৪-এর ৫ জানুয়ারি প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলোর বর্জন সত্ত্বেও প্রায় একতরফা যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে জাসদের পাঁচ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও চারজনই ছিলেন আওয়ামী লীগের 'নৌকা' প্রতীকে।

৬ মুক্তিযুদ্ধে আবু তাহেরের ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন, আলতাফ পারভেজ, *অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ, কর্নেল তাহের ও জাসদ রাজনীতি*, পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ৩৭-৪৬।

৭ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মেজর থাকাবস্থায় পালিয়ে এসে আবু তাহের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধকালে এক পর্যায়ে ১১ নং সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সেক্টর গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর ও গাইবান্ধার কিছু এলাকা নিয়ে। সেক্টর হেডকোয়ার্টার ছিল মহেন্দ্রগঞ্জে। 'মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সেক্টরে বামপন্থী তরুণদের বাধা দেয়া হলেও তাহের ঐরূপ আদর্শের তরুণদের খুঁজে পেতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।' *লেখক কর্তৃক গৃহীত ১১ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা নঈম জাহাঙ্গীরের সাক্ষাৎকার*, মে ২০১২, ঢাকা। এই লেখাতেই পরে (*অধ্যায় ৬.খ*) আমরা দেখবো জাসদের সশস্ত্র রূপ হিসেবে গড়ে ওঠা 'বিপ্লবী গণবাহিনী'র একটি শাখা হিসেবে রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনীগুলোর অভ্যন্তরে সৃষ্ট 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'-এর কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আবু তাহের মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৩৮ সালের ১৪ নভেম্বর তাঁর জন্ম। মুক্তিযুদ্ধে তিনি 'বীরউত্তম' খেতাব পান। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম এডজুটেন্ট জেনারেল (এজি) ছিলেন।

মোটেই দুরূহ হবে না। তবে একই সময়ে সিরাজুল আলম খানের[৮] নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ 'নিউক্লিয়াস'-এর সমাজতান্ত্রিক অভিযাত্রা অতটা সরলরৈখিক নয় এবং মেজর এম এ জলিল[৯]-এর নেতৃত্বাধীন গ্রামীণ

---

৮ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের খ্যাতনামা সংগঠক। ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি; তখন নাম ছিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। সিরাজুল আলম খান ১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৪-৬৫ এই দুই মেয়াদে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে ঢাকায় ছাত্রলীগের যে প্রাদেশিক সম্মেলন হয় তাতে ওবায়দুর রহমান সভাপতি ও সিরাজুল আলম খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আগের কমিটিতে (১৯৬০-৬৩) শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন সভাপতি এবং ফজলুল হক মণি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। পরের কমিটিতে (১৯৬৫-৬৭) মাজহারুল হক বাকী ছিলেন সভাপতি, আবদুর রাজ্জাক ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪১ সালের ৬ জানুয়ারি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলীপুর গ্রামে সিরাজুল আলম খানের জন্ম। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়ন করেছেন অংকশাস্ত্রে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে তাঁর অনেক মৌলিক ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে মূলত একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে দেশে-বিদেশে কাজ করছেন। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ববর্তী সময়ে 'স্বাধীনতার পটভূমি' তৈরির মুখ্য চরিত্র।

৯ এম এ জলিল যুদ্ধকালে ছিলেন ৯ নং সেক্টরের অধিনায়ক। এই সেক্টর গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর বরিশাল, যশোর, খুলনা এবং ফরিদপুরের কিছু এলাকা নিয়ে। যুদ্ধে যোগদানের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাভালরী রেজিমেন্টে 'মেজর' ছিলেন। যুদ্ধকালে সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানীর সঙ্গে মতভিন্নতা এবং মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে ভারতীয় ভূমিকার বিরোধিতা করার কারণে একাত্তরের ৩০ ডিসেম্বর তাঁকে আটক করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে সেই সময়কার খুলনার বেসামরিক প্রশাসনের তরফ থেকে নারী নিপীড়নেরও অভিযোগ তোলা হয়েছিল। তবে সামরিক আদালতে বিচার শেষে সব অভিযোগ থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে আটকাবস্থা থেকে মুক্ত হন। যে সামরিক আদালতে তাঁর বিচার হয় তার প্রধান ছিলেন লে. কর্নেল আবু তাহের। ধারণা করা হয়, এখানেই উভয় সেক্টর কমান্ডার নিজেদের রাজনৈতিক ও স্বদেশচিন্তার ঐক্য খুঁজে পেয়ে থাকবেন। ইতিহাসের বড় কৌতুক এই যে, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় অভিযুক্তদের ঢাকা সেনানিবাসে যেখানে রাখা হতো সেই 'সিগনাল অফিসার্স মেসে'ই সেক্টর কমান্ডার জলিলকেও রাখা হয় 'বিচার'কালে। এসময় ৯ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা 'নির্ভীক সঙ্ঘ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলে জলিলের মুক্তির দাবিতে ঢাকাসহ দক্ষিণাঞ্চলে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে। প্রাক্তন এমএনএ নূরুল ইসলাম মঞ্জুরসহ ৯ নং সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ সমর নেতৃবৃন্দ এ আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন– যা যুদ্ধোত্তর সমাজে জলিলকে জনপ্রিয় করে তোলে। সামরিক আদালত থেকে খালাস পাওয়ার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জলিলকে বিডিআর-এর দায়িত্ব নিতে বা তাঁর দল করতে বলেন। জলিল সেসময় মুজিবকে সীমান্ত রক্ষায় একটি পরিকল্পনা দিয়েছিলেন যা প্রধানমন্ত্রীর একজন ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগীর হস্তক্ষেপে বাস্তবায়ন হয়নি। দেখুন, *সাপ্তাহিক বিচিন্তা*, বর্ষ ১, সংখ্যা ১৩, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, ঢাকা।

মেজর জলিলের জন্ম ১৯৪২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলার উজিরপুরে। ১৯৭২ সালে ৩১ বছর বয়সে তিনি জাসদের প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৭৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ভোলা লঞ্চঘাটে তৎকালীন সরকার সমর্থকদের দ্বারা সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হলেও অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। জাসদ ত্যাগ করার পর, আন্তর্জাতিক এক সম্মেলনে

মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে ঐ নিউক্লিয়াসভুক্ত অপেক্ষাকৃত শহুরেদের সম্মিলনও সহজবোধ্য নয়। ১৯৭২-এ উপরিউক্ত তিন ধারার সম্মিলন প্রক্রিয়াটির প্রস্তুতিপর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল মুক্তিযুদ্ধের গর্ভজাত 'মুজিব বাহিনী'-এর প্রথম সারির কেন্দ্রীয় সংগঠকদের দ্বারা জাসদের জন্ম। তারই পূর্বাপর খোঁজা হবে এই অনুসন্ধানে। বাংলাদেশে বহুল পঠিত 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস'-এর আরেকপ্রস্ত পুনর্পাঠ বলা যেতে পারে একে।

সুনির্দিষ্টভাবে বললে, মুজিবনগরের অস্থায়ী প্রবাসী সরকার মুক্তিসংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার জন্য কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে ১১টি সেক্টরভিত্তিক যে 'মুক্তিবাহিনী' গড়ে তোলে তাতে যুক্ত হননি মুজিব বাহিনীর সদস্যরা। এরা সংগঠিত ও সশস্ত্র হয়েছিলেন মূলত 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট' (বিএলএফ) নামের সংগঠনের পতাকাতলে। এই ফ্রন্টভুক্তরা আবার নিজেদের 'মুজিব বাহিনী' নামে পরিচয় দিতেই বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। এই পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে যে নীরব বার্তাটি দেওয়ার চেষ্টা ছিল, তা হলো– সংগঠন হিসেবে মুক্তিবাহিনীর চেয়ে তারাই বেশি মাত্রায় আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বাসভাজন ও নিকটের। এই মুজিব অনুসারী বা ভক্তদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই যুদ্ধ-পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অবস্থান নিতে গিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর অভ্যুদয় ঘটান এবং তাতে শামিল হন মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডার আবু তাহের ও এম এ জলিল এবং যুদ্ধকালীন তাঁদের অনেক সশস্ত্র সহযোগী। জাসদের অভ্যুদয় এবং আবু তাহের ও এম এ জলিলের তাতে সামিল হওয়া ছিল যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ও সামরিক চমক। এই চমকের প্রধান এক কারণ হলো– যুদ্ধকালে আবু তাহের, এম এ জলিলসহ প্রায় সকল সেক্টর কমান্ডারের কাছেই 'মুজিব বাহিনী' ছিল সন্দেহ, অবিশ্বাস ও রহস্যেঘেরা এক বাহিনী; অথচ এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দুই দিকের বাসিন্দারাই যুদ্ধ শেষের মাত্র নয় মাসের মধ্যে যুক্ত হলেন জাসদ নামক রাজনৈতিক দলে! কেন এবং কী পরিস্থিতিতে এটা সম্ভব হলো; বাংলাদেশের আর্থসামাজিক জীবনে তার কী ফল হলো; এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধোত্তর সমাজে আবার নতুন কী ধরনের আশাবাদ ও অবিশ্বাস তৈরি হলো এবং সেই সন্দেহ, আশা ও অবিশ্বাসের বাস্তব পরিণতি কী দাঁড়াল– এসব খতিয়ে দেখাই চলতি অনুসন্ধানে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হিসেবে ছিল।

অংশগ্রহণরত অবস্থায় ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর পাকিস্তানে অসুস্থ হয়ে মারা যান তিনি। উল্লেখ্য, ভৌগোলিক দুর্গমতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে পল্লিসমাজের তরুণদের প্রায় একচেটিয়া প্রতিনিধিত্বের কারণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নবম সেক্টর বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

বাংলাদেশের গবেষণা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ বহুভাবে অনুসন্ধানের শিকার। একাত্তর সালকে এখানে 'মুক্তি'র বছর এবং ১৬ ডিসেম্বরকে 'মহান বিজয়ের পূর্ণতা' হিসেবেই দেখা হয়। সরকারিভাবে কয়েক দফায় 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' লিখিত হয়েছে এখানে। কিন্তু যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ-পরবর্তী দিনগুলোতে দেশের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মুজিব বাহিনী নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক সত্ত্বেও তারুণ্যদীপ্ত এই সংগঠনের জন্ম, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে এই সংগঠনের সম্পৃক্তি, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের স্বার্থের সঙ্গে এর দূরবর্তী যোগসূত্র, এই সংগঠনকে ঘিরে অত্র অঞ্চলে বৃহৎ শক্তিসমূহের স্বার্থের মেলবন্ধন, মুজিবনগর সরকারের বিরুদ্ধে মুজিব বাহিনীর লাগাতার বিরোধিতা, যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে মুজিব বাহিনী সংশ্লিষ্টদের দ্বারা কথিত 'হত্যা চেষ্টা', স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টিতে মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দের একাংশের সচেতন ভূমিকা, একাত্তর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক পরিমণ্ডলে 'মুজিব বাহিনী'র পর্যায়ক্রমিক কাঠামোগত বিকাশ ইত্যাদি প্রশ্ন আজও মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক সাহিত্যে গভীরভাবে মনোযোগ না পাওয়া বিস্ময়কর। বিশ্বজুড়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ইতিহাসবিদ্‌দের কাছে সকল ধরনের covert action প্রলুব্ধকর এক বিষয় হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে 'মুজিব বাহিনী' কেন স্থানীয় সাংবাদিক ও গবেষকদের আকর্ষণ করতে পারেনি তা বোধগম্য নয়।

বর্তমান লেখায় শুরুতে 'মুজিব বাহিনী' সম্পর্কিত কয়েকটি বিবদমান ভাষ্য তুলে ধরা হবে এবং তার আলোকে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশে মুজিব বাহিনীর অভিযাত্রাকে বোঝার চেষ্টা করা হবে। স্বাধীনতা-উত্তর দেশে মুজিব বাহিনীর ওপর অনুসন্ধানের গুরুত্ব এ কারণে যে, মুজিব বাহিনীর একাংশ একদিকে যখন জাসদ গড়ে তুলেছিল, সেই সময়েই আরেক অংশ নিয়ে তৎকালীন সরকারের তরফ থেকে গঠন করা হয়েছিল রক্ষীবাহিনীর প্রথম দিককার কয়েকটি ব্যাচ, শেখ ফজলুল হক মণি[১০] গড়ে তোলেন 'যুবলীগ', আবদুর রাজ্জাক গড়ে

---

১০ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর পৈতৃক নিবাস। সিরাজুল আলম খানের মতোই পাকিস্তান ছাত্রলীগে দু'বার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন (১৯৬০-৬৩)। শেখ মুজিবুর রহমানের বড় বোনের বড় ছেলে। ১৯৬৪ সালের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান বয়কট আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে বিশেষ পরিচিতি পান। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তার একজন ছিলেন শেখ মণি; অন্যদের মধ্যে ছিলেন রাশেদ খান মেনন, ওবায়দুর রহমান, আবদুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান প্রমুখ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানকালে রিসালদার মুসলেহউদ্দিনের নেতৃত্বে একদল সৈনিক কর্তৃক ঢাকায় নিজ বাড়িতে সস্ত্রীক নিহত হন মণি। তাঁর বিশ্লেষণাত্মক লেখনী শক্তি ছিল প্রশংসনীয়। সাহসী ও বলিষ্ঠ সংগঠক ছিলেন।

তোলেন 'স্বেচ্ছাসেবক লীগ' এবং পঞ্চম আরেক অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয় নতুন রাষ্ট্রের বেসামরিক প্রশাসনে।[১১] সমকালীন বিশ্বে অন্যদেশে জাত ও পরিপুষ্ট কোনো সশস্ত্র non-state actor-এর এভাবে নির্বিঘ্নে দ্রুতলয়ে state actor-এ পরিণত হওয়ার আর কোনো দৃষ্টান্ত মেলে না– যেমনটি ঘটেছে মুজিব বাহিনীর ক্ষেত্রে।

উপরে উল্লিখিত পাঁচ অভিমুখে মুজিব বাহিনীর নবঅভিযাত্রা এবং তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মিলন পরবর্তী দশকগুলোতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন বহু টানাপোড়েনের জন্ম দিয়েছে– যা ক্ষতবিক্ষত করেছে দেশকে। আবার কারও কারও তরফ থেকে এইরূপ অনুমান করা হয়েছিল ১৯৭১ সালেই। এ প্রসঙ্গে যুদ্ধকালের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের উপদেষ্টা এবং আওয়ামী লীগ নেতা ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে। মুজিব বাহিনীর প্রতিষ্ঠাকে তিনি এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে 'বড় বিপর্যয়' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১২] আমিরুল ইসলামের কথিত এই 'বিপর্যয়' থেকেই অন্য একাধিক সংগঠনের পাশাপাশি জন্ম হয় জাসদ ও তাদের সামরিক শাখা 'গণবাহিনী'র, সে কারণেও বাংলাদেশের রাজনীতি বিজ্ঞানে এসব 'বাহিনী' এবং তার আর্থসামাজিক পরিণতি নিয়ে আলোচনা বিশেষ জরুরি। মুজিব বাহিনীর জন্ম আদৌ কোনো 'বিপর্যয়' ছিল কি না এবং তার গর্বজাত স্বাধীনতা-উত্তর নতুন নতুন সংগঠনগুলো কি সেই 'বিপর্যয়'-এর ধারাবাহিকতা– না কি তা থেকে উত্তরণের চেষ্টা সেটা বোঝাও জরুরি বিবেচনা করা হয়েছে এই অনুসন্ধানে। জাসদ পরিবারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পরবর্তীকালে দাবি করেছেন, 'মুজিব বাহিনী গণবাহিনী সৃষ্টির কোনো পশ্চাৎভূমি নয়।'[১৩] এরূপ দাবির যথার্থতা খতিয়ে দেখাও বর্তমান আলোচনার অন্যতম দায় হিসেবে থাকছে।

---

১১ '...গণপ্রশাসনে, বিশেষত ১৯৭৩ সালে যাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশন নির্বাচন করেছিল তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ মুজিব বাহিনীর ছিল', লিখেছেন মুজিব বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী (*মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিব বাহিনী*, বৈশাখী প্রকাশনী, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ৪১)। প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে 'মুক্তিযোদ্ধা'দের এরূপ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ও আরেকজন গবেষক শেখ আবদুর রশীদ তাঁদের গবেষণা গ্রন্থে (Syed Giasuddin Ahmed, *Bangladesh Public Service Commission*, University of Dhaka, Dhaka, 1990, p.103-105 ও Sheikh Abdur Rashid, *Civil Service At the Cross-roads*, Muktochinta Prokashona, Dhaka, 2008) বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। এ বিষয়ে এই লেখার পঞ্চম অধ্যায়ে (৫.খ) বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২ দেখুন, *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র* (১৫ শ' খণ্ড), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৩১।

১৩ মাহমুদুর রহমান মান্না, মিথ্যা ইতিহাসের ওপর জাতি দাঁড়াতে পারে না, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৯ জুলাই, ২০১৪, ঢাকা।

ভিন্ন আরেকটি কারণেও মুজিব বাহিনী বিষয়ে অনুসন্ধানের এই উদ্যোগ। এর মধ্য দিয়ে আমরা খুব প্রাসঙ্গিকভাবে বুঝতে চাইব মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় 'সহযোগিতা'র তাত্ত্বিক কাঠামোটি। সাধারণভাবে বলা হয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সহায়তার মূলভিত্তি 'মানবিক দায় এবং আদর্শগত চাপ।' ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় নিজ দেশের একাংশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত বর্বরতা ও গণহত্যা এবং পূর্ববাংলা জুড়ে তৎপরবর্তী ঘটনাবলি যেভাবে লাখ লাখ শরণার্থীকে ভারতে ঠেলে দিয়েছে সেটাই এই যুদ্ধে ঐ দেশের সংশ্লিষ্টতার প্রধান বাধ্যবাধকতা তৈরি করে। কেউ কেউ একে `...one of the world's most successful cases of humanitarian intervention against genocide' হিসেবেও অভিহিত করেছেন।[১৪] দ্বিতীয়ত, (এও বলা হয়) পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা-ভাষীদের বিপুল উপস্থিতির কারণে পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তিসংগ্রামে পাশে দাঁড়ানোর এক ধরনের আবেগগত দায়ও ভারতকে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করে।

ঐতিহাসিক স্মৃতির এসব বোঝায় বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক অধিকাংশ সাহিত্য ভারাক্রান্ত এবং তাদের তরফ থেকে তৃতীয় এমন দাবিও করা হয়,[১৫] 'আওয়ামী লীগ ও (ভারতীয় জাতীয়) কংগ্রেসের মধ্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাদৃশ্য' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'দোদুল্যমানতা' কাটিয়ে উঠতে আদর্শিক চাপ হিসেবে কাজ করেছে ভারতের ওপর। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোর আলোচনা থেকে আমরা দেখার চেষ্টা করবো বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সূচনা কতটা আবেগগত এবং কতটাইবা 'জাতীয় স্বার্থ' চালিত ছিল। পাশাপাশি এও লক্ষ্য করা হবে, পূর্ববাংলার স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করতে ভারত আদৌ 'দোদুল্যমান' ছিল কি না– নাকি একাত্তরের বহু পূর্ব থেকে বিপুল বিনিয়োগসহ একাগ্রচিত্তে সে নিজেই এই মাহেন্দ্রক্ষণ সৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট ও 'সক্রিয়' ছিল এবং মুজিব বাহিনীর জন্ম সেই *সক্রিয়তার* সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো তাৎপর্য বহন করে কি না।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশে একাত্তর-উত্তর সমাজে দৃশ্যমান 'ভারত-নির্ভরতা'র ধারণা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিকভাবে কীভাবে ভারত-নির্ভরতার চর্চা শুরু হয়

---

১৪ Gary J. Bass, *The Blood Telegram*, Random House, 2013 India, p. 334.

১৫ এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন, মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৯-৪৪। 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে আদর্শবাদিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব'– এরূপ অভিমত তুলে ধরে রাষ্ট্রীয় প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থে বিপুল রেফারেন্সের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। প্রায় একই ধরনের নীতিগত অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, Salam Azad-এর *Contribution of India in the war of liberation of Bangladesh*, Ankur Prakashani, 2003, Dhaka শীর্ষক প্রকাশনায়।

সে বিষয়ও খতিয়ে দেখা হবে। উপরন্তু, একাত্তর-উত্তর বাংলাদেশে অন্তত ৪-৫ বছরের জন্য দেশজুড়ে যে প্রায়-গৃহযুদ্ধতুল্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার পেছনে কীরূপ বহির্দেশীয় ঐতিহাসিক যোগসূত্র ছিল তাও খতিয়ে দেখা হয় এই অনুসন্ধানে। বাংলাদেশের ইতিহাসের উপরোক্ত কালপর্বে (১৯৭১-'৭৫) গৃহযুদ্ধতুল্য পরিস্থিতি সৃষ্টিতে ২-৩ জন রাজনৈতিক চরিত্রকে ঘিরে 'অন্ধ আনুগত্যের সংস্কৃতি' কীরূপ ভূমিকা রেখেছিল তারও মোটাদাগের নজির পাওয়া যাবে এ পুনর্পাঠ প্রক্রিয়ায়। পুরো আলোচনা মুজিব বাহিনীকেন্দ্রিক হলেও প্রাসঙ্গিকভাবেই উপরোক্ত নানান বিষয়ে আলোকপাত ঘটেছে।

অনুসন্ধানের পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থে সম্মিলিতভাবে অনেক ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সময় এবং বিশেষত মুজিব বাহিনী, জাসদ ও রক্ষীবাহিনীর ওপর লিখিত দেশি-বিদেশি গ্রন্থ ও দলিলপত্র ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে এখানে। যার বিস্তারিত উল্লেখ পাবেন পাঠক প্রাসঙ্গিক অধ্যায়গুলোতে। তবে ব্যবহৃত গ্রন্থাদি সম্পর্কে এ পর্যায়ে এটা বলে নেয়া জরুরি যে, সাধারণভাবে মুজিব বাহিনী নিয়ে ঐ বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা যে দু-তিনটি ক্ষুদ্র আয়তনের পুস্তক রচিত হয়েছে (যেমন আবদুল মান্নান চৌধুরী, শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন প্রমুখ কর্তৃক) তাতে এই বাহিনীর কার্যক্রমের কিছু বিবরণ দেওয়া হলেও এর সৃষ্টির তাৎপর্যময় অনেক বিষয়ই বাদ পড়েছে তাতে। উপরন্তু যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে এই বাহিনীর দ্বিতীয় প্রজন্মের বিকাশ সম্বন্ধেও ঐসব প্রকাশনা নীরব। উপরিউক্ত লেখকরা মুজিব বাহিনীর নেতৃস্থানীয় সংগঠক ছিলেন না– ফলে তাঁরা হয়তো তৎকালীন ঘটনাবলির সামান্যই জানতেন। আবার নেতৃস্থানীয়দের (যেমন আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ) কিছু প্রকাশিত সাক্ষাৎকার পাওয়া গেলেও তাতে মুজিব বাহিনী সৃষ্টির ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির ভূমিকা প্রায় অনুল্লেখই রয়েছে বলা যায়। এক্ষেত্রে ভারতীয় জেনারেল উবান তাঁর গ্রন্থে অনেক তথ্য হাজির করেছেন বটে; কিন্তু তিনি এই প্রকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের দূরবর্তী ভূমিকা একেবারেই উল্লেখ করেননি। ভারতীয় লেখক অশোক রায়না এবং বি. রমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে ভারতীয় তৎপরতার কিছু কিছু তথ্য হাজির করলেও মুজিব বাহিনী সম্পর্কে তাঁরা নীরব থেকেছেন বা এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যের স্বাধীন গবেষকরাও স্বতন্ত্রভাবে মুজিব বাহিনীর গঠন ও এর ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে আজও কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেছেন বলে লক্ষ্য করা যায় না। সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রকাশিত 'মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র'-এ এই বাহিনী সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রায় দুর্লভ। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে মঈদুল হাসান (দুটি গ্রন্থে), মাসুদুল

হক প্রমুখ এই বাহিনী সৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করলেও সেই ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না তাঁদের কাছ থেকে। তাঁদের বিবরণেও মুজিব বাহিনী থেকে জাসদ ও রক্ষীবাহিনী সৃষ্টির বিষয়টি একেবারেই মনোযোগ পায়নি। অনেকেই এভাবে মুজিব বাহিনীকে একাত্তরকেন্দ্রিক একটি স্বল্পস্থায়ী অভিপ্রকাশ হিসেবে ধরে নিয়ে তাঁদের অনুসন্ধান ও আলোচনা শেষ করেছেন। যে কারণে স্বাধীনতা-উত্তর শাসন কাহিনী, বামপন্থী রাজনীতি ও বিশেষভাবে জাসদ রাজনীতি সম্পর্কেও যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে (তালুকদার মনিরুজ্জামান, লরেন্স লিফস্যুলৎজ, মোহাঃ রোকনুজ্জামান প্রমুখ কর্তৃক) তাতে জাসদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুজিব বাহিনীসংশ্লিষ্ট ধারাবাহিকতা, মাঠ পর্যায়ে এর সশস্ত্র শাখা গণবাহিনীর কার্যক্রম, শেখ মণি'র নেতৃত্বাধীন মুজিব বাহিনীর অপর গ্রুপের সঙ্গে সিরাজুল আলম খান গ্রুপের রক্তাক্ত বৈরিতা ও তার তাৎক্ষণিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ফলসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে খতিয়ে দেখা হয়নি। অন্যদিকে 'রক্ষীবাহিনী' ও 'গণবাহিনী' নিয়েও স্বতন্ত্র ও বস্তুনিষ্ঠ কোনো রাজনৈতিক গবেষণা এখনও পাওয়া যায় না বাংলাদেশে। সম্প্রতি রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে এই বাহিনীর কর্মকর্তা আনোয়ার উল আলম একটি গ্রন্থ লিখেছেন। তবে এ থেকে নিরপেক্ষ ভাষ্য পাওয়া দুরূহ। কারণ গ্রন্থটি রক্ষীবাহিনীকেন্দ্রিক সামাজিক অভিযোগের বিপরীতে পুরোপুরি আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক একটি ভঙ্গি থেকে লিখিত। এটা অস্বাভাবিকও নয়– কারণ লেখক এই বাহিনীরই একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন।

অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন মওদুদ আহমদ, আহমেদ মুসা প্রমুখ রাজনৈতিক গবেষক। কিন্তু প্রথমোক্ত লেখকের গ্রন্থে রক্ষীবাহিনীর মাঠ পর্যায়ের তৎপরতার বিবরণ পাওয়া যায় না, যদিও তিনি ওই বাহিনী সৃষ্টির আইনগত প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। আবার শেষোক্তজন এই বাহিনীর দ্বারা মাঠ পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত বহু মানুষের কাহিনীর সন্নিবেশ করলেও 'গণবাহিনী'র ভূমিকা তাতে আড়ালে পড়ে গেছে। উপরন্তু, এই গ্রন্থসমূহে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের দুঃখজনক শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অভিমুখীন রাজনীতির বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে মুজিব বাহিনী, এর অভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং তা থেকে সৃষ্ট অন্যান্য সংগঠনের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয়নি। এক্ষেত্রে আগ্রহী পাঠকের জন্য বিশেষ সহায়ক হতে পারে দুই বরেণ্য সাংবাদিক– সাপ্তাহিক হলিডে ও ডেইলী স্টারের প্রয়াত সম্পাদক যথাক্রমে এনায়েতুল্লা খান ও এস এম আলী'র লিখিত গ্রন্থদ্বয়। তবে, পুরো মুজিব শাসনামল জুড়ে এনায়েতুল্লা খান সাপ্তাহিক হলিডে'তে যে রাজনৈতিক কলামগুলো লিখেছেন তাতে তৎকালীন শাসন-কাঠামোতে মুজিব বাহিনীর প্রভাব সম্পর্কে যথার্থই আলোকপাত করা হলেও

প্রাসঙ্গিকভাবে জাসদের ভূমিকা মনোযোগ পায়নি সেখানে। একইভাবে এস এম আলী তাঁর গ্রন্থে শেখ মুজিব শাসনামলের এমন একটি অন্তরঙ্গ ও অনুসন্ধানী চিত্র তুলে ধরেছেন– যার তুলনা পাওয়া সমকালে বিরল; কিন্তু রক্ষীবাহিনী ও গণবাহিনী প্রায় অনুল্লেখ্য সেখানে। এনায়েতুল্লা খান ও এস এম আলীর পাশাপাশি আরও কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক (নির্মল সেন, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, আমির হোসেন প্রমুখ)-এর আত্মজৈবনিক রচনা থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের অনেক ঐতিহাসিক উপাদান গৃহীত হয়েছে এই পর্যালোচনায়।

খ্যাতনামা এই সাংবাদিকদের রচনাবলি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশকে বোঝার ক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান দিলেও সেগুলো উপস্থাপিত হয়েছে খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আকারে– মুজিব বাহিনীর সঙ্গে একাত্তর-উত্তর ঘটনাবলির পূর্বাপর কোনো যোগসূত্র প্রতিষ্ঠাতা ছাড়াই। একইভাবে পঁচাত্তরের আগস্টে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু ও পরবর্তী ২-৩ মাসের মধ্যে সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী মাসগুলোতে রক্ষীবাহিনীর অভ্যুত্থানধর্মী তৎপরতাও আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্যে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নয় আজও। মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, মেজর জেনারেল ইব্রাহিম, মেজর নাসির উদ্দিন প্রমুখ সামরিক কর্মকর্তারা এক্ষেত্রে যেসব তথ্য উল্লেখ করেছেন তার সমন্বয় ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে পঁচাত্তরের তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে বিদ্যমান বয়ানগুলো স্পষ্টত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে দেখা যায়।

নানাভাবে ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছড়িয়ে আছে উল্লিখিত সকল লেখনিতেই– এবং সেগুলো থেকে প্রয়োজনী সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে যথাযথ উল্লেখসহ। দেশের দুটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দুই পণ্ডিত উপাচার্য– সৈয়দ আলী আহসান (জাহাঙ্গীরনগর) ও আবুল ফজল (চট্টগ্রাম)-এর শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে লিখিত স্মৃতিচারণমূলক দুটি গ্রন্থও এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছে ঐ সময়ের বাংলাদেশের পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য।

তবে মুজিব বাহিনী, জাসদ ও রক্ষীবাহিনীসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উপরিউক্ত কোনো গ্রন্থই পাঠককে বিশেষ সহায়তা করে না। এমনকি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে সবচেয়ে সাড়া জাগানো গ্রন্থগুলোতেও[১৬] মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চরিত্র হিসেবে মুজিব বাহিনীর

---

১৬ যেমন Gary J. Bass, *The Blood Telegram*, Random House, 2013 India; Richard sisson and Leo E. Rose, *War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh*, University of California Press, 1990; Srinath Raghavan, *1971: A Global History of the Creation of Bangladesh*, Harvad Univercity press, 2013. ইত্যাদি। প্রথম দুটি গ্রন্থে বিস্ময়করভাবে মুজিব বাহিনী সম্পর্কে কোনো তথ্যই উল্লিখিত হয়নি। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে এই বাহিনী সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে ২-৩টি লাইন মাত্র উল্লেখ রয়েছে।

সৃষ্টি ও তার ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক তাৎপর্য সম্পর্কে অতি সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। কোন কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই আলোকপাত করা হয়নি।

উল্লিখিত শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজন ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক অনুসন্ধানের। সে লক্ষ্যে তৎকালীন ঘটনাবলির একটি বাস্তবভিত্তিক রাজনৈতিক চিত্র পেতে প্রাসঙ্গিক বহু ব্যক্তির সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এখানে।[১৭] সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যাবলিকে আবার মুদ্রিত তথ্যাবলির সঙ্গে তুলনা করে দেখা হয়েছে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের দু-একজনের ছদ্মনাম উল্লেখ করা হয়েছে– তাঁদের মতামত নিয়েই। আবার কারো কারো নাম কোনোভাবেই উল্লেখ করা হয়নি; সেও তাঁদের অনুরোধেই। এইরূপ ব্যক্তিরা এখনও তাঁদের রাজনৈতিক ও পেশাগত অবস্থানে থেকে সত্য প্রকাশে শংকিত বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত সময়কার দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, বিভিন্ন ধরনের সাময়িকী থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলিও এখানে ব্যবহৃত রয়েছে ব্যাপকভাবে। আলোচ্য সময়ের তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক শ্লোগানগুলোকেও ঘটনাবলির ফাঁকে ফাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে– যা সমকালীন সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে।

তথ্যাবলি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থের কিছু প্রথাবিরোধী ধরন সম্পর্কেও এ পর্যায়ে সামান্য কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, গবেষণা সাহিত্যে 'একটি অধ্যায়ে একটি বিষয়' উপস্থাপনের যে গতানুগতিক রেওয়াজ তা এখানে অনুসরণ করা হয়নি। সাধারণত রাজনীতি ও সমাজ জীবনে একটি বিষয়ের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে বহু বিচিত্র এবং অনিয়ন্ত্রিত পথে ধাবিত হয়। তার অনুরণন চলে বিবিধ ভঙ্গিতে। অনেকটা সে কারণেই এখানে একাধিক অধ্যায় জুড়ে বর্ণিত হয়েছে কোনো একটি ঘটনা বা চরিত্রের নানান অভিপ্রকাশ– উত্থান, পতন, প্রতিক্রিয়া। 'মুজিব বাহিনী' ও এর দ্বিতীয় প্রজন্মের সাংগঠনিক বিকাশ ধারা বুঝতে পাঠককে তাই পরিভ্রমণ করতে হবে মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিবুর রহমান শাসনামলের পুরো সময়ব্যাপী। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি

---

[১৭] মুজিব বাহিনী, জাসদ ইত্যাদি সংগঠনের প্রধান এক উদ্যোক্তা সিরাজুল আলম খান সাধারণত সাংবাদিক ও গবেষকদের আনুষ্ঠানিক কোনো সাক্ষাৎকার প্রদান করেন না। বারংবার চেষ্টার পরও বর্তমান লেখকের ক্ষেত্রেও এই নীতির কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। এইক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে অতীতে এবং বর্তমানে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন বা আছেন এমন কয়েকজনের সঙ্গে দীর্ঘদিন নিবিড় আলাপচারিতার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক নানান মুহূর্তে সিরাজুল আলম খানের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

অধ্যায় বা উপ-অধ্যায় পড়ে চলতি অনুসন্ধানের মূল প্রাপ্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ দুরূহ হবে। আপাতদৃষ্টিতে আটটি অধ্যায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ২৭টি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত হলেও পুরো গ্রন্থটি আসলে একটি অধ্যায়ের মতো করেই লিখিত। তারপরও কোনো বিশেষ ব্যক্তি, ঘটনা বা স্থান সম্পর্কে দ্রুত ধারণা লাভে আগ্রহীদের 'নির্ঘণ্ট' কিছুটা পাঠ-সহায়তা দিতে পারবে বলে আশা করা যায়। তিনভাবে (ব্যক্তি–বিষয়–স্থান) নির্ঘণ্ট সাজানো হয়েছে সে লক্ষ্যেই।

গ্রন্থের কাঠামো

সময়ের বিস্তৃতিতে বর্তমান অনুসন্ধানের পরিধি সীমিত হলেও ঘটনার ব্যাপকতায় তা বহুমুখী ও বিচিত্র। সে কারণে এ পর্যায়ে বর্তমান প্রকাশনার কাঠামোগত কিছু বিবরণও দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণভাবে মুজিব বাহিনীর জন্ম, বিকাশ, গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে (২.ক ও ৩.ক)। তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তত দুটি উপ-অধ্যায়ে (৩.খ ও ৩.ঘ) মুজিব বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় বিশেষ সামরিক বাহিনী 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স' (Special Frontier Force) বা এসএফএফ-এর সম্পর্ক এবং যুদ্ধের শেষলগ্নে সেই সম্পর্কের বাস্তব অভিপ্রকাশ সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। ৫.ক উপ-অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ সম্পর্কে।

তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের সঙ্গে মুজিব বাহিনীর সম্পর্ক ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ের 'গ' উপ-বিভাগে (৩.গ)। মুজিব বাহিনীতে শুরু থেকে শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খান গ্রুপের দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের মতাদর্শিক দিক ও একাত্তর-উত্তর সরেজমিন পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে একই অধ্যায়ের 'ঙ' বিভাগে (৩.ঙ)।

পরের অধ্যায়গুলোতে এসেছে মূলত যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক বিবেচনাসমূহ। চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতে (৪.ক) মুজিবুর রহমানের যুদ্ধোত্তর একান্ত বলয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলির বিবরণ দিয়ে জাসদ গঠনে সে সবের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয়। এ পর্যায়ে এও বলার চেষ্টা ছিল, জাসদের জন্ম ও মুজিব বলয়ে রাজনীতিবিদ হিসেবে শেখ মণি'র একচ্ছত্র উত্থান– উভয়ে ছিল মুজিব বাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রা। ৪.গ উপ-অধ্যায়েও এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে মুজিব বাহিনীর দুই অংশের সংঘাতের সূচনাপর্বও দেখতে পাবেন পাঠক। ৪.খ উপ-অধ্যায়ে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের ব্যর্থ প্রচেষ্টার কারণ ও ফল সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে– কীভাবে এই কাঠামো ব্যবহার করেই রক্ষীবাহিনী গঠনের দিকে এগিয়েছে সেই সময়কার সরকার। এরপরই চতুর্থ অধ্যায়ের চারটি উপ-বিভাগ (ঘ, ঙ, চ, ছ) জুড়ে জাসদের গঠনপর্বের বিস্তারিত

তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে ৪.চ উপ-অধ্যায়ে জাসদের উত্থানকালে শ্রমিক লীগ ও কৃষক লীগের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং তারপরের উপ-অধ্যায়ে ১৯৭২ সালে ছাত্রলীগের ভাঙনের সূচনাকালে দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তা কীরূপ মতাদর্শিক বিতর্ক ও সংঘাতের জন্ম দিয়েছিল সেটা উপস্থাপন করা হয়েছে ।

পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় পর্যায়ে (৫.গ) জাসদের মুখপত্র হিসেবে দৈনিক গণকণ্ঠ এবং তার বিপরীতে মুজিব বাহিনীর অপরপক্ষের মুখপত্র হিসেবে দৈনিক বাংলার বাণীর গড়ে ওঠার ইতিহাস ও ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয়। এসময় মুজিব বাহিনীর নতুন বিস্তৃতি হিসেবে রক্ষীবাহিনীর জন্ম, বিকাশ, আইনগত কাঠামো, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সামরিক আমলাতন্ত্রে আত্তীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে একই অধ্যায়ের খ, ঘ, ঙ, চ ও ছ উপ-অধ্যায়ে। পাশাপাশি ১৯৭৫ সালের তেসরা নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানে রক্ষীবাহিনীর সংশ্লিষ্টতার ধারণা যাচাই করা হয়েছে ৫.ঘ উপ-অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ে বামপন্থী রাজনীতির জগতে জাসদের আবির্ভাব যে বিতর্ক, বিবাদ ও চ্যালেঞ্জের জন্ম দেয় তার পূর্বাপর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পরের উপ-অধ্যায়ে (৬.খ) 'গণবাহিনী আকারে' এই দলের সশস্ত্র রূপ ধারণের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে রহস্যঘেরা ব্যক্তি ও বিষয় হিসেবে চিহ্নিত নেদারল্যান্ডের নাগরিক পিটার কাস্টার্সের ভূমিকারও বিবরণ দেওয়া হয়েছে– দীর্ঘ আলাপচারিতার আলোকে। ইতিহাসের ঐ জটিল সময়টিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশাসক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের ভারসাম্যের নীতি এবং পাশাপাশি তাঁর পরিকল্পনা কমিশনের বিধ্বংসী ভূমিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য ও ফল খতিয়ে দেখা হয় একই উপ-অধ্যায়ে। উল্লেখ্য, পরিকল্পনা কমিশনের উপর্যুক্ত বিধ্বংসী ভূমিকার প্রধান দিক ছিল সমাজতন্ত্রের নামে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রীয়করণ। এ বিষয়ে পরবর্তী উপ-অধ্যায়েও (৬.গ) আলোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সেই সময়কার সরকারের অর্থনৈতিক নীতি ও পদক্ষেপ কীভাবে জাসদের উত্থানে জ্বালানি হিসেবে কাজ করেছে সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শুরুতে (৭.ক) রয়েছে একাত্তর পরবর্তী মাঠ পর্যায়ে গণসশস্ত্রতার চিত্র। দৈবচয়ন আকারে দেশের মধ্যাঞ্চলের কয়েকটি জেলাকে বেছে নেয়া হয়েছিল অনুসন্ধানের জন্য এবং প্রাপ্ত ফলাফলকে অভিহিত করা হয়েছে 'আধা-গৃহযুদ্ধতুল্য' পরিস্থিতি হিসেবে। আর এর উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন 'মুজিব বাহিনী' ও এর যুদ্ধ-উত্তর প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন বিকাশধারাকে। পরের উপ-অধ্যায়ে (৭.খ) যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়কর পরিস্থিতির শেষ পরিণতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত একদলীয়

'বাকশাল' কর্মসূচির পটভূমি ও পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এসময় কীভাবে মুজিবুর রহমান প্রশাসন মার্কিন বলয়ে প্রবেশ করছিল তারও চুম্বক দৃশ্য রয়েছে এ পর্যায়ে– যা ছিল তাঁর কৌশলগত মোড় পরিবর্তনের এক মরিয়া প্রচেষ্টার সূচক। কিন্তু যা ছিল একই সঙ্গে বিপজ্জনক নানান স্ববিরোধিতায় ভরা।

বর্তমান অনুসন্ধানের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কিছু আইন, দলিলপত্র ও লেখা গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে– যা পাঠককে সম্পূরক পাঠ হিসেবে গ্রন্থভুক্ত মূল আলোচ্য বিষয়ের আরও গভীরে যেতে এবং সেই সময়কে বুঝতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। 'সংযুক্তি'গুলো (মোট ২৯টি) বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও এখানে কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মুখ্যত পাঁচটি বিষয়কে ঘিরে সংযুক্তিগুলো আবর্তিত : ক. মুজিব বাহিনী; খ. রক্ষীবাহিনী; গ. জাসদ রাজনীতি; ঘ. ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫-এর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঙ. মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রশাসনে নিয়োগ সংক্রান্ত।[১৮]

---

১৮ 'সংযুক্তি'তে মুজিব বাহিনী সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় এক সংগঠক (আ ফ ম মাহবুবুল হক)-এর পাশাপাশি মুক্তিবাহিনীর একজন সেক্টর কমান্ডার (রফিকুল ইসলাম)-এর নিজস্ব লেখা সংযুক্ত করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতমুখী অবস্থান থেকে লিখিত হলেও এসব ভাষ্য থেকে মুক্তিযুদ্ধে এই বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে অনেক সিদ্ধান্ত গঠন সম্ভব।

রক্ষীবাহিনী সম্পর্কিত চারটি আইনই এখানে সংযুক্ত হয়েছে। রয়েছে এই বাহিনীর কর্মকর্তাদের একটি তালিকাও– যা সংগৃহীত হয়েছে এই বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার গ্রন্থ থেকে। পাশাপাশি রয়েছে এই বাহিনীর তৎপরতার ধরন আঁচ করার জন্য কমিউনিস্ট নারী সংগঠক অরুণা সেনের একটি বিবৃতি। অরুণা সেন তখন এই বাহিনীর হাতে আটক ও নিগৃহীত হয়েছিলেন। ঐ সময়ের আধা-গৃহযুদ্ধতুল্য পরিস্থিতি ফল হিসেবে জাসদ ও আওয়ামী লীগের নিহত কর্মীদের দুটি তালিকাও তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থ শেষে । বলা বাহুল্য, তালিকা দুটি অপূর্ণাঙ্গ।

সংযুক্তির তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে জাসদ রাজনীতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র। এই দলের জন্ম ও তার প্রথম তিন বছরের রাজনীতি বিকাশের ধারাবাহিকতা বোঝার সুবিধার্থে অনেকগুলো সংযোজনী রয়েছে। যে তালিকায় আছে এই দলের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়া বিদেশি ব্যক্তিত্ব পিটার কাস্টার্স-এর পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার এবং সিরাজুল আলম খানের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল– যা প্রায় এক যুগ পূর্বে স্বল্প পরিচিত একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রচুর অসম্পূর্ণতাসহ।

তৎকালীন সামরিক আমলাতন্ত্রের মনোভাব উপলব্ধির স্বার্থে লে. কর্নেল জিয়াউদ্দীন ও মেজর জলিলের ঐ সময়ের আলোচিত দুটি লেখা রয়েছে চতুর্থ ক্যাটাগরীতে। একই সময়ের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপলব্ধির স্বার্থে লেখক আহমদ ছফার একটি দীর্ঘ লেখা এবং রফিক আজাদের একটি কবিতাও সংযুক্ত হয়েছে। যে সব লেখায় ঐ সময়ের আশা-প্রত্যাশা-হতাশার কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যাবে। সংযোজনীর সর্বশেষ দলিলগুলো প্রশাসনে মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিব বাহিনী সদস্যদের নিয়োগ সংক্রান্ত।

সীমাবদ্ধতা

সচেতন পাঠক মাত্রই এই অনুসন্ধানের অনেক সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি লক্ষ্য করবেন। একটি সীমাবদ্ধতার কথা শুরুতেই উল্লেখ করা প্রয়োজন– তা হলো, এখানে একাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত কালপর্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলির ওপর সাধারণ মনোযোগ নিবদ্ধ করা হলেও বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয় মুজিব বাহিনী ও এর বিকাশধারার ওপর। ফলে একই কালপর্বের অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের বিকাশধারা অনেকক্ষেত্রে মনোযোগ পায়নি। একইভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনেক অভ্যন্তরীণ উপাদান এখানে অনুল্লেখ থেকেছে বা যথেষ্ট বিশ্লেষিত নয়।

দ্বিতীয়ত ১৯৭৫-এর মাঝামাঝি গিয়ে ইতিহাসের এই 'পুনর্পাঠ' থেমে গেছে– যদিও মুজিব বাহিনী, জাসদ ও গণবাহিনীর সক্রিয়তা তখনও চলমান ছিল এবং সে পর্যায়ের ওপর অনুসন্ধানী মনোযোগের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয়ত, উল্লিখিত সময়ের ঘটনাবলির সঙ্গে যুক্ত বহু ব্যক্তির সাক্ষাৎকার এবং বহু দলিলপত্রের পর্যালোচনা এই গ্রন্থের অন্যতম উপাদান হলেও এমন অনেক অপরিহার্য ব্যক্তির মতামত ও দলিলপত্রের পর্যালোচনা এখানে নেই– যা থাকলে ইতিহাসের এই পুনর্পাঠ বাড়তি গ্রহণযোগ্যতা পেত। একইভাবে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হলেও এই গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়সমূহের কোনো ছবি সংযুক্ত করা হয়নি– যা গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা হিসেবেই চিহ্নিত হবে।

২
দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রের পুনর্বিন্যাস
যুদ্ধ যখন নিয়তি হয়ে ওঠে

২.ক. 'মুজিব বাহিনী'র জন্ম : নেতৃস্থানীয় সংগঠকদের দাবি

> সর্বত্র, সব সময়– দু' ধরনের ইতিহাস চালু আছে। একটিকে বলা যায় অফিসিয়াল ইতিহাস– মিথ্যার ভাগই বেশি থাকে সেখানে। আরেকটি হলো, একই অধ্যায়ের গোপন ইতিহাস– যেখানে আপনি ঘটনাবলির আসল কার্যকারণের হদিস পাবেন।
>
> –Honore de Balzac (১৭৯৯-১৮৫০), ফরাসি ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার

মুজিব বাহিনীর প্রধান চার নেতা ছিলেন সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক[১৯] ও তোফায়েল আহমেদ[২০]। ভারতীয়রা এই নেতাদের বলতেন 'অবিচ্ছেদ্য চার।' মুক্তিযুদ্ধের পর শেখ মণি জীবিত ছিলেন চার বছর। আবদুর রাজ্জাক মারা গেছেন ২০১১-এর ২৩ ডিসেম্বর। বাকি দু'জন এখনও জীবিত। কিন্তু চার জনের কেউই এই বাহিনীর জন্ম ও কার্যক্রম নিয়ে ক্ষুদ্র আয়তনের সাক্ষাৎকার ব্যতীত কোথাও আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু লিখেননি, বলেননি। বিশেষত মুজিব বাহিনীর প্রধান এক সংগঠক সিরাজুল আলম খান বরাবরই এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক মতামত দিতে অনিচ্ছুক। তবে তাঁর একটি 'অফিসিয়াল ওয়েবসাইট' রয়েছে– যেখানে তাঁকে মুজিব বাহিনীর পূর্ববর্তী

---

১৯ ১৯৪২ সালের ১ আগস্ট শরীয়তপুরে জন্ম। ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ। ১৯৬৭-৬৮ সালে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রথমে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পরে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হন। 'বাকশাল'-এর তিন জন সম্পাদকের একজন তিনি। পরিশ্রমী সংগঠক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

২০ জন্ম ১৯৪৩-এর ২২ অক্টোবর ভোলায়। ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকাবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শেষ করেন। ১৯৬৬-৬৭ মেয়াদে ইকবাল হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি এবং ১৯৬৮ সালে ডাকসুর সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৯-৭০ সালে ছাত্রলীগের সভাপতি হন। ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবের দায়িত্ব লাভ করেন। মুজিব বাহিনীর এই সংগঠক এখনও জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়।

সাংগঠনিক কাঠামো 'স্বাধীনবাংলা নিউক্লিয়াস'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলাদেশের 'স্থপতি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২১]

সঙ্গতকারণেই এইরূপ বর্ণনা ও দাবি খুবই সংক্ষিপ্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। শেখ ফজলুল হক মণি'রও একইভাবে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না– যদিও যুদ্ধোত্তর সময়ে দৈনিক বাংলার বাণীতে নানান বিষয়ে বিস্তর লিখেছেন তিনি। এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৫ খণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের যেসব দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছে– একটি খণ্ড তার পুরোপুরি সাক্ষাৎকার বিষয়ে হলেও তাতে মুজিব বাহিনীর সংগঠকদের কারও বক্তব্য সংরক্ষিত হয়নি। এসবই বিস্ময়কর।

তবে একাত্তরে বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমর কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই এই ছাত্র ও যুবনেতাদের সম্পর্কে এবং তাদের যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধপূর্ব সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে গুরুত্বের সঙ্গে মতামত দিয়েছেন। এরূপ মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে বিশিষ্ট অনেকে এও দাবি করেছেন, সিরাজুল আলম খান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগীরা মুক্তিযুদ্ধকালে মূলধারার সশস্ত্র সংগ্রামে খুব কমই যুক্ত হতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান এবং ২০০৯ পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খন্দকারের মন্তব্য বিস্ময়করভাবে অনেক তীব্র এবং সরাসরি : 'মুজিব বাহিনীর বড় অংশ যুদ্ধ করেছে বলে বলে আমার জানা নেই। মুজিব বাহিনীর নেতৃত্ব পর্যায়ের খুব কম সদস্যই যুদ্ধ করেছেন।'[২২] অন্যদিকে মুজিব বাহিনীর প্রথম ব্যাচের একজন সদস্য সারোয়ার হোসেন মোল্লা, যিনি পরবর্তীকালে রক্ষীবাহিনীর পরিচালক হয়েছিলেন– বলেন, 'আমাদের প্রধান কাজ ছিল লিডারশিপ দেয়া, গাইড করা,..পলিটিক্যাল কর্মকাণ্ড। তবে শুধু পলিটিক্স দিয়ে তো আর মানুষ ধরে রাখা যায় না, যদি না তাদের শেল্টার দিতে পারি। এই কারণে তখন কিছু কিছু অ্যাকশানে যেতে হয়েছে।'[২৩] পদমর্যাদার রকমফের থাকলেও যুদ্ধসংশ্লিষ্টদের এসব বিপরীতমুখী ভাষ্যে মুজিব বাহিনীর 'যুদ্ধ' ও 'অ্যাকশন' সবকিছুকে ঘিরে ধূম্রজালই কেবল বেড়েছে।

মুজিব বাহিনীর প্রথম সারির সংগঠকদের মধ্যে কেবল প্রয়াত কাজী আরেফ আহমেদ ১৯৯৫ সালে তাঁদের যুদ্ধকালীন কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যবহুল একটি লেখা

---

২১ দেখুন, http://www.serajulalamkhan.co.uk/prson.htm (retrived on 20th January 2013.)

২২ এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা, *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর*, প্রথমা প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ১১৮। উল্লেখ্য, যুদ্ধকালীন সামরিক বাহিনীর উপ-প্রধান ছাড়াও যুদ্ধোত্তর বিমান বাহিনীরও প্রধান ছিলেন এ কে খন্দকার; বাকশালেরও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। ২০০৯ পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন। তার আগে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের মন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন।

২৩ *আমি সারোয়ার বলছি*, বাংলাদেশ প্রতিদিন, প্রথম কিস্তি, ১ নভেম্বর ২০১২, ঢাকা।

লিখেন দৈনিক জনকণ্ঠে।[২৪] তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬২ সাল থেকে ছাত্রলীগে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে গোপন একটি 'নিউক্লিয়াস' কাজ করত– যে নিউক্লিয়াসের অপর দুই সদস্য ছিলেন আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদ নিজে। পরে আরও অনেকে এই নিউক্লিয়াসে অন্তর্ভুক্ত হন। ঐ 'গোপন'[২৫] রাজনৈতিক নিউক্লিয়াসেরই একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ হচ্ছে বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট বা বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী। তিনি লিখেছেন, '১৯৬৫ সাল থেকে নিউক্লিয়াসের তরফ থেকে আবদুর রাজ্জাক শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।' আবদুর রাজ্জাক ছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক। পরে সাধারণ সম্পাদকও হন।

কাজী আরেফের উল্লিখিত বক্তব্য যে সময়কে নির্দেশ করছে তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যময় দিক রয়েছে। কাজী আরেফের বক্তব্যের পাশাপাশি 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য' মামলা (*আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা* নামে

---

২৪ কাজী আরেফ আহমেদ, *ইতিহাসের নির্মোহ গতিধারা* (ধারাবাহিক রচনা), দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮-২৯ মার্চ ১৯৯৫, ঢাকা। সিরাজুল আলম খানদের 'নিউক্লিয়াস'-এর অন্যতম সদস্য কাজী আরেফ আহমেদের জন্ম ১৯৪৩ সালের ৮ এপ্রিল কুষ্টিয়ার সদর থানার ঝাওদিয়া গ্রামে। ঢাকায় ১৪/৩ অভয়দাস লেনে পৈতৃক বাড়িতেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন কাটে। সংগঠক হিসেবে বিকাশ মূলত ঢাকা মহানগরীতে। ওবায়দুর রহমান ও সিরাজুল আলম খান ছাত্রলীগের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে তিনি এই সংগঠনের ঢাকা মহানগরীর সভাপতি হন (১৯৬৩ সালে)। 'ছয়দফা'র আন্দোলনে তিনি ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। শিক্ষা জীবনের শেষপর্যায় সমাপ্ত হয় তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে। ১৯৭৭ সালে তিনি ছাত্রলীগের সুপরিচিত নারী সংগঠক রওশন জাহান সাথীকে বিয়ে করেন। মিসেস সাথী ২০১০ সালে আওয়ামী লীগ থেকে নারীদের জন্য 'সংরক্ষিত' আসনে এমপি হন। ১৯৭৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি রওশন জাহান সাথীর পিতা জাসদের অন্যতম সহ-সভাপতি এডভোকেট মোশারফ হোসেন গুপ্তহত্যার শিকার হলে দলের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগকেই ঐ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করা হয়েছিল। কাজী আরেফ 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি'রও অন্যতম সংগঠক। এই কমিটিতে তিনি ছাড়াও বিএলএফ'র বহু নেতৃস্থানীয় সংগঠক জড়ো হন– যাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক, আবদুল মান্নান চৌধুরী প্রমুখ।

২৫ বারবার 'গোপন' বলা হলেও আলোচ্য এই নিউক্লিয়াস এবং এর রাজনৈতিক বিশেষত্ব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলও যে অবহিত ছিল তার প্রমাণ মেলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গোপন নথিতেও। ১৯৭১-এর ২৯ জানুয়ারি দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ঢাকার দূতাবাস থেকে প্রেরিত গোপন নথি থেকে দেখা যায়– 'notoriously difficult' এই 'group' সম্পর্কে বলা হচ্ছে, *যেহেতু এই গ্রুপই হলো আওয়ামী লীগের সমাবেশ শক্তির মেরুদণ্ড সে কারণে দলটির নেতৃত্ব এদের দাবি কতটা উপেক্ষা করতে পারবে তার ওপরই পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে*। আরও দেখুন, *The American Papers: Secret and Confidential, India-pakistan-Bangladesh Documents 1965 to 1973*, Compiled and selected by Roedad Khan, Oxford, 1999, p. 459.

যা খ্যাত, যদিও মামলায় উত্থাপিত অভিযোগ পুরোটাই যে সত্য ছিল সে সম্পর্কে অভিযুক্তরাই সম্প্রতি স্বীকার করছেন)[২৬]-এর বিষয়বস্তুকে যৌথভাবে বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন পূর্ববাংলার জন্য শিক্ষাঙ্গনে সিরাজ-রাজ্জাক-আরেফদের যে সময়ে 'নিউক্লিয়াস' বা 'বিপ্লবী পরিষদ' গঠন করতে উৎসাহ যোগাচ্ছেন এবং নিজে তাতে শরিক হচ্ছেন– ঠিক সে-সময়ে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি অফিসাররা সশস্ত্র পন্থায় সামরিক ক্যু'র আদলে পূর্ববাংলার ক্যান্টনমেন্টগুলো দখল করে দেশের এ অঞ্চলকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে যে 'বিপ্লবী সংস্থা বা সেল' গঠন করে তাতেও তিনি নিজেকে যুক্ত করছেন।

১৯৬৮ সালে দায়েরকৃত *রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য* মামলার বিবরণী থেকে দেখা যায়, ১৯৬৪ সাল থেকে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন[২৭]-এর নেতৃত্বে বাঙালি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা একযোগে সেনা ছাউনিগুলো দখল করে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের বন্দি করার মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করার জন্য কাজ করছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে স্থানীয় ভারতীয় দূতাবাসের নিয়মিত সহযোগিতা ছিল। উপরিউক্ত বিপ্লবী পরিষদ ভারতীয়দের সঙ্গে দীর্ঘ যোগাযোগের ভিত্তিতে দু'জন সদস্যকে প্রতিশ্রুত অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ভারত নিয়ন্ত্রিত আগরতলাও পাঠিয়েছিল ১৯৬৭ সালের ১২ জুলাইয়ে।[২৮] এসবই হচ্ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের জ্ঞাতসারে। সশস্ত্র সামরিক

---

২৬ দেখুন, কর্নেল (অব.) শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা, ২০১১, ঢাকা। এই গ্রন্থ প্রকাশকালে তিনি জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। উল্লিখিত মামলার ৩৫ জন আসামীর একজন তিনি।

২৭ মোয়াজ্জেম হোসেন আগরতলা মামলার ২নং আসামী ছিলেন। ১৯৩২ সালে পিরোজপুরে জন্ম। ১৯৫০ সালে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার হন। বাঙালি সৈনিকদের সংগঠিত করে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে একটি গুপ্ত সংগঠন গঠন করেছিলেন। পরে এই সংগঠনের তৎপরতার বিষয় ফাঁস হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালের ৯ ডিসেম্বর আটক হন এবং তাঁকে আগরতলা মামলার আসামি করা হয়। মুক্তি পান ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন। সামরিক পরিমণ্ডলে ব্যাবহারিক অর্থে তাঁকেই বাংলাদেশের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে অভিহিত করা যায়। বিশেষ করে '৬৯-এর ফেব্রুয়ারির পর থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রশ্নে মাঠ পর্যায়ে 'একদফা'র আন্দোলন শুরু করেছিলেন তিনি এবং ১৯৭০-এর ২৮ মার্চ এ লক্ষ্যে 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি' নামে একটি সংগঠনও গড়ে তোলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক তৎপরতা নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে কোনো উল্লেখ্যযোগ্য অনুসন্ধান হয়নি, যা বিস্ময়কর।

২৮ ১৯৬৭-এর জুলাইয়ের এই যোগাযোগপর্ব সম্পর্কে বিস্তারিত এক বিবরণ পাওয়া যায় পাকিস্তানের লে. জে. কামাল মতিনুদ্দীনের লেখা 'Tragedy of Errors' (Wajidalis, Lahore, Pakistan, 1994, p. 262-64) গ্রন্থে। সেখানে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর এই কর্মকর্তা জানাচ্ছেন, ভারতীয় যে দূতাবাস কর্মকর্তা ঐ সময় পূর্ববাংলার 'রাজনীতিবিদ ও সামরিক

অফিসারদের এই বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে মাঝে মাঝে করাচি, ঢাকা ইত্যাদি নানান স্থানে বৈঠক করতেন মুজিবুর রহমান। এ থেকে লক্ষ্য করা যায়, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বাইরে ১৯৬২-৬৩-এর পর থেকে মুজিবুর রহমান জ্ঞাতসারে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার জন্য একাধিক গোপন তৎপরতায়ও যুক্ত ছিলেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা ভারতীয় সহযোগিতার মাধ্যমেই এগোচ্ছিল। উপরে আরেফ আহমেদের দেওয়া ছাত্রলীগকেন্দ্রিক নিউক্লিয়াসের যে বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে তার পরবর্তী বিকাশকে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য' মামলার আলোকে মনোযোগসহ লক্ষ্য করলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অনেক নতুন অধ্যয়ন-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য' মামলার অভিযোগনামা এবং উপস্থাপিত 'অভিযোগ' সম্পর্কে অন্যতম অভিযুক্ত কর্নেল শওকত আলীর বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যবহ। তিনি স্পষ্টত জানাচ্ছেন, 'অভিযোগনামায় উল্লিখিত ঘটনা সত্য ছিল।'[২৯]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আরেকজন অভিযুক্ত বেসামরিক কর্মকর্তা আহমেদ ফজলুর রহমানও তাঁর সাক্ষাৎকারে অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়েছেন। 'পাকিস্তানে প্রথম মার্শাল ল'র সময় থেকে স্বাধীনতার চিন্তাটা শুরু। আমরা কয়েকজন– রুহুল কুদ্দুস, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী মিলে...শেখ মুজিবও আসতেন। অধিকাংশ মিটিং হয়েছে আমার শশুরবাড়ি ১০ আগামসি লেনে।...তখন থেকে আমরা বাংলাদেশকে আলাদা করার কথা ভাবছি। আমরা তখন ভারতের সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করি। ইন্ডিয়ার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ আমিই করেছি। আমাদের যেসব মিটিং হতো সেখানে ইন্ডিয়ার হাইকমিশনের ফাস্ট সেক্রেটারিও আসতেন। ...ভারতীয় গোয়েন্দাদের সঙ্গে আলোচনায় স্বাধীনতার ব্যাপারে সাহায্য চাইতাম। দরকার ছিল আর্মস।...শেখ সাহেব সব জানতেন। তাঁকে আগরতলায়ও পাঠানো হয়।'[৩০]

১৯৬২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের আগরতলা যাত্রার অন্তরঙ্গ সেই বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর ফুফাতো ভাই মমিনুল হক খোকা'র তরফ থেকেও। মমিনুল হক খোকা তখন মুজিব পরিবারের সঙ্গে একই বাসাতে থাকতেন। তিনি বিস্তারিত জানিয়েছেন, কীভাবে দুই সিএসপি প্রয়াত রুহুল কুদ্দুস ও আহমেদ ফজলুর

কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন' তিনি হলেন দূতাবাসের চট্টগ্রামস্থ ফাস্ট সেক্রেটারি Mr. P. N Ojha. ১৯৬৭ সালের জানুয়ারিতে লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর বিজয়ে এই যোগাযোগ বেগবান হয়।

২৯ শওকত আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৫।

৩০ সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত দেখুন, আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, চতুর্থ খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৮০-১৮১। এই বিষয়ে আরও আলোকপাত করা হয়েছে পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে।

রহমান এবং সিলেটের চা বাগান মালিক মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী মুজিবের ঐ যাত্রার আয়োজন করেছিলেন। ঢাকার ফুলবাড়িয়ার পরিবর্তে কুর্মিটোলা থেকে মুজিবুর রহমান সেবার ট্রেনে করে প্রথমে কুলাউড়া যান এবং সেখান থেকে পায়ে হেঁটে সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন। মমিনুল হক খোকাই তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেন।[৩১]

তারপরও অবশ্য 'আগরতলা মামলা'কে *ষড়যন্ত্র* হিসেবেই চিহ্নিত করেছিল পূর্ব-পাকিস্তানের তখনকার রাজনীতি এবং সেই রাজনীতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েই পাকিস্তান সরকার ঐ মামলায় অভিযুক্তদের ছেড়ে দেয় ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। আর মুজিবুর রহমান আগরতলা মামলার আটকাবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার পর– কাজী আরেফ জানাচ্ছেন, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তাঁকে নিয়ে একটি 'ফোরাম' গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীকালে, ১৯৭০ সালের নভেম্বরের কোনো এক সময়– ছাত্রলীগের মধ্যে যারা সিরাজুল আলম খানের নিউক্লিয়াসে জড়িত ছিলেন না তাঁদের মধ্য থেকে আরও দু'জনকে (শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমেদ) ঐ ফোরামে যুক্ত করা হয়। এটা ঘটেছিল একই সঙ্গে মুজিবের আগ্রহ এবং 'নিউক্লিয়াস' সংগঠকদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে।'[৩২] মুজিব বাহিনীর নেতৃস্থানীয় সংগঠক হওয়া ছাড়াও একই সঙ্গে মুজিব বাহিনীর উৎস সংগঠন 'নিউক্লিয়াস'-এরও প্রাথমিক তিন সদস্যের একজন ছিলেন বিধায় কাজী আরেফের মুজিব বাহিনী সম্পর্কিত উপরিউক্ত বক্তব্যকে বর্তমান অনুসন্ধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে নেয়া হয়েছে।

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কথিত ঐ নিউক্লিয়াস সম্পর্কে সাংগঠনিকভাবে আরও বিস্তৃত এবং কিছুটা ভিন্নতর বিবরণ দিয়েছেন পরবর্তীকালে নিউক্লিয়াসভুক্ত তৎকালীন আরেক ছাত্রনেতা আ স ম আবদুর রব।[৩৩] ১৯৬৯-৭০ পর্যায়ের

---

৩১ মমিনুল হক খোকা, *অন্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জ্বল : বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও আমি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৮৪-৮৭।

৩২ কাজী আরেফ আহমেদ-এর এ ভাষ্যটি এ কারণেও গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁর দাবি থেকে স্পষ্ট, ১৯৭১-এর অন্তত নয় বছর আগে থেকে পাকিস্তান ভেঙে পূর্ববাংলায় একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করছিলেন তাঁরা এবং আওয়ামী লীগের বয়োজ্যেষ্ঠ অন্যান্য নেতাদের অজ্ঞাতেই শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন। পরের আলোচনায় আমরা দেখবো, এই 'প্রক্রিয়া'র সঙ্গে কোনো এক পর্যায়ে ভারতীয় বিভিন্ন সংস্থার সম্পৃক্তি মুজিবের মাধ্যমেই ঘটে, যদিও আরেফ আহমেদ তা অস্বীকার করেছেন।

৩৩ আ স ম আবদুর রব, *মুক্তিযুদ্ধে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের ভূমিকা*, কালের কণ্ঠ, ২৪ জানুয়ারি ২০১৩, ঢাকা। অপর এক সাক্ষাৎকারে আবদুর রব নিউক্লিয়াসের শুরু সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য দেন: 'সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ–এই তিনজন নিউক্লিয়াস ওপেন করেন। পরে আমি, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, আমিনুল হক বাদশা, শাজাহান সিরাজ, স্বপন চৌধুরী যুক্ত হই।'

ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক আ স ম রবের মতে, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফের বাইরে 'আরো দুজনকে পরে নিউক্লিয়াসে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়– তাঁরা হলেন ছাত্রলীগ নেতা আবুল কালাম আজাদ ও এম এ মান্নান।[৩৪] ১৯৬৮ নাগাদ এই নিউক্লিয়াস সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৩০০ ইউনিট গঠন করে। প্রতি ইউনিটে ৯ জন করে সদস্য ছিল। প্রতি মহকুমায় ৪-৫ জন সদস্য থাকতেন। মহকুমার বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঁচ জন সদস্য নিয়ে গোপন কমিটি গঠিত হতো। ১৯৬৮-৭০ নাগাদ নিউক্লিয়াসের সদস্য দাঁড়ায় সাত হাজার।' আ স ম আব্দুর রব অবশ্য তাঁর ভাষ্যে 'শেখ মুজিবুর রহমান'-এর অনুরোধে কেবল ফজলুল হক মণিকে নিউক্লিয়াসভুক্ত করা হয় বলে উল্লেখ করেন; তবে এও বলেন, 'নিউক্লিয়াসের সবাই ভারতে ট্রেনিং নিয়েছিলেন।'

কাজী আরেফ আহমেদ পূর্বে উল্লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছেন, শেখ মুজিবুর রহমান সে সময়ই (অর্থাৎ একাত্তরের আগেই) চার যুব নেতাকে (সিরাজ, মণি, রাজ্জাক ও তোফায়েল) 'পাকিস্তানি সামরিক শক্তির সম্ভাব্য আঘাত মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে ছাত্র-যুবকদের জঙ্গী বাহিনী গড়ে তোলার নির্দেশ দেন এবং এভাবেই প্রতিষ্ঠা ঘটে বিএলএফ-এর। এই সংগঠনের সঙ্গে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সংশ্লিষ্টতা *আষাঢ়ে গল্প* মাত্র।' কাজী আরেফ আরও লিখেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চের আগে (তাজউদ্দীনের উপস্থিতিতে) ঐ চার যুব নেতাকে 'কলকাতার ভবানীপুরস্থ একটি ঠিকানা' দিয়ে সশস্ত্র লড়াই-সংগ্রামের দায়িত্ব ও সামরিক সহায়তার 'সূত্র' দিয়েছিলেন এবং মুজিবের নির্দেশ ছিল পাকিস্তানী আগ্রাসনের মুখে যেন রাজনৈতিকভাবে একটি 'বিপ্লবী কাউন্সিল' গঠন করা হয়। আরেফ আরও দাবি করেছেন, 'চার নেতা' ও বিএলএফ-এর উপরিউক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে তাজউদ্দীন আহমদ সবই জানতেন।...এবং মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে ভারতীয়দের কোন রকম হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল না। সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণে মুজিব বাহিনী দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।[৩৫] তবে বিএলএফকে যে ভারতীয় জেনারেল উবান-ই প্রশিক্ষণ দেন এটা কাজী আরেফ স্বীকার করেছেন!

বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাকের এক ক্ষুদ্র সাক্ষাৎকারে[৩৬] এবং তোফায়েল

---

৩৪ আবুল কালাম আজাদ সদস্য হন ১৯৬৩ সালে; অন্যদিকে এম এ মান্নান সদস্য হন ১৯৬৫ সালে। এম এ মান্নান পরে শেখ মণি'র অনুসারী হয়ে পড়ায় তাঁকে নিউক্লিয়াস প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা হয়। আবুল কালাম আজাদও একপর্যায়ে বাদ পড়েন– আদর্শগত কারণে।

৩৫ কাজী আরেফ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, ৩০ মার্চ ১৯৯৫।

৩৬ দেখুন, মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ*, গণপ্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১২৪।

আহমেদের এক ক্ষুদ্রায়তনের লেখায়।[৩৭] তোফায়েল আহমেদ সেখানে বলেন, "একাত্তরের ১৮ ফেব্রুয়ারি আমাদের চার জন– শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও আমাকে বঙ্গবন্ধু ডাকেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে। বঙ্গবন্ধু আমাদের বললেন, 'পড়ো, মুখস্থ কর।' আমরা মুখস্থ করলাম, একটা ঠিকানা– ২১ রাজেন্দ্র রোড, নর্দার্ন পার্ক, ভবানীপুর, কলকাতা। বলেছিলেন, 'এইখানে হবে তোমাদের জায়গা।...আক্রান্ত হলে এখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করবে।' বঙ্গবন্ধু সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। চিত্তরঞ্জন সূতারকে আগেই কলকাতায় প্রেরণ করেছিলেন। ডাক্তার আবু হেনা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। তাঁকেও বঙ্গবন্ধু আগেই পাঠিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে। যে পথে আবু হেনা গিয়েছিলেন, সেই একই পথে তিনি মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, মণি ভাই ও আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজেন্দ্র রোডে আমরা অবস্থান করতাম। ৮ থিয়েটার রোডে অবস্থান করতেন জাতীয় চার নেতা। নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ হতো।"

বিএলএফ-এর প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কিছুটা ভিন্ন আরেকটি ভাষ্য পাওয়া যায় মুজিব বাহিনীর আরেক সুপরিচিত সংগঠক অধ্যাপক আফতাব আহমাদ-এর তরফ থেকে। তাঁর মতে, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্রলীগের সমাজতন্ত্র অনুরাগী র‍্যাডিক্যাল ধারার কর্মীরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের অনুপ্রেরণা থেকে সেখানকার ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের আদলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ মুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করার চিন্তা করতেন।[৩৮] কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চলের আরেকজন বিএলএফ সংগঠক ডা. মাহফুজুর রহমান দাবি করেছেন, 'সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হবে এই চিন্তা থেকে বঙ্গবন্ধু নিউক্লিয়াসের দুইজন ও শাসনতান্ত্রিক গ্রুপের দুইজন মোট চারজনকে নিয়ে যুদ্ধ শুরুর আগেই বাংলাদেশে বসে বিএলএফ গঠন করেন।'[৩৯] নিউক্লিয়াস গ্রুপ ও শাসনতান্ত্রিক গ্রুপ বলতে এখানে সিরাজুল আলম খান ও শেখ মণি গ্রুপের কথা বলা হচ্ছে।

বিএলএফ সম্পর্কে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্র-যুব নেতাদের এসব ভাষ্যের সাধারণ সমর্থনসূচক বক্তব্য পাওয়া যায় প্রান্তিক জেলাগুলোতে অবস্থানকারী

---

৩৭ তোফায়েল আহমেদ, জাতীয় চার নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ নভেম্বর ২০১২, ঢাকা।

৩৮ প্রয়াত আফতাব আহমাদের মতে, বিএলএফ সম্পর্কিত ঐরূপ চিন্তাকারীদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রলীগের চিশতী হেলালুর রহমান, নজরুল ইসলাম, আ ফ ম মাহবুবুল হক, রায়হান ফেরদৌস মধু, বদিউল আলম, একরামুল হক প্রমুখ। ১৯৬৯ সালের পর ঢাকার বিভিন্ন দেয়ালে 'বিএলএফ-এ যোগ দিন' শ্লোগানও লেখা হয়েছিল– কিন্তু তা খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি। দেখুন, দুঃসময়ের চালচিত্র 'সরাসরি', *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৫ এপ্রিল ২০০০, ঢাকা।

৩৯ ডা. মাহফুজুর রহমান, *বঙ্গবন্ধু: ছাত্রলীগ-নিউক্লিয়াস*, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ২০১৩, পৃ. ১৭৩।

তাঁদের সহযোগীদের কাছ থেকেও। ছাত্রলীগে সিরাজপন্থীরা যে সম্ভাব্য মুক্তিযুদ্ধে ভিন্ন কোনো অবস্থান নিতে যাচ্ছে এবং সে বিষয়ে তাঁরা যে দেশব্যাপী দূরবর্তী জেলার ছাত্র সংগঠকদেরও পরিকল্পিতভাবে নেটওয়ার্কভুক্ত করছিল তার স্পষ্ট সাক্ষ্য মেলে সেই সময়কার বৃহত্তর সিলেটের একজন ছাত্রনেতা মাহবুবুর রব সাদীর বক্তব্যে। সাদী সেসময় ছাত্রলীগে সিরাজপন্থী হলেও তিনি এইরূপ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে মুজিব বাহিনীর পরিবর্তে চতুর্থ সেক্টরে যুদ্ধে যোগ দেন।[৪০] তবে সবাই সাদীর মতো ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন এক্ষেত্রে স্বল্প ব্যতিক্রমদের একজন। সিরাজুল আলম খানের পৃথক কাঠামোর আহ্বানে তাঁর অধিকাংশ অনুসারী ইতিবাচকভাবেই সাড়া দিয়েছে।[৪১]

উপরে মুজিব বাহিনী বা বিএলএফ সম্পর্কিত কাজী আরেফ আহমেদের বক্তব্য এবং তাঁর বক্তব্যের সমর্থনসূচক অন্যান্য (আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আ স ম আব্দুর রব, আফতাব আহমাদ, মাহবুবুর রব সাদী প্রমুখের) যেসব বক্তব্যের উল্লেখ করা হলো তার সারসংকলন থেকে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ উত্থাপিত হয় :

---

৪০ মাহবুবুর রব সাদী পরে জাসদ গঠনকালে সিরাজ অনুসারীদের মাঝে ফিরে আসেন। মুক্তিযুদ্ধে ভিন্নভাবে সক্রিয়তার পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি জানান, '২৫ মার্চের পর সিরাজ গ্রুপের পক্ষ থেকে আমার কাছে স্বপন চৌধুরীকে পাঠানো হলো। তার মাধ্যমে জানতে পারলাম, মূল কমান্ডের বাইরে ভিন্ন এক কমান্ডে আমরা প্রশিক্ষণ নেব। আমাদের ব্যবস্থাপনা থাকবে আলাদা। আমি যেন সেভাবে অন্যদের প্রস্তুত করি। কিন্তু মুজিবের নেতৃত্ব ছাড়া ভিন্ন কমান্ডে যাওয়াকে আমার কাছে তখন মনে হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধকে দ্বিধাবিভক্ত করা। তাই স্বপন চৌধুরীকে সেটা জানিয়ে দিলাম। আমার এই বক্তব্য অবশ্য বৃহত্তর সিলেটে ছাত্রলীগের সিরাজপন্থী কেউ গ্রহণ করলো না। ওরা স্বপন চৌধুরীর নির্দেশনা অনুযায়ী চললো। আমিও ভিন্ন পথে ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে চতুর্থ সেক্টরে সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে জকিগঞ্জ-কানাইঘাট এলাকায় যুদ্ধে যোগ দিলাম।' উল্লেখ্য, বৃহত্তর সিলেটে মুজিব বাহিনী গঠনে নেতৃত্ব দেন আখতার আহমদ (বালাগঞ্জ)। তিনি ছিলেন সিরাজুল আলম খানদের নিউক্লিয়াসের সদস্য এবং জেলা ছাত্রলীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ('৬৫-'৬৬); পরে সভাপতিও হন ('৬৬-'৬৭)। জাসদ গঠনকালে তাঁকে কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক হিসেবে দেখা যায়। পরে দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য হন। ১৯৮৬ সালের ৫ আগস্ট মারা যান তিনি।

৪১ এরূপ আরেকজন আঞ্চলিক নেতা সিরাজগঞ্জের আবদুর রউফ পাতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'মুক্তিবাহিনীর বাহিরে পৃথক একটি বাহিনীতে যোগ দেয়ার এরূপ আহ্বান নিয়ে আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি তখন?' উত্তরে বর্তমান লেখককে তিনি বলেন, 'প্রশ্ন ওঠেছিল। কিন্তু 'দাদা'র ওপর আমাদের প্রচণ্ড আস্থা ছিল। আমরা ভাবতাম উনি যা করছেন নিশ্চয়ই তা কোনো সুপরিকল্পনার ধাপ মাত্র। আমরা আসলে প্রশ্নহীনভাবে ওনাকে অনুসরণ করতাম।' উল্লেখ্য, আবদুর রউফ পাতা পরে জাসদেও যোগ দিয়েছিলেন। 'দাদা' বলতে এখানে তিনি সিরাজুল আলম খানকে বুঝিয়েছেন।

প্রথমত, মুজিব বাহিনী বা বিএলএফ গঠিত হয়েছে ২৫ মার্চের আগেই; আরও স্পষ্টভাবে বললে, এ হলো ১৯৬২ সালে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ 'নিউক্লিয়াস' নামক গোষ্ঠীরই ধারাবাহিক বিকাশ এবং সম্ভাব্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ভার মুখ্য নেতা শেখ মুজিব নিজেই এ বাহিনীর ওপর অর্পণ করেছিলেন।[৪২]

দ্বিতীয়ত, মুজিব বাহিনীর কার্যক্রমের সূচনাতেই সিরাজুল আলম খানদের নিউক্লিয়াসের[৪৩] পাশাপাশি তাতে ছাত্রলীগের মণি-তোফায়েল-মাখনদের নেতৃত্বাধীন অংশের সমন্বয় ঘটেছিল।

তৃতীয়ত, নিউক্লিয়াসের একাংশ একটি 'সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ'-এর স্বপ্ন দেখতেন।

চতুর্থত, বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর সঙ্গে মুজিবের সম্পর্ক বিষয়ে তাজউদ্দীন আহমদ ওয়াকিবহাল ছিলেন।

---

৪২ কাজী আরেফ আহমেদের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে না থাকলেও অন্যান্য সূত্রে এও সমর্থিত হচ্ছে যে, 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' এসময় একটি সশস্ত্র শাখার গোড়াপত্তন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। '৭১-এর শুরু থেকে ইকবাল হলে, বর্তমানে যা জহুরুল হক হল, রাতে নকল রাইফেল নিয়ে ট্রেনিং হতো। দেখুন, শামসুদ্দিন আহমেদ-এর সাক্ষাৎকার, আফসান চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪২। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ একাত্তরের বহু পূর্বে ছাত্রদের মাঝে সশস্ত্র কার্যক্রমের সূচনা ঘটিয়েছিল। কেবল ঢাকায় নয়, অন্যান্য অনেক জেলাতে ২৫ মার্চের পূর্বে এরূপ প্রশিক্ষণের কথা জানা যায়। যেমন কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের মুজিব বাহিনী সদস্য *জিয়ারুল ইসলাম* ২৫ মার্চের পূর্বে ছাত্রাবস্থায় তাঁর খুলনার বিএল কলেজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সেখানে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ছাত্রলীগের তত্ত্বাবধানে রাতের আঁধারে ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ হতো এবং তাতে এক পর্যায়ে সত্যিকারের অস্ত্র নিয়েই প্রশিক্ষণ চালু হয়। একজন অবসরপ্রাপ্ত সিপাহি এখানে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। *২০১৩ সালের ১১ অক্টোবর ঢাকার মোহাম্মদপুরে নিজ বাসায় তাঁর এই সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।*

৪৩ সিরাজুল আলম খানদের নিউক্লিয়াসের একটি সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা ছিল বলে বিভিন্ন উৎস থেকে শক্তিশালী সাক্ষ্য মেলে। তারপরও কেন খান নিজস্ব নিউক্লিয়াসে ছাত্রলীগের সমাজতন্ত্র বিরোধী গ্রুপের পুরোধাদের অন্তর্ভুক্তি মেনে নিলেন তার ব্যাখ্যা হিসেবে মনে করা হয়– মুজিবের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার এবং তার মাধ্যমে প্রাপ্তব্য সম্ভাব্য ভারতীয় সহযোগিতা ব্যবহারের স্বার্থে তা ঘটেছিল। অন্যদিকে মুজিব সমাজতন্ত্রের অনুসারী না হওয়া সত্ত্বেও যুবনেতা শেখ মণি ও তোফায়েল আহমেদকে এই নিউক্লিয়াসে অন্তর্ভুক্ত করিয়েছিলেন আন্দোলনের ঐ ভরকেন্দ্রে তাঁর কর্তৃত্ব বাড়াতে। লক্ষ্যণীয়, ইতিহাসের এই সময়টিতে 'সমাজতন্ত্রী' এবং 'সমাজতন্ত্র বিরোধী' উভয়ে পরস্পর যুথবদ্ধ হচ্ছে কেবল প্রভাববলয় বিস্তৃতির প্রয়োজনে, মতাদর্শিক বিবেচনা থেকে নয়। আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, সেসময় দেশের মূলধারার সমাজতন্ত্রীরা তাদের আদর্শ বপনের জন্য প্রথাগতভাবে শিল্পাঞ্চল ও কৃষক সমাজকে বেছে নিলেও সিরাজুল আলম খান কর্মএলাকা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ইকবাল হল, এস এম হল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আহসানউল্লাহ হল, ক্যাফেটিরিয়া ইত্যাদি স্থানকে। তিনি তখন ছাত্রদের নিকট-ভবিষ্যতের রাজনীতির 'স্ট্রাইকিং ফোর্স' মনে করতেন। তাঁর এ অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

পঞ্চমত, মুজিব বাহিনী ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ এন্ড এনালিসিস উইং (Research and Analysis Wing- RAW)-এর সৃষ্টি এ তথ্য সঠিক নয়– যদিও শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুনির্দিষ্ট 'ঠিকানা' দিয়ে ছাত্রনেতাদের সেখানে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে বলেছেন এবং এক্ষেত্রে দু'জন মধ্যবর্তী ব্যক্তি ছিলেন চিত্তরঞ্জন সূতার ও ডা. আবু হেনা।[৪৪]

ষষ্ঠত, মুজিব বাহিনীর সঙ্গে প্রবাসী সরকারের মুখ্যব্যক্তিদের বৈরিতার বিষয়টি একেবারেই ঠিক নয় বরং তারা এই সংস্থাটি সম্পর্কে পূর্বাপর অবহিত ছিলেন।

মুজিব বাহিনী বিষয়ে উপরিউক্ত প্রতিটি দাবি বা মতকেই পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে প্রাসঙ্গিক সূত্র ও বাস্তব তথ্যের আলোকে যাচাই করা হবে এবং আমরা দেখবো, এসব অভিমতে সত্য ও মিথ্যার বিপজ্জনক মিশ্রণ ঘটে গেছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সিরাজুল আলম খানদের নিউক্লিয়াসের গঠন এবং তার পরবর্তী কাঠামো হিসেবে 'মুজিব বাহিনী'র উপরে উল্লিখিত বিকাশকে এ পর্যায়ে পূর্ববাংলার তৎকালীন কমিউনিস্ট আন্দোলনের পটভূমিতেও বিবেচনা করা জরুরি। কারণ যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধের পরপর দ্রুত ব্যাপকভাবে মুজিব বাহিনীকে দেশের বামপন্থী বলয়ে মতাদর্শিকভাবে এবং শারীরিকভাবেও এক নতুন চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা যাবে। ইতিহাসের ঐ সময়টিতে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বামপন্থীরা যখন 'শ্রেণি বৈষম্য' হিসেবে দেখছিল ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে সিরাজুল আলম খানদের উল্লিখিত 'নিউক্লিয়াস' তখন একে 'জাতিগত বৈষম্য' হিসেবে ব্যাখ্যা করে। যে কারণে কথিত নিউক্লিয়াসকে এর উদ্যোক্তারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে অভিহিত করতেন।

পূর্ববাংলায় এসময় অন্তত একটি মস্কোপন্থী (মনি সিংহয়ের নেতৃত্বাধীন) এবং পাঁচটি পিকিংপন্থী 'কমিউনিস্ট পার্টি বা গ্রুপ' সক্রিয় ছিল। এসব উপদলের নেতা ছিলেন সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক, দেবেন শিকদার, আবুল বাশার, আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন, কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো এবং সিরাজুল হক সিকদার (সিরাজ সিকদার)। মস্কোপন্থী দল দীর্ঘ মেয়াদে শান্তিপূর্ণ সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্রে

---

৪৪ চিত্ত সূতার সম্পর্কে এই লেখার অন্যত্র (৩.খ) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর মতোই ডা. আবু হেনা ছিলেন মুজিব ও ভারতীয় বিভিন্ন সংস্থার মধ্যকার যোগাযোগ মাধ্যম। সিরাজগঞ্জের বেলকুচি থেকে ডা. হেনা সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মননোয়ন পান এবং প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হন। তবে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্র ছিল ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ময়মনসিংহে লেখাপড়া করেন। গ্রাজুয়েশন করেন ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে। ছাত্রলীগে তিনি ছিলেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের রিক্রুট এবং ওবায়দুর রহমানের ঘনিষ্ঠ। একাত্তরের মার্চের পূর্বে ভারতের সঙ্গে মুজিবের 'যোগাযোগ'-এর ক্ষেত্রে ডা. আবু হেনার ভূমিকা সম্পর্কে পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে আরও আলোচনা রয়েছে।

পৌঁছানো এবং স্বল্পমেয়াদে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও 'সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী' একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং পিকিংপন্থীরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌঁছাতে কৃষক প্রলেতারিয়েতের সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে বলছিলেন। সশস্ত্র 'লাইন'-এর কারণে পিকিংপন্থীরা সত্তরের নির্বাচনও বর্জন করে।

আপাতদৃষ্টিতে ৫০ থেকে ৬৫ সময়ে উভয় ধারার কমিউনিস্টদের সদস্য সংখ্যাই বাড়ছিল পূর্ববাংলায়। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় পূর্ববাংলায় যেখানে অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা নেমে এসেছিল মাত্র কয়েক শ'তে সেখানে ১৯৬৬ সালে মস্কো-পিকিং বিরোধ ও ভাঙনের আগে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় অন্তত তিন হাজারে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঠিক এই সময়টিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও কমিউনিস্ট শক্তির উত্থান ঘটছিল। বাংলাদেশে অবশ্য শেষপর্যন্ত জাতীয়তাবাদী উচ্ছ্বাসে কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ বাধাগ্রস্ত হয়। ইতিহাসের এ পর্যায়ে পূর্ববাংলায় জাতীয়তাবোধের নির্ধারক ভূমিকা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় প্রায় উভয় ধারার বামপন্থীরাই। সিরাজুল আলম খানদের 'নিউক্লিয়াস' এবং সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে তরুণ মাওবাদীদের ক্ষুদ্র এক কেন্দ্র এক্ষেত্রে ছিল বিশেষ এবং মনোযোগ আকর্ষণী ব্যতিক্রম।

বাংলাদেশে গত চার দশকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে উচ্ছ্বাসপূর্ণ অনেক গ্রন্থ ও ইতিহাস রচনা হলেও একাত্তর-পূর্ব সময়ে যে কেবল উপরিউক্ত দুটি গ্রুপই 'স্বাধীনতা'র প্রসঙ্গটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে এসেছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায় কম। 'নিউক্লিয়াস' অনুসারীরা এক্ষেত্রে কিছুটা স্বীকৃতি পেলেও সিরাজ সিকদার অনুসারীদের প্রতি সমকালীন ঐতিহাসিকরা পুরোদস্তুর বৈরি হয়েই থেকেছেন। অথচ রাজনীতির এই ধারাটি রণনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অসামান্য নজির রেখেছিল সেসময়।

যতদূর জানা যায়, ভারতের নকশালবাড়ি আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিরাজ সিকদার ১৯৬৬ সালে মাও সেতুঙ চিন্তাধারা গবেষণা কেন্দ্র এবং পরের বছর 'পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলন' নামে দুটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। সিরাজ সিকদার ও তাঁর অনুসারীরা ১৯৭১ সালের মার্চের বহু আগে প্রকাশ্যে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের *উপনিবেশ* হিসেবে আখ্যায়িত করে পাকিস্তানী শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে *যুদ্ধের মাধ্যমে* স্বাধীনতার ডাক দেয় এবং নিজেরা সে কাজে নেমে পড়ে। মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীসহ বাংলাদেশের মূলধারার মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করতে ভারতের ওপর নির্ভরতাকে যখন অলঙ্ঘনীয় নিয়তি ধরে নিয়ে এগোচ্ছিলেন তখন সিরাজ সিকদার ও তাঁর অনুসারীরা সফলতার সঙ্গে নিজস্ব শক্তিতে দেশেই একাধিক 'মুক্তাঞ্চল' গড়ে তুলতে সফল হন (বরিশালে এইরূপ এক মুক্তাঞ্চলেই একাত্তরের ৩ জুন তাঁর নেতৃত্বাধীন 'পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলন' পরিবর্তিত হয়ে

প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি।) এ দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার শক্তিশালী উদ্যোগগুলো মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে সিরাজ সিকদারের তাত্ত্বিক ও রণনৈতিক উপরিউক্ত অগ্রসরতাকে সব সময় যেমন নীরবতার চাদরে ডেকে রাখতে পেরেছে তেমনি দেশের অভ্যন্তরে থেকে অন্যান্য যেসব দেশপ্রেমিক শক্তি প্রতিরোধ গড়ে তোলায় উদ্যোগী ছিল (নরসিংদীর বেলাবো, শিবপুর; কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর; যশোরের নড়াইল-শালিখা-মোহাম্মদপুর-কালীগঞ্জ; নোয়াখালীর হাতিয়া ও লক্ষ্মীপুর, বাগেরহাটের বিষ্ণুপুর ইত্যাদি স্থানে) তাদের অভিজ্ঞতাও মনোযোগ পেয়েছে কমই।[৪৫]

২. খ. উত্তাল মার্চে ছাত্রলীগের 'নিউক্লিয়াস' : যুদ্ধ যেভাবে পূর্ববাংলার নিয়তি হয়ে উঠল

> ইতিহাসে বরাবরই সকল যুদ্ধের পেছনে ছিল 'বিজয়ী'র লুণ্ঠনগত স্বার্থ...কিন্তু সকল যুদ্ধেই বাস্তব লড়াইয়ে থেকেছে শ্রমজীবী শ্রেণী। তাদেরই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। অকৃপণভাবে সকল রণক্ষেত্রে এই শ্রেণীকেই রক্ত ঝরাতে হয়েছে। তারাই ছিল 'বিজয়ী' বাহিনীর মূল সৌন্দর্য। কিন্তু কখনো, কোথাও, যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন– কোন পর্যায়ে তাদের মতামতের কোন সুযোগ ছিল না। সবাইকে যুদ্ধে নামানো এবং আবার শান্তিতে ফিরিয়ে আনা– দু'টোই করেছে শাসক শ্রেণী। ব্যতিক্রমহীনভাবে সর্বত্র এটা ঘটেছে। আর এসব করতে গিয়ে অবিরামভাবে নিজেদের 'দেশপ্রেমমূলক ভূমিকা'-এর কথা বলতে থাকে তারা। তাদের এই কথিত 'দেশপ্রেম' কখনো তাদের গোলাগুলির সামনের কাতারে ঠেলে দেয় না। পরিখার ভেতরে থেকে 'শত্রু'পক্ষের গোলার খোরাক হতেও দেখা যায় না তাদের।
>
> –Eugene V. Devs (১৮৫৫-১৯২৬), যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত শ্রমিক সংগঠক, সমাজতন্ত্রী।[৪৬]

বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে (২.ক) মুজিব বাহিনী সম্পর্কে তোফায়েল আহমেদ, কাজী আরেফ আহমেদ, আ স ম আব্দুর রব প্রমুখের যেসব বক্তব্য তুলে ধরা

---

৪৫ একাত্তর-পূর্ব সময়ে পূর্ববাংলায় বামপন্থীদের রাজনৈতিক ভূমিকার উপর বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, তালুকদার মনিরুজ্জামান, *বামপন্থী রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, অনুবাদঃ মো. সাহেব আলী ও এ কে এম কুতুবউদ্দিন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭। বিশেষভাবে মাওবাদী দলগুলোর বিকাশ ও পরিণতির জন্য দেখুন, Md. Nurul Amin, *Maoism in Bangladesh: The Case of the East Bengal Sarbohara Party* in Asian Survey, Vol. 26, No. 7. (July, 1986), pp. 759-773.

৪৬ যুদ্ধবিরোধী ভূমিকার জন্য নিজদেশ যুক্তরাষ্ট্রে 'দেশদ্রোহী' আখ্যায়িত হয়েছিলেন Eugene V. Devs. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Walls and Bars. তাঁর সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন, en.wikipedia.org/wiki/Eugene_V_Devs (retrived on 15th Feb. 2013).

হয়েছে সে বিষয়ে অন্যান্য ঐতিহাসিক ভাষ্যের তুলনামূলক আলোচনায় যাওয়ার আগে সত্তর-একাত্তরের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, বিশেষত একাত্তরের মার্চে, ছাত্রলীগের 'নিউক্লিয়াস'-এর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থাপন এ পর্যায়ে সম্ভবত প্রাসঙ্গিক হবে।

একাত্তরের মার্চে এসে ছাত্রলীগের কথিত 'নিউক্লিয়াস'-এর রাজনৈতিক তৎপরতা এক চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তসূচক রূপ নেয়। সংক্ষেপে সেই সময়কার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে, মুজিবুর রহমান তখন প্রকাশ্যে 'ছয়দফা' ভিত্তিক এমন একটি পাকিস্তানের কথা বলছিলেন, যেখানে পূর্ব-পাকিস্তান হবে **একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ**, যার হাতে পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষার দায়িত্ব ছাড়া আর প্রায় সব প্রশাসনিক বিষয় থাকবে– যার মধ্যে রয়েছে পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা, কর ধার্য ও আদায় এবং প্যারামিলিটারি গড়ে তোলার অধিকারও। অর্থাৎ তাঁর দাবি অনুযায়ী মূলত পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন এবং তার আওতায় পূর্ব-পাকিস্তান হবে একটি স্বশাসিত প্রদেশ। ছয়দফা বাস্তবায়িত হলে পূর্ব-পাকিস্তান তার সুবিধামত যে কোন দেশের সঙ্গে পৃথকভাবে বাণিজ্যিক সম্পর্কও করতে পারত।[৪৭]

সত্তরের নির্বাচনে জনগণ মুজিবুর রহমানের এসব দাবির প্রতি সরাসরি সমর্থন দিয়েছিল বলেই প্রতীয়মান হয়– যদিও নির্বাচনে দ্রব্যমূল্য কমানোর মতো নানান চিত্তাকর্ষক প্রতিশ্রুতিও ছিল তাঁর। বস্তুত মুজিবের ছয়দফার মাঝে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানরা দেশটির পশ্চিম অংশের সঙ্গে অসমতা হ্রাসের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিল।[৪৮] বিশেষভাবে পূর্ববাংলার উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি মনে

---

৪৭ 'ছয়দফা'র এই বিশেষ দফাটি (৫ নং দফা) ভারতকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। এর মধ্যে সে তার জন্য বিশাল এক বাণিজ্যিক সম্ভাবনা দেখতে পায়। ঐসময় পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলো কাঁচাপাটের অভাবে ধুঁকছিল। অথচ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে অঢেল পাট বিদেশে রপ্তানি হতো। ভারত ভেবেছিল মুজিব ছয়দফা আদায় করার মানেই হলো তার পাটশিল্পের পুনরুত্থান। তাদের সেই ভাবনা ছিল সঠিক। একাত্তরের পর বাংলাদেশ সরকারের পাটনীতি ভারতকে তাদের প্রত্যাশার চেয়েও অধিক সুযোগ এনে দেয়। উল্লেখ্য, 'ছয়দফা'র ঘোষণা হয় ১৯৬৬-এর ফেব্রুয়ারিতে।

৪৮ এই অসমতা বাঙালিদের মাঝে বঞ্চনার একটি বোধ সৃষ্টি করে। বিশেষত যখন তারা দেখতে পায়, 'পশ্চিমের নাগরিকরা তাদের চেয়ে ভালো খায়, ভালো পরে, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা সুবিধা পায় এবং উন্নত যানবাহন ও যোগাযোগ অবকাঠামোর মধ্যে থাকে।' যদিও দেশটির পূর্ব অংশের চেয়ে পশ্চিমে বাজারের আকার ছিল বড় এবং বাঙালি মুসলমানদের বৃহৎ আয়তনের অর্থনৈতিক উদ্যোক্তা হিসেবে অবাঙালি মুসলমানদের চেয়ে অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও মেধার ঘাটতি ছিল– ফলে এখানে অর্থনৈতিক বিকাশের গতি ছিল অপেক্ষাকৃত ধীর। কিন্তু যখনি তারা দেখেছে, দেশটির বিত্তবান ৪৩টি শিল্প গোষ্ঠীর মাঝে মাত্র একটি বাঙালি (এ কে খান গ্রুপ-চট্টগ্রাম) তখন তারা নিজেদের 'কোণঠাসা' ভেবেছে; বিশেষ করে যখন তারা দেখে, সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও (৫৬ শতাংশ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভরকেন্দ্রগুলোতে তাদের প্রতিনিধি কম এবং আঞ্চলিক অসমতা কমাতে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকরা যথেষ্ট আন্তরিকও নন। বঞ্চনার এই বোধ দানা বাঁধাতে ষাটের দশকে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি

করেছিল আওয়ামী লীগ 'ছয়দফা আদায়' করতে পারলে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশ্চিমের মধ্যবিত্তের পাশাপাশি তারও বিকাশের কিছু বাড়তি পরিসর তৈরি হবে। নির্বাচনের পর উঠতি মধ্যবিত্তের সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সংগ্রামেই লিপ্ত ছিলেন মুজিবুর রহমান। জনপ্রিয়তার অতি উচ্চশিখরে তিনি তখন। তাঁর সমগ্র সংগ্রাম ও দরকষাকষি একাত্তরের মার্চে এক উত্তেজক ক্রান্তি কালে প্রবেশ করে। লক্ষ্যণীয়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোতেই পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য ব্যাপকভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য মুজিবুর রহমান যখন লড়ছেন তখন শিক্ষাঙ্গনে তাঁর প্রধান শক্তিভিত ছিল ছাত্রলীগ এবং তাদের ভরকেন্দ্র ছিল সংগঠনটির অভ্যন্তরীণ উপরিউক্ত 'নিউক্লিয়াস'।

'ছয়দফা'য় আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের সম্ভাবনা ছাড়াও সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে ইশতেহার প্রকাশ করে তাতে 'সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিকতা-বর্ণবাদ' বিরোধী বক্তব্য থাকায় তরুণদের মাঝে দলের ছাত্র শাখা 'ছাত্রলীগ'-এর আবেদন বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৬৯-৭০ সময়ের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পূর্ব-পাকিস্তানের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৪২টি কলেজের মধ্যে ১৩২টিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ সমর্থিত প্যানেল জয়লাভ করে।[৪৯] স্বভাবত সংগঠনটির আত্মবিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা তখন তুঙ্গে। পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় নিজের অবস্থান শক্তিশালী করতে মুজিবুর রহমানও ছাত্রলীগকে ব্যবহার করছিলেন সর্বোতভাবে। এসময় তিনি ছয়দফার কথা বললেও এবং তাঁর পক্ষ থেকে আইন উপদেষ্টা ড. কামাল হোসেনসহ অন্যরা ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টাদের কাছে ২৩ মার্চও (১৯৭১) পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমন্বয়ে কনফেডারেশনের প্রস্তাব[৫০] পেশ করলেও ছাত্রলীগের নিউক্লিয়াস তখন–

অর্থনীতিবিদদের মূল্যায়ন ও মতামত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্রনেতারাও একে সফলতার সঙ্গে রাজনীতির প্রধান ইস্যুতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। দেশটির দু'অঞ্চলের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, দুর্বল সাংবিধানিক বিকাশ এবং সীমিত রাজনৈতিক স্বাধীনতাও বঞ্চনার উপরোক্ত বোধের তিন সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে এবং পূর্বের বাসিন্দারা এক পর্যায়ে ভাবতে শুরু করে, আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন হয়তো তাদের বঞ্চনার সদুত্তর হয়ে উঠতে পারে। ছয়দফার জনপ্রিয়তার মূলে ছিল উপরোক্ত মনোভঙ্গি। এ বিষয়ে আরও বিশ্লেষণী আলোচনার জন্য দেখুন, রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ১৫-৭২।

৪৯ Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh revolution and its aftermath*, Bangladesh Books International Ltd, 1980, Dhaka, p. 29.

৫০ দেখুন, মিজানুর রহমান খান, দুনিয়া কাঁপানো ছাব্বিশ দিন, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ২৭-৫৫।

- শ্লোগান দিচ্ছে, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর– বাংলাদেশ স্বাধীন কর' (১ মার্চ)[৫১];
- তারা বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পতাকায় অগ্নিসংযোগ করছে এবং সম্ভাব্য 'স্বাধীন বাংলা'র পতাকা তৈরি ও তা উত্তোলন করছে (২ মার্চ);
- 'স্বাধীনতা'র ইশতেহার পাঠ করছে শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে পল্টন ময়দানে (৩ মার্চ);
- উর্দু সিনেমা প্রদর্শন বন্ধের জন্য হল মালিকদের ও উর্দু বই বাজার থেকে তুলে নেয়ার জন্য বইয়ের দোকানগুলোর প্রতি নির্দেশ সম্বলিত বার্তা প্রচার করছে (৮ মার্চ);
- ঢাকার সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে বোমা তৈরির রাসায়নিক লুট ও দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্দুকের দোকান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র লুট করে (১০ মার্চ);
- বাংলাদেশের জন্য পৃথক জাতীয় সংগীত নির্ধারণ করে নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের পরিবর্তে সেটাকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হচ্ছে (১১ মার্চ);
- উর্দুভাষীদের আবাসস্থল ত্যাগ ও পাকিস্তানি সৈন্যদের চলাচল নিয়ন্ত্রণে ঢাকার পাঁচটি স্থানে চেকপোস্ট বসানো শুরু করেছে (১৪ মার্চ);
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা করেছে (১৭ মার্চ);
- ঢাকার কয়েকটি পত্রিকায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ'-এর মানচিত্র দিয়ে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে; দেশব্যাপী আনুষ্ঠানিকভাবে *নতুন দেশের পতাকা* উত্তোলন করছে (২৩ মার্চ);
- পল্টনে গণবাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান করছে। দশ প্লাটুন সদস্য কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্মান প্রদর্শন এবং মুজিবের হাতে সেই পতাকা তুলে দেওয়া হয় (২৩ মার্চ);[৫২]

---

৫১ সেই সময়কার ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা এবং ডাকসুর ভিপি আবদুর রব এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশ' ধারণাটি প্রথম তাঁরা পেয়েছেন বিচারপতি ইব্রাহিমের কাছ থেকে। আবদুর রাজ্জাকের মাধ্যমে ছাত্রলীগের সঙ্গে বিচারপতি ইব্রাহিমের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। দেখুন, আ স ম রব, কোথায় যাবে বাংলাদেশ, *সাপ্তাহিক ঠিকানা*, ১৯ আগস্ট ২০১২, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

আওয়ামী লীগের গণপরিষদ সদস্য ডা. আবু হেনাও বর্তমান লেখককে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, বিচারপতি ইব্রাহিমই তাদের স্বাধীনতার প্রশ্নে বিশেষ অনুপ্রাণিত করতেন। বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের অন্যতম বিএলএফ সংগঠক আ ও ম শফিক উল্যাহও সাক্ষাৎকারে অভিমত দিয়েছেন, সিরাজুল আলম খান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগিদের স্বাধীনতাকেন্দ্রিক অনুপ্রেরণার বিশেষ উৎস ছিলেন বিচারপতি ইব্রাহিম। ১৮৯৪ সালে ফরিদপুরের সদরপুরে জন্মগ্রহণকারী মোহাম্মদ ইব্রাহিম ১৯৫৮ সাল থেকে জেনারেল আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ছিলেন। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে আইয়ুব খানের সঙ্গে নীতিগত মতবিরোধের কারণে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। এর পর থেকে তিনি তৎকালীন আওয়ামী ঘরানার তরুণ রাজনীতিক কর্মীদের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১৩ নভেম্বর তিনি মারা যান।

৫২ মার্চের ১ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত ছাত্রলীগ কী কী কর্মসূচি পালন করেছে তার পুরো বিবরণের জন্য দেখুন, মিজানুর রহমান খান, *পূর্বোক্ত* এবং ডা. মাহফুজুর রহমান, *বঙ্গবন্ধু : ছাত্রলীগ-নিউক্লিয়াস*, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণাকেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৮৪-১১২।

উপরোক্ত সব কর্মসূচিতে 'বাঙালির জন্য' নতুন রাষ্ট্রের আবেগকে প্রধান প্রবণতা হিসেবে দেখা যায়। তবে সেই রাষ্ট্রের রূপ কী হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কোনো স্পষ্ট ছবি ছিল না। এক্ষেত্রে ভারতের জন্য বিশেষ স্বস্তিদায়ক ঘটনা ঘটে ছাত্রলীগ কর্তৃক 'স্বাধীন

ছাত্রলীগের উপরিউক্ত মার্চ-কর্মসূচি শেখ মুজিবুর রহমানকে দরকষাকষির প্রক্রিয়ায় এমন এক চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে ঠেলে দেয়, যেখানে পাকিস্তানের কাঠামোতে ছয়দফাভিত্তিক সমাধানের সুযোগ অনেকাংশে কমে যায়। ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খানদের অদৃশ্য ভরকেন্দ্রটি ঠিক এটাই চাইছিল। এসময় পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করার মতো 'সিদ্ধান্ত'গুলো তারাই নিচ্ছিল– মুজিবুর রহমান তা অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন কেবল। এমনিতে 'ছয়দফা' থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দূরত্ব ছিল খুবই কম। তারপরও ২৩-২৪ মার্চ পুরো সময় জুড়ে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে নিবিড়ভাবে আলোচনা চলছিল এবং অন্যতম আলোচক ড. কামাল হোসেন সেই আলোচনার ফলাফলের ইতিবাচক আভাসও দিয়ে যাচ্ছিলেন মুজিবুর রহমানকে। কিন্তু মুজিবের হাতে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিয়ে ছাত্রলীগ আলোচনার প্রক্রিয়ায় তাঁর অবস্থানকে নিঃশেষ করে দেয় এবং ছয়দফা ও স্বাধীনতার মাঝের স্বল্প ব্যবধানটুকুও লুপ্ত করে দেয়। ছাত্রলীগের এসব কর্মসূচিতে মুজিবের অমত রয়েছে বলেও মনে হয়নি। পরিণতিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট'-এ নামে তখন নিজ বাসভবনে বসে থাকা ছাড়া মুজিবের আর একটাই করণীয় ছিল, ভারতে চলে যাওয়া। কিন্তু তা হতো, ভারতীয় গোয়েন্দাদের সঙ্গে তিনি ও তাঁর সহযোগীদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে পাকিস্তানিদের এতদিনের অভিযোগকে সরাসরি সত্যতা দান।

সিরাজুল আলম খানের পরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্রলীগ নেতারা যেভাবে নানান উদ্ভাবনী তৎপরতার মাধ্যমে মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামকে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছিলেন– তেমনি পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বও ২৫ মার্চ তাদের বর্বর অপারেশনের মাধ্যমে 'সমঝোতা'র সকল সুযোগ ধ্বংস করে দিয়েছিল। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক দলিলপত্র এও সাক্ষ্য দিচ্ছে, একাত্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরকেন্দ্রিক সংকটের অন্যতম চরিত্র জুলফিকার আলী ভুট্টো ও তাঁর জেনারেল বন্ধুরাও চাইছিল পূর্ব-পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাক। বিশেষ করে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান অন্তত সেরকমই সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

পূর্ববাংলা'র পতাকার নকশা প্রকাশের পর। পতাকায় সুনির্দিষ্টভাবে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের মানচিত্র সবুজের উপরে স্থাপিত দেখে এটা স্পষ্ট হয়, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ডতার জন্য মোটেই কোনো বিপদ ডেকে আনছে না। ছাত্রলীগের সেই সময়কার একজন কর্মী, যিনি বর্তমানে জাসদের সঙ্গে কাজ করছেন– বর্তমান লেখকের কাছে পতাকার নকশা তৈরির কাহিনী বর্ণনাকালে মন্তব্য করেন, 'ঐ পতাকার মধ্য দিয়েই আসলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ-এর চিরায়ত ধারণার মৃত্যু ঘটানো হয়।' কারণ পতাকা তৈরির ঐ অধ্যায়ের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণাটি স্পষ্টত খণ্ডিত হয়ে পড়ে।

মৃত্যুর ২৭ বছর পর প্রকাশিত তাঁর গোপন এফিডেভিটে[৫৩] ইয়াহিয়া বলছেন, 'একাত্তরে ভুট্টো যেসব কথা বলেছেন, যেসব গোয়ার্তুমি করেছেন– পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টে নিঃসন্দেহে তা ছিল শেখ মুজিবের ছয়দফার তুলনায় অনেক বেশি আত্মঘাতী।... নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে মুজিবুর রহমানকে মেনে নিতে ভুট্টো মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। পাকিস্তানকে আলাদা করার জন্য ভুট্টো সিজিএস লে. জে. গুল হাসান খান ও বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল রহিম খানকে নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন– যা আমি অনেক পরে জানতে পারি। ভুট্টো চাইছিল দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তানের ক্ষমতা। এক পর্যায়ে ভুট্টো *এক পাকিস্তানে দুই প্রধানমন্ত্রীর* তত্ত্ব নিয়ে জেদ ধরেন। ভুট্টো যখন এ ধরনের আচরণ দেখান, তখনও ঢাকায় প্রকাশ্য জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা ছিল পাকিস্তানের একতা ও সংহতির পক্ষে।... ছয়দফা নিয়ে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের অবস্থানও ছিল নমনীয়।...তবে বরাবরই আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে একটি উগ্রবাদী গোষ্ঠীও সক্রিয় ছিল।'

ইয়াহিয়ার উপরিউক্ত ভাষ্য এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, মুজিব ও ভুট্টোর সঙ্গে মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে তিনিই দরকষাকষি করছিলেন। তাঁর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, মুজিবুর রহমান যেমন তাঁর তরুণ অনুসারীদের একাংশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি তেমনি ইয়াহিয়াও তাঁর জেনারেলদের বাঙালি বিদ্বেষী একাংশের সঙ্গে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সংযোগের বিধ্বংসী ফলাফল থামাতে পারেননি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঐ জেনারেলরা পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালিদের উদীয়মান জাতীয়তাবোধের মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন গোলাগুলির মাধ্যমে; মার্চ-আন্দোলনের গণভিত্তি সম্পর্কে তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে মনে হয় না। অন্যদিকে মুজিবুর রহমান যে তীব্র দরকষাকষির মাঝেও মর্যাদাপূর্ণ একটি

---

৫৩ ২০০৫ সালে পাকিস্তান সরকার এই এফিডেভিট প্রকাশ করে। বস্তুত এটাই হলো একাত্তরের ঘটনাবলি সম্পর্কে ইয়াহিয়ার একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জবানবন্দি। উল্লেখ্য, একাত্তরের যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র ভুট্টো ক্ষমতা গ্রহণ করে ইয়াহিয়াকে গৃহবন্দি করেন। প্রথমে তাঁকে দেশটির খাড়িয়া এলাকায় বনবিভাগের একটি রেস্টহাউসে রাখা হয়। তাঁর পেশোয়ারের বাড়িটি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। কখনোই সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হতো না তাঁকে। ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন হলে ইয়াহিয়া মুক্তি পান এবং আলোচিত এই এফিডেভিট লিখেন। লাহোর হাইকোর্টের আইনজীবী মনজুর আহমদ রানার মাধ্যমে ৫৭ পৃষ্ঠার গোপনে লিখিত এই ভাষ্যের প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর শেষে ইয়াহিয়া এটি কোর্টে নথিভুক্ত করেন ১৯৭৯ সালে এবং পরের বছরই তিনি মারা যান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *Secret Affidavit of Yahya Khan*, Edited by Abu Rushed, Bangladesh Defence Journal Publishing, 2009, Dhaka. এখানে ইয়াহিয়ার যেসব বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো নেয়া হয়েছে আবু রুশদ সম্পাদিত উপরোক্ত গ্রন্থ থেকে যেখানে সম্পাদক ইয়াহিয়ার এফিডেভিটের মূল ইংরেজি ভাষ্যের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ নিয়ে আটটি ছোট ছোট ধারাভাষ্য তৈরি করেছেন। দেখুন, পৃ. ১৪-৩৫.

সমঝোতার বিষয়ে চেষ্টারত ছিলেন, যেমনটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় ইয়াহিয়ার উপরিউক্ত ভাষ্যে– তার সমর্থন মিলে মুজিবের অন্যতম আলোচক ড. কামাল হোসেনের তরফ থেকেও। সামরিক শাসন প্রত্যাহার, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে একাত্তরের মার্চের নাটকীয় সেই দরকষাকষির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লিখিত 'স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা : ১৯৬৬-১৯৭১' শীর্ষক গ্রন্থের শেষপ্যারাটি শেষ করেছেন ড. কামাল হোসেন এভাবে :

> '২৫ মার্চে ভয়াবহ রাতের আগে সারাক্ষণ আমি একটি টেলিফোন পাওয়ার অপেক্ষা করলাম। এমনকি ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ আমি যখন শেখ মুজিবের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম তখনও শেখ মুজিব আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি ঐ টেলিফোন পেয়েছি কি না। ঐ টেলিফোন কখনোই আসেনি।'[৫৪]

উল্লিখিত টেলিফোন আসার কথা ছিল দরকষাকষির আলোচনায় যাঁরা ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন– লে. জে. পীরজাদা, বিচারপতি কর্নেলিয়াস প্রমুখের কাছ থেকে। কিন্তু টেলিফোন যে আসেনি সেটা তো এখন ইতিহাসের অংশ। আর ঐ টেলিফোন না আসার মধ্য দিয়ে শুরু হয় পূর্ব-পাকিস্তান সংকটের দ্বিতীয় পর্যায় এবং পূর্ব-বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক অধ্যায়। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর নানান বিপরীতমুখী আচরণে যুদ্ধই তখন পূর্ববাংলার নিয়তি হয়ে ওঠে। বস্তুত ইয়াহিয়ার প্রতিনিধিরা যখন মুজিবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সমঝোতার পথ খুঁজছেন তখন আবার নিজেদের মতো করে সংঘাতের জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এক্ষেত্রে আলোচনার আড়ালে ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও পাকিস্তানি জেনারেলদের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সামরিক অপারেশনের পূর্বপ্রস্তুতি এবং তাদের তরফ থেকে নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থকদের রাষ্ট্র পরিচালনার ন্যায্য আকাঙ্ক্ষাকে *আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা* হিসেবে দেখার গুরুতর ভ্রান্তির বিষয়টি রাজনৈতিক সাহিত্যে বেশ ভালোভাবে আলোচিত; কিন্তু মুজিবের পক্ষ থেকেও একই সময়ে, এমনকি মার্চের প্রথম সপ্তাহ

---

৫৪ দেখুন, ড. কামাল হোসেন, *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা: ১৯৬৬-১৯৭১*, অংকুর প্রকাশনী, ১৯৯৪, ঢাকা, পৃ. ৭৩। ড. কামাল হোসেনের বিবরণ থেকে দেখা যায়, ইয়াহিয়া এবং মুজিবের সম্মতিতেই আওয়ামী লীগের একদল আলোচক, যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি নিজেও– ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত আপসমূলক একটি খসড়া প্রস্তাব নিয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পূর্ববর্তী ২-৩ সপ্তাহ ধরে 'দিন-রাত কাজ করছিলেন।' একেবারে শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানকে একটি 'কনফেডারেশন' বা 'ইউনিয়ন' হিসেবে দেশটির ভবিষ্যৎ সংবিধানে উল্লেখের বিষয়েও তাঁরা প্রায় চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছেছিলেন। তবে ২৪ মার্চ এসে আলোচনা থেমে যায়। এসময় পাকিস্তানের শাসক এলিটদের মাঝে 'শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা'য় বলপ্রয়োগের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য বিস্তার করে।

থেকে– স্থানীয় ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ করা হচ্ছিল সেই বিষয়ে বর্তমানে বহু সূত্র থেকে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য মেলে। যেমন ভারতের পেশাদার কূটনীতিবিদ চন্দ্রশেখর দাসগুপ্ত সেদেশের খ্যাতনামা 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় ২০১১ সালের ১৭ ডিসেম্বর 'Was there an Indian plot to break up Pakistan in 1971' শীর্ষক লেখায় স্পষ্ট জানাচ্ছেন, ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম দিকেই আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের পূর্ববাংলার সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি লিখেছেন,

> In early March, Tajuddin Ahmad met secretly with Deputy High Commissioner K.C. Sen Gupta, on Mujib's instructions, to explore whether India would provide political asylum and other assistance in the event of a liberation war. After consulting Delhi, Sen Gupta gave a response that was insufficiently specific to satisfy Sheikh Mujib. In mid-March, the latter repeated his appeal for assistance at this critical hour for his country...

অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য অপর সূত্র[৫৫] থেকে এটাও এখন প্রকাশ্য যে, ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার কে সি সেনগুপ্তের সঙ্গে সেসময় মুজিবের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন সুজাত আলীও 'যোগাযোগ' রাখতেন; আর মুজিবের 'দ্রুত সিদ্ধান্ত'-এর অন্তত একটি আর্জি ইন্দিরা গান্ধীর দপ্তরে পৌঁছে ১৯ মার্চ।

মার্চের শুরুতে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের তরফ থেকে ভারতীয়দের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের আরও শক্ত সাক্ষ্য মেলে খোদ আওয়ামী সূত্র থেকেও। তাজউদ্দীন আহমদের ১৯৭৩ সালের ২৯ আগস্টে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক তালকুদার মনিরুজ্জামান জানাচ্ছেন,

> 'At the Government level, some of the AL leaders contracted a top official of the Indian Deputy High Commissioners office at Dacca in the first week of March....The official concerned then went to Delhi, on the pretext of his daughter's illness, and came back on 8 after having consulted the 'appropriate authority.' He assured the AL leaders that some help

---

[৫৫] Srinath Raghavan, *Ibid*, p. 54. শ্রীনাথ রাঘবন এখানে ১৯৭১-এর ১৪ মার্চ ভারতের বিদেশ সচিবকে লেখা ঢাকার ডেপুটি হাইকমিশনারের চিঠি উদ্ধৃত করেছেন নয়াদিল্লির নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এন্ড লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'হাকসার পেপার'স থেকে। উল্লেখ্য, গবেষক Gary J. Bass-ও একই সূত্র থেকেই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

in terms of food-supply at the border and political asylum would be available.'[৫৬]

শেষোক্ত বৈঠকটি হয়েছিল ৫ ও ৬ মার্চ।[৫৭] এইরূপ যোগাযোগ যে সম্ভবত আরও পুরানো বৈঠকগুলোর ধারাবাহিকতা তার স্বীকৃতি রয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রকি সাম্প্রতিক একাধিক আন্তর্জাতিক গবেষণায়। যেমন সাংবাদিক Gary J. Bass তাঁর 'The Blood Telegram : India's Secret War in East Pakistan'-এ নয়াদিল্লির নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এন্ড লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'হাকসার পেপার' (সাবজেক্ট ফাইল ২২০) থেকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন, একাত্তরের ২ মার্চ, (২৫ মার্চের অন্তত তিন সপ্তাহ আগে) মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মুখ্য সচিব হাকসার এবং র প্রধান আর এন কাও-কে জানাচ্ছেন, তিনি 'বাঙালিদের *কেবল ওষুধ এবং খাদ্যই নয়* ভারতের অভ্যন্তরে সীমান্তজুড়ে দ্রুত চলাফেরার জন্য হেলিকপ্টার ও ছোট এরোপ্লেন দিয়েও সহায়তার বিষয় বিবেচনা করছেন। পাশাপাশি এ সহায়তার মধ্যে থাকবে মেশিনগান, মর্টার ও অন্যান্য অস্ত্র এবং গোলাবারুদও।'[৫৮] উল্লেখ্য, এসময় (মার্চ ১৯৭১) ভারতীয় কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগে নিয়মিতভাবেই 'পূর্ব-পাকিস্তান' শব্দের জায়গায় 'বাংলা দেশ' শব্দদ্বয় জায়গা করে নেয়– স্পষ্টত, যা ছিল তাৎপর্যবহ। এ রকম এক যোগাযোগে ডি পি ধর, যখন তিনি মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত– ইন্দিরা গান্ধীর মুখ্য সচিব হাকসারকে লিখছেন, 'This resistance must not be allowed to collapse.'[৫৯] এ পর্যায়ে এও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, 'বাংলাদেশ'কে যথার্থ উপায়ে 'সাহায্য' প্রদানের বিষয় নজরদারি করার জন্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট সেক্রেটারি কে স্বামীনাথন, স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ নারায়ণ, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হাকসার, বিদেশ সচিব কাউল, বৈদেশিক গোয়েন্দা প্রধান কাওকে নিয়ে নীতিনির্ধারণী যে কমিটি করেছিলেন তাও গঠিত হয় ঢাকায় ২৫ মার্চের

---

৫৬ বিস্তারিত দেখুন, Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh revolution and its aftermath*, Bangladesh Books International Ltd, 1980, Dhaka, p. 107.

৫৭ Srinath Raghavan, *Ibid.*

৫৮ দেখুন, Gary J. Bass, *Ibid*, p. 47-48. উল্লেখ্য, মিসেস গান্ধী যে এপ্রিলেই তাঁর সেনাবাহিনীকে পূর্ব-পাকিস্তানে ঢুকে পড়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন তা ইতোমধ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক গবেষণায় স্বীকৃত। জেনারেল শ্যাম মানেকস 'সম্ভাব্য যুদ্ধে নিশ্চিত বিজয়ের লক্ষ্যে' প্রস্তুতির জন্য আরও সময় নেয়ার পক্ষে ছিলেন– 'অন্তত ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত' এবং ইন্দিরা গান্ধী শেষপর্যন্ত এই মতটি মেনে নিয়েছিলেন। বিস্তারিত দেখুন, Gary J. Bass, *Ibid*, p. 93. এবং Srinath Raghavan, *Ibid*, p.67.

৫৯ Gary J. Bass, *Ibid*, p. 95

সামরিক অভিযানের অন্তত তিন সপ্তাহ আগে– ২ মার্চ। এই কমিটিতে পরে শুধু প্রতিরক্ষা সচিব কে বি লালকে সংযুক্ত করে নেয়া হয়েছিল।

চন্দ্রশেখর দাসগুপ্ত, তাজউদ্দীন আহমদ, Gary J. Bass, Srinath Raghavan প্রভৃতি সূত্রগুলো থেকে পাওয়া উপরিউক্ত তথ্য-উপাত্ত ও মতামতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষ্য মেলে ডা. আবু হেনার কাছ থেকেও। তাঁকে যে একাত্তরের ২৫ মার্চের বহু আগে ভারতে পাঠিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান সেটা ইতঃপূর্বে তোফায়েল আহমেদের জবানিতে আমরা জানতে পেরেছি। বাস্তবে ডা. আবু হেনা কী ভূমিকা পালন করেছিলেন সেটা জানতে তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়া হয় ২০১৩ সালের ১ মে তাঁর মিরপুরের (১০ নম্বর এলাকার) বাসায়। সেখানে বর্তমানে ৭১ বয়সী এই প্রবীণ জানান, ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে প্রথমে শেখ ফজলুল হক মণি এবং পরে শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে তিনি 'পাসপোর্ট ছাড়াই' ভারতে যান। সফরটি ছিল ভারতীয়দের অনুরোধে। ভারতীয়রা মুজিবের কাছে অনুরোধ করেছিলেন একজন 'নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি' পাঠাতে– ভবিষ্যৎ সহযোগিতা নিয়ে কথা বলার জন্য। সেই সূত্রেই তাঁকে পছন্দ করে পাঠানো হয়। বিশেষ করে ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি ইত্যাদি ভাষা জানা এবং গোপণীয়তার সংস্কৃতিতে বিশেষ দক্ষতার কারণে তাঁকে এই কাজের জন্য 'নির্বাচিত' করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। ঐ সফরকালে ভারতীয় গোয়েন্দারা রাজনৈতিক প্রয়োজনে সীমান্ত খুলে দেওয়া, আগতদের প্রশিক্ষণ প্রদান, রেডিও স্টেশন তৈরি ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেছিল।

ডা. আবু হেনা আরও জানান, সফরকালে তাঁকে চিত্ত সূতারের ঠিকানাতেই পাঠানো হয়। 'মুজিবুর রহমান সূতারকে আগে থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মুজিব জানতেন, সূতারের সঙ্গে ভারতীয়দের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ভারতীয়রা শুধু সূতারের সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। তারা 'মুজিবের প্রতিনিধি' কারও সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাইছিল। তাই আমাকে পাঠানো হয়। সূতার আমাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দা প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করিয়ে দিয়েছিলেন।...২৫ মার্চের পর আমি মনসুর আলী, কামরুজ্জামান হেনা ও যুবনেতাদের চিত্ত সূতারের ঠিকানাতে নিয়ে যাই। পরে সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকও সেখানে আসেন। সূতার অবশ্য সেখানে ভিন্ন নামে অবস্থান করতেন।' ডা. আবু হেনা সাক্ষাৎকারে আরও জানান, তাঁর মাধ্যমে সৃষ্ট এই যোগাযোগ ছাড়াও 'তাজউদ্দীনের সঙ্গে ভারতীয়দের পৃথক যোগাযোগ ছিল'– সেটা তিনি যুদ্ধ শুরুর পর জানতে পারেন।[৬০]

---

৬০ উল্লেখ্য, ডা. আবু হেনা যুদ্ধের পূর্বে মুজিবের পক্ষ থেকে ভারতীয়দের সঙ্গে উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ভূমিকা পালন করলেও যুদ্ধ শেষে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তিনি

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিবিধ সূত্রে ভারতীয়দের এরূপ 'যোগাযোগ' যে ১৯৭০ সালে এসে হঠাৎ করে গড়ে ওঠেনি সে বিষয়ে পূর্ববর্তী উপ-অধ্যায়ে (২.ক) একদফা বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। প্রচুর ভারতীয় দলিল-দস্তাবেজসহ সম্প্রতি প্রকাশিত 'Contribution of India in the war of liberation of Bangladesh' শীর্ষক গ্রন্থে তৎকালীন ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার এ কে রায়-এর সাক্ষাৎকার থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়[৬১], ঐরূপ যোগাযোগ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে ভারতীয় সহায়তা অন্তত ১৯৬৫ থেকে সক্রিয়। খোদ তখনকার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে যে এইরূপ যোগাযোগ ও সহায়তা চালু হয় সেই বিবরণও বিস্তারিত আকারে পাওয়া যায় এ কে রায়ের আগে উল্লিখিত বিবরণীতে। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের আগরতলা যাত্রা সম্পর্কে তাঁদের পরিবারের কেয়ারটেকার– তাঁর ফুফাত ভাই মমিনুল হক খোকার ইতোমধ্যে উল্লিখিত বিবরণ থেকেও প্রমাণ মেলে ১৯৬২ সালের আগে থেকেই ভারত পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিতে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বলা বাহুল্য, এসব যোগাযোগ পূর্ববাংলার রাজনীতিবিদদের তরফ থেকে 'স্বাধীনতার জন্য সহায়তা'র লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও, ভারতীয়দের কাছে তা হাজির হয়েছিল 'পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ' আকারে।

মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দীন আহমদের অন্যতম সহযোগী মঈদুল হাসান এক্ষেত্রে আরেকটি 'যোগাযোগ' অধ্যায়ের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

মুজিব কর্তৃক গণপরিষদ সদস্যপদ হারান। তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়ের শুরু আসলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই। 'নিউক্লিয়াস'সংশ্লিষ্ট যুবনেতাদের চিত্ত সুতারের ঠিকানায় পৌঁছে দিলেও ডা. হেনা মুজিব বাহিনীতে যোগ দেননি এবং মুজিব বাহিনী গঠনেরও বিরোধিতা করেন। ফলে চার যুবনেতা যে বাড়িতে অবস্থান করতেন সেখান থেকে ২০ দিন পরে চলে আসেন বা চলে আসতে হয় তাঁকে। এ ছাড়া তিনি যুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক ধারায় দেশ পুনর্গঠনেরও বিরোধিতা করেন– তাঁর মতে 'ঐ পরিস্থিতিতে এটা ছিল ভুল পথ'– ফলে মুজিব বাহিনীর দুই গ্রুপের কোনোটিতেই তাঁর ঠাঁই হয়নি। 'এই দুই কারণে আওয়ামী লীগে আমার ভাগ্য বিপর্যয়ের শুরু' বলে ডা. হেনা বর্তমান লেখকের কাছে তাঁর অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন। গণপরিষদ সদস্যপদ থেকে অপসারিত হওয়ার পরও দলে তাজউদ্দীন আহমদ ও খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে ডা. হেনার যোগাযোগ ছিল। বিশেষ করে শেষোক্তজনের সঙ্গে সেই যোগাযোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

৬১ Salam Azad, *Ibid*, p. 283. একই বিষয়ে এ কে রায় ভারতীয় পত্রিকা আউটলুক-এও ২০০৪ সালের ৪ জুন তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায়ও বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তাঁর এই শেষোক্ত বিবরণে এ কে রায় দাবি করেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম'-এ 'সব ধরনের সহায়তা' দানের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর অনুমোদন সম্পর্কে কেবল তাদের পররাষ্ট্র সচিব C.S. Jha অবহিত ছিলেন। কূটনীতিক ভাষায় এই কর্মসূচির নাম ছিল 'politico-geographic orientations'. ১৯৬৫ সালের আগস্টের চতুর্থ সপ্তাহ থেকে এই 'politico-geographic orientations' শুরু হয়। বিস্তারিত দেখুন, http://www.outlookindia.com. (retrived on 25th Feb. 2013).

"১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর শেখ সাহেব জেল থেকে বেরোন। ওই বছর অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ইয়াহিয়ার শাসনামলে তিনি চিকিৎসার জন্য লন্ডন যান। ঠিক একই সময়ে ইন্দিরা গান্ধীও লন্ডনে যান। লন্ডনে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে শেখ সাহেবের দেখা হয় হামস্টেড হিথের একটি বাড়িতে। সেখানে ছিলেন আই সিং নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। আই সিং ছিলেন লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসের কাউন্সিলর। তিনি আসলে ছিলেন লন্ডনে 'র'-এর প্রধান। শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধীর বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন আই সিং নিজের বাড়িতেই। ১৯৭২ সালে আমি যখন লন্ডনে যাই, তখন আই সিং আমার সম্পর্কে জানতেন। হয়তো পিএন হাকসার বা ডি পি ধরের সুবাদে। ডি পি ধর তখন ভারতের পরিকল্পনামন্ত্রী এবং পি এন হাকসার প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপল সেক্রেটারী। আই সিং নিজেই একদিন এসে আমাকে তাঁর পরিচয় দেন। তাঁকে কথা বলতে উৎসুক দেখি। পুরাতন দিনের কথা প্রসঙ্গে আই সিং আমাকে জানান, সেই ১৯৬৯ সালের বৈঠকে তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন। কেননা এটা একটা সৌজন্য সাক্ষাৎ হিসেবেই শুরু হয়। সেই বৈঠকেই শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, আমরা জানি, নির্বাচনে আমরা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জিতবো। কিন্তু ওরা আমাদের ক্ষমতা দেবে না। ঠিক ১৯৫৪ সালের মতো হবে। আবার কেন্দ্রীয় শাসন জারি করবে। ধরপাকড় করবে। শেখ সাহেব আরো বলেন, 'কিন্তু এবার আমি তা হতে দেব না। আমার কিছু ছেলেকে তোমাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর একটা বেতারযন্ত্র দিতে হবে, যেখান থেকে তারা যাতে প্রচার করতে পারে যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।' আই সিংয়ের এই তথ্য আমি বিশ্বাসযোগ্য মনে করি, কেননা হুবহু একই ধরনের গেম-প্ল্যানের কথা আমি শুনেছিলাম ১৯৬২ সালে...।"[৬২]

ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী ও সামরিক কর্মকর্তাদের দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে ওঠা উপরিউক্ত বিবিধ যোগাযোগের পটভূমিতে ১৯৭১ সালের মার্চে এসে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম যে ভারতের নিজস্ব যুদ্ধে পরিণত হবে সেটা প্রায় নিয়তি-নির্দিষ্ট হয়েছিল। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দীর্ঘ বঞ্চনার বোধ থেকে উৎসারিত পূর্ববাংলার নিরস্ত্র মানুষের দুর্বার এক গণআন্দোলনকে তার যৌক্তিক পরিণতি দিতে জাতীয়তাবাদী সংগঠকরা দেশের অভ্যন্তরে কোনো ধরনের টেকসই রণনৈতিক প্রস্তুতিই নেননি– কেবল ধারাবাহিকভাবে ভারতীয়

---

[৬২] এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩২-৩৩।

নেতৃত্ব ও তাদের দূতাবাসে যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়া। ২৬ মার্চ সকাল থেকে সংগ্রামমুখর নিরস্ত্র মানুষ চরম অসহায়ত্বের সঙ্গে দেখতে পায় এশিয়ার দুর্ধর্ষ এক সেনাবাহিনীর মুখোমুখি তারা। ইতোমধ্যে সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় নিজ বাড়িতে গ্রেফতারবরণ করেছেন। আর তাঁর মূলশক্তি 'ছাত্র ও যুবনেতা'রা কয়েকটি কথিত 'ঠিকানা' 'মুখস্থ করে' পাড়ি জমিয়েছেন ভারতে পথে– যদিও মুজিবের নির্দেশ ছিল– 'ঘরে ঘরে দুর্গ' গড়ে তোলার। সমকালীন বিশ্ব ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের এরূপ হতবিহ্বল ভূমিকার[৬৩] দৃষ্টান্ত বিরল। যুদ্ধের সংকল্পে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতি না নিয়ে বরং কামানের গোলার মুখে ঠেলে দেওয়া হলো তাদের। অসহায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রতিরোধ যুদ্ধ দ্রুতই হুমড়ি খেয়ে পড়ল সীমান্তের ওপারে। এরপর সম্ভাব্য স্বল্প সময়ে আওয়ামী লীগকে পূর্ববাংলায় ক্ষমতাসীন করতে পরিস্থিতির ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ নিল ভারত।[৬৪] সবই যেন ছক কাটা ছিল।

তবে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগের ও শুরুর মুহূর্তের অসঙ্গতিপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কাছে মুখ্য নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারবরণ বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্রটির রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য এসময় ভিন্ন এক তাৎপর্য নিয়েও হাজির হয়েছিল– যার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইতিহাসবিদ্ ড. আহমেদ কামাল।[৬৫] তাঁর মতে, একাত্তরের ২৫ মার্চ পূর্ববর্তী দু' সপ্তাহে পাকিস্তান

---

৬৩ এরূপ স্ববিরোধী ভূমিকার বড় এক বিবরণ পাওয়া যায় একাত্তরের যুদ্ধকালীন পাকিস্তানি জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার সাম্প্রতিক গ্রন্থ *'A stranger in my own country: East Pakistan, 1969-1971*, UPL, 2012, p.60. তে। সেখানে জেনারেল রাজা বিবরণ দিচ্ছেন, একাত্তরের সাতই মার্চ ঐতিহাসিক সেই বক্তৃতার আগের দিন শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন ঢাকার জেনারেল অফিসার কমান্ডিংয়ের কাছে দূত পাঠিয়েছেন এই বলে যে, দলের চরমপন্থীদের চাপের মুখে পরের দিনের জনসভায় তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হতে পারে; তাই তাঁকে যেন অনতিবিলম্বে নিবর্তনমূলকভাবে গ্রেফতার করা হয়। জেনারেল রাজা মুজিবের ঐ দূতকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই ভেবে যে, ঘটনাটি একটা রাজনৈতিক চালও হতে পারে। কিন্তু মধ্যরাতে মুজিব আবার একই অনুরোধ করে দ্বিতীয়বারও দূত পাঠান। ঘটনার সাক্ষী হিসেবে জেনারেল রাজা আরও অন্তত তিনজন পাকিস্তানি সামরিক অফিসারের নাম লিখেছেন– যারা তখন তাঁর অধীনস্ত ছিল। একই ধরনের বিবরণের জন্য দেখুন, Hasan Zaheer, *The Separation of East Pakistan : The Rise and Realization of Bangali Muslim Nationalism*, Oxford University Press, Karachi, 1994, p. 488. তবে এরূপ বিবরণ এখনও বাংলাদেশের কোনো সূত্র দ্বারা সমর্থিত হয়নি।

৬৪ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, আহমদ ছফা, *শেখ মুজিবুর রহমান*, যুক্তাক্ষর, মে ১৯৯৬, কলকাতা। মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ছফার এই লেখাটিকে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীতার অন্যতম অগ্রসর প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করা যায়। ঢাকায় *'পাক্ষিক চিন্তা'* পত্রিকায় ১৮.০৮.২০১২ তারিখে লেখাটি পুন:প্রকাশিত হয়।

৬৫ আহমেদ কামাল, *কালের কল্লোল*, সংহতি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৭-৯১।

সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রস্তুতি সম্পর্কে মুজিবুর রহমান নানান সূত্রেই সংবাদ পাচ্ছিলেন। এ রকম পরিস্থিতিতে করণীয় হিসেবে তিনটি বিকল্প ছিল তাঁর জন্য : এক. জনযুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ; যে যুদ্ধের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে স্থানীয় প্রতিরোধ সংগ্রামগুলো ততদিনে শুরু হয়ে গিয়েছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। দুই. ভারতে আশ্রয় নেয়া, এবং তিন. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারবরণ। মুজিবুর রহমান নিজের ও আওয়ামী লীগের শ্রেণি অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন– ফলে ফিদেল কাস্ট্রোর মতো কোনো ভূমিকার প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ এড়িয়ে গেছেন তিনি। আর দ্বিতীয় বিকল্পও বেছে না নেয়ার মধ্য দিয়ে একদিকে পাকিস্তানের শাসক এলিটদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ক্ষীণতম একটি সম্ভাবনা জিইয়ে রেখেছিলেন এবং উপরন্তু, ভারতের শাসক এলিটদের সেই বাসনাকেও অনিশ্চয়তায় ফেলে রেখেছিলেন– যার বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের মর্যাদা হতো অঙ্গরাজ্যতুল্য।

একাত্তরের ২৫ মার্চের আগে বহু বছর ধরে বিভিন্ন পরিসরে ভারতের সঙ্গে মুজিবুর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক সহযোগীদের যে বোঝাপড়া এগিয়েছে– এবং যার কিছু কিছু বিবরণ ইতোমধ্যে এ লেখায় তুলে ধরা হয়েছে সে আলোকে পূর্ব-পাকিস্তানকে ঘিরে ভারত যে রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছিল– ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে মুজিবের ধরা দেওয়া তাকে ভয়ানক অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয়। এ সম্পর্কে ড. আহমেদ কামাল লিখেছেন :

> ...শেখ মুজিবের পাকিস্তান সেনানায়কদের হাতে ধরা পড়ার ঘটনাটি ভারতের রাজনৈতিক পরিকল্পনার বিরাট ব্যর্থতা। শেখ মুজিবের মতো একজন জনপ্রিয় নেতা–যিনি তখন জাতির কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছেন– ভারতের আয়ত্তে না থাকাতে তাদের স্বার্থে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক মীমাংসার পথে একটি অনিশ্চয়তা সার্বক্ষণিকভাবে বিরাজ করতে থাকে। এটা দুই কারণে ঘটে : প্রথমত শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে ভারতে আশ্রিত আওয়ামী লীগ নেতারা দেশটির সঙ্গে এমন কোন সম্পর্কে যেতে পারছিলেন না– যেটা শেষপর্যন্ত মুজিবের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না; দ্বিতীয়ত ভারতীয় শাসকশ্রেণীর তরফ থেকেও মুজিবের কাছে অগ্রহণযোগ্য হবে এমন কোন বাড়তি সুবিধা আদায় করার লোভ সংবরণ করতে হচ্ছিলো। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতি ও পাকিস্তানী শাসকদের হাতে তাঁর অবস্থান ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে নিয়ে...ভারতের স্বপ্নের জন্য ছিল–বিরাট *অনিশ্চয়তা*।...'[৬৬]

---

৬৬ *পূর্বোক্ত*। মুজিব ভারতে গিয়ে 'অবাধ্য' হলে তাঁর কীরূপ পরিণতি হতে পারত তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন ড. আহমেদ কামাল ভারতে মাওলানা ভাসানীর যুদ্ধকালীন গৃহবন্দি দশার উদাহরণ দিয়ে।

বলা বাহুল্য, এরূপ 'অনিশ্চয়তা'রই ফল হলো তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সরকার এবং ওসমানীর অধীনস্ত মুক্তিবাহিনীর বিস্তৃতির পরও মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি। এরূপ 'অনিশ্চয়তা' যে বিপুল 'উৎকণ্ঠা'র জন্ম দিয়েছিল তার সরাসরি ছাপ পড়ে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের প্রথম সাক্ষাৎকারে। তাজউদ্দীন আহমদের সহকারী মঈদুল হাসানের বিবরণ থেকেই দেখা যাক ভারতীয় সেই উৎকণ্ঠার বাস্তব স্বরূপ :

> (একাত্তরের ৩ এপ্রিল রাতে) তাজউদ্দীন আহমদকে ১ সফদার জং রোডের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। তাজউদ্দীন আহমদের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি যখন পৌঁছান, মিসেস গান্ধী তখন দীর্ঘ বারান্দায় হাঁটছিলেন হন হন করে। তাঁকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম প্রশ্ন ছিল–'শেখ মুজিব কোথায়?' এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, 'শেখ মুজিব গ্রেফতার হলেন কেন?' তাজউদ্দীন আহমদ তবু তাঁকে বলেন, 'শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন; সরকার গঠন করেছেন; তারপর একটা বিভ্রাটে পড়ে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন।' কিন্তু তাঁর এই কথায় ইন্দিরা গান্ধীর সংশয় কাটেনি।[৬৭]

উপরিউক্ত 'সংশয়' ও 'অনিশ্চয়তা' মুক্তিযুদ্ধে ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে কীভাবে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছিল তারই বিবরণ পরবর্তী আলোচনায় ধাপে ধাপে।

অন্যদিকে ২৫ মার্চ মুজিবের গ্রেফতারবরণকে মুজিব বাহিনীসংশ্লিষ্ট ছাত্র-যুবনেতারা কীভাবে প্রচার করছিলেন সে বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে। দীর্ঘ হলেও নিম্নোক্ত সেই বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়গুলো অধ্যয়নের একটি পূর্বপাঠ হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

> ...মণি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ছিল। পরস্পরের মতামত সম্পর্কে আমরা অপরিচিত ছিলাম না। (সীমান্ত ফেরনোর কিছু দিন পর) তার সঙ্গে দেখা হতে সে আমাকে সাইকেল-রিকশায় তুলে নিল, তারপর যেতে যেতে অনেকক্ষণ আলাপ। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ গ্রেফতার হয়েছেন, এ কথা নিশ্চিতভাবে মণিই বলে। সে আরো বলে, ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় বোঝা গিয়েছিল, পাকিস্তান আর্মি ক্র্যাকডাউন করতে যাচ্ছে। সন্ধ্যার আগেই ইয়াহিয়া যে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেছেন– সে খবরও বঙ্গবন্ধু পেয়েছিলেন। মণি অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। স্থির হয়েছিল তিনি আত্মগোপন করবেন। প্রস্তুতি হিসেবে একটি গাড়িতে স্যুটকেসও তোলা হয়। তারপর কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে একটা ফোন পেয়ে বঙ্গবন্ধু মত বদলে বাড়িতে থেকে যান এবং সেখানে পাকিস্তানিরা তাকে ধরে নেয়। ফোনটা কে করেছিল, স্বভাবত তা জানতে চাই। মণি কারো নাম বলেনি; তবে আকারে-ইঙ্গিতে যাকে বুঝিয়েছে তিনি তাজউদ্দীন আহমদ। বঙ্গবন্ধু না থাকলে তাজউদ্দীনের নেতৃত্ব নিরঙ্কুশ হয়–এ ধরনের একটি ধারণার ইঙ্গিতও সে দিয়েছিল।...একটা ভয়ংকর অস্বস্তি ও দুর্ভাবনা নিয়ে সেদিন ঘরে ফিরেছিলাম।... দেখুন, আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ৫৮-৫৯।

[৬৭] এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা, *পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪।*

৩

স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স যেভাবে পানছড়ির চাকমা গ্রামে এল : 'বাংলাদেশের যুদ্ধ'-এ সিআইএ, 'র' এবং ইসরায়েল

৩. ক. 'মুজিব বাহিনী' সম্পর্কে ঐতিহাসিক কিছু ভাষ্য

> Once my family decides something, it doesn't go back. Whether it's about India's freedom, *dividing Pakistan* or taking India to the 21st centuary.
>
> - Rahul Gandhi[৬৮]

মুজিবুর রহমান ভারতে না গেলেও ২৫ মার্চের নির্মমতার পর তাঁর সকল অনুসারীদের সেটা ছাড়া বিকল্প ছিল না। স্বাধীনতাসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক তৎপরতার এটা ছিল নতুন পর্যায়। এ পর্যায়ে আমরা কেবল মুজিবের যুব-শক্তিভিতের যুদ্ধকালীন ভূমিকার দিকেই নজর রাখবো– যার আওতায় যুদ্ধকালে বিএলএফ-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে একে একে ভিন্নধর্মী অনেকগুলো ভাষ্য তুলে ধরা হবে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (২.ক) উদ্ধৃত কাজী আরেফ আহমেদ, তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, আ স ম আব্দুর রব প্রমুখের বক্তব্যের সঙ্গে তুলনা

---

৬৮ ২০০৭ সালের ১৫ এপ্রিল উত্তর প্রদেশে নির্বাচনী প্রচারকালে ইন্দিরা গান্ধীর নাতি এবং সেখানকার পার্লামেন্টের সদস্য ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী এই মন্তব্য করেন। তাঁর এই মন্তব্যে ভারত ও পাকিস্তান জুড়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেলেও বাংলাদেশে সরকারের পক্ষ থেকে বা ভারতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের কার্যালয় থেকে কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি। তাঁর এই বক্তব্যের স্পষ্ট দাবি, ১৯৭১-এ পূর্ববাংলার বিচ্ছিন্ন হওয়া ভারতের গান্ধী পরিবারের ইচ্ছার ফল। বাংলাদেশের অনেক নীতিনির্ধারকও যে সেরকমই মনে করেন তার প্রমাণ মেলে খোদ দেশটির মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর নিম্নোক্ত প্রকাশ্য ভাষণে:

> **ইন্দিরা গান্ধী না থাকলে দেশ ৯ বছরেও স্বাধীন হতো না - মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**
>
> মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোজাম্মেল হক ভারতের অবদান স্বীকার করতে গিয়ে বলেছেন, ভারত যদি আমাদের সহযোগিতা না করত আর ইন্দিরা গান্ধী না থাকত তাহলে আমরা ৯ মাস তো দূরের কথা ৯ বছরেও স্বাধীন হতে পারতাম না। আর সেই কৃতজ্ঞতার কারণেই ভারত আমাদের বন্ধু।...আরও দেখুন, http://janatarnews24.com/details.php?sid=9&id=9553 (পর্যবেক্ষণ: ২৯ মার্চ ২০১৪)

করলে নিম্নোক্ত বিবরণগুলো থেকে বহুরূপ সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। মিলবে অনেক অসত্যের সন্ধানও। এক্ষেত্রে সিভিল-মিলিটারি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য তুলে ধরাই যৌক্তিক হবে। প্রথমে আমরা মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনিক সূত্রের অভিমত হিসেবে 'মূলধারা ৭১' গ্রন্থ থেকে পাওয়া মঈদুল হাসান-এর বক্তব্য তুলে ধরবো। আর নেতৃস্থানীয় যোদ্ধাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে একজন সেক্টর কমান্ডার (রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম, ১ নম্বর সেক্টর)-এর বক্তব্য উপস্থাপন করবো।

ইতোমধ্যে বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২.ক) মুজিব বাহিনীর উৎস কাঠামো হিসেবে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ নিউক্লিয়াস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং একাত্তরের মার্চে পাকিস্তানের দু' অংশের মাঝে বিচ্ছিন্নতাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উপরিউক্ত নিউক্লিয়াসের তৎপরতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে ২.খ উপ-অধ্যায়ে। রাজনৈতিক তৎপরতায় গোপনীয়তা ও নাটকীয়তার অনেক উপাদান পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন উভয় আলোচনায়। তবে নিঃসন্দেহে তার আরও বিকশিত রূপ দেখা যাবে পরবর্তী বিবরণগুলোতে। যেমন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার রফিকুল ইসলাম তাঁর বহুল পঠিত গ্রন্থ 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে'তে মুজিব বাহিনী নিয়ে পুরো একটি অধ্যায়ই লিখেছেন– যার শিরোনাম 'বিশেষ গোপন বাহিনী।' সেখানে তিনি বলেন,

> '...জুন মাস থেকে দেখা গেল, বিভিন্ন শিবির থেকে প্রশিক্ষণের জন্য অপেক্ষারত তরুণরা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। এই যুবকদের গোপনে অন্য ধরনের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা এতই সুপরিকল্পিত ও বিস্তৃত ছিল যে, বিশেষ বিমানে কঠোর নিরাপত্তা ও গোপনিয়তার মাধ্যমে সেটা হতো। ফলে ভাবতে বাধ্য হলাম, আমাদের বিশ্বাস করা হচ্ছে না। সেক্টর কমান্ডাররা সবাই এতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। জানিয়ে দেওয়া হলো, *এ ব্যাপারে নাক গলাবেন না।* পরে জানতে পেরেছিলাম 'র'ই ছিল এর মূল উদ্যোক্তা।...রাজনৈতিক দিক থেকে এটা ছিল এক সর্বনাশা সিদ্ধান্ত। এ ধরনের গোপন পরিকল্পনার কারণে যুদ্ধের সময়ই মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। আমরা জানতে পেরেছিলাম, কিছু সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক বিবেচনাতেই এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ সরকারের কোন অনুমতি ছিল না। তাদের যেসব *মিশনে* পাঠানো হতো তার কিছুই আমরা জানতাম না। শুধু শেখ মণি ও ভারত সরকারের অল্প কিছু লোক এসব জানতেন। এই বিশেষ বাহিনী সেসময় মুক্তিযুদ্ধে কোন বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। ওরা ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে প্রথম

থেকে। 'র' এই পরিকল্পনার মাধ্যমে অদৃশ্য ও কাল্পনিক কোন এক শক্তির বিরুদ্ধে নতুন একটা ফ্রন্ট খোলে।...[৬৯]

মাঠ পর্যায়ের এই অভিজ্ঞতা মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনে কীভাবে প্রভাব ফেলে সেটা বোঝার জন্য এবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে বিশেষ আলোচিত মঈদুল হাসান-এর 'মূলধারা ৭১' গ্রন্থের সাহায্য নিতে পারি আমরা। সেখানে যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রীর এই বিশেষ সহকারী লিখেছেন, '(১৯৭১ সালের) ১৮ এপ্রিল নবগঠিত বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা দেশের ভেতর থেকে ছাত্র-যুব কর্মী সংগ্রহের দায়িত্ব দেয় শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদের ওপর। অজ্ঞাত কারণে অল্পদিনের মধ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি (সৈয়দ নজরুল ইসলাম) চার যুবনেতার ক্ষমতা সম্প্রসারিত করে তাদের রিক্রুটিংয়ের দায়িত্ব ছাড়াও সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও পরিচালনার অধিকার প্রদান করেন। এ অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদানের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সম্মতি ছিল না।...ওসমানী নিজেও এ সম্পর্কে সংশয়মুক্ত ছিলেন না।...এদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রথম দল আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়, এ বাহিনী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কর্নেল ওসমানী তথা বাংলাদেশ সরকারের কোনো এখতিয়ার নেই।...কেবল প্রশিক্ষণ নয়, এদের অস্ত্রশস্ত্র ও যাবতীয় রসদের যোগান আসত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর *বিশেষ উপসংস্থা* থেকে এবং ঐ উপসংস্থার প্রধান জেনারেল উবান ছিলেন মুজিব বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্বে।'[৭০]

মঈদুল হাসান 'মুজিব বাহিনী'র বিরুদ্ধে–

ক. স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিভক্ত করা;

খ. বামপন্থীদের বিরুদ্ধাচারণ করা;

গ. সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র কেড়ে নেয়া;

ঘ. মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়া;

ঙ. মুজিবনগর সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করা; এবং

চ. তাজউদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণা ও তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন।

---

৬৯ রফিকুল ইসলাম 'মুজিব বাহিনী' সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়েছেন সেখান থেকে *অতি সংক্ষেপে* এই উদ্ধৃতি দেয়া হলো। এর কিছুটা বাড়তি ভাষ্য রয়েছে 'সংযুক্তি'তে। আলোচ্য গোপন বাহিনী সম্পর্কিত তাঁর পুরো বিবরণের জন্য দেখুন, রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ২৭৬-২৮২।

৭০ মঈদুল হাসান, *'মূলধারা '৭১'*, ইউপিএল, ১৯৮৬, ঢাকা, পৃ. ৭৩, ১৩৯। উল্লেখ্য, মুজিব বাহিনীর উপরোক্ত নেতাদের প্রদত্ত রিক্রুটিংয়ের দায়িত্ব সংক্রান্ত অধিকারপত্র পরে প্রবাসী সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁদের কার্যক্রমের অতি সামান্যই ব্যত্যয় ঘটে। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪।

মঈদুল হাসানের ভাষায়, 'মুজিব বাহিনীকে স্বতন্ত্র কমান্ডে রাখার বিষয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল খুবই জোরালো'...এবং তাজউদ্দীনের তরফ থেকে খোদ ইন্দিরা গান্ধীকে মুজিব বাহিনী সৃষ্ট 'বিড়ম্বনা' বন্ধে ভূমিকা রাখার জন্য অনুরোধ করা হলেও তা কার্যকর করা যায়নি।[৭১]

বিএলএফ সম্পর্কে মঈদুল হাসানের এসব বক্তব্যের আংশিক বা পূর্ণ সমর্থন মেলে রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম, এম আর আখতার মুকুল, মনি সিংহ, এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার, কাজী জাফর আহমেদ, আমীরুল ইসলাম, আবদুল খালেক (প্রবাসী সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব ও আইজিপি) প্রমুখের লেখনিতেও।[৭২] এর মধ্যে সেক্টর কমান্ডার রফিকের বক্তব্য এই গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত রয়েছে।

আবদুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ, মঈদুল হাসান, রফিকুল ইসলাম, এম আর আখতার মুকুল, এ কে খন্দকার, মনি সিংহ, কাজী জাফর আহমেদ, আমীরুল ইসলাম, আবদুল খালেক– এরা সবাই মুক্তযুদ্ধকালীন ঘটনাবলি এবং একাত্তরের আগে-পরে বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও প্রশাসনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁরা অনেকটা আকরগ্রন্থতুল্য উৎস। আবার এও সত্য, কোনো-না কোনোভাবে সরাসরি জড়িত ছিলেন বলে এবং ভিন্ন ভিন্ন আদর্শতাড়িত ছিলেন বিধায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে এদের বর্ণনায় আবেগ ও রাজনীতির মিশেল ঘটাও অস্বাভাবিক নয়।

এরূপ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, বিএলএফ সম্পর্কে পূর্বোক্ত ভাষ্যকাররা প্রদত্ত বিবদমান ও বিরোধপূর্ণ তথ্যের কোনটিকে সঠিক বলে ধরে নেয়া যাবে? এক্ষেত্রে মুজিব বাহিনী সম্পর্কিত তথ্যের একটা নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে জেনারেল এস এস উবানের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে– কারণ তিনি ছিলেন কার্যত এই বাহিনীর প্রশিক্ষক ও সর্বাধিনায়ক। ভারতীয় এই গেরিলাযুদ্ধ বিশেষজ্ঞ তাঁর 'ফ্যানটম অব চিটাগং : ফিফথ আর্মি ইন বাংলাদেশ' গ্রন্থে[৭৩] মুজিব বাহিনী

---

৭১ মঈদুল হাসান, *পূর্বোক্ত*।

৭২ দেখুন, রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৬ এবং এম আর আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৫; মনি সিংহয়ের সাক্ষাৎকার, *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র* (১৫ শ' খণ্ড), তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫, পৃ. ৩১৬; এ কে খন্দকারের সাক্ষাৎকার, স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র (১৫শ' খণ্ড), তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫, পৃ. ৩৩; কাজী জাফর আহমেদের সাক্ষাৎকার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৩; আবদুল খালেকের সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।

৭৩ বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছে 'ঘাস ফুল নদী', আজিজ মার্কেট, ঢাকা, ২০০৫। অনুবাদ করেছেন হোসাইন রিদওয়ান আলী খান। এই লেখার অন্যত্রও মূলত এই অনুবাদ থেকেই উবানের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। উবান কেন তাঁর বইয়ের শিরোনামে মুজিব বাহিনীকে 'ফিফথ আর্মি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা এক গভীর বিস্ময়ের বিষয়। কারণ বর্তমানে রাজনৈতিক সাহিত্যে এবং ব্যাবহারিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই শব্দদ্বয় দ্বারা

এবং এ বাহিনীর সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মূলত ঐ গ্রন্থ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সূত্রের[৭৪] ভিত্তিতে মুজিব বাহিনী সম্পর্কে এরূপ সাধারণ ধারণা প্রকাশ পায় যে, বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর গঠন ছিল পূর্বপরিকল্পিত; ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা *রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস* উইং- 'র' (Research and Analysis Wing- RAW)-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই বাহিনীর গঠন ও বিকাশ এবং যুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের প্রতি মুজিব বাহিনীর ছিল বৈরিতা ও আনুগত্যহীনতা। পরবর্তী উপ-অধ্যায়গুলোতে ধাপে ধাপে বিএলএফ সম্পর্কিত এসব পর্যবেক্ষণের স্বপক্ষে উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্তসমূহ তুলে ধরা হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উপরে উল্লিখিত জেনারেল উবানের সংশ্লিষ্টতার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু কে এই জেনারেল উবান এবং কেনইবা তাঁকে মুজিব বাহিনী গড়ে তোলার জন্য 'র' কর্তৃক বাছাই করা হয়েছিল সেই বিষয়ে কমই অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের বিভিন্ন আলোচনায় সে বিষয়েও কৌতূহলোদ্দীপক অনেক তথ্য পাওয়া যাবে; বিশেষত, 'র'-এর সেই সময়কার প্রধান রাম নাথ কাও সম্পর্কে– বহির্বিশ্ব যাঁকে 'বাংলাদেশের স্রষ্টা' হিসেবে জানে! বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জেনারেল উবানের সংশ্লিষ্টতা রাম নাথ কাও-এর মাধ্যমে। যেহেতু উবান ও তাঁর যুদ্ধকালীন ভূমিকা সম্পর্কে পরবর্তী উপ-অধ্যায়গুলোতে (৩.খ ও ৩.ঘ) বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে সে কারণে ঐ আলোচনার পটভূমি হিসেবে এখানে রাম নাথ কাও সম্পর্কেও সংক্ষেপে পরিচিতিমূলক কিছু তথ্য উপস্থাপন করা প্রাসঙ্গিক।

সাধারণত এমন ধারার বিশ্বাসঘাতকদের বোঝানো হয়– যারা স্বীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রের শত্রুদের স্বার্থে কাজ করে। ফিফথ আর্মি বা পঞ্চম বাহিনী শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি হিসেবে জানা যায় :

> 'স্পেনের গৃহযুদ্ধে (১৯৩৬-৩৯)-এর সময় জেনারেল ফ্রাংকোর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীরা চতুর্দিক থেকে যখন মাদ্রিদ আক্রমণ করে, তখন ফ্রাংকোর বিশ্বস্ত অনুচররা ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে বিদ্রোহ, গুপ্তচরবৃত্তি ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারি শক্তিকে সরকারের অভ্যন্তর থেকে ধ্বংস করে দিতে থাকে। এই গোপন বাহিনী পঞ্চম কোলামিস্ট (Fifth Columnist) বা পঞ্চম বাহিনী নামে পরিচিত হয়।' দেখুন, হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ১৮৬।

৭৪ 'অন্যান্য সূত্র' হিসেবে এখানে ভিত্তি হিসেবে বেছে নেয়া হয় ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম (যুদ্ধকালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের উপদেষ্টা), এ কে খন্দকার (মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি), মঈদুল হাসান (যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী), মনি সিংহ (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা)-এর সাক্ষাৎকার ও লিখিত বক্তব্য। এসব সাক্ষাৎকার ও বক্তব্যের সূত্র গ্রন্থের অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে দুটি গোয়েন্দা সংস্থা (আইবি ও সামরিক গোয়েন্দা) দিয়ে যাত্রা হলেও উইকিপিডিয়ায় 'List of Indian Intelligence Agencies'-এ বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী[৭৫] ভারতে এখন চিরায়ত অর্থে গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে অন্তত ১১টি। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সর্বাধিক আলোচিত রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং বা RAW ('র')। ১৯৬৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর আইবি (IB) বা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ভেঙে এই সংস্থাটি গড়ে তোলা হয়– যার কর্ম এলাকা 'বহির্বিশ্ব'। শেষোক্ত গোয়েন্দা সংস্থার প্রথম চিফ ছিলেন রামেশ্বর নাথ কাও বা রাম নাথ কাও। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে তিনি 'রামজি' নামেও পরিচিত। ১৯৪০ সালে ভারতীয় পুলিশে যোগদানের মাধ্যমে তিনি গোয়েন্দা জীবন শুরু করেন। নেহেরু পরিবারের অতি নির্ভরযোগ্য এই ব্যক্তিকে দিয়েই রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং-এর গোড়াপত্তন করেন মিসেস ইন্দিরা গান্ধী। জন্ম পরবর্তী নয় বছর সংস্থাটির প্রধান ছিলেন কাও।

১৯৭১ সালে কাও-এর আনুষ্ঠানিক পদ ছিল ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটে 'সেক্রেটারি (গবেষণা)'। সাধারণত রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং-এর চিফদের আনুষ্ঠানিক বা প্রকাশ্য পদ ওটিই হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দিল্লির প্রশাসন মহলে এই সত্য সবাই মেনে নিতেন, ইন্দিরা গান্ধী যে চার ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ শেষে তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন তাঁদের একজন হলেন কাও (অন্য তিনজন ছিলেন ডি পি ধর, পি এন হাকসার এবং টি এন কাউল)। গান্ধীর শাসনামলে তাঁর ঘনিষ্ঠজনরা এও জানতেন, প্রতিদিন অফিস ছাড়ার আগে তিনি শেষ সাক্ষাৎকারটি দিতেন কাওকে। মুজিব বাহিনী ও উবানকে কাও'ই সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং তা ইন্দিরার সম্মতিতেই। ইন্দিরা ও 'র'-এর মাঝে মুজিব বাহিনী বিষয়ে কাও ব্যতীত কারো প্রশাসনিক ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল না।

উল্লেখ্য, কাও, ৫৭ বছর বয়সে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সফর করার কিছুদিন পর শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। ভারতীয় তরফ থেকে তখন বলা হয়েছিল, কাও এসেছিলেন রাষ্ট্রপতিকে সম্ভাব্য অভ্যুত্থান সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। কাও কীভাবে জানতে পারলেন বাংলাদেশে অভ্যুত্থান হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে এক কৌতূহল উদ্দীপক ভাষ্য রয়েছে 'ইনসাইড র' গ্রন্থের লেখক অশোকা রায়নার বিবরণীতে। তিনি লিখেন, পঁচাত্তরের *আগস্টের তিন মাস আগে 'র' এজেন্টরা জিয়াউর রহমানের বাসায় মেজর ফারুক, মেজর রশীদ ও ওসমানীর একটি সভার*

---

৭৫ *List of Indian Intelligence Agencies* : National Technical Research Organisation, Research and Analysis Wing, Intelligence Bureau. Directorate of Revenue Intelligence, Defence Intelligence Agency, Joint Cipher Bureau, All India Radio Monitoring Service, Signals Intelligence Directorate, Aviation Research Centre, Directorate of Air Intelligence, Directorate of Navy Intelligence. (retrived on 16th Jan. 2014.)

তথ্য লাভে সমর্থ হয়। তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় একজন অংশগ্রহণকারী উদ্দেশ্যহীনভাবে কাগজে কিছু লিখে ফেলেন ও পরে তা অমনযোগিতাবশত বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেন। সেই দোমড়ানো কাগজটি আবর্জনার স্তুপ থেকে একজন কেরানি ('র' এজেন্ট) সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় এবং পরে তা দিল্লিতে সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। (ঢাকায়) অভ্যুত্থান আসন্ন বুঝতে পেরে কাও একজন রপ্তানিকারকের ছদ্মবেশে ঢাকায় পৌঁছেন।...পূর্ব নির্ধারিত স্থানে মুজিবের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। এক ঘণ্টা স্থায়ী হয় আলোচনা। অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় জড়িত সন্দেহভাজনদের নাম উল্লেখ করার পরও মুজিব গুরুত্ব দিয়ে আমলে নেননি।[৭৬]

চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণের ২৫ বছর পর ২০০২ সালের ২০ জানুয়ারি ৮৪ বছর বয়সে দিল্লিতে মারা যান আর এন কাও। ভারতের এলিটরা দক্ষিণ এশিয়ার জনসমাজে তাদের প্রভাববলয় নির্মাণে অসামান্য অবদান রাখার জন্য প্রতিবছর আনুষ্ঠানিক এক মেমোরিয়াল লেকচারের মাধ্যমে কাওকে স্মরণ করে থাকে। মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কাওকে 'র' থেকে সরিয়ে দেওয়া হলে সংস্থাটির প্রধান হন দ্বিতীয় ব্যক্তি শংকরণ নায়ার। তাঁর জীবন-বৃত্তান্তেরও সবচেয়ে শক্তিশালী দিক ছিল একাত্তরে পূর্ব-পাকিস্তানে *দক্ষতা* প্রদর্শন। ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতাসীন হলে কাও আবার তাঁর উপদেষ্টা হন। তাঁকে ক্যাবিনেট বিভাগের সিনিয়র উপদেষ্টা করা হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্ব গোয়েন্দা জগতে কাওকে 'বাংলাদেশের স্রষ্টা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এইরূপ বিবেচনা বাংলাদেশিদের জন্য সুখকর নয়। আবার এই বিবেচনার সময় অনেকেই বিস্মৃত হন, একাত্তরে পূর্ব-পাকিস্তানের কাও-এর সফলতার প্রধান স্থপতি ছিলেন আসলে শংকরণ নায়ার (K. Sankaran Nair)– যিনি কাও থাকাবস্থায় ছিলেন 'র'-এর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি; আর 'র' সৃষ্টির আগে আইবি-এর পক্ষে আগরতলাকে কেন্দ্র করে পূর্ব-পাকিস্তান ডেস্কের 'দায়িত্ব' তিনিই পালন করতেন। ১৯৭৭ সালে কাও-এর পর 'র'-এর প্রধান হন তিনি। মাত্র কয়েক মাস তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। কাও ও নায়ার 'র' থেকে বিদায় নেয়ার পর মোরারজি দেশাইর শাসনামলে বাংলাদেশের শাসকদের সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর তা আবার ব্যাহত হয়। এই অভিজ্ঞতার কারণে বাংলাদেশ-ভারত স্বাভাবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'র'-কে প্রধান দেয়াল মনে করেন প্রথমোক্ত দেশের কূটনীতিবিদরা এবং আওয়ামী লীগ বহির্ভূত রাজনীতিকরা।

---

৭৬ দেখুন, অশোকা রায়না, *ইনসাইড র*, অনুবাদ: লে. (অব.) আবু রুশদ, মিলারস্ প্রকাশনী, ১৯৯৪, ঢাকা, পৃ. ৭৩।

৩. খ. মুজিব বাহিনী ও স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স বহুমুখী আন্তর্জাতিক স্বার্থের সম্মিলন

> ১৯৭১ সালে ভারতের পেশাদার গোয়েন্দাদের জন্য এক ধরনের স্বপ্নময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গোয়েন্দা তথ্যের জন্য তাদের হন্যে হয়ে ঘুরতে হতো না বরং এসব তথ্য তাদের দোরগোড়ায় এসে হাজির হতো। পূর্ব-পাকিস্তানের পুরো জনগোষ্ঠীর মধ্যে তখন এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয় যাতে তারা স্বেচ্ছায় গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য তাদের নেতৃবৃন্দ ও ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে সরবরাহ করতো। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ গোপন তথ্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে সরবরাহ করা এবং তাদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা দানকে দেশপ্রেম ও দায়িত্বের অংশ মনে করতো। ...ফিল্ড মার্শাল (তখন জেনারেল) মানেক শ'র নেতৃত্বে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এবং পরলোকগত কে এম রুস্তমজির নেতৃত্বে বিএসএফ-এর প্রকাশ্য এবং 'র' ও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)-এর গোপন কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। ১৯৬৮ সালের আগে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং পরে 'র' পূর্ব পাকিস্তানের বহু রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করে।
>
> –বি. রমন, *র-এর কাওবয়েরা*;[৭৭] 'বি. রমন' নামে পরিচিত Bahukutumbi Raman 'র'তে কাজ করেছেন শুরু থেকে। এক পর্যায়ে সংস্থার কাউন্টার টেরোরিজম শাখার প্রধান হন। অবসর নেন ১৯৯৪ সালে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (২.ক) এ ভাষ্য আমরা দেখেছি যে, শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগেই সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে ছাত্র-যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য পিরোজপুরের আওয়ামী লীগ নেতা চিত্তরঞ্জন সূতা[৭৮]রের

---

৭৭ *র-এর কাওবয়েরা* গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাসুমুর রহমান খলিলী ও মো. একরামুল্লাহিল কাফি, প্রতীতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৫, ১৪। উদ্ধৃতিটি গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ থেকে নেয়া।

৭৮ চিত্তরঞ্জন সূতার ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বরিশাল থেকে এমপি হয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ করতেন তিনি। তারও আগে ছিলেন শিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের সঙ্গে। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর তিনি 'ন্যাপ'-এ যোগ দেন। আবার ১৯৬৪ সালে তিনি এবং বৃহত্তর ফরিদপুরের বাসিন্দা ডা. কালীদাস বৈদ্য মিলে গঠন করেন 'গণমুক্তি দল'– যে দলের প্রতীক ছিল মোমবাতি। ১৯৬৮ সালে সূতার আগরতলা হয়ে কলকাতা চলে যান। পরের বছর ঢাকায় এক জনসভায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিশে যায় তাঁর গণমুক্তি দল।

মাধ্যমে ভারতকে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলেন। এ কাজে ডা. আবু হেনার সংশ্লিষ্টতাও ইতোমধ্যে বিস্তারিত আকারে তুলে ধরা হয়েছে ২.খ উপ-অধ্যায়ে।

পূর্ব-পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে সূতারের জনভিত্তি হিন্দু সম্প্রদায় হলেও এই জনগোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অংশের সঙ্গে মূলত তাঁর সখ্যতা ছিল। তাঁর বিশেষ একটি সাংগঠনিক দক্ষতার দিক ছিল, দুই বাংলাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের অগ্রসর চিন্তার মানুষদের ভৌগোলিক নানান নস্টালজিয়া এবং অধরা স্বপ্নের মাঝে একটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতেন তিনি। মুজিব বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা যুবনেতাদের সঙ্গে আর এন কাও এবং জেনারেল উবানের যোগসূত্র স্থাপন করেন এই সূতার। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পার্লামেন্ট সদস্য হন। তবে পার্লামেন্টের অধিবেশনগুলোতে প্রথম দুই-একদিন ব্যতীত কমই দেখা যেত তাঁকে। মূলত কলকাতাতে থাকতেন তিনি। তবে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সূতারের এতই গুরুত্ব ছিল যে, 'বাকশাল' প্রতিষ্ঠার পর এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঠাঁই হয়েছিল তাঁর। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশের নতুন সরকার তাৎক্ষণিকভাবে সূতারের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে। ভুজঙ্গ ভূষণ রায় নামে তাঁর একটি ভারতীয় পাসপোর্ট ছিল বলে কথিত রয়েছে। সূতার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য দেখুন, মঈদুল হাসান ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২।

পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে ভারতে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে একটি 'হিন্দু রাষ্ট্র' ('অখণ্ড বাংলা' হিসেবেও উল্লিখিত) প্রতিষ্ঠার যে অনিয়মিত প্রচারণা দেখা যায় তাতে সূতারের প্রভাব ছিল বলে বাংলাদেশে ধারণা করা হয়। তাঁর উদ্যোগেই কলকাতা থেকে 'মায়ের ডাক', 'অধিকার' ইত্যাদি পত্রিকা বের হতো হিন্দু জাতীয়তাবাদী উপাদান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত নানান অন্যায়কে উপজীব্য করে। কিন্তু সরকারের কঠোর মনোভাবের কারণে তাঁর চিন্তার অনুসারীরা বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন গড়তে সফল হননি কখনো। এমনকি দীর্ঘ অনেক বছর আগে দিল্লিতে তাঁর মৃত্যুর পর আজও বাংলাদেশের কোথাও প্রকাশ্যে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হতে দেখা যায় না। শেষ জীবনে আওয়ামী লীগের (সম্প্রতি প্রয়াত) নেতা আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে সূতারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পাবনার একজন আওয়ামী লীগ নেতা এই ঘনিষ্ঠতার অংশীদার ছিলেন। আবদুর রহমান (ছদ্মনাম) নামে জাসদের একজন সংগঠক (যিনি একই সঙ্গে এখনও সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠ) বর্তমান লেখকের কাছে দাবি করেছেন, জাসদ গঠনের সময় সূতার সিরাজুল আলম খানকেও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিশেষত ভারতীয় রাজনৈতিক দল এসইউসি-আই'র সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে সূতারের ভূমিকা ছিল। কিন্তু এই দাবি কোনো তৃতীয় সূত্র দ্বারা সমর্থিত হয়নি। তবে পিরোজপুরসহ দক্ষিণাঞ্চলে জাসদ সমর্থিত ছাত্রসংগঠনই সর্বপ্রথম এরূপ শ্লোগান দিত : *চিত্ত সূতার কলকাতা–সাবধান বঙ্গমাতা।*

তাজউদ্দীন আহমদের প্রবাসী সরকার মুক্তিযুদ্ধের শেষলগ্নে ভারতের সঙ্গে যে ৭ দফা 'চুক্তি' করে তার পেছনে সূতারের সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। অতীতের মতো এখনো সূতারের ভাবাদর্শের অনুসারীরা ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীতে স্বরূপকাঠির একটি মঠে মিলিত হন আর্থসামাজিক বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় করতে। উল্লেখ্য, সূতার মারা যান ২০০৮ সালের আগস্টে। সূতারের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ বিষয়ে সবচেয়ে মনোযোগী রাজনীতিবিদ ছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী।

দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ৬৭-৬৮ সালে সশস্ত্র বাহিনী ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বাঙালি অফিসারদের 'পরিকল্পনা' (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য' মামলায় উল্লিখিত) ব্যর্থ হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই ভারতীয়দের সঙ্গে আরেকটি ফ্রন্ট খোলা রেখেছিলেন।[৭৯] ১৯৭১-এর মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের পূর্ব থেকে চিত্তরঞ্জন সূতার অবস্থান নিয়েছিলেন কলকাতার ভবানীপুরস্থ ২১ নম্বর

---

৭৯ ১৯৬৭-৬৮ সালে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি অফিসারদের 'স্বাধীনতা-পরিকল্পনা'য় ভারতীয় সংশ্লিষ্টতার জন্য দেখুন, কর্নেল (অব.) শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা, ২০১১, ঢাকা। গ্রন্থে এই মামলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগনামার যে বিবরণ রয়েছে তার ৬১, ৬২, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৯সহ আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদে ঐ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অভিযোগনামায় কথিত ঘটনাবলির সত্যতা সম্পর্কে কর্নেল শওকত আলী লিখেছেন, 'অভিযোগনামা শুনতে শুনতে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু আমাদের সার্বিক পরিকল্পনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।...ট্রাইব্যুনাল কক্ষে একদিন একান্তে তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ (বিভিন্ন গোপন বৈঠকসহ অন্যান্য) সত্য কি না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ।' পৃ. ১৩৬-৩৭।

'আগরতলা ষড়যন্ত্র' হিসেবে কথিত ঘটনাবলিতে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের তৎকালীন প্রথম সেক্রেটারি মি. ওঝা (R. N. Ojha)-এর সংশ্লিষ্টতার কারণে ১৯৬৮ সালের ৭ জানুয়ারি তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। অন্যদিকে শেখ মুজিব রাজনৈতিক সাহায্যের জন্য ১৯৬৩ সালে যে গোপনে ত্রিপুরা গিয়েছিলেন সে বিষয়ে ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের স্বীকারোক্তিমূলক বিবরণ রয়েছে। তিনি এও জানান, 'শেখ মুজিবকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।' শচীন্দ্রলালের পুরো বিবৃতির জন্য দেখুন, সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৬। একই বিষয়ে আ স ম আব্দুর রবেরও সমর্থনসূচক বক্তব্য রয়েছে। দেখুন, *কোথায় যাবে বাংলাদেশ*, সাপ্তাহিক ঠিকানা, ১৯ আগস্ট ২০১২, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

উপরোক্ত সূত্রসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে পাকিস্তানের দুই অংশের বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে ভারত একাত্তরের বহু পূর্ব থেকে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক গ্রন্থে যেমনটি বলা হয়েছে (দেখুন, ১৫ নং তথ্যসূত্র)– 'আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাদৃশ্য' ভারতকে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের প্রশ্নে দোদুল্যমানতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে, তা স্রেফ বাস্তবতা বর্জিত। কারণ বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতার যুদ্ধে ভারত একাত্তরের পূর্বেই শামিল ছিল।

একাত্তর-পূর্ব পূর্ববাংলার রাজনীতিতে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতার আরেকটি বিবেচনাযোগ্য বিশ্লেষণ হাজির করেছেন আহমদ ছফা। ছফার মতে, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে প্রথমোক্তরা তাদের আক্রমণ মূলত পশ্চিম রণাঙ্গণেই সীমিত রাখে। অথচ পূর্ববাংলাতে তারা অধিক অনায়াসে পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে পারত; পাকিস্তানের এই অংশ ছিল অধিক অরক্ষিত। কিন্তু ভারত সচেতনভাবে এদিকে মনোযোগ দেয়নি। তা করা হয়নি এ কারণে, আক্রমণকারী হিসেবে পূর্ববাংলার মানুষকে বিগড়ে দিতে চায়নি তারা। ছফার ভাষায়, 'কোন রকম সামরিক হামলা না করে পূর্ব-পাকিস্তানের জনমতকে জয় করবার ইচ্ছাই ছিল তার মনে।' দেখুন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা, *বেহাত বিপ্লব ১৯৭১*, সম্পাদনা: সলিমুল্লাহ খান, অন্বেষা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১০৩।

রাজেন্দ্র রোড-এ (কলকাতা ৭০০০০২১) 'সানী ভিলা' নামক বাড়িতে। এ বাড়ি সম্পর্কে তাজউদ্দীন আহমদের বিশেষ সহকারী মঈদুল হাসান বলেছেন, 'এই বড় বাড়িটা ছিল ভারতের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর একটা অফিস ও অতিথি ভবন। সেখানে মুজিব বাহিনীর যুবনেতারা ও 'র'-এর প্রতিনিধি চিত্তরঞ্জন সূতার থাকতেন।[৮০] যুবনেতারা এখানে থাকাবস্থায় ছদ্মনামও নিয়েছিলেন। শেখ ফজলুল হক মণি'র ছদ্মনাম ছিল মণি বাবু, সিরাজুল আলম খানের ছদ্মনাম ছিল সরোজ বাবু, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ নাম নেন রাজু বাবু ও তপন বাবু।[৮১] যুবনেতাদের এরূপ ছদ্মনাম ধারণ ছিল কৌতূহলোদ্দীপক। যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তারা পরিবার-পরিজনকে ঝুঁকিপূর্ণ জীবনে ফেলে এসে বিদ্রোহ করে স্বনামে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ে নেমে পড়েছেন এবং যখন আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদদের অধিকাংশ স্বনামে প্রবাসী সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়; তখন যুবনেতাদের কলকাতার নিরাপদ পরিবেশে পরিচয় গোপন করার এরূপ প্রচেষ্টা বিস্ময় উদ্রেকের কারণ হয় এবং 'সানী ভিলা' সম্পর্কে বাড়তি কৌতূহল তৈরি করে।

একাত্তরের মার্চের পর এ বাড়িতেই সূতারের মাধ্যমে প্রথমে ভারতীয় শীর্ষ গোয়েন্দা ব্যক্তিদের সঙ্গে এবং পরে জেনারেল উবানের সঙ্গে উল্লিখিত চার যুবনেতার বৈঠক হয়। চিত্ত সূতারই এসব বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিলেন, আর জেনারেল উবানকে এ প্রক্রিয়ায় শামিল করে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'। সে সময় এই সংস্থার প্রধান ছিলেন জনাব রাম নাথ কাও বা আর এন কাও– যাঁর সম্পর্কে ইতোমধ্যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষে পরিচিতিমূলক তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে।

উপরিউক্ত যুবনেতাদের সঙ্গে বৈঠকের স্মৃতিচারণ করে নিজ গ্রন্থে উবান দাবি করেছেন,[৮২] ভারতে কেউ এই যুবনেতাদের চিনত না। উবানরাই এদের 'খুঁজে বের করেছেন।' মাঠ পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরুর পরও কেন

---

৮০ এ কে খন্দকার ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩। যুব নেতৃবৃন্দ এবং সূতারের মাঝে যোগাযোগের আরেকটি সূত্র ছিলেন ডা. আবু হেনা। এ বিষয়ে তোফায়েল আহমেদ ও আবদুর রাজ্জাকও বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন। মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫১। তবে ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম এক্ষেত্রে আরো কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর পূর্বে উল্লিখিত সাক্ষাৎকারে (*মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র*, ১৫ শ' খণ্ড)। সেখানে তিনি, একাত্তরে কলকাতায় 'র'-এর পক্ষে মি. নাথ নামে আরেকজন ব্যক্তির সক্রিয়তার উল্লেখ করেছেন। পৃ. ১৬০।

৮১ আমির হোসেন, *বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন*, ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ৩১। সাংবাদিক আমির হোসেন উপরোক্ত 'বাবু'দের সঙ্গে সানী ভিলাতেই নিচতলায় থাকতেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল শেখ মণির নির্দেশনা মতো 'বাংলার বাণী' প্রকাশ করা।

৮২ উবান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫।

এই 'খোঁজপর্ব' শুরু হলো উবান তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তবে ইঙ্গিত দিয়েছেন[৮৩], মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠার পরও 'আসল কাজ'টি সারার জন্য ভারতীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ মুজিব বাহিনীর মতো একটি বাহিনী গড়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল। যদিও চূড়ান্ত অপারেশনের সময় কেবল মুজিব বাহিনী নয়– 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স' নামের পুরোপুরি আনকনভেনশনাল আরেকটি ফোর্সকেও ভারতীয়রা পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করায়। এই ফোর্সের দায়িত্ব ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারত নিয়ন্ত্রিত মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের খুঁজে বের করা এবং নিশ্চিহ্ন করা।

এসময় শেখ মণি প্রায় সার্বক্ষণিক জেনারেল উবানের সঙ্গী ছিলেন। 'মুজিব বাহিনী'র যোদ্ধারা থাকার পরও কেন উবান 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স'কে বাংলাদেশে ঢোকাচ্ছিলেন– যে গোপন বাহিনীটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনস্ত নয় এবং যার সৃষ্টিই হয়েছিল গণচীনকে মোকাবেলার আন্তর্জাতিক গোপন প্রকল্পরূপে– সে বিষয়ে শেখ ফজলুল হক মণি বা মুজিব বাহিনীর তরফ থেকে উবানের কাছে কোনো প্রশ্ন বা বিরোধিতা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না কোথাও। এই ঘটনাবলির সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক হলো রাঙামাটি ও সংলগ্ন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়া এই স্পেশাল ফোর্স গড়ে ওঠার সময় (১৯৬২ সালের নভেম্বরে) সমস্ত আর্থিক, অস্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা দিয়েছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা সিআইএ। মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত দেরা দুনের অবকাঠামোর প্রায় সবই সিআইএ'র সহায়তায় তৈরি হয় মূলত ঐ স্পেশাল ফোর্সকে প্রশিক্ষণের জন্যই।[৮৪]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কার্যক্রম নিয়ে এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ-সাহিত্যে কোনো আলোচনা দেখা যায় না। কিন্তু ভারতীয় দিক থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সংশ্লিষ্টতার একটি বড় উপাদান ছিল এই 'ফোর্স' এবং তার 'টার্গেট' ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম। জেনারেল উবান ছিলেন এই ফোর্সের প্রথম ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং 'র' সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আইবি' ঐ ফোর্সকে নিয়ন্ত্রণ করত। এই জেনারেল উবানকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সকে একটি 'বাহিনী' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। উবান পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন শুরু করলেও যুদ্ধের চূড়ান্তপর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে মূলত এগিয়ে দেন তাঁর স্পেশাল ফ্রন্টিয়ারদের। কেন এটা ঘটেছিল– এ পর্যায়ে তার কিছু পটভূমি ব্যাখ্যা করা প্রাসঙ্গিক হবে।

---

৮৩ উবান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১।

৮৪ দেখুন, মঈদুল হাসান ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬।

একাত্তর-পূর্ব সময়ে ভারতীয় শাসক এলিটরা মনে করত ফিজোর নেতৃত্বে নাগাল্যান্ডের এবং লালডেঙ্গার নেতৃত্বে মিজোরামের স্বাধীনতা সংগ্রাম পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা (Inter-Services Intelligence বা আইএসআই)-এর তৎপরতার ফল। বাস্তবে Angami Zapu Phizo-এর নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল ১৯৪৭'ই নাগাল্যান্ডকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং Pu Laldenga-এর নেতৃত্বে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টও পঞ্চাশের দশক থেকেই মিজোরামের স্বাধীনতার লক্ষ্যে ভারতের অভ্যন্তরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাচ্ছিল। পরে এক পর্যায়ে তীব্র দমনাভিযানের মুখে তাঁদের অনেক যোদ্ধা পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে লুকায়।

ভারত বরাবর মনে করত, পার্বত্য চট্টগ্রামে নাগা ও মিজো সংগঠকরা যে লুকিয়ে আছে সেটা পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর সহায়তার কারণে সম্ভব হচ্ছে। এর পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানকে দেশটির মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কর্মসূচির নিয়ে এগিয়ে যেতে নিজস্ব গোয়েন্দাদের সবুজ সংকেত দেয় ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা। 'র'-এর কর্মকর্তা বি. রমন এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করেছেন : 'পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আইএসআই'র চালানো কার্যক্রমের অবসান ঘটাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তার সিদ্ধান্ত নেন।'[৮৫]

ভারতীয় এই উদ্যোগে ইসরায়েলেরও সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়। পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলার বিচ্ছিন্নতাকে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' দেখেছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করার সুযোগ হিসেবে।[৮৬] বর্তমান

---

৮৫ দেখুন, বি. রমন, *র-এর কাওবয়েরা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩। উল্লেখ্য, আমরা ইতঃপূর্বে (৬১ নং তথ্যসূত্রে) দেখেছি যে, এইরূপ উদ্যোগ আসলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকে নয়– তারও আগে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সময় থেকে শুরু হয়েছে।

৮৬ ইসরায়েলী এই চেতনার প্রকাশ যে ভারতীয় মনস্তত্ত্বেও প্রবলভাবে শেকড় গেড়ে ছিল তার এক চমৎকার নজির দিয়েছেন খ্যাতনামা ভারতীয় সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ 'Beyond the Lines'-এ। সেখানে (Daily Star book, Dhaka, 2012, p. 218) কুলদীপ নায়ার দেখিয়েছেন, একাত্তরের ১৫ ডিসেম্বরই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর কাছে অস্ত্রসমর্পণের জন্য প্রস্তুত থাকার পরও এবং সেভাবে প্রক্রিয়া শুরুর পরও বিষয়টি ঘটে ২৪ ঘণ্টা পরে এবং নজিরবিহীনভাবে খোলা মাঠে। কেন এটা ঘটেছিল। এ সম্পর্কে তখনকার ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জে এফ আর জেকব সাংবাদিক নায়ারকে জানাচ্ছেন, 'New Delhi wanted to humiliate Islamabad by showing that Muslim country had laid down arms before a Jew.' উল্লেখ্য, জেনারেল জেকব ছিলেন একজন ইহুদি। আরও উল্লেখ্য, পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করতে বিশেষ

অধ্যায়ের কাঠামোতে এ বিষয়ে ব্যাপকভিত্তিক তথ্য উপস্থাপনের সুযোগ কম। এখানে শুধু এটুকু উল্লেখ করা হচ্ছে যে, গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে 'র' গঠিত হওয়ার পরপরই ভারত সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে তার একটি আউটপোস্ট প্রতিষ্ঠা করে। এই অফিসটি ব্যবহৃত হতো মূলত বিদেশে পাকিস্তানের বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিবিদদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। এই লিয়াঁজোতে 'র'কে সহায়তা করে 'মোসাদ'। এ বিষয়ে 'র'-এর কর্মকর্তা বি. রমন লিখেছেন,

> '১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে 'র' গঠিত হওয়ার পরপরই আর এন কাও-এর সৃষ্ট প্রথম পোস্টগুলোর একটি হয় জেনেভায়। তিনি এই পোস্টটিকে ইসরাইলের বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সঙ্গে গোপন লিয়াজোঁ স্থাপন এবং ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনীতিক সোর্সগুলোর সাথে স্পর্শকাতর বৈঠক অনুষ্ঠানের পয়েন্ট হিসেবে কাজে লাগাতো। ...এই পোস্টটি গঠনের পর প্রায় ১০ বছর মোসাদ এটাকে তার যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে। ...জেনেভায় বহু গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১৯৭১ সালের আগে বাংলা ভাষাভাষী কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠকগুলো। এসব বৈঠকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগপর্যন্ত বাংলাভাষী কূটনীতিকদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হতো।...[৮৭]

সফলতার প্রতীক হিসেবে ইসরায়েল তার সামরিক জাদুঘর 'Latrum'-এ জেকবের সামরিক পোশাকটি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে সংরক্ষণ করছে। ভারত-ইসরায়েল সম্পর্ক নির্মাণে ১৯২৩ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণকারী এবং ১৯৭৮ সালে সামরিক বাহিনী থেকে অবসরে যাওয়া Jack Farj Rafael Jacob-এর ভূমিকা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন, http://www.jewishjournal.com/world/article/jack_jacob_the_general_who_saved_india_from_more_war_20120806 (retrieved on 30th June 2013). উল্লেখ্য, জেকবকেই ভারত-ইসরায়েল সম্পর্কের প্রধান স্থপতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং প্রধানত তাঁর ভূমিকার মধ্য দিয়েই ১৯৯২ সালে ইসরায়েল-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়।

৮৭ বিস্তারিত দেখুন, বি. রমন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭। একাত্তরে ভারত-ইসরায়েল সম্পর্কের আরও চমকপ্রদ তথ্য-প্রমাণের জন্য দেখা যেতে পারে Srinath Raghavan-এর *1971: A Global History of the Creation of Bangladesh*, Harvad University Press, 2013, p. 181-83. রাঘবন হলেন দিল্লির সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ-এর একজন ফেলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর এই গবেষণায় তিনি বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছেন কীভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকার পরও ইসরায়েল একাত্তরে ভারতকে অস্ত্র ও 'বিশ্বজুড়ে প্রপাগান্ডা সহায়তা' দিয়েছিল। ভারতের পক্ষে ফ্রান্সে নিযুক্ত তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ডি এন চ্যাটার্জি এবং ইসরায়েলের পক্ষে Liechtenstein-এ অবস্থিত অস্ত্র নির্মাণ স্থাপনা Salgad-এর

মুক্তিযুদ্ধকালে ইসরায়েল কেবল জেনেভা থেকেই বাংলাদেশের ঘটনাবলিতে যুক্ত ছিল না, বরং সরাসরি যুদ্ধ ময়দানেও তাদের সক্রিয়তার পরোক্ষ ইঙ্গিত মেলে। যেমন মুজিব বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী এ বিষয়ক তাঁর গ্রন্থে অন্তত দুটি স্থানে ইসরায়েলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'এক পর্যায়ে মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং ও অস্ত্রসম্ভার কমিয়ে দেওয়ায় আমরা তাদের (ভারতের) মতিগতি সম্পর্কে আরও সন্দিহান হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় আমরা বিকল্প উৎস হিসেবে ইসরায়েলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করি।'[৮৮] এত দেশ থাকতে মুজিব বাহিনী কেন ইসরায়েল থেকে অস্ত্র সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল– বিশেষত যেখানে দেশটির সঙ্গে খোদ ভারতেরই কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিল না তখন, সে বিষয়ে অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে আর কিছু বর্ণনা করেননি। তবে নেতৃস্থানীয় একজন মুজিব বাহিনী সংগঠক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, ইসরায়েল তাদের দুই শত যোদ্ধাকে সেদেশে নিয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে চেয়েছিল– কিন্তু ভারতীয়রা তাতে রাজি হয়নি। অন্যদিকে লে. জেনারেল নিয়াজি তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, '(মুক্তিযুদ্ধকালে) বাংলাদেশি নেতৃবৃন্দ ২৫ লাখ ডলার মূল্যের অস্ত্র ক্রয়ের জন্য জাপানে ইসরায়েলী কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেছিলেন'– এমন গোয়েন্দা তথ্য তাঁদের কাছে ছিল।[৮৯]

নির্বাহী পরিচালক পারস্পরিক 'অমূল্য সহায়তা'র এই পুরো প্রক্রিয়াটি তদারক করতেন। আলোচ্য সূত্র এও জানাচ্ছে, যুদ্ধকালে তেলআবিব কেবল অস্ত্র নয়– সামরিক বিশেষজ্ঞ দিয়েও সহায়তা দিয়ে গেছে ভারতকে। এসব অস্ত্র ও ইন্সট্রাক্টরদের এয়ার লিফটিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলা হয়। একই বিষয়ে হিন্দুস্থান টাইমসের প্রতিবেদন দেখুন : http://www.hindustantimes.com/india-news/israel-helped-india-in-1971-war-reveals-book/article1-1146011.aspx#disqus_Comments (retrieved on 29th December 2013). অন্যদিকে খ্যাতনামা সাংবাদিক Gary J. Bass নয়াদিল্লিতে নেহেরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'হাকসার পেপার' থেকে উদ্ধৃত করে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, উক্ত অস্ত্রের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক ছিলেন Shlomo Zabludowicz. প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ারের নির্দেশে অস্ত্র সরবরাহের এই নির্দেশটির তারিখ রয়েছে ২৩ আগস্ট ১৯৭১। সরকার-সরকার এই সম্পর্কের বাইরেও ইসরায়েল তাদের একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে সরাসরি বাংলাদেশি মুক্তিসেনাদের সাথেও যে যোগাযোগ রাখত–সে বিষয়েও তথ্যসূত্রের উল্লেখ করেছেন Gary J. Bass তাঁর গবেষণায়। দেখুন : *The Blood Telegram*, Random House, India, 2013, p. 403.

৮৮ আবদুল মান্নান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিব বাহিনী*, বৈশাখী প্রকাশনী, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ৪৭।

৮৯ এ এ কে নিয়াজি, *দ্য বিট্রেয়অল অব ইস্ট পাকিস্তান*, অনুবাদঃ ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৮৮।

উল্লেখ্য, ইসরায়েল যুদ্ধকালেই স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল– যদিও প্রবাসী সরকার আরব দেশগুলোর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে সেই স্বীকৃতি গ্রহণ করেনি। ইসরায়েল এসময় বাংলাদেশের জন্য বিমানে করে ওষুধ সামগ্রীও পাঠায় ভারতে– কিন্তু 'বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের তরফ থেকে সেই ওষুধ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়'– বলে জানিয়েছেন ডেভিড যোহর– যিনি সেসময় বোম্বেতে ইসরায়েলের একজন ভাইস-কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। ডেভিড এও জানাচ্ছেন, উল্লিখিত ওষুধ সামগ্রী পরে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্সফাম-এর কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং তারা সেটা 'ব্রিটেনের অনুদান' হিসেবে ঢাকায় নিয়ে গিয়েছিল।[৯০] যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল আবারও আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে ইসরায়েল-ভারত সখ্যতার বিষয়ে সম্প্রতি গবেষক Srinath Raghavan ও Gary J. Bass–এর পক্ষ থেকে আরও যেসব সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গিয়েছে সে বিষয়ে ৮৭ নম্বর তথ্যসূত্রে ইতোমধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে। এসব তথ্য এবং বি. রমন ও আবদুল মান্নান চৌধুরীর উপরে উল্লিখিত লেখা– বিশেষ করে শেষোক্ত জনের বক্তব্য নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রহস্যময় এক অধ্যায়ের আভাস দিচ্ছে– যার ভরকেন্দ্রে পাওয়া যাচ্ছে জেনারেল উবানের মুজিব বাহিনীকেও। আন্তঃরাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্রে ইসরায়েল ও মুজিব বাহিনীর কাছাকাছি আসতে পারা শেষোক্ত সংগঠনের অতি স্বাধীন সত্তার ইঙ্গিত দেয়। জেনারেল উবান এও জানিয়েছেন, তাঁর কার্যক্রমের জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক জেনারেল অরোরার কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন না। সরাসরি ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল মানেক শ এবং 'র'-এর প্রধান আর এন কাও-এর কাছে জবাবদিহি করতেন তিনি। এ নিয়ে জেনারেল অরোরা ছিলেন বিক্ষুব্ধ।[৯১] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হস্তক্ষেপের ধরন সম্পর্কে ভারতীয় সামরিক প্রশাসনে যে মতদ্বৈততা ও একাধিক প্রকল্প ছিল মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি তার মোটাদাগের এক প্রমাণ।[৯২] বলাবাহুল্য, ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশ ছাড়া ভারতীয় গোয়েন্দারা 'মুজিব বাহিনী' নামক প্রকল্প নিয়ে এগোতে পারতেন না।

---

৯০ https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.bangladesh/S6FEpbPjdo0 (reterived on 19th April 2014)

৯১ বিস্তারিত দেখুন, মেজর জেনারেল এস এস উবান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮ ও ৪১।

৯২ মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক নানান সাহিত্যে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কেবল একটি বিষয় এখানে নতুন করে যুক্ত করা যায়, তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর সহযোগীরা ভারতে প্রবেশ এবং ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিশেষ সহায়তা পেয়েছিলেন। বিএসএফ-এর এই 'সাফল্য' গোয়েন্দা সংস্থা 'র'কে কিছুটা ম্লান করে দেয়।

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষক হিসেবে জেনারেল উবান ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স' সরাসরি ভারতীয় সেনাবাহিনী নয়, বরং 'র' গঠিত হওয়ার পর এই সংস্থার মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। পূর্ববাংলা থেকে যাওয়া ছাত্র ও যুবনেতাদের আলাদা বাহিনী গড়ে তোলার প্রকল্পে 'ইন্দিরা গান্ধীকে সম্মতিসূচক জায়গায় আনতে মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাহিনীর মূল নেতৃত্ব দীর্ঘ আলাপচারিতায় ইন্দিরা গান্ধীকে এটা বোঝাতে সক্ষম হন যে, তাঁদের অধীনে দেশজুড়ে বিপুল তারুণ্য রয়েছে এবং এদের যদি 'মুক্তিবাহিনী'র সেক্টর কমান্ডারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে ধীরে ধীরে এরা মস্কো কিংবা পিকিং যে কোনো এক ঘরানার কমিউনিস্ট হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করবে; এ পরিস্থিতি এড়াতে প্রয়োজন স্বতন্ত্র একটি কাঠামো। ইন্দিরা এক পর্যায়ে ছাত্রনেতাদের বক্তব্যে নিজস্ব স্বার্থের যৌক্তিকতাও খুঁজে পেয়ে থাকবেন', বললেন সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠ এক জাসদ সংগঠক।[৯৩] ইন্দিরার ঐ 'নিজস্ব স্বার্থ' সম্পর্কে এ পর্যায়ে সামান্য আলোকপাত করা জরুরি। তবে তার আগে ছাত্র-যুবনেতাদের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর উপরে উল্লিখিত যোগসূত্র ও তার ফলাফল সম্পর্কে দিল্লির সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ-এর ফেলো গবেষক Srinath Raghavan–এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটুকু উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে :

> ...a small group of influential young leaders refused to work with the Bangladesh government. Led by Mujib's

---

যুবনেতা মণি-সিরাজ-রাজ্জাক-তোফায়েলদের ভিন্ন কাঠামোতে বাহিনীবদ্ধ করে তারা সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে। এ বিষয়ে আরও বিবরণের জন্য দেখা যেতে পারে, কামাল হোসেন, *তাজউদ্দীন আহমদ: বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর*, অংকুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৮১। লক্ষ্যণীয়, একাত্তরে 'যুদ্ধ'টি বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের জন্য হলেও তাতে দক্ষতা প্রদর্শন এবং কর্তৃত্ব ও খবরদারিত্ব করা নিয়ে ভারতীয় সামরিক আমলাতন্ত্রে রীতিমতো মনস্তাত্ত্বিক প্রতিযোগিতা চলছিল তখন। নিশ্চিতভাবেই এখন বলা যায়, ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিএসএফ ও 'র'-এর পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের ঐ প্রতিযোগিতার বলি হয়েছে হবু বাংলাদেশের 'জাতীয় ঐক্য'– কারণ রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গত চার দশকে অনেক রক্তাক্ত বৈরিতার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় ভারতীয় সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রতিযোগিতামূলক ঐসব 'সাফল্য'-এর মাঝে। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় যা স্পষ্ট হবে।

৯৩ ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, সিরাজুল আলম খান সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রম নিয়ে কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ করেন না। বর্তমান লেখক এক্ষেত্রে ভিন্ন একটি পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে কিছু কিছু প্রশ্নের পরোক্ষ উত্তর ও মতামত নেয়া হয় এ প্রক্রিয়ায়। শর্ত হিসেবে এই মধ্যস্থতাকারীরা অবশ্য পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক থেকেছেন। দীর্ঘদিন এই পদ্ধতিতে নানা বিষয়ে আহরিত প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত এই লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

> nephew, Fazlul Haq Moni, this group, we may recall, had opposed the establishment of the government in exil. Moni claimed that before being arrested Mujibhad entrusted him and four of his associates in the student movement with carrying on the struggle for the liberation of Bangladesh. His report was apparently corroborated by intelligence gathered by the RAW. Moni quickly established a good relationship with the intelligence chief, R. N. Kao.
>
> Owing to the lack of clarity about Mujib's intentions, Mrs. Gandhi allowed Kao to organize a separate militia under Moni's leadership_ known as the Mujib Bahini_that would function independent of the Bangladesh government and the Mukti Fauj. The Mujib Bahini was also regarded as insurance against the possibility of the liberation movement being captured by the ultra-left Maoists...[৯৪]

তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুক্তিবাহিনীর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের পরও ভারতকর্তৃক মুজিব বাহিনী সৃষ্টির কৌশলগত তাৎপর্যের কিছু স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যায় উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে। মুজিব বাহিনী সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বাড়তি আর কী কী বিবেচনা কাজ করেছে এ পর্যায়ে সে বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধের ঐ সময়টিতে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের একটা অংশ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করা এবং একটি সমঝোতায় পৌঁছানোরও চেষ্টা শুরু করেছিল।[৯৫] উক্ত উদ্যোগে ভারতের একেবারেই সায় ছিল না। এইরূপ উদ্যোগ

---

৯৪ Srinath Raghavan, *Ibid*, p. 216.

৯৫ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক সাহিত্যে বরাবর আপসরফার এই উদ্যোগকে খন্দকার মোশতাকের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হলেও B. Z. Khasru (*Maths and Facts: Bangladesh Liberation War*, Rupa and co., 2010, p. 158-194) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্প্রতি উন্মুক্ত দলিলপত্র– যার অধিকাংশ মূলত দেশটির সেই সময়কার 'ডিপলোম্যাটিক ক্যাবল'– উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন, এই প্রচেষ্টায় শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠের সায় ছিল। 'মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে তা বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে'– এরূপ বক্তব্যের প্রতি লাগাতার যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন তারা এপ্রিল থেকে। আলাপ-আলোচনার প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেন কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সাংসদ কাজী জহিরুল কাইউম (কলকাতায়) এবং পররাষ্ট্রসচিব মাহবুবুল আলম চাষী (দিল্লিতে)। তবে ভারত প্রথম থেকে এরূপ যোগাযোগ

সফল হলে তাকে মোকাবেলা করেও যুদ্ধ জারি রাখার একটি বিকল্প হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল তখন চার ছাত্র-যুবনেতার সহযোগীদের।[৯৬]

পূর্বোক্ত তিনটি প্রধান বিবেচনা– তথা মুজিব বাহিনীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নাগা ও মিজোদের খোঁজে এসএফএফ-কে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকিয়ে দেওয়া, মাওবাদী যোদ্ধাদের হাত থেকে পূর্ববাংলার 'মুক্তিযুদ্ধকে রক্ষা' এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ও তার মূল বাহিনীর কোনো ধরনের সমঝোতার উদ্যোগের বিকল্প হিসেবে রাজনৈতিকভাবে অধিক নির্ভরযোগ্য আরেকটি বাহিনীকে প্রস্তুত রাখার বিবেচনা থেকেই শেষপর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি ভিন্ন আরেকটি বাহিনী গঠনে হাত দিয়েছিল ভারত। এমনকি উবানের দাবি থেকে প্রতীয়মান হয়, এটা তাঁর কাছে 'পবিত্র যুদ্ধ' (holy war)-এর মতোই ব্যাপার ছিল– বিশেষত মুজিব বাহিনী ও এসএসএফ-এর প্রধান প্রশিক্ষক যখন বলেন, গুরু সন্ন্যাসী শ্রী শ্রী ঠাকুর সিতারাম ওঙ্কার অন্তত এক বছর আগেই এরূপ যুদ্ধ ও 'দায়িত্ব' সম্পর্কে আধ্যাত্মিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তাঁকে।[৯৭]

'পবিত্র যুদ্ধ' কিংবা কৌশলগত বিবেচনা– যে কারণেই হোক না কেন, সামরিকভাবে ভারত যে অস্থায়ী সরকারের মূল বাহিনীর চেয়ে মুজিব বাহিনীকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছে তার অন্তত একটি প্রমাণ হিসেবে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করা যায়। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের সময় এক ব্যক্তিগত বিদায়ী সাক্ষাৎকারে জেনারেল উবানকে মিসেস গান্ধী বলেছিলেন : 'বাংলাদেশ বিষয়ে ভারতের *সকল সাফল্যের* মেরুদণ্ড ছিলেন আপনি।'[৯৮] ইন্দিরা গান্ধীর এই মন্তব্য যে কেবল কথার কথা থাকেনি তার প্রমাণ হিসেবে দেখা যায়, উবানই একমাত্র অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় জেনারেল যিনি দেশটির সর্বোচ্চ সামরিক পদকের একটি 'অতি বিশ্বস্ত সেবা পদক' পান। উবানের উপরোক্ত 'সফলতা'র অন্তর্নিহিত আরও কিছু বিবরণ আমরা ৩.ঘ উপ-অধ্যায়ে তুলে ধরবো।

কঠোর নজরে রেখেছিল এবং ডি পি ধরের জোরালো কূটনীতি তাজউদ্দীনকে আপসরফার উদ্যোগ থেকে সরিয়ে আনে এবং মোশতাককে কোণঠাসা করে ফেলা হয়। ২১ সেপ্টেম্বর এক বৈঠকে সৈয়দ নজরুল ইসলামকেও নিরস্ত্র করার জোরালো প্রয়াস নেন ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অশোক রায়। লক্ষ্যণীয়, বামপন্থা উত্থানের ভয় দেখিয়ে সৈয়দ নজরুল ও মোশতাক আহমদরা যখন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আপসরফায় সহায়তা চাচ্ছেন– একই সময়ে একই ভীতির বয়ান চলছিল বিএলএফ গঠনের লক্ষ্যে 'চার যুবনেতা' কর্তৃক ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি।

৯৬ মুজিব বাহিনী গঠনের এই প্রেক্ষিতটির আলোচনার জন্য দেখুন, Salam Azad, *ibid*, p. 284.

৯৭ দেখুন, Praveen Swami, India's secret war in Bangladesh, *The Hindu*, Feb. 11, 2012, India. http://www.thehindu.com/opinion/lead/indias-secret-war-in-bangladesh/article2747538.ece (retrieved on 27th July 2014)

৯৮ মেজর জেনারেল এস এস উবান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৮।

যতদূর জানা যায়, একাত্তরের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মুক্তিবাহিনীর অজান্তে বা মুক্তিবাহিনীর উষ্মাকে অবজ্ঞা করেই মণি-সিরাজ-রাজ্জাক-তোফায়েলদের মনোনীত তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা জেনারেল উবানের মাধ্যমে এবং নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে। 'ভারতের সামনে তখন শতাব্দীর সেরা সুযোগ'– বাংলাদেশের গবেষক আফসান চৌধুরীর কাছে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার সম্ভাবনাকে এই ভাষাতেই ব্যাখ্যা করেন ১৯৭১ সালে ভারতের ইনস্টিটিউট অব ডিফেন্স স্টাডিজের পরিচালক ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ কে. সুব্রানিয়াম।[৯৯]

সুব্রানিয়ামের এরূপ মনে করার অনেকগুলো কারণ ছিল। যদিও প্রধানত মনে করা হয়, ভারত তখন এটাই ভেবেছিল–পাকিস্তানকে বিভক্ত করা গেলে সীমান্তের একটি দিকে বাড়তি সৈন্য মোতায়েনের ব্যয়ভার থেকে রেহাই পাওয়া যাবে; কারণ ভারতকে তখন চীন সীমান্ত, পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান– এই তিন দিকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে সৈন্য সমাবেশ করে রাখতে হতো। বাংলাদেশের অভ্যুদয় তাকে ঐ অবস্থা থেকে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণে রেহাই দিয়েছে।

উপরোক্ত বিবেচনা ছাড়াও ভারতের নিকট আরেকটি জরুরি (অজ্ঞাত কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসবিদ্ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যে প্রসঙ্গটি বরাবর কম গুরুত্ব দিয়েছেন) বিবেচনা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্তির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে উদীয়মান মাওবাদী বিপ্লবকে পর্যুদস্ত করা। ১৯৭০-এর দশকে দরিদ্রক্লিষ্ট ভারত– আসাম, মনিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি তরুণদের নকশালবাড়ি আন্দোলন[১০০] নিয়ে প্রকৃতই উদ্বিগ্ন ছিল– গণচীন যাকে তাৎক্ষণিকভাবে অভিহিত করেছিল, 'A peal of spring thunder over India.'[১০১]

---

৯৯ আফসান চৌধুরী, *চতুর্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬৩। সুব্রানিয়াম তখন এও বলেন, '*বাংলাদেশে* পশ্চিম-পাকিস্তানিদের গণহত্যাকে ভারতের উচিত দ্রুত 'যুদ্ধ'-এর নৈতিক উপলক্ষ বানানো এবং বিশ্বজুড়ে বিষয়টি সেভাবে তুলে ধরা গেলে এ যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন দেয়া তার বন্ধুদের জন্যও দুরূহ হয়ে যাবে।' দেখুন, Subrahnanyam, `Bangla Desh and our policy options,' 4 April 1971. See Inder Malhotra, *Indra Ghandhi: A Personal and Political Biography*, Hodder and Stoughton, London, 1989, p. 133.

১০০ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন তরাই অঞ্চলের নকশালবাড়ি এলাকায় ১৯৬৭ সালের মে থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত। এলাকাটি তখন রাজনৈতিকভাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সংগঠকরাও প্রাথমিকভাবে ঐ পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে তাঁরা সিপিআই-এমএল গঠন করেন। কৃষক আন্দোলন ও সশস্ত্র জনযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা গ্রামীণ বিপ্লবী কেন্দ্রগুলো ক্রমে শহর ঘেরাও করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেবে এটাই ছিল এই দলের রাজনৈতিক নীতি-কৌশলের মৌল দিক।

১০১ Spring Thunder over India, *People 's Daily*, Central Committee of the Communist Party of China, 5 July 1967.

তরুণদের মাঝে নকশালবাড়ি মডেলের তীব্র আবেদন এবং চীনের উপরোক্ত প্রতিক্রিয়ার পর যে কোনোভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কমিউনিস্টদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা এবং এই যুদ্ধের ঢামাডোলে সম্ভাব্য নির্মম পন্থায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়াকেও ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা একটি রণকৌশলগত কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন সঠিকভাবেই। এ বিষয়ে উপরে Srinath Raghavan-এর উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছিল। মুজিব বাহিনী গঠনের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে একই প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ৭ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার কাজী নূরুজ্জামান লিখেছেন,

> The Indian authorities took sole responsibility to train the cream of the crop. They (Mujib Bahini) were trained as political comandos, in some forest area near Dehra Dun...While the liberation war was going on, in India the leftist Naxalite movement was making its influence felt under the leadership of Charu Mojumder. This influence reached and strengthened a faction of the left movement in what was then East Pakistan. College students were attracted of this fraction. The Indian authorities realized that many college students with lefties ideas would join the liberation forces and possibly help to build a leftist ideology in Bangladesh. The political comandoes (Mujib Bahini) were established to neutralized such a possibility.[১০২]

উল্লেখ্য, 'নকশালবাড়ি আন্দোলনের সংগঠকরা এসময় (১৯৭১ সালে) বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে ভারতের সক্রিয়তা এবং সিকিমের ভারতভুক্তিরও বিরোধিতা করছিলেন।'[১০৩] ফলে একদিকে দেশের ভেতরে এরূপ আদর্শের সংগঠনকে দমন না করে এবং হবু বাংলাদেশে এদের বিকাশের সম্ভাবনা নসাৎ না করে স্বস্তি পাচ্ছিল না দিল্লি।

উপরের উদ্ধৃতিতে কর্নেল নূরুজ্জামান যাদের বলছেন 'পলিটিক্যাল কমান্ডো'– সেই মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি ও বিকাশের উপরোক্ত আঞ্চলিক 'Politico-military' পটভূমিটিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে কখনো গুরুত্বের সঙ্গে নজর দেয়া হয়নি। এই লেখার পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখবো চারু মজুমদার ও কানু সান্যাল-এর নেতৃত্বে শুরু হওয়া নকশালবাড়ি বিদ্রোহ– যা এক পর্যায়ে

---

১০২ Quazi Nooruzzanan, *A Sector Commander Remembers Bangladesh Liberation War 1971*, writers.ink, Dhaka, 2011, p. 2.

১০৩ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *রাজনীতির অভিধান*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৭।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত ছেড়ে সর্বভারতীয় আবেদন সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল, তার দমনে ভারত যে বাহিনীটিকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছিল সেই সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর অভিজ্ঞতার আলোকেই স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশে গড়ে তোলা হয় রক্ষীবাহিনী এবং তা ভারতের প্রশিক্ষকদের মাধ্যমেই এবং মুজিব বাহিনীর একাংশকে দিয়েই। এই রক্ষীবাহিনীর হাতেই বিচারবহির্ভূত পন্থায় খুন হন সিরাজ সিকদারসহ স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম প্রজন্মের বিপুল বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী। যেভাবে ভারতেও সিআরপিএফ-এর হাতে খুন হয় চারু মজুমদারসহ অসংখ্য মানুষ– কেউ সমাজ বিপ্লবের সশস্ত্র চেষ্টার কারণে, কেউবা তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের দায়ে, এমনকি কেউ কোনো কারণ ছাড়াই। স্মরণযোগ্য, পাকিস্তানের শাসকরাও একই মডেলে গড়ে তুলেছিল স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ বা এসএসজি। সিআরপিএফ-এর মতোই ১৯৫৬ সালে গঠিত[১০৪] এসএসজি'র দায়িত্ব ছিল 'কাউন্টার টেরোরিজম'। ভারত ও পাকিস্তানে এইরূপ সংস্থাগুলোর পত্তন হচ্ছিল ঔপনিবেশিক ধাঁচে জনগণকে 'দমন'-এর মনস্তত্ত্ব থেকে। সিআরপিএফ গড়ে তোলা হয়েছিল সরাসরি ঔপনিবেশিক 'ক্রাউন রিপ্রেজেনটিটিভ পুলিশ' (যার সৃষ্টি ১৯৩৯ সালে)-এর অবশেষ থেকে। এভাবে দেখা যাচ্ছে, দফায় দফায় 'স্বাধীন' হলেও এ অঞ্চলের জনগণ– ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যে শাসক শ্রেণিকে পায় তারা আসলে ঔপনিবেশিক 'রাষ্ট্র'-এর শাসকদের মতোই 'শক্তি'কেই শাসনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে।

ক্রাউন রিপ্রেজেনটিটিভ পুলিশ-এর কাঠামোটিকেই ১৯৪৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর স্বাধীন ভারত সিআরপিএফ নাম দেয় 'সিআরপিএফ এক্ট' নামে একটি আইনের মাধ্যমে। এরও প্রধান কর্মক্ষেত্রের রাশভারী নাম হলো 'কাউন্টার ইনসারজেন্সি'। আর এই কর্মপ্রয়াসে তার প্রধান পদ্ধতি 'এনকাউন্টার'-এ টার্গেটকে খুন করা। এই সংস্থার সবচেয়ে আদুরে শাখাটির নাম Commando Battalion for Resolute Action (CoBRA)– শুধু মাওবাদী নকশালদের মোকাবেলা করা যার কাজ। তবে নকশালদের হত্যার পাশাপাশি সিআরপিএফ-এর প্রধান কুখ্যাতির আরেক ক্ষেত্র ছিল নির্মম নির্যাতনের পদ্ধতিগত ব্যবহার। এটা 'তথ্য' বের করার নামে হলেও কার্যত তার মূল সামাজিক লক্ষ্য ছিল সমাজ পরিবর্তনকামী তরুণদের ভয় দেখানো এবং তাদের ইচ্ছাশক্তিকে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া। বাংলাদেশে সৃষ্ট বাহিনীও তার পুরো কর্মকালে একইরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। ভারতে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, সিআরপিএফ-এর তৎপরতার সঙ্গে বাংলাদেশে রক্ষীবাহিনীর কর্মকাণ্ডের আরও

---

[১০৪] ১৯৫৬ সালে গঠিত হলেও সংস্থাটির নাম 'স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ' রাখা হয় ১৯৬৫ সালের আগস্টে। এই সংগঠনটির কাঠামোগত উৎস ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৯ বালুচ রেজিমেন্ট।

কয়েকটি মিলের দিক হলো সেখানেও সিদ্ধার্থ শংকর রায়, প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সি প্রমুখের মাধ্যমে কংগ্রেস সরকার মূল দমনাভিযান শুরু করলেও সিপিএম-এর মতো বামপন্থী দাবিদার দলগুলো দ্বিধাহীনভাবে সিআরপিএফ-এর কাউন্টার ইন্সারজেন্সিকে সমর্থন যুগিয়ে গেছে– যেমনটি ঘটেছে বাংলাদেশেও, মুজিবের রক্ষীবাহিনীর তৎপরতায় বামপন্থী সিপিবি ও ন্যাপের সমর্থনমূলক ভূমিকার মাধ্যমে। আবার সিআরপিএফ-এর উলঙ্গ ব্যবহার সত্ত্বেও 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ' করতে না পেরে সেখানে যেমন পঁচাত্তরের জুনে ইন্দিরা গান্ধী 'জরুরি অবস্থা' জারি করেছিলেন; এখানেও তেমনি চুয়াত্তরের ডিসেম্বরে একই ধরনের 'জরুরি অবস্থা' জারি করে শেষরক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

সিআরপিএফ-এর আদলে রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি এবং তাতে নানারূপে ভারতের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে যখন তা ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির আলোকে বিবেচনা করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ স্বাক্ষরিত ২৫ বছর মেয়াদি ঐ চুক্তিতে 'যে কোনো পক্ষ আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে উভয়পক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে *ভীতি দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত কার্যকর ব্যবস্থা* গ্রহণ করবে' বলে ঐকমত্য হয়েছিল (১০ নম্বর অনুচ্ছেদে)। আরও উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশের 'ভেঙে পড়া প্রশাসন পুনর্গঠনে সহযোগিতার জন্য' আইএএস অফিসার এ আর গুপ্তের নেতৃত্বে আমলাদের যে দলটি ভারত থেকে এ দেশে এসেছিলেন[১০৫] তারাই 'শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত' করা ও 'ভীতি দূর করা'র নানান প্রশাসনিক উপায় সম্পর্কে সেই সময়কার সরকারকে অভিজ্ঞ করে তুলেছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

ঠান্ডাযুদ্ধ বা স্নায়ুযুদ্ধকালীন পারস্পরিক বৈরিতা সত্ত্বেও নকশাল ধারার আমূল পরিবর্তনবাদী রাজনীতি ঠেকাতে ঐ সময়কার বাংলাদেশ ও ভারতের শাসক শ্রেণির মিলিত স্বার্থের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থও যে এক হয়ে গিয়েছিল তার কিছু কৌতূহল উদ্দীপক নজির পাওয়া যায় ১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ প্রকাশিত বাংলাদেশকে নিয়ে লেখা Newsweek-এর প্রচ্ছদ রচনাটিতে। বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযুক্ত উক্ত প্রতিবেদনে পাঠকের নজরে পড়বে, যুক্তরাষ্ট্র যেমন বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতার মাঝে 'বিপ্লব' ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনায় তখন উদ্বিগ্ন ছিল তেমনি– সোভিয়েত ইউনিয়নও এই মর্মে উদ্বিগ্ন ছিল যে, এখানকার বিপ্লবটি যেন 'রাশিয়ার মতো' হয়– 'চীনের মতো নয়' এবং পরাশক্তিদের পারস্পরিক এরূপ উদ্বেগ ও প্রত্যাশা আবার জানাজানি হচ্ছে পারস্পরিক গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে!

---

[১০৫] নির্মল সেন, *আমার জবাববন্দি*, তরফদার প্রকাশনী, ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ৩৩৪। নির্মল সেন এরূপ কর্মকর্তার সংখ্যা ১৩ বলে উল্লেখ করলেও এ সংখ্যা ছিল বস্তুত ২৮। দেখুন Salam Azad, *ibid.* একই বিষয়ে তথ্যসূত্র ১৯৪-ও বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

৩. গ. যুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের প্রতি মুজিব বাহিনীর আনুগত্যহীনতা ও বৈরিতা

> যুদ্ধ বাঁধে রাজনৈতিক পথের বাধাকে দূর করার জন্য। যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ। রাজনীতি হলো রক্তপাতহীন যুদ্ধ, আর যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি। যদিও যুদ্ধ সরাসরি রাজনীতির মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু সব সময় তা রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।
>
> – মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত), সমর দর্শন[১০৬]

এই লেখার পূর্ববর্তী অন্তত তিনটি উপ-অধ্যায়ে (২.ক, ৩.ক এবং ৩.খ) মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি ও বিকাশ সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে এও দেখা গেছে, কীভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় কমিউনিজম বিরোধী এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী নির্যাতিত জাতিগুলোর মুক্তিসংগ্রাম বিরোধী বিভিন্ন আন্তঃদেশীয় প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল এই বাহিনীর উত্থানপর্ব। বর্তমান উপ-অধ্যায়ে (৩.গ) মূলত একাত্তর সালে কলকাতায় এই বাহিনীর ভূমিকা এবং তাকে ঘিরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারে সৃষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। এই বিবরণ থেকে দেখা যাবে, মুজিব বাহিনী সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের ভেতরেই যুদ্ধকালে কীরূপ উপদলীয় কোন্দলের সৃষ্টি হয় এবং তা প্রতিনিয়ত কীভাবে রাজনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টির ঝুঁকির মধ্যে রেখেছিল সরকারকে। গুরুত্বপূর্ণ অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তির জীবননাশের আশঙ্কাও তৈরি করে তা।

সাধারণভাবে যে কোনো যুদ্ধেই 'চেইন অব কমান্ড' বা স্বপক্ষীয় ঊর্ধ্বতনের প্রতি স্তরে স্তরে নিম্ন পদস্থদের আনুগত্যের বিষয়টি সর্বাগ্রে জরুরি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী সরকারই ছিল বৈধ ক্ষমতার একমাত্র কেন্দ্র। কিন্তু এই কেন্দ্রের প্রতি মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বের আনুগত্যহীনতা ছিল প্রকাশ্য। খোদ মেজর জেনারেল এস এস উবান বলেছেন : '(মুজিব বাহিনীর) চার যুবনেতার তাজউদ্দীনের প্রতি কোন আনুগত্য ছিল না' এবং যুদ্ধের পরও এই আনুগত্যহীনতা বহাল ছিল।[১০৭] সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যের

---

১০৬ বাংলা একাডেমি, ২০০০, ঢাকা, পৃ. ১১-১২।

১০৭ উবান, *পূর্বোক্ত*। পৃ. ৩২ এবং ১৩৪। যুদ্ধের পরপর স্বাধীন দেশেও মুজিব বাহিনীর প্রধান চার নেতার প্রভাব রাজনীতির পাশাপাশি কীভাবে প্রশাসনকে তটস্থ করে তুলেছিল তার একটি মনোযোগ আকর্ষণী উদাহরণ দিয়েছেন কূটনীতিবিদ ফারুক চৌধুরী। ১৯৭২ সালে

কারণেই সাংবাদিক এনায়েতুল্লা খান মুজিব বাহিনীকে অভিহিত করেছিলেন Super-autonomous এক বাহিনী হিসেবে।[১০৮] তিনি মুজিব বাহিনী সৃষ্টির কয়েকটি কারণও ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

> 'স্বাধীনতা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধে রূপ নেয়ার সম্ভাবনা ছিল; সেক্ষেত্রে 'লিবারেশন আর্মি' ধাঁচের কিছু গড়ে ওঠলে তাকে মোকাবেলার জন্য, বিশেষত ঐরকম যুদ্ধে র‍্যাডিক্যাল সামাজিক শক্তিসমূহের বিপরীতে শক্তির ভারসাম্য রাখার জন্য মুজিব বাহিনীকে সৃষ্টি করা হয়। এর অন্য আরেকটি লক্ষ্য ছিল, পাকিস্তানের আটকাবস্থা থেকে মুজিব ফিরে না এলে এমন একটি শক্তিকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত রাখা– যারা নিজেদের মুজিবের সরাসরি উত্তরাধিকার হিসেবে দাবি করতে পারে। শেষোক্ত লক্ষ্যের কারণেই প্রবাসী সরকারের আরেক অংশের সঙ্গে এর বিরোধ বাঁধে।'[১০৯]

সরকার প্রধান ও সামরিক বাহিনী প্রধানের প্রতি আনুগত্যহীনতা বিদ্রোহতুল্য হলেও যুদ্ধকালে মুজিব বাহিনীর সংগঠকরা কখনো এর জন্য বৈরি জবাবদিহিতার মুখে পড়েননি সরাসরি ভারতীয় প্রশ্রয়ের কারণে। নিজেদের কর্মকাণ্ডের বৈধতা দিতে গিয়ে তারা মনে করতেন, মুজিবের নির্দেশ ছিল তাঁর অনুপস্থিতিতে সিরাজুল আলম খান, শেখ মণি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ সামরিক সংগঠন

রাষ্ট্রাচারপ্রধান হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর সফরকালীন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেন:

> শুক্রবার, ১৭ মার্চ ১৯৭২। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তখন সকাল ৯টা বাজে। আকাশে নজরে এলো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিমান। কিন্তু নিচে আমি মহা সমস্যায় প্রটোকল নিয়ে। অভ্যর্থনার সারিতে দাঁড়ানো মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ, উপাচার্যগণ আর তথাকথিত 'চার খলিফা'। প্রশাসন নির্ধারিত এই ক্রমিকতায় খুশি নন চার খলিফা। তারা অন্তত উপাচার্যদের উপরে স্থান চাইলেন। তাদের বোঝানোর প্রয়াস নিলাম। আমলাতান্ত্রিক খুঁটিনাটি শোনার ধৈর্য তাদের আছে বলে মনে হলো না। শরণাপন্ন হলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের। তিনিও নিরুপায়।... বঙ্গবন্ধুকে বিষয়টি জানালাম। কোথায় তারা? ক্রোধান্বিত প্রধানমন্ত্রী। 'আমি বলছি, তোরা লাইনে দাঁড়া।'...মনে জাগলো, সমস্যার শেষ না শুরু?' দেখুন, ফারুক চৌধুরী, *স্মরণে বঙ্গবন্ধু*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪, ঢাকা, পৃ. ৯৪-৯৫।

একই বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সৈয়দ আলী আহসানের *'বঙ্গবন্ধুকে : যেরকম দেখেছি'*, বার্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ৩২। সৈয়দ আলী আহসান সেই সময়কার একজন উপাচার্য হিসেবে ঐ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বভাবত 'খলিফা'দের আচরণে ছিলেন ব্রিবত।

১০৮ Enayetullah Khan, *A Testament of Time*, Foreword, Holiday Publication, 1999, Dhaka, p. 7.

১০৯ *ibid*, p. 224.

এবং তাজউদ্দীন আহমদ রাজনৈতিক কাঠামোর নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু মুজিবের অনুপস্থিতিতে তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীনতার সংগ্রামের রাজনৈতিক ভরকেন্দ্র হয়ে উঠলে এবং সামরিক ভরকেন্দ্র হিসেবে ভিন্ন এক কাঠামো (মুক্তিবাহিনী) নির্মাণে ব্রতী হলে প্রথোমক্তরা (বিশেষত ফজলুল হক মণি) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং নিজেদেরই সামগ্রিক মুক্তি সংগ্রামের প্রধান ভিত্তি ও শক্তি হিসেবে ভারতে প্রচারণা চালাতে শুরু করেন। এমনকি তাজউদ্দীনের প্রধানমন্ত্রী হওয়া এবং সরকার গঠনকে 'ষড়যন্ত্র' মনে করতেন মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ। আবদুর রাজ্জাক বলছেন,

> 'তিনি (তাজউদ্দীন) সরকার গঠন করেছেন নিজেকে প্রধানমন্ত্রী করে। এই হলো ক্ষোভের কারণ। বঙ্গবন্ধু যা বলেছিলেন সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না।...প্রধানমন্ত্রী যদি কেউ হন তো বঙ্গবন্ধুই হবেন। বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী করে তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। আবার উপ-প্রধানমন্ত্রী হলে তো সৈয়দ নজরুল ইসলামই হবেন।...তিনি (তাজউদ্দীন) এটা কেন করলেন? কমান্ড কাউন্সিল না করে তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন। ...আমার ধারণা, তিনি মনে করেছিলেন বঙ্গবন্ধু আর ফিরে আসবেন না। সুতরাং তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধের নায়ক হিসেবে থাকবেন এবং এই বুদ্ধিটা অন্য জায়গা থেকে দেওয়া হয়েছিল।...[১১০]

এ রকম বক্তব্য থেকে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দের সাধারণ মনোভাবটি আঁচ করা সম্ভব। এরূপ বহু ভাষ্যে প্রমাণ হয়, তাজউদ্দীনের প্রতি ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখের বৈরিতা ছিল প্রকাশ্য এবং তীব্র। উপরিউক্ত ছাত্র-যুব নেতারা তাজউদ্দীন বিরোধী রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অন্তত ৪২ জন আওয়ামী লীগ নেতাকেও স্বপক্ষে শামিল

---

[১১০] মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৯। আবদুর রাজ্জাক-এর প্রায় অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে এই লেখার অন্যত্রও (তথ্যসূত্র ১১৫)। সেখানেও তিনি তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে মুজিবের 'নির্দেশনা' অমান্য করার অভিযোগ করেছেন। তবে যুদ্ধ পরিচালনা বা সরকার গঠন বিষয়ে আদৌ কোনো *নির্দেশনা* ছিল কি না সে বিষয়ে কোনো শক্ত সাক্ষ্য মেলে না আজো, বরং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম ২০১২-এর ৩ জুলাই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ২৫ মার্চের পূর্বে অন্তত দু'দিন চাওয়ার পরও তাজউদ্দীন, কামাল হোসেন, আমীরুল ইসলাম প্রমুখ তাঁদের নেতার কাছ থেকে এ রকম কোনো নির্দেশনা পাননি। যে কারণে গণহত্যার রাতে তাজউদ্দীন আহমদ করণীয় বিষয়ে ছিলেন 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়'। তবে আমীরুল ইসলাম-এর একই সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিত মেলে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু হলে রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে 'সবাই' যে জড়ো হবে সে বিষয়ে তাজউদ্দীনও অবহিত ছিলেন– যেমনটি প্রায়ই দাবি করে থাকেন মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ। আমীরুল ইসলামের এই সাক্ষাৎকারটি দেখুন, শারমিন আহমেদ, *তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৬৩-৭৩।

করতে পেরেছিলেন বলে দাবি করেছেন আমিরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীনের কার্যক্রম যে উক্ত নেতৃবৃন্দের মনঃপূত হচ্ছে না সে বিষয়ে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে সম্মিলিতভাবে আপত্তিও উত্থাপন করা হয়েছিল।[১১১]

মুজিব বাহিনীর নেতারা তাজউদ্দীন আহমদকে কীভাবে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতেন তার নজির হিসেবে তৎকালীন সচিব হোসেন তৌফিক ইমামের লেখনি থেকে আগরতলা সার্কিট হাউসের অভিজ্ঞতাটি এ পর্যায়ে তুলে ধরা যায়। শিলিগুড়ির মূর্তি সেনাক্যাম্পে ভারতীয়দের হাতে বাংলাদেশের 'প্রথম সামরিক অফিসার ব্যাচ'-এর পাসিং আউট প্যারেড শেষে উক্ত ঘটনাটি ঘটে। এইচ টি ইমাম লিখেছেন,

> 'রাতে শেখ মণি কয়েকজন সাথী নিয়ে এলেন সার্কিট হাউসে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কামরায় বৈঠক করতে করতে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার আরম্ভ করলেন। অনেকেই সমবেত হলেন। রাগের কারণ– প্রধানমন্ত্রী ও কর্নেল ওসমানী সম্পর্কে তাঁর নানা অভিযোগ। ওসমানী কেন মুজিব বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে অভিযোগ করছেন, আর প্রধানমন্ত্রী কেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তা প্রকাশ করছেন!...বলা বাহুল্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রকাশ্যে এ রকম উঁচু গলায় এবং রাগতস্বরে কথা বলা মোটেই আমাদের মান-সম্মান বৃদ্ধি করেনি।'[১১২]

মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বের তাজউদ্দীনের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতার ধরন সম্পর্কে খোদ মুজিব বাহিনীর একজন সংগঠক অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী লিখেছেন, '...আমাদের অধিনায়ক শেখ ফজলুল হক মণি এক পর্যায়ে সিরাজ ভাইকে আগরতলায় খবর দিয়ে আনলেন। কি কারণে জানি না মিজানুর রহমান চৌধুরীও আগরতলায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে সামনে রেখে শত শত গেরিলা যোদ্ধার উপস্থিতিতে আগরতলার সংসদ ভবনে মণি ভাই, সিরাজ ভাই বাংলাদেশ সরকারের যৌথ কমান্ড গঠনের প্রচেষ্টাকে অনাস্থা জানালেন।'[১১৩]

---

১১১ Srinath Raghavan, *ibid*, p. 66.

১১২ এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ.৩১১। এইচ টি ইমামের বিবরণীটি এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, উল্লিখিত ঘটনার সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ২০০৯ থেকে পরিচালিত আওয়ামী লীগ সরকারেরও অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন জনাব ইমাম এবং এও বোধহয় ইতিহাসের বড় কৌতুক, তাজউদ্দীন আহমদের পুত্র সোহেল তাজকে ঐ সরকারের (২০০৯-২০১৩) প্রতিমন্ত্রীর পদ ছেড়ে যখন চলে যেতে হয় তখন তাও মুজিব বাহিনীর এক নেতৃস্থানীয় সদস্যের দুর্ব্যবহারের কারণেই ঘটে বলে কথিত রয়েছে। এইচ টি ইমামকে এ পর্যায়েও দর্শকের ভূমিকাতেই থাকতে হয়।

১১৩ দেখুন, আবদুল মান্নান চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪।

পূর্বোক্ত ঘটনার আরও স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধকালীন যুবশিবিরের উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং গণপরিষদের সদস্য অ্যাডভোকেট আহমেদ আলী এভাবে :

> মুজিব বাহিনী গঠনের বিরোধিতার কারণে বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলায় একটি কর্মীসভার আয়োজন করেছিল। জহুর আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামরুজ্জামান এবং মিজানুর রহমান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সভায় শেখ মণিসহ যুব ও ছাত্রনেতারা মুজিব বাহিনী গঠনে বিরোধিতার জন্য তীব্র ভাষায় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করাকালে কে একজন হঠাৎ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করলে সমস্বরে চিৎকারের মাধ্যমে তা পাস হয়ে যায়। ব্যাপারটার ভয়াবহ পরিণতি অনুধাবন করে আমার পাশে বসা মিজান চৌধুরীকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনুরোধ করলে তিনি বলে ওঠেন, এই আগুনের মধ্যে আমি দাঁড়াতে পারবো না। বুঝলাম এ ব্যাপারে তাঁরও ইন্ধন রয়েছে।[১১৪]

মুক্তিযুদ্ধকালে শেখ ফজলুল হক মণি'র রাজনৈতিক উচ্চাশা অস্পষ্ট ছিল না। মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে পূর্ববাংলায় সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতা তিনিই পূরণ করছেন, এটাই ছিল তাঁর ধারণা। মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দের প্রতি সর্বোচ্চ পক্ষপাতিত্ব থাকার পরও তাই জেনারেল উবান লিখেছেন, 'মি. তাজউদ্দীনের প্রতি এই যুবনেতারা (উপরোক্ত চারজনের কথা বলা হচ্ছে) এমন প্রচারণা চালাত যে, তিনি জবরদখল করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।' এমনকি স্বাধীনতার দীর্ঘ পরও এইরূপ মনোভাব ছিল তাঁদের। যেমন আবদুর রাজ্জাক মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ১৮ বছর পর ১৯৮৯ সালের জুনে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'তাজউদ্দীন নিজেই নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, আমরা বুঝলাম–এটা ষড়যন্ত্র। তিনি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পালন করলেন না। আমরা এটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারলাম না।'[১১৫]

---

১১৪ আহমেদ আলী, *বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী গঠনের অজানা কাহিনী*, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৫ জানুয়ারি ২০১৩, ঢাকা। আহমেদ আলী একই লেখায় এও উল্লেখ করেছেন, মুজিব বাহিনী গঠনের পক্ষে আওয়ামী লীগে নেতৃত্ব পর্যায়ে অনেক সমর্থক ছিল এবং এই 'সমর্থক'রা এও চাচ্ছিলেন, ভারতীয় বাহিনী সীমান্তে দাঁড়িয়ে না থেকে অবিলম্বে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ুক। উল্লেখ্য, এসময় আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনী'ও গঠিত হয়নি বিধায়– ভারত কর্তৃক যুদ্ধরত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আগে ভারতীয় বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পড়ার অর্থ হতো পাকিস্তানের ভূখণ্ড দখল। এমনকি আওয়ামী লীগের অনেক নেতা যে দল বেঁধে তাজউদ্দীনের কাছে এসেছিলেন, 'ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য' প্রস্তাব নিয়ে সেটাও তাজউদ্দীন আহমদের জবানিতেই উল্লেখ করেছেন আহমদ আলী তাঁর লেখায়।

১১৫ সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত দেখুন, 'শেখ ফজলুল হক মণি : বিতর্কিত এক মানুষ', *সাপ্তাহিক এখনই সময়*, সম্পাদক : রেজাউর রহমান, ২য় বর্ষ, ১৭ সংখ্যা,.২৫ জুন, ১৯৮৯, ঢাকা।

যুদ্ধকালে উপরোক্ত বৈরিতার তীব্রতা ছিল ব্যাপক। মঈদুল হাসান দাবি করেছেন, মুজিব বাহিনীর চার প্রধান নেতার অন্তত দু'জন সেসময় তাজউদ্দীনকে হত্যার অসফল চেষ্টাও চালিয়েছিলেন।[১১৬] মঈদুল হাসানের এরূপ দাবি আরো কয়েকটি সূত্র দ্বারা সমর্থিত হয়।[১১৭] যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো তাজউদ্দীন আহমদের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ফারুক আজিজ খানের এতদসংক্রান্ত বিবরণ। আজিজ খান লিখেছেন,

> In October, he (D P Dhar) cautioned the prime minister (Mr. Tajuddin) about the strong opposition that developed within the AL against him. When the meeting was going on (between the two) in the BSF office a telephone came and I was informed that a young man was detained by the BSF guards with a hand grenade and some explosive in his possession inside the 8 Theatre Road office compound... ।'[১১৮]

অন্যদিকে একই ঘটনা সম্পর্কে যুদ্ধকালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আইজি গোলক মজুমদার লিখেছেন,

---

১১৬ এ কে খন্দকার ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, ঢাকা, পৃ. ১৩০।

১১৭ যার মধ্যে একটি হলো Faruk Aziz Khan, *Spring 1971*, The University Press Limited, Dhaka, p.184. স্পার্সোর অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফারুক আজিজ খান যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। যে কারণে তাঁর ভাষ্যের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আরেক গবেষক কামাল হোসেন তাঁর *'তাজউদ্দীন আহমদ : বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও তারপর'* গ্রন্থে (অংকুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৪৬) উল্লিখিত হত্যা চেষ্টার সত্যতা সম্পর্কে যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলামের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উল্লেখ্য করেছেন। তাজউদ্দীনকে হত্যার অন্তত দুটি চেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন মঈদুল হাসানসহ একাধিক লেখক। একটি ঘটনায় হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রেরিত যুবক নিজেই তাজউদ্দীনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন সাহিত্যে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। অপর ঘটনাটির বিবরণ পাওয়া যায় কেবল যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারি ফারুক আজিজ খানের গ্রন্থে। যা উপরে উল্লেখ করা হলো।

১১৮ বিস্তারিত দেখুন, Faruk Aziz Khan *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৪ ও ১৯২। ফারুক আজিজ খান এও জানাচ্ছেন, মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন স্বদেশভূমিতে মন্ত্রী থাকাবস্থায়ও 'বিশেষ মহল' থেকে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। বিশেষ করে চুয়াত্তরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে তাজউদ্দীন উক্ত নিরাপত্তাহীনতার কারণে, যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে রাইফেলের জন্য কিছু গুলি এবং একটি পিস্তল ক্রয় করেন। দেখুন, *পূর্বোক্ত*, ১৮৭। অন্যদিকে মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারিত হওয়ার পরও যে তাজউদ্দীনকে ব্যাপকভিত্তিক গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখা হতো এবং কারা কারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাও উচ্চপর্যায়ে রিপোর্ট হতো। সেই বিবরণের জন্য দেখুন, নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা*, ইউপিএল, ২০০৭, ঢাকা, পৃ. ৯৯।

'(বাংলাদেশের) কয়েকজন যুবনেতা বিক্ষুব্ধ হয়ে মুক্তিবাহিনীর প্রতিযোগী আরেক মুক্তিবাহিনী গঠন করেন এবং কিছু (ভারতীয়) দিশেহারা আমলার সাহায্যে অধিকতর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র জোগাড়ে সমর্থ হন। তাদের একজন তাজউদ্দীন সাহেবের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে পিস্তল হাতে অতর্কিতে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েন...।'[১১৯]

এইরূপ ঝুঁকিপূর্ণ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাজউদ্দীনের পক্ষেও যুবনেতাদের দাবিকৃত মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব ছিল না; এমনকি মুজিবের কথিত 'নির্দেশ' সত্ত্বেও। কারণ এপ্রিলের শুরুতে স্বজনদের ওপর পাকিস্তান বাহিনীর নির্মমতায় ক্রুদ্ধ হাজার হাজার তরুণ ছুটে আসছিল প্রতিরোধ যুদ্ধের তালিম নিতে– ইতোমধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রণাঙ্গনগুলোতে যে যুদ্ধের সামরিক নেতৃত্বও তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং ৪ এপ্রিল হবিগঞ্জের মাধবপুরে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ম্যানেজারের বাংলোতে সম্মিলিত মুক্তিফৌজ গঠন ও আতাউল গণি ওসমানীর প্রতি তার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়ে যাওয়ায় এতদবিষয়ে তাজউদ্দীনকে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।[১২০] তবে বিএলএফ নেতৃবৃন্দের লাগাতার চাপের কারণে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জুনে উভয়পক্ষের (তাজউদ্দীন ও বিএলএফ) রাজনৈতিক শক্তি যাচাইয়েরও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সর্বশেষ নির্বাচনে যারা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের এক সম্মেলন আহ্বান করতে তাজউদ্দীনকে ভারতীয়রা অনুরোধ করে। সেই অনুযায়ী একাত্তরের ৫ জুলাই খন্দকার মোশতাক আহমদের সভাপতিত্বে জলপাইগুড়ির বাগডোগরায় পূর্ববঙ্গীয় পরিষদ সদস্যদের সমাবেশ হয়। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিরাপত্তা সুরক্ষার মাঝেই এই সভা হয়। সভায় পরিষদ সদস্যের বাইরে আওয়ামী লীগ দলীয় কিছু নেতৃবৃন্দও উপস্থিত হন। শুরুতেই তাতে শেখ আবদুল আজিজ বক্তৃতা আরম্ভ করেন তাজউদ্দীনের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। এসময় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ নিয়ে তাতে হস্তক্ষেপ করেন গাজিপুরের ময়েজউদ্দিন আহমেদ।[১২১] মোশতাক আহমদ এ সময় সভাটি স্থগিত

---

১১৯ গোলক মজুমদার, একটি উজ্জ্বল স্মৃতি, *তাজউদ্দীন আহমদ : স্মৃতির এ্যালবাম*, সম্পাদনা : মাহবুবুল করিম, প্রকাশক : মিসেস দিলরুবা করিম, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ৪০।

১২০ প্রবাসী সরকার গঠিত হওয়ার আগেই, এই বৈঠকে উপস্থিত বাঙালি সামরিক কর্মকর্তারা পুরো প্রতিরোধ যুদ্ধক্ষেত্রকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রাথমিক সামরিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করেছিলেন। ওসমানী প্রবাসী সরকারের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধের সর্বাধিনায়কের স্বীকৃতি পান ১০ এপ্রিল।

দেখুন, https://en.wikipedia.org/wiki/M._A._G._Osmany (২৪ জুন ২০১৩)

১২১ আগেই তাজউদ্দীন আহমদ এ বিষয়ে ময়েজউদ্দিনের সাহায্য প্রার্থী ছিলেন। ময়েজউদ্দিনের হস্তক্ষেপের ধরন ছিল খুবই আক্রমণাত্মক। বিস্তারিত দেখুন, বদরুদ্দিন আহমদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ১১২। ময়েজউদ্দিন,

করে দিতে চাইলেও ৬ জুলাই পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল– যদিও আবদুর রব সেরনিয়াবত, তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখকে সভা ছেড়ে চলে যেতে দেখা যায়। এদেরই কারো অনুসারী তরুণ সংগঠকরা তাজউদ্দীন ও প্রবাসী সরকারকে 'চোর', 'প্রতারক' ইত্যাদি শব্দ বলতেও দ্বিধা করেননি সেদিন।[১২২] শেষ পর্যন্ত এই সমাবেশ প্রবাসী সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান রক্ষা করলেও বিএলএফ-কে নিয়ন্ত্রণ তো দূরের বিষয়– স্বাধীনভাবে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম পরিচালনাও সম্ভব ছিল না সেই সরকারের পক্ষে। এমনকি বিএলএফ-কে 'নিয়ন্ত্রণ'-এর জন্য তাজউদ্দীন আহমদ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আগস্টে সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে দাবি জানালেও তাতে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি বরং এই বাহিনীকে মাঠ পর্যায়ে জবাবদিহিতাহীন 'স্বচ্ছন্দ' করে দিতে উবানের চাপে অরোরা ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এক পর্যায়ে নির্দেশ দেন, 'সীমান্তের কেবল ২০ মাইলের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম সীমিত থাকবে। অভ্যন্তরে যুদ্ধের দায়িত্ব বিএলএফ-এর।'[১২৩] আপাতদৃষ্টিতে এটাকে মুক্তিবাহিনী ও বিএলএফ-এর মধ্যে একটি আপসরফা বলে মনে হলেও কার্যত এর মাধ্যমে এই বাহিনীর প্রতি ভারতের অগ্রাধিকারভিত্তিক পক্ষপাত প্রকাশ পায় এবং সরাসরি

ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, শামসুল হক (শ্রীপুরের জনপ্রতিনিধি) প্রমুখ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতাদের ঝুঁকি নিয়ে তাজউদ্দীনের পক্ষ নিতে কমই দেখা যেত। বাগডোগরা কনফারেন্সের পরও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাজউদ্দীনকে অপসারণের আরেকটি উদ্যোগ নেয়া হয় একাত্তরের নভেম্বরে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে। কলকাতার সিআইটি রোডে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। *পূর্বোক্ত*।

মুজিব বাহিনীর বাইরে তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে বিশেষ সোচ্চার ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, শেখ আবদুল আজিজ, আবদুর রব সেরনিয়াবত, মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। শেষোক্তজন বাগডোগরা কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর কারণে যুদ্ধের নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরে 'প্রয়োজনে দেশে ফিরে আপসরফা' করারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দেখুন, মঈদুল হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮। তাজউদ্দীন যুদ্ধকালে রাজনৈতিকভাবে অন্তত পাঁচটি গ্রুপকে মোকাবেলা করেছেন। যাদের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে শেখ মণি, মোশতাক আহমদ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, দেওয়ান ফরিদ গাজী, জহুর আহমেদ চৌধুরী, নুরুল ইসলাম মঞ্জু প্রমুখ। উল্লেখ্য, ময়েজউদ্দিন ১৯৮৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কালীগঞ্জে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছিলেন।

১২২ এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের নেতা এ এ মোহাইমেন সম্মেলনের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, '...তাজউদ্দীনকে চোর, প্রতারক ইত্যাদি বলে এমন অশ্লীল ভাষায় রব, মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী প্রমুখ গালি দিতে শুরু করলো যে লজ্জায় মাথা তুলতে পারছিলাম না। মাইকের গোটা দুই হর্ণ রাস্তায়ও ফিট করে রাখা ছিল। বারান্দায় বেরিয়ে দেখি প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে গেছে বক্তৃতা শোনার জন্য।...' দেখুন, *ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর*, পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯, ঢাকা, পৃ. ১০০।

১২৩ জেনারেল উবান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১।

যুদ্ধে যুক্ত হওয়ার বহু আগেই ভারতীয়রা যুদ্ধক্ষেত্রের নীতি ও কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এসময় মুজিব বাহিনীকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ স্বতন্ত্র একটি 'wireless system' এবং 'code of communication'[১২৪]-এর ব্যবস্থাও করে দেয়।[১২৫]

একই সময়ে দেশের ভেতরে জনগণের কাছে মুক্তিবাহিনীর বিপক্ষে বিএলএফ ক্যাডারদের অধিক গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে প্রমাণ করতেই তাদের নাম দেওয়া হয় 'মুজিব বাহিনী।' আনুষ্ঠানিকভাবে এই নাম ধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বাহিনীর অন্যতম সংগঠক মার্শাল মনিরুল ইসলাম– যিনি পরে জাসদেরও একজন প্রভাবশালী সংগঠক ছিলেন– জানিয়েছেন, অক্টোবরে বিএলএফ-এর শীর্ষ ১০০ সংগঠক দেরা দুনের কাছাকাছি কালশিতে মিলিত হন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে ঐকমত্য গড়ে তুলতে। যাকে মনিরুল ইসলাম বলছেন, বিএলএফ-এর 'কাউন্সিল অধিবেশন'। এই কালশি অধিবেশনে বিএলএফকে 'মুজিব বাহিনী' নামে অভিহিত করা হয়। এই সিদ্ধান্তের আর্থসামাজিক কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনিরুল ইসলাম লিখেছেন, 'মুজিবের অনুপস্থিতিতে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতা ও সামরিক-বেসামরিক আমলাচক্রের অশুভ চক্রান্ত প্রতিহত করে মুজিবের দর্শন বাস্তবায়িত করার সংগ্রামে এই নাম পরিবর্তন সহায়ক হবে এবং মুজিবের দর্শনের সৈনিকদের সংগঠন 'মুজিব বাহিনী' জনগণের মাঝে দ্রুত বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হবে বলে বিবেচিত হয়।'[১২৬] তবে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের মুজিব বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার জিয়ারুল ইসলাম বর্তমান লেখককে বলেছেন, প্রশিক্ষণ পর্যায়ে এবং পুরো যুদ্ধকালে 'মুজিব বাহিনী' নামেই তাঁরা যুদ্ধ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'এই বাহিনীর নাম যে বিএলএফ সেটা যুদ্ধের পরে শুনতে পাই।'[১২৭] জিয়ারুল ইসলাম ছিলেন মুজিব বাহিনীর 'পঞ্চম কোর্সের সদস্য।' তাঁর কাছ থেকে পাওয়া দলিলপত্রে দেখা যায় 'মুজিব বাহিনী'র নামে বিএলএফ যোদ্ধারা প্রশিক্ষণকালেই মুদ্রিত প্যাড ব্যবহার করতেন এবং ঐরূপ প্যাডে বিএলএফ শব্দটিও ছিল না।

বিএলএফ-এর 'মুজিব বাহিনী' নামকরণ যখনি হোক– বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে এই বাহিনী সৃষ্টি ও ভারতীয় বিভিন্ন 'কর্তৃপক্ষ'-এর নানামুখী তৎপরতায় কর্নেল ওসমানীসহ সেক্টর কমান্ডাররা স্পষ্টত নাখোশ ছিলেন। কিন্তু এ ছিল কার্যত অনিবার্য। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে তখনি ভারতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও কানাঘুষা শুরু হয়। সেই সময়কার একজন খ্যাতনামা ভারতীয়

---

১২৪ এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন, মনিরুল ইসলাম, *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র*, জ্যা পাবলিকেশন্স, ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১৯০-১৯৩।

১২৫ দেখুন, Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh revolution and its aftermath*, *Ibid*, p. 116.

১২৬ মনিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৩।

১২৭ তাঁর সাক্ষাৎকার, *পূর্বোক্ত*।

বামপন্থী তাত্ত্বিক শিবদাস ঘোষ (সাধারণ সম্পাদক–এসইউসি-আই) ১৯৭১-এর ২৪ এপ্রিল যুদ্ধকালেই তাঁদের পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় 'সহায়তা'র রাজনৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ভারতের সরকার একচেটিয়া পুঁজিবাদী চরিত্রের সরকার। সে ইতোমধ্যে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। পশ্চিমা দেশগুলোর মতো সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি না থাকলেও স্বল্প পরিমাণ সম্প্রসারণবাদী মনোভাব তার নাই এটা বলা যায় না। বাংলাদেশকে সাহায্য করার ব্যাপারে এই মনোভাব কাজ করবে আমাদের সরকারের। সরকার স্বভাবতই বাংলাদেশের আন্দোলনকে সমর্থন করা এবং তাকে সাহায্য করার নামে সেই দেশের উপর খবরদারী বা অন্তত ট্রেড এন্ড কমার্সের স্বার্থে খানিকটা প্রভাবের পরিধি বিস্তার করার চেষ্টা করতে পারে এবং বাংলাদেশে একটি তাঁবেদার সরকার খাড়া করার চেষ্টা করতে পারে।'[১২৮]

শিবদাস ঘোষের উপরোক্ত দূরদর্শী অনুমান ও তার পরবর্তী সত্য-মিথ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একেবারে অমূলক প্রমাণিত হয়নি তা।[১২৯] কৌতূহলোদ্দীপক দিক হলো, 'মুজিব বাহিনী'র আপাত কমিউনিস্ট বিরোধী অবস্থান থেকে মাত্র এক বছরের মধ্যে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-এর ডাক দিয়ে সৃষ্ট জাসদের রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি আদর্শিক প্রভাব দেখা গিয়েছিল শিবদাস ঘোষ এবং তাঁর দল এসইউসি-আই-এরই। তার পেছনে অবশ্য ভিন্ন আরেক আত্মগত উপাদান কাজ করেছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ডের তরুণ মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ব্যক্তিগত কারণে ভারতে অবস্থানকালে এসইউসি-আই-এর রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বৃহত্তর কুমিল্লার বামপন্থী নেতা হাবিবুল্লাহ চৌধুরীর মাধ্যমে মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর পরিচয় হয় সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে। মুবিনুল হায়দারের বড় ভাই থাকতেন ভারতে। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে পালিয়ে সেসময় মুবিনুল হায়দার তাঁর ভাইয়ের কাছে অবস্থান করছিলেন।[১৩০] চাঁদপুরের হাজিগঞ্জে জন্ম গ্রহণকারী হাবিবুল্লাহ চৌধুরী ও

---

১২৮ আরও বিস্তারিত দেখুন, শিবদাস ঘোষ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে*, বক্তব্যটি প্রথমে ভাষণ আকারে প্রদত্ত এবং পরে মুদ্রিত, প্রথম প্রকাশ (বাংলা): ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ এবং (ইংরেজি) ১১ জুলাই ১৯৭১, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার ইন্ডিয়া।

১২৯ এ বিষয়ে স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ-ভারত যৌথ অর্থনৈতিক নীতিকৌশলগুলো এবং তার ফলাফল নিয়ে এ গ্রন্থের ৬.গ উপ-অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

১৩০ ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর হাবিবুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের কথোপকথনকালে তিনি এ সম্পর্কিত 'যোগসূত্র' তৈরির বিবরণ দিয়ে পাশাপাশি এও বলেন যে, তাঁর জীবনের একটি 'বড় ভুল' হচ্ছে এই যোগসূত্র স্থাপন। এইরূপ বিস্ময়কর মূল্যায়নের কারণ জানতে চাইলে তিনি, 'জাসদ ভেঙে বাসদ সৃষ্টির জন্য প্রধানত মুবিনুল হায়দারকে দায়ী করেন। উল্লেখ্য, হাবিবুল্লাহ চৌধুরী এখন আর রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত নেই। কুমিল্লাতেই অবস্থান করেন তিনি। জাসদ সৃষ্টির কালে তিনি চাঁদপুর এলাকায় ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি ও খালেকুজ্জামান মিলে চাঁদপুরে জাসদের গোড়াপত্তন

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী পরস্পর নিকটাত্মীয় ছিলেন। মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকে এসইউসি-আই পাঠিয়েছিল বাংলাদেশের নতুন ধারার বামপন্থী রাজনীতির উত্থান পর্যবেক্ষণ এবং তাদের সঙ্গে সম্ভাব্য সম্পর্কের সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য। বাংলাদেশে জাসদের ব্যানারে নতুন ধারার বামপন্থী তারুণ্যের উত্থান কলকাতায়ও ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল তখন। এসইউসি-আই এ ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি যাচাইয়ে বিশেষ তৎপর ছিল। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই মুবিনুল হায়দার এসইউসি-আই-এর অভিজ্ঞতা ও আদর্শের আলোকে সিরাজুল আলম খানকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন– এ দেশেও অনুরূপ আদলে আরেকটি কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তনে। পরে মুবিনুল হায়দারের মাধ্যমে এসইউসি-আই নেতা শিবদাস ঘোষের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের দীর্ঘ বৈঠকও হয় ভারতে।[১৩১] ফল হিসেবে দেখা যায়, বামপন্থী দল হিসেবে সিরাজুল আলম খানের অনুসারীরা যখন 'জাসদ' গড়ে তুলছেন তখন তার সঙ্গে এসইউসি-আই'র অনেক সাংস্কৃতিক মিল।[১৩২] এমনকি মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এও মন্তব্য করেছেন, ১৯৭৪ সালে গৃহীত জাসদের প্রথম থিসিস, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন, রণনীতি-রণকৌশল– কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে জাসদের তাত্ত্বিক নেতা সিরাজুল আলম খানের

করেন। তবে বৃহত্তর কুমিল্লা জুড়েই জাসদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল– যদিও কুমিল্লায় জাসদের গোড়াপত্তন হয় অ্যাডভোকেট ফজলুল হক, নওশের আহমেদ, আনসার আহমেদ, আলী আক্কাস প্রমুখের মাধ্যমে।

১৩১ মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, উপরোক্ত যোগাযোগ ঘটেছিল তেহাত্তরের আগস্টে এবং শিবদাস ঘোষের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের বৈঠক হয়েছিল 'কয়েক দফা।' দেখুন, মহিউদ্দিন আহমদ, *এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল*, সিডিএল, ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ১৭৪। তবে জাসদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মধ্যসারির একজন সংগঠক বর্তমান লেখকের কাছে দাবি করেছেন, হাবিবুল্লাহ চৌধুরীর মাধ্যমে যোগাযোগের আগেই চিত্তরঞ্জন সূতারের মাধ্যমে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর যোগাযোগে ঘটেছিল। এই বক্তব্য অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র দ্বারা সমর্থিত হয় না। তবে মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মাধ্যমে বাংলাদেশের আরও অনেক বামপন্থী নেতার যোগাযোগ ঘটেছিল শিবদাস ঘোষের সঙ্গে। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন বদরুদ্দীন উমর। এদের মধ্যে সিরাজুল আলম খান ও জাসদকেই শিবদাস ঘোষ আদর্শিক ও সাংগঠনিক মৈত্রীর জন্য উপযুক্ত মনে করেছিলেন। অন্যদিকে জাসদ নেতৃবৃন্দও শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় বিশেষভাবে 'ইমপ্রেজড' ছিলেন।

১৩২ এসইউসি-আই গঠিত হয়েছিল মূলত অনুশীলন সমিতি থেকে আগত রেভ্যুল্যুশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (আরএসপি)-এর একটি অংশ নিয়ে। বিপ্লবের রণনৈতিক কৌশল সম্পর্কিত ভিন্নতা ছাড়াও কর্মীদের জীবন-যাপন, পারস্পরিক সম্পর্ক, পার্টি জীবন ইত্যাদি বিষয়ে সিপিআই, সিপিআইএম প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভারতীয় কমিউনিস্ট ধারাগুলোর অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির সঙ্গে এসইউসি-আই এর বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। সার্বক্ষণিক কর্মীদের এই পার্টিতে ব্যক্তিগত সম্পদ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন-যাপন বাদ দিয়ে পার্টি কমিউনে থাকতে উৎসাহিত করা হয়– যেরূপ চর্চা এ অঞ্চলে মস্কো কিংবা পিকিং কোনো ঘরানার বামপন্থী দলেই সচরাচর দেখা যায় না।

আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে রচিত।[১৩৩] জেলে আটক জাসদ নেতারা তখন শিবদাস ঘোষের 'কেন এসইউসিআই ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল' শীর্ষক পুরো পুস্তিকাটি সাধারণ খাতায় লিখে অধ্যয়নের জন্য এক কারাগার থেকে আরেক কারাগারে সতীর্থদের পৌঁছে দিতেন বলেও জানা যায়।[১৩৪]

উল্লেখ্য, হাবিবুল্লাহ চৌধুরী পরে কুমিল্লা অঞ্চলে গণবাহিনীর পলিটিক্যাল কমিশার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর নেতা খালেকুজ্জামান ভূঁইয়ার জাসদে অভিষেকও তাঁর মাধ্যমেই। খালেকুজ্জামান ছিলেন চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার সন্তান। জাসদে যোগদানের আগে তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে শ্রমিক রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন তিনি। জাসদে মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর অন্তর্ভুক্তির পটভূমি এবং এই অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দলে সৃষ্ট রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তখনকার জাসদ এবং বর্তমানে বাসদ নেতা খালেকুজ্জামান সাম্প্রতিক এক ভাষণে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়েছেন :

> জাসদ হওয়ার পর এক তাত্ত্বিক সংকটের মধ্যে শ্লোগান উঠেছিল 'আমরা লড়ছি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য।' কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? বিপ্লবটা কি ধরনের হবে? বিপ্লবের স্তর কি? দলের নীতিগত-পদ্ধতিগত সংগ্রাম কী হবে? এই বিষয়গুলো ছিল অস্পষ্ট। তার সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা আমাদের নেই। সে সময়, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা-ভাবনা আমাদের পার্টির নেতা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মাধ্যমে আমরা পেলাম। তিনি আগে থেকে এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।...কমরেড শিবদাস ঘোষের যে

---

১৩৩ মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, *'বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি ও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ'*, এপ্রিল ২০১৩, ঢাকা। ২০১৩ সালের এপ্রিলে বাসদের নবপর্যায়ের ভাঙনকালে একাংশের নেতা মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ৪২টি পয়েন্ট আকারে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রাখেন সেটাই এই শিরোনামে অভ্যন্তরীণ প্রচারের জন্য মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত বিষয়ে এই গ্রন্থের ৫.গ উপ-অধ্যায়ে মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর আরও অভিমত রয়েছে।

১৩৪ মোস্তফা ফারুক, *বাসদের ইতিহাস, তাত্ত্বিক বিতর্ক ও শিবদাস ঘোষ*, ৮ মে ২০১৩, https://www.facebook.com/mostafa.farook?ref=ts&fref=ts. উল্লেখ্য, মোস্তফা ফারুক তখন যশোর জেলে ছিলেন; জাসদ ছাত্রলীগের যশোর জেলার সভাপতি ছিলেন তিনি। পরে জাসদ ভেঙে বাসদ গঠনকালে তিনি শেষোক্ত দলে চলে আসেন। বর্তমানে যুক্তরাজ্য প্রবাসী।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ... সেটা জাসদ গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার যে অনুশীলন, এটাকে উপেক্ষা করে গেছে।[১৩৫]

খালেকুজ্জামান কথিত 'উপেক্ষা'রই সংশোধিত ফল পরবর্তীকালে 'বাসদ'-এর সৃষ্টি। তবে প্রথমে জাসদ এবং পরে বাসদ সৃষ্টিতে শিবদাস ঘোষের বিপুল তাত্ত্বিক প্রভাব কাজ করলেও মুবিনুল হায়দার চৌধুরী শুরুতে সচেতনভাবে নিজেকে আড়াল করে রাখতেন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য হলো, 'কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন তুমি ওখানে গেছ, ওখানে নেতা হবে না; তুমি সামনে আসবে না; তুমি যদি সামনে আস তাহলে ইন্ডিয়ান পার্টি হিসেবে সেই পার্টি ব্রান্ড হয়ে যাবে। তাহলে আর পার্টি দাঁড়াতে পারবে না।'[১৩৬] কথিত 'পার্টি'টি দাঁড় করানোর এতসব সযত্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জাসদ কেন ২-৩ বছরের মধ্যে হোঁচট খেল সে ব্যাখ্যাও সবিস্তারে দিয়েছেন মুবিনুল হায়দার চৌধুরী সম্প্রতি বাসদের ভাঙনকালে প্রকাশ্য এক লেখায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে। লেখাটিতে জাসদের উত্থান ও পতন– উভয় প্রসঙ্গেই বক্তার গভীর এবং মনোযোগ আকর্ষণী পর্যবেক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-এর শ্লোগান তরুণ সমাজকে স্রেফ 'ধরে রাখা'র প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছিল মাত্র।

> স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপর শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যখন মার খেতে শুরু করলো, তার বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবক-তরুণদের প্রবল প্রতিবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে জাসদ গড়ে ওঠে। এই ছাত্র-যুবকরা শাসকদের লুটপাটে যুক্ত হতে চায়নি। জাসদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান আসলে একটা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেছিল। কিন্তু কেমন করে সমাজতন্ত্র হয়, কেমন করে বিপ্লবের উপযোগী পার্টি হয়, এসব কিছুই তাদের সামনে পরিষ্কার ছিল না। এ সম্পর্কে জাসদ নেতাদের মধ্যে স্বচ্ছ, স্পষ্ট কোন ধারণাও ছিল না। আমার মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তারা একটি প্রয়োজনের হাতিয়ার খুঁজে পেলেন, যা দিয়ে ছাত্র-তরুণদের আকৃষ্ট করা যায়, ধরে রাখা যায়। এটা তাদের প্রয়োজনবাদিতার ঝোঁক, উপস্থিত প্রয়োজনের তাগিদ। কিন্তু শিবাদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাকে ধারণ করে নিজেদের জীবন পাল্টানোর প্রশ্ন যখন এলো, তখন কিন্তু এরা আর তা করতে পারলেন

---

১৩৫ খালেকুজ্জামান এই ভাষণটি দিয়েছেন ২০১০ সালের ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায়। পরে এটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। দেখুন, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি: অতীত ও বর্তমান*, ভ্যানগার্ড প্রকাশনী, নভেম্বর ২০১১, ঢাকা, পৃ. ২০-২১।

১৩৬ মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ২০১২ সালের আগস্টে ঢাকার পাশে সাভারের গণবিশ্ববিদ্যালয়ে বাসদের সাতদিনব্যাপী এক শিক্ষাশিবিরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে জাসদ গড়ে ওঠবার সময়ের স্মৃতিচারণ হিসেবে উপরোক্ত বিবরণ দেন।

না। এ তাদের সাধ্যের মধ্যেই ছিল না। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, জাসদ নেতারা সব ব্যক্তিগতভাবে অসৎ ছিলেন। তারা বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তার কাঠামোর মধ্যেই আটকে ছিলেন। সেখান থেকে নিজেদের ভেঙ্গেচুরে সর্বাহারা শ্রেণীর আদর্শে নতুনভাবে গড়ে তোলার কাজটি করতে পারলেন না। এদিক থেকে জাসদ ব্যর্থ হয়ে গেছে...[১৩৭]

উল্লেখ্য, জাসদ সৃষ্টির সময় মুজিব বাহিনীর সিরাজ অনুসারীদের প্রবলভাবে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'মুখী হওয়ার পেছনে বাহিনী বহির্ভূত ব্যক্তি হিসেবে মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ছাড়াও আরেকজন ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল– তিনি হলেন অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমান; যিনি প্রথমে করাচিতে ইউনাইটেড ব্যাংকে কাজ করেছেন এবং পরে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনার চাকরি নেন আখলাকুর রহমান। অর্থনীতি পড়েছিলেন তিনি ম্যানচেস্টারে ও ম্যাসাচুসেটস ইনসটিটিউট অব টেকনোলজিতে (পিএইচডি)। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর একটি স্বতন্ত্র গবেষণা সংস্থাও ছিল। কুমিল্লায় যে পরিবারে তিনি বিয়ে করেন সেই পরিবারেরই জামাই ছিলেন আরেক বামপন্থী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা। অন্যদিকে জাসদ পরিবারে প্রাতিষ্ঠানিক বিবেচনায় আখলাকুর রহমানই ছিলেন সবচেয়ে মেধাবী ও পলিটিক্যাল ইকোনমিতে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত। পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগেও পড়িয়েছিলেন তিনি। ভারত বিভক্তির পূর্ব থেকে তিনি সাম্যবাদী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। যুক্ত ছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে। সিরাজুল আলম খানের অনুসারী জঙ্গী তরুণদের নিয়মিত পাঠচক্রের মাধ্যমে মার্কসবাদী মতাদর্শে দীক্ষা দিয়ে জাসদকে বামপন্থী দল হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় তাঁর অবদান বিপুল। বিশেষ করে, ১৯৭৩-এর আগস্ট থেকে পরবর্তী চার মাস আখলাকুর রহমান জাসদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে জাসদ কার্যালয়ের দোতলায় প্রত্যহ ভোরে মার্কসবাদের ওপর সাইক্লোস্টাইল করা পাঠ উপকরণ দিয়ে দলের অগ্রসর ক্যাডারদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শুরু হতো। পাশাপাশি এই দলের তাত্ত্বিক অবস্থানও নির্মাণ করে দেন তিনি। জাসদের প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলিল, বিশেষত 'বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ' শীর্ষক জাসদের মুখ্য

---

[১৩৭] মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, *মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে শোধনবাদ-সংস্কারবাদ-আপসকামিতার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুলুন*, বাসদের বুলেটিন, মে ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৪।

তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখেন তিনি।[১৩৮] বাহাত্তরে ড. আখলাক সাপ্তাহিক 'হলিডে'তে বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন, সেটাই হবু জাসদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করে। ইতোমধ্যে মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মাধ্যমে সীমান্ত পেরিয়ে আসা 'উৎপাদন পদ্ধতি'র যেরূপ বিশ্লেষণকে সিরাজুল আলম খানের কাছে যৌক্তিক মনে হচ্ছিল আখলাকুর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল তার কাছাকাছি। ফলে নবীন দলটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি দ্রুত বিকশিত হয়। জাসদের মুখপত্র দৈনিক গণকণ্ঠে ১৯৭৩-৭৪ জুড়ে বামপন্থী রাজনীতির তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে প্রায়ই লিখতেন তিনি।

আখলাকুর রহমানের পাশাপাশি এসময় অন্য যে নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদ জাসদ কর্মীদের 'মার্কসবাদ' ও 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' বিষয়ে অনিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দিতেন তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সুপরিচিত অধ্যাপক ড. আবু মাহমুদ। অর্থনীতিবিদ আনিসুর রহমানও জাসদের প্রথম দিকে বিভিন্ন সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। পল্টনে জাসদের প্রথম কাউন্সিল সভাতেও তিনি আলোচক ছিলেন। এক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনাযোগ্য দিক হলো, জাতীয় পরিসরে অধ্যাপক আনিসুর রহমান[১৩৯] তখন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন

---

১৩৮ আশির দশকে এসে আখলাকুর রহমানের সঙ্গে জাসদের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে যায়। এসময় তিনি মার্কসবাদের ওপর তাঁর পুরানো বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। জাসদের পুরানো তাত্ত্বিক দলিলটি (বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ) পুনর্লিখনের অনুরোধও প্রত্যাখান করেন তিনি এ পর্যায়ে। এসময় ঢাকার মালিবাগে একটি মাজারে যাতায়ত করতেন তিনি এবং সুফী ধারার ইসলামি বিশ্বাসের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। পরে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। উল্লেখ্য, অভ্যন্তরীণ নানা বিতর্ক শেষে পরবর্তীকালে যখন জাসদ ভেঙে বাসদ সৃষ্টি হয় তখন শেষোক্ত দলটি 'কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সংক্রান্ত' জাসদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটি বর্জন করেনি। জাসদ ভেঙে বাসদ সৃষ্টির প্রধান উপলক্ষ ঘটে সিরাজুল আলম খান যখন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র-এর ধারণা থেকে সরে গিয়ে 'পেশাজীবীদের পার্লামেন্ট' সংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে দলকে আদর্শিকভাবে পুনর্গঠনের তাগিদ দেন। এসময় ভাঙনের প্রথম আঘাত লাগে ছাত্রতরের মতোই ছাত্রলীগে। কৌতূহলোদ্দীপক দিক হলো যেই দুই প্রধান ছাত্রনেতাকে কেন্দ্র করে এই ভাঙন প্রক্রিয়ার শুরু হয় (মাহমুদুর রহমান মান্না ও আখতারুজ্জামান) তারা উভয়েই পরে বাসদ ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেন।

১৩৯ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ড. আনিসুর রহমান ছিলেন সেই বুদ্ধিজীবী দলের অন্যতম সদস্য যারা ৬৫ থেকে ৭০ সালের মাঝামাঝি পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের আর্থিক বঞ্চনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে দায়ী করে 'টু ইকোনমি থিওরি' দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অন্যান্য যেসব অধ্যাপক টু ইকোনমি থিওরির প্রবক্তা তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আতোয়ার রহমান, অধ্যাপক আবু মাহমুদ, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ প্রমুখ। অধ্যাপক রেহমান সোবহানই এই বিষয়ে বেশি সরব ছিলেন। আর এই অধ্যাপক গোষ্ঠীকে বিশেষ উৎসাহ যোগাতেন অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। যাকে বলা হতো 'শিক্ষকদের শিক্ষক'। পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝে বৈষম্যের চিত্র উপস্থাপন শেষে desparity থেকে রক্ষা পেতে উপরোক্ত অধ্যাপকরা ঐ সময় যে সমাধান চিন্তা তুলে ধরেন তা সেই রাজনীতিবিদদের হাতকেই শক্তি যুগিয়েছিল যারা

আহমদের ঘনিষ্ঠ। তবে বামপন্থী অধ্যাপকদের সরাসরি মানসিক প্রেরণা, উৎসাহ ও সংশ্লিষ্টতা সত্ত্বেও জাসদের সাংগঠনিক কাঠামো মোটেই সমাজতান্ত্রিক

পূর্ববাংলাকে পৃথক করাই পাকিস্তানের তখনকার বিরাজমান সংকটের একমাত্র সমাধান হিসেবে ভাবছিলেন। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমে সহায়ক ভূমিকায় ছিল ইত্তেফাকে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার 'মুসাফির' নামক কলাম এবং হামিদুল হক চৌধুরীর অবজারভারে অর্থনীতি বিষয়ক নানামুখী রিপোর্ট। এ বিষয়ে আরও বিবরণের জন্য দেখুন, ড. মোজাফফর আহমেদের সাক্ষাৎকার, *অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, আসাদুজ্জামান, তরফদার প্রকাশনী, ২০০১, ঢাকা।

টু ইকোনমি থিওরির প্রবক্তাদের অভিমত ছিল, একই দেশ হলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবদান, চাহিদা ও প্রাপ্তি আলাদা চরিত্রের; তাদের আর্থিক নীতি, বিবেচনা ও বণ্টনও আলাদা হতে হবে। 'যেহেতু জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি (৫৬%) পূর্ব-পাকিস্তানে থাকে সে কারণে আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধাও তাদের অর্ধেকের বেশি পাওয়া উচিত'– এরূপ যুক্তি দিয়ে তাঁদের সমাধান চিন্তা তাড়িত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের তাত্ত্বিকরা অবশ্য পূর্বের দাবি মানতে এ কারণে নারাজ ছিলেন যে, কেন্দ্রীয় রাজস্বে পূর্বের অবদান মাত্র ২০ শতাংশ– সুতরাং তাদের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রেও সেই ছাপ থাকা অস্বাভাবিক নয়।

'টু ইকোনমি থিওরি'র একটি পদ্ধতিগত দুর্বলতা ছিল– পূর্বাঞ্চলের কৃষি সমাজের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের শিল্প পুঁজির দ্বন্দ্ব কিংবা পুরো পাকিস্তান জুড়ে শ্রেণি শোষণের ধারণাকে আড়াল করেই এই তত্ত্বটি বিকশিত হয়। একদিকে তাঁরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিকে 'টু ইকোনমি' বলছিলেন; আবার 'টু ইকোনমি'র সমাধান হিসেবে বলছিলেন 'টু নেশন'-এর সৃষ্টিকে। এই মতবাদে পুরো পূর্ব-পাকিস্তানকে 'শোষিত' হিসেবে ধরে নিয়ে 'শোষক' হিসেবে হাজির করা হয় পুরো পশ্চিম পাকিস্তানকে। এ বিষয়ে Ali Riaz লিখেছেন, `They transposed the class conflict on to the inter-nation level identifying the whole of the Bangladesh as `oppressed' and West Pakistan as `oppressor' `capitalist'.... দেখুন, *State, class and military rule in Bangladesh: 1972-1982*, University of Hawii, USA, 1993, p. 151.

উপরোক্ত 'টু ইকোনমি' মতবাদের ব্যাপক প্রচারের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান জুড়ে পুরানো কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপগুলোর সমাজ সম্পর্কিত নিজস্ব তাত্ত্বিক ভিত্তির আবেদন কমে গিয়েছিল তখন। যে অধ্যাপকরা তখন এই কাজটি করছিলেন তারাই অনেকে পাকিস্তান বিভক্তির পর জাসদের আলোচনা সভাগুলোতে সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কসীয় শ্রেণি ধারণাকে প্রয়োগ করছিলেন– যা ছিল বিস্ময়কর। কারণ তাঁদের অতীত 'থিওরি'টি সমাজ বিশ্লেষণের যে পদ্ধতিতে দাঁড় করানো হয়েছিল তার পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণেই যে একাত্তর-উত্তর হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম সে সত্যের কোন স্বীকৃতি দেখা গেল না তাঁদের একাত্তর-উত্তর বক্তব্যে, বরং এ সময় তাঁরা সব সমস্যার জন্য কেবল শেখ মুজিব ও তাঁর অনুসারীদের দায়ী করছিলেন। যেমনটি এই অধ্যাপকরা দায়ী করেছিলেন একাত্তর-পূর্ব সময়ে কেবল পশ্চিম পাকিস্তানিদের। মুজিব ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপর এই অধ্যাপকদের একাংশ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হওয়া মাত্র নিজেদের জন্য মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নিতে বিলম্ব করেননি। মুজিব শাসনামলে পরিকল্পনা কমিশনের এই অধ্যাপককুলের ব্যর্থ ভূমিকার ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য দেখুন, S. M. Ali, *After the dark night: Problems of Sheikh Mujibur Rahman*, UPL, 1994, p.108-129. উল্লেখ্য, আনিসুর রহমান ১৯৭৩-এর নভেম্বরে, রেহমান সোবহান ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বরে আর নূরুল ইসলাম ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি পরিকল্পনা কমিশন ছাড়েন। দেশ তখন দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত।

পার্টিগুলোর প্রথাগত আদলে গড়ে উঠছিল না। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল কমই। বহু দশক ধরে এতদাঞ্চলে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশেও সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট ঘরানার দলগুলোর সংগঠন যেভাবে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের জনপদে দীর্ঘ সংগ্রাম-সংগঠনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে, তাদের সংগঠনের যেরূপ বিশেষ শ্রেণিভিত্তি থাকে, মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব যেভাবে শ্রেণিচ্যুতির প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে দল পরিচালনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে দায়িত্ব পায়– জাসদের চর্চা ছিল তার চেয়ে ভিন্নতর। এর বড় প্রমাণ, স্রেফ ভারত বিরোধী লড়াকু একটা ইমেজের কারণে মেজর এম এ জলিল নতুন দলটির প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন। যদিও তিনি ছিলেন একজন সফল সেক্টর কমান্ডার, বীর মুক্তিযোদ্ধা– কিন্তু প্রথম আবির্ভাবেই একটি সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি হিসেবে তাঁর অভিষেক ছিল বিস্ময়কর। তাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুর রাজ্জাকের আসার সম্ভাবনা নাকচ হয়ে যাওয়ার পর জাসদ প্রথমে সভাপতি হিসেবে ড. আলীম আল-রাজিকে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি প্রস্তাবে রাজি হননি।[১৪০]

প্রথাগত বামপন্থী আদলের বাইরে এসে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে যেভাবে ছাত্রলীগের সিরাজপন্থী 'নিউক্লিয়াস' তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাফল্য পায় তারই পুনরাবৃত্তি আশা করছিলেন একই সংগঠকরা যুদ্ধ-পরবর্তী 'সমাজতন্ত্র'-এর সংগ্রামেও। যে কারণে 'মাল্টিক্লাস' ভিত্তি নিয়েই তাঁরা সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য শ্রেণি সংঘাতের দিকে এগোতে ছিলেন মরিয়া। ভিন্নমতও দেখা দেয় শিগগির। এ বিষয়ে জাসদের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মাহবুবুর রব সাদীর পর্যবেক্ষণ এ পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। তাঁর মতে, 'মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আওয়ামী লীগের পরিধি থেকে বেরিয়ে একটি ভিন্ন দল গড়ে তোলার সময় নির্ধারণে সিরাজুল আলম খান অনন্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সেই দলের আদর্শ নির্ধারণে তিনি পরিচয় দিয়েছেন চরম অপরিণত জ্ঞানের। তাঁর মাথায় ছিল রাশিয়ার ছক। কিন্তু বাংলাদেশে মানুষ তখনও বলশেভিক ধাঁচে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তখন নতুন দলের রাজনৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দেওয়া। গণতন্ত্র বিনির্মাণ করা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আত্মগত শর্ত তখন এ দেশে ছিল না। যে দেশে শ্রমিক শ্রেণিরই বিকাশ ঘটেনি সেখানে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কীভাবে হবে? তখন কোনোভাবেই বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক হতে পারে না। কিন্তু জাসদ সেই

---

১৪০ দেখুন, আ ও ম শফিক উল্লাহ ও অন্যান্য, *জাসদ-বাসদের ভ্রান্ত, দোদুল্যমান ও বিভ্রান্তিকর রাজনীতি প্রসঙ্গে*, ১৯৮১, পৃ. ১৪, ঢাকা। উল্লেখ্য, ঐ সময় রাজনৈতিক মহলে ধারণা করা হচ্ছিল, মেজর জলিল ভাসানী ন্যাপে যোগ দিতে যাচ্ছেন। কারণ 'জলিল তখন নানান পরিমণ্ডলে বলছিলেন যে, ভাসানী ও তাঁর ন্যাপ এ মূহূর্তে বাংলাদেশে একমাত্র *আশার আলো* এবং এটাই কেবল দেশপ্রেমিকদের প্লাটফর্ম হয়ে উঠতে পারে।' দেখুন, A party is born, Weekly *HOLIDAY*, November 7, 1972, Dhaka.

আওয়াজই দিল। সিরাজ ভাই কখনোই ভুল স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভিন্নমতও পাশ কাটিয়ে যেতেন।...আমরা যা করেছি মানুষ তা চায়নি। অনেক পরে আমার মনে হয়েছে মুজিবের ধ্বংস সাধনের জন্যই বোধহয় এসব হচ্ছিল।'[১৪১]

শুরুর মুহূর্তে– বিশেষ করে জাসদের পরিচয় যখনও কেবলি 'ছাত্রলীগের রব গ্রুপ'– তখন দলটির রাজনীতি ও সংগঠনসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এ দলের বাইরে বামপন্থী পরিমণ্ডলে সবচেয়ে সরাসরি তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলেছিলেন পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির সিরাজ সিকদার– দেশব্যাপী প্রচারিত দুটি দলিলের মাধ্যমে।[১৪২] এই দলিল দুটিতে তাঁর মন্তব্য ছিল প্রথমত, জাসদ মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা বললেও সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের কথা বলে না; সর্বহারার একনায়কতন্ত্র ছাড়া মার্কসবাদ ফ্যাসিবাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়; দ্বিতীয়ত, জাসদ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছে– অথচ পূর্ববাংলায় এখনো জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবই অসম্পন্ন; এরা আসলে মুজিববাদীদের উৎখাত করে কেবল ক্ষমতা দখল করতে চাইছে; তৃতীয়ত, জাসদ মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা বলছে– অথচ সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি ছাড়াই তারা এটা বলা শুরু করেছে, যা বিস্ময়কর! এটা শ্রেণি বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে দাঁড়াবে। এটা সর্বহারা শ্রেণীকে অপ্রস্তুত করে রাখার নামান্তর। চতুর্থত. শ্রেণি সংগ্রাম ও শ্রেণি রাজনীতির কথা বলার পরও জাসদকর্তৃক বিভিন্ন জেলায় অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়ার যথার্থতা নিয়েও প্রশ্ন করেন সিরাজ সিকদার। সবশেষে তিনি বলেন, জাসদের 'ভুল লাইন' এ দলের কর্মীদের সরকারের পেটোয়া বাহিনীগুলোর নিপীড়নের খোরাকে পরিণত করবে।

জাসদের 'লাইন' ভুল ছিল কি না– সেটা বিতর্কের বিষয় হলেও এই দলের প্রথম প্রজন্মের মেধাবী তরুণদের বিরাট সংখ্যক যে সেই সময়ে বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছিলেন তার সত্যতা তুলে ধরছে দলটির নিহত কর্মীদের বিশাল তালিকা– যার অসম্পূর্ণ একটি সংকলন এই গ্রন্থের সংযুক্তিতেও (১৫ তম) মুদ্রিত হলো। তবে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঐ কালো অধ্যায় একতরফা ছিল না।

---

১৪১ মাহবুবুর রব সাদী, *পূর্বোক্ত*।

১৪২ এই দলিল দু'টি ছিল: ক. 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল– ছাত্রলীগের রব গ্রুপের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন' (আগস্ট ১৯৭২) এবং খ. 'সমাজতন্ত্র, শ্রেণী সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লব প্রসঙ্গে' (অক্টোবর ১৯৭২), দেখুন, *সিরাজ সিকদার রচনা সংগ্রহ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ৩৫৯-৩৬১; ৩৫২-৩৭০।

৩.ঘ. মুজিব বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো ও 'অপারেশন মাউন্ট ঈগল'

> ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি শ্রী আর এন কাও এসময় (যুদ্ধকালে) আমার ঊর্ধ্বতন সিভিলিয়ান কর্মকর্তা ছিলেন। আওয়ামী লীগের যুব উইংয়ের নেতৃত্ব এবং খোদ সংগঠনটি সম্পর্কে বিস্তারিত গোয়েন্দা তথ্য জানার সুবিধা তাঁর হয়েছিল এবং তাঁরও গভীর উপলব্ধি ছিল, তিনি আমার তত্ত্বাবধানে যে যুবনেতাদের দিয়েছিলেন কেবল তাদের দ্বারাই *আসল কাজটি* হবে এবং তাদের *বিশেষ মর্যাদা* দেওয়া দরকার।
>
> –মেজর জেনারেল এস এস উবান, ফ্যান্টম্‌স্ অব চিটাগং[১৪৩]। উবান উল্লিখিত আর এন কাও ছিলেন 'র'-এর প্রধান। তাঁর সম্পর্কে ৩.খ উপ-অধ্যায়ে পরিচিতিমূলক তথ্য রয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থের পূর্ববর্তী আলোচনায় এক পর্যায়ে (২.ক) সংগঠনের প্রাক্তন নেতা আ স ম আবদুর রবের জবানিতে এমন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছাত্রলীগে তাঁদের 'নিউক্লিয়াস'-এর সদস্য সংখ্যা সত্তর সালের দিকে প্রায় সাত হাজারে উন্নীত হয়েছিল। তবে সেই একই সংগঠনের দ্বিতীয় দফা সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে 'মুজিব বাহিনী'র কাঠামো ও সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে তদ্রুপ সুস্পষ্ট তথ্য জানা যায় না। একজন আঞ্চলিক সংগঠক অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরীর বর্ণনা অনুযায়ী[১৪৪]এই বাহিনীর নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আমীর হোসেন আমু, শেখ সেলিম, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, আব্দুল হামিদ, আ স ম রব, নূর আলম জিকু, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, শাজাহান সিরাজ, আ ফ ম মাহবুবুল হক, মনিরুল ইসলাম, মঈনউদ্দিন খান বাদল, আফতাব আহমাদ, স্বপন চৌধুরী (যুদ্ধকালে চট্টগ্রামে শহীদ), মনিরুল হক চৌধুরী, হাসানউদ্দিন সরদার প্রমুখ। এর মধ্যে প্রথম চার জনকে মুখ্য শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এর পরে আ স ম আব্দুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন ও শাজাহান সিরাজ– এই চার জনকে মুখ্য শক্তির মূল শক্তিভিত হিসেবে 'চার খলিফা' উল্লেখ করা হতো। উল্লেখ্য, তোফায়েল আহমেদ ও আ স ম আব্দুর রবের পরে ১৯৭০ সালে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ যথাক্রমে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন।

---

১৪৩ এস এস উবান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১।

১৪৪ বিস্তারিত দেখুন, আবদুল মান্নান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিব বাহিনী*, বৈশাখী প্রকাশনী, ১৯৯৮, ঢাকা।

'টিম' হিসেবে মুজিব বাহিনীর উপরোক্ত নেতৃত্ব যুদ্ধকালে চারটি আঞ্চলিক কাঠামোতে বিন্যস্ত ছিল। প্রধানত চট্টগ্রাম বিভাগ নিয়ে গঠিত পূর্বাঞ্চলের প্রধান ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি; সিলেট ও ময়মনসিংহে একাংশ নিয়ে গঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান করা হয় আবদুর রাজ্জাককে; দিনাজপুর ও রংপুর নিয়ে গঠিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং ফরিদপুর-যশোর-রাজশাহী নিয়ে গঠিত পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান ছিলেন যথাক্রমে সিরাজুল আলম খান ও তোফায়েল আহমেদ। এর মধ্যে ফজলুল হকের সঙ্গে সহকারী হিসেবে ছিলেন আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আবদুল মান্নান চৌধুরী, সৈয়দ রেজাউর রহমান, এম এ রশিদ, আবদুল মান্নান মজুমদার প্রমুখ। আব্দুর রাজ্জাকের প্রধান সহকারী ছিলেন সৈয়দ আহমদ ও শাজাহান সিরাজ; সিরাজুল আলম খানের প্রধান সহকারী ছিলেন মনিরুল ইসলাম; তোফায়েল আহমেদের সঙ্গী ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ, নূর আলম জিকু, নূরে আলম সিদ্দিকী প্রমুখ। অন্যদিকে শাজাহান সিরাজ মুজিব বাহিনী ও অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের মধ্যে যোগাযোগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন কাজী আরেফ আহমেদ।[১৪৫] ঢাকায় মুজিব বাহিনীর পক্ষে সামরিক অপারেশনের নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিমাঞ্চলের জন্য মোস্তফা মহসিন মন্টু, পূর্বাঞ্চলের জন্য কামরুল আলম খান খসরু।[১৪৬] সাধারণভাবে প্রায় প্রতি জেলাতেই বিএলএফ একজনকে মুখ্য

---

১৪৫ দেখুন, কাজী আরেফ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*। সিরাজুল আলম খানের জীবন ও আদর্শকে ভিত্তি করে রচিত একটি গ্রন্থে সম্প্রতি উল্লেখ পাওয়া যায়, 'মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকে সম্ভাব্য সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধকে হিসাবে রেখে স্বাধীনতা পূর্বকালে গঠিত সিরাজ-রাজ্জাক-আরেফ এর 'নিউক্লিয়াস' *জয়বাংলা বাহিনী* নামে একটি 'সামরিক উইং'ও গড়ে তুলেছিল। যার কমান্ডার ছিলেন আ স ম আব্দুর রব এবং ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন কামরুল আলম খান খসরু। ছাত্রীদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল 'নারী ব্রিগেড' যার প্রধান ছিলেন মরহুম মমতাজ বেগম। সত্তরের সাতই জুন উপরোক্ত 'জয়বাংলা বাহিনী'ই সিরাজদের নকশাকৃত সম্ভাব্য স্বাধীন দেশের পতাকা মুজিবের হাতে তুলে দেয়। দেখুন: *সিরাজুল আলম খান-এর দর্শন ও চেতনালোক*, কামাল উদ্দিন আহমেদ, ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক, ঢাকা, ২০১০। উল্লেখ্য, শ্লোগান হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে 'জয়বাংলা' প্রথম উচ্চারিত হয় ১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারী সিরাজুল আলম খান কর্তৃক ঢাকার পল্টনে আওয়ামী লীগের এক জনসভায়। ভারতের 'জয়হিন্দ' শ্লোগানের ভাবদর্শিক প্রভাব ছিল এক্ষেত্রে। একই প্রভাবে তখন সিন্ধুতেও 'জিয়েসিন্দ' শ্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে। ছাত্রলীগে এই শ্লোগানটির চর্চা এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আফতাব আহমাদ ও চিশতি হেলালুর রহমানেরও প্রভাবক ভূমিকা ছিল।

দেখুন, https://www.facebook.com/pages/সিরাজুল-আলম-খান-পাঠ-চক্র-Serajul-Alam-Khan-Study-Circle/545285015495471?ref=ts&fref=ts (২৮ মে ২০১৩)। উল্লেখ্য, সিরাজুল আলম খান পাঠচক্রের উপরোক্ত সূত্রে এও জানা যায়, সিরাজুল আলম খান গ্রুপ কর্তৃক 'জয়বাংলা' শ্লোগান দেয়ার কারণে ছাত্রলীগে তাঁদের বিরোধী গ্রুপ মুজিবের কাছে এ বিষয়ে নালিশ করেছিল।

কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। যেমন চট্টগ্রামে বিএলএফ প্রধান ছিলেন মাহফুজুর রহমান, সিলেটে আখতার আহমদ, কুমিল্লায় সৈয়দ রেজাউর রহমান, নোয়াখালীতে মাহমুদুর রহমান বেলায়েত, খুলনায় কামরুজ্জামান টুকু, বরিশালে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, মানিকগঞ্জে মফিজুল ইসলাম খান কামাল, টাঙ্গাইলে খন্দকার আবদুল বাতেন, ময়মনসিংহে সৈয়দ আহমদ, ফরিদপুরে শাহ আবু জাফর প্রমুখ।

আলোচ্য বাহিনীর অন্যতম সংগঠক মনিরুল ইসলাম জানাচ্ছেন, মে মাসের শেষ নাগাদ তাঁদের প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। প্রশিক্ষণে যাওয়া এবং ফিরে এসে বাংলাদেশে প্রবেশের আগে 'অপেক্ষা' করার জন্য বিএলএফ-এর চারটি আঞ্চলিক 'ঘাঁটি' বা ক্যাম্প ছিল ভারতের অভ্যন্তরে (ব্যারাকপুর, পাঙ্গা, তুরা এবং আগরতলা)। যুদ্ধ শুরু হওয়ার ৪-৫ মাস পরে মুজিব বাহিনীর যোদ্ধাদের বাংলাদেশে প্রবেশ শুরু হয়। দ্রুতই তারা প্রায় সকল জেলাতে নিজেদের পৃথক সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে ফেলে। এসব কাঠামোর সদস্যরা অধিকাংশ ছিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া সংশ্লিষ্ট জেলার বা ভিন্ন জেলার শহুরে তরুণ।

ভারতের কাছ থেকে সামরিক সরঞ্জাম পাওয়ার ক্ষেত্রে মুজিব বাহিনী ছিল বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী। মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান এ কে খন্দকার বলছেন, 'একটি বিষয় লক্ষ্য করেছিলাম, তারা (মুজিব বাহিনী) যখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে আসছিল, তখন তাদের কাছে আমাদের সাধারণ গেরিলা যোদ্ধাদের তুলনায় অনেক বেশি এবং উন্নত মানের সমরাস্ত্র রয়েছে। পরে শুনেছি, উন্নত মানের অস্ত্র দেওয়ার বিষয়টি ভারত সরকারের অনুমতি নিয়েই করা হয়েছে।'[১৪৭] তবে ভিন্ন একটি ভাষ্য বলছে, গুণগতভাবে উন্নত অস্ত্র দেওয়া হলেও দেশের অভ্যন্তরে একেবারে নিম্নস্তরের কর্মী পর্যন্ত সেই অস্ত্রের বিস্তৃতি ছিল না। তৃণমূলে কর্মী সংগ্রহ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে চললেও তাদের হাতে কম ক্ষেত্রেই ঐ ধরনের উন্নত অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল।[১৪৮]

ভারতে বিএলএফ-এর সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির ছিল দু'টি– উত্তর প্রদেশের দেরা দুনে এবং আসামের হাফলঙে। মুজিব বাহিনীর সদস্যরা সবচেয়ে বেশি

---

১৪৬ শেখ মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স*, অংকুর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৬।

১৪৭ এ কে খন্দকার ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

১৪৮ মুক্তিযোদ্ধা নঈম জাহাঙ্গীরের সাক্ষাৎকার। ২০১২ সালের ১৬ মে এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি প্রথমে জেড ফোর্সে এবং পরে কর্নেল তাহেরের সঙ্গে ১১ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ পরবর্তীকালে যেহেতু তিনি আওয়ামী লীগ কিংবা জাসদ কোনো পক্ষেই যুক্ত ছিলেন না সে কারণে মুজিব বাহিনী সম্পর্কিত মতামতের জন্য নেতৃস্থানীয় এই মুক্তিযোদ্ধাকে বাছাই করা হয়। নঈম জাহাঙ্গীর পরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন।

সংখ্যায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন দেরা দুনে। যে কারণে দেরা দুনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যতটা আলোচিত হাফলঙের ততটা নয়। হাফলঙও ছিল দেরা দুনের মতোই পাহাড়ি এলাকা। আসামের উত্তর কাছাড়ের দিয়াং নদী সংলগ্ন এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে যোগাযোগের মূল মাধ্যম ট্রেন। দেরা দুনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কাছ থেকে জানা যায়, প্রতিটি ব্যাচকে সাধারণভাবে ৪৫ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। প্রথম ব্যাচে প্রায় ২০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়– যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় সংগঠক। এই ব্যাচের নেতৃত্বে ছিলেন নূর আলম জিকু। এ ব্যাচের একজন প্রশিক্ষণার্থী যিনি বর্তমানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক– নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, সাধারণভাবে মুজিব বাহিনীতে প্রশিক্ষণার্থীদের দুটি ক্যাটেগরিতে ভাগ করে দুটি কেন্দ্রে পাঠানো হতো। যেসব প্রশিক্ষণার্থীকে অধিক 'বিশ্বাসযোগ্য' মনে করা হতো তাদের পাঠানো হতো দেরা দুনের কেন্দ্রে। আর যাদের ভবিষ্যৎ বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যেত না তাদের হাফলঙে পাঠানো হতো। মুজিব বাহিনীর আরেক পরিচিত সংগঠক অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী অবশ্য লিখেছেন, দেরা দুনে প্রশিক্ষণ হতো 'সিনিয়র লিডার'দের এবং হাফলঙে হতো 'জুনিয়র লিডার'দের। উভয় কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ছিল উন্নতমানের ব্যবস্থাপনা– প্রবাসী সরকারের অধীনস্ত মুক্তিবাহিনীর সাধারণ সদস্যরা যা কখনোই পায়নি। হাফলঙে দ্বিতীয় ব্যাচে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাব উদ্দীন সাথীও আবদুল মান্নান চৌধুরীর বক্তব্য সমর্থন করেছেন। তবে তাঁর মতে, প্রথম দিকে যদিও সিদ্ধান্ত ছিল দেরা দুনে নেতৃস্থানীয়দের এবং হাফলংয়ে পরবর্তী স্তরের সংগঠকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে– কিন্তু এ নিয়ে শেষোক্ত স্থানের প্রশিক্ষণার্থীরা প্রতিবাদ করায় পার্থক্যসূচক পরিকল্পনাটি বাদ দেওয়া হয়। সাথী অবশ্য এও জানিয়েছেন, দেরা দুনের প্রশিক্ষণের ধরন ছিল রাজনৈতিক ধাঁচের– আর হাফলংয়ে প্রশিক্ষণের ধরন ছিল পুরোপুরি সামরিক চরিত্রের।[১৪৯] দেরা দুনের প্রথম ব্যাচের আরেকজন প্রশিক্ষণার্থী আ ন ম শফিক উল্লাহ্ জানাচ্ছেন, 'প্রশিক্ষণকালে যথেষ্ট পকেটমানিও দেওয়া হতো।' পঞ্চম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী জিয়ারুল ইসলাম জানিয়েছেন, সাধারণভাবে তাদের খাবারের মানও ছিল অত্যন্ত উন্নত।[১৫০]

---

১৪৯ সাহাব উদ্দীন সাথী'র এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় ২০১৩ সালের ২৩ এপ্রিল– ঢাকায়। যুদ্ধকালে সাথী বিএলএফ-এর ইস্টার্ন কমান্ডের অধীনে মূলত কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম এলাকায় নিয়োজিত ছিলেন।

১৫০ *অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার*। আ ন ম শফিক উল্ল্যাহ-এর সাক্ষাৎকার ধারণ করা হয় ২০১৩ সালের ১৩ জুলাই ঢাকার হাতিরপুলে; অন্যদিকে জিয়ারুল ইসলামের সাক্ষাৎকার ২০১৩ সালের ৯ অক্টোবর ঢাকার মোহাম্মদপুরে ধারণকৃত। জিয়ারুল ইসলাম জানিয়েছেন,

মুজিব বাহিনীর প্রতি ভারতীয় বিশেষ কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যের নানান রূপ ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এইরূপ সুদূরপ্রসারী আনুকূল্যের তথ্যাদি বিশেষ তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে যখন সাম্প্রতিক এ সত্য তার সঙ্গে যুক্ত হয় যে, 'পূর্ব-পাকিস্তানের এই গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য' মুজিবনগর মন্ত্রিসভা গঠনের আগেই ভারত সিআইএ-এর কাছে অস্ত্র প্রার্থনা করেছিল।[১৫১]

এইরূপ তথ্য থেকে ধারণা করা যায়, পাকিস্তানকে দ্বি-খণ্ডিত করার বিষয়ে ভারত একাত্তরের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্ব থেকে দেশে-বিদেশে সামরিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিল। ভারতীয় এইরূপ প্রকল্পে সিআইএ'র সংশ্লিষ্টতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে থাকবে উপরে উল্লিখিত ছাত্র-যুবনেতাদের তীব্র কমিউনিস্ট বিদ্বেষ– যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকে যা ছিল খুবই প্রকাশ্য। যুদ্ধপূর্ব সেই সময়কার উত্তাল দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রও যে *পূর্ব-পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট উপাদান যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন* ছিল তার প্রমাণ মেলে পাকিস্তান দূতাবাস থেকে ওয়াশিংটনে পাঠানো তাদের নিম্নোক্ত গোপন বার্তায় :

> The indiscriminate pillage, execution, collective punishment and molestation which appears to have characterized the Army's operations in certain areas of East Pakistan- against Muslims as well as Hindus- might have created a psychological climate where fear only barely submerges a desire for revenge on the part of some peasants personally affected by the Army's actions. The Army may have by inadvertence and maladroitness created the `water' in which the Mukti Fauj can swim, to use Mao's analogy.[১৫২]

যুদ্ধকালে মুজিব বাহিনীর সঙ্গে বা ভারত বহির্ভূত বিদেশি উৎসের সংশ্লিষ্টতা আঁচ করা হয় এর সদস্যদের ব্যবহৃত অস্ত্রের ধরন দেখেও। এ বিষয়ে মঈদুল হাসান ও এ কে খন্দকারের সূত্রে পাওয়া বক্তব্য ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে একই বিষয়ে মুজিব বাহিনীর একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী শামসুদ্দীন আহমেদ-এর বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। যুদ্ধকালে শেখ মণি'র সঙ্গে কাজ করলেও জাসদ গঠনের পরে তিনি এই দলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও পাঠক তার মধ্যে চিন্তার অনেক খোরাক পাবেন।

প্রাথমিকভাবে তাদের প্রশিক্ষণকাল আট সপ্তাহ বলা হলেও কার্যত তা ছিল ৩৭ দিনের; তবে পূর্ববর্তী ব্যাচগুলোতে প্রশিক্ষণ আরও দীর্ঘ ছিল।

১৫১ এ কে খন্দকার ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪।

১৫২ *The American Papers: Secret and Confidential*, India-pakistan-Bangladesh Documents 1965 to 1973, Compiled and selected by Roedad khan, Oxford, 1999, New York, P. 616.

"...আমি হাফলংয়ে ট্রেনিং নিয়েছি। এলিট বাহিনীর মতো...সেখানে সবাই ছিল মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। আমাদের ইন্সট্রাক্টররা 'আপনি' করে বলতেন। পৃথক পৃথক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল চমৎকার। অনেক উইপন্স...অটোমেটিক যেগুলো...সেগুলোর প্রশিক্ষণ নিয়েছি। পরে এসে দেখি অন্যান্য, এমনকি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনেকেও এসব উইপন্সের নামও কখনও শোনেনি। মাঠ পর্যায়ে আমরা এসকেএস (Self-loading Carbine of (the) Simonov system] নামের রাইফেল ব্যবহার করতাম। আমাদের সবার কাছে এই রাইফেল ছিল। আমরা যখন দেশের ভিতরে ঢুকছি আমাদের সঙ্গে ইন্ডিয়ার আর্মির বেশ কিছু সোলজারও ঢুকলো। তারা দেখলাম আমার উইপনের...মানে দেখা তো দূরের কথা নামই জানতো না। বললো, এতনা খুব সুরত...। আমি বললাম, এটা তো ইন্ডিয়ার। ওরা বলছে, না, না, এটা ইন্ডিয়ার নয়।"[১৫৩]

প্রকৃতই ঐ অস্ত্রগুলো ভারতীয় ছিল না। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, জেনারেল উবানের প্রকল্পটি একই সঙ্গে ছিল ভারতীয় এবং পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেরও। মুজিব বাহিনীর যোদ্ধাদের অস্ত্রগুলোও তাই অত্যন্ত উন্নত মানের থাকাটা অস্বাভাবিক ছিল না। তিব্বতকে 'উদ্ধার', কমিউনিস্ট গণচীনকে প্রতিরোধ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা, মিজো ইত্যাদি র‍্যাডিক্যাল স্বাধীনতাপন্থীদের ধ্বংসের জন্য জেনারেল উবানের পূর্বতন কর্মস্থল 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স' গঠিত হলেও একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে মাও সেতুঙের আদর্শে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশাল আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় কমিউনিস্ট আদর্শের প্রভাব নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল যুগপৎ দিল্লির শক্তিশালী একটি মহল এবং যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। পরে তিব্বত উদ্ধারের আশা ত্যাগ করে উবানের স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতাপন্থীদের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিপ্লবের দিকেই মূল মনোযোগ দেয়। এই প্রকল্পে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের অন্যতম উৎস ছিল সিআইএ। এই বিষয়ে ইতোমধ্যে আমরা ৩.খ উপ-অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি। এ পর্যায়ে বাড়তি শুধু এটাই বলা যায়, ১৯৫০-এর পর থেকে তিব্বত নিয়ে চীনে যে সংকট তৈরি হয় তার ফলে অত্র অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ বিশেষভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল। তিব্বতি বৌদ্ধদের আধ্যাত্মিক নেতা দালাইলামা সেসময় ১৯৫৯ সালের ৩১ মার্চ সিআইএ'র প্রশিক্ষিত এক দল গেরিলার সহায়তায় তিব্বত থেকে পালিয়ে ভারতে চলে আসেন। এরপর ১৯৬২ সালের অক্টোবরে চীন-ভারত যুদ্ধ বাঁধে। উপরোক্ত দুটি ঘটনার পর চীনকে মোকাবেলায় ভারতীয় গোয়েন্দা

---

১৫৩ শামসুদ্দিন আহমেদ-এর সাক্ষাৎকারের জন্য দেখুন, আফসান চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*।

বাহিনীসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তা সুসংহত করার জন্য সিআইএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। তারই অংশ হিসেবে 'চীনের ভেতরে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালানোর জন্য' এসময় তিব্বতি শরণার্থী তরুণদের নিয়ে সিআইএ বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেয়– যে বাহিনীর নাম ছিল *স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স* বা এসএফএফ। আকাশে নজরদারির ক্ষেত্রে এই ফোর্সকে সহায়তার জন্য তখন সৃষ্টি হয় আরেকটি সংস্থা 'এভিয়েশান রিসার্স সেন্টার' বা এআরসি। প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর দুটি ছোট বিমান দিয়ে শুরু হয় এআরসি'র কার্যক্রম। এসএফএফ-এর অধীনে প্রশিক্ষিত অনেককে পরে চীনের ভেতরেও পাঠানো হয়। চীন বিরোধী সামগ্রিক সহযোগিতার পাশাপাশি এসময় তিব্বত নিয়ে একসঙ্গে কাজের একটি কাঠামোও গড়ে তোলে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আইবি এবং সিআইএ। আইবি'র পক্ষ থেকে তৎকালীন চিফ ভোলানাথ মল্লিক[১৫৪] এক্ষেত্রে খুবই উদ্যোগী ভূমিকা নেন। তখনও 'র' গঠিত হয়নি। পরে 'আইবি' ভেঙে 'র' সৃষ্টির পর এসএফএফ তাদের কর্তৃত্বে চলে আসে। সিআইএ এবং 'র' মিলে তিব্বতি উপজাতি তরুণদের প্রশিক্ষণের জন্য উত্তরখণ্ডের দেরা দুন জেলার চাকরাতা নামের পাহাড়ি ক্যান্টনমেন্ট শহরটিকে কাজে লাগানো হয়। চাকরাতা শহরটি হিমাচল প্রদেশের একেবারে সীমান্ত ঘেঁষা। এই হিমাচল প্রদেশেই রয়েছে তিব্বতের প্রবাসী সরকার এবং দালাইলামার বাসস্থান। চাকরাতায় তিব্বতিদের প্রশিক্ষণের জন্য কাঠামোগত সহায়তার পাশাপাশি সিআইএ সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করত। এমনকি সিআইএ'র

---

১৫৪ ভোলানাথ মল্লিক ভারতীয় গোয়েন্দা জগতের 'পিতামহ' হিসেবে পরিচিত। আইবি (IB) নামে পরিচিত ভারতের প্রাচীন গোয়েন্দা কাঠামোটির প্রথম পরিচালক তিনি। নেহেরুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। চৌদ্দ বছর তিনি আইবি'র পরিচালক ছিলেন। তাঁর সময়ই সিআইএ-এর সঙ্গে ভারতের গোয়েন্দা জগতের যৌথ কার্যক্রমের গোড়াপত্তন। 'ঠান্ডাযুদ্ধ'-এর মাঝেই ভারত-মার্কিন এই সহযোগিতা ঘটে– যদিও বিশ্ববাসী তখন জানত, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর মাঝেও সিআইএ ও আইবি'র যৌথ কার্যক্রম বিকশিত হয় মূলত কমিউনিজম প্রতিরোধে উভয়ের আন্তরিক ইচ্ছার কারণে। ভোলানাথ মল্লিক যখন আইবি'র পরিচালক তখন রাম নাথ কাও ছিলেন আইবি'র অঙ্গ সংস্থা এভিয়েশন রিসার্স সেন্টার– এআরসি'র পরিচালক। এসময় দিল্লিতে সিআইএ-এর স্টেশন প্রধান ছিলেন ডেভিড ব্লিঈ। উপরোক্ত এআরসি'র জন্ম সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর সহায়তায়। পরে এআরসি'র রাম নাথ কাও-এর নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয় রিসার্স এন্ড এনালাইসিস উইং ('র') নামের বহুল পরিচিত গোয়েন্দা সংস্থা এবং সিআইএ ও ভারতের মধ্যকার তাবৎ কার্যক্রমের দায়িত্ব নিয়ে নেয় কাওয়ের 'র'। আগ্রহীরা এসব বিষয়ে আরও দেখুন, B N Mallik, *Chinse Betrayal: My year with Nehru*, Allied Publishers, 1971; http://www.american-buddha.com/cia.secret.war.oaktree.htm; এবং M.S. Kohli and Kenneth Conboy, *Spies in the Himalayas: Secret Missions and Perilous Climbs*, Harpercollins, India, 2003.

প্যারামিলিটারি অফিসাররা প্রশিক্ষণে উপদেষ্টা হিসেবেও ভূমিকা রাখতেন। এখানে তান্দুয়া নামেও একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল। এসব প্রশিক্ষণস্থলে প্রশিক্ষণার্থীরা অত্যাধুনিক M1, M2 ও M3 কারবাইন ব্যবহার করত। মুজিব বাহিনীও অনুরূপ বা সমমানের অস্ত্র ব্যবহারের জন্য পেয়েছিল। মুজিব বাহিনী যেসব প্রশিক্ষণ অবকাঠামো ব্যবহারের সুযোগ পায় তা আসলে তিব্বতি কমান্ডোদের জন্য সিআইএ কর্তৃক বিনিয়োগ করা ছিল। আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের পরিবহন কাজে ব্যবহৃত বিমানগুলো ছিল এসএফএফ-এর অধীনস্ত 'এআরসি' সংস্থার। সিআইএ'র সহায়তায় এআরসি'র গঠন-কাহিনী ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫৫]

উল্লেখ্য, জেনারেল উবানকে এসএফএফ নামে গঠিত উপরোক্ত তিব্বতি গেরিলা বাহিনীরই ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজি) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। আইজি'র উর্ধ্বতন পদ হচ্ছে ডিজি ('র')। উবান যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে '২২-মাউন্টেন ব্রিগেড'-এ ছিলেন সে কারণে তাঁর নতুন গেরিলা দল– অর্থাৎ এসএফএফ-কে 'এস্টাবলিশমেন্ট ২২' নামেও অভিহিত করা হতো। অনেকে একে 'টু-টু'ও বলতেন। আটটি ব্যাটালিয়নের অধীনে ৬৪টি কোম্পানি ছিল এর। সিআইএ'র সহায়তায় ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানো হলেও অপ্রচলিত সামর্থ্যের এই গেরিলা দলের শক্তি কখনোই যুদ্ধক্ষেত্রে পরীক্ষিত ছিল না। কখনোই চীনে ঢোকার সুযোগ পায়নি তারা। সে কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত এই বাহিনীর শক্তি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়। যেহেতু এসএফএফ ভারতীয় নিয়মিত বাহিনীর অধীনস্থ ছিল না এবং এটা 'ভারতের স্বার্থ'-এর জন্য নয়, 'তিব্বতের স্বার্থ'-এর জন্য সৃষ্ট– সে কারণে প্রথম দিকে এসএফএফ-এর নেতৃস্থানীয় তিব্বতি যোদ্ধারা বাংলাদেশে আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পরে 'র' প্রধান আর এন কাও হিমাচলের ধর্মশালায় গিয়ে এ বিষয়ে প্রবাসী তিব্বতি সরকারকে চাপ প্রয়োগে রাজি করান। এসময় ইন্দিরা গান্ধী তিব্বতি গেরিলাদের বাংলাদেশে পাঠানোর আগে দালাইলামার সঙ্গেও কথা বলেন সম্মতির জন্য। প্রথমত, শক্তি পরীক্ষা এবং দ্বিতীয়ত, এই বাহিনীকে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মিজো ও নাগা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে তিব্বতি কমান্ডোদের প্রায় তিন হাজার সদস্যকে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি ১৯৭১ সালের নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিজোরামের দেমাগিরি দিয়ে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢোকানো হয়। এই অপারেশনের প্রতীকী নাম ছিল 'মাউন্ট ঈগল'।

---

[১৫৫] নেহেরুর আমলে ভারত-সিআইএ'র তিব্বতকেন্দ্রিক বিমানভিত্তিক গোয়েন্দাগিরির বিষয়ে ২০১৩ সালে আরও কিছু চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। দেখুন, http://www.business-standard.com/article/international/nehru-permitted-cia-spy-planes-to-use-indian-air-base-113081600225_1.html (retrieved on 18-08-2013)

প্রথমে তিব্বতি যোদ্ধাদের উত্তর প্রদেশ থেকে বিমানে করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে গাড়িতে করে নেয়া হতো মিজোরামের দেমাগিরিতে। তারপর তারা বিভিন্নপথে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবেশ করে।[১৫৬] এই সফল অভিযানে এসএফএফ-এর হাতে নিজেদের গেরিলা অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে মিজো ও নাগারা পরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আপসমূলক চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উবানের এই স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার্সদের অন্যতম অধিনায়ক (সিআইএ প্রশিক্ষিত) Dhondup Gyatotsang মারা গিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম অপারেশনে এসএফএফ-এর তিনটি ইউনিট অংশ নেয়। প্রত্যেকটির নেতৃত্বে ছিলেন একজন তিব্বতি (যাকে বলা হতো 'Dapon' বা ব্রিগেডিয়ার) এবং একজন ভারতীয় কর্নেল। Dhondup Gyatotsang ছিলেন ঐরূপ একজন 'Dapon'. যিনি তিব্বতি গেরিলাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অন্যতম সুপরিচিত যোদ্ধা ছিলেন। এইরূপ আরেকজন 'Dapon' ছিলেন Ratuk Ngawang. ২০১১ সলের ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ৮৪ বছর বয়সে প্রকাশিত তাঁর এক সাক্ষাৎকারে তিনি মুজিব বাহিনী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানান,

> They later acted as our guides and contact persons during the war though they did not actually fight with us. Though it us who fought the real war and suffered the casualties, all the credit has later been given to the Mujib Bahinis (because the Tibetan Force was involved under the guise of the Mujib Bahinis).[১৫৭]

পার্বত্য চট্টগ্রাম অপারেশনে মুজিব বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে একাত্তরের ১২ নভেম্বর থেকে পরবর্তী ২৮ দিনে অন্তত ৪৯ জন তিব্বতি কমান্ডো মারা যান (ভিন্নমতে ৫৬ জন[১৫৮]) এবং ১৯০ জন আহত হন। মূলত এরাই পাকিস্তান

---

১৫৬ উল্লেখ্য, দেমাগিরির অবস্থান বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের একেবারে সীমান্তবর্তী। একসময় দেমাগিরি পার্বত্য চট্টগ্রামেরই অংশ ছিল এবং কাপ্তাই লেক দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। বর্তমানে এ স্থানটি 'তেন্নবাং' নামে পরিচিত। মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে এটা প্রায় ৩৩২ কিলোমিটার দূরবর্তী।

১৫৭ দেখুন, http://claudearpi.blogspot.com/2011/12/war-which-was-not-theirs.html (retrieved on 18-09-2013). এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন Claude arpi. উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক পরিসরে তিব্বত বিষয়ে Claude arpi হলেন একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক। বর্তমান সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় Ratuk Ngawang দিল্লির মজনু-কা টিলার তিব্বতি কলোনিতে বসবাস করছিলেন।

১৫৮ ভারতীয় নিরাপত্তা বিশ্লেষক Praveen Swami এক লেখায় দাবি করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে এসএফএফ-এর অপারেশন শুরু হয়েছিল ৩ ডিসেম্বর এবং তাতে ৫৬ জন অফিসার ও সৈনিক নিহত হয়েছিল। দেখুন: Praveen Swami, *Ibid.*

সেনাবাহিনীর ৯৭ ইনডিপেন্ডেন্ট বিগ্রেড ও ২ নম্বর কমান্ডো ব্যাটালিয়নকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিব্বতি কমান্ডোদের এইরূপ ভূমিকা সম্পর্কে কেবল বাংলাদেশে নয় ভারতীয় জনসমাজেও সব ধরনের আলোচনা চেপে যাওয়া হয়। এটাকে 'মোস্ট সিক্রেট' বিষয় হিসেবে দেখা হয় সেখানে। যে কারণে, ভারত বাংলাদেশের যুদ্ধে সাহসী ভূমিকার জন্য উবানের এসএফএফ বাহিনীর ৫৮০ জন সদস্যকে কোনো ধরনের পদক দিয়ে নয়– নগদ মুদ্রা দিয়ে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছে। তিব্বতি এসএফএফ-এর পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিযান উদযাপন করতে ঐ সময় 'র' প্রধান আর এন কাও স্বয়ং সেখানে চলে এসেছিলেন। এভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও গোপন সামরিক অভিযানের এক মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

ভারত ও সিআইএ কর্তৃক তিব্বতি গেরিলাদের উপরোক্ত ব্যবহারকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের নীরব ভূমিকার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হয়। কারণ পুরো বিষয়টি চীনের নজরদারির বাইরে ছিল না।[১৫৯] উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উপরোক্ত ভূমিকার কারণেই 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স'কে ভারতীয় সামরিক পরিমণ্ডলে 'ইন্দিরা গান্ধীর নিজস্ব ফোর্স' হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং এই ফোর্সকে নিয়েই লেখা হয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি পাওয়া যুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস 'ড্রাগন ফায়ার।'[১৬০] এ পর্যায়ে আরও উল্লেখ্য যে, এসএফএফ-এর উপরোক্ত অভিযানের প্রতীকী নাম যে 'মাউন্ট ঈগল' রাখা হয়েছিল সেটাও তাৎপর্যহীন ছিল না– কারণ Bald Eagle সচরাচর যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রতীক হিসেবেই তুলে ধরা হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে এবং মুজিব বাহিনীর কার্যক্রমের আড়ালে 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স'-এর উপরোক্ত তৎপরতা উপমহাদেশের ইতিহাসে কিছুটা অভিনব হলেও আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রায় প্রত্যেক মহাদেশ জুড়ে এইরূপ প্রকল্পের বহু নজির রয়েছে। এক্ষেত্রে আফ্রিকার 'ইউনিটা', দক্ষিণ আমেরিকার 'কন্ট্রা' এবং এশিয়ায় 'তালিবান'দের দৃষ্টান্তের উল্লেখ্য করা যায়। উপরোক্ত প্রত্যেকটি উদ্যোগে সিআইএ জড়িত থাকলেও তার স্থানীয় শক্তিশালী অংশীদারও ছিল। যেমন UNITA (National Union for the Total Independence of Angola) গড়ার কাজে সিআইএ দক্ষিণ আফ্রিকার সহায়তা পায়। Contra Militia-দেরও স্রষ্টা তারা এবং সেক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল আর্জেন্টিনার গোয়েন্দা সংস্থা এসআই। হন্ডুরাসে ছিল এদের ঘাঁটি। আফগানিস্তানে Taliban-দের তৈরির

---

১৫৯ উপরোক্ত বিষয়ে আরও বিবরণের জন্য দেখুন, Wikipedia.org/wiki/Special_Frontier_Force.

১৬০ ২০০০ সালের ২৪ আগস্ট এটি প্রকাশিত হয় ব্রিটেন থেকে। লেখক বিবিসির খ্যাতনামা সংবাদদাতা Humphrey Hawksley.

ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকায় ছিল পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং তাকে সামরিক সহায়তা দেয় সিআইএ ও আর্থিক সহায়তা দেয় সৌদি আরব। অন্যদিকে UNITA-কে ব্যবহার করা হয় পর্তুগালের কবল থেকে এঙ্গোলাকে মুক্তকারী MPLA (People's Movement for the Liberation of Angola)-এর বিরুদ্ধে। Contra-দের গড়া হয় নিকারাগুয়ার সান্ডানিস্টা বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য। Taliban-দের ব্যবহার করা হয় মোহাম্মদ নজিবুল্লাহ'র সোভিয়েত সমর্থিত সরকারকে উৎখাত করতে। উপরোক্ত তিনটি প্রকল্পই গড়ে তোলা হয় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রথাগত মার্কসবাদীদের পর্যুদস্ত করার জন্য– বিএলএফ-এর গঠনকালীন রাজনৈতিক প্রণোদনার সঙ্গে যার আশ্চর্যরকমের মিল।[১৬১]

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, একাত্তরের যুদ্ধকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুজিব বাহিনীকে সামনে রেখে ভারতীয় এসএফএফ যা করেছে তা পুরোদস্তুর এক ধরনের covert operation মাত্র। covert operation-এর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞার আলোকেই এটা বলা যায়। যেমন উইকিপিডিয়াতে বলা হচ্ছে covert operation হলো,

> an operation that is so planned and executed as to conceal the identity of or permit plausible denial by the sponsor. It is intended to create a political effect which can have implications in the military, intelligence or law enforcement arenas. Covert operations aim to fulfill their mission objectives without any parties knowing who sponsored or carried out the operation.[১৬২]

উল্লেখ্য, সিআইএ'র ক্ষেত্রে covert operation এর দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ হলো Special Activity Division বা SAD. আর ঐ দেশে একে আইনগত ভিত্তি দেওয়া হয়েছে ১৯৪৭-এর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এক্ট-এর মাধ্যমে। এটা তাদের এবং বিশ্বের অন্যত্রও অস্ত্র শিল্পের বিকাশে বাড়তি গতি এনে দিয়েছিল। ভারতকেও covert operation বিষয়ে বিশেষভাবে প্রথম তালিম দেয় সিআইএ। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে নেতৃত্বদানের পাশাপাশিই সিআইএ'র সঙ্গে এসব যৌথ প্রকল্পে যুক্ত ছিল ভারত। covert operation-এর ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ভারতীয় গোয়েন্দা প্রাতিষ্ঠানিকতায় সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হয় একাত্তরে মুজিব বাহিনী তৈরি ও পূর্ব-পাকিস্তানে

---

১৬১ উপরোক্ত তিনটি সংগঠন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার জন্য দেখুন: http://en.wikipedia.org/wiki/UNITA; https://en.wikipedia.org/wiki/Contras; এবং http://en.wikipedia.org/wiki/Taliban. (১৫ মে ২০১৩ তারিখে প্রদর্শিত তথ্যের আলোকে)

১৬২ https://en.wikipedia.org/wiki/Covert_operation. (৩০ মে ২০১৩ তারিখে প্রদর্শিত তথ্যের আলোকে)

এর ব্যবহার; এবং সিকিমকে ভারতভুক্তির ক্ষেত্রে[১৬৩] যেসব ভূমিকা রাখা হয়েছে সেগুলোকে। অন্যদিকে একই বিষয়ে ভারতীয়রা সবচেয়ে বড় আকারে ব্যর্থ শ্রীলংকার তামিলদের ক্ষেত্রে। উল্লেখ্য, শ্রীলংকা ও তামিলনাড়ুর মাঝামাঝি অবস্থিত Palk প্রণালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরগুলোর পাশাপাশি তামিল যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও ভারতে মূলত চাকরাতা ও দেরা দুনের সামরিক অবকাঠামো ব্যবহার করা হয়[১৬৪]– যেখানে আমরা মুজিব বাহিনীকে প্রশিক্ষণ নিতে দেখেছিলাম। 'গোপন সামরিক তৎপরতা'র জন্য গড়ে তোলা 'গোপন বাহিনী' হিসেবে মুজিব বাহিনী সম্পর্কে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সামরিক বাহিনীর উপ-প্রধান এ কে খন্দকারের নিম্নোক্ত ভাষ্যটি এ পর্যায়ে বিবেচনার দাবি রাখে :

> মুজিব বাহিনীর ব্যাপারটা অনেকেরই অজানা ছিল এ কারণে যে, এই সংগঠনটি অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে করা হয়েছিল এবং গোপনীয় রাখাও হয়েছিল। আমার ধারণা, মুজিব বাহিনীর যারা সদস্য ছিলেন, তাদের একটা বড় সংখ্যক এ সম্পর্কে কিছু জানত না। মুজিব বাহিনীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রধানত এর যে নেতৃত্ব, তাদের মধ্যেই স্বচ্ছ ধারণা ছিল। (সংগঠনের) নিচের দিকে এই বাহিনীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না।[১৬৫]

---

১৬৩ ১৯৪৭ সালে সিকিম ভারতভুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও এবং কয়েক বছর তার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখলেও ১৯৭১ থেকে সেখানে নানান রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করা হয়। দেশটি মূলত Namgyal ডাইনেস্টি শাসন করত। যারা ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। অন্যদিকে সিকিমের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালি বংশজাত হিন্দু। ধর্মীয় এই বিভাজনকে রাজনৈতিক কাজে লাগায় ভারত। গোয়েন্দাদের ধারাবাহিক সহায়তার মধ্য দিয়ে একাত্তর পরবর্তী পর্যায়ে সেখানে 'সিকিম ন্যাশনাল কংগ্রেস' (এসএনসি) নামে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা গঠন করা হয়। তিয়াত্তরে এসএনসি সেখানে জঙ্গী আন্দোলন শুরু করে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ফল হিসেবে দেশটিতে নির্বাচন হয় এবং এসএনসি সরকার গঠন করে। বস্তুত এটা ছিল ভারত প্রভাবিত পুতুল সরকার এবং তারা (Kazi Lhendup Dorji–এর নেতৃত্বে) দেশটিকে ভারতভুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং সেই অনুযায়ী এক 'গণভোট' অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় সৈনিকদের তত্ত্বাবধানে। ১৯৭৫ সালের ১৬ মে ভারত চূড়ান্তভাবে সাত হাজার কিলোমিটার আয়তনের সিকিমকে তার ২২তম অঙ্গরাজ্য করে নেয়। তার আগে কিছুদিন সিকিমের মর্যাদা উল্লেখ করা হতো, 'এসোসিয়েটেড স্টেট।' সেই থেকে সিকিম ও নেপালের আর্থসামাজিক সংস্কৃতিতে Kazi Lhendup Dorji একজন বিশ্বাসঘাতক চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত। ২০০৭ সালের ২৮ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের কালিংপঙে Kazi Lhendup Dorji মারা যান। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: http://blog.com.np/2013/01/31/the-pain-of-losing-a-nation-story-of-lhendup-dorji-and-sikkim/ (08.06.2013)

১৬৪ বিগত দিনগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয়দের covert operation সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন:
http://www.scribd.com/doc/44831591/India-s-Experience-of-Covert-Action-and-Need-for-Action-Against-Pakistan

১৬৫ এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪।

মুজিব বাহিনীর সহযোগী হিসেবে জেনারেল উবানের এসএফএফ সম্পর্কে *দ্য হিন্দু* পত্রিকায় খ্যাতনামা ভারতীয় নিরাপত্তা বিশ্লেষক Praveen Swami-এর নিম্নোক্ত মন্তব্যও এ পর্যায়ে বিশেষ মনোযোগ দাবি করে :

> The role of irregular forces (SFF) needs a more nuanced assessment. There is no doubt that they served to tie down Pakistani troops, and derail their logistical backbone. They were also, however, responsible for large-scale human rights abuses targeting Pakistani sympathisers and the ethnic Bihari population. There is no moral equivalence between these crimes and those of the Pakistani armed forces in 1971 — but the fact also is that the irregular forces bequeathed to Bangladesh a militarised political culture that would have deadly consequences of its own.[১৬৬]

৩.৬. মুজিব বাহিনীর বিভক্তির পটভূমি সিরাজুল আলম খান ও শেখ ফজলুল হক মণি'র দ্বন্দ্ব

> নির্বাচিত প্রতিনিধি আওয়ামী লীগের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি পদ্ধতি বাঁচাইয়া রাখিবার মহৎ উদ্দেশ্যেই ভারতীয় নেতৃত্ব মুজিব বাহিনী গঠন করার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামে স্বাধীনতা আসিলে, রাষ্ট্র ক্ষমতা সশস্ত্র বাহিনীর হাতে যাইতে বাধ্য, ভারতীয় নেতারা তা বুঝিতেন। আট-দশ হাজার ট্রেনিং-প্রাপ্ত সৈন্যের সঙ্গে আরও আশি-নব্বই হাজার মুক্তিফৌজ যোগ দিয়াছেন। অধিকাংশই ছাত্র। এদের মেজরিটি আবার ছাত্র ইউনিয়নের লোক। ছাত্রলীগাররা সেখানে মাইনরিটি। ছাত্র ইউনিয়নের প্রায় সবাই ন্যাপ। ন্যাপ মানেই কমিউনিস্ট।...এই বামপন্থীরা মুক্তিবাহিনী সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা দখলই সমর্থন করিবেন। এটা ভারতীয় বাহিনীর বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।... তাই সাবধানতা হিসেবেই তারা ডেমোক্র্যোটিক পলিটিক্স ওরিয়েনটেড মুজিব বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন।...এই রিপোর্ট আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম। পলিটিক্যাল মোটিভেশন হিসেবে 'মুজিববাদ' কথাটাও জন্ম হইয়াছিল ওখান হইতেই।
>
> –আবুল মনসুর আহমেদ, *রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক*[১৬৭]

পূর্ববর্তী অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়গুলোতে 'মুজিব বাহিনী' গড়ে ওঠার দীর্ঘ রাজনৈতিক, সামরিক ও আঞ্চলিক পশ্চাৎ ইতিহাসটি অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল কিংবা বুয়েটের ক্যাফেটারিয়া থেকে

---

১৬৬ Praveen Swami, *Ibid.*

১৬৭ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলি*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪৬২-৪৬৩।

শুরু করে ভারতের হিমাচল প্রদেশে আশ্রয় নেয়া তিব্বতি প্রবাসী সরকার পর্যন্ত যার বিস্তৃতি ও সংশ্লিষ্টতা। এই মুজিব বাহিনীর জনবলের একাংশের সমন্বয়েই কালক্রমে গড়ে উঠেছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ও রক্ষীবাহিনী। এবার স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসের সে অধ্যায়ের আলোচনা।

যে কোনো রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠারই আত্মগত-বস্তুগত, বহুবিধ কারণ থাকে। জাসদ-এর ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। জাসদের উত্থানের অন্তত একটি অনিবার্যতা চিহ্নিত করা যায় এর প্রধান সংগঠক সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে মুজিব বাহিনীতে শেখ মণি'র দ্বন্দ্বকে। মুক্তিযুদ্ধকালে শেখ মণি ও তাজউদ্দীন আহমদ-এর রেষারেষির মতোই (যার বিবিধ অভিব্যক্তি ইতোমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি) আরেক ধরনের দ্বন্দ্ব কাজ করত সিরাজুল আলম খান ও ফজলুল হক মণি'র মধ্যে। প্রথম দ্বন্দ্বটি ব্যক্তিগত হলেও দ্বিতীয় দ্বন্দ্বটি ছিল একই সঙ্গে নীতিগত ও ব্যক্তিগত। এমনকি একাত্তরের নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ কোথাও কোথাও তা সশস্ত্র রূপ নেয়। শেখ মণিরা ছিলেন মূলত শেখ মুজিবুর রহমানের কট্টর ভক্ত এবং তাঁর সঙ্গে পারিবারিক বন্ধনের দাবিদার। বিএলএফ-এর মাধ্যমে তাঁরা বামপন্থীদের ব্যর্থ করে দেয়া ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর 'মুজিব অনুসারী আওয়ামী লীগ সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণ' অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। অন্যদিকে সিরাজুল আলম খানরা স্বাধীনতার প্রশ্নে আপসহীন হলেও মুজিবের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রশ্নাতীত ছিল না। তাছাড়া সত্তর ও আশির দশকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাবে এদের মাঝে সমাজতন্ত্রের আবেদন বাড়ছিল এবং বলা বাহুল্য, সিরাজুল আলম খান নিজেও ছিলেন ফজলুল হক মণি'র মতোই নেতৃত্বের প্রশ্নে উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

রাজনৈতিক আদর্শের ফারাক, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা ছাড়াও উপরোক্ত দুই ধারার কর্মীদের মাঝে জীবনাচারের সংস্কৃতিতেও ছিল ব্যাপক অমিল। সাংস্কৃতিক এই ভিন্নতা প্রকট হয় যুদ্ধোত্তর সমাজে। অতি সংক্ষেপে এই বৈপরীত্যকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে যে, ফজলুল হক মণি ও তাঁর অনুসারীরা যেখানে ছিলেন Pro-establisment, সিরাজপন্থীরা সেখানে ছিলেন অপেক্ষাকৃত Anti-establisment. তবে এই বৈপরীত্য ও বিরোধের আঞ্চলিক একটা ধরনও ছিল বলে জানিয়েছেন বিএলএফ-এর হাফলঙ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী সাহাব উদ্দীন সাথী। তাঁর ভাষায়, 'দেরা দুন ও হাফলঙ– দু জায়গাতেই নোয়াখালী বনাম ফরিদপুর গ্রুপে মারামারি হয়েছে। প্রধান দুই সংগঠকের গ্রামের বাড়ির পরিচয়কে ঘিরে এই দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। প্রশিক্ষকরাও এই মারামারি দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।'[১৬৮] প্রথম ব্যাচেরই আরেকজন প্রশিক্ষণার্থী আ

[১৬৮] ২৩ এপ্রিল ২০১৩ সালে গৃহীত সাহাব উদ্দীন সাথীর সাক্ষাৎকার।

ন ম শফিক উল্লাহ্‌র ভাষায়, 'আমরা ছিলাম ৮০ ভাগ এবং তারা ছিল ২০ ভাগ। প্রত্যেক গ্রুপকে তাদের নেতারা গোপনে ব্রিফিং দিত।' 'আমরা' বলতে শফিক উল্লাহ্ বুঝিয়েছেন নোয়াখালী গ্রুপ তথা সিরাজুল আলম খান গ্রুপের কথা।

'মুজিব বাহিনী'র দুই ধারার এই বৈপরীত্য যে '৭১ সালে যুদ্ধের মাঝেই তীব্র বৈরিতার জন্ম দেয় সেটা বলতে গিয়ে যুদ্ধকালে শেখ মণি'র অন্যতম সহযোগী অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী লিখেছেন, 'মুজিব বাহিনীর সিনিয়র লিডারদের তান্দুয়ায় (দেরা দুন) এবং জুনিয়রদের হাফলং (আসাম)-এ পাঠানো হতো। সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কমবেশি রাজনৈতিক ট্রেনিংও সবাই লাভ করে। এই রাজনৈতিক ট্রেনিং পর্যায়ে সিরাজ গ্রুপ ও মণি গ্রুপের দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং *'আফটার শেখ, হু'* প্রসঙ্গ চলে আসে। মুজিব বাহিনীর সামনে মুজিবের অবর্তমানে উত্তরাধিকার নিয়ে কাল্পনিক লড়াই শুরু হয়।'[১৬৯]

আবদুল মান্নান চৌধুরীর সূত্রে আরো জানা যায়, মুজিব বাহিনীর প্রায় ১৬-১৭টি ব্যাচকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা প্রশিক্ষণ দেয়। এই বাহিনীর প্রশিক্ষিত যোদ্ধা ছিল আনুমানিক ১২ হাজার।[১৭০] মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান এ কে খন্দকার মনে করেন এ সংখ্যা ৯-১২ হাজার। জেনারেল উবান এই সংখ্যা ১০ হাজার বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭১] লক্ষ্যণীয়, নির্ভরযোগ্য সকল ভাষ্যে মুজিব বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৯-১২ হাজার বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। কিন্তু ১৯৭২-এর ৩১ জানুয়ারি মুজিব বাহিনীর সদস্যরা যখন ঢাকা স্টেডিয়ামে 'প্রতীকী অস্ত্র সমর্পণ' করছেন তখন তাদের সংখ্যা '৭০ হাজার' বলে উল্লেখ করা হয়।[১৭২] ঢাকা স্টেডিয়ামে 'সত্তর হাজার মুজিব বাহিনী সদস্যের অস্ত্র সমর্পণ'-এর ঐ ঘোষণাটি ছিল ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক নৈরাজ্যের এক প্রাথমিক পদক্ষেপ, কারণ মুজিব বাহিনীর ঘোষিত সদস্যদের শেখ মণি ও তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব তসলীম আহমদের স্বাক্ষরে

---

১৬৯ আবদুল মান্নান চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১-৩২।

১৭০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১।

১৭১ জেনারেল উবান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।

১৭২ *দেখুন*, আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১৯৫৩-৯৩*, ইউপিএল, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ২৭৩। দীর্ঘ চার দশক পরও মুজিব বাহিনীর প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে এই বাহিনীর সদস্যরা যে সংশয় মুক্ত হতে পারছেন না এবং তাদের কাছেও যে এই বাহিনীর সদস্যদের কোনো তালিকা নেই– তার নজির হিসেবে দেখা যায়– ২০১৪ সালের ৩ জুলাই জাতীয় সংসদে 'বিএলএফ সদস্যদের তালিকা' ভারত থেকে আনার জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ সেদিন সংসদে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী তা সমর্থন করেন। বিস্ময়কর হলো, এইরূপ তালিকা ছাড়া কীভাবে মুজিব বাহিনী সদস্যদের এতদিন 'মুক্তিযোদ্ধা'র সনদপত্র দেয়া হয়েছে– সে প্রশ্ন কেউ-ই সংসদে তোলেন নি সেদিন।

সেসময় মুক্তিযোদ্ধার সনদও দেওয়া হয়। বাস্তব সংখ্যা ও ঘোষিত সংখ্যার এইরূপ দুস্তর ব্যবধান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ চিরতরে দুঃসাধ্য করে দেয়। অন্যদিকে সনদ দানকারী দু'জনের অন্যতম তসলীম আহমদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কোনো সংশ্লিষ্টতাই ছিল না।

উপরোক্ত 'প্রতীকী অস্ত্র সমর্পণ' আরেকটি কারণেও প্রশাসনিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। অস্ত্রসমর্পণ শেষে তার বিরাট অংশই আবার বিভিন্ন জেলায় মুজিব বাহিনী সদস্যদের কাছে ট্রাকে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মুজিব বাহিনীর চার শীর্ষ নেতা নিজেদের মাঝে আলোচনার ভিত্তিতেই 'ভবিষ্যৎ প্রয়োজন'-এর কথা বিবেচনায় রেখে এরূপ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। কারণ তখনও এই বাহিনীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ স্পষ্ট ছিল না। বর্তমান লেখক অন্তত একটি জেলায় (মানিকগঞ্জ) অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, ঢাকা স্টেডিয়ামে অস্ত্রসমর্পণ শেষে ঐ জেলায় দুই ট্রাক অস্ত্র ফেরত এসেছিল সরাসরি শেখ মণি'র নির্দেশে। পরে অবশ্য ঐ জেলা থেকে ফজলুল হক মণি সমর্থক মুজিব বাহিনী সদস্যরা তাঁদের নেতা মফিজুল ইসলাম খান কামালের মাধ্যমে অনেক অস্ত্র ফেরত দিয়েছিলেন। কিন্তু মুজিব বাহিনীর জাসদমুখী অংশ (ঐ জেলায় যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আনিসুর রহমান খান) তাঁদের অস্ত্র আর ফেরত দেয়নি। এভাবে প্রায় প্রতি জেলাতে মাঠ পর্যায়ে বিপুল অস্ত্র থেকে যায়– যা পরে জাসদের সশস্ত্র শাখা 'গণবাহিনী'র সঙ্গে 'রক্ষীবাহিনী' ও 'লাল বাহিনী'র সংঘর্ষে ব্যবহার হয়েছে।[১৭৩] কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের মুজিব বাহিনী সদস্য জিয়ারুল ইসলামও সাক্ষাৎকারে কিছু কিছু অস্ত্র রেখে দেওয়ার সত্যতা স্বীকার করছেন। তবে তাঁর ভাষায়, 'অস্ত্র রেখে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে সংগঠক ও নেতৃত্ব পর্যায়ে– তাদের কাছেই কেবল বাড়তি অস্ত্র ছিল। একটা করে অস্ত্র ছিল এমন সাধারণ যোদ্ধাদের সেটা জমা দিতেই

---

১৭৩ মুজিব সরকারের ডাকে যুদ্ধোত্তর সময়ে সব মিলে মাত্র ৩০ হাজার অস্ত্র সমর্পিত হয়েছিল– যার মধ্যে উন্নত অস্ত্রের পরিমাণ ছিল অতি কম। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যশোর ব্রিগেডের কমান্ডার মঞ্জুর পরবর্তীকালে লেখক অ্যান্থনী মাসকারেণহাসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, তাঁর অধীনস্ত ছয়টি জেলা থেকেই মুজিব শাসনামলে সেনাবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে ৩৩ হাজার অস্ত্র উদ্ধার হয়। (দেখুন, অ্যান্থনী মাসকারেণহাস, *বাংলাদেশ রক্তের ঋণ*, অনুবাদঃ মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাললিশার্স, ১৯৮৮, ঢাকা, পৃ. ৩৩ ও ৪৩)। উল্লেখ্য, অস্ত্র উদ্ধারে সফলতার লক্ষ্যেই মুজিব বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে (২৪ ফে.) প্রথমে মুক্তিবাহিনীকে এবং পরে (২৭ ফে.) মুজিব বাহিনীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছিলেন (দেখুন, মওদুদ আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭)। কিন্তু রাজনৈতিক চাপে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হয়। বেসামরিক এসব উন্নত অস্ত্রধারীদের মোকাবেলায় পরবর্তী বছরগুলোতে প্রশাসনকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

হয়েছে।' জিয়ারুল ইসলাম আরও জানিয়েছেন, ঢাকায় অস্ত্রসমর্পণের পরই মুজিব বাহিনী সদস্যদের এক শত টাকা এবং একটা করে কম্বল দিয়ে পিলখানায় থাকার ব্যবস্থা করা হয় প্রয়োজনীয় ব্রিফিংয়ের জন্য। 'সেখানে ব্রিফিংকালে তোফায়েল আহমেদ বিশেষভাবে আমাদের ধন্যবাদ দেন 'মুজিব-আদর্শ' টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে অবদান রাখার জন্য এবং জানান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও একইভাবে মুজিবের আদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য মুজিব বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে আলাদা একটি এলিট বাহিনী গঠিত হবে। সেটায় অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্যও তিনি সবাইকে আহ্বান জানান। এই আহ্বান শুনে কেউ কেউ সেখানে থেকে গেলেও অনেকে আবার নিজ দায়িত্বে বাড়ি চলে যান। এভাবেই বাহিনীতে ভাঙনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।'

জিয়ারুল ইসলাম কথিত মুজিব বাহিনীর উপরোক্ত ভাঙন প্রক্রিয়া পুরোপুরি রাজনৈতিক ছিল না। অনেকেই যুদ্ধ-পূর্ববর্তী পেশায় ফিরে যান নিজ ইচ্ছায়। তবে ততদিনে বাহিনীর চার প্রধান নেতার অনুসারীদের মাঝে রাজনৈতিক মেরুকরণও শুরু হয়ে গিয়েছিল– যে কারণে প্রথমোক্ত বাহিনীতে ভাঙন নতুন অনেকগুলো বাহিনীর বীজ তৈরি করে।

উল্লেখ্য, একাত্তরে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বিএলএফয়ে সদস্য সংখ্যার দিক থেকে সিরাজুল আলম খানের অনুসারীদের প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় মে-জুনে। প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে যে ৮ জনকে প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয় তার মধ্যে সাত জনই ছিলেন 'সিরাজ ভাই'-এর শিষ্য। পরবর্তীকালে প্রশিক্ষকের সংখ্যা যখন ৫২-তে উন্নীত হয় তখন উক্তরূপ অনুগামীর সংখ্যা ছিল ৪৯। বিএলএফ গঠনকালে বাহ্যিকভাবে ফজলুল হক মণি গতিশালীতায় শীর্ষ অবস্থানে থাকলেও (সিরাজুল আলম খান যুদ্ধের শুরুতে কিছু দিন অসুস্থ ছিলেন বিধায়) তাঁর প্রতিপক্ষ গ্রুপ অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে তাদের অনুসারীদের বাহিনী কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে সন্নিবেশ ঘটাতে সমর্থ হয়; বিশেষত, সিরাজুল আলম খান দেরা দুনে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের ইনচার্জ পদে তাঁর অনুসারী হাসানুল হক ইনুকে অভিষিক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ছাড়া অন্য যারা এখানে প্রশিক্ষক ছিলেন, শরীফ নুরুল আম্বিয়া[১৭৪], আ ফ ম মাহবুবুল হক[১৭৫]– এরাও ছিলেন সিরাজুল আলম খানের অনুগত। পরে জাসদ গঠনকালেও

---

১৭৪ পারিবারিকভাবে নড়াইলের অধিবাসী। জন্ম ১৯৪৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। ঢাকার বিজ্ঞান কলেজে ও বুয়েটে লেখাপড়া করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর জাসদ ছাত্রলীগের প্রথম সভাপতি। বর্তমানে জাসদের একাংশের সাধারণ সম্পাদক।

১৭৫ স্বাধীনতা-উত্তর ছাত্র রাজনীতিতে সিরাজুল আলম খানের অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার ছিলেন এই আ ফ ম মাহবুবুল হক। মূলত তাঁর অসামান্য ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে এ

এদেরই নেতৃত্বে দেখা যাবে। কেবল দেরা দুন বা হাফলঙেই নয়– একাত্তরের শুরুতে মাঠ পর্যায়ে হবু যোদ্ধাদের রিক্রুটমেন্টকালেই এইরূপ *গ্রুপ চেতনা* মুখ্য বিবেচনা হিসেবে কাজ করত বলে জানিয়েছেন কুমিল্লার একটি এলাকায় রিক্রুটমেন্টের দায়িত্বে থাকা সাহাবউদ্দীন সাথী। তাঁর ভাষায়, 'চৌদ্দগ্রামে বিএলএফ-এর ৫৪ জনকে আমরা রিক্রুটমেন্ট করি। এর মধ্যে ৫০ জন ছিল আমাদের গ্রুপ (সিরাজ গ্রুপ)-এর।'[১৭৬]

মণি গ্রুপকে কোণঠাসা করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের পূর্বাপর সিরাজুল আলম খান গ্রুপের এরূপ পরিকল্পিত কার্যক্রমে শেষপর্যন্ত মুজিব বাহিনী সম্পর্কে 'র'-তে এক ধরনের গভীর সংশয় সৃষ্টি হয়। কারণ এই দুই গ্রুপের আদর্শিক ভিন্নতা তাদেরও নজর এড়ায়নি। এ ছাড়া এসময় এও লক্ষ্য করা যায়, বাহিনীর সাধারণ সদস্যদের বিরাট সংখ্যকের মাঝে– বিশেষত, যারা সিরাজ অনুসারী, তাদের মনোজগতে সমাজতন্ত্রের প্রতি অস্পষ্ট এক পক্ষপাত তৈরি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ভারতের প্রতিও এদের আনুগত্য প্রশ্নাতীত বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল না।

ফলে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এগিয়েছে দুটি ধারায়। প্রথমত, ১৯৭১-এর ২০ নভেম্বর দেরা দুনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৭৭] ১৬ ডিসেম্বর

সময় জাসদপন্থী ছাত্রলীগ বিকশিত হচ্ছিল। ১৯৪৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর নোয়াখালীর চাটখিলের মোহাম্মদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণকারী মাহবুবুল হক এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন। প্রথমে ছাত্রলীগের সূর্যসেন হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর জাসদ ছাত্রলীগে প্রথমে সাধারণ সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন। ১৯৭৩ সালের ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত হওয়ার পথে বিপক্ষ ছাত্র ইউনিয়ন-ছাত্রলীগ জোট (লেনিন-গামা প্যানেল) ব্যালট পেপার ছিনতাই করে তাঁর ডাকসু ভিপি হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়। পুরো নির্বাচনে বিপক্ষ প্যানেলের মূল শ্লোগানই ছিল, 'লেনিন-গামা, নূরা থামা।' প্রতিপক্ষের তরফ থেকে 'নূরা' (পাগলা) কথাটি শ্লেষাত্মকভাবে ব্যবহার করা হতো মাহবুবুল হককে উদ্দেশ্য করে– কারণ তখন তাঁর মুখ ভরা ছিল বড় বড় দাড়ি গোঁফ। শেষপর্যন্ত 'নূরা'কে থামিয়েছিল প্রতিপক্ষ। তবে তা স্বাভাবিক ভোটের হিসাবে নয়।

১৭৬ সাহাবউদ্দীন সাথী, *অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার*, এপ্রিল ২০১৩, ঢাকা।

১৭৭ প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি কেন বন্ধ করে দেয়া হলো এবং কেন প্রশিক্ষণার্থীদের বের হতে দেয়া হচ্ছে না সে সম্পর্কে কিছুই অবহিত করা হয়নি তাঁদের। দেখুন, হাসানুল হক ইনুর সাক্ষাৎকার, মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭০। উল্লেখ্য, স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়ার আগেও দেরা দুনের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে সিরাজুল আলম খানের অনুসারী প্রশিক্ষকদের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাজনৈতিক বক্তৃতার কারণে ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তারা সাময়িকভাবে আরেকবার ক্যাম্পের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ভারতীয় এই কর্মকর্তাদের একাংশই পরে রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষক হন। রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণের যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয় তার পটভূমি হিসেবে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে 'র' সংশ্লিষ্ট ভারতীয় প্রশিক্ষকদের একাত্তরকালীন উপরোক্ত টানাপোড়েনের বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছিল।

পর্যন্ত সেখানে প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশকে আটকে রাখা হয় এবং শেখ মণি ও তাঁর অনুসারীদের নিয়েই জেনারেল উবান অগ্রাভিযান শুরু করেন।[১৭৮] মুক্তিযুদ্ধ শেষে

---

১৭৮ এই অগ্রাভিযান শুরু হয় নভেম্বরের শেষে–ডিসেম্বরের শুরুতে। অগ্রাভিযানকালে কী ঘটেছে তার বিবরণের পূর্বে তখনকার পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকা জরুরি। পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রশাসনিক তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে তিনজনকে সার্কেল চিফ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। এর মধ্যে চাকমা সার্কেল চিফ ত্রিদিব রায় মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সরকারের সমর্থক ছিলেন। বান্দরবান সার্কেলের চিফ মংশুয়ে প্রু চৌধুরী নিরপেক্ষ অবস্থান নেন এবং মং সার্কেল চিফ মং প্রন্স সাইন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর অনেক সদস্যও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তবে ত্রিদিব রায় এবং বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর ভূমিকার কারণে এই প্রচারণাই ব্যাপকতা পায় যে, স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীগুলো 'বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে।'

পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের বিশেষ অস্তিত্ব ছিল না। সত্তরের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হন স্বতন্ত্র প্রার্থী ত্রিদিব রায় আর প্রাদেশিক পরিষদে অং শুয়ে প্রু চৌধুরী ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। এরা কেউ আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন না। ফলে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ ছিল অতি ক্ষীণ। ঠিক এই পটভূমিতে ডিসেম্বরে অত্র এলাকায় শুরু হয় জেনারেল উবানের মুজিব বাহিনী ও স্পেশাল ফোর্সের 'অভিযান'। ভারতের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সীমান্ত পথে মুজিব বাহিনীর সদস্য ও স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের মুহূর্তে কী ঘটেছে তার একটি স্থানের নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন ঐ এলাকার বাসিন্দা প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত শরদিন্দু শেখর চাকমা: *৫ ডিসেম্বর একটি দল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পানছড়িতে প্রবেশ করে। একদল চাকমা তাদের অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তারা একটি খাঁসিও সঙ্গে নিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা খাঁসিটি নিলেও অভ্যর্থনাকারী সবাইকে হত্যা করে। এর পর তারা পানছড়ির পাহাড়ি গ্রামগুলোতে হামলা শুরু করে। বাড়িঘরে লুটপাট চালায় এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। সামনে যাকে পায় তাকেই হত্যা করে এবং মেয়েদের ধর্ষণ করে। তাদের হামলায় সেদিন পানছড়িতেই ৩২ জন উপজাতি নিহত হয়। পানছড়ি থেকে খাগড়াছড়ি যাওয়ার পথে তারা ১৭৬টি বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। ১৪ ডিসেম্বরও তারা ২২ জন উপজাতিকে হত্যা করে।* বিস্তারিত দেখুন, *মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম*, অংকুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৪৩।

নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের ওপর উল্লিখিত ধাঁচের আক্রমণ চলে এসময় পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে এবং তা অব্যাহত থাকে একাত্তরের ডিসেম্বর পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯৭২-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি গড়ে ওঠে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং তার প্রায় এক বছর পর গড়ে ওঠে এই দলের সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী। শান্তিবাহিনী গড়ে ওঠার অন্যতম তাৎক্ষণিক কারণ ছিল পাহাড়ি গ্রামগুলোকে 'মুক্তিযোদ্ধা'দের তাণ্ডব থেকে রক্ষা– তথা 'শান্তি' স্থাপন। শান্তিবাহিনীকে মোকাবেলায় মুজিব ভারতের কাছে সুনির্দিষ্ট সামরিক সহায়তা চেয়েছিলেন। দেখুন, J. N. Dixit, *Liberation and Beyond: Indo-bangladesh relation*, UPL, 1999, Dhaka, p. 138, 158. ফল হিসেবে দেখা যায়, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনী চলে যাওয়ার সময় তাদের একটি ব্রিগেড রেখে দেয়া হয়েছিল কক্সবাজারে এবং ঐ ব্রিগেড ১৯৭২ সালের জুলাই পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে

রক্ষীবাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে যার ভিন্ন একটি বিকাশধারা দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, সিরাজুল আলম খানদের সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক নৈকট্য তৈরি হতে থাকে। এই নৈকট্যের ফল হয় দুটি– স্বাধীন দেশে তাজউদ্দীন আহমদ ও সিরাজুল আলম খানের সমন্বয়ে নতুন দল গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নিয়ে কানাঘুষা বেড়ে যায়, এবং ফজলুল হক মণিও সতর্ক হয়ে ওঠেন হবু দলকে মোকাবেলায়। বাহাত্তরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফেরামাত্র তাঁর স্নেহধন্য মণি যে আসন্ন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করতে সফল হয়েছিলেন তাজউদ্দীনের প্রতি মুজিবের কঠোর মনোভাব থেকে তা আঁচ করা যাচ্ছিল।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সিরাজুল আলম খান ও তাজউদ্দীন আহমদের সমন্বয়ে বামপন্থী ধারায় নতুন রাজনৈতিক দল সৃষ্টির গুঞ্জন শোনা গেলেও মুজিব বাহিনীতে সংশ্লিষ্টতার কারণে সিরাজুল আলম খান ও তাঁর অনুগামীদের নিয়ে নতুন দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সন্দেহ ও অবিশ্বাসও ছিল প্রবল। বস্তুত এই গ্রুপের জন্য ঐ সংশ্লিষ্টতাই ছিল বড় এক ঐতিহাসিক দায়। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে ১৯৬২-৬৩ থেকে নিউক্লিয়াস গঠন করে জাতীয় রাজনীতির বহু কর্মসূচির কর্তৃত্ব ও প্রশংসা ভোগ করছিল এই গ্রুপ; উপরন্তু তাদের নেতৃত্ব-শক্তি ও সাংগঠনিক ব্যাপকতাও ছিল সুস্পষ্ট, কিন্তু একাত্তরে সীমান্তের ওপারে 'র'-এর প্রকল্পে সরাসরি সংশ্লিষ্ট হয়ে– সেই শক্তি ও সংগঠনের নৈতিক ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেন তারা। জাসদ সৃষ্টির পর নানান উত্তেজক ও আত্মবিনাশী রাজনৈতিক কর্মসূচি জনগণের সেই প্রশ্নবোধক মনস্তত্ত্বকে আরও দৃঢ়তা দেয়। সে বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে।

'অপারেশন' চালিয়ে তবেই দেশে প্রত্যাবর্তন করে। এই অধ্যায়ের কৌতুককর দিক হলো, কক্সবাজারে ভারতীয় একটি ব্রিগেডের উপস্থিতি গোপন রেখেই বাহাত্তরের ১২ মার্চ জানানো হয়েছিল, বাংলাদেশ থেকে সব ভারতীয় সৈন্য চলে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু দিন পর মার্চের শেষে এই বিষয়টি গণমাধ্যমে নিয়ে আসেন তরুণ এক মার্কিন সাংবাদিক। সরকার প্রথমে গণমাধ্যমের ঐ প্রতিবেদনের সত্যতা অস্বীকার করলেও পরে অধিকতর বিব্রত অবস্থা এড়াতে পূর্বতন ভাষ্য প্রত্যাহার করে নেয়। বিস্তারিত দেখুন, S. M. Ali, *ibid*, p. 156. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে বরাবরই ১৯৭৬ সালে বাঙালিদের পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট' শুরু বলে ভুলভাবে দেখানো হয় এবং এই সংকটের সঙ্গে এসএফএফ ও মুজিব বাহিনীর কোনো যোগসূত্র দেখাতেও মোটদাগে ব্যর্থ তারা।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ৭৯ বছর বয়সে পাকিস্তানে মারা যান। শেষ ইচ্ছা ও পরিবারের আগ্রহ সত্ত্বেও পুরানো আক্রোশবশত বাংলাদেশে অনেকের বিরোধিতার কারণে তাঁর মরদেহ পার্বত্য চট্টগ্রামে আনা যায়নি।

৪

একাত্তরের 'স্বপ্নের অপহরণ' : হত্যালীলার নতুন তরঙ্গ মুজিববাদ বনাম বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

৪.ক. ভারতের বলয় থেকে বেরোতে মুজিবের স্ববিরোধী বিবিধ চেষ্টা; জাসদের জন্ম

> অত্যাচারী-অত্যাচারিতের দ্বন্দ্বের সমাধান শুধু তাদের পারস্পরিক স্থান বদলের মধ্যে নিহিত নেই। এমনকি মুক্তির নামে পুরানো অত্যাচারীর স্থলে নতুন অত্যাচারীকে স্থাপনের মধ্যেও নেই। কারণ, তাতে অত্যাচারিতের বিলুপ্তি ঘটে না।... অত্যাচারিতরা তাদের অস্তিত্বের অভিজ্ঞতার এক পর্যায়ে অত্যাচারী ও তাদের জীবন-যাপনের পদ্ধতির প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বোধ করে। তাদের মতো জীবন-যাপন করাই প্রধান উম্মাদনা ও কামনা হয়ে ওঠে। এই উম্মাদনার জন্য তারা যে কোন মূল্যে অত্যাচারীর মতো হতে চায়, তাকে অনুসরণ করে।...সত্যিকার অর্থে তাদের 'মনিব' তাদের 'ভেতরই' বাস করে।
>
> –পাওলো ফ্রেইরি, অত্যাচারিতের শিক্ষা[১৭৯]

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে সিরাজুল আলম খান ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক নৈকট্যের যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বস্তুত তার শুরু যুদ্ধকালেই। যুদ্ধের শুরুতে শেখ মণি'র পাশাপাশি সিরাজুল আলম খান ও তাঁর অনুসারীরা একসঙ্গেই তাজউদ্দীন বিরোধিতায় থাকলেও এক পর্যায়ে তাজউদ্দীন আহমদে এদের মাঝে বিভক্তি আনতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। যার মধ্য দিয়ে সিরাজপন্থীদের তরফ থেকে যুদ্ধকালে তাজউদ্দীন বিরোধিতা ক্রমে কমে আসে। এ সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষ্য পাওয়া যায় যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারি ফারুক আজিজ খানের জবানিতে। তিনি লিখেছেন :

> Tajuddin thought he could moderate the BLF leaders through Shirajul Alam Khan and therefore wanted to meet him without the knowledge of his colleagues in the

---

[১৭৯] উদ্ধৃতিটি গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ থেকে নেয়া। দেখুন, পাওলো ফ্রেইরি, *অত্যাচারিতের শিক্ষা*, অনুবাদ: আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, আরবান, ২০০৮, ঢাকা, পৃ. ২৯, ৩৩-৩৪।

> BLF. I do not know how it was arranged but Shirajul came once to Theatre Road (prime minister's office) on a Sunday and had a long session with the prime minister. When the two came out of the room I thought they had a fruitful discussion. Even was leaving the building the two of them standing outsideunder the portico continued their discussion in a very low voice. I was the only other person standing a little distance away so that their privacy wasn't disturbed. Then Sirajul steped out unfolding his big umbrella as the heavy monsoon rains slowed down for a while. I did not know the gist of their discussion but I could draw some conclussions from the prime minister's relaxed mood.[১৮০]

জাসদ গঠনের সময় উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত ঘনিষ্ঠতা আরও বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯৭২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে জাসদের কার্যক্রম শুরুর সময় ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খান সমর্থক অংশের সম্ভাব্য যে কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগে তাজউদ্দীন আহমদের নীরব সমর্থন রয়েছে বলে মনে করা হতো। সরকারের বিভিন্ন পেটোয়া বাহিনীর নিপীড়ন থেকে রেহাই পেতে সিরাজ অনুসারী সংগঠকরা তাজউদ্দীনের কাছে সহানুভূতি আশা করতেন এবং নতুন দল গঠনের প্রচেষ্টা সম্পর্কেও অবহিত করতেন। সিরাজ অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও তিনি নতুন দলের বিষয়ে ধীরে এগোনোর পক্ষপাতী ছিলেন বলেই সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

মুজিব দেশে ফিরে এসেছিলেন বাহাত্তরের জানুয়ারিতে। মে-জুনেই সিরাজুল আলম খানরা আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন বা বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন। এ পর্যায়ের একটি বড় প্রশ্ন হলো, মাঝখানের ৪-৫ মাসে এমন কী ঘটেছিল যে, নতুন দল গঠন 'অপরিহার্য' হয়ে পড়েছিল। সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের কাছ থেকে[১৮১] এ বিষয়ে যেসব ভাষ্য পাওয়া তার সংক্ষিপ্ত ও সম্মিলিত বক্তব্য এ রকম যে, জানুয়ারি থেকে এপ্রিলে'র মাঝে একের পর এক এমন অনেকগুলো ঘটনা ঘটছিল, যেগুলো সিরাজ গ্রুপ প্রথমত, তাদের 'স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য ভবিষ্যৎ হুমকি' হিসেবে গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয়ত, তাদের মাঝে মুজিবের ক্ষমতার বলয়ে 'উপেক্ষার একটি বোধ' তৈরি হয়। এইরূপ

---

১৮০ Faruk Aziz Khan, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৪-৮৫।

১৮১ কীভাবে এসব তথ্য সারসংকলন করা হয়েছে সে বিষয়ে অন্যত্র পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

অভিজ্ঞতার শুরু বস্তুত মুজিবের আগমনের পরদিন থেকেই।[১৮২] যেমন সিরাজুল আলম খান-আ স ম রব-শাজাহান সিরাজরা চাইছিলেন দেশে ফিরে মুজিব দেশ ও দলের দায়িত্ব নিন, সরকারের নয়। বিশেষ করে চীনে মাও সেতুঙ যেভাবে দেশ পরিচালনায় দলে চেয়ারম্যানরূপী একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন সিরাজরা চাইছিলেন মুজিবের ভূমিকাও সেইরূপ হোক– যুদ্ধকালীন 'তাজউদ্দীন প্রশাসন' অক্ষুণ্ন থাকুক। ৬২ থেকে ৭২– এই এক দশকে জনসমাজে যেসব রাজনৈতিক দাবি তৈরি হয়েছিল– দল ও দেশের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে মুজিব সেগুলোর বাস্তবায়ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেবেন এবং তাজউদ্দীন সরকার ও ছাত্র-যুবারা তা বাস্তবায়ন করবে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি কেবল আকাঙ্ক্ষার পর্যায়েই থাকেনি। অন্তত মুজিব বাহিনীর অন্যতম নেতা এবং সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠ সংগঠক মনিরুল ইসলাম দাবি করেছেন, ৩১ জানুয়ারি তাঁরা যে অস্ত্রসমর্পণ করেছিলেন সেটার ভিত্তি ছিল মুজিবের সঙ্গে অন্তত তিন দফা নিম্নোক্ত বোঝাপড়া :

- বিভিন্ন মত ও দলের সমন্বয়ে দেশে অন্তবর্তীকালীন বিপ্লবী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে;
- যদিও আওয়ামী লীগ এই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সরকার রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে, কিন্তু মুজিবুর রহমান সরকার বা দল কোনোটাতেই থাকবেন না; তিনি অবস্থান করবেন রাজধানীর বাইরে;
- তবে দেশের নীতিনির্ধারণী বিষয়গুলোতে মুজিব মতামত দিতে পারবেন এবং দেবেন।

মনিরুল ইসলাম এও জানাচ্ছেন যে, মুজিব উপরোক্ত বোঝাপড়ার অংশ হিসেবে দেশের দক্ষিণের দ্বীপ মনপুরাতে থাকার বিষয়েও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন![১৮৩]

কার্যত যে এসব কিছুই ঘটেনি সেটাই এখন ইতিহাস। দেশে ফিরেই সরকারে যোগ দিয়েছিলেন মুজিব। এমনকি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি থেকে পার্লামেন্টারি

---

১৮২ বন্দিদশা থেকে রাষ্ট্রপতি মুজিব যেদিন দেশে ফিরে আসেন সেই ১০ জানুয়ারি সিরাজুল আলম খান ঢাকায় ছিলেন না। ৯ জানুয়ারি খুলনা থেকে ঢাকায় রওয়ানা দিয়ে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ঘাটে কুয়াশার কারণে আটকা পড়ে থাকতে হয় তাঁকে। সেদিন অনেক রাতে তিনি মুজিবের কাছাকাছি পৌছাতে পেরেছিলেন। মাঝখানের এই কয়েক ঘণ্টা সময়কে অনেকে মুজিব ও তাঁর মাঝে পরবর্তীকালে সৃষ্ট দূরত্বের এক বড় উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। এরূপ পর্যবেক্ষকদের মতে, ১০ জানুযারির ঐ সময়টুকু ছিল মুজিবকে ঘিরে প্রভাব বলয় সৃষ্টির এক মাহেন্দ্রক্ষণ। মুজিব বাহিনী ও আওয়ামী লীগে সিরাজুল আলম খানের প্রতিদ্বন্দ্বিরা যা সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগিয়েছিল।

১৮৩ মনিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১২-২১৩.

পদ্ধতিতে ফিরে গিয়ে তিনি এমনভাবে একজন প্রেসিডেন্ট বাছাই করেন যাতে নীতিনির্ধারণী বিষয়ে প্রশাসনের কোনো পর্যায়ে কোনো ধরনের শক্তিশালী ভিন্নমতের সম্ভাবনা না থাকে। এইরূপ ভাবনায় অবশ্য শিগগির ছেদ পড়ে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তিয়াত্তরের ২৪ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন। কাগুজে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা উপভোগ করতে না পেরেই স্বীয় পদ ছেড়ে দেন তিনি। এ বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিতে তিনি বলেন, *১০ বছর উচ্চ আদালতের জজ থাকাতে আমার সব কনক্লুশন ছিল রিজনড কনক্লুশন। কিন্তু যে পদ্ধতিতে (পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে) অন্যের কনক্লুশনে সব সময় এগ্রি করতে হচ্ছিল– সেটা আমার ভালো লাগেনি।*[১৮৪] ...উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পদত্যাগের একটি তাৎক্ষণিক কারণ ছিল দালাল আইনে আটককৃতদের ক্ষমা ঘোষণা ও ছেড়ে দেওয়া। ক্ষমা ঘোষণার এখতিয়ার রাষ্ট্রপতির হলেও সেসময় ঘোষণাটি এসেছিল প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে। যা ছিল রাষ্ট্রপতির জন্য খুবই বিব্রতকর। আবু সাঈদ চৌধুরীর পদত্যাগের পর প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল মুহাম্মদুল্লাহকে। তিনি পূর্বসূরির পদত্যাগের পেছনের টানাপোড়েন সম্পর্কে লিখেছেন,

> 'সেই সময়ে (আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি থাকাকালে) বাজারে গুঞ্জন চালু হয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় লন্ডনে উত্তোলিত চাঁদা নিয়ে অনিয়ম হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিচারপতি চৌধুরী সাহেব বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার চালান। ফলে এহেন অপপ্রচারে মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। আমি স্পিকার থাকাকালে তিনি যাবতীয় হিসাবের বিবরণ দেন।...তিনি রাষ্ট্রপতি থাকাকালে যে *প্রক্রিয়ায়* বিভিন্ন সরকারি বিল তাঁর কাছে উত্থাপিত হয়েছে বা সই করতে হয়েছে তা নিয়ে তিনি অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন। আমাকে তিনি তাঁর অসুবিধার কথা বিস্তারিত বলেছেন। অবশেষে ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি পদত্যাগ করেন।'[১৮৫]

উল্লেখ্য, প্রচুর 'ভালো না লাগা' এবং 'অস্বস্তি' নিয়ে পদত্যাগের আগেই রক্ষীবাহিনী বিষয়ে আইনগুলো বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর স্বাক্ষরেই

---

১৮৪ বিচারপতি চৌধুরীর এ বিষয়ক মনোবেদনার বিস্তারিত দেখুন, মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশের তিন রাষ্ট্রপতির কথন*, সুবর্ণ, ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১৮০-১৮২। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং 'মুজিব শাসনামলে দেশ থেকে নির্বাসিত গণতন্ত্র মোশতাক আহমদ আবার ফিরিয়ে আনতে চান'– বিদেশমন্ত্রী হিসেবে ১৯৭৫-এর ২৩ আগস্ট বিচারপতি চৌধুরী এমন মন্তব্যও করেছিলেন লন্ডনে। দেখুন, *Daily Star*, 17 August 2014, Dhaka.

১৮৫ মুহাম্মদুল্লাহ, *নীরবতা ভেঙ্গে*, অয়ন, ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ৯৩।

জনসম্মুখে এসেছিল। তারপরও তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি। তাঁর পদত্যাগ ছিল তৎকালীন শাসন পরিমণ্ডলে এমন একটি সুস্পষ্ট বার্তা যে, মুজিব যা চাইবেন সেভাবেই দেশ চলবে। কিন্তু তারপরও ছাত্রলীগের সিরাজ গ্রুপের পক্ষ থেকে কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে একের পর এক সংস্কারধর্মী নানান পরিকল্পনা পেশ করা হতে থাকে মুজিবের কাছে। বিশেষত ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ১৫ দফার একটি করণীয় পেশ করা হয়। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল : 'জাতীয় ঐক্য ও মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক মুজিবকে সরকারের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে তাঁর নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখা, আওয়ামী লীগের পরিবর্তে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল দলকে নিয়ে সরকার গঠন করা, প্রশাসনসহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া ইত্যাদি।'

ছাত্রলীগের এই অংশের দাবি-দাওয়াতে তখন 'পুঁজি বিনিয়োগ' বিরোধী মনোভঙ্গিটি ছিল বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়– যদিও স্বাধীন দেশের পুনর্গঠনে যে কোনো প্রকারে সেটাই ছিল প্রয়োজনীয়। জাসদ ছাত্রলীগের সেসময়ের একটি উল্লেখযোগ্য শ্লোগান ছিল : 'জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো–উঠতি পুঁজির গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে।' উপরে উল্লিখিত '১৫ দফা' পেশের পরপর 'বঙ্গবন্ধুর হাতকে শক্তিশালী করতে' বাহাত্তরের ৭ জুন শরীফ নুরুল আম্বিয়া ও শাজাহান সিরাজ 'সংগ্রাম–স্বাধীনতা–বিপ্লব' শীর্ষক এক পুস্তিকায় মুদ্রিত আকারে আরও কিছু 'করণীয়' তুলে ধরেন, যার মধ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশটি লক্ষ্যণীয় :

> বাংলার রাজনৈতিক আকাশ আজ বিদেশী শত্রুমুক্ত। কিন্তু অর্থনৈতিক আকাশে অশুভ নক্ষত্রের অভ্যুদয় ঘটছে। ...বাংলাদেশ সরকার জাতীয়করণ আইন ঘোষণা হওয়ার পরই এ দেশে বৃহৎ পুঁজির সৃষ্টির অবকাশ না থাকলেও অতি সঙ্গোপনে উঠতি পুঁজি ও মাঝারি পুঁজির জন্ম দেখা যাচ্ছে।... (সরকারের) দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্য হতে হবে ব্যক্তি শোষণ, শ্রেণী শোষণ বন্ধ করা, আমলা ও আমলাতন্ত্রের উৎখাত, *ছোট-মাঝারি-বড়*, সকল ধরনের পুঁজি বা উৎপাদনযন্ত্রকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন শ্রেণীকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা।[১৮৬]

---

[১৮৬] পুঁজি ও পুঁজি বিনিয়োগ সম্পর্কিত হবু জাসদ নেতাদের উল্লিখিত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্যরকম মিল পাওয়া যায় বাংলার বাণীতে সেসময় প্রকাশিত শেখ ফজলুল হক মণির ক্ষুরধার কলামগুলোতে এবং সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের 'অর্থনীতিবিদ'দের তাবৎ প্রয়াসে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গিরই সম্মিলিত ফল হয়েছিল চুয়াত্তর-পঁচাত্তরের অর্থনৈতিক বিপর্যয়– যদিও তার জন্য কেবল শেখ মুজিবুর রহমানকেই দোষের ভাগীদার হতে হয়েছে। বিনিয়োগ বিরোধিতা ও রাষ্ট্রায়ত্তকরণকে এসময় 'সমাজতন্ত্র' হিসেবে চিহ্নিত করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস দেখা যায় খোদ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের প্রভাবশালী পণ্ডিত সদস্যদের মাঝে। তার

জাতীয়করণের প্রসঙ্গ ব্যতীত শরীফ নুরুল আম্বিয়া ও শাজাহান সিরাজদের দফায় দফায় প্রদত্ত উপরোক্ত সুপারিশসমূহের খুব কমই সেসময় গৃহীত হয়। বিশেষ করে রাজনৈতিক সুপারিশসমূহ সরকার অবজ্ঞা করে তাৎক্ষণিকভাবে। ফলে সিরাজুল আলম খানদের নিউক্লিয়াসের পক্ষে অনুসারীদের রাজনৈতিকভাবে সন্তুষ্ট রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে– যে কর্মীদের তারা বিগত এক দশক ধরে বুঝিয়ে এসেছে, স্বাধীনতা মানেই 'সোনার বাংলা' এবং যে কর্মীরা এও দেখেছিল, সিরাজুল আলম খান ও 'নিউক্লিয়াস' যা চেয়েছে মুজিবও তাই করেছেন এতদিন; কিন্তু এবার সেই সমীকরণ কাজ করছে না এবং সোনার বাংলাও অনিশ্চিত।

উপরন্তু বাহাত্তরেই এইরূপ ভিন্নমতালম্বীদের সরকারি বিভিন্ন পেটোয়া বাহিনী হয়রানি, নাজেহাল ও আটক করতে শুরু করে। মাওলানা ভাসানী ছাড়া আর কাউকেই জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিকভাবে ভিন্নমত প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না তখন। সিরাজদের পুরো গ্রুপটি তাই এ পর্যায়ে অস্তিত্বের সংকটের আশঙ্কায় পড়ে যায়। এর বাইরে ছিল দেশব্যাপী সর্বহারা পার্টি ও নকশাল ধারার রাজনীতির উত্থান এবং তরুণদের সেইদিকে ধাবিত হওয়ার বাস্তব এক 'বিপজ্জনক' সম্ভাবনা। জাসদ গঠনে এই শেষোক্ত নিয়ামকটি সম্পর্কে এই লেখার

একটি নজির হিসেবে এখানে বিশিষ্ট শিল্পপতি মঞ্জুর এলাহির একটি সাক্ষাৎকার থেকে ঐ সময়কার বিনিয়োগ অভিজ্ঞতার একটি খণ্ডাংশ তুলে ধরা হলো :

> ...১৯৭৩ সালে চিন্তা করছিলাম ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যাবো। তখন আবার বঙ্গবন্ধু সরকার ঠিক করে দিল, পঁচিশ লাখের উপরে কোন ইন্ডাস্ট্রি করতে পারবে না কেউ। প্রজেক্ট কস্ট সিলিং করে দিল। ভাবলাম রিকশা তো খুব চলে আর সাইকেল রিকশার সবচেয়ে বেশি বিক্রয় হয় স্পোক। স্পোকটা ভেঙ্গে যায়। ভাবলাম একটা স্পোক ইন্ডাস্ট্রি দেব। এপ্লাই করলাম শিল্প ব্যাংকে। শিল্প ব্যাংকে আমার বন্ধুবান্ধব ছিল। জেনারেল ম্যানেজার মোস্তফা কামাল ছিলেন আমার রুমমেট। বলল, দোস্ত তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি তোমার প্রোপজালটা নেক্সট বোর্ড মিটিংয়ে পাস করিয়ে দেব। হয়ে যাবে। ...কিন্তু আর পাসই হয় না। কী ব্যাপার? বললো প্ল্যানিং কমিশনে গেছে, তারা না করে দিয়েছে। প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে একটা স্পোক ইন্ডাস্ট্রির কী সম্পর্ক আমি বুঝি না। প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন নুরুল ইসলাম। সদস্য রেহমান সোবহান। আমি তো ভাবলাম পোয়াবারো। (দু'জনই আমার শিক্ষক)। সোবহান স্যারকে ফোন করে গেলাম। বললাম, আমার স্পোক ইন্ডাস্ট্রির একটা প্রস্তাব আছে, আপনি তা না করে দিয়েছেন? উনি বললেন, হ্যাঁ আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি করেছি একটা সাইকেল ইন্ডাস্ট্রি করবো। ওর মাধ্যমেই আমরা সারা দেশ কাভার করবো। যত সাইকেল পার্টস আছে সব সেখানেই তৈরি হবে। আমি বললাম, স্যার ওদের স্পেসিফিকেশনই আলাদা। চাইনিজদের সঙ্গে আমাদের একটা মিল আছে। বললেন, না না আমরা অলরেডি সাইন করে দিয়েছি। তারা আসবে, আমরা জমির চেষ্টা করছি।...আমি তর্ক করছি, উনি ক্ষেপে গেলেন। বললেন, মনজুর, পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্যোক্তাদের আমরা তাড়িয়েছি পুঁজিবাদ তাড়াতে।... দেখুন, সৈয়দ মনজুর এলাহী, *আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার*, সাপ্তাহিক, ২৬ আগস্ট ২০১০, ঢাকা, পৃ. ২১৫।

অন্যত্র আলোকপাত করা হয়েছে। এইরূপ পরিস্থিতিরই সামগ্রিক যোগফল ছিল জাসদ। বলা যায়, একাত্তরের মার্চে সিরাজুল আলম খান পতাকা, জাতীয় সংগীত ইত্যাদি তৈরি করে মুজিবকে যেমন এক ধরনের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার মাঝে ফেলে দিয়েছিলেন– মাত্র ১২ মাস পরেই মুজিবও নীরব এক রাজনৈতিক উপেক্ষার মাধ্যমে সিরাজকে অনুরূপ এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মাঝে ফেলে দেন। প্রথমোক্ত খেলার ফল ছিল যুদ্ধ, আর দ্বিতীয় খেলার ফল দাঁড়িয়েছিল গৃহযুদ্ধ।

ঠিক এসময়টিতে জাসদের নেতৃস্থানীয় সংগঠকদের অনেকে আশা করতেন তাজউদ্দীন শেষপর্যন্ত তাদের সঙ্গে চলে আসবেন। আসবেন আবদুর রাজ্জাকও। কিন্তু এদের অজ্ঞাতে ভিন্ন আরেকটি মহল অপর একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে থাকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বর্তমান জাসদের একজন সংগঠকের মতে তৃতীয় এই 'পরিকল্পনা'টি ছিল এমন যে, তিয়াত্তরের নির্বাচন শেষে তাজউদ্দীনকে সভাপতি করে নতুন একটি দল গঠিত হবে। তার আগে নির্বাচনে বিশেষভাবে বাছাইকৃত অন্তত একশত জনের মনোনয়ন পাওয়া ও বিজয় নিশ্চিত করা হবে; আর তরুণ এই এমপিরাই হবেন নতুন দলটির শক্তিভিত। দেশের বাইরের একটি মহল যখন এই পরিকল্পনা নিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে তখনি হুট করে প্রায় একক সিদ্ধান্তে সিরাজুল আলম খান জাসদ গঠন করে ফেলেন। আর এসময় জাসদের অন্যতম শ্লোগান হয়ে ওঠে 'রুশ-ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার–সাবধান।' এত দ্রুত জাসদের গোড়াপত্তন, নতুন দলটির প্রধান শ্লোগান নির্ধারণ, ভারত বিরোধী আইকন মেজর এম এ জলিলকে নতুন দলের সভাপতি নির্বাচন, মুজিব সরকার থেকে তাজউদ্দীনকে অপসারণ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আবদুস সামাদ আজাদকে সরিয়ে ড. কামাল হোসেনকে নিয়োগ, যুদ্ধকালে বাংলাদেশকে ঘিরে তাজউদ্দীন সৃষ্ট ভারতীয় বলয় থেকে বেরোনের জন্য মুজিবের প্রাণান্তকর চেষ্টা এসবই ছিল একসূত্রে গাঁথা। 'মুজিব তখন দেশজুড়ে ভারত বিরোধী জন-জোয়ার চাইছিলেন', বললেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উপরোক্ত নেতা।

প্রশাসনিকভাবে এসময় মুজিবের উল্লেখ্যযোগ্য এবং দূরদর্শী এক কৃতিত্ব ছিল বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বেসামরিক প্রশাসনকে প্রত্যাহার করানো। এই উদ্যোগের পটভূমিটি এ পর্যায়ে ব্যাখ্যা করা প্রাসঙ্গিক হবে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন আত্মসমর্পণ করে তখন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রশাসনের কর্তৃত্ব নেয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার বা ঐ সরকারের কাউকে উপস্থিত পাওয়া যায়নি। এসময় নতুন দেশের নবীন প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় জেনারেল বি এন সরকার।[১৮৭] মে. জে. সরকার

---

[১৮৭] Aftab Ahmed, *Politics Ethnicity and Security: Bangladesh and South Asian Perspective*, Riverside Press, 2012, Dhaka, p.6.

একাত্তরের প্রথম দিকে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ-এর মিলিটারি সেক্রেটারি। একই বছরের শেষের দিকে তাঁকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিভিল এফেয়ার্স অর্গানাইজেশনের (Civil Affairs Organization-CAO) প্রধান করা হয়। বাংলাদেশের যুদ্ধকালেই, বিশেষত ভারতীয়রা যখন যুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ হস্তক্ষেপের দিকে এগিয়ে যায়– তখনই প্রথমবারের মতো ভারতীয় সেনাবাহিনী CAO তৈরি করে তাদের ইস্টার্ন কমান্ডের অধীনে। শুরুতে CAO-এর প্রধান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার এস সি সিনহা, পরে বি এন সরকার ঐ দায়িত্ব নেন।[১৮৮] এসময় প্রস্তাব করা হয় যে, ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সহায়তায় সেদেশের পুলিশ নতুন দেশটির আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নেবে এবং প্রশাসন দেখবে সেদেশের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা। বিশেষ করে বাংলাদেশের সকল মন্ত্রণালয়ে ন্যূনপক্ষে একজন করে ভারতীয় প্রশাসনিক উপদেষ্টা থাকবেন। এসব নিয়ে আলাপচারিতা ও মতবিনিময়ের মধ্যবর্তী সময়ে কার্যত বাংলাদেশ পরিচালনা করছিল বি এন সরকারের নেতৃত্বে CAO. কলকাতা থেকে প্রবাসী সরকারের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের নজরদারির দায়িত্বও ছিল বি এন সরকার ও CAO-এর ওপর। যুদ্ধ জয় সত্ত্বেও অন্তত ছয় দিন পর্যন্ত প্রবাসী সরকার নিকটবর্তী কলকাতায় অবস্থান করেও মাতৃভূমিতে আসতে ব্যর্থ হয়। মাঝের এই সময়টিতে বি এন সরকারই ছিলেন কার্যত বাংলাদেশের বেসামরিক প্রধান।[১৮৯] এসময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ঢাকাসহ সকল জেলা থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণকৃত সকল অস্ত্র ভারতে নিয়ে যাওয়া। এই প্রক্রিয়ায় কেবল যে অস্ত্রসম্ভার নিয়ে নেয়া হয় তাই নয়– বাস, ট্রাক, ভারী কল-কারখানাও খুলে খুলে নিয়ে নেয়া হয়। এইরূপ লুণ্ঠনের বিরোধিতা করতে গিয়েই সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল CAO-এর রোষানলে পড়েন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন সামরিক নেতৃত্বও CAO-এর কার্যক্রমে এক ধরনের

---

১৮৮ Aftab Ahmed, *Ibid.*

১৮৯ বাংলাদেশে বি এন সরকারের ঐ সময়কার ভূমিকার সঙ্গে একালে (২০০৩-২০০৪ সময়ে), যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনীর অধীনে ইরাকে Paul Bremer-এর ভূমিকার কিছুটা তুলনা করা যায়। ইরাকে ন্যাটো বাহিনী ঢুকে পড়ার পর Paul Bremer-কে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে 'প্রশাসক' করে পাঠানো হয়েছিল। Paul Bremer সেখানে CPA (Coalition Provisional Authority) গড়ে তুলে তার স্বঘোষিত প্রশাসক তথা দেশটির প্রধান নির্বাহী হন। ইরাকের এই CPA-এর মতোই ছিল একাত্তরে বাংলাদেশে বি এন সরকারের নেতৃত্বাধীন CAO. প্রশাসক হিসেবে Paul Bremer ডিক্রি জারি করে ইরাক পরিচালনা করতেন। তাঁর প্রথম ডিক্রি ছিল সেদেশের বাথ পার্টি নিষিদ্ধ করা; দ্বিতীয় ডিক্রি ছিল ইরাকের সেনাবাহিনী ভেঙে দেয়া ইত্যাদি। তীব্র বিক্ষোভের মুখে ২০০৪-এর জুলাই থেকে ইরাকিরা Paul Bremer-এর হাত থেকে ধীরে ধীরে তাদের কিছু স্বাধিকার ফিরে পায়। বাংলাদেশে CAO গুটিয়ে যেতে থাকে মুজিব আসার পর।

নীরব সহযোগিতাই দিয়ে গেছে। খোদ ওসমানী দেশে ফিরেছিলেন– বিস্ময়করভাবে, যুদ্ধ বিজয়ের আট দিন পর। যুদ্ধকালীন ৭ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার কাজী নূরুজ্জামান ঐসময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখেছেন,

> We knew that the Indians had whisked away all the Pakistani weapons, ammunitions, trucks, tanks and cannons. Our military HQ had to know it. However, the Mukti Bahini was not directed to do anything about it. Major Jalil of Sector 9 was relatively young, patriotic, and fierce. He stood up against the Indians when they started to take away cars, buses, trudks, factory equipment and materials, just as I had tried to stop them from carrying off jute products from Mohodipur sub-sector after December 16. But with Jalil, it got complicated. He got into trouble. He was arrested and brought to Dhaka. Our military HQ had many charges agaunst him.[১৯০]

খোদ সেক্টর কমান্ডার এম এ জলিলও তাঁর যুদ্ধকালীন আত্মজীবনী[১৯১]তে বেশ খেদের সঙ্গে সে সময়কার ঘটনাবলি স্মরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> ...সুপরিকল্পিত উপায়ে তারা (ভারত) বাংলাদেশকে লুণ্ঠন করে। খুলনা ও যশোরে আমি তাদের লুট দেখেছি। ভারত যদি মানবতার খাতিরেই যুদ্ধ করে থাকে তাহলে এ ধরনের লুট বড় এক হীনমন্যতার পরিচয়।...একাত্তরের ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর রাতে ভারতীয় সৈনিকরা কারফিউ দিয়ে পরিকল্পিতভাবে দোকান-পাট, ফ্যাক্টরী, পোর্ট, রেডিও স্টেশন, নিউজপ্রিন্ট মিল লুট করে। এমনকি ছোট ছোট বাড়ি-ঘরও বাদ যায় নি। সারা রাত ধরে এই লুণ্ঠন চলে। এর বাইরে ট্রাকে করে পাক-হানাদারদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ি, সরঞ্জাম ভারত সেদেশে নিয়ে গেল। যেন তারা দেশটা জয় করেছে। ১৮ ডিসেম্বর এই স্বেচ্ছাচারিতার বিবরণ লিখে ওদের অধিনায়কের কাছে পাঠিয়েছিলাম। মি. তাজউদ্দীনের কাছেও এক কপি পাঠিয়েছিলাম।... এই প্রতিবাদলিপি পাঠাবার পর সব যেন কর্দমাক্ত হয়ে উঠলো। ৩১ ডিসেম্বর যশোরের কাছে ওত পেতে আমাকে আটক করা হয়। তারা আমাকে মেরেই ফেলতো– যদি না আমার সঙ্গে ১৫ জন সাথী থাকত।... যশোর ক্যান্টনমেন্টের এক নির্জন কক্ষে আমাকে নিক্ষেপ করা হলো।

---

১৯০ Quazi Nooruzzman, *Ibid,* p.110-111.

১৯১ *সীমাহীন সমর*, মেজর জলিল রচনাবলি, সম্পাদনা: মাসুদ মজুমদার, প্রকাশক: সায়মা জলিল, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২১২-২১৩.

আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম,
'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তুমি বিদ্রোহী।'

দু'জন সেক্টর কমান্ডারের উপরের দুটি বিবরণ থেকে স্বাধীনতা-উত্তর দেশের প্রশাসনিক নৈরাজ্য সম্পর্কে অনেকখানি ধারণা পাওয়া যায়। যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশে এটা অস্বাভাবিক নয়। তবে বাংলাদেশে যা ঘটেছে তা ছিল পরিকল্পিত।[১৯২] বি এন সরকারের নেতৃত্বাধীন CAO-এর প্রশাসনের ওপরই উপরোক্ত পরিস্থিতির দায় বর্তায়। একই সময়ে প্রবাসী সরকারের আগমনও বিলম্বিত করা হয়। তবে বিস্ময়করভাবে সরকারের শারীরিক অনুপস্থিতির মাঝেই এসময় স্থানীয় মুদ্রার মান হ্রাস করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর পরবর্তী এই সময়টিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে ডি পি ধর ঢাকা আসেন (২৩ ডিসেম্বর) এবং ঢাকায় তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ছিল বাংলাদেশের সচিব পর্যায়ের আমলাদের এক সমাবেশে সভাপতিত্ব করা! ডি পি ধরের ঐ বৈঠকের পরই এক ঘোষণায় সরকারি কর্মকর্তাদের বেতনের সর্বোচ্চ সিলিং এক হাজার টাকায় বেঁধে দেওয়া হয়। ফলে অনেকের মাইনে কমে যায়। এসময় একদল ভারতীয় বেসামরিক প্রশাসনিক উপদেষ্টাও ঢাকায় চলে আসেন 'যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পরিচালনার লক্ষ্যে।' যে বিষয়ে সাংবাদিক নির্মল সেনসহ অন্যান্য সূত্রের সমর্থনসূচক ভাষ্যও এ গ্রন্থের অন্যত্র (৪.ঘ উপ-অধ্যায়ের ২৬৭ ও ২৭০ নম্বর তথ্যসূত্রে) তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের কীরূপ বিব্রতকর অবস্থা তৈরি হয় তার বিবরণ

---

[১৯২] ভারত এসময় কী পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে যায় তার কোনো নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় না। তবে যুদ্ধের পর পাকিস্তানে প্রধান বিচারপতি হামুদুর রেহমানের নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন হয় তার প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, লুণ্ঠিত অস্ত্রের মধ্যে আর্মাড ও আর্টিলারি রেজিমেন্টের বিপুল মর্টার ব্যাটারি, ইনফ্যানট্রি'র হাজার হাজার এলএমজি ও মেশিনগান ছাড়াও অন্তত ৬৩টি ট্যাংক, পাঁচটি সিগনাল ও চারটি ইঞ্জিনিয়ার্স ব্যাটালিয়নের সরঞ্জাম, ১০টি গানবোট, ১৮টি এফ-৮৬ ফাইটার ইত্যাদি রেখে গিয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। যা বাংলাদেশ পায়নি।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল পাটকলগুলোর ভারী যন্ত্রপাতির প্রতি ভারতীয়দের পরিকল্পিত আকর্ষণ। এ সম্পর্কে কমিশন লিখেছে, The loot was partly planned and organized for the benefit of Indian industrialists who were interested in acquipment acquiring the modern jute machinery installed in East Pakistan since 1947.

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ দিয়ে উপরোক্ত কমিশন এও জানিয়েছে, উল্লিখিত সরঞ্জাম দ্রুত সরিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সেসময় খুলনা থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রতিদিন একের পর এক ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিবেদন পাকিস্তানের এলিট সমাজ ও সেনাবাহিনীর জন্য চরম অপমানকর বিবেচিত হতে পারে এবং তাদের নৈতিক মনোবল আরও ভেঙে পড়তে পারে বিবেচনায় ২০০০ পর্যন্ত অপ্রকাশিতই থেকে যায়। প্রতিবেদনটির বিস্তারিত দেখুন, *The Report of the Hamoodur Rehman Commission of inquiry into the 1971 war*, Vanguard, Lahore, p. 494, 496-97.

পাওয়া যায় সেই সময়কার কুমিল্লার এডিসি মোফাজ্জল করিমের নিম্নোক্ত বিবরণ থেকে :

> (স্বাধীনতার পরপর) একদিন কুমিল্লায় আমাদের অফিসে নাজিল হলেন এক সুদর্শন ভদ্রলোক। তিনি নাকি এসেছেন দিল্লি থেকে– ভারত সরকার তাঁকে পাঠিয়েছে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করতে। তিনি মি. বিষ্ণুই। তিনি একজন আইএএস অফিসার– দিল্লির ইউনিয়ন গভর্মেন্টের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি।...তাঁর অনুরোধে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের ব্যবস্থা করলাম।...তিনি জানালেন, আমাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ইকোনমি পুনর্গঠনের জন্য জনশক্তি কী লাগবে, সে সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা তিনি পেতে চান। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে জনপ্রশাসনে, প্রকৌশল ও স্বাস্থ্যখাতে দিল্লি দ্রুত দক্ষ জনবল পাঠাবে।...'[১৯৩]

উল্লেখ্য, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন চিত্র ছিল না। ঢাকাসহ অন্যত্রও এ রকম ঘটনা ঘটেছিল। তবে ভারতীয় প্রশাসনিক উপদেষ্টারা স্থানীয় বাধার মুখে বাংলাদেশে কোনো কাজ করতে পারেননি। অনেককে বেশ নাজেহাল হয়েই বাংলাদেশ ছাড়তে হয়।[১৯৪] বিশেষ করে মুজিব দেশে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী সময়ে জনমনস্ত

---

১৯৩ মোফাজ্জল করিম, *জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য*, অনন্যা, ২০১৩, ঢাকা, পৃ ৭২। উল্লেখ্য, সিএসপি কর্মকর্তা মোফাজ্জল করিম পরে ১৯৯৯ সালে প্রশাসন থেকে সচিব হিসেবে অবসর নিয়েছিলেন।

১৯৪ একজন বিদেশি হয়েও ডি পি ধর কীভাবে বাংলাদেশের আমলাদের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং তাঁর ঐ ভূমিকা কীভাবে সেসময় প্রশ্নের উদ্রেক করেছিল সে বিষয়ে কূটনীতিবিদ ফারুক চৌধুরীর বিবরণ দেখুন: *দেশ-দেশান্তর*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ৮১-৮২। অন্যদিকে ঢাকায় বিভিন্ন স্তরের ভারতীয় প্রশাসকদের আগমন ও তার বিপরীতে স্থানীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষাবিদ সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন,

> 'বাংলাদেশ সৃষ্টির সাথে সাথে ভারতীয় কিছু পদস্থ কর্মকর্তা আমাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন।... রেডিওতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন রণেন আচার্য। কিন্তু আশরাফুজ্জামানের নেতৃত্বে রেডিওর কর্মচারীরা তাঁকে তাড়িয়ে দেন এবং তিনি ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় নেন। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়েও একজন ভারতীয় এসেছিলেন। মিল্কভিটা দুগ্ধ প্রকল্পকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় 'আমূল' প্রকল্পের একজন কর্মচারী এসেছিলেন।...এরা বেশিদিন ঢাকায় থাকেননি। এ দু'জন আমার বাসায়ও এসেছিলেন। আমার বিশ্বাস, কলকাতায় অবস্থানরত তাজউদ্দীন সরকার ভারতের সাহায্যের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তা না হলে ভারত কেন তাদের কর্মচারীদের আমাদের দেশে পাঠাবেন? দেখুন, সৈয়দ আলী আহসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১।

আরেকজন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (যিনি প্রবাসী সরকারের প্ল্যানিং সেলে তখনকার প্রধানমন্ত্রীর একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে কাজ করেছেন) এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে তাঁর '*আমার একাত্তর*' গ্রন্থে জানাচ্ছেন, ভারত এসময় বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায়

ত্বে এইরূপ ভারতীয় সহায়তার ব্যাপারে মনোভাবের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য যায়। ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মুজিব কলকাতা সফরকালে ইন্দিরা গান্ধীকে এ মর্মে সম্মত করাতে সমর্থ হন যে, CAO কাঠামো বাংলাদেশ থেকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করা হবে। সে অনুযায়ী পরবর্তী তিন সপ্তাহের মধ্যে সেটা বাস্তবায়িত হয়।[১৯৫] বস্তুত, বাংলাদেশের হবু সরকার তাদের ইচ্ছা ও প্রত্যাশা মতো পরিচালিত হয় কি না এ নিয়ে যুদ্ধের সময় থেকে ভারতীয়রা উদ্বিগ্ন ছিল। যুদ্ধকালীন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে Richard sisson ও Leo E. Rose তাঁদের যৌথ গবেষণায় মন্তব্য করেছেন,

> The Indians were skeptical not only of the capacity of the Bangladeshi political groups...but also of the political orientation and stability of any Bangladeshi government not set up under Indian guidance and supervission.[১৯৬]

তাজউদ্দীন আহমদ ভারতীয় উপরোক্ত উদ্বেগ মেটাতে বরাবর সর্বোচ্চ করেছেন। কিন্তু, মুজিব শাসনদণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ধীরে ধীরে তাজউদ্দীন ও ভারতীয় পরিকল্পনায় কিছু কাটছাট শুরু করেন। এসময় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেই আরেকটি রাজনৈতিক কাঠামো– বীজের অঙ্কুরোদগম আকারে দৃশ্যমান হতে থাকে। ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহারের ছয় মাস

তাদের একজন করে কর্মকর্তাকে সংযুক্ত করতে আগ্রহী ছিল। (সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৫)

১৯৫ তবে মুজিব কর্তৃক CAO-কে নিষ্ক্রিয় করা হলেও দেশে ঐসময় সরকারি তরফ থেকে কোনো ধরনের ভারত বিরোধী সমালোচনাই সহ্য করা হচ্ছিল না। কেবল মুজিব বা তার দলই নয় সিপিবি ও ন্যাপও এক্ষেত্রে তীব্র স্পর্শকাতরতা দেখিয়ে যাচ্ছিল। যার এক প্রকাশ হিসেবে দেখা যায়, যুদ্ধশেষে দেশে আসার পর দৈনিক বাংলায় মাওলানা ভাসানী এক সাক্ষাৎকারে 'ভারতীয় বন্ধুত্বের স্বরূপ' সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করায় পরদিনই কাগজটির সামনে বিক্ষোভ দেখায় সিপিবি'র অঙ্গশাখা ছাত্র ইউনিয়ন। ঐ বিক্ষোভের চাপে সরকারি ঐ দৈনিক ২৬ জানুয়ারি সাক্ষাৎকারটি প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। এটা ছিল স্বাধীনতা-উত্তর গণমাধ্যমে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চাপের শুরু– যে চাপ আর কখনো কাটিয়ে ওঠা যায়নি। উল্লেখ্য, মাওলানা ভাসানী ১৯৭২-এর ২২ জানুয়ারি যখন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন শাসক গোষ্ঠীর তরফ থেকে কেউ তাকে কোথাও স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন না। নীরবে নিভৃতে তিনি টাঙ্গাইলের সন্তোষে জীর্ণ কুটিরে প্রবেশ করেছিলেন। আর ইতিহাসের ঠিক ঐ সময়টিতে ১৯৭২ সালের ২২ এপ্রিল বাংলাদেশে লেনিনের ১০২তম জন্মবার্ষিকী পালন করতে গিয়ে সিপিবি নেতা মনি সিংহ বলেন, 'মহান লেনিনের আদর্শ অনুসরণ করেই মুজিব সরকার বাংলাদেশের উন্নয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।' দেখুন: *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭২।

১৯৬ *War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh*, University of California Press, 1990, P. 207.

নাগাদ জাসদের প্রথম আহ্বায়ক কমিটি ঘোষিত হয়। এই কমিটির সাত সদস্যের তালিকায় সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে যিনি অন্তর্ভুক্ত হন সেই রহমত আলী তাজউদ্দীনের ইচ্ছাতেই নতুন দলের নেতৃত্বে সংযুক্ত হন বলে কথিত ছিল। কিন্তু চূড়ান্তভাবে জাসদ গড়ে ওঠার পর তাজউদ্দীন তো তাতে শামিল হনই নি উপরন্তু তাঁর 'প্রতিনিধি' হিসেবে চিহ্নিত রহমত আলীও দ্রুত জাসদ ত্যাগ করেন।'[১৯৭] যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তখন ধীরে ধীরে আওয়ামী লীগে কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন। এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা যায়, যুদ্ধ-পূর্বকালে আওয়ামী লীগের সফল সাধারণ সম্পাদক এবং যুদ্ধকালীন সফল প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে মাত্র তিন মাসের মধ্যে 'আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠন' করার যে উদ্যোগ নেন তাতে সাধারণ সম্পাদক করা হয় জিল্লুর রহমানকে। এক্ষেত্রে জিল্লুর রহমানের প্রধান 'যোগ্যতা' হিসেবে দেখা হয় 'মুজিববাদ'-এর প্রতি তাঁর দৃঢ় সমর্থনকে।[১৯৮] এসময় গণপরিষদেও ডেপুটি লিডার পদে তাজউদ্দীনকে না নিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে নেয়া হয়।[১৯৯]

---

১৯৭ এসময় আবদুর রাজ্জাককেও জাসদে প্রত্যাশা করা হলেও তিনি পিছু টান দেন।

১৯৮ জোহরা তাজউদ্দীন-এর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন, কামাল হোসেন (*তাজউদ্দীন আহমদ: বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর*, অংকুর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৪১)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শিক্ষক ড. মো. নূরুল ইসলাম, যিনি মুজিব বাহিনীর একজন যোদ্ধা এবং সিরাজুল আলম খানের একজন অনুরাগী শিষ্য ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন– বর্তমান লেখকের সঙ্গে ০৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে এক আলাপচারিতায় দাবি করেছেন, জাসদ গঠনের পেছনে জিল্লুর রহমানের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়াও একটি কারণ ছিল। তাঁর মতে, সিরাজ ঐ পদ পেতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু যুবনেতা মণিও একই আগ্রহ প্রকাশ করায় বিবাদ এড়াতে জিল্লুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। তবে সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠ একজন প্রাক্তন রাজনৈতিক সংগঠক বর্তমান লেখককে বলেছেন, মুজিব নিজেই সিরাজুল আলম খানকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষোক্তজন অজ্ঞাত কারণে তাতে রাজি হননি। এমনকি আওয়ামী লীগের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও কাকরাইলে এই দলের স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম যে সাংগঠনিক সম্মেলন বসে তাতে সিরাজুল আলম খানকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে ডেলিগেট করা হয়েছিল। অন্যদিকে মনিরুল ইসলাম দাবি করেছেন, কাকরাইলে স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগের ঐ প্রথম কাউন্সিলে কামরুজ্জামানকে সভাপতি এবং আবদুর রাজ্জাককে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়ে মুজিব দলীয় ও সরকারি আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবেন এমনি 'কথা ছিল'। বাস্তবে তা না ঘটায় ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খান সমর্থকরা ভাবতে শুরু করেন যে মুজিব বিশেষ কোনো চাপের মধ্যে রয়েছেন। দেখুন, মনিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২২।

১৯৯ এক্ষেত্রে মণির সমর্থক পরিমণ্ডলে একটি যুক্তি তুলে ধরা হয় এভাবে যে, ১৯৭০-এ নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের নিয়েই যেহেতু বাহাত্তরের গণপরিষদ গঠিত এবং যেহেতু জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি দলের উপনেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রাদেশিক পরিষদে মূলনেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাজউদ্দীন আহমদের অবস্থানের এভাবে কেবল অবনতিই ঘটছিল। যার চূড়ান্ত এক পর্যায়ে ১৯৭৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত এবং ৭ জুনে গঠিত 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ (বাকশাল)'-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটি– কোথাও ঠাঁই হয়নি তাজউদ্দীন আহমদ-এর (যদিও নতুন দলের নামটি তাঁর দেওয়া বলে কথিত রয়েছে[২০০])। এ সময় বাকশালের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে 'মুজিব বাহিনী'র প্রতিনিধি হিসেবে দু'জনকে দেখা যায়। তিন জন সেক্রেটারি (জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মণি ও আবদুর রাজ্জাক)-এর দুজনই ছিলেন মুজিব বাহিনীর নেতা। এদের প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাও দেওয়া হয়। লক্ষ্যণীয়, প্রবাসী সরকারে তাজউদ্দীন আহমদ ভারতীয় সমর্থন নিয়ে মুজিব বাহিনীর বৈরিতা সামাল দিলেও স্বাধীন দেশে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে সেই সুরক্ষা দিতে পারেননি বা দেননি। মুজিব বাহিনী এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে শেখ মণিই শেষপর্যন্ত 'বিজয়ী' হন। অন্যদিকে যুদ্ধোত্তর ছয় মাসের মধ্যে মুজিবের একান্ত বলয়ে তাজউদ্দীন ও সিরাজুল আলম খান উভয়ে ভূতপূর্ব গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন প্রায় পুরোপুরিভাবে।

বলা বাহুল্য, সরকার থেকে তাজউদ্দীন আহমদ-এর অপসারণ এবং আওয়ামী ঘরানা থেকে সিরাজুল আলম খান ও তার অনুসারীদের বিচ্ছেদের পর অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর প্রভাব বিস্তারের একছত্র অবস্থা পেয়ে যান শেখ ফজলুল হক মণি। বাকশালের জন্য সাংবিধানিক আয়োজনের আগে, অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারির পূর্বে শেখ ফজলুল হক মণি ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য মাত্র। কিন্তু একক জাতীয় দল 'বাকশাল' গঠনের পর তাঁর কর্তৃত্ব একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত রূপ পায়, কারণ আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও সিপিবি'র মতো রাজনৈতিক দলসমূহের সদস্য ছাড়াও রাষ্ট্রের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীরাও বাকশালের সদস্য ছিলেন। কেবল তিন জন সম্পাদকের একজন হিসেবে নয়– চূড়ান্তভাবে বাকশালের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার কথা ছিল শেখ মণি'রই– যদিও প্রাথমিকভাবে ঘোষিত কমিটিতে এম মনসুর আলীর নাম 'সেক্রেটারি জেনারেল' হিসেবে উল্লেখিত হয়।[২০১] ১৫ আগস্ট অধ্যায়ের কারণে বাধাগ্রস্ত না হলে সেটা

ক্যাপ্টেন [অব.] মনসুর আলী, তাই তাজউদ্দীনকে গণপরিষদে মুজিবের পরবর্তী মর্যাদায় অভিষিক্ত করার সুযোগ নেই। দেখুন, আমির হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০।

২০০ Mahfuz Ullah, *ibid*, p.124.

২০১ এ বিষয়টি নিশ্চিত হয় শেখ মণি কর্তৃত্ব এনায়েতুল্লা খানকে বাংলাদেশ টাইমস্-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ সংক্রান্ত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। বাকশাল গঠিত হওয়ার পর দেশে চারটি দৈনিক পত্রিকা রেখে বাকিগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। জীবনী ভিক্ষা পাওয়া দৈনিকগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ টাইমস্ও ছিল। মণি ছিলেন এই দৈনিকের সম্পাদক। কিন্তু বাকশালের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হবে বিধায় মণি

হতো জাতীয় পরিসরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মুজিব বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয় এবং নতুন অধ্যায়। আওয়ামী লীগের কাঠামোতে মুজিব বাহিনী থেকে উত্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেবল নূরে আলম সিদ্দিকী বাকশালরূপী একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন।[২০২] বাকশাল গঠনের আগে মুজিব সিরাজুল আলম খানকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যে কোনোভাবে ঐ দলে সম্পৃক্ত হতে অনুরোধ করেছিলেন বলে দাবি করেছেন শেষোক্তজনের ঐ সময়কার এক তরুণ সহযোগী মহিউদ্দিন আহমদ। তাঁর বর্ণনাটি ছিল নিম্নরূপ :

> (১৯৭৪-এ) শেখ মুজিব অত্যন্ত চাপের মুখে ছিলেন। একদিকে তাঁর সাংবিধানিক গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা, অন্যদিকে অবনতিশীল পরিস্থিতি।...অনেকদিন তাঁর সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল না। জাসদের বিরুদ্ধে পুলিশ, রক্ষীবাহিনী ও আওয়ামী লীগের দলীয় সন্ত্রাস ছিল ব্যাপক। তথাপি খান ছিলেন মুক্ত। তাঁকে কেউ ছোঁয়নি। এ পর্যায়ে মুজিব, সিরাজুল আলম খানকে অনুরোধ করলেন– তিনি একটি জাতীয় দল করবেন, রব-জলিল যেন সেই দলে যোগ দেয়। তাদের যোগদান

টাইমস্-এর সম্পাদকের দায়িত্বভার ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং মুজিব ও মণি-এর মধ্যে ঐকমত্য হয় যে, টাইমস্-এর নতুন সম্পাদক করা হবে এনায়েতুল্লা খানকে। ১৯৭৫ সালের ২৯ জুলাই মুজিবের সঙ্গে এবং ৯ আগস্ট ফজলুল হক মণির সঙ্গে এতদবিষয়ে এনায়েতুল্লা খানের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়। এ বিষয়ে এনায়েতুল্লা খানের ভাষ্য এবং সংশ্লিষ্ট বিবরণের জন্য দেখুন, Mahfuz Ullah, *Press Under Mujib Regime*, Kakali Prokashani, 2002, Dhaka, p. 133. উপরোক্ত বিবরণের কৌতূহল ও কৌতুককর দিক হলো, ১৯৭৫ সালেই এনায়েতুল্লা খান তাঁর লেখনীর জন্য মুজিবকর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা আইনে কয়েকমাস কারাবরণ করলেও [লেখক মাহফুজ উল্ল্যাহ'র বিবরণ থেকে আরও দেখা যায়] একদলীয় ব্যবস্থা হিসেবে বাকশাল গঠনের পর দেশের গণমাধ্যম জগতকে চারটি দৈনিকে সীমিত করে আনার প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে মুজিবকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহায়তা করেছিল তিন সদস্য বিশিষ্ট যে সাংবাদিক কমিটি– তারও সদস্য ছিলেন এনায়েতুল্লা খান; কমিটির অন্য দুই সদস্য ছিলেন তোয়াব খান ও শহীদুল হক। দেখুন, *Ibid*, p. 133. এই বিষয়ে সমর্থনসূচক ভাষ্য মেলে সেসময় প্রেসিডেন্টের সহকারী প্রেস সচিব মাহবুব তালুকদারের লেখনিতেও। দেখুন: *বঙ্গভবনে পাঁচ বছর*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ১৪২।

২০২ আওয়ামী লীগের মধ্যে বাকশাল কার্যক্রমের অন্যান্য বিরোধী ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, জেনারেল (অব.) ওসমানী, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন প্রমুখ। দেখুন, এম এ ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ইউপিএল, এপ্রিল ২০০০, ঢাকা, পৃ. ২৩৩। জাতীয় সংসদে নূরে আলম সিদ্দিকী একদলীয় ব্যবস্থার বিরোধিতা করে দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলেন এবং সেই থেকে দলটিতে তাঁরও 'ভাগ্য বিপর্যয়' ঘটে এবং আজও তিনি সেই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেননি। জাতীয় সংসদের ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আরও কিছু বিতর্ক থেকে দেখা যায়, জনাব সিদ্দিকী সেসময় কিছু কিছু বিষয়ে স্বাধীন মত প্রদানের চেষ্টা করতেন।

যেন সিরাজুল আলম খান নিশ্চিত করেন। তিনি এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না।...মুজিবের পরামর্শে মোহাম্মদউল্লাহ চুয়াত্তরের ২৮ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। নীতিনির্ধারক মহলে সিদ্ধান্ত হয়, সিরাজুল আলম খানকে গ্রেফতার করা হবে। পরদিন তিনি মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত চলে যান। ফিরেন পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর।[২০৩]

মহিউদ্দিন আহমদের উপরোক্ত ভাষ্যটি স্বাধীনতা-উত্তর জাসদ রাজনীতি বোঝার জন্য খুবই ইঙ্গিতবহ। বর্তমান লেখক সিরাজুল আলম খানের নিজস্ব রাজনৈতিক আড্ডায় যাতায়াত করেন এমন ব্যক্তিদের ব্যবহার করে তাঁর সঙ্গে পরোক্ষ আলাপচারিতার মাধ্যমে এটা নিশ্চিত হয়েছেন, বাহাত্তর থেকে বাকশাল গঠনের পূর্ব পর্যন্ত জাসদ রাজনীতির উত্তাল নানান ঘটনা প্রবাহের মাঝেও শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের যোগাযোগ ছিল– এমনকি তাঁরা দেখা-সাক্ষাৎও করতেন। রক্ষীবাহিনী যখন জাসদ কর্মী পাওয়া মাত্র তুলে নিয়ে যাচ্ছে তখনও সিরাজুল আলম খানের নির্বিঘ্ন গোপন জীবনের যোগসূত্র ছিল সম্ভবত এখানেই।

একই বিষয়ে সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠ তরুণ সহযোগী মনিরুল ইসলামেরও সমর্থনসূচক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। তিনি লিখেছেন :

(১৯৭২-এর মাঝামাঝি থেকে আওয়ামী লীগ থেকে জাসদের বিভক্তি প্রক্রিয়া শুরু হলেও) সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগাযোগের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রায়ই গণভবনে দু'জনের একান্ত সাক্ষাৎ হতো এবং যা ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জরুরি অবস্থা বলবৎ করার আগ পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এই সাক্ষাৎগুলোতে নিয়মিত মতবিনিময় অব্যাহত ছিল। '৭৪-এর ১৭ মার্চের পর জাসদের অনেকের নামে হুলিয়া থাকলেও আজিমপুরের একটি নির্দিষ্ট বাসায় সিরাজুল আলম খানের অবস্থান জাতির পিতার জানা ছিল। ফলে যোগাযোগের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।[২০৪]

এইরূপ বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়, শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকে প্রত্যাশা করেছেন, সিপিবি, ন্যাপ, সর্বহারা পার্টি ও পুরানো নকশালদের হাত থেকে মুজিব বাহিনীর সশস্ত্র তরুণদের সরিয়ে রাখতে হলে জাসদের মতো একটি কাঠামো গড়ে উঠুক এবং জারি থাক। কিন্তু মুজিব বাহিনীর শেখ মণি গ্রুপ ও সিপিবি-ন্যাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি যখন বাকশাল কার্যক্রম অনুমোদন

---

২০৩ মহিউদ্দিন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৩।

২০৪ মনিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩২।

করেন তখন জাসদের কর্মী বাহিনীর ভবিষ্যৎ অভিমুখ নিয়ে মুজিব নিজেও উদ্বিগ্ন ছিলেন। সিরাজুল আলম খানও তখন মনে করতেন, পুরো 'অধ্যায়'টি শেষ অংকে প্রবেশ করেছে। সিরাজ জরুরি অবস্থা জারির আগে মুজিবকে বহুভাবে নিরস্ত্র করতে চেষ্টা করেছিলেন বলে তাঁর উপরোক্ত ঘনিষ্ঠ সূত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ঐ সূত্রের মতে, 'সিরাজুল আলম খান চাইছিলেন বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে একটি বিপ্লবী সরকার– একদলীয় ব্যবস্থা নয়।' কিন্তু মুজিবকে তাঁর পরিকল্পনা থেকে হটানো যায়নি– যদিও শেখ মণি এবং শেখ মুজিবুর রহমান দু'জনই তখন চাইছিলেন, সিরাজুল আলম খান ও তাঁর অনুসারীরা পুরানো বলয়ে প্রকাশ্যে ফিরে আসুক। তারই ভিন্ন আরেকটি সাক্ষ্য পাওয়া যায় বামপন্থী রাজনীতিবিদ হায়দার আকবর খান রনোর জবানিতে। তাঁর সহযোগী কাজী জাফর আহমেদ ও রাশেদ খান মেননের মতোই তিনিও আধা আত্মগোপন অবস্থায় তখন। লিখেছেন :

> ..চারিদিকে খবর আসছিল একদলীয় ব্যবস্থা হবে। এই সময় ফজলুল হক মণি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কাজী জাফর আহমদের সঙ্গে গোপনে দেখা করেন তিনি। জাফর আমাদের আলোচনার বিষয় জ্ঞাত করালে জানতে পারি মণি'র প্রস্তাব। তাদের প্রস্তাব ছিল একদলীয় ব্যবস্থা হবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন ছয় জন। এর মধ্যে চার জন হবেন মণি নিজে, কাজী জাফর, মোহাম্মদ ফরহাদ এবং সিরাজুল আলম খান। অন্য একজনকে মুজিব নিজ পছন্দ অনুযায়ী বাছাই করবেন। আর মুজিব নিজে হবেন সুপ্রিম লিডার। মণি'র ভাষ্য অনুযায়ী, 'বঙ্গবন্ধুর সম্মতি রয়েছে এতে।' কাজী জাফর রাজি হননি। সিরাজুল আলম খানের কাছে প্রস্তাব গিয়েছিল কি না সেটাও জানি না।[২০৫]

বাহাত্তর ও পঁচাত্তরের মধ্যবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের রাজনৈতিক যোগাযোগের ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য পাওয়া যায় সেই সময়কার আরেকজন জাসদ নেতা মাহবুবুর রব সাদীর বক্তব্যেও। বর্তমান লেখকের সঙ্গে (২০১২ সালের অক্টোবরে, ঢাকায় নিজ বাসভবনে) এক সাক্ষাৎকারে সাদী স্মৃতিচারণ করে বলেন, '১৭ মার্চের উত্তাল ঘটনার পরও আমাদের দলের সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং কমিটির মিটিং হচ্ছে ঢাকাতেই সুপরিচিত চায়না বিল্ডিংয়ে। এটা আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হতো। অথচ সেসময় রক্ষীবাহিনী মাঠ পর্যায়ে আমাদের কাউকে পাওয়া মাত্র তুলে নিয়ে যেত।' উল্লেখ্য, সাদী ছিলেন জাসদের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এবং জাতীয় কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। একই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সেই সময়কার একজন সুপরিচিত সাংবাদিক আমির হোসেন এভাবে : 'সিরাজুল আলম

---

[২০৫] হায়দার আকবর খান রনো, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৩।

খানের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু যে প্রতিহিংসামূলক কোন ব্যবস্থা নেননি তার কারণ হিসেবে শোনা গেছে, পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল, তাঁর পূর্ব অনুমতি ছাড়া যেন কোনো অবস্থাতেই সিরাজুল আলম খানকে গ্রেফতার করা না হয়।'[২০৬]

অন্যদিকে বাকশালের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যোগ দিতে সিরাজুল আলম কেন শেষপর্যন্ত রাজি হলেন না সে বিষয়ে আরেক জাসদ নেতা আবু সাঈদ খান সিরাজুল আলম খানের সূত্রে আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়েছেন। ২০১২ সালের ২ নভেম্বর বর্তমান লেখককে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি যখন কারাবন্দি তখন সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে কিছু দিন থেকেছি। সেসময় একদিন কথা প্রসঙ্গে *দাদা* জানালেন, বাকশালের নেতৃত্বে যোগদানের জন্য মুজিবের তরফ থেকে যখন প্রস্তাব এলো তখন তিনি তাজউদ্দীনকেও তাতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দেন। মুজিব তখন জানান, সেটা সম্ভব নয়। এরপর আর আলোচনা এগোয়নি।' এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মুজিব তাজউদ্দীনের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি মেনে নিলে রাজনীতির পুরো চিত্রটি তাৎক্ষণিকভাবে অন্যরকম হয়ে পড়ত। উল্লেখ্য, বাকশাল গঠনের পর তাতে যোগদানে অস্বীকৃতির কারণে জাতীয় সংসদের জাসদ দলীয় সদস্য আবদুল্লাহ সরকার ও মঈনুদ্দিন মানিক তাদের সংসদ সদস্যপদ হারান। সরকারিভাবে তৈরি নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দলে যোগ না দিলে জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সংসদ সদস্যপদ বাতিলের মধ্য দিয়ে 'গণতন্ত্র' এসময় অদ্ভুত এক চেহারায় হাজির হয় বাংলাদেশে।

জাসদ রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে 'বাকশাল'-এর বিরোধিতা করলেও এটা ছিল তাদের পূর্ববর্তী সাংগঠনিক কাঠামো মুজিব বাহিনীর আদর্শ 'মুজিববাদ'-এরই নতুন সংস্করণ মাত্র। মুজিব নিজেই জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল (যার ভিত্তিতে বাকশাল কর্মসূচি আসে) পাসের সময় সমাপনী ভাষণে বলেছিলেন,

> 'স্পিকার সাহেব, আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই।...এটা আজকের কথা নয়। বহুদিনের কথা আমাদের। সেজন্য আমাদের শাসনের পরিবর্তন করতে হচ্ছে। ...আমাদের শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। This is our second revolution. যারা দেশকে ভালোবাসেন– জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রিন্সিপালকে ভালোবাসেন– তারা আসুন, কাজ

[২০৬] আমির হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪। বর্তমানে (২০১৪) আমির হোসেন ডেইলী সানের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

করুন। সেজন্য আমরা সংশোধিত সংবিধানে নতুন ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। এটা শোষিতের গণতন্ত্র।..."[২০৭]

মুজিব বাহিনী তাদের আদর্শ হিসেবে যে 'মুজিববাদ'-এর কথা বলত মুজিব নিজে তাকে যে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সম্মিলিত এক রূপ হিসেবে মনে করতেন সে বিষয়ে এই গ্রন্থের অন্যত্র বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো ১৯৭৫-এ এসে 'মুজিববাদ'-এর এই নতুন সংস্করণ, যাকে মুজিব বলেছেন second revolution– তার বাস্তব চেহারা পুরোদস্তর একনায়কতান্ত্রিক রূপ নেয়। কারণ বাকশাল নামক এই second revolution-এর কর্মসূচি অনুযায়ী :

ক. দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে, সেটি হলো বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ বা বাকশাল। আসলে বাকশাল ছিল আওয়ামী লীগেরই পরিবর্তিত নাম। যদিও এই দলে সিপিবি ও ন্যাপও যোগ দিয়েছিল, কিন্তু কার্যনির্বাহী কমিটিতে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন দলের প্রতিনিধি ছিল না। নতুন দলটির প্রতীকটিও ছিল আওয়ামী লীগের প্রতীক– নৌকা। ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে অপর দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি নগণ্য– যেমন সিপিবি'র সদস্য ছিলেন মাত্র এক জন (মো. ফরহাদ, ৭৭ নং সদস্য)[২০৮]!

---

২০৭ প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন শেখ মুজিবুর রহমান এই ভাষণ দেন। *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, সম্পাদনা: শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ৭৬-৯৩।

বাকশালকে মুজিবুর রহমান তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লব', 'শোষিতের গণতন্ত্র' ইত্যাদি বললেও এর তাত্ত্বিক উৎস ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এ সম্পর্কে সেই সময়কার সাংবাদিক ও বামপন্থী নেতা নির্মল সেন ক্রুদ্ধ ভাষায় লিখেছেন, বাকশাল ছিল একটি রাজনৈতিক দর্শন। যার মূলকথা হলো অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো। এ দর্শন সোভিয়েত তাত্ত্বিক উলিয়ানভের। এই তত্ত্ব মনে করত, যেদেশে শিল্প বিপ্লব হয়নি, যেখানে শ্রমিক নেতৃত্ব দুর্বল, সেখানে জাতীয় বুর্জোয়ার সহযোগিতায় বিপ্লব সাধন। এ তত্ত্বের আলোকে রাজনীতির ধরন হবে একদলীয়। তানজানিয়া, মোজাম্বিক, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া ইত্যাদি দেশে এর নিরীক্ষা হয়েছিল।... আমাদের দলের মতে, এটা ছিল মহাভুল। বাকশাল ছিল সমাজতন্ত্রের লেবেল। জনতার রোষ থেকে বাঁচা ও বামপন্থীদের ভাওতা দিয়ে একদলীয় শাসন কায়েমের জন্য এটা করা হয়। আরও বিস্তারিত দেখুন, নির্মল সেন, *আমার জবানবন্দি*, তরফদার প্রকাশনী, ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ৫৪৪-৪৫।

২০৮ সাংগঠনিক নগণ্য প্রতিনিধিত্ব সত্ত্বেও সিপিবি 'বাকশাল' কর্মসূচি এগিয়ে নিতে অতি আন্তরিক ছিল। এই কর্মসূচি ঘোষণার কয়েকদিন পর ১৯৭৫-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনাসভায় প্রাক্তন (!) সিপিবি নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ 'বাকশাল'কে একটি 'বিপ্লবী প্রক্রিয়া' হিসেবে অভিহিত করেন। দেখুন, *দৈনিক সংবাদ*, ২০ ফেব্রুয়ারি, '৭৫।

শ্রমিক শ্রেণির দল বলে দাবিদার কোনো 'কমিউনিস্ট পার্টি'র অপর একটি বুর্জোয়া দলে রাতারাতি এবং স্বেচ্ছায় বিলীন হয়ে যাওয়ার এরূপ ঘটনা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে খুব বিরল দৃষ্টান্ত। যদিও দীর্ঘ প্রায় এক যুগ পর প্রকাশিত এক দলীয় সাহিত্যে

খ. চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী দেশে যে 'একটিমাত্র' দল থাকবে তাতে চেয়ারম্যানই হবেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী; যদিও ঐ চেয়ারম্যান কীভাবে নির্বাচিত হবেন তার কোনো বিধান করা হয় নি। অর্থাৎ শেখ মুজিব নিজেই যে হবেন নতুন দলের চেয়ারম্যান– এটা এত বেশি স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেয়া হয় যে, তার জন্য কোনো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উল্লেখ করারও প্রয়োজনবোধ করেন নি নতুন দলের উদ্যোক্তরা।

গ. চেয়ারম্যানের পর সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন কাঠামো হলো একক দলটির কার্যনির্বাহী কমিটি– সাধারণ সম্পাদকসহ যার ১৫ জন সদস্যের সকলকে চেয়ারম্যানই মনোনীত করবেন;

ঘ. একক এই দলের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা ও যুব বিষয়ে অঙ্গ সংগঠন থাকবে; তার বাইরে দেশে আর কোনো শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা ও যুব সংগঠন থাকতে পারবে না;

ঙ. পার্লামেন্ট নির্বাচনে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে, তাকে চেয়ারম্যানের, অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমতি নিতে হবে। চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে গঠনতন্ত্র পাল্টাতে পারবেন এবং চেয়ারম্যানই গঠনতন্ত্রের একমাত্র ব্যাখ্যাদানকারী হবেন;

চ. বাকশালের অধীনে জেলার মূল প্রশাসক হিসেবে যেসব গভর্নর নিয়োগ হবেন তারাও হবেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের মনোনীত।

নতুন দেশে নতুন দল ও নতুন রাজনীতির উপরোক্ত ধাঁচের বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল পুরোপুরি এক ব্যক্তিনির্ভর এবং গণতন্ত্রের মৌলচেতনার বিরোধী, বিশেষত যে জাতি গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে তাদের জন্য পুরোপুরি

সিপিবি দাবি করেছে, বাকশালে যোগ দিলেও পার্টি 'গোপনে তার সংকুচিত একটি কাঠামো' বজায় রেখেছিল। দেখুন, *কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কালপঞ্জি*, সিপিবি, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ১০। তবে এই দাবি কতটা সত্য তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। কারণ বাকশাল গঠনের অনেক পূর্ব থেকেই ন্যাপসহ সিপিবি আওয়ামী লীগের সঙ্গে 'ঐক্যবদ্ধ' হতে চাচ্ছিল (সে বিষয়ে এই লেখার অন্যত্র আলোকপাত করা হয়েছে) এবং 'দল বিলুপ্ত করে বাকশালে যোগদানের বিষয়ে' সিপিবি'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় ভোটাভুটিতে যোগদানের পক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়েছিল। দেখুন, ড. মোস্তাফিজুর রহমান, *মনি সিংহ: কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সমকালীন রাজনীতি*, বাঙলায়ন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৭৭।

১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সিপিবি'র তৃতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টেও স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে, ১৯৭৪-এর জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মুজিবের সঙ্গে সিপিবির কয়েক দফা বৈঠক হয় এবং মুজিবের নেতৃত্বে সৎ ও সমাজতন্ত্রমনাদের নিয়ে যে একটি একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সে বিষয়ে সিপিবি ওয়াকিবহাল ছিল এবং নিজেদের পার্টিকে তারা সেভাবেই প্রস্তুত করেছে। দেখুন, *তৃতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, ১৯৮০, ঢাকা, পৃ. ২৩-২৪।

অন্যদিকে ডেইলী স্টারের প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক এস এম আলীর পর্যবেক্ষণে সিপিবি এসময় পশ্চিমবঙ্গের সিপিআই-এর অভিজ্ঞতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। যে অভিজ্ঞতার মূল বিষয় ছিল *সোভিয়েতপন্থী হিসেবে টিকে থাকতে হলে বাম-মধ্য ঘরানার একটি বড় সংগঠনের আনুকূল্য প্রয়োজন– সিপিআই যেটা পেয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে*। S. M. Ali, *ibid*, p. 168.

বেমানান। 'জাতীয় দল' সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কেবল যে দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় তাই নয়, দুই যুগের পুরানো আওয়ামী লীগের অস্তিত্বও বিলীন করে দেয়া হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বৈরাচারী রূপ পরিগ্রহ করতে প্রায় দু' দশক সময় নিলেও বাংলাদেশে স্বাধীনতার মাত্র চার বছরের মধ্যে গণতন্ত্র অতীতের চেয়েও নিকৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করায় জনগণই কেবল নয়, স্বয়ং মুজিবের নীতিনির্ধারক, সমর্থক পরিমণ্ডলেও প্রশ্ন ওঠে।[২০৯] যদিও এরূপ প্রশ্নকারীর সংখ্যা ছিল অতি কম।

কেবল আওয়ামী লীগের বিলুপ্তিই নয়– এসময় সংসদীয় গণতন্ত্রেরও অবসান ঘটানো হয় এবং সংবিধানের মৌলিক চরিত্রও পাল্টে ফেলা হয়। অথচ এ দাবিগুলোই ছিল একাত্তর পূর্ববর্তী শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক তৎপরতার নৈতিক শক্তি। দেখা গেল সারা জীবন যেসব 'গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি'র জন্য তিনি লড়েছেন সেগুলোর চর্চা করতে গিয়ে মাত্র দু-তিন বছরেই বিরক্ত হয়ে পড়েন তিনি। এসময় পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের এককালের অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্র বোম্বের খ্যাতনামা পত্রিকা 'The economic and political weekly'তে লিখেন, As far as civil liberties are concerned, Sheikh Mujibur Rahman's Second Revolution in Bangladesh has lighted the way to dusty death.[২১০] তবে ভারতের তৎকালীন ক্ষমতাসীনরা বাংলাদেশের বহুদলীয় গণতন্ত্রের অবলুপ্তিকে অভিনন্দিত করেছিলেন বলেই সাক্ষ্য মেলে। বাকশাল কর্মসূচির পর এ বিষয়ে ১৯৭৫ সালের ২৯ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর অভিনন্দন' শিরোনামের প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ :

> নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (বাসস) : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। বঙ্গবন্ধুর নিকট প্রেরিত এক বাণীতে মিসেস গান্ধী বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করিয়াছেন।[২১১]

---

২০৯ পরিকল্পনা কমিশনে মুজিব তাঁর যেসব অধ্যাপক বন্ধুর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন 'থিংকট্যাংক' আকারে– তাঁরা সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পর ছুটি নিতে শুরু করেন। কেউ কেউ দেশ ছেড়েই চলে যান।

২১০ অশোক মিত্রের পুরো লেখাটির জন্য দেখুন, Enayetullah Khan, *ibid*, p. 397.

২১১ উল্লেখ্য, একদলীয় ব্যবস্থা কায়েমের জন্য বাংলাদেশের বন্ধুকে অভিনন্দন জানানোর ঠিক পাঁচ মাস পর ১৯৭৫-এর ২৬ জুন ইন্দিরা গান্ধী স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। প্রায় ২১ মাস স্থায়ী হয়েছিল ভারতীয় ইতিহাসের ঐ পর্যায়– যাকে আজও ভারত স্মরণ করে তার গণতন্ত্রের সবচেয়ে *কালো অধ্যায়* হিসেবে। বাংলাদেশে অবশ্য 'বাকশাল' কর্মসূচি যে ভুল ছিল তা এখনও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে দলটির সাম্প্রতিক একটি অভিমত দেখুন, http://www.thedailystar.net/beta2/news/know-context-of-baksal/ [২২.০৪.২০১৩]

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র ও রাজনীতির পরিমণ্ডলে মুজিবের এইরূপ উল্টো যাত্রায় তাঁর আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকা খুব কম জনই সেদিন স্বাধীন ও সোচ্চার ভঙ্গিতে বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ২৯২ জন সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে কেবল জেনারেল এম এ জি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন চতুর্থ সংশোধনী মেনে নিতে না পেরে সংসদ সদস্য পদ ছেড়ে দেন। এ ছাড়া আওয়ামী লীগ দলীয় কসবার এমপি এডভোকেট সিরাজুল হকও এসময় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় 'সরকারের গণতন্ত্র বিরোধী' বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর সমালোচনামূলক বক্তব্য রেখেছিলেন।[২১২] সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল উত্থাপনের আগে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সর্বশেষ যে বৈঠক হয় (১৮ জানুয়ারি ১৯৭৫) সেখানে সম্ভাব্য সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে জেনারেল ওসমানী বলেছিলেন, 'আমরা আইয়ুব খানকে দেখেছি, আমরা ইয়াহিয়া খানকে দেখেছি। আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শেখ মুজিবুর রহমান খান হিসেবে দেখতে চাই না।' ওসমানী বা মঈনুল হোসেন বা সিরাজুল হকদের এইরূপ বিরোধী অবস্থানের কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক কোনো আচরণ করা হয়েছে বলে জানা যায় না।[২১৩] সুতরাং যাঁরা বাকশালের বিরোধিতা করেননি– তাঁরা গুরুতর হুমকির মুখে ছিলেন এটা বলা যায় না।

তবে তৎকালীন নানান সূত্র সাক্ষ্য দিচ্ছে, বাকশাল গঠনকালে শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ভঙ্গি তাঁর নতুন শাসনতান্ত্রিকক কর্মসূচির মতোই ক্রমে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। যার এক নিবিড় পর্যবেক্ষণ দেখা যায় সাংবাদিক নির্মল সেনের জবানবন্দিতে। বাকশালের যখন পত্তন হয় নির্মল সেন তখন ঢাকায় সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। বাকশাল পদ্ধতি চালু হওয়া মাত্র চারটি দৈনিক পত্রিকা রেখে বাকি সব বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় (এবং ১৯৭৫ সালের জুন থেকে তা কার্যকরও হয়)। বিষয়টি নিয়ে গণভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের এক আলোচনার পর বৈঠকের বিবরণ দিচ্ছেন নির্মল সেন এভাবে:

> ...শেখ সাহেব কথা শুরু করলেন। তিনি বললেন, বাকশাল গঠন করেছি। চারটি দৈনিক পত্রিকা থাকবে। পরবর্তীকালে আরও দুটি বের হবে। কিছু সাপ্তাহিক-মাসিক থাকবে। এসব হবে বিনোদনমূলক কাগজ।...আমরা চুপ করে শেখ সাহেবের কথা শুনছিলাম। আমার সঙ্গে গিয়াস কামাল চৌধুরী, কামাল লোহানী ও

---

২১২ দেখুন, সাঈদ তারেক, *ফিরে দেখা পঁচাত্তর*, সাপ্তাহিক এখন সময়, ৮ ডিসেম্বর ২০০৯, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র। লেখক ঐ সময় দৈনিক গণকণ্ঠের সংসদ বিষয়ক রিপোর্টার ছিলেন।

২১৩ উল্লেখ্য, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাকশাল গঠন সংক্রান্ত সরকারি আদেশটি বাতিল ঘোষিত হয়।

> রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ। শেখ সাহেব জিজ্ঞাস করলেন, কোন কথা বলছেন না কেন। আমি বললাম, বলার কিছু নেই, সাংবাদিক ইউনিয়নের সভা ডাকবো। যা সিদ্ধান্ত হয় আপনাকে জানাবো। শেখ সাহেব তীব্র কণ্ঠে বললেন, দেশে এখন কোন ইউনিয়ন-টিউনিয়ন নেই। সব বাতিল হয়ে গেছে। আপনাদের ডেকেছি সমস্যা সমাধানের জন্য। অন্যকিছু বলার অবকাশ নেই। মিটিং করুন। কিন্তু সংবাদপত্রে কোন বিজ্ঞপ্তি যাবে না। *এ যেন মনে থাকে।...*[২১৪]

উল্লেখ্য, বাকশালের প্রধান এক আঘাত সংবাদপত্র শিল্পে এসে লাগলেও এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনজন সম্পাদকের নামও দেখা যায়– তারা হলেন, ওবায়দুল হক (অবজারভার), আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (ইত্তেফাক) এবং মিজানুর রহমান (সংবাদ সংস্থা 'বিপিআই'– পরে এটি বাসসে যুক্ত হয়েছিল)। বাকশালে যোগদানের কারণে সাংবাদিক ইউনিয়নের অবজারভার শাখা এই সম্পাদকদের সম্মানে সংবর্ধনারও আয়োজন করেছিল ১৯৭৫ সালের ১২ জুন।[২১৫] বাকশালে যোগদানকারী সাংবাদিকরা কেবল নিজেদের নয় বাকশালের জেলা গভর্নরদের জন্যও জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন।[২১৬] নেতৃস্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে নির্মল সেন, কামাল লোহানী এবং আবদুল গাফফার চৌধুরী বাকশাল কার্যক্রমে শামিল হননি এবং এজন্য তাদের কোনো ধরনের নিগ্রহের শিকারও হতে হয়নি। এ থেকে ধারণা করা হয়, যারা বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন তারা নিজস্ব আগ্রহ ও সিদ্ধান্তেই সেটা করেছিলেন– যদিও সেসময় যোগদানের স্বপক্ষে পারিপার্শ্বিক চাপ ছিল। বাকশাল গঠনকালে জাতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যে এক ধরনের একনায়কতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বিকৃতির সৃষ্টি হয়েছিল তারই এক নিবিড় পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায় সাহিত্যিক আহমদ ছফার সেসময়কার এক লেখায়।[২১৭] ছফা লিখেছেন :

> যে কেউ ইচ্ছা করলে সরকারি দলে (বাকশালে) যোগদান করতে পারবে, এটা ছিল সরকারি ঘোষণা। আসলে যোগ না দিয়ে কারো নিস্তার পাওয়ার উপায় ছিল না। ভেতরে ভেতরে সমস্ত সরকারি-বেসরকারি দফতর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পত্রিকার সাংবাদিক, লেখক, কবি, সাহিত্যিক এবং

---

২১৪ নির্মল সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪২-৪৩।

২১৫ দেখুন, Mafuz Ullah, *ibid*, p.125.

২১৬ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, *সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন*, অনন্যা, ২০০০, ঢাকা, পৃ. ৪০।

২১৭ 'মুজিব শাসন: একজন লেখকের অনুভব' শীর্ষক এই লেখাটি ছফা লিখেছেন ১৯৭৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। পরে এটি সংকলিত হয়েছে তাঁর *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ* গ্রন্থে। প্রকাশক: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ২০১১, ঢাকা, পৃ. ৪৯৯-৫২০।

বুদ্ধিজীবীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছিলো– সবাইকে জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার আবেদনপত্রে সই করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যাকে বিপজ্জনক মনে করেন সদস্যপদ দেবেন না, কিন্তু বাংলাদেশে বাস করে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেঁচে-বর্তে থাকতে চাইলে জাতীয়দলের সদস্যপদের আবেদনপত্রে সই করতেই হবে। সর্বত্র বাকশালে যোগদান করার একটা হিড়িক পড়ে গেল। শেখ মুজিবুর রহমান যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বাকশালের কেন্দ্রীয় দফতর[২১৮] উদ্বোধন করতে এলেন তঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গোটা দেশের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, শ্রমিক, কৃষক সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে হাজির থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেদিন ছিল মুষলধারে বৃষ্টি। অবিরাম ধারাস্রোতে প্লাবিত হয়ে ভেজা কাকের মতো সুদীর্ঘ মানুষের সারি– কীভাবে রাস্তায় তারা অপেক্ষা করছিলেন, যারা এ দৃশ্য দেখেছেন ভুলবেন না। মহিলাদের গাত্রবস্ত্র ভিজে শরীরের সঙ্গে একশা হয়ে গিয়েছিল। এই সুবিশাল জনারণ্যে আমাদের দেশের নারীকুলকে লজ্জা-শরম জলাঞ্জলি দিয়ে সশংকিত চিত্তে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করতে হচ্ছিলো।

যেহেতু বাকশাল ছিল একটি বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের ফল– সে কারণে পঁচাত্তরের বাংলাদেশে গণতন্ত্রমনা সবাই এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধিতা আশা করছিলেন। কিন্তু জাসদের তরফ থেকে মুজিবের বাকশাল মডেলের বিরোধিতার যৌক্তিক এবং দৃঢ় নৈতিক ভিত্তি ছিল কমই। কারণ স্বাধীনতার পরপর সিরাজুল আলম খানের তিন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী আ স ম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ ও শরীফ নুরুল আম্বিয়া বিবৃতি দিয়ে 'দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যদের নিয়ে একটি জাতীয় বিপ্লবী সরকার' গঠনেরই দাবি জানিয়েছিলেন। তারা সেদিন জরুরি অবস্থা ঘোষণারও আহ্বান জানান– যা ছিল স্পষ্টত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়ার প্রস্তাব। রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বাকশাল ছিল তাঁদের তিন বছর আগেকার দাবিরই হুবহু না হলেও অনেকটা কাছাকাছি কর্মসূচি। তবে বাকশাল কায়েমের পর প্রথম তাৎক্ষণিক আঘাত আসে জাসদের ওপরই। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাসের ৪৮ ঘণ্টা পরই পুলিশ জাসদের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত 'গণকণ্ঠ' কার্যালয় দখল করে নেয়।

---

২১৮ বাকশালের কেন্দ্রীয় দপ্তর খোলা হয়েছিল ঢাকার কাকরাইলের ১১২ নং সার্কিট হাউস রোডে।

স্বভাবত ডান এবং বাম উভয় ধারার রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী এবং তার আওতায় সৃষ্ট নতুন 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা'র সমালোচনায় ছিলেন পঞ্চমুখ। এমনকি আওয়ামী লীগেও স্পষ্ট ভিন্নমত ছিল বাকশাল ব্যবস্থা নিয়ে– যে বিষয়ে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মস্কোপন্থী ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ও কমিউনিস্ট পার্টি। তারা এই ব্যবস্থার সমর্থক ছিল, তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং শাসন ও রাজনৈতিক পদ্ধতির এরূপ ভূমিকম্পতুল্য পরিবর্তনে তাদের সঙ্গে মুজিব পরামর্শ করতেন বলেও সমাজের সর্বত্র ধারণা ছিল।[২১৯] এই ধারণার বাস্তব অবকাঠামোগতভিত্তি তৈরি হয়েছিল তিয়াত্তরের ১৪ অক্টোবরে আওয়ামী লীগ-সিপিবি-ন্যাপের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ত্রিদলীয় গণ ঐক্যজোটের মাধ্যমে। এ দিন ত্রিদলীয় এই জোটের ঘোষণা ও ১৯ সদস্য বিশিষ্ট সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ করা হয়। সদস্যদের মধ্যে ১১ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের; ৫ জন মোজাফফর ন্যাপের এবং ৩ জন সিপিবি'র। চুয়াত্তরের মার্চ মাসে গণ ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠক হয়। পরবর্তীকালে এর আর কোনো কার্যক্রম দেখা যায়নি; নীরবেই এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে ধরা যায়।

সরকারের সঙ্গে বা সরকারি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ফ্রন্ট গঠন কার্যত সরকারে অংশগ্রহণ– সেক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতার ভাগিদার ফ্রন্টভুক্তরাও। সিপিবি ও ন্যাপ অবশ্য এ রকম দায়ভার স্বীকার করেনি কখনো। তবে বাকশাল গঠনের ক্ষেত্রে সিপিবি'র যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল সেই বিষয়ে দলটির পক্ষ থেকেই স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। ঐ সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে বাকশাল পরবর্তী সিপিবির তৃতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টে তারা লিখেছে :

---

২১৯ নুরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫। উল্লেখ্য, মুজিব সরকারের প্রতি সিপিবি'র ঐসময়কার সমর্থনসূচক ভূমিকা নিয়ে দলটি ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় কংগ্রেসে এবং ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৃতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রতিবেদনে যেসব মূল্যায়ন হাজির করে তাও ব্যাপক স্ববিরোধিতায় ভরা। দ্বিতীয় কংগ্রেসে মুজিব শাসনকে 'সমাজে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সূচনা' হিসেবে অভিহিত করার পর তৃতীয় কংগ্রেসে আবার বলা হচ্ছে, 'আওয়ামী লীগের শাসনামলে ব্যর্থতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ক্ষতিকর কাজকর্ম ছিল। কিন্তু দেশের ধারা প্রগতির দিকেই ছিল। এটা ছিল আমাদের পার্টির অবদান...বড় সাফল্য।' *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭, ২৬। এখানে সিপিবি মুজিবের *একদলীয় শাসনকে* নিজদের সাফল্য হিসেবেই তুলে ধরছে। কিন্তু একই দলিলের অন্যত্র লিখেছে, [ক] স্বাধীনতার পর জনগণের ঘরে স্বাধীনতার সুফল কখনোই আসেনি।...পৃ. ৩০। [খ] *'চুয়াত্তরের মে মাসেই আমাদের মূল্যায়ন ছিল, দেশ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।'* পৃ. ১৩।

দুর্ভিক্ষ-উত্তর পরিস্থিতিতে '৭৪ সালের অক্টোবরে কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠকে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। এ পর্যালোচনায় দেশের সামাজিক সংকটজনক অবস্থা ...বিবেচনায় নেয়া হয়। সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় কমিটি 'ব্যর্থ সরকার বাতিল কর' আওয়াজ তোলার সিদ্ধান্ত করে। আর আওয়ামী লীগ সরকারের বিকল্প হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই সৎ, যোগ্য, দৃঢ়চিত্ত প্রগতিশীলদের নিয়ে সরকার গঠনের দাবি উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া প্রগতির ধারাকে অগ্রসর করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক, সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবিও উত্থাপন করা হয়।...তদানিন্তন অবস্থা বিবেচনা করলে এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।...তাঁর (মুজিব) সঙ্গে জুন মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বেশ কয়েক দফা আলোচনা হয়। তিনি বলেন, যারা সৎ এবং সমাজতন্ত্রমনা তাদের মিলিত করে একটি শক্তি সমাবেশ তিনি গড়ে তুলবেন। এসব আলোচনার মাধ্যমে আমরা ধারণা করতে পারি, তিনি দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবছেন। *তার (মুজিব) নেতৃত্বে পরিচালিত (নতুন) এই সরকারের প্রতি আমাদের ঐক্যের নীতি আমরা প্রত্যাহার করিনি।...আমরা যখন বুঝতে পারলাম, বঙ্গবন্ধু শেষাবধি একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করবেন, তখন পার্টিকে প্রস্তুত করার নীতি আমরা গ্রহণ করেছিলাম।*[২২০]

প্রায় ছয় পৃষ্ঠা জুড়ে (১৯-২৫ নম্বর পাতা) দীর্ঘ স্বীকারোক্তিমূলক পর্যালোচনা থেকে অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত উপরের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, বাকশাল নামক একদলীয় ব্যবস্থার আগমন সম্পর্কে সিপিবি যে কেবল পূর্ব থেকে জানত তাই নয়– বাকশালের আওতাধীন 'প্রশাসনিক সংস্কার'-এর অনেক প্রস্তাব তাদের তরফ থেকেই উত্থাপিত। সিপিবি ও আওয়ামী লীগের সেই সময়কার সম্পর্কের বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক আরও তথ্যের উল্লেখ রয়েছে ৬৩২ নম্বর তথ্যসূত্রে।

উল্লেখ্য, বাকশাল নামক একদলীয় শাসনব্যবস্থায় পদার্পণের আগেই বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো কালাকানুন তৈরি করে নেয়া হয় এবং ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানকেও জরুরি অবস্থা জারির উপযোগী করা হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইন তৈরি, জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা অর্জন ও জরুরি অবস্থা জারি এবং পরে একদলীয় ব্যবস্থায় যাত্রা সবই ছিল স্পষ্টত পরিপূর্ণ এক ব্যর্থতার স্মারক। যে ব্যর্থতার বস্তুগত দিক ছিল– দেশ পরিচালনার জন্য আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ এবং তার রাজনৈতিক সহযোগী হিসেবে ন্যাপ-সিপিবি-ছাত্র ইউনিয়নের সত্তর-একাত্তর-বাহাত্তর পর্যায়ে প্রতিশ্রুত ও গৃহীত

---

[২২০] সিপিবি, *তৃতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, ১৯৮০, ঢাকা।

কার্যক্রমের চরম বিপরীত আচরণ। আর এর তাৎক্ষণিক ফল দাঁড়ায় দুর্ভিক্ষ ও অনিয়ন্ত্রিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি।

দেশ পরিচালনায় শাসকজোটের তৎকালীন ব্যর্থতার প্রবল এক আত্মগত বৈশিষ্ট্যও ছিল। আন্দোলনের শক্তি হিসেবে উপরোক্ত রাজনৈতিক ভরকেন্দ্রগুলো সত্তর-পূর্ব সময়ে যতটা সাফল্য দেখিয়েছে, শাসন সামর্থ্যে তারা ঠিক উল্টো রকমভাবে অসফল একাত্তর-পরবর্তী সময়ে। এর প্রমাণ ছিল নীতিনির্ধারকদের সামাজিক দুর্নীতি এবং প্রশাসনিকভাবে অগণতান্ত্রিক কালাকানুনের প্রতি ধারাবাহিক পদ্ধতিগত আগ্রহ। নিয়ন্ত্রণমূলক বিশেষ আইন, জরুরি অবস্থা জারি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব, মিছিল ও সমাবেশের স্বাধীনতা হরণ, বিচারবিভাগের ক্ষমতা কমিয়ে তাদের নির্বাহী বিভাগের অধীনে নিয়ে আসা, বিচারবহির্ভূত খুন এবং নিবর্তনমূলক আটকাদেশের ক্ষমতার[২২১] মতো পদক্ষেপগুলো ছিল শাসক

---

২২১ সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে নিবর্তনমূলকভাবে আটককৃতদের মৌলিক মানবাধিকার হরণ করা হয়। মুজিব সরকার কর্তৃক এটা করা হয় সংবিধানের ২৬ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে। এই সংশোধনীর পূর্বে সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাওয়ার বিধান থাকলেও নতুন সংশোধনী তা খারিজ করে দেয় এবং গ্রেফতারকৃত কাউকে আটকের কারণ জানানো, আইনজীবীর পরামর্শের সুযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আটককৃতকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করার বাধ্যকতা ইত্যাদি সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেয়। ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের ক্ষেত্রে সংবিধানের এরূপ সংশোধনীর দীর্ঘমেয়াদি ফল হয়েছিল বিধ্বংসী। লক্ষ্যণীয়, বাহাত্তর সালে প্রণীত সংবিধানেরই অন্তর্গত এমন কাঠামোগত ত্রুটি ছিল যাতে শাসক এলিটরা চাইলে তাতে সংশোধনের নামে জনগণের মৌলিক অধিকারবিরোধী বিধি ইচ্ছামত ঢুকিয়ে দিতে পারে। কেবল জরুরি অবস্থা বা নিবর্তনমূলক আটকাদেশের সুযোগই নয়– পুরো গণতান্ত্রিক কাঠামো পাল্টে দেয়ার মতো চতুর্থ সংশোধনীও আনা সম্ভব হয়েছে সংবিধানের ঐ কাঠামোগত দুর্বলতার সুযোগে। পরে বহুবার রাজনৈতিক এলিটরা সংবিধানের এই ত্রুটির সুযোগ নিয়েছে। কিন্তু তারপরও সমাজের 'প্রগতিশীল' মহল বাহাত্তরের সংবিধানকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসেবে সর্বোচ্চ এক দলিল হিসেবে অভিহিত করে থাকে। এমনকি আমরা দেখেছি, সেই সময়কার প্রধান বিরোধী দল সিপিবি, ন্যাপ এবং জাসদও সংবিধানের উপরোক্ত দুর্বলতা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেননদের ভাসানী ন্যাপকেন্দ্রিক কমিউনিস্ট গ্রুপটিও একে 'বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসেবে বেশ ভালো' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। দেখুন, হায়দার আকবর খান রনো, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩১। সংবিধান বিষয়ে জাসদের পক্ষ থেকে দৈনিক গণকণ্ঠে বাহাত্তরের ২০ অক্টোবর আ স ম রব ও শাহজাহান সিরাজ যে বিবৃতি দেন তার মুখ্য বক্তব্য ছিল এই সংবিধানটি 'মন্দের ভালো'। 'মন্দ' দিক সম্পর্কে মাত্র চারটি প্রশ্ন ছিল তাদের বক্তব্যে:

ক. ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল এর সত্যতা কী?

খ. মহিলাদের মতো কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য সংবিধানে আসন সংরক্ষণ করা হচ্ছে না কেন?;

হিসেবে পাকিস্তানি জেনারেলদের প্রিয় সব শাসনতান্ত্রিক পণ্য। সেই শাসক ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির নিন্দা ও পরাজয়ের ওপর ভিত্তি করে একাত্তরে যে জনগোষ্ঠীর গর্বিত যাত্রা তারা মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে একই নোংরা অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে শুরু করে শতগুণ মহিমার সঙ্গে। একাত্তর-পরবর্তী সময়ে দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যার যে ব্যাপকতা তা ছিল অতি ভীতিকর এক পরিস্থিতি। রাজনীতি বিজ্ঞানে এ ধরনের ভীতিকেই গণতন্ত্রের বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

একাত্তর থেকে পঁচাত্তর সময়ের রাজনৈতিক ব্যর্থতার উপরোক্ত বস্তুগত ও আত্মগত বৈশিষ্ট্যগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়– বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নৈতিক শক্তিকে অভাবনীয় দ্রুততায় নিঃশেষ করে দিচ্ছিলেন তার পুরোধারাই। তৎকালীন শাসকরা যে কেবল জাসদ ও মাওবাদী নকশালদের মতো ভিন্নমত ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষমাহীন ছিলেন তাই নয়– সিপিবি ও ন্যাপের মতো জাতীয় রাজনৈতিক সহযোগিরাও তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। যদিও সিপিবি ও ন্যাপ *যে কোনোভাবে* তখনকার সরকারের সঙ্গে *খাপখাইয়ে চলার* নীতি নিয়েছিল– কিন্তু সেটা ছিল প্রধানত মস্কোর নির্দেশনার কারণে– দলের মাঠ পর্যায়ের আগ্রহের কারণে নয়। যার প্রতিফলন হিসেবে দেখা যায় সরকারকে 'প্রশ্নহীন সহযোগিতা'র প্রতিবাদে চুয়াত্তরের নভেম্বরের দ্বিতীয়

গ. মহিলাদের জন্য কোটা না রেখে সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না কেন? এবং

ঘ. দেশরক্ষা বাহিনীকে উপনিবেশিক ধাঁচে না রেখে 'পিপলস্ আর্মি' ধাঁচে গড়ে তোলার বিধান রাখা হচ্ছে না কেন?

এর আগে অবশ্য সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ে নৈতিক একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন আ স ম রব ও শাজাহান সিরাজ আরেক যৌথ বিবৃতিতে (৭ অক্টোবর বিবৃতিটি দৈনিক *গণকণ্ঠে* প্রকাশিত হয়)। তাঁরা বলেন, '(সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণকারী) পরিষদ সদস্যদের শতকরা ৯০ জনই যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত না থেকে আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে দিয়ে এবং নানা ধরনের অসামাজিক কাজে লিপ্ত থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্পূর্ণ সময়টুকু ভারতে নির্লিপ্ত জীবন-যাপন করেছে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার সেই গণপরিষদ সদস্যদের আদৌ আছে কি?' কাঠামোগত দিক থেকে রব-সিরাজ তাঁদের বিবৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেন এভাবে: 'প্রায় ৫০ জনের অধিক গণপরিষদ সদস্যের অবর্তমানে (যারা কেউ দুর্নীতির দায়ে বহিষ্কৃত, কেউ পদত্যাগী, কেউ অনুপস্থিত), অর্থাৎ প্রায় এক কোটি লোকের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই দেশের সংবিধান প্রণীত হওয়া কতটা সঙ্গত হচ্ছে?' উপরোক্ত অবস্থানের বাইরে নবসৃষ্ট সংবিধান সম্পর্কে জাসদের আর কোনো মৌলিক আপত্তি ছিল না। তখন দেশের প্রধান এক বিরোধী দল হলেও জাসদ সংবিধান রচনার রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়াকে কতটা হালকাভাবে গ্রহণ করেছিল তার একটি কৌতুককর বিবরণের জন্য দেখুন, মহিউদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৫-৫৬।

সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ একজন ন্যাপ নেতা ও নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী তাঁর সহযোগীদের নিয়ে দল থেকে পদত্যাগ করেন।[২২২]

জাসদ, সর্বহারা পার্টি বা অন্যান্য কমিউনিস্ট দল ও গ্রুপগুলোর প্রতি আওয়ামী লীগ ও তাদের সরকারের কঠোর নীতি সিপিবি ও ন্যাপের ক্ষেত্রে হুবহু অনুসৃত না হলেও নানান স্থানে তাদের কর্মীরাও নির্দয় নিপীড়নের শিকার হয়েছে ঐ সময়। বলা যায়, তাদের দিয়েই নিপীড়ন শুরু হয়। এক্ষেত্রে ঢাকায় ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি সিপিবি'র অঙ্গ সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে গুলি চালিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র মতিউল ইসলাম ও ঢাকা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র মির্জা কাদের নামের দু'জন শিক্ষার্থীকে হত্যা এবং গোপালগঞ্জে ১৯৭৩-এর ১০ মার্চের নির্মম হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করা যায়।

প্রথম ঘটনাটিতে 'ভিয়েতনাম সংহতি দিবস' পালন উপলক্ষ্যে ছাত্র ইউনিয়ন ও ডাকসু যৌথভাবে ঢাকার মতিঝিলস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে স্মারকলিপি দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিছিল নিয়ে বের হলে বর্তমানের জাতীয় প্রেসক্লাবের উল্টোদিকে ইউএসআইএস ভবনের সামনে কোনো সতর্কতা ছাড়া গুলি চালানো হয় ঐ মিছিলে। স্বাধীনতা-উত্তর কেন্দ্রীয় ঢাকায় সবচেয়ে আলোচিত প্রকাশ্য রাজনৈতিক খুন ছিল এটা।[২২৩] ঐদিনের ঘটনায় গলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত পরাগ মাহমুদের বিবরণ থেকে জানা যায়, পুলিশ প্রথমে মিছিলের অগ্রভাগে থাকা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে রাইফেল দিয়ে আঘাত করে। এ দৃশ্যে ক্ষুব্ধ মিছিলকারীরা পুলিশের উদ্দেশ্যে কয়েকটি ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মারে। এরপরই বেপরোয়া গুলিবর্ষণ শুরু হয়।[২২৪]

ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে পরদিন ২ জানুয়ারি স্বাধীন দেশে প্রথমবারের মতো ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ততায় হরতাল পালিত হয়। একই দিন বিকালে পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সমাবেশে ডাকসুর পক্ষ থেকে তৎকালীন ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম শেখ মুজিবুর রহমানকে দেওয়া 'জাতির পিতা' উপাধি প্রত্যাহার করে নেন এবং তাঁর ডাকসুর 'আজীবন' সদস্যপদ বাতিল করেন। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও ডাকসুর জিএস মাহবুব জামান উত্তেজিতভাবে ডাকসু'র সিদ্ধান্ত-বই থেকে এ সংক্রান্ত

---

২২২ ১৯৭৪ সালের ১৪ নভেম্বর পদত্যাগকালে ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী ন্যাপের শিক্ষা ও শ্রম সম্পাদক ছিলেন। পরে কাজী জাফর আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি গড়ে তুলেছিলেন।

২২৩ একই ঘটনায় গুরুতর আহত হন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আবুল কাশেম, দৈনিক বাংলার বাণীর ফটোসাংবাদিক রফিকুর রহমান, পরাগ মাহমুদসহ ছয় জন।

২২৪ ঐ দিনের ঘটনায় পরাগ মাহমুদের অভিজ্ঞতা এবং ঘটনার তৎকালীন রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে লন্ডন প্রবাসী লেখক মাসুদ রানার একটি লেখা সংযুক্তি করা হয়েছে গ্রন্থের শেষে। দেখুন: *সংযুক্তি একুশ*।

পাতাও ছিঁড়ে ফেলেন। সভা থেকে ছাত্রহত্যায় যুক্তদের পদত্যাগ, মিছিল মিটিংয়ে রক্ষীবাহিনীর হামলা বন্ধ করাসহ সাত দফা দাবিও উত্থাপিত হয়েছিল সরকারের কাছে। এ বিষয়ে সিপিবি-ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক কাগজ দৈনিক সংবাদে সেদিনের বড় খবরটি ছিল এরূপ :

> গতকাল মঙ্গলবার পল্টন ময়দানের জনসমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম নিম্নোক্ত ঘোষণা পাঠ করেন : এই সমাবেশের সামনে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি যে, বিগত ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা যে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিলাম ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে আজ সেই বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রত্যাহার করে নিলাম। আমরা দেশের আপামর জনসাধারণ, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, আজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে তাঁর 'বঙ্গবন্ধু' বিশেষণ ব্যবহার করবেন না। একদিন ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা মুজিবকে জাতির পিতা আখ্যা দিয়েছিলাম। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে আবার ছাত্রের রক্তে তাঁর হাত কলংকিত করায় আমরা ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি, আজ থেকে কেউ আর জাতির পিতা বলবেন না। শেখ মুজিবকে একদিন ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল। আজকের এই সমাবেশ থেকে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি, আজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকসু'র আজীবন সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়া হলো।[২২৫]

---

২২৫ দেখুন, *দৈনিক সংবাদ*, ৩ জানুয়ারি ১৯৭৩, ঢাকা। মুজাহিদুল ইসলামের উপরোক্ত হুমকি ও ঘোষণার দু'দিন পর ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ শহীদুল ইসলাম আরেক সমাবেশ থেকে মুজাহিদুল ইসলামের হুঁশিয়ারিকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেন, যারা শেখ মুজিবের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' লিখবে না বা বলবে না জনগণ তাদের জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলবে (দেখুন, *দৈনিক বাংলা*, ৬ জানুয়ারি ১৯৭৩)। ৫ জানুয়ারি ছাত্রলীগ ঢাকায় ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন কার্যালয় জ্বালিয়ে দেয়। এইরূপ পাল্টাপাল্টি যুদ্ধ ও বাগযুদ্ধের উপসংহার হলো, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে ঘটনার কিছুদিন পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হয় এবং ১০ মাস পর ১৯৭৩ সালের ১১ নভেম্বর ছাত্র ইউনিয়নের চতুর্দশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানই আমন্ত্রিত হন। এর তিন সপ্তাহ পর সিপিবি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসেরও উদ্বোধন করেন তিনি। আর উপরোক্ত ঘটনার দু' বছর পর যখন বাকশাল গঠিত হয় তখন ঐ 'জাতীয় দল'-এর অঙ্গসংগঠন 'জাতীয় ছাত্রলীগ'-এ ২১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে শেখ শহিদুল ইসলামের পরই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে নাম দেখা যায় মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের। ডাকসুর নির্বাচিত ভিপিকে সেদিন বাকশালের অঙ্গসংগঠনে সদস্য হয়েই

পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় সত্তর দিন পর ঘটে গোপালগঞ্জের ঘটনাটি– যেটি ভয়াবহতায় ছিল আরও অধিকতর পৈশাচিক। সেখানে ওয়ালিউর রহমান লেবু, কমলেশ বেদজ্ঞ নামে ন্যাপের দুজন সংগঠক (যারা আসলে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক হিসেবে মোজাফফর ন্যাপে কাজ করতেন) কোটালিপাড়া থেকে গোপালগঞ্জ সদরে ফেরার পথে সদর উপজেলার টুপুরিয়া নামক গ্রামে তাঁদের ডাকাত হিসেবে জনগণের কাছে চিহ্নিত করে নিপীড়ন শেষে নৌকায় বেঁধে সেই নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হয়। নিহতদের পরিবার বর্তমান লেখককে বলেছেন, স্থানীয় 'হেমায়েত বাহিনী' ছিল এই ঘটনার সংগঠক। এই খুনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ঘটনার দু'দিন পর হেমায়েত উদ্দিনকে আটক করা হলেও আট মাস পর তাকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে তিনি বীরবিক্রম খেতাবেও ভূষিত হন।

কমলেশ ও ওয়ালিউর রহমানের ওপর তৎকালীন শাসক এলিটদের ক্ষোভের কারণ ছিল, প্রথমজন তিয়াত্তরের মার্চের নির্বাচনে কোটালিপাড়ায় (ফরিদপুর-১২) আওয়ামী লীগের প্রার্থী সন্তোষ আচার্যের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছিলেন। যে কারণে অনেক স্থানে 'ভোট কেটে' সন্তোষ আচার্যকে জিততে হয়েছে। অন্যদিকে ওয়ালিউর রহমান গোপালগঞ্জ আসনে প্রার্থী হওয়ায় সেখানকার মূল আওয়ামী প্রার্থী মোল্লা জালালকে সম্ভাব্য পরাজয়ের আশঙ্কায় প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই পরে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন সেখানে। মুজিব প্রার্থী হচ্ছেন দেখে ওয়ালিউর রহমান মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলেও তাঁর জনপ্রিয়তা সরকারি দলের স্থানীয় নেতৃত্বকে বিরক্ত করেছিল। যার কারণে ৭ মার্চ নির্বাচন শেষে কোটালিপাড়ায় অবস্থান করা ক্রমে দুরূহ হয়ে পড়েছিল উপরোক্ত কমিউনিস্ট সংগঠকদের পক্ষে। তখন এক পর্যায়ে পায়ে হেঁটে কোটালিপাড়া থেকে গোপালগঞ্জ রওনা দেন তাঁরা এবং পথে উপরে উল্লিখিত পরিকল্পিত খুনের ঘটনাটি ঘটে ১০ মার্চ শনিবার সকাল সাড়ে দশটায়। ওয়ালিউর রহমান, কমলেশ বেদজ্ঞ, শ্যামল ব্যানার্জি মানিক ও বিষ্ণুপদ কর্মকার তাতে নিহত হলেও স্থানীয় দুর্গাপুর গ্রামের লুৎফর রহমান গঞ্জুর (বর্তমানে যিনি

সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। আরও উল্লেখ্য, ন্যাপ ও সিপিবি প্রথমে মতিউল-কাদের হত্যায় কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও পরে আওয়ামী লীগের রুদ্রমূর্তির মুখে তারা ছাত্রহত্যার বিষয়টি ধীরে ধীরে চেপে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ৭ জানুয়ারি পল্টনে জনসভা হওয়ার কথা থাকলেও পূর্বদিন ন্যাপ সেই কর্মসূচি বাতিল করে। অথচ ঘটনার পরপরই প্রদত্ত বিবৃতিতে মোজাফফর আহমদ ও পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের এ বর্বরোচিত ছাত্রহত্যা ইয়াহিয়া-মোনায়েম স্বৈরাচারী সরকারের কার্যকলাপের নামান্তর। যে সরকার ছাত্র-জনতার রক্তে হাত কলুষিত করেছে সে সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর সংগ্রামকে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেখুন, *দৈনিক সংবাদ*, ৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩।

গোপালগঞ্জ জেলা কৃষকলীগের সভাপতি) নামে তাঁদের এক সহযোগী অলৌকিকভাবে বেঁচে যান এবং তাঁর মাধ্যমেই হত্যার বিষয়টি জনসম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী দ্বিতীয় বছরে মাত্র দু মাসের ব্যবধানে জাতীয় পর্যায়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এসব হত্যার ঘটনা ঘটলেও কেন্দ্রীয়ভাবে সিপিবি ও ন্যাপ তা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদে উচ্চবাচ্য না করার নীতি গ্রহণে বাধ্য হয় মস্কোর মুজিব-সমর্থক নীতির কারণে। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের ২৫ মার্চে গোপালগঞ্জে যে মামলার চার্জশীট হয়েছিল (মামলা নম্বর ৫; তাং ১১.০৩.৭৩; জিআর কেস নম্বর ৯৬/৭৩) দীর্ঘ ৪১ বছর পরও সেই মামলা নিয়ে সেখানে লড়ছিলেন কমলেশ বেদজ্ঞের কন্যা সুতপা বেদজ্ঞ ও তাঁদের নিকটাত্মীয়রা। এ রকম একজন নিকটাত্মীয়ের (সাংবাদিক দীপংকর গৌতম)-এর সঙ্গে আলাপচারিতার ভিত্তিতেই এখানে টুপুরিয়া হত্যাকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরা হলো।[২২৬] বর্তমানে এই মামলার ২৩ জন আসামির মধ্যে জীবিত রয়েছেন মাত্র ১০ জন এবং এই লেখা তৈরির সময় (নভেম্বর ২০১৩) তারা জামিনেই ছিলেন। মামলার প্রধান দুই আসামি ছিলেন কোটালিপাড়ার হেমায়েতউদ্দীন বীরবিক্রম ও গোপালগঞ্জের ফারুকুজ্জামান।

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, শাসক দলের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মমভাবে আক্রান্ত হওয়ার ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সিপিবি ও ন্যাপ জাতীয় দল বাকশালকে বরণ করে নিয়ে এগোতে চাইছিল মূলত সোভিয়েত 'লাইন'-এর কারণে।[২২৭] সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ইতোমধ্যে শেখ মণি'র এক

---

২২৬ এ সম্পর্কে আরও দেখা যেতে পারে, আশরাফ কায়সার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১ ও ৫২।

২২৭ এই সোভিয়েত 'লাইন'টি কী ছিল তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় ২০৭ নং ফুটনোটে নির্মল সেনের বক্তব্য থেকে। নির্মল সেন এই 'লাইন' বিকাশে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাত্ত্বিক উলিয়ানভের নাম উল্লেখ করেছেন। আসলে ঐ তাত্ত্বিকের নাম ছিল আর. উলিয়ানভস্কি। তিনি ও ভ. পাভলভ ঐ সময় যৌথভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় '*এশিয়ার পথবিকল্প: উত্তরণকালে সামাজিক প্রগতির পথ*' (১৯৭৬, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো; মূলগ্রন্থটির নাম ছিল 'Asian Dilemma') শীর্ষক একটি তাত্ত্বিক গ্রন্থ লিখে দেখান, এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার উপনিবেশ ছিন্নকারী সদ্য স্বাধীন দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের *সহায়তায়* অপুঁজিতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রে পৌঁছাতে পারে এবং তাই ঘটতে যাচ্ছে। এটা হলো সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর একটা বিশেষ ধরন এবং এ প্রক্রিয়ায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই। সিরিয়া, মিসর, বার্মা, ভারতসহ আরও কয়েকটি দেশের উদাহরণ দিয়ে উপরোক্ত গ্রন্থের ২২৪-২৬৯ পৃষ্ঠা জুড়ে উলিয়ানভস্কি এই তত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ দেন। এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে এই তত্ত্ব অনুসরণ করে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায় এবং বলা বাহুল্য ব্যর্থ হয়। এই তত্ত্বের আলোকে অধনবাদী পথে সমাজতন্ত্রে পৌঁছাতে করণীয় হলো: [ক] মিশ্র অর্থনীতি থেকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় খাতকে একচেটিয়া করে তোলা; [খ] সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের

ধরনের বোঝাপড়া হয়েছিল বলে প্রথমোক্তরা বিশ্বাস করত এবং একদিকে বাকশাল এবং তাতে সিপিবি-ন্যাপের অবস্থান; অন্যদিকে সরকারে শেখ মণি'র ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সোভিয়েত প্রভাব একচ্ছত্র হবে বলেই তাদের হিসাব ছিল (এ বিষয়ে ৭.খ উপ-অধ্যায়ের ৬৩২ নম্বর তথ্যসূত্রে সিপিবি-ন্যাপ ও স্থানীয় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের তৎকালীন ভূমিকা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে।) ফজলুল হক মণি এসময় নাটকীয়ভাবে তীব্র সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন। তার কার্যকারণ তুলে ধরে সংবাদমাধ্যমে মণি'র দীর্ঘদিনের সহকর্মী আমির হোসেন লিখেছেন :

> শেখ মণি মনে-প্রাণে সমাজতন্ত্রী ছিলেন এমন কথা তাঁর শত্রু-মিত্র কেউ বলবে না। অথচ তিনি দ্রুত সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এই ঝোঁক আরও বৃদ্ধি পায় তাজউদ্দীন আহমদের বিদায়ের পর। তার আগেই সম্পন্ন হয়েছিল শেখ মণি'র মস্কো সফর। মস্কো সফরকালে মণিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে তাঁর ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহও দেখানো হয়। ক্রেমলিনের এই আগ্রহ পরবর্তীকালে আরও বৃদ্ধি পায়...।[২২৮]

আমির হোসেনের উপরোক্ত বক্তব্যের সূত্র ধরে ২০১৩ সালের ১১ জুন ঢাকায় কথা হয় সেই সময়কার মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা অজয় রায়ের সঙ্গে। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল শেখ মণি'র মস্কো সফর সম্পর্কে। তিনি জানান, 'একবার নয়, শেখ মণি অন্তত তিনবার মস্কো সফর করেন ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যবর্তী সময়ে।' অজয় রায় আরও জানিয়েছেন, মস্কোর পক্ষ থেকে একপর্যায়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে 'পার্টি স্তরে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক' গড়ে ওঠে। তার আওতাতেই পরবর্তী সময়ে নতুনধারার সম্পর্ক বিকশিত হয়। ইতোমধ্যে দেশে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক হতেও সম্মত হন। একজন সরকার প্রধানের তরফ থেকে

সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হওয়া; তাদের 'সহায়তা' নেয়া; [গ] বৈপ্লবিক একনায়কতন্ত্র কায়েম– প্রয়োজনে অমার্কসীয় সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে; [ঘ] সব ধরনের পুঁজির বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ব্যবস্থা নেয়া; ইত্যাদি। উপরোক্ত শর্তগুলো অনুসরণ করলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আর 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র' কায়েমের প্রয়োজন নেই বরং উলিয়ানভস্কির ভাষায় এটা একটা মাওবাদী 'হঠকারিতা'। বাংলাদেশে ১৯৭১-৭৫ পর্যায়ে 'বাকশাল' কায়েম, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় খাতের একচেটিয়াত্ব প্রতিষ্ঠা, রাজনীতিতে ন্যাপ-সিপিবি-আওয়ামী লীগের গণঐক্যজোট প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রধান প্রধান ঘটনাবলির পেছনে উলিয়ানভস্কির উপরোক্ত তত্ত্বের সুগভীর প্রভাব কাজ করেছে। ১৯৭১-এর মার্চে অনুষ্ঠিত ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের পর থেকে ব্রেজনেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি উপরোক্ত তত্ত্বের আলোকেই পরিচালিত হচ্ছিল।

২২৮ আমির হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

এইরূপ একটি বেসরকারি সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক হওয়া ছিল রীতিমত বিস্ময়কর। এই সমিতি সরাসরি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন ছিল।

বাংলাদেশের রাজনীতির উপরোক্ত 'অগ্রগতি'সমূহ যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রখর নজরদারির মধ্যেই ছিল পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে সেটাই প্রতীয়মান হয়। শাসক গোষ্ঠীর সমাজতান্ত্রিক বিলাস ও বিভ্রমের মাঝেই নিজের ভবিষ্যৎ সক্রিয়তার পথ করে নিচ্ছিলো ওয়াশিংটন।

৪.খ. 'জাতীয় মিলিশিয়া' : বাংলাদেশকে 'নিরস্ত্র করা'র প্রথম ব্যর্থ চেষ্টা

> স্বাধীনতার সংগ্রাম আমাদের যত গৌরবের বিষয়ই হোক ভারতের শাসক শ্রেণীর কাছে সেটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।... নিজের নিরাপত্তার বিবেচনা থেকে ভারত সব সময় পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার নীতি অনুসরণ করেছে এবং সফল হয়েছে। আমাদের কাছে যা মুক্তিযুদ্ধ ভারতের শাসক শ্রেণীর কাছে সেটা তাদের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন।
>
> –ফরহাদ মজহার, *গণপ্রতিরক্ষা*, ঐতিহ্য, ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ৯৪ ও ১০৬।

> ...the war in Bangladesh between India and Pakistan never really ended on December 16, 1971...
>
> –জেনারেল (অব.) শংকর রায়চৌধুরী, ভারতীয় প্রাক্তন চিফ অব আর্মি স্টাফ (১৮তম) এবং রাজ্যসভার সদস্য[২২৯]

একাত্তর সালে বাংলাদেশে সংঘটিত সশস্ত্র মূলযুদ্ধের মাঝে অনেকগুলো উপ-যুদ্ধও চলছিল। আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতের জন্য এটা যেমন ছিল পাকিস্তান ভাঙার যুদ্ধ– তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটা ছিল কমিউনিজম মোকাবেলার সংগ্রাম; আর সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য এটা ছিল অত্র অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাস এবং চীনকে কোণঠাসা করার সুযোগ। বলা বাহুল্য, একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শেষ হলেও যুদ্ধরত সকল পক্ষ যে তাদের সশস্ত্রতা গুটিয়ে ফেলেছে সেটা বলা যায় না– যেমনটি আমরা দেখবো উপরে ভারতীয় জেনারেল (অব.) শংকর রায়চৌধুরী'র উদ্ধৃত মন্তব্যে।

'ঠান্ডাযুদ্ধ'-এ সক্রিয় আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের মতো একাত্তরে বাংলাদেশ পক্ষেও ছিল অনেকগুলো ধারা। তাজউদ্দীন একটি রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্ব

---

[২২৯] দেখুন, *'Delhi can't afford to let Dhaka slip off its radar'* The Asian Age, India, March 24, 2009.

করছিলেন; খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং মুজিব বাহিনীও একইভাবে পৃথক পৃথক মতাদর্শ ধারণ করে এগোচ্ছিল। বস্তুত তাজউদ্দীন, খন্দকার মোশতাক[২৩০] ও মুজিব বাহিনীর সংগঠক– সবাই ছিলেন মুজিবের ঘনিষ্ঠ এবং মুজিব বরাবরই পৃথক পৃথক উপলক্ষ্যে এসব ধারার প্রতিনিধিদের তাঁর পরের গুরুত্ববহ ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করায় তারা সেটাকেই প্রত্যয়নপত্র জ্ঞান করে এগোচ্ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়েও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ এসব ধারার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধী এবং তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ধারাগুলোর আন্তঃসম্পর্ক আলাদাভাবে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার দাবি করে। এর মধ্যকার তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন ধারার সঙ্গে মুজিব বাহিনীর যুদ্ধকালীন দ্বন্দ্ব-বিরোধের কিছু ফিরিস্তি ইতোমধ্যে এ লেখায় প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত এটাই ছিল যুদ্ধদিনে বাংলাদেশ পক্ষের সবচেয়ে ব্রিবতকর অংশ এবং যুদ্ধের পরও তার প্রবল রেশ জারি ছিল এবং আছে বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজ জীবনে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এসে তাজউদ্দীন আহমদ ও মুজিব বাহিনী সংগঠকদের সম্পর্ক আরও জটিল হয়ে উঠেছিল জাতীয় মিলিশিয়া গঠন প্রক্রিয়ায়। এই বাহিনী গঠনের জন্য প্রথোমক্তজনের প্রচেষ্টা ছিল খুবই তীব্র। এক্ষেত্রে দ্রুতলয়ে এগোচ্ছিলেন তিনি। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এইচ টি ইমাম লিখেছেন, ১৯৭১ সালের ২৩ ডিসেম্বর ঢাকায় মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই সকল মুক্তিযোদ্ধাকে একটি জাতীয় মিলিশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়।[২৩১] কিন্তু মঈদুল হাসান লিখেছেন, ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা 'গণবাহিনী[২৩২]'র সকল সদস্যের সমবায়ে জাতীয়

---

২৩০ খন্দকার মোশতাক আহমদ (১৯১৮–মার্চ ৫, ১৯৯৬) ছাত্রজীবন থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোদ্ধা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশাস্ত্রের এই গ্রাজুয়েট ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। ছয়দফার আন্দোলনে দীর্ঘদিন শেখ মুজিবের সঙ্গে কারাবরণ করেন। জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতার বিচারে মুজিবের পর তিনিই আওয়ামী লীগে নেতৃত্ব পাওয়ার অধিকারী হিসেবে মনে করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং যুদ্ধের পর তাজউদ্দীন আহমদের মতোই তাঁর বিরুদ্ধেও দুর্নীতির কোনো অভিযোগ শোনা যায়নি। তবে তাঁদের মাঝে আদর্শিক বিরোধী ও রাজনৈতিক বৈরিতা ছিল তীব্র। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিসভায় বিদ্যুৎ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী ছিলেন।

২৩১ এইচ টি ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ২০০৪, ঢাকা, পৃ. ৩৩৫।

২৩২ বর্তমান লেখায় 'গণবাহিনী' শব্দটির দু' ধরনের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১১টি সেক্টরে ও তিনটি ফোর্সের অধীনে থাকা নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি যুদ্ধরত সাধারণ যোদ্ধাদের গণবাহিনী বলা হতো। আবার জাসদ গঠনের পর তাদের যে সশস্ত্র শাখা গড়ে ওঠে তাকেও গণবাহিনী নামেই অভিহিত করা হতো। জাসদ সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা যখন 'গণবাহিনী' শব্দটি ব্যবহার করবো তখন বুঝতে হবে যে তাদের সশস্ত্র শাখার কথা বলা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধকালীন গণবাহিনীর কথা নয়।

মিলিশিয়া গঠনের পরিকল্পনা অনুমোদন করে।'[২৩৩] শেষোক্ত তথ্য প্রমাণ করে, স্বাধীন দেশে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলেও ভারতে অবস্থানকালেই তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভা মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ প্রবাসী সরকার ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতেই তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছিল। ফলে ১৮ ডিসেম্বরের যে কোনো বৈঠক কলকাতাতেই হওয়ার কথা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণী দিক ছিল তিনটি : প্রথমত ১১ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মিলিশিয়া বোর্ডে[২৩৪] ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়; দ্বিতীয়ত মিলিশিয়া বাহিনী গঠনে মুজিব বাহিনী যাতে বাধা না দেয় সেজন্য জেনারেল উবানকে ২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় আনা হয়। তবে মিলিশিয়া ধারণাটি সমন্বয় করছিলেন জেনারেল বি এন সরকার। আগেই যেমনটি বলা হয়েছে– তিনি ছিলেন ইস্টার্ন কমান্ডের ডিরেক্টর অব অপারেশনস্। যুদ্ধকালে যাঁর পদবি ছিল ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের 'সিভিল এ্যফেয়ার্স লিয়াজোঁ অফিসার' এবং যাঁর যুদ্ধপরবর্তী তৎপরতা সম্পর্কে ৪.ক উপ-অধ্যায়ে ইতোমধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে– যুদ্ধের পর তিনিই অনেকাংশে বাংলাদেশকে পরিচালনা করছিলেন।[২৩৫]

তৃতীয়ত জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী সম্পর্কে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে যে ঘোষণা প্রকাশ করে (৮ নম্বর সংযুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) তাতে প্রথমবারের মতো উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশে 'সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি যখন মিলিশিয়া বোর্ডের প্রথম বৈঠক হয় তাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ব্রিগেডিয়ার আনন্দ স্বরূপ। উপরোক্ত বোর্ডে মুজিব বাহিনীর তরফ থেকে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তোফায়েল আহমেদ ও আবদুর রাজ্জাক। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মুজিব বাহিনী মিলিশিয়া বাহিনীর কার্যক্রমে সম্মতি

---

২৩৩ মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইউপিএল, ২০০৪, ঢাকা, পৃ. ২৩০।

২৩৪ বোর্ডের সদস্যরা ছিলেন মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মনি সিংহ, অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ, মনোরঞ্জন ধর, তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, গাজী গোলাম মোস্তফা, রফিক উদ্দিন ভুঁইয়া, ক্যাপ্টেন সুজাত আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সেন্ট্রাল মিলিশিয়া বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এও সিদ্ধান্ত হয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের একজন প্রতিনিধিও থাকবেন সেন্ট্রাল মিলিশিয়া বোর্ডে। প্রথম বৈঠকেই সেই প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। একটি দেশের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীর এইরূপ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল বিস্ময়কর।

২৩৫ বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাস প্রতিষ্ঠিত হলে জেনারেল সরকার তাতে প্রথম ভারতীয় মিলিটারি এটাশে হন। অবসর পর্যায়ে তিনি যুক্ত ছিলেন কলকাতার আর কে মিশন ইনস্টিটিউটে।

দিয়েছিল। বাহাত্তরের ২৪ জানুয়ারি মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সরকার। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের এক ক্যাম্পে জড়ো করা, অস্ত্র নিয়ে নেয়া, দেশ গঠনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমও শুরু হয়। মিলিশিয়া ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাতারও ব্যবস্থা করা হয়। এসব সত্ত্বেও, মুজিব বাহিনীর তৃণমূল সদস্যরা মিলিশিয়া ক্যাম্পে যোগদানে নিরুৎসাহিত ছিলেন।[২৩৬] তারা সরকার কর্তৃক অস্ত্র নিয়ে নেয়ার তৎপরতাকে তাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলার প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করছিল। ফলে কার্যত যা ঘটে, প্রায় প্রতি জেলাতে দ্রুত মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি শক্তিকেন্দ্র গড়ে ওঠে– একটি হলো মিলিশিয়া ক্যাম্প এবং অপরটি হলো মুজিব বাহিনী। জেলার আর্থসামাজিক নানা বিষয়ে এই দুই শক্তিকেন্দ্র থেকে শক্তি প্রদর্শনের প্রচেষ্টাও শুরু হয়। উপরন্তু 'জাতীয় মিলিশিয়া'র নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে এ নিয়ে মুজিব বাহিনী ও জাতীয় সেনাবাহিনীর মাঝেও প্রকাশ্য মতদ্বৈততা দেখা দেয় এ সময়।[২৩৭] সেই মতদ্বৈততার খোলামেলা ছাপ পড়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় মিলিশিয়া বোর্ডের প্রথম বৈঠকেই। বৈঠকের minutes-এ মুজিব বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে আবদুর রাজ্জাকের বক্তব্য এভাবে উল্লিখিত হয় :

> Mr. Razzqk, MPA, agreed that the young fighters must go to the Militia camps. He was also of the view that command of the National Militia should be given to political leaders since most of the freedom fighters were politically motivated...'

অন্যদিকে বৈঠকের অন্যতম আলোচক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেই সময়কার কর্মকর্তা কর্নেল খালেদ মোশাররফের বক্তব্য উল্লিখিত হয় এভাবে :

> `Col. Khaled Mosharraf, Adviser on behalf of the Mukti Bahini, was of the opinion that the command

---

২৩৬ মুজিব বাহিনীর সদস্যদের মিলিশিয়া ক্যাম্পে না যাওয়ার বিষয়ে সমর্থনসূচক বক্তব্য পাওয়া গেছে নঈম জাহাঙ্গীর (জামালপুর) এবং সামছুল আলম খান (মানিকগঞ্জ)-এর কাছ থেকেও। শেষোক্তজন যুদ্ধ করেছেন ১১ সেক্টরে। বর্তমানে জাতীয় কৃষক জোটের প্রশিক্ষণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জাসদ গড়ে ওঠার পর তিনি মানিকগঞ্জের গণবাহিনীর নেতৃস্থানীয় সংগঠক ছিলেন। তাঁর ভাষায়: 'মুজিব বাহিনীর সাধারণ সদস্যরা তখনও নিশ্চিত ছিল না শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত অবস্থায় বাংলাদেশে ফিরতে পারছেন কি না। তাঁদের মাঝে শঙ্কা ছিল তিনি ফিরে না এলে এবং তাজউদ্দীন আহমদ তাদের নিরস্ত্র করতে সক্ষম হলে মুজিব বাহিনী দ্রুত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলবে। অন্যদিকে নীতিনির্ধারক ও সংগঠক পর্যায়ে অস্ত্রসমর্পণের বিপক্ষে আরও গুরুতর কারণ ছিল।' বিশেষত কে এই বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করবে সে নিয়ে মতভেদ ছিল তীব্র।

২৩৭ মিলিশিয়া বাহিনী কার্যক্রমে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে এসময় সেনাবাহিনীও ফরমেশন কমান্ডারদের বৈঠকের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করে।

(of the National Militia) should be given to Army officers, who are trained in this type of work and who can discharge the function more effectively.[২৩৮]

স্পষ্টতই এখানে নীতিগত একটি মীমাংসার চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু মিলিশিয়া বোর্ড তার চূড়ান্ত কোনো সমাধান দিতে পারেনি। এইরূপ বিবাদের পাশাপাশি মিলিশিয়া ক্যাম্পের ব্যয় নির্বাহে রাষ্ট্রীয় অপারগতার পরিণতিতে[২৩৯] বন্দিদশা থেকে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরই মিলিশিয়া বাহিনীর কার্যক্রম পরিত্যক্ত হয়। অনেক জেলার মতো কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায়ও (পিলখানায়; রাইফেলস্-এর কার্যালয়টিই ছিল মিলিশিয়া বাহিনীর কেন্দ্রীয় দপ্তর) মিলিশিয়া কার্যক্রম নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

যে বিবেচনা থেকে এই বাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল ব্যাপক। মূলত মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় দেশি-বিদেশি প্রভাবশালী মহল চাইছিল মুজিব বাহিনী বহির্ভূত গণচরিত্রের সকল মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার তথা তাদের নিরস্ত্র করা। ধারণা করা হয়, সে লক্ষ্য অর্জনের পথেই এই বাহিনীতে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করে তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন সরকার। এই কার্যক্রমে সরকারের যুক্তি ছিল– ব্যাপকভিত্তিক অস্ত্র উদ্ধার ও মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন ছাড়া কোনোক্রমে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তবে ঘটনাবলির ভিন্ন তাৎপর্যও প্রবল অনুসন্ধানের দাবি রাখে। ইতিহাসের এই সময়টিতে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে 'নকশাল আন্দোলন' ছিল তুঙ্গে। ভারতীয়দের আশঙ্কা ছিল (এবং সম্ভবত তাজউদ্দীন আহমদেরও) মুক্তিযোদ্ধা গণবাহিনীর হাতে অস্ত্র থাকলে (যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৪ হাজার) এটা যেমন একদিকে ভারতীয় নকশালদের হাতে যেতে পারে তেমনি বাংলাদেশেও সশস্ত্র শ্রেণিসংগ্রাম বিকশিত রূপ নিতে পারে। এইরূপ বাস্তবতাতেই মিলিশিয়া বাহিনীর ধারণা পরিত্যক্ত হওয়ার পর রক্ষীবাহিনী গঠন আওয়ামী লীগ

---

২৩৮ বৈঠকের পুরো minutes -এর জন্য দেখুন, মঈদুল হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৫-৩৩০।

২৩৯ মুজিবের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাহাত্তরের এপ্রিলে মিলিশিয়া ক্যাম্পগুলো বন্ধ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন তসলিম আহমেদ। ঐ মুহূর্তটিকে ফরিদপুরের একজন মুক্তিযোদ্ধা আবু সাঈদ খান ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : 'মিলিশিয়া ক্যাম্প ভেঙে দেয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের 'যার যার পুরানো পেশায় ফিরে যাওয়ার' জন্য বলা হলেও অনেকেরই পুরানো পেশায় ফিরে যাওয়ার কোনো বাস্তব পরিস্থিতি ছিল না। তাছাড়া যুদ্ধ তাদের মনোজগতে যে বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তার ফলে 'আগের জীবনে' ফিরে যাওয়া তাদের পক্ষে ছিল প্রকৃতই অসম্ভব। বাহাত্তর-উত্তর রাজনৈতিক সংকটের এটাও এক বড় কারণ।' আবু সাঈদ খান ফরিদপুরে জাসদের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ছিলেন এবং পরে দৈনিক সমকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হন। তাঁর সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয় ২০১২ সালের ২ নভেম্বর।

সরকার ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আর তার জন্য প্রয়োজন পড়ে মুজিব বাহিনীর। তবে লে. জে. অরোরা দাবি করেছেন, তাঁরা প্রথমে মুজিব বাহিনী ভেঙে দিতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু মুজিবের কারণে তাঁরা সেটা পারেননি।[২৪০] নতুন রাষ্ট্রে অনেকগুলো বাহিনী থাকার পরও রাজনৈতিক চরিত্রের আধা-সামরিক আরেকটি বাহিনী গঠনে মুজিবের বিশেষ আগ্রহ কিংবা সম্মতির পেছনে সেই সময়কার বিশিষ্ট সাংবাদিক এস এম আলী (পরে ডেইলী স্টারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক) একটি বড় কারণ হিসেবে শনাক্ত করেছেন মুজিবের এইরূপ মনস্তাত্ত্বিক ভয় যে, বামপন্থীরা তাঁর কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারে। বাহাত্তরের পটভূমিতে এস এম আলী লিখেছেন, 'The fear of take-over of the country by militant left forces continues to dominate the thinking of Sheikh Mujibur Rahman.'[২৪১]

ভিন্ন ভঙ্গিতে প্রায় একই ধরনের মূল্যায়ন করেছেন ঐ সময়ের আরেক সাংবাদিক এনায়েতুল্লা খান। তাঁর মতে, মুজিবের জনপ্রিয়তা এক পর্যায়ে ভিন্ন রূপ নিতে শুরু করে– যা অক্ষম ছিল সেই সময়কার অবদমিত জনচেতনাকে মোকাবেলা করতে। ফলে মুজিব ও শাসক গ্রুপ সন্ত্রাসনির্ভর নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর দিকেই ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পুলিশ, সেনাবাহিনী বা অন্যকোনো প্যারা-মিলিটারি দিয়ে এই আরাধ্য কাজ করানো সম্ভব ছিল না। কারণ দেশপ্রেমিক যুদ্ধে এদের মনোভঙ্গিতে অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়ে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এরাই প্রথম গড়ে তুলেছিল সশস্ত্র প্রতিরোধ। ফলে নতুন দেশে তারা অন্ধভাবে কোনো শাসক গ্রুপের 'নিজস্ব' স্বার্থে নিয়োজিত হবে এমনটি সম্ভব ছিল না। এভাবেই শাসকদের কাছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর 'আনুগত্য' প্রশ্নবিদ্ধ এবং সন্দেহের শিকার হয়ে পড়েছিল। যার পরিণতিতে একই শাসকদের প্রয়োজন পড়ে নতুন একটি নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের– যে যন্ত্র ঔপনিবেশিক আদলে তাদের স্বার্থকে সুরক্ষা দেবে।'[২৪২] কার্যত এভাবেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নতুন এক দফা সম্প্রসারণ ঘটে

---

২৪০ দেখুন, *লে. জে. অরোরার সাক্ষাৎকার*, ফুয়াদ চৌধুরী, বাংলায় অনুবাদ : আহসানুল আলম, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৯১, ঢাকা, পৃ. ৩৭। উক্ত সাক্ষাৎকারে অরোরা বলেন, 'যুদ্ধের পর আমরা মুজিব বাহিনী ভেঙে দিতে চেয়েছিলাম, যেন এ বাহিনীর সবাই আবার স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে যেতে পারে। এর জন্য পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন শেখ মুজিব ফিরে এলেন, তখন তিনি মুজিব বাহিনী না ভেঙে একে গড়ে তুলতে চাইলেন। এর জন্য তিনি আমার কাছে যন্ত্রপাতি, গাড়ি ইত্যাদি ভারতীয় সহায়তা চাইলেন।'

২৪১ S. M. Ali, *ibid*, p.194.

২৪২ এনায়েতুল্লা খান অবশ্য উক্তরূপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র হিসেবে কেবল রক্ষীবাহিনীই নয়- 'লাল বাহিনী' ও 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'কেও চিহ্নিত করেছেন। প্রথমোক্ত বাহিনীকে প্যারামিলিটারি ফোর্স বললেও শেষোক্ত দুটিকে বলেছেন, 'আধা-আনুষ্ঠানিক প্রাইভেট বাহিনী।' বাস্তবে এসব বাহিনী দেশব্যাপী তখন তাদের কার্যক্রম চালালেও সেগুলোর 'প্রাইভেট' চরিত্রটি এমন ছিল

রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে।[২৪৩] যার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল মুজিব বাহিনী সদস্যদের অস্ত্রসমর্পণের পর পিলখানায় ব্রিফিংকালে ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। ইতোমধ্যে সে বিষয়ে ৩.ঙ উপ-অধ্যায়ের শেষে সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য তুলে ধরা হয়েছে।

রক্ষীবাহিনী গঠন যে উপরোক্ত ব্রিফিং ও জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতা এবং এসবের যে আন্তঃসম্পর্ক ছিল তা অপর একটি বিষয় থেকেও অনুমান করা যায়। জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ক্যাপ্টেন এ. এন. এম. নূরুজ্জামানকে। এই দায়িত্বের র‍্যাংক ছিল লে. কর্নেল। মিলিশিয়া ধারণা পরিত্যক্ত হলেও পরবর্তীকালে আমরা দেখবো জনাব নূরুজ্জামানকেই রক্ষীবাহিনীর প্রধান করা হয়। পেশাগত যোগ্যতায় অপেক্ষাকৃত সামর্থ্যবান অনেক সামরিক অফিসার থাকলেও এ এন এম নূরুজ্জামানের প্রতি সেই সময়কার দেশি-বিদেশি নীতিনির্ধারকদের এই 'আস্থা' ছিল বিস্ময়কর। জাতীয় মিলিশিয়ার কেন্দ্রীয় দপ্তর পিলখানাতে '৭২-এর ১৬ ফেব্রুয়ারিতে তাঁর উপস্থিতিতেই গুরুতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। প্রায় আধা ঘণ্টা সেখানে গোলাগুলি হয়। তিনি নিজেও সেখানে অধীনস্তদের আঘাতে আহত হয়েছিলেন। মিলিশিয়া বাহিনীর হবু সদস্যদের রাজনৈতিক ও আদর্শিক আনুগত্য যাচাইয়ের জন্য স্ক্রিনিং কার্যক্রম নিয়ে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত। এই বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধাবস্থা সেনাবাহিনীর ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্ষুদ্র একটি দলকে পাঠিয়েও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না এবং বিদ্রোহীদের দাবি অনুযায়ী, এক পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে সেখানে যেতে হয়েছিল পরিস্থিতি সামাল দিতে। মিলিশিয়া প্রকল্প পরিত্যক্ত হওয়ার পেছনে এই সংঘর্ষও একটি অনুঘটকের ভূমিকা রেখেছিল। এতসব কিছুর পরও অবশ্য ধাপে ধাপে ব্রিগেডিয়ার হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন নূরুজ্জামান। তাঁর সম্পর্কে পরে রক্ষীবাহিনী গঠন বিষয়ক আলোচনায় (৫.খ ও ৫.ঘ উপ-

---

যে, শাসক গ্রুপের বা শাসক দলের পূর্ণাঙ্গ কোনো প্রভাব ছিল না কোনো বাহিনীর ওপর; বরং একেক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতেন ২-১ জন ব্যক্তি মাত্র। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত দেখুন, Enayetullah Khan, *ibid*, p. 238. উল্লিখিত রচনায় এনায়েতুল্লাহ খান পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশসহ আরও কিছু অভিজ্ঞতার আলোকে তাত্ত্বিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন এভাবে: In the socio-political matrix of the Third World, counter-revolution is openly aggressive, because it has to contend with the highest degree of revolutionary potential and, at times, with revolution itself. That is why it is unabashed in its brutality...*ibid*, p.242.

২৪৩ রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে নবীন রাষ্ট্রের নতুন ধারার এই সম্প্রসারণ চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন ক্ষুরধার শেখ মণিও, ১৯৭২ সালেই; যখন তিনি বড় বড় হেডলাইনে দ্বিধাহীন চিত্তে লিখেন, *মুজিবের শাসন চাই–আইনের শাসন নয়*। দেখুন, *বাংলার বাণী*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, ঢাকা।

অধ্যায়ে) আমরা আরও তথ্য তুলে ধরবো। আপাতত এখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্বাধীনতা-উত্তর সময়কার একজন এডজুটেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ থেকে পাওয়া নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি তুলে ধরা হচ্ছে যা পাঠককে ঐ সময়কার অনেক ঘটনাবলির যোগসূত্র উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারে।

> "রক্ষীবাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান শেখ মুজিব হত্যার সময় দেশের বাহিরে ছিলেন। কয়েকদিন পর তিনি দেশে ফিরে আসেন।...নভেম্বরের ৩ (১৯৭৫) তারিখে খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থানে যদিও ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান সরাসরি জড়িত ছিলেন না তবে বিভিন্নভাবে পরে তাঁকে এক্ষেত্রে সক্রিয় দেখা গেছে। ৭ তারিখের (নভেম্বর ১৯৭৫) অভ্যুত্থানের পর তিনি দেশত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান।...১৯৭৬ সালে তৎকালীন সিজিএস জেনারেল মঞ্জুর তাঁকে ভারতে থেকে ফেরত আনার উদ্যোগ নেন। পরে তিনি ভারত থেকে সরাসরি লন্ডন আসেন। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি (মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী) তাঁকে লন্ডন থেকে আমেরিকা পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। তিনি সেখানে তাঁর শ্যালক আমেরিকায় বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর হুমায়ূন কবিরের সঙ্গে অবস্থান করেন। ১৯৮৬ সালে আমি যখন সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের হাইকমিশনার তখন সেখানে ভারতীয় দূতাবাসে হাইকমিশনার হয়ে আসেন ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শংকর নারায়ণ। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান। আমি সে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাই।"[২৪৪]

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে রক্ষীবাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানের জড়িত থাকার বিষয়ে মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে কিছু ইঙ্গিত দিলেও তা অস্পষ্ট। প্রকৃত সত্য হলো, ঐ অভ্যুত্থান সংগঠকদের মাঝে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের পরই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিনিয়র অফিসার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান।[২৪৫] অন্যদিকে মইনুল

---

২৪৪ মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য: স্বাধীনতার প্রথম দশক*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০, ঢাকা, পৃ. ১০৬-৭। ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, রক্ষীবাহিনী ও মধ্য-পঁচাত্তরে সেনাবাহিনীর বিশৃঙ্খলায় এদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে এ লেখার অন্যত্র অনেকগুলো ফুটনোটে আরও তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪৫ বিস্তারিত দেখুন, কর্নেল শাফায়াত জামিল (অব.), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর*, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৮, ঢাকা। উল্লেখ্য, এই অভ্যুত্থানে যুক্ত সেনা অফিসারের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭। দেখুন, মেজর নাসির উদ্দিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩।

হোসেন চৌধুরী যে শংকর নারায়ণের (আসলে নাম K. Sankaran Nair) উল্লেখ করেছেন তিনিই একাত্তর পূর্ববর্তী সময়ে আগরতলা মামলায় অভিযুক্তদের সঙ্গে মূল যোগাযোগ রাখতেন 'কর্নেল মেনন' ছদ্মনামে।[২৪৬] ধারণা করা হয়, তখন থেকে নূরুজ্জামানকে জানতেন তিনি। এই K. Sankaran Nair ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

উল্লেখ্য, পঁচাত্তরের আগস্টের ঘটনাবলির একটি কাকতালীয় (এবং হয়তো তাৎপর্যবহও বটে) দিক হলো, সেই সময়কার বিবদমান দুটি বাহিনী (রক্ষীবাহিনী ও গণবাহিনী)-এর সংশ্লিষ্ট প্রধান ব্যক্তি হিসেবে যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার নূরজ্জামান যেমন ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের কিছু আগে দেশের বাইরে চলে যান– তেমনি সিরাজুল আলম খানও ঐ সময় ভারতে অবস্থান করছিলেন। আবার ঐ সময়কার বাংলাদেশে প্রভাবশালী দুই রাষ্ট্রদূত সমর সেন (ভারত) এবং আন্দ্রে ফোমিনও (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ছিলেন তখন কর্মস্থলের বাইরে।

দেশের তখনকার আরেক প্রভাবশালী বামপন্থী নেতা– যাকে বাকশালে যোগদানের অনুরোধ করেছিলেন শেখ মণি– সেই কাজী জাফর আহমেদও ১৫ আগস্টের আগে ভারত চলে যান। সিপিবি প্রধান মনি সিংহ চলে যান মস্কোতে। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল উল্লিখিত ১৫ আগস্ট ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসে তাদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনমূলক কোনো অনুষ্ঠান না হওয়া।

---

২৪৬ দেখুন, অশোকা রায়না, *ইনসাইড 'র'*, অনুবাদঃ লে. (অব.) আবু রুশদ, মিলারস্ প্রকাশনী, ১৯৯৪, ঢাকা, পৃ. ৬১। উল্লেখ্য, কাও-এর পর K. Sankaran Nair-ই 'র'-এর প্রধান হন।

৪.গ. 'গণবাহিনী'[২৪৭] ও 'রক্ষীবাহিনী'র সংঘাত এবং দ্বিতীয় তরঙ্গের হত্যালীলা

'অস্ত্র জমা দিয়েছি – ট্রেনিং জমা দেইনি।'
– স্বাধীনতার ঊষালগ্নে ঢাকায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে লিখিত শ্লোগান।[২৪৮]

আমরা (মুজিব বাহিনী) জাতীয় বিপ্লবী সরকারের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এটা সিরাজুল আলম খান আর আমি মুজিব বাহিনীর পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কারণ, এ প্রস্তাব গৃহীত হবার অনুকূল অবস্থা তখন ছিল না। কেননা, আগেই ভারতের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছিল।...
–আবদুর রাজ্জাক, মুজিব বাহিনীর প্রধান চার নেতার একজন[২৪৯]

---

২৪৭ গণবাহিনী ছিল জাসদের সশস্ত্র শাখা। জাসদ নিজেকে একটি 'দল' হিসেবে উল্লেখ করলেও তাত্ত্বিকভাবে সে নিজেকে 'মাল্টিক্লাস অর্গানাইজেশন' মনে করত এবং ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক পার্টির 'ভ্রূণ' হিসেবে সেখানে একটি সিওসি (সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং কমিটি) গড়ে তোলা হয় সবগুলো অঙ্গসংগঠনের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে। গণবাহিনী এই সিওসি'র অধীনে কাজ করত। ১৯৭২ সালের মে মাসে অনানুষ্ঠানিকভাবে ঐ কাঠামোর গোড়াপত্তন। সিরাজুল আলম খানও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থার ১২ সদস্যের একজন ছিলেন। কর্নেল আবু তাহেরকে গণবাহিনীর প্রধান করা হয়েছিল, যদিও তা সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয়নি। গণবাহিনীর উপনেতা হিসেবে হাসানুল হক ইনুর (সাংগঠনিকভাবে যিনি ছিলেন কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক) পরিচিতি ছিল প্রকাশ্য। জাসদ রাজনীতি কীভাবে গণবাহিনীকেন্দ্রিক রূপ নিয়েছিল সে বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বহু ক্ষয়ক্ষতি শেষে ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে এক নীতিনির্ধারণী বৈঠক শেষে জাসদ তার এই সামরিক অঙ্গসংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ করে। তবে সাংগঠনিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হলেও অস্ত্রসমর্পণের সেরকম উদ্যোগ দেখা যায়নি। মানিকগঞ্জের গণবাহিনীর একজন সুপরিচিত সংগঠক বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন, কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণার পর তাদের অস্ত্র 'ক্যাশ' করে রাখার (লুকিয়ে রাখা) জন্য বলা হয়। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তিগত ও গ্রুপভিত্তিতে এর পরও গণবাহিনী সংশ্লিষ্টরা তাদের সশস্ত্র তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিলেন– জাসদ রাজনৈতিকভাবে যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। কুষ্টিয়া, কালীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।

২৪৮ এটাকে স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দেয়াল লিখন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন জাসদ নেতা আবু সাঈদ খান তাঁর 'শ্লোগানে শ্লোগানে রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থে, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮, ঢাকা, পৃ. ৪৬।

২৪৯ ১৯৮৯ সালের ২ জুন টেপরেকর্ডারে ধারণকৃত মুজিব বাহিনী নেতা আবদুর রাজ্জাক-এর সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার প্রদানকালে তিনি বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের সাধারণ

১৯৭২-এর প্রথম থেকে মুজিব বাহিনীর একাংশের সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের তীব্র বিরোধ, মুজিব বাহিনীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ, সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর কর্তৃত্ব ধরে রাখতে সর্বগ্রাসী ভারতীয় চেষ্টা, শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে আসামাত্র যুদ্ধকালে তাজউদ্দীনপন্থীদের দ্বারা নয় মাস কোণঠাসা থাকা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের একাংশের আবারও প্রভাবশালী হয়ে ওঠা ইত্যাদির মাঝেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গড়ে ওঠার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর এম এ জলিল ও আ স ম রব[২৫০]কে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে জাসদের জন্ম হয়। পরবর্তী ডিসেম্বরে আহ্বায়ক কমিটি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটিতে বর্ধিত হয়। তিয়াত্তরের মে মাসে গঠিত হয় পূর্ণাঙ্গ জাতীয় কমিটি।

নবগঠিত এই দলের প্রধান শক্তিভিত ছিল মুজিব বাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধারা, যদিও দলের প্রথম প্রকাশ্য আহ্বায়ক কমিটি দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না।[২৫১] কিন্তু দ্রুত সেই যোদ্ধাদের গুরুত্ব বেড়ে যায় যখন দেখা গেল, জাসদ গঠনের পরপরই নবাবগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জে খুন হলেন তাদের দুই জনপ্রিয় নেতা সিদ্দিকুর রহমান মাস্টার ও বাদল বিশ্বাস। মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার

সম্পাদক ছিলেন। বিস্তারিত দেখুন, মাসুদুল হক, *'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে র এবং সিআইএ'*, প্রচিন্তা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৫৭।

২৫০ জনসম্মুখে এ সময় জাসদের সবচেয়ে সোচ্চার তথা মুজিবের প্রতি আক্রমণাত্মক বক্তা ছিলেন আ স ম রব (জন্ম: ১৯৪৫)। ১৯৭১-এর ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বাংলাদেশের সম্ভাব্য পতাকা উত্তোলন করে তাঁর একটি সাহসী ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল। যে কারণে একাত্তর-উত্তর সময়ে তিনি যখন সরকারের বিরুদ্ধে অনলবর্ষী হয়ে ওঠেন তখন তরুণদের মাঝে আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব তৈরির ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তার এরূপ বিশেষ ভাবমূর্তির কারণে জাসদ নামে একটি পৃথক 'দল' গঠনের পর বেশ কয়েক মাস সাধারণ্যে এ দলকে (ছাত্রলীগের) 'রব গ্রুপ' হিসেবে অভিহিত হতে দেখা যায়। ১৯৯৬-২০০১ পর্যায়ে এসে সেই আ স ম রবই শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার আগে তিনি সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আঁতাতের দায়েও নিন্দিত হন রাজনৈতিক অঙ্গনে।

২৫১ আহ্বায়ক কমিটি ছিল মাত্র সাত সদস্যের। জলিল-রব ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক। বাকি সদস্যরা ছিলেন শাজাহান সিরাজ, বিধানকৃষ্ণ সেন, নূর আলম জিকু, সুলতান উদ্দীন আহমদ এবং রহমত আলী। শেষোক্তজন অবশ্য এক সপ্তাহের মধ্যে আবার আওয়ামী লীগে ফিরে যান। যা নবগঠিত দলকে বেশ বিব্রত অবস্থায় ফেলে। উপরোক্ত সাত জনের মধ্যে সুলতানউদ্দিন এবং বিধান কৃষ্ণ ছিলেন আগরতলা মামলার আসাম। এ ছাড়া তখন আর তাঁদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। জাসদের যাত্রার সময়ের উল্লেখযোগ্য একটি দিক ছিল, 'জয়বাংলা' শ্লোগান দিয়েই নবগঠিত দল তার প্রথম সাংগঠনিক বক্তব্য উপস্থাপন করে (দেখুন, সংযুক্তি: *জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রথম ঘোষণাপত্র*)। অন্যদিকে তিয়াত্তরের নির্বাচনে প্রতীক হিসেবেও নতুন দলের প্রথম পছন্দ ছিল নৌকা এবং দ্বিতীয় পছন্দ ছিল মশাল। নৌকা প্রতীকের জন্য আইনগত লড়াইও চালিয়েছিল জাসদ।

চারিগ্রামে জন্মগ্রহণকারী সিদ্দিক মাস্টার ছিলেন নওয়াবগঞ্জ পাইলট হাইস্কুলের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক; ১৯৭২ সালের ১২ নভেম্বর স্কুল হোস্টেলে গুলি করে জনপ্রিয় এই নেতাকে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে সাহাদাত হোসেন বিশ্বাস বাদল খুন হন ১৯৭৩-এর ১০ জানুয়ারি দোহারের জয়পাড়ার পালংগঞ্জে। এরপর ১৯৭৩ সালের ৭ অক্টোবর সরকারপন্থী ছাত্রলীগের সবচেয়ে বড় শিকার হন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিরাজুল আলম খানদের অনুসারী জাকসুর নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছাত্রনেতা শাহ বোরহান উদ্দিন রোকন।[২৫২] নারায়ণগঞ্জে বোনের বাসায় যাওয়ার পথে তাঁকে বন্দুকের মুখে অপহরণ করা হয় এবং পরদিন লক্ষীনারায়ণ কটনমিলের পাশে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তে রোকনের মাথায় একটি গুলির চিহ্ন শনাক্ত করা হয়েছিল।

এ ধরনের মৃত্যুর মিছিল এরপর স্বাভাবিক ও প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। তবে মাঝে মাঝেই হত্যার নির্মমতা ও হত্যাকারীদের বেপরোয়া ভঙ্গি জনগণকে ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কিত করে তুলত। ১৯৭৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এ রকম এক ঘটনায় ছোট্ট জনপদ নওয়াবগঞ্জে একই দিন রক্ষীবাহিনী ও সরকারি দলের ক্যাডাররা স্থানীয় সাতজন রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করে।[২৫৩] যশোরে অ্যাডভোকেট মোশারফ হোসেনের হত্যাকাণ্ডও ছিল এ রকম আরেক আতঙ্কজনক

---

২৫২ রোকন খুব খ্যাতনামা সংগঠক ছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম জাকসু নির্বাচনে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরের নির্বাচন সরকার সমর্থক ছাত্রলীগ বানচাল করে দেয়– ফলে রোকন জিএস হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। স্বাধীনতার পরপর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কীভাবে শাসকগোষ্ঠীর সরাসরি সম্পৃক্ততায় সন্ত্রাসকবলিত হয়ে পড়েছিল তার এক করুণ দৃষ্টান্ত হতে পারে রোকনের মৃত্যু। ঐ সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন শিক্ষাবিদ সৈয়দ আলী আহসান। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, জাসদ ছাত্রলীগের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুজিব ও ইন্দিরাকে লক্ষ্য করে গায়ক আবদুল জাব্বার ব্যঙ্গাত্মক একটি গান গাওয়ার প্রতিশোধ হিসেবে তৎকালীন ছাত্রলীগের একজন বহুল আলোচিত প্রভাবশালী নেতা তাঁর কিছু সঙ্গীকে নিয়ে কিছুদিন পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালান। রোকন ছিলেন তাঁদের প্রধান টার্গেট। কিন্তু রোকন প্রাথমিকভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। বিষয়টি শিক্ষকদের তরফ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে জানানো হলেও কিছুদিন পরই রোকনকে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে যাওয়ার পথে অপহরণ করা হয় এবং পরদিন শীতলক্ষ্যার তীরে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, প্রতিকারহীন এরূপ হত্যাকাণ্ড প্রতিপক্ষের মাঝেও অনুরূপ জিঘাংসার সঞ্চার করেছিল। রোকনের মৃত্যুর পূর্বাপর জানতে দেখুন: সৈয়দ আলী আহসান, *বঙ্গবন্ধু: যেরকম দেখেছি*, বার্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬, ঢাকা, পৃ. ২২-২৩। রোকনের গ্রামের বাড়ি ছিল বৈদ্যেরবাজার থানার বুরুন্ডি। তিনি পরিসংখ্যানের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭৩-এর নভেম্বরে পরবর্তী জাকসু'র নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হকও (যিনি ছিলেন ছাত্রলীগের বিপক্ষ গ্রুপের সমর্থনপুষ্ট) আততায়ীর হাতে নিহত হন।

২৫৩ এরা ছিলেন খালিদ হোসেন, এবাদত আলী, বাবুল, রবি, কালু, এবাদত (২) এবং মোতালেব।

ঘটনা। তিনি ছিলেন সেখানে জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি। ১৯৭৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি রাতে জাসদ কার্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় মাত্র দু' জন মুখোশধারী সন্ত্রাসী স্টেনগান থেকে গুলি চালিয়ে ধীরেসুস্থে হেঁটে হেঁটে রাস্তা পার হয়ে যায়। মোশারফ হোসেনের সঙ্গে আরও দু'জন সেদিন গুলিবদ্ধ হয়েছিলেন।[২৫৪]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এসব মৃত্যুকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা কঠিন হয়ে পড়ে বিশেষত যখন দেখা যায় প্রায় প্রতিদিন দেশের কোথাও না কোথাও সরকারি ছত্রছায়ায় বলপ্রয়োগের এরূপ ঘটনা ঘটছে। সিদ্দিক মাস্টারের লাশ রাজধানীতে এনে জাসদ নেতৃত্ব প্রকাশ্যেই শপথ নিয়েছিলেন যে তারা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবে। সিদ্দিক মাস্টার ও বাদল বিশ্বাসের খুনের আগেই অবশ্য ছাত্রলীগের এই অংশের কর্মীরা মুজিববাদ সমর্থকদের হাতে মারা যেতে শুরু করে। এক্ষেত্রে মুজিববাদপন্থীদের প্রথম শিকার ছিলেন দিনাজপুরের আবদুল মালেক। ১৯৭২-এর ২৩ জুলাই তিনি খুন হন। মালেক-সিদ্দিক-বাদল-মোশারফ হোসেন প্রমুখের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জাসদ ও প্রতিপক্ষ বাহিনীর মধ্যে খুনের যে হোলিখেলা শুরু হয় তাকে যে ধীর লয়ে চলা এক ধরনের গণহত্যার সঙ্গে তুলনা-করা যায় তার স্মারক এই গ্রন্থের শেষে সংযোজিত নিহতদের তালিকা। এই তালিকা নিহতদের এক খণ্ডাংশ মাত্র। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারা বরাবর এসব মৃত্যুর যৌক্তিকতা, খুনীদের বিচার কিংবা নিহতদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির বিষয়টি সচেতনভাবে এড়িয়ে যায়।[২৫৫]

এটা ছিল বাস্তবে স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজে দ্বিতীয় তরঙ্গের হানাহানি– যার ইঙ্গিত দেশবাসী পেয়েছিল এই আলোচনার শুরুতে উদ্ধৃত স্বাধীনতা-উত্তর সেই দেয়াল লিখনে '*অস্ত্র জমা দিয়েছি–ট্রেনিং জমা দেইনি।*' স্বাধীনতা পরবর্তী হত্যালীলার প্রথম তরঙ্গটি প্রবাহিত হয়েছিল সম্মিলিতভাবে সকল ধারার 'মুক্তিযোদ্ধা'দের দ্বারা উর্দুভাষীদের ওপর। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগেই আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর মাঝে রাজনৈতিক

---

২৫৪ বেগম মোশারফ হোসেন তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত শোকবাণীও সেদিন এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন: 'যার দলীয় কর্মীরা আমাকে শোক সাগরে ভাসিয়েছে– তিনি আবার আমার কাছে শোকবাণী পাঠিয়েছেন। এটাকে পরিহাস ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে।' *দৈনিক গণকণ্ঠ*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, ঢাকা। উল্লেখ্য, মোশারফ হোসেনের নিহতস্থল গুরুদাস বাবু লেনস্থ জাসদ অফিসের উপরতলাতেই ছিল তাঁর বাসস্থান।

২৫৫ এসময় সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দ্বারা প্রায় ৫০-৬০টি থানা ও পুলিশ ফাঁড়িতেও হামলা ও লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটে। সেসব থানা ও ফাঁড়ির তালিকা ও আক্রমণের তারিখের জন্য দেখুন: আনোয়ার উল আলম, *রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা*, প্রথমা, জুন ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ২১৭-২১৯। তবে এসব হামলার অনেকগুলো ঘটে পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি কর্তৃক।

দরকষাকষি যতই দুরূহ হয়ে উঠছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে 'বিহারি' নামে পরিচিত উর্দুভাষীদের ওপর বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ ততই বাড়ছিল। চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা ডা. মাহফুজুর রহমান সেই বিবরণ দিয়েছেন এভাবে : *১ মার্চ ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পরপরই...পথেঘাটে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দোকান লুট হয়। বিভিন্ন স্থানে অবাঙালিদের ওপর হামলা শুরু হয়।* উল্লেখ্য, এসময় ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের তরুণ স্বাধীনতাপন্থীদের অন্যতম একটি শ্লোগান ছিল 'একটা দুইটা মাউরা ধরো, সকাল-বিকাল নাস্তা করো', 'মাউরাদের হত্যা করো – বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। 'মাউরা' হলো উর্দুভাষীদের প্রতি গালিসুলভ একটি শব্দ। এসময় সান্তাহার, দিনাজপুর ও সিরাজগঞ্জে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মাঠ পর্যায়ে পৌছানোর আগেই কয়েক হাজার 'বিহারি' খুন হয়ে যায়।[২৫৬] সেসময় চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে 'বিহারি'দের পক্ষ থেকেও পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই জনগোষ্ঠীর ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে পদ্ধতিগত একতরফা হত্যালীলার অভিযোগ ওঠে মূলত একাত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বরের পরে, বিশেষ করে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহার শেষে। সবচেয়ে সংগঠিত ও ব্যাপকতর হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল ১৯৭২ সালের ১০ মার্চ দিবাগত রাতে খুলনার খালিশপুরে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহারের পরপর। অভিযোগ রয়েছে, প্রায় ১০ হাজার কলোনিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবার-পরিজন খুন হন তাতে। হত্যাকারীরাও ছিলেন শ্রমজীবী। খালিশপুরের হত্যালীলার কথা পরদিন বিবিসি থেকে প্রচার হলে আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়– তবে এই ঘটনায় কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি, কোনো তদন্ত হয়নি এবং কেউ গ্রেফতারও হয়নি কখনো। ঐ সময়ের সংবাদপত্র থেকে দেখা যায়, বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধোত্তর অনেক মাস জুড়ে উর্দুভাষীদের প্রতি এরূপ আক্রমণ চলে নিয়মিতভাবে। এইরূপ হত্যার জন্য কাউকে যাতে জবাবদিহিতার মুখে পড়তে না হয় সেজন্য তৎকালীন সরকার ১৯৭৩ সালে এক আইনে পেছনের তারিখ দিয়ে *১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 'জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের অংশ হিসেবে' এবং 'শান্তি-শৃঙ্খলা বজায়ের স্বার্থে' কৃত কাজকে আদালতে প্রশ্নযোগ্য নয়* বলে ঘোষণা করে।

আলোচ্য আইনের তৃতীয় অনুচ্ছেদটি ছিল নিম্নরূপ : *১ মার্চ ১৯৭১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত সময়ে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা থাকলে তা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো কাজের কারণে বা সম্পর্কিতভাবে তার দ্বারা কৃত হয়েছে বা এমন কাজ পরিচালনা অথবা শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের সঙ্গে*

---

[২৫৬] এ বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসের বিবরণের জন্য দেখুন: আহমেদ ইলিয়াস, *বিহারি: বাংলাদেশে ভারতীয় অভিবাসী*, শামসুল হক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৯৭।

জড়িত এই মর্মে একজন সরকারি উকিল সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যয়ন করবেন অথবা আদালতে আবেদন করবেন। এইরূপ আবেদনের শুনানি শেষে আদালত আর মামলাটি পরিচালনা করবে না, যা তুলে নেয়া হয়েছে বলে ধরা হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি এরপর খালাস পাবেন।[২৫৭]

একাত্তরে এবং বাহাত্তরে বাংলাদেশে উর্দুভাষীদের ওপর নিপীড়নের সবচেয়ে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছেন খ্যাতনামা সাংবাদিক কুতুবুদ্দিন আজিজ তাঁর 'Blood and Tears' শীর্ষক গ্রন্থে।[২৫৮] উর্দুভাষী যুদ্ধ-উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে করাচিতে দায়িত্বপূর্ণ পদে যুক্ত ছিলেন তিনি। সেই সূত্রে ১৭০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে নিবিড় আলাপচারিতা শেষে ৩৩ অধ্যায় জুড়ে স্থান-কাল-পাত্রসহ শত শত হামলার বিবরণ তুলে ধরে কুতুবউদ্দিন দাবি করেছেন, দু' দফায় (২৫ মার্চের আগে এবং ১৬ ডিসেম্বরের পরে) বাংলাদেশের অন্তত ১১০টি শহরে হাজারে হাজারে উর্দুভাষী পদ্ধতিগতভাবে হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের মুখোমুখি হন। তবে তিনি প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে এও উল্লেখ করতে ভোলেননি, স্থানীয় অনেক বাঙালি ঝুঁকি নিয়ে ভীত বিহ্বল অবাঙালিদের আশ্রয়ও দিয়েছিল।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক খুন তথা বিচারবহির্ভূত হত্যার সংস্কৃতির উপরোক্ত যাত্রাবিন্দুকে স্থানীয় ইতিহাসবেত্তারা বরাবর এড়িয়ে যান। জাতীয় পর্যায়ে ইতিহাসের ঐ লগ্নে প্রায় সকল প্রধান প্রধান দল 'সমাজতন্ত্র'-এর জন্য উচ্চকণ্ঠ থাকলেও বেসামরিক নিরস্ত্র উর্দুভাষীদের (যাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল রেলওয়ে ও পাটকলগুলোর শ্রমজীবী ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী এবং সৈয়দপুরসহ আরও কয়েকটি স্থানে যাঁরা যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে মূলত বামপন্থী ধারার ট্রেড ইউনিয়নে সম্পৃক্ত ছিল) বিরুদ্ধে সৃষ্ট ঐ হত্যাযজ্ঞের সক্রিয় বিরোধিতা করেছে

---

২৫৭ দেখুন, The Bangladesh National Liberation Struggle [Indemnity] Order, 1973. President's Order No. 16 of 1973. Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, Dated the 28 February 1973, Dhaka. এই আইন উর্দুভাষীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হত্যা ও অন্যান্য অপরাধের জন্য দায়ীদের দায়মুক্তি দেয়ার পাশাপাশি ঢাকায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সামনে নিরস্ত্র 'বিশ্বাসঘাতক'দের বেয়নেট দিয়ে হত্যাকারী কাদের সিদ্দিকীকেও দায়মুক্তি দেয়। ৫ জন উর্দুভাষীকে কোনো ধরনের নিয়মতান্ত্রিক বিচার ছাড়াই প্রকাশ্য হত্যার ঐ ঘটনাটি ঘটে ঢাকা স্টেডিয়াম এলাকায় ১৮ ডিসেম্বর বিকাল চারটায়। সেদিন সেখানে একটি মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আহমেদ ইলিয়াস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯১। বর্তমান গবেষণায় এই বইটির ইংরেজি ভাষ্য থেকেও অনেক উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। ইংরেজি ভাষ্যটি আগে প্রকাশিত হয়– বাংলা ভাষ্যটি বর্ধিত আকারে এই অনুসন্ধান চলা অবস্থায় প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, কাদের সিদ্দিকীর ঐ হত্যার ভিডিও ফুটেজ দেখুন: http://www.youtube.com/watch?v=y__EoP5lM_8 (Retrieved on 16th January 2013.)

২৫৮ কুতুবউদ্দিন আজিজ, *ব্লাড এন্ড টিয়ার্স*, ভাষান্তর: এডভোকেট মহিম মিত্র, অনির্বাণ প্রকাশনী, লেলিন সরণি, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪। গ্রন্থটির মূল সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে।

এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। জিঘাংসার এই অধ্যায় এতই বর্ণবাদী চেতনায় আপ্লুত ছিল যে, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন নামে যে উর্দুভাষী ব্যক্তিটি ঢাকার মোহাম্মদপুর ইউনিট আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস যাঁকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল নিজ কমিউনিটির হাত থেকে বাঁচার জন্য– তিনিও একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর ধানমন্ডিতে প্রকাশ্যে খুন হয়ে যান স্রেফ অবাঙালি হওয়ার কারণে। অথচ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে সেদিন গিয়েছিলেন তিনি আওয়ামী লীগের অন্যান্যদের সঙ্গে বিজয় উদযাপনের জন্য।[২৫৯]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর প্রায় ১০-১২ হাজার উর্দুভাষীকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ করা হয়েছিল। এদের ঘিরে কীরূপ দুর্নীতি হয়েছে তার একটি বিবরণ পাওয়া যায় সেই সময়কার সুপরিচিত দৈনিক গণকণ্ঠে ১৯৭৪ সালের ৮ জুলাই, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংক্রান্ত এক লেখায়। কারাবাসী উর্দুভাষীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে :

> "...এসব বিহারির কাছ থেকে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত (আটককালে পাওয়া) জমা নেয়া হয়। কোন কোন বিহারির কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল।...তদন্তে দেখা যায়, যে জমা দিয়েছে ৫ হাজার টাকা– তার নামের পাশে লেখা আছে ৫০ টাকা।..এমনও শোনা যায়, বিহারিরা থাকাকালীন টাকার বিনিময়ে রাতে মহিলা সেল খোলা থাকত।..."[২৬০]

হত্যা, অপহরণ ও নির্যাতনের পাশাপাশি এসময় উর্দুভাষীদের সম্পদও যে গণহারে বেদখল হয়েছে সে বিষয়ে এই লেখার অন্যত্র আলোকপাত করা হয়েছে। উর্দুভাষীদের ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে তুলনা করলে যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে আটকেপড়া বাংলাদেশিদের সৌভাগ্যবানই বলতে হবে। কারণ ঐরূপ চার লাখ বাঙালি, যাঁদের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার সেনা অফিসার ও জওয়ানও ছিলেন– তুলনামূলকভাবে অতি নগণ্য শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি ও বস্তুগত সম্পদ খুইয়ে নির্বিঘ্নেই বাংলাদেশে ফিরতে পেরেছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর আটকেপড়া বাংলাদেশিদের প্রথম দলটি ঢাকায় পৌঁছায়। উল্লেখ্য, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আটকেপড়া সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিরা যে চুক্তির বলে নিজ নিজ দেশে ফেরার সুযোগ পান তাতে বাংলাদেশ কোনো পক্ষই ছিল না। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় নয়াদিল্লিতে ১৯৭৩ সালের ২৮ আগস্ট। ভারতের পক্ষে পি এন হাকসার এবং পাকিস্তানের পক্ষে আজিজ আহমেদ এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি স্বাক্ষর বিশেষভাবে সহজ হয়– যখন বাংলাদেশ জানিয়ে দেয়, ভারতের হাতে আটক ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সেনার বিচারের দাবি সে ছেড়ে দিচ্ছে।

---

[২৫৯] দেখুন, Ahmed Ilias, *Ibid*, p.119-20.

[২৬০] ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে–৩, *দৈনিক গণকণ্ঠ*, ৮ জুলাই ১৯৭৪, ঢাকা।

৪.ঘ. বাহাত্তরের বাংলাদেশ : স্বপ্নের অপহরণ

'আমি ফিরে না এলে তোমরা সিকিম হইয়া যাইতা।'

–শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৩ সালে সাংবাদিক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ও গিয়াস কামাল চৌধুরীকে ৩২ নম্বর রোডে এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়।[২৬১]

১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে আমি পাঁচ বার ঢাকা শহরে ঢুকেছি। মাঝখানে প্রতিটি এলাকায় একই কথা শুনেছি। সকলেরই এক প্রশ্ন, 'ভারতীয় বাহিনী কবে আসবে? ইন্দিরা গান্ধী কবে সৈন্য পাঠাবে? ইন্দিরা গান্ধী সৈন্য পাঠাচ্ছে না কেন? তিনি কি আমাদের মেরে ফেলতে চান?...অন্যদিকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকায় যে কথাগুলো প্রথম শুনলাম তার মর্মার্থ হচ্ছে চরম ভারত বিরোধিতা। কোন কৃতজ্ঞতা নয়, কোন মুক্তিযুদ্ধের গল্প নয়। সর্বত্র শুধু লুটপাটের কাহিনী।

–নির্মল সেন, *রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক*[২৬২]

১৯৭১-এর ২৫ মার্চের আগে মুজিব এবং তাঁর রাজনৈতিক সহযোগীরা 'সোনার বাংলা' নামক দুটি শব্দের স্বপ্নে বিভোর করে তুলেছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষদের। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রায় তিন সপ্তাহ পর মুজিব যখন দশ-এগারো মাসের অনুপস্থিতি শেষে 'সোনার বাংলা'য় ফেরেন তখন তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল গগনচুম্বি এবং ব্যক্তিত্ব ছিল চ্যালেঞ্জের অযোগ্য। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে কীভাবে জাসদ ও সর্বহারা পার্টির মতো নবীন দলগুলো তাঁর জন্য রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠল তার উত্তর পাওয়া যায় প্রকৃতপক্ষে সেই সময়কার সমাজ জীবনের উদীয়মান লক্ষণগুলোতে। যার কয়েকটি শনাক্ত করা যায় এভাবে :

- দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছিল তীব্র বেগে। যুদ্ধের সময় চালের মন ছিল চল্লিশ টাকার নিচে। বাহাত্তরের জানুয়ারিতে তা ৫০ টাকায় দাঁড়ায়। পরবর্তী দু' মাসে তা ৮০ টাকা হয়। সকল পণ্যের ক্ষেত্রে না হলেও কিছু জরুরি সামগ্রী স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যোগাড় করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। তার মধ্যে একটি ছিল শিশুখাদ্য। ন্যায্যমূল্যে 'বেবিফুডে'র দাবিতে ঢাকায় একাধিক দিন মিছিল হতেও দেখা যায়। ডিমের হালি ৫০ পয়সা থেকে এক টাকা হয়ে যায়। ফলে সৎ মানুষরা দারুণ দুর্ভোগে পড়ে। অবস্থা সামাল দিতে সরকার দেশীয় উৎপাদিত পণ্য এবং আমদানিকৃত পণ্যের একটি নতুন সরবরাহ

---

২৬১ উপরোক্ত মন্তব্যের পটভূমি সম্পর্কে দেখুন, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮।

২৬২ নির্মল সেন, *আমার জবানবন্দী*, তরফদার প্রকাশনী, ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ৩৮১।

ব্যবস্থা গড়ে তুলতে 'ডিলারশিপ' প্রদান শুরু করে। কিন্তু প্রক্রিয়াটি এত বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল যে, এরূপ ২৫ হাজার ডিলারশিপের অর্ধেকের বেশি অব্যবসায়ী আওয়ামী লীগ নেতারাই নিয়ে নেন এবং পরে তা পেশাদার ব্যবসায়ীদের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রি করেন। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রগুলো যে জনমতের প্রকাশ ও জনদুর্ভোগের খবর প্রকাশ করে প্রশাসনকে প্রতিকারে উদ্বুদ্ধ করবে এবং গণতন্ত্রকে প্রাণবন্ত রাখবে তাও ছিল দুঃসাধ্য। স্বাধীনতার আগে নিউজপ্রিন্ট ছিল টনপ্রতি ১ হাজার ১৪০ টাকা, স্বাধীনতার পরপর তা প্রথম দফায় ২ হাজার ১৫০ টাকায় পৌঁছে। যা ছিল প্রায় ৯০ ভাগ বৃদ্ধি। ১৯৭৪-এর মার্চে, ততদিনে সমাজতন্ত্রের নামে সকল উৎপাদন যন্ত্র সরকারের হাতে চলে গিয়েছিল– আরেক দফা বাড়িয়ে নিউজপ্রিন্ট টনপ্রতি ৩ হাজার ২০০ টাকায় উন্নীত করা হয়।[২৬৩]

- যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে সংকট ছিল অফুরন্ত। অনভিজ্ঞ সরকারের ভুলভ্রান্তি হওয়াও অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু জনগণ ধৈর্য ধরতে ছিল একেবারে নারাজ। বাঙালি চরিত্রের এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য সেসময় বস্তুত বিপর্যয় ডেকে আনে। এক শ্রেণির মানুষের কাছে আওয়ামী লীগের প্রতিটি ভুল খুব বড় আকারে প্রতিভাত হচ্ছিল– তেমনি সরকারও সমালোচকদের প্রতি ছিল অসহিষ্ণু ও নির্মম। বিরুদ্ধমতকে দেশদ্রোহিতাও আখ্যায়িত করা হতো।
- অস্ত্রের জোরে অনেক অন্যায় দাবি পূরণ হয়ে যাচ্ছিল। পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী নকলের সুযোগ দাবি করে প্রকাশ্যে এবং আদায় করে নেয়। ঢাকা ও কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার বেড়ে দাঁড়ায় ৯০ শতাংশের উপরে। অনেক স্থানে নকলের দাবিতে সশস্ত্র মিছিল বের হয়। যা মূল্যবোধের অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে তোলে। ঐ সময় এক বিবৃতিতে মাওলানা ভাসানী তাঁর *সাপ্তাহিক হককথার* ২৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৭২) সংখ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, 'এক শ্রেণীর দুষ্কৃতকারী মুজিব বাহিনী বা মুক্তিবাহিনী পরিচয় দিয়া যেসব সমাজবিরোধী কাজ করছে তাতে আগামী ২৫ বছরেও দেশে শান্তি আনা সম্ভব হবে না।'[২৬৪] প্রায় একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়

---

২৬৩ Mahfuz Ullah, *ibid*, p. 114.

২৬৪ উল্লেখ্য, দেশে ফিরে আসার পর এরূপ বক্তৃতা-বিবৃতির জন্য মাওলানা ভাসানী দ্রুত সরকারের একাংশের রোষানলে পড়েন। শেখ মণি বাংলার বাণীর কলামে তাঁকে 'সিআইএ'র এজেন্ট, মার্কিন দালাল ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করেন। *ভাসানী সম্পর্কে মণি'র আক্রমণের তীব্রতা বোঝার জন্য বাংলার বাণীতে নিম্নোক্ত তারিখের কলামগুলো দেখা যেতে পারে : ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২, ৯ জানুয়ারি ১৯৭৫।*

এসময় পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যমেও তাঁকে 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি' হিসেবে অভিহিত করে 'বাংলাদেশ-ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ভাঙার চেষ্টা'র জন্য দোষারোপ করা হয়। দেখুন, *সাপ্তাহিক সপ্তাহ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, কলকাতা। উপরোক্ত সাপ্তাহিকীটি ছিল সেখানকার

সে সময়কার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রক্ষীবাহিনীতে মুজিব কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক সারোয়ার হোসেন মোল্লার নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণে :

> সে সময় সারা দেশে প্রায় ৭০টি থানা লুট হয়েছিল। মা-বোনেরা ইজ্জত সহকারে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারতেন না।... মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাতো। বেআইনি অস্ত্র ছিল ঘরে ঘরে।[২৬৫]

– দ্রব্যমূল্য বাড়লেও চারদিকে ভারতীয় পণ্যের অবাধ উপস্থিতি দেখা যায়। প্রথম দিকে দুই দেশ এক চুক্তির মাধ্যমে সীমান্তের ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে বাণিজ্য উন্মুক্ত করে দিলে চোরাচালান ব্যাপকতা পায়। ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ চুক্তিটি হয়। বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্যমন্ত্রী এম আর সিদ্দিকী এবং ভারতের পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী এল এন মিশ্র এই চুক্তি করেন। চুক্তির আওতায় সীমান্তের ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী নির্বাচিত কিছু মানুষকে এক ধরনের 'পারমিট' দেওয়া হয়– যার ভিত্তিতে তারা অবাধে মালামাল আনা নেয়ার অধিকার পায়। অদ্ভুত এই উদ্যোগ বাস্তবে চোরাচালানকে সর্বগ্রাসী রূপ দেয়। প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য চুক্তিটি হলেও বাংলাদেশে তীব্র বিতর্ক ও ক্ষোভ তৈরি হওয়ায় ১৯৭২ সালের ৫ থেকে ৮ অক্টোবর ঢাকায় এ বিষয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক হয় এবং তারপর উভয় দেশের সরকার চুক্তিটি স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয়। তবে এরপরও চোরাচালান ছিল অবাধ। এই চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আবদুল মোহাইমেন লিখেছেন, '৭১ সালে অনুকূল আবহাওয়ার ফলে মুক্তিযুদ্ধ চলা সত্ত্বেও দেশে প্রচুর ধান হয়েছিল। তখন দেশে চালের দাম ছিল ৩৫-৪০ টাকা মণ। উন্মুক্ত সীমান্ত বাণিজ্যের ফলে লাখ লাখ মণ ধান ভারতে চলে যাওয়ায় স্বাধীনতার ছয়

মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র। সেখানকার আরেক প্রভাবশালী কাগজ দৈনিক আনন্দবাজার-এ ১৯৭৩ সালের ৩১ জুলাই মৌলানাকে নিয়ে তির্যক ভাষায় সম্পাদকীয় লেখা হয় 'ভাসানীর জেহাদী জিগির' শিরোনামে। এরূপ প্রচারণা সত্ত্বেও মাওলানা এসময় মুজিবের প্রতি নমনীয় নীতি নিয়েছিলেন বলেই প্রমাণ মেলে। বিশেষ করে তিয়াত্তরের মার্চে নির্বাচনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে 'নৌকা' মার্কার বিপক্ষে ন্যাপ প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণায় অংশ না নিয়ে 'বুকজ্বালা, পেটব্যথা' ইত্যাদি ধরনের মামুলি সমস্যা নিয়ে তাঁর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় অনেকেই বিস্মিত হন। এ বিষয়ে তাঁর নির্বাচনী জোটের অন্যতম শরিক রাজনীতিবিদ অলি আহাদ লিখেন, 'সেদিন মাওলানার ভূমিকা আওয়ামী প্রার্থীদের পরোক্ষভাবে নির্বাচনে বিজয়ে প্রচুর সহায়তা করেছিল।' অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৫-৭৫, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.*, ২০০৪, ঢাকা, পৃ. ৫৫৪।

[২৬৫] সারোয়ার হোসেন মোল্লা, কর্নেল সারোয়ার বলছি, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৩ নভেম্বর ২০১২, ঢাকা।

মাসের মধ্যে চালের মণ এক শত টাকায় উঠে। ফলে মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।'[২৬৬]

অন্যদিকে স্বাধীনতার আগে ভারতের মুদ্রার সঙ্গে পাকিস্তানের মুদ্রার বিনিময় মূল্য প্রায় সমান থাকলেও ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশের মুদ্রার মান কমতে থাকে। মাস ছয় পরে এটা ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। যুদ্ধের পর এটা কেন কম হবে তার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। দেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য কিনতে গেলে অন্তত ৩০-৪০ শতাংশ বেশি বাংলাদেশি মুদ্রা দিতে হচ্ছিল তখন। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব বিনিময় হার ভারতীয়দের পক্ষে আরও বেশি অনুকূল ছিল। ফলে কিছু দিন আগেও যারা পাঞ্জাবি বিদ্বেষে ভুগতেন তারা এবার ভারত বিদ্বেষে ভুগতে শুরু করেন।[২৬৭] বিষয়টি আরও গভীরতা পায় বাংলাদেশের প্রথম কিস্তির ৩৫০ কোটি টাকার কারেন্সি নোট মুদ্রণের দায়িত্ব ভারতকে প্রদানের মধ্য দিয়ে। পত্রিকায় এসময় একই নম্বরের একাধিক নোটের ছবি প্রকাশিত হয়। গুজব ছড়িয়ে পড়ে ভারত অধিক নোট ছাপিয়ে বাজারে ছেড়েছে। ফলে টাকার দাম আরও পড়ে যায় এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে।[২৬৮] এ থেকে আবার এক ধরনের অযৌক্তিক সাম্প্রদায়িকতারও উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। সাম্প্রদায়িকতার চর্চা বন্ধে সরকার ধর্মভিত্তিক কয়েকটি দলকে নিষিদ্ধ করেই দায়িত্ব শেষ করে। কিন্তু ঐ সব দলের সদস্যরা নানা রূপে সমাজে তাদের আদর্শকে সজিব ও সক্রিয় রাখতে পেরেছিলেন। যে কোনো মূল্যে মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় করারও একটি প্রবণতা তৈরি হয় এদের মাধ্যমে।

- শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনকে ঘিরেও এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা তৈরি হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র ভারত এদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে সর্বোচ্চ তৎপর হয়ে ওঠে। শরণার্থীদের মাঝে হিন্দুদের সংখ্যাই ছিল বেশি; কারণ গিয়েছিলও তাঁরা বেশি। তবে কোথাও কোথাও একাত্তরের আগের দেশান্তরিরাও ফিরছিলেন। এক্ষেত্রে বাস্তব সংখ্যার চেয়ে গুজব তৈরি হচ্ছিল অধিক হারে। এসব হিন্দুরা এসে তাদের বিক্রিত বা পরিত্যক্ত বা দখল হয়ে যাওয়া সম্পত্তি ফেরত চাইবে এ ভয় মুসলমান সমাজে তীব্রতা পায়; যার

---

২৬৬ মো. আবদুল মোহাইমেন, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ*, প্রকাশক: লেখক নিজে, ১৯৮৭, ঢাকা, পৃ. ২৩।

২৬৭ এর একটি অশোভন প্রকাশ দেখা যায় বেসামরিক ভারতীয় প্রশাসক– যারা ঐসময় নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সমঝোতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে এসেছিলেন, তাঁদের প্রতি স্থানীয়দের আচরণে। এ সম্পর্কে আরও দেখুন : ১৯৪ নং ফুটনোট।

২৬৮ মো. আবদুল মোহাইমেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০।

ছাপ পড়ে গণমাধ্যমেও এবং রাজনৈতিক মেরুকরণেও তা ভূমিকা রাখে। এ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে তৃণমূলে একধরনের হিন্দু বৈরিতা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে অবস্থা এমন দাঁড়াল, খোদ মুজিবকে বিবৃতি দিয়ে বলতে হয়, বাংলাদেশ কেবল একাত্তরে যাওয়া হিন্দুদের গ্রহণ ও পুনর্বাসন করবে।[২৬৯] তবে মুজিবের এই হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও সমাজে হিন্দু বৈরিতা নীরবে পাখা মেলছিল। প্রমাণ হিসেবে দেখা যায়, যুদ্ধোত্তর প্রথম দুর্গা-উৎসবে (১৪-১৭ অক্টোবর) দ্বিতীয় দিনেই প্রতিমা ভাঙ্গচুর হয় খোদ ঢাকায়, যা কখনো অবিভক্ত পাকিস্তানকালেও ঘটেনি।

- রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৫ লাখ টাকার অধিক মূল্যের শিল্প-সম্পত্তিগুলো জাতীয়করণের ফলে ব্যক্তি উদ্যোগ চরমভাবে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। ফলে ধারণা তৈরি হয়, ভবিষ্যতে এখানে ভারতীয় পণ্যের একচেটিয়া কারবার শুরু হবে। যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরও চরমভাবে নিরুৎসাহিত করে। ভারত বিদ্বেষকে এটা আরও বেগবান করে এবং অন্ধকার করে তোলে শিল্প-অর্থনীতির ভবিষ্যৎ। টাকার মান কমানো, সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং অভ্যন্তরীণ বেসরকাবি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে (যার ঊর্ধ্বসীমা করা হয় ২৫ লাখ টাকা) এ সময় পরিকল্পিতভাবে ভারত নির্ভরতার একটি প্রবণতা দেখা যায়।[২৭০]

---

২৬৯ কার্তিক ঠাকুর, *সংবিধান ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়*, প্রকাশকাল ও প্রকাশ তারিখ উল্লেখ নেই, পৃ. ৫-৬। কার্তিক ঠাকুর বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের অতি পরিচিত নেতা।

২৭০ যদিও মুজিব বলছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ হবে 'এশিয়ার সুইজারল্যান্ড'-এর মতো (নিরপেক্ষ চরিত্রের), কিন্তু তাঁর শাসনামলজুড়ে 'নির্ভরতা' প্রবণতার নানান মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপক অর্থে এই প্রবণতা ছিল চতুর্মাত্রিক। প্রথমত, আর্থিক ও শিল্পনির্ভরতার চেষ্টা; যার বড় এক প্রকাশ ছিল পাটখাতসংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশলে। এ বিষয়ে ৬.গ উপ-অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া অর্থনীতিতে দেশীয় বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে নির্ভরতাকে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিকতা দেয়ার চেষ্টা ছিল তার একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা দেখুন ১৮৬ নং ফুটনোটে।

দ্বিতীয়ত, সামরিকনির্ভরতা; যার বড় প্রকাশ ছিল রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতায়। এ বিষয়ে পরবর্তী উপ-অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রশাসনিকনির্ভরতা; এই প্রবণতার প্রকাশ ঘটে দু'ভাবে; এক. স্বাধীনতার পরও বেশ কয়েক সপ্তাহ দেশের দায়িত্ব গ্রহণে প্রবাসী সরকারের বিলম্ব এবং এসময় বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে [ভারতীয় সরকারি দলিলপত্রের সহায়তায় Salam Azad লিখিত *Contribution of India in the war of liberation of Bangladesh* (২০০৩) শীর্ষক গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী, ঐসময় অন্তত ২৮ জন ভারতীয় কর্মকর্তা বাংলাদেশের সিভিল প্রশাসনে দায়িত্ব পালনের জন্য এসেছিলেন। দেখুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯০] এবং পরে মুজিব বাহিনীর যোদ্ধাদের অন্তত দুটি ব্যাচে প্রশ্নসাপেক্ষ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ক্যাডার পদগুলোতে নিয়োগ দেয়ার মধ্য দিয়ে।

– শিল্প পরিমণ্ডলে জাতীয়করণের নামে 'সমাজতন্ত্র'-এর ধ্বনি উঠলেও গ্রামে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কর্মসূচি ছিল অনুপস্থিত। সত্তরের নির্বাচনে মুজিব ও আওয়ামী লীগের পক্ষে 'গণরায়'-এর বড় এক শক্তি ছিল গ্রামীণ খুদে চাষী সমাজ। মুক্তিযুদ্ধকালে যাঁরা কল্পনা করেছিল স্বাধীনতা জমির পুনর্বণ্টন ও কৃষিজাত ফসলের মালিকানার কিছুটা হলেও সামাজিকীকরণ বা পুনর্বিন্যাস ঘটাবে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর সমাজে সরকার সিদ্ধান্ত দেয়, পরিবারগুলো একশত বিঘা পর্যন্ত জমি দখলে রাখতে পারবে। উপরন্তু এই ঘোষণায় 'পরিবার'-এর সংজ্ঞাও নির্ধারিত ছিল না– ফলে ধনী জোতদাররা নানান কৌশলে সকল জমিই রক্ষা করতে পারল।[২৭১] এতে ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন চাষী সমাজ বুঝল, 'পরিবর্তন'-এর কোনো সম্ভাবনা নেই। তারা তখন নকশাল

চতুর্থত. ভাবাদর্শিকনির্ভরতা; যার প্রধান এক প্রকাশ হিসেবে দেখা যায় সংবিধান প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণের পূর্বে ড. কামাল হোসেন-এর ভারত গমন (যাকে 'হককথা'য় ভাসানী বলেছিলেন *সংবিধানের ভারত যাত্রা;* তবে কামাল হোসেন কেবল ভারত নয় গিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যেও; দেখুন, *মুক্তিযুদ্ধে জনআকাঙ্ক্ষা এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠার লড়াই*, গণসংহতি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৮)। ভাবাদর্শিকনির্ভরতার আরেক প্রকট ক্ষেত্র ছিল দমনমূলক চরিত্রের প্রতিষ্ঠান ও আইন প্রণয়নকালে ভারতকে অনুসরণ। এ বিষয়ে রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় সিআরপিএফকে মডেল হিসেবে অনুসরণ ও ভারতীয় Armed Forces (Special Powers) Act-কে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' প্রণয়ন-এর উল্লেখ করা যায়।

একাত্তর-উত্তর সমাজের অন্যতম আলোচিত লেখক এনায়েতুল্লা খান প্রমুখ ১৯৭৪-এ উপরোক্ত নির্ভরতাতত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেও (দেখুন, Enayetullah Khan, *ibid*, p. 300-319.) তার উৎস হিসেবে কলকাতাকেন্দ্রিক প্রবাসী সরকারকেই দায়ী করেছেন। [এ বিষয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের গ্রন্থেও (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১) এমন উদাহরণ পাওয়া যায়– যা থেকে প্রমাণ মেলে, তাজউদ্দীন পরিপূর্ণভাবে ভারতের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন।] কিন্তু রক্ষীবাহিনী বিকাশকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, মুজিবও এরূপ পদক্ষেপগুলোর স্বপক্ষে ছিলেন দৃঢ়। তবে তিনি আবার ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীতমুখী ও স্ব-বিরোধী পদক্ষেপও নিয়েছেন। যার ফল হয়েছে তাঁর জন্য বিধ্বংসী।

২৭১ ১৯৭২-এর ২৬ মার্চ মুজিব ঘোষণা দিয়েছিলেন, পরিবারগুলো ১০০ বিঘা জমি রাখার পাশাপাশি যাদের ২৫ বিঘার কম জমি থাকবে তারা খাজনা রেয়াত পাবে। তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশন একে সমাজতন্ত্র অভিমুখীন 'ভূমি সংস্কার কর্মসূচি' হিসেবে চিহ্নিত করলেও তার ফলাফল ছিল শূন্যগর্ভ। কারণ যদি কর্মসূচিটি বাস্তবায়িতও হতো তাহলে সর্বোচ্চ দু লাখ একরের মতো জমি উদ্ধার হতো এবং তা যদি সে সময়কার ৩২ লাখ ভূমিহীনের মাঝে বণ্টিত হতো তাহলে প্রতি পরিবারের বরাদ্দ দাঁড়াত ০.০৭ একর। আর্থিক বিবেচনায় এরূপ জমি প্রাপ্তির তাৎপর্য হতো অতি নগণ্য। উপরন্তু বলা হচ্ছিল, এরূপ উদ্বৃত্ত জমি দিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হবে। দেশজুড়ে বিচ্ছিন্ন আকারে উদ্ধার করা ছোট ছোট জমি খণ্ডগুলো কীভাবে সমবায়ের মাধ্যমে আবাদ করা যাবে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মুজিবের ঘোষণায় যেমন ছিল না– তেমনি পরিকল্পনা কমিশনও তা কখনো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেনি। এ সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দেখুন, S. M. Ali, *ibid*, p.133-134.

ধারার রাজনৈতিক শক্তিসমূহের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শুরু করল, যারা বিভিন্ন অঞ্চলে জোতদারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ বলপ্রয়োগের কর্মসূচির স্বপক্ষে একটা জাগরণের প্রচেষ্টায় ছিল।

- ঠিক উপরোক্ত সময়েই চারিদিকে চলছিল লুণ্ঠন, ডাকাতি, চোরাকারবারি, ছিনতাই, কালোবাজারি, মজুদদারি। আবার এমনি এক অবস্থায় সরকারি তরফ থেকে ডাক দেওয়া হচ্ছিলো কৃচ্ছ্রতাসাধনের, যার আওতায় সরকারি-বেসরকারি কর্মচারিদের বেতনের ৩০ ভাগ কেটে নেয়া শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরাও এ থেকে বাদ যাননি। কিন্তু চারদিকের লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় এবং ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের মাঝে সরকারের এই উদ্যোগ শুধুই ক্ষোভ বাড়াচ্ছিল। সমাজ দেহের এইরূপ নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে সেসময় মেহেরপুরের গাংনীতে গবেষণারত দু'জন বিদেশি গবেষক তাঁদের পর্যবেক্ষণ লিখেছেন এভাবে : 'সেই সময়ে শোষণের প্রধান রূপ ছিল ব্যবসা ও দুর্নীতি (যেমন ফটকাবাজি, মজুতদারি, চোরাচালানী, ঘুষ ইত্যাদি); উৎপাদনের ক্ষেত্রে শোষণের রূপ সে সময় ততটা প্রকট ছিল না।'[২৭২] নতুন এই শোষকরা সরকারের আশীর্বাদ পাচ্ছিল দেখে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে শাসকদের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হতে শুরু করে।
- ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদির কারণে সমাজে এক ধরনের ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হয়। বিশেষ করে রাজনীতিমনস্ক অনেক তরুণ গ্রেফতার হয়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্তৃত্ব ছিল ন্যূনতম। সাংবাদিক নির্মল সেনের ভাষ্য থেকে দেখা যায়, স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম বছরই দেশে ৪ হাজার ২০০ ডাকাতি ঘটে। যার মধ্যে কেবল ঢাকাতে ৬৮৬টি ডাকাতি সংঘটিত হয়।[২৭৩] তবে দৈনিক গণকণ্ঠের হিসাবে দেখা যায়, উল্লিখিত এক

---

২৭২ ইয়েনেকা আরেন্স ও ইরস ফান ব্যুরদেন, *ঝগড়াপুর*, অনুবাদ : নিলুফার মতিন, গণপ্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২০৯।

২৭৩ নির্মল সেন, *স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই*, তরফদার প্রকাশনী, ২০০৯, ঢাকা, পৃ, ৬৬। সাংবাদিক-রাজনৈতিক নির্মল সেন এই লেখা লিখেছিলেন ১৯৭২-এ দৈনিক বাংলায়। ঐ পত্রিকায় 'অনিকেত' নামে নিয়মিত উপসম্পাদকীয় লিখতেন তিনি। ১৯৭৩-এর ১৬ মার্চ লেখা তাঁর একটি উপ-সম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই।' সমকালীন বাস্তবতা ফুটে ওঠার কারণে সর্বত্র সেসময় এই কলামটি আলোড়ন তুলেছিল। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাসের পর অনিকেতের কলামটি বন্ধ হয়ে যায়। সে বিষয়ে পরে তিনি জানিয়েছেন, '১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে অনিকেত নামে আমার উপ-সম্পাদকীয় লেখা বন্ধ করে দেয়া হয়। জাতীয় সংসদে তখন সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আলোচিত হচ্ছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং জানিয়ে দেন, দৈনিক বাংলায় 'অনিকেত' নামে আমার কোনো উপ-সম্পাদকীয় আর প্রকাশিত হবে না। সে বিতর্ক দীর্ঘ। এর পর তাঁর জীবিতকালে ঐ নামে কোনো উপ-সম্পাদকীয় দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়নি।' *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮।

বছরে ব্যাংক ডাকাতি হয়েছে ৩১টি, গুপ্তহত্যা ১ হাজার ৪৬৭টি, ডাকাতি ২ হাজার ৩৯টি এবং ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে ১৭ হাজার ৩৪১টি।[২৭৪] বস্তুত এসময় দিনে রাতে অনেক সময়ই গুলি বোমা ইত্যাদির শব্দ শোনা যেত। যারা এসব করছিল তারা ছিল সশস্ত্র। আবার সশস্ত্র ব্যক্তি মাত্রই চিহ্নিত হচ্ছিল মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। যে কারণে সকল ধরনের অন্যায়ের জন্য দোষ পড়ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের গায়ে। এ নিয়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা এক থেকে দেড় লাখের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[২৭৫] সরকার অবাঞ্ছিত কাজ যেমন বন্ধ করতে পারছিল না, তেমনি অপবাদের হাত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষা করতেও ব্যর্থ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা অধিকাংশ ছিল তরুণ। নিজেদের পেশাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকের মাঝে উদ্বেগ তৈরি হয়। কারণ সরকারের তরফ থেকে এই সশস্ত্র জনশক্তির জন্য যথাযথ কোনো পুনর্বাসন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছিল না। আবার পুলিশকে ব্যবহার করে ডাকাতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি দমনেরও সুযোগ ছিল সীমিত। কারণ একদিকে পুলিশের সংখ্যা ছিল অতি অল্প (১৯৭২-৭৩-এ মাত্র ২২-২৩ হাজার) এবং অন্যদিকে দুষ্কৃতকারীদের ব্যবহৃত অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ ছিল পুলিশের চেয়ে উন্নত। উপরন্তু কোথাও ধরা পড়া মাত্রই প্রথমোক্তরা রাজনৈতিক যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে ছাড়া পেয়ে যেত।

- রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে আলাপ-আলোচনার সংস্কৃতি একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়। রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত সর্বত্র রাজনৈতিক মতপার্থক্য খুনোখুনির মাধ্যমে ফয়সালার রেওয়াজ শুরু হয়। কেউই বিশ্বাস করতে পারত না এবং চর্চা করতেও ছিল অনিচ্ছুক ছিল যে, রাজনৈতিক বিবাদ সংলাপ, বিতর্ক ও রাজনৈতিকভাবেই মীমাংসাযোগ্য।
- পাকিস্তান ও ভারত প্রত্যাগতদের পুনর্বাসনে যথাযথ কোন উদ্যোগ ছিল না। ভারত প্রত্যাগতদের পরিবার প্রতি ১০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। পরে কমতে কমতে তা ২৫ টাকায় নেমে আসে। পাকিস্তান প্রত্যাগতদের জন্য তাও মেলেনি। অন্যদিকে সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ব্যাপকভিত্তিক রিলিফের উদ্যোগ নিলেও পুরো প্রক্রিয়াটি ছিল আওয়ামী লীগ নির্ভর এবং দুর্নীতির

---

২৭৪ *দৈনিক গণকণ্ঠ*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৩, ঢাকা।

২৭৫ এ বিষয়ে অরাজক অবস্থার স্বরূপ উঠে এসেছে সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে; যেখানে দেখা যায়, দেশে এখন (২০১২ সালে) স্বীকৃত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২ লাখ ৪ হাজার ৮০০। ১৯৯৪ সালে বিএনপি'র শাসনামলে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত ছিলেন ৮৬ হাজার জন। অর্থাৎ সরকার পরিবর্তন হলেই মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং এখনও 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে নাম তালিকাভুক্তির জন্য এক লাখ ৪০ হাজার জনের আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেখুন, *প্রথম আলো*, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২, ঢাকা।

কারণে উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়। এর মধ্য দিয়ে সর্বত্র দুর্নামের শিকার হয় আওয়ামী লীগ।

- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুটিকয়েক সন্ত্রাসী ছাত্র ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সংখ্যায় তারা অত্যাল্প থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের বশংবদ হয়ে পড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভয়-ভীতির সংস্কৃতি এতটা শেকড় গাঢ়তে শুরু করে যে, পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমান যখন দেশের সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করে একটি 'জাতীয় দল' করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সবাইকে তার সদস্য হতে পরোক্ষে চাপ প্রয়োগ শুরু হয়– তখন দেখা গেল, গণতান্ত্রিক আবহের জন্য বিখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র পনেরোজন শিক্ষক ঐ একক দলে যোগ দিতে অপারগতার কথা সাহস করে জানিয়েছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবুল ফজল ব্যতীত আর সকল উপাচার্যই তাঁদের কর্মচারী ও শিক্ষকদের জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন।[২৭৬] তিনজন উপাচার্য উল্লিখিত দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতেও অন্তর্ভুক্ত হন। এরা হলেন ড. আবদুল মতিন চৌধুরী (ঢাকা বিশ্ব.), ড. মাযহারুল ইসলাম (রাজশাহী বিশ্ব.) এবং ড. মোহাম্মদ এনামুল হক (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব.)। এভাবে পঁচাত্তরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ 'সরাসরি মেঠো রাজনীতির অংশীদার' হয়ে পড়ে– যা কার্যত শিক্ষার পরিবেশকে দারুণভাবে কলুষিত করে; যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় থেকে বাংলাদেশ আর কখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি। উপাচার্যদের যে মেয়াদ শেষের আগেই অপমানজনকভাবে দায়িত্ব ছেড়ে চলে যেতে হয় সাম্প্রতিক

---

২৭৬ আহমদ ছফা, 'মুজিব শাসন: একজনের লেখকের অনুভব', *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ* গ্রন্থে সংকলিত, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ২০১১, ঢাকা, পৃ. ৫১৭। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষকরা সেসময় বাকশালে যোগ দেননি তাঁদের মধ্যে ছিলেন আহমদ শরীফ, মমতাজুর রহমান তরফদার, আবদুল লতিফ, হোসনে আরা হক, লতিফা আকন্দ, নূরুল ইসলাম, আহমেদ কামাল, স্বপন আদনান, মুনতাসীর মামুন প্রমুখ। উল্লিখিত শিক্ষকদের অন্তত একজন বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন, যদিও তাঁরা স্ববিবেচনাবোধ থেকেই 'একক দল'-এ যোগ দেননি, তবে সেই সময়কার প্রভাবশালী পণ্ডিত প্রফেসর আবদুর রাজ্জাকও গোপনে তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন এই দলে যোগ না দিতে। প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক ও এই শিক্ষকদের মাঝে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিলেন লেখক আহমদ ছফা। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবুল ফজলের সঙ্গে মুজিবের কথোপকথনের বিবরণী থেকে দেখা যায়, বাকশালে যোগদান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না। তবে পরোক্ষ চাপ ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৮ জুন শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ শেষে আবুল ফজল ডায়েরিতে লিখেছেন :

> '..আশ্বস্ত হলাম তিনি [মুজিব] যখন বল্লেন আপনাকে আমি বাকশালে যোগ দিতে বলবো না। তবে আপনার কোন শিক্ষক যদি যোগ দিতে চান তাঁকে আপনি বাধা দেবেন না।' দেখুন : আবুল ফজল, *শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৭৮, ঢাকা, পৃ. ৩১।

এই সংস্কৃতিরও শুরু বাহাত্তর-তিহাত্তর থেকে। চারটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দফায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যদের (ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, সৈয়দ আলী আহসান, ড. ইন্নাস আলী প্রমুখ) অধিকাংশ স্বাভাবিকভাবে নিয়োগকাল শেষ করতে পারেননি। মূলত সরকার দলীয় ছাত্রদের চাপের মুখে এদের অপসারণ করা হয়।

– সর্বশেষ যে রাষ্ট্রীয় প্রবণতাটি সমাজের বন্ধনকে দুর্বল করে দেয়– তা হলো জনসমাজকে তিনভাবে চিহ্নিত করা শুরু হয় এসময়– মুক্তিযুদ্ধকালে যাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করেছেন, যাঁরা পূর্ববাংলা বা নিজ আবাসস্থলে ছিলেন এবং যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। এর মাঝে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন বা না নেন– 'সীমান্ত অতিক্রমকারী' মাত্র প্রশাসনে বিশেষ মর্যাদা ও সুবিধা পাচ্ছিলেন। মেধা বা যোগ্যতার পরিবর্তে 'সীমান্ত ফেরোনো'কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদোন্নতির একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করার দাবি ওঠে এবং সেটাই করা হচ্ছিল।[২৭৭] প্রশাসনে এসময় প্রভাবশালী কর্মকর্তা হয়ে উঠেছিলেন সৈয়দ হোসেন– তাঁর অনানুষ্ঠানিক অবস্থান ছিল যুদ্ধকালে কলকাতায় অবস্থানকারী কিংবা ঢাকায় অবস্থানকালীন সকল ধরনের কর্মকর্তার ওপরে, যদিও তিনি ছিলেন একজন যুগ্ম-সচিব মাত্র। পারিবারিক পরিচয়ে তিনি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মীয়। সৈয়দ হোসেন নিজে প্রভাব বিস্তারে ব্রতী ছিলেন না– বরং অন্যরাই বদলি, ভালো পদে নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর কাছে ছুটতে শুরু করে। অন্যদিকে স্থানীয় প্রশাসকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকলেও এবং নানানভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করলেও দেশে অবস্থান করার কারণে মনস্তাত্ত্বিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল তাঁদের; দেখা হচ্ছিল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে– যদিও সংখ্যায় ছিলেন এরাই সর্বাধিক। আর তৃতীয় দল পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার কারণে রীতিমতো সামাজিক রোষে পড়েন, অথচ এরা পরিস্থিতির শিকার হয়েই যুদ্ধকালে ভৌগোলিকভাবে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং সর্বোতভাবে যুদ্ধে স্বজাতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য কামনা করেছেন। যুদ্ধোত্তর সমাজে এইরূপ সচেতন বিভক্তি শেষোক্ত দুই বর্গকে একটি শিবিরে ঠেলে দেয় এবং প্রথম বর্গের বিপক্ষে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক অবস্থান নিতে থাকে তারা। এভাবেই জন্ম হয় একটি জাতীয় বিভেদ রেখার।[২৭৮]

---

২৭৭ এরূপ মানদণ্ড এমন এক হাস্যকর অবস্থার জন্ম দেয়– যাতে দেখা যায়, সীমান্ত ফেরোনো এক কোটি মানুষকে বাদ দিলে দেশে জনসংখ্যার হিসাবে তথাকথিত 'দালাল'-এর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি! উপরোক্ত পরিস্থিতিকে ব্যঙ্গ করেই সেসময় সাংবাদিক এনায়েতুল্লা খান সাপ্তাহিক হলিডেতে নিবন্ধ লিখেন [February 6, 1972] 'Sixty-Five Million Collaborators.' সেসময় এই লেখাটি বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল।

২৭৮ এই বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক এক পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায় সেই সময়কার সচিব আসাফোদ্দৌলার নিম্নোক্ত বিবরণে:

আর উপরোক্ত সম্মিলিত বাস্তবতারই এক ধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয় 'সোনার বাংলা'য় বাহাত্তর-তিয়াত্তরের রাজনৈতিক হতাশা এবং ক্ষোভ। দেশে ফিরে মাত্র কয়েক মাস পরেই মুজিব বিস্ময়ের সঙ্গে কেবল এটাই আবিষ্কার করেননি যে, চল্লিশ-অনুর্ধ্ব একদল তরুণের ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাঁকে সশস্ত্র-নিরস্ত্র সকল পরিসরে, বরং তিনি এও দেখতে পান, তাঁর পরিমণ্ডল থেকেই ঐ ঔদ্ধত্যে প্রতিনিয়ত জ্বালানি যোগানো হচ্ছে। এ যেন ছিল একাত্তর-পূর্ব তাঁর স্ববিরোধী রাজনীতিরই এক ঐতিহাসিক প্রতিশোধ।

৪.ঙ. 'মুজিববাদ' বনাম 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'

> Mujibbad is the calculas of the power-elite invented to weigh and secure its usurpations on the scale of other people's martydom.
>
> -Enayetullah Khan, *A Scheme Gone Wild*, Holiday, May 6, 1973

> রাজনৈতিক যুদ্ধে আমাদের পরাজিত করতে পারে এমন শক্তি বাংলাদেশে সহজে জন্মাবে না। কিন্তু আমাদের সমাজনীতি, অর্থনীতি যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে রাজনীতিটাই টিকবে না।
>
> – শেখ ফজলুল হক মণি, *বাংলার বাণী*, ২০ এপ্রিল ১৯৭৩

As soon as liberation was achived, the claim for victory which belongs to the people was denied to them. It was monopolized by a particular political party. Those who stayed within and suffered much more than whose who had run away, were given guilt trips by those who had crossed the border and demaned to be addressed as the liberators. They put price tags on them. Some occupied abandoned houses, some got jobs for which they were not qualified. Some took promotions and some professed seniority....This was the most tragic divide of the Bangladesh psyche....cracked our national solidarity. Asafuddowlah, *Of Pains and Panics, Adorn Publications*, 2010, Dhaka, p.311.

উল্লেখ্য, ৩৪ বছরের প্রশাসক জীবন শেষে আসাফোদ্দৌলা বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

যুদ্ধোত্তর উক্তরূপ পরিস্থিতির আরেকটি দৃষ্টান্তমূলক বিবরণ দিয়েছেন সৈয়দ আলী আহসান। সেই বিবরণ থেকে দেখা যায়, যুদ্ধোত্তর সময়ে দেশে কলকাতাগামীদের 'দেশপ্রেমিক' ও কলকাতায় না যাওয়াদের 'দেশদ্রোহী' হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি যেমনটি ছিল প্রবাসী সরকারের নেতৃবৃন্দের। আলী আহসান আওয়ামী লীগের দুই পরিষদ সদস্যের কাহিনী তুলে ধরেছেন (আবদুল হাদী তালুকদার ও জহির উদ্দীন)– যাঁরা দেশে অবস্থানের কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ছাড়াই নিগ্রহের শিকার হন। দেখুন, আলী আহসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০-৪৩।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব রাজনীতির প্রধান দুই চরিত্র নিঃসন্দেহে শেখ মুজিবুর রহমান ও সিরাজুল আলম খান। একাত্তরের ২৫ মার্চের আগে তাঁরা যা চেয়েছিলেন সেভাবেই সব ঘটনা এগিয়েছে– আর ১৬ ডিসেম্বর ঘটেছে তার শেষ অধ্যায়। কিন্তু তাঁদের এই 'অর্জন'-এর মাঝে কোথায় যেন ভয়ংকর রকম ছন্দহীনতাও বাসা বেঁধেছিল– কারণ ১৬ ডিসেম্বরের 'অর্জন' মোটেই স্বস্তি দিতে পারছিল না তাঁদের। যে কারণে আমরা দেখছি, মাত্র তিন বছরের মধ্যে (১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে) মুজিব তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এর কর্মসূচি ঘোষণা করছেন। যা ছিল কার্যত একদলীয় এক শাসনব্যবস্থা। অন্যদিকে সিরাজুল আলম খান মুজিবের আগেই তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এ নামেন ১৯৭২-এ। 'জাসদ' গঠনকে তিনি মনে করতেন ১৯৬২ থেকে শুরু তাঁর 'দ্বিতীয় ধারা'র রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি। স্বাধীনতা লাভকে দ্বিতীয় ধারার রাজনীতিকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসার পরিবেশ ও সুযোগ হিসেবে দেখেন তিনি।[২৭৯] কিন্তু মুজিবের 'দ্বিতীয় বিপ্লব' এবং তারও আগে সিরাজুল আলম খানের 'দ্বিতীয় ধারা'র রাজনীতি নিয়ে সমাজে ব্যাপক বিতর্ক ও ভিন্নমত তৈরি হয়– একাত্তরের পূর্ববর্তী তাঁদের প্রথম পর্যায়ের রাজনীতি নিয়ে যা ছিল তুলনামূলকভাবে অতি কম।

দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর জাসদ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দেশের বামপন্থী মনীষার তরফ থেকে যে-সব অভিযোগ উত্থাপিত হতো তার মধ্যে অন্যতম ছিল মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনীর কমিউনিস্ট নির্মূলের কাহিনী। এসব কাহিনীর প্রবল ভিত্তি ছিল। অভিযোগ ওঠে, চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে[২৮০], সাতক্ষীরার তালায় (কাজী

---

২৭৯ আরও দেখুন, কামাল উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬।

২৮০ ১৯৭১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বাঁশখালীতে ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা হয়। এই ঘটনাটি বিশেষ আলোচিত হয় স্থানীয় বামপন্থী লেখক অধ্যাপক আস্হাব উদ্দীন আহমদ যখন এর প্রতিবাদে এবং নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির উদ্দেশে 'ইন্দিরা গান্ধীর বিচার চাই' নামে ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে একটি রাজনৈতিক গ্রন্থ উৎসর্গ করেন (প্রকাশক : লেখক নিজে)। এই ঘটনায় বাঁশখালী থানার নাপোড়া পাহাড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর হামলা হয়েছিল এবং তাতে সর্বমোট ১৬ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হন। এর মধ্যে ১৪ জন মারা যান সরাসরি মুজিব বাহিনীর হাতে। নিহত মুক্তিযোদ্ধারা হলেন : প্রাণ কুমার ভট্টাচার্য, জাহেদ ছালে আহমেদ, আবু সাদেক, ডাক্তার তুহিন, এম এ মোস্তফা চৌধুরী, আমানত খান চৌধুরী, মামুন, হাবিলদার রুস্তম, আসাদুল্লাহ, বজল আহমদ, নুরুল ইসলাম, আবুল হাসেম, কালু মিয়া, শের আলী, আলী আহমেদ ও জামাল আহমেদ চৌধুরী। শেষোক্ত দু'জন মুজিব বাহিনীর হামলা থেকে পালাতে পারলেও পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের সহযোগী বাহিনীর হাতে খুন হন। আরো দেখুন, অমি রহমান পিয়াল, *মুজিব বাহিনী : মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে রহস্যময় অধ্যায়*, 'রাজকূট', দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৩ মার্চ ২০১১, ঢাকা এবং আহমেদ মুসা, *ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ*, প্রকাশক : লেখক নিজে, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ. ১২০।

জাফরদের গ্রুপের), পাবনার শাহপুরে (টিপু বিশ্বাসদের গ্রুপের) অসংখ্য বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছে মুজিব বাহিনী। সিরাজুল আলম খান সমর্থক অংশ মনে করে উপরোক্ত মর্মান্তিক ঘটনাবলির সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল মুজিব বাহিনীর শেখ মণি অনুসারীদের কীর্তি। যদিও তার জন্য রাজনৈতিক মূল্য দিতে হয়েছে সিরাজুল আলম খানদেরও। কমিউনিস্ট ধারার রাজনীতিবিদদের নির্মূলের বিবরণ দিতে গিয়ে মুজিব বাহিনীর একজন মুক্তিযোদ্ধা[২৮১]– যিনি নিজেও কুমিল্লার বড়ুরা'য় ভাসানী ন্যাপের জনপ্রিয় এক নেতাকে হত্যায় অংশ নিয়েছিলেন, বর্তমান লেখকের কাছে বলেন,

> 'আমরা না চাইলেও কমান্ডাররা বাধ্য করেছিল ঐ কাজে। বিষয়টি স্বচ্ছন্দ করার জন্য তাই পরবর্তী পর্যায়ে বিএলএফ যোদ্ধাদের পরিচিত এলাকায় ইনডাকশান বন্ধ করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এলাকা ও মানুষ পরিচিত হলে হত্যা করার ক্ষেত্রে দ্বিধা তৈরি হতো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বামপন্থীরা নিজ নিজ এলাকায় সুনামের অধিকারী থাকতেন, ফলে তাদের মারার নির্দেশ পালন করা জটিল হতো। অপরিচিত এলাকা হলে ঐরূপ সম্ভাবনা থাকবে না– এটাই ধরে নিয়েছিল নেতৃবৃন্দ।'

সাধারণভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের বামপন্থী শিবিরকে মস্কো ও পিকিং ঘরানার আলোকে বিবেচনা করা যায়। উভয় শিবিরই মুজিব বাহিনী দ্বারা যুদ্ধকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে মস্কো শিবিরের নেতা মনি সিংহ এবং পিকিং শিবিরের নেতা কাজী জাফর আহমেদের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।[২৮২] মস্কো ঘরানা যুদ্ধের পূর্ব থেকে আওয়ামী লীগের সহযোগী হিসেবে অবস্থান নিলেও মুজিব বাহিনীর তরফ থেকে তারাও যে ছাড় পায়নি তার স্বীকারোক্তি হিসেবে মনি সিংহ বলেন,

> 'আমরা আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তির বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলাম। এই প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। ...আমরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভর করার ওপর জোর দিতাম। এই সকল বিষয়ে আওয়ামী লীগের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আওয়ামী লীগের একাংশের

---

২৮১ বোধগম্য কারণেই এখানে তার পরিচয় প্রকাশ করা হচ্ছে না।

২৮২ দেখুন, *মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র* ১৫ শ' খণ্ড। পৃ. ৩১৬ ও ২১৩। কাজী জাফর আহমেদ সুনির্দিষ্টভাবে কিছু এলাকার উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে 'খুলনায় সৈয়দ কামাল বখতের নেতৃত্বে প্রায় দুই হাজার গেরিলার একটি বাহিনী গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুজিব বাহিনী কামাল বখতকে হত্যা করে।' মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত এসব ঘটনার কিছুই ভারতীয় গোয়েন্দাদের অজানা ছিল না। কিন্তু মুজিব বাহিনীর এসব হত্যাকাণ্ড তারা কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে বলে জানা যায় না।

> তরুণদের দ্বারা 'মুজিব বাহিনী' নামে একটি পৃথক বাহিনী গঠিত হওয়ার পর তাদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে আমাদের সমর্থক গেরিলাদের দেশের ভেতরে প্রেরণের প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে আমাদের অসুবিধা দেখা দিল।'[২৮৩]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে মনি সিংহ কথিত 'অসুবিধা'র আরও স্পষ্ট বয়ান পাওয়া যায় ২ নম্বর সেক্টরে মেজর হায়দারের অধীনে যুদ্ধ করা জহিরুল ইসলামের ভাষ্যে। 'বামপন্থী' হিসেবে চিহ্নিত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বিএলএফ-এর সংঘর্ষ এবং তাদের থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়ার প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত বয়ানটি এ কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে ঘটনার শিকার খালেদ মোশাররফের সেক্টরের যোদ্ধারা এবং যুদ্ধের আগে খালেদের কোনো বামপন্থী পরিচিত ছিল বলে প্রমাণ নেই। কিন্তু জহিরুল ইসলাম বলছেন,

> 'যেহেতু আমরা ছাত্রলীগের ছিলাম না, অতএব বামপন্থী। এই সরলীকৃত ফর্মুলায় আমরা বামপন্থী দল হয়ে গিয়েছিলাম এবং পরবর্তী সময়ে (অক্টোবরে) বিএলএফ আমাদের ক্যাম্পও আক্রমণ করেছিল।...নভেম্বরে ঈদের আগের দিন সন্ধ্যায় বিএলএফ বাহিনী কাঞ্চন এলাকায় অবস্থানরত একটি বাম গেরিলাদলকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ওদের সব অস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল। এই দলের বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত কমান্ডার লুৎফর ভাই ২০ নভেম্বর ঈদের দিন আমাদের চাপড়ি ক্যাম্পে (বর্তমানে ঢাকার নিকটবর্তী পূর্বাচল এলাকা) উপস্থিত হলেন। আমি লুৎফর ভাইকে চিনতাম। তিনি ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী ছিলেন। মহিলা পরিষদের আয়শা খাতুনের ছোট ভাই। আমরা লুৎফর ভাইকে সাময়িক আশ্রয় এবং মেজর হায়দারের মাধ্যমে বিএলএফ-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করে অস্ত্র ফেরতের ব্যবস্থা করেছিলাম।'[২৮৪]

বামপন্থীদের প্রতি এসব বাধা ও আক্রমণের সাধারণ কারণ ছিল ভারতীয় কমান্ডের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের যে কোনো ধরনের কমিউনিস্ট ধারার বিকাশকে বাধা প্রদানের নীতি। দেশের অভ্যন্তরে যেখানেই কমিউনিস্টরা নিজস্ব স্বাধীন শক্তিতে যুদ্ধাঞ্চল ও মুক্তাঞ্চলের বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করেছে সেখানেই বাধা ও আক্রমণ এসেছে। বর্তমান অনুসন্ধানকালে এরূপ আক্রমণের সবচেয়ে করুণ দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বৃহত্তর যশোরের নড়াইল-শালিখা এলাকার পুলুম গ্রামকে ঘিরে গড়ে ওঠা বামপন্থীদের সশস্ত্র উত্থান ও তার বিপর্যয়কে। মুক্তিযুদ্ধকালে ইপিসিপি-

---

২৮৩ মনি সিংহয়ের সাক্ষাৎকার, *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র* (১৫ শ' খণ্ড), তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৫, পৃ. ৩১৬।

২৮৪ জহিরুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধে মেজর হায়দার ও তার বিয়োগান্ত বিদায়*, প্রথমা, ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১৭৯।

এমএল নামে পরিচিত পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির যশোর শাখা পুরোপুরি নিজস্ব উদ্যোগে এখানে বিশাল এক মুক্তাঞ্চল গড়ে তুললেও অক্টোবর নাগাদ মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী ও রাজাকারদের ত্রিমুখী আক্রমণে পুলুমের প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়ে। এখানে প্রায় দেড় শত কমিউনিস্ট যোদ্ধা নিহত হয় বলে আনুমানিক একটা হিসাব দিয়েছেন অত্র প্রতিরোধের সামরিক প্রধান নূর মোহাম্মদ। তিনি এও জানান, কেবল ভারতীয় কমান্ডের অধীনে না থাকার কারণেই তারা বারবার আক্রান্ত হন। 'ভারত সরকার ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যুদ্ধ না করলে সেটা দেশপ্রেম বর্জিত যুদ্ধ হবে– এটাই ধরে নেয়া হয়েছিল।...কিন্তু আমাদের নীতি ছিল কোনো অবস্থাতে ভারতে গিয়ে যুদ্ধ নয়।'[২৮৫]

যশোরের পুলুম মুক্তাঞ্চলের মতো নোয়াখালীর চরজাঙ্গালিয়া ইউনিয়নে মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) এর মুক্তিযোদ্ধারা গড়ে তুলেছিল আরেকটি মুক্তাঞ্চল। এই মুক্তাঞ্চলে পাকিস্তানের সৈনিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি কৃষিবিপ্লবের লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার শুরু হয়েছিল এবং গণপ্রশাসন গড়ে তোলা হয়। এখানেও যুদ্ধকালে মুজিব বাহিনী প্রেরণ করা হয়– কিন্তু তোয়াহা স্থানীয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে চুক্তি করে মুজিব বাহিনীর আক্রমণ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে ১৬ ডিসেম্বরের পর এক সপ্তাহের অধিক টিকতে পারেনি জাঙ্গালিয়ার কমিউনিস্টদের এই গণপ্রশাসন– যদিও ভূস্বামীদের হাত থেকে কেড়ে নেয়া জমি ক্ষুদে চাষিরা ১৯৭৪-এ রক্ষীবাহিনী আসার পূর্ব পর্যন্ত দখলে রাখতে পেরেছিল।[২৮৬]

উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের শেষপর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে মুজিব বাহিনীর আক্রমণাত্মক অগ্রাভিযানে পরিস্থিতির এতটাই অবনতি ঘটে যে, মুজিব বাহিনীর সমাজতন্ত্রীরাও আক্রান্তের তালিকায় চলে আসে। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের স্বপন চৌধুরীর দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করতেই হয়। এই প্রতিভাধর ছাত্রনেতাই ১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগে 'সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশে'র প্রস্তাব উত্থাপন করে সেই সময়কার ছাত্র রাজনীতিকে ইতিহাসের নতুন এক অধ্যায়ে ঠেলে দেন। ছাত্রলীগের

---

২৮৫ দেখুন, নূর মোহাম্মদ, 'ডাক দিয়ে যায় ২৩ অক্টোবর ১৯৭১', *শহীদ স্মরণে*, শহীদ দেশপ্রেমিক স্মৃতি কমিটি, যশোর, ২০১২। পুলুম গ্রামের প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং তার বিপর্যয় সম্পর্কে সরাসরিও নূর মোহম্মদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় ২০১৩ সালের ১ মার্চ ঢাকায়। তিনি ছিলেন ঐখানে 'পার্টি বাহিনী'র প্রথম কমান্ডার। পরবর্তীকালে এখানে বিমল বিশ্বাসও কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হন– যিনি বর্তমানে ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা।

২৮৬ হায়দার আকবর খান রনো, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং বাম-প্রগতিশীলদের ভূমিকা*, www.amaderbudhbar.com/?=686, এপ্রিল ২৪ ও মে ১৫, ২০১৩. হায়দার আকবর খান উপরোক্ত লেখায় চর জাঙ্গালিয়ার মতোই বাগেরহাটের বিষ্ণুপুর এলাকার আরেকটি কমিউনিস্ট মুক্তাঞ্চলের উল্লেখ করেছেন– সেখানেও মুজিব বাহিনী ঘাঁটি এলাকা ধ্বংসের চেষ্টা করেছিল। ঐ এলাকায় কমিউনিস্ট গেরিলাদের নেতৃত্বে ছিলেন রফিকুল ইসলাম খোকন।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে সমাজতন্ত্রপন্থীদের অন্যতম সংগঠক ছিলেন তিনি।[২৮৭] কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ৪৫ জনের মধ্যে মাত্র ১৩ জন সেদিন তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী, শেখ শহীদুল ইসলাম, আবদুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ। যাঁদের গ্রুপ-নেতা তখন ফজলুল হক মণি। নূরে আলম সিদ্দিকী ঐ বৈঠকের সভাপতি ছিলেন এবং সভাপতির ক্ষমতাবলে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেদিন বৈঠক অসমাপ্ত রেখে দেওয়া হয়েছিল। যা ছিল এক অর্থে স্বপন চৌধুরীর প্রস্তাবটির পরোক্ষ বিরোধিতা।[২৮৮] 'সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশে'র প্রস্তাব উত্থাপন করায় ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক স্বপন ঐ সময় ছুরিকাহতও হয়েছিলেন। এইরূপ প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান রুষ্ট হয়েছিলেন বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৮৯] মুক্তিযুদ্ধের শেষলগ্নে ২৭ নভেম্বর স্বপন চৌধুরী চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থেকে আহত অবস্থায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে আটক হন। তাঁকে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। পরে ঐ হাসপাতাল থেকে গুম হয়ে যান তিনি। এ বিষয়ে সিরাজ গ্রুপের অন্যতম নেতা হাসানুল হক ইনু এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস মণি গ্রুপই স্বপন চৌধুরীকে পাক বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেয়। ধরা পড়ার সময় তিনি প্রতিরোধ করেন ও আহত হন। পাক বাহিনী স্বপন চৌধুরীর পরিচয় পেয়ে তাঁর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং রাঙ্গামাটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ১৬ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটির পতনের পর স্বপন হাসপাতালেই ছিলেন। পরদিন তাঁকে গোপনে সরিয়ে ফেলা হয়। যে নার্স স্বপনের চিকিৎসায় ছিলেন তিনিও ১৯৭১ সালে গায়েব হয়ে যান। আমাদের ধারণা এ কাজ শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের।'[২৯০]

---

২৮৭ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার ঢেমশা এলাকায় ১৯৪৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম।

২৮৮ মাহমুদুর রহমান মান্না, *বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি*, শিখা প্রকাশনী, ২০১১, ঢাকা, পৃ.৩৩।

২৮৯ ডা. মাহফুজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯।

২৯০ মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭০। উল্লেখ্য, জাসদ এখনো প্রতিবছর *শহীদ স্বপন চৌধুরী দিবস* পালন করে থাকে। এই হত্যার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার দায়ে চট্টগ্রামের অনেক রাজনীতিবিদ পটিয়ার একজন নেতার নাম উল্লেখ করেন– তবে বাস্তব প্রমাণ না থাকায় এখানে তার নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চট্টগ্রামের একজন বিএলএফ সদস্য স্বপন চৌধুরীর হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীদের পরিণতি সম্পর্কে ভিন্ন এক ভাষ্য দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তার ও নার্সকে পরে ঝালকাঠি বদলি করা হয়। তারা সেখানে যোগ দিতে গেলে লঞ্চ থেকে নামার মুহূর্তে খুন হয়ে যান।

বিএলএফ-এর ইস্টার্ন কমান্ডের যোদ্ধা সাহাব উদ্দীন সাথী বর্তমান লেখককে বলেছেন, 'বিএলএফ-এর এক অংশের হাতে অপর অংশের গেরিলাদের হত্যার আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল। চট্টগ্রামের রাউজানে নাজিম নামেও আমাদের আরেকজন যোদ্ধা এভাবে খুন হন।' অন্যদিকে কুমিল্লার জাসদ নেতা হাবিবুল্লা চৌধুরীও সাক্ষাৎকারে অত্র জেলায় একইভাবে এমদাদ নামে একজন কর্মীর নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্মীপুরের আ ন ম শফিক উল্যাহ অত্র এলাকায় যুদ্ধে বিজয়ের মাত্র একদিন পরেই

উল্লেখ্য, ডিসেম্বরে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর শেখ মণি'র নেতৃত্বে মুজিব বাহিনী সদস্যদের অগ্রাভিযানের পথ নির্ধারিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে। সম্ভবত এ সময় সিরাজুল আলম খানের প্রতি অনুগত অংশও রাজনৈতিকভাবে তাদের ভবিষ্যৎ অগ্রাভিযানের পথানুসন্ধান শুরু করে। ১৬ ডিসেম্বরের পর এর লক্ষণ হিসেবে দেখা যায়, শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফেরার কিছুদিন পরই মুজিব বাহিনীর তিন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আ স ম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ ও শরীফ নুরুল আম্বিয়া (এরা তখন দেশের সুপরিচিত ছাত্রনেতা) স্বাধীন দেশে সরকার গঠন প্রশ্নে 'দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যদের নিয়ে একটি *জাতীয় বিপ্লবী সরকার* গঠনের দাবি জানান।' তাঁরা একই সঙ্গে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা, গণপরিষদ ও মন্ত্রিসভা বাতিলেরও আহ্বান জানান।[২৯১]

তিন ছাত্রনেতার উপরোক্ত দাবিনামার কিছু ছিল প্রশাসনিক বিবেচনায় প্রকৃতই বিপজ্জনক ধাঁচের– যেমন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী ও সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীদের প্রকাশ্যে গুলি করে মারতে হবে; অসৎ ব্যবসায়ী এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি ছাত্র-যুবকদেরও দিতে হবে; ইত্যাদি। এসময় সিরাজুল আলম খানের উপরোক্ত অনুসারীরা 'যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের স্বার্থে সেনাবাহিনীকে *জনগণের বাহিনী* হিসেবে' গড়ে তোলা[২৯২] এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকার ও আওয়ামী

বিএলএফ-এর বৈরী অংশের হাতে সিরাজদ্দৌলা নামে একজন সম্ভাবনাময় যোদ্ধার মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন, যিনি ছিলেন সিরাজ গ্রুপের অনুসারী এবং ঢাকার জিন্না কলেজের [পরে তিতুমীর কলেজ] প্রথম ভিপি।

২৯১ ২৫ মে ১৯৭২ সালে তাঁরা এই দাবি তোলেন। বিবৃতির পুনর্পাঠের জন্য দেখুন, *দ্য বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ মে ১৯৭২, ঢাকা। জাতীয় শ্রমিক লীগের কয়েকজন নেতাও একই তারিখে অনুরূপ বিবৃতি দেন। এ পর্যায়ে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল, 'মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে আসার পর থেকে ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খান সমর্থক অংশ মুজিববাদের বিষয়টি তাদের শ্লোগান ও বক্তব্যে উত্থাপন কমিয়ে দেয় এবং 'সমাজতন্ত্র ও শ্রেণিসংগ্রাম' সংক্রান্ত বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতে থাকে।' কৌতূহলোদ্দীপক এই 'রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তন' সম্পর্কে আরও বিস্তারিত দেখুন, ফাইজুস সালেহীন, *বাম রাজনীতির ৬২ বছর*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৯০, ঢাকা, পৃ. ৪১।

২৯২ এসময় সেনাবাহিনীতেও এসব বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ঢাকাস্থ ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল জিয়াউদ্দীন এবং কুমিল্লাস্থ ৪৪ ব্রিগেডের কমান্ডার (মুক্তিযুদ্ধকালীন ১১ নং সেক্টর কমান্ডার) লে. কর্নেল আবু তাহের 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন' বিষয়ে যখন খোলামেলা বক্তব্য উত্থাপন করেন তখন প্রতিষ্ঠানটির সর্বত্র তা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁদের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানদের যোগাযোগ গড়ে ওঠার কারণেই শেষোক্তরা একই বিষয় রাজনৈতিক দাবি আকারে জনসমাজে হাজির করেন। অতীতে কখনোই ছাত্রলীগের সিরাজ গ্রুপ সেনাবাহিনীর বিপ্লবী পুনর্গঠনের বিষয়ে কোনো দাবি উত্থাপন বা বক্তব্য রেখেছেন বলে জানা যায়

লীগ নেতাদের কলকাতাকেন্দ্রিক দুর্নীতির তদন্তেরও ডাকা দেন। ইতিহাসের বড় কৌতুক এই যে, সেদিন আব্দুর রব-সিরাজ-আম্বিয়াদের জরুরি অবস্থা জারির বিরোধিতা করে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী, ইসমত কাদির গামা ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। আর ১৯৭৪-৭৫ এ শেখ মুজিবুর রহমান যখন প্রকৃতই জরুরি অবস্থার আদলে দেশ চালাতে শুরু করেন তখন শেষোক্তরা ছিলেন তাঁর সমর্থক এবং রব-সিরাজ-আম্বিয়ারা ছিলেন তার করুণ শিকার।[২৯৩]

এসময় কেবল শেখ মুজিবুর রহমানই নন, তাজউদ্দীন আহমদও সিরাজ গ্রুপের উত্থাপিত 'জাতীয় বিপ্লবী সরকার' ধারণার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কারণ এরূপ বিপ্লবী সরকার গঠিত হলে বিদ্যমান প্রশাসন ও আমলাতন্ত্রের জায়গায় নতুনধারার প্রশাসন গড়ে ওঠার সূচনা ঘটত এবং তাতে, বিশেষত তৃণমূল পর্যায়ে, অনেক বিপ্লবী নেতৃত্ব ও শক্তির অন্তর্ভুক্তি ছাড়া গত্যন্তর থাকত

না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আলতাফ পারভেজ, *অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ, কর্নেল তাহের ও জাসদ রাজনীতি*, পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৬, ঢাকা।

উল্লেখ্য, এই বিতর্কের তাৎক্ষণিক ফল হিসেবে জিয়াউদ্দীনকে সেনাবাহিনী ছাড়তে হয়। চাকুরিরত অবস্থায় তিনি সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় দেশজুড়ে বিদ্যমান সামগ্রিক হতাশা এবং সরকারের সর্বোচ্চ ব্যক্তির সমালোচনামূলক বক্তব্য তুলে ধরে কলাম লিখে সেনাশৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন। পরে তিনি সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে সর্বহারা পার্টিতে যোগ দেন এবং সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর ঐ দলের একাংশের নেতৃত্ব দেন ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীকালে ঐ রাজনীতিতেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন তিনি এবং ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যান। জিয়াউদ্দীনের সেনাবাহিনী ত্যাগের পরপর লে. কর্নেল তাহেরও (সেপ্টেম্বর ১৯৭২) ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে পদত্যাগ করেন। তবে তাহের সেনাবাহিনী ত্যাগ করলেও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বি আই ডব্লি টি এ)-এর ড্রেজার ইউনিটের প্রধান হিসেবে চাকরিরত ছিলেন।

২৯৩ জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং বিপ্লবী সরকার গঠনের দাবির পূর্বে ফেব্রুয়ারিতে সিরাজুল আলম খান ও তাঁর সহযোগীরা মুজিবকে আরও কিছু রাজনৈতিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন তাঁদের গ্রুপের সেই সময়কার একজন রাজনৈতিক সংগঠক মহিউদ্দিন আহমদ। তাঁর মতে, 'আমাদের গ্রুপের নেতাদের সঙ্গে মুজিবের একটা বৈঠক হয় ফেব্রুয়ারিতে। সেখানে গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়: *শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ ছেড়ে দিয়ে দলের বাইরে থাকবেন এবং জাতীয় নেতা হিসেবে দেশকে দিকনির্দেশনা দেবেন মাত্র। সরকার পরিচালনা করবে অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় গড়ে ওঠা কমিটিগুলো।* মুজিব প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করলেও সে অনুযায়ী কোনো পদক্ষেপ নেননি। বিস্তারিত দেখুন, মহিউদ্দিন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৬।

একই বিষয়ে মার্শাল মনিরুল ইসলামেরও অনুরূপ বক্তব্য দেখেছি আমরা– যেখানে বলা হয়েছে, (দেখুন, *৪.ক উপ-অধ্যায়ে*), সিরাজ গ্রুপ মুজিবকে সরকারে কোন পদ গ্রহণ না করে গণচীনের মাও সেতুঙের আদলে চেয়ারম্যানসুলভ ভূমিকা রাখার প্রস্তাব করে এবং সরকারের নির্বাহী প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের প্রতি আস্থার কথা জানায়।

না। এরূপ প্রশাসন পাকিস্তান রাষ্ট্রের ফেলে যাওয়া অবশেষের বদলে এমন এক নতুন রাষ্ট্রীয় আইনগত কাঠামোর দাবি জানাত যা মুজিবনগরে গড়ে ওঠা প্রবাসী সরকারের সাজানো ছকটি অনিবার্যভাবে এলোমেলো করে দিত। তাজউদ্দীন এইরূপ সরকারের ধারণা কলকাতায় থাকাকালেই এক দফা মোকাবেলা করেছিলেন। স্বাধীনতার পরও তিনি সেই অবস্থান বজায় রেখেছিলেন। ভারতীয়রাও যে বাংলাদেশে এইরূপ একটি বিপ্লবী সরকার দেখতে একেবারেই প্রস্তুত নয় সেটাও ছিল সেসময় সুবিদিত।

বলা বাহুল্য, জাতীয় বিপ্লবী সরকার ধারণার প্রতি তাজউদ্দীন আহমদ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিক্রিয়া সিরাজুল আলম খানের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। এই ধারণা প্রচারণার মাধ্যমে তাঁর লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগ এবং বিশেষ করে মণি'র অনুসারীদের থেকে নিজ কর্মীদের রাজনৈতিক পৃথকত্ব সুনির্দিষ্ট করা। ছাত্রফ্রন্টে আ স ম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ, শরীফ নুরুল আম্বিয়া এবং শ্রমিক ফ্রন্টে মোহাম্মদ শাজাহান, রুহুল আমিন ভূইয়া প্রমুখের মাধ্যমে উপরোক্ত বিবৃতিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশব্যাপী একটি আদর্শিক মেরুকরণের সূচনা এবং শক্তি প্রদর্শনের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন তিনি। সিরাজুল আলম খানের উদ্যোগে এসময় কৃষক লীগ নামেও একটি সংগঠনের জন্ম হয়। ১৯৭৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এই সংগঠনের প্রথম সম্মেলন হয়। সম্মেলন শেষে যার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করা হয় যথাক্রমে খোন্দকার আবদুল মালেক[২৯৪] এবং হাসানুল হক ইনুকে। সহ-সভাপতি ছিলেন তিন জন : খোরশেদ আলী, কাবিল হোসেন ও মফিজুর রহমান খান। ছাত্রলীগ বা শ্রমিক লীগের মতো এটি ভাঙনের শিকার কোনো সংগঠন ছিল না– বরং প্রথম থেকে তা পুরোপুরি সিরাজুল আলম খানের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

ছাত্র ও শ্রমিক রাজনীতির পর এসময় কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিসরেও সিরাজুল আলম খানের সাংগঠনিক বিস্তৃতির চেষ্টা এ কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, স্বাধীনতার পূর্ব থেকে এতদাঞ্চলে প্রথাগত সমাজতন্ত্রীরা ঐ পরিমণ্ডলেই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন। স্বভাবত এটা ছিল বাংলাদেশে গ্রামীণ শ্রেণিরাজনীতির এক নতুন অধ্যায়।

---

২৯৪ ২০১৩ সালে এক সাক্ষাৎকারে আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ তাঁর জাসদে যোগদানকে 'রাগের মাথায় নেয়া সিদ্ধান্ত' হিসেবে অভিহিত করেছেন। আরও দেখুন: *৩০৭ নং তথ্যসূত্র*।

৪.চ. প্রথাগত শ্রমিক ও কৃষক রাজনীতিতে সিরাজুল আলম খান

> তিনি (সিরাজুল আলম খান) এমন মানুষ যাকে ভালোবাসতে হয়। তিনি আত্মোৎসর্গের প্রতীকস্বরূপ। আমার শুধু ভয় ছিল, দারিদ্র্যমুক্তির পথের ধীরগতিতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারবেন না এবং হয়তো রূঢ় ও অগ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে অপ্রিয় হয়ে যাবেন।
>
> – জেনারেল উবান[২৯৫]

> তাঁর (সিরাজুল আলম খান) মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুকে অপ্রিয় করে তোলা। এটার মধ্যে যাদের হাত ছিল, আমি সেটা বলবো না, তবে আমি জানি।
>
> – তোফায়েল আহমেদ[২৯৬]

> বাঙালি উঠতি বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের স্বার্থ রক্ষাকারী সংগঠন হিসেবেই আওয়ামী লীগের উৎপত্তি ও বিকাশ। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন আব্দুর রব-সিরাজ গ্রুপ 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার ধারায় শ্রমিক-কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিটি তাঁদের কাছে স্বচ্ছ ছিল না।
>
> –আ ফ ম মাহবুবুল হক, আহ্বায়ক, বাসদ[২৯৭]

সিরাজুল আলম খান ছিলেন ছাত্র রাজনীতির সংগঠক। আর জাসদ হলো তাঁর সৃষ্টি। স্বভাবত জাসদে সূচনাকালে ছাত্র সংগঠকরাই ছিলেন কেন্দ্রে এবং জেলা পর্যায়েও মুখ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁরা তখন বলতেন, 'আমরা লড়ছি শ্রেণিসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য।' অন্যদিকে তাদের উদ্দেশ্য করে ছাত্রলীগের মাখন-সিদ্দিকী গ্রুপ বলত, 'বৈজ্ঞানিকের ভাওতাবাজি– মাও নিক্সনের কারসাজি'; 'নিক্সন পেড়েছে ডিম– মাও দিয়েছে তা– তা থেকে বের হলো বৈজ্ঞানিকের ছা।' এতসব আক্রমণাত্মক শ্লোগানের পরও অবশ্য রব-সিরাজ গ্রুপ 'সমাজ বিপ্লবের অভিমুখে' ছিলেন দৃঢ় পদক্ষেপে আগুয়ান। ছাত্রলীগের এই অংশের আরেকটি চিত্তাকর্ষক শ্লোগান ছিল, 'পিকিং মস্কো বুঝি না– মাও লেনিন ছাড়া চিনি না।'

ছাত্রদের দ্বারা শ্রেণিসংগ্রাম ত্বরান্বিত করার এরূপ চেষ্টা মার্কসবাদী বিশ্ব-অভিজ্ঞতায় বেশ অভিনব হলেও এও সত্য, ছাত্র রাজনীতিতে থাকার সময়ই

---

২৯৫ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩।

২৯৬ ১৯৮৯ সালের ১৪ এপ্রিল টেপরেকর্ডারে ধারণকৃত তোফায়েল আহমেদের সাক্ষাৎকার, বিস্তারিত দেখুন, মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৭।

২৯৭ আ ফ ম মাহবুবুল হক, *বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স: একটা পর্যালোচনা*, সংযুক্তি: দুই।

সিরাজুল আলম খান পূর্ব-পাকিস্তানের শ্রমিক রাজনীতিতেও সংগঠন করার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। শিক্ষাঙ্গনে তিনি যে 'নিউক্লিয়াস মডেল'-এ সফলতা পান শিল্পাঙ্গনেও (এমনকি অন্যান্য অনেক পেশাজীবীদের মাঝেও) সেই একই পথ অনুসরণ শুরু করেন তিনি '৬৬-'৬৭ থেকে। তাঁর প্রত্যক্ষ উদ্যোগেই ১৯৬৯ সালে গড়ে ওঠে শ্রমিক লীগ। ১৯৭২ সালে ছাত্রলীগের ভাঙন যেমন শিক্ষাঙ্গনকে অস্থির ও রক্তাক্ত করে তোলে তেমনি শিল্পাঞ্চলেও অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বাংলাদেশ শ্রমিক লীগের বিভক্তি। এ পর্যায়ে তাই সিরাজুল আলম খানের শ্রমিক রাজনীতিতে প্রবেশ ও প্রভাব বিস্তারের কাহিনী কিছুটা সংক্ষেপে হলেও তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে। এটা এ কারণেও জরুরি যে, সিরাজুল আলম খান ও তাঁর তরুণ সহযোগীরা যখন ১৯৭২ সালে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-এর ডাক দিচ্ছেন তখন তাঁদের শ্রমিক ফ্রন্টে সাধারণ শ্রমিকদের জন্য তা ছিল অনেকাংশেই বিস্ময় ও কৌতূহলের বিষয়। এই শ্রমিকদের '৬৮-'৬৯ পর্যায়ে সংগঠিত করা হয়েছিল মুজিব ও তাঁর ছয়দফার সমর্থনে, অথচ মাত্র ২-৩ বছরের ব্যবধানে তাদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতো এক আদর্শের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য বলা হয় এবং পাশাপাশি মুজিবের বিরুদ্ধেও। যুদ্ধের এই নতুন সমীকরণে মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পড়ে যান অনেকাংশে শ্রেণিশত্রুর কাতারে। অন্যদিকে শেখ মুজিব, এমনকি শেখ মণিও তখন 'সমাজতন্ত্র' চাইছিলেন– ফলে মাঠ পর্যায়ে শ্রমিকরা ছিল প্রকৃতই বিভ্রান্ত। বিশেষত এই দুই ধারার 'সমাজতন্ত্রী'রা কেউই শ্রমিক লীগের কর্মীদের মার্কসবাদী ধারায় পদ্ধতিগতভাবে সমাজ পরিবর্তনের পথ ও পদ্ধতি বিষয়ে দীক্ষা দেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা নেয়নি, অন্তত বাহাত্তর-তিয়াত্তরের আগে। ফলে সাধারণ শ্রমিকরা চারিদিকের বহুমুখী 'তীব্র সমাজতান্ত্রিক বাক্য জালে' ছিলেন অনেকখানি হতবিহ্বল।[২৯৮]

শ্রমিক অঙ্গনে প্রবেশের সময় প্রাথমিক পর্যায়ে সিরাজুল আলম খানের অন্যতম নির্ভরশীল একজন সংগঠক ছিলেন মেসবাহ্উদ্দীন আহমেদ।[২৯৯] তাঁর

---

২৯৮ অনেক বোদ্ধা মধ্যবিত্তের জন্যও সমাজতন্ত্রের এরূপ রণধ্বনি ছিল হতবুদ্ধিকর। কারণ ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে যেসব রাজনৈতিক দলিলকে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়– যেমন বহুল আলোচিত ২১ দফা, ৬ দফা, ১১ দফা– এমনকি ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিলের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' ইত্যাদির কোথাও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রটির সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে 'সমাজতন্ত্র'-এর সরাসরি উল্লেখ্য ছিল না। উপরোক্ত তিনটি দলিলে একইভাবে অনুপস্থিত ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রসঙ্গও।

২৯৯ জাসদ গঠনের পর তিনি ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পাশাপাশি দলটির শ্রমিক সংগঠনেরও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হন তিনি। বর্তমানে ঢাকার সুপরিচিত প্রকাশনা সংস্থা 'অংকুর'-এর স্বত্বাধিকারী। জাসদের প্রথম দফা ভাঙনে শাহজাহান সিরাজের সঙ্গে, তারপর মীর্জা সুলতান রাজার সঙ্গে এবং পরে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন গণফোরামে যোগ দেন। তবে বর্তমানে সাধারণভাবে রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হলেও শ্রমিক রাজনীতিতে সক্রিয়।

সঙ্গে আলাপচারিতার (৩১ অক্টোবর এবং ৩ নভেম্বর ২০১২, ঢাকায়) ভিত্তিতে জানা যায়, মূলত মুজিবের ছয়দফাকে জনপ্রিয় করার আন্দোলনের সময়– সেই উদ্যোগেরই অংশ হিসেবে সিরাজুল আলম খান তাঁর কয়েকজন ছাত্র সংগঠক সহযোগীকে তখনকার বিদ্যমান শ্রমিক সংগঠনগুলোর নৈকট্য অর্জনের জন্য দায়িত্ব দেন। একে তৎকালীন বিদ্যমান শ্রমিক রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। এসময় সবচেয়ে বড় শ্রমিক সংগঠন ছিল কমিউনিস্ট দল আরএসপি[৩০০] প্রভাবিত চটকল ফেডারেশন এবং মুসলিম লীগ প্রভাবিত 'পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার'। এসব সংগঠনে অনুপ্রবেশের পাশাপাশি তেজগাঁও, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি শিল্পাঞ্চলেও সিরাজুল আলম খান কিছু শ্রমিক সংগঠকের সঙ্গে নৈকট্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন সত্তরের আগেই। এসব যোগাযোগ গড়ে তোলার কাজে সিরাজুল আলম খান অনেক সময় আঞ্চলিকতার সদয় সহযোগিতাও পেয়েছেন বলা যায়। দেশের শিল্পাঙ্গনে বৃহত্তর নোয়াখালীর শ্রমিকদের প্রাধান্য এসময় সিরাজুল আলম খানকে তাঁর পরিকল্পিত অগ্রযাত্রায় বিশেষ সহায়তা করে– যেহেতু তাঁর গ্রামের বাড়ি ছিল একই জেলায়। এভাবে একদিকে যেমন তিনি আদমজীতে পান মোহাম্মদ উল্ল্যা ও সায়েদুল হক সাদু'দের[৩০১], তেমনি তেজগাঁয়ে যোগাযোগ ঘটে রুহুল আমিন ভূঁইয়াদের সঙ্গে।

---

৩০০ রেভল্যুশনারী সোসালিস্ট পার্টি বা 'আরএসপি' হলো ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামকালে গড়ে ওঠা গোপন বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন'-এর একটি গোষ্ঠীর পরবর্তী সময়ে বিকশিত সাংগঠনিক নাম। যোগেশ চ্যাটার্জি, ত্রিদিব চৌধুরী, কেশবপ্রসাদ শর্মা প্রমুখ ছিলেন আদি সংগঠক। আনুষ্ঠানিকভাবে দলের জন্ম ১৯৪০-এ। আরএসপি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া একটি অংশ পরে গঠন করে এসইউসি আই– জাসদ গঠনকালে যে দলের ভূমিকা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ববাংলায় এই দলের সংগঠকরা মূলত শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। বর্তমানে দলের ভারতীয় শাখার কেন্দ্রীয় কার্যালয় দিল্লির ১৭ নং ফিরোজ শাহ রোড-এ। ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালের নির্বাচনে এই দল ভারতীয় পার্লামেন্টে তিনটি করে আসন লাভ করেছিল। বাংলাদেশে এই দলের আলোচিত সংগঠক ছিলেন নির্মল সেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলাদেশে এই দল নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

৩০১ সাদু পরবর্তীকালে বাংলাদেশের শ্রমিক রাজনীতিতে, বিশেষত আদমজী এলাকায় এক সুপরিচিত চরিত্র হয়ে ওঠেন আশির দশকে। সিপিবি'র শ্রমিক সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের অন্যতম শ্রমিক সংগঠক তাজুল ইসলামকে যখন ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আদমজীতে হত্যা করা হয় তখন সাদু ও তার সহযোগিদের এজন্য দায়ী করা হচ্ছিল। তাজুল ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ও ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠক। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির টানে তিনি আদমজীতে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে গিয়েছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের হয়ে। তাঁর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ঐ সময়কার আদমজীতে সাদুকেন্দ্রিক শ্রমিক লীগের পুরানো সংগঠকদের কমিউনিস্ট বিরোধী মনস্তত্ত্ব প্রকটভাবে ধরা পড়ে। সাদুদের নেতৃত্বেই আদমজিতে স্বাধীনতা-উত্তর 'লাল বাহিনী' গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর সময় থেকে নিজস্ব একটি বাহিনীও ছিল তার। এসব বাহিনীর চাপেই সত্তর-একাত্তরে ইউনাইটেড এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতা মাওলানা সাইদুর রহমানকে শ্রমিক লীগে আসতে হয়েছিল, আর এই প্রক্রিয়ায় দূর থেকে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সিরাজুল আলম খানও। এসময় শেখ

আদমজীতে নোয়াখালী সংযোগ শক্তিশালী করতেই সিরাজ তাঁর তরুণ 'কমরেড' ফজলে এলাহীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়োগ দেন সেখানে সংগঠন গোছাতে। রুহুল আমিন ভূঁইয়াকে পাওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের 'নিউক্লিয়াস' সদস্য আবদুর রাজ্জাক তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। রুহুল আমিন ভূঁইয়া তখন মজদুর ফেডারেশন করতেন। সামগ্রিক এসব তৎপরতার ফসল ছিল ১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর 'জাতীয় শ্রমিক লীগ'-এর প্রতিষ্ঠা। মেসবাহ্উদ্দীনের ভাষায়, 'একজন ছাত্রনেতার হাতেই আসলে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠনের জন্ম হয়েছিল এবং খোদ আওয়ামী লীগেও এর প্রবল বিরোধিতা ছিল। সেখানে শ্রম বিষয়ক সম্পাদক জহুর আহমেদ চৌধুরী ছাড়াও তাজউদ্দীন আহমদও দলীয় অঙ্গসংগঠন হিসেবে শ্রমিক সংগঠন গড়ার বিপক্ষে ছিলেন।'

কিন্তু সিরাজুল আলম খান শ্রমিক লীগ দাঁড় করাতে এতটাই মরিয়া ছিলেন যে, অন্য সংগঠনে ঢুকে পড়ে ভালো সংগঠকদের নিজের রাজনৈতিক বলয়ে নিয়ে আসার পাশাপাশি পেশাগতভাবে ভিন্ন পরিসরের অনেককে ধরে এনে 'ট্রেড ইউনিয়ন পরিমণ্ডলে' ঢোকানোরও চেষ্টা করেন। যেমন তাঁর হাতে সৃষ্ট 'শ্রমিক নেতা' মোহাম্মদ শাহজাহান শ্রমিক লীগে আসার আগে ছিলেন একজন সাধারণ নির্মাণ ঠিকাদার। আবদুল মান্নানকে নিয়ে আসা হয় চটকল ফেডারেশন থেকে। মুজিবের প্রতি মান্নানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সামগ্রিক এসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাওলানা সাইদুর রহমান[৩০২], নুরুল হক, রুহুল আমিন ভূঁইয়া, আবদুল মান্নান, মোহাম্মদ শাহজাহান, মেসবাহ্ আহমেদ প্রমুখ সংগঠকের মাধ্যমে শ্রমিক লীগের গোড়াপত্তন ঘটে। এর মধ্যে নুরুল হক ছিলেন পেশায় ব্যবসায়ী। নোয়াখালীর বাসিন্দা হিসেবে তিনি নোয়াখালীর শ্রমিকদের আকৃষ্ট করতে পারবেন এই বিবেচনা কাজ করেছিল।

সূচনাকালে শ্রমিক লীগের অধীনে কারখানাভিত্তিক কোনো ইউনিয়নই ছিল না। বস্তুত ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজনে কিংবা সরাসরি শ্রমিকদের পেশাগত বিষয়ে কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে নয়– জাতীয় রাজনীতিতে সিরাজুল আলম খানের পরিকল্পনার অংশীদার হতেই জন্ম হয় নতুন এই শ্রমিক সংগঠনের। মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের রাজনীতির বিজয় একাত্তর পরবর্তী সময়ে শিল্পাঙ্গনে ঐ শ্রমিক সংগঠনকে একচেটিয়া রাজত্ব এনে দেয়। ইতোমধ্যে লীগসংশ্লিষ্ট

ফজলুল হক মণিও আদমজীর রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টায় নামেন–'আদমজী জুটমিলস্ শ্রমিক সংঘ' নামে একটি নতুন সংগঠনের রেজিস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর সাদু ও শ্রমিক লীগের প্রধান অংশ সামরিক শাসকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'জনস্বাধীন শ্রমিক ফেডারেশন' নামে নতুন একটি শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাদের পুরানো আধিপত্য ধরে রাখতে সমর্থ হয়। ১৯৮৭ সালের ২৯ মে সাদু মারা যান।

৩০২ তিনি ছিলেন আদমজীতে 'শ্রমিক ইউনিয়ন'-এর নেতা। ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

শ্রমিকদের একাংশ একাত্তরে মুজিব বাহিনীতেও সামরিক প্রশিক্ষণ পেয়ে এসেছিলেন।[৩০৩]

জাসদ গঠনের পর শ্রমিক লীগ নেতাদের মধ্যে রুহুল আমিন ভূঁইয়া, মোহাম্মদ শাহজাহান ও মেসবাহ্ আহমেদ– সিরাজুল আলম খানের ডাকে সাড়া দিলেন। আদমজীতে সাদুরা এলেন না। আবদুল মান্নানও নয়। জাতীয় রাজনীতির টানাপোড়েনে ট্রেড ইউনিয়ন পরিমণ্ডলের আবহাওয়াই তখন পাল্টে যাচ্ছিল। যে কোন শিল্পাঞ্চলেই কোনো শ্রমিক সংগঠক জাসদের পক্ষ নেয়া মাত্রই তাকে সেখান থেকে উৎখাত হতে হচ্ছিল– কেবল পোস্তগোলা এলাকা ব্যতীত। শেখ মুজিব ও শেখ মণি'র প্রলোভন কিংবা আহ্বান কোনোটা প্রত্যাখ্যানই সহজ ছিল না। শ্রমিক লীগে যার সবচেয়ে বড় বলী ছিলেন রুহুল আমীন ভূঁইয়া। জাসদ গঠনের আগেই তাঁকে আটকের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রথম গ্রেফতারে শ্রমিকরা থানা ঘেরাও করে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান– কিন্তু পরের দফায়, প্রেস কনফারেন্স করে আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগের আগের দিন– ১৯৭২-এর ৬ ডিসেম্বর আটক হওয়ার পর সমগ্র মুজিব আমল তাঁকে কারাগারেই থাকতেই হয়। তিনটি মামলা দেওয়া হয় তাঁর বিরুদ্ধে।[৩০৪] এসময় ঢাকায় কোথাও জাসদপন্থী শ্রমিক লীগের অফিসও করা যায় নি। প্রথমে পল্টনে এবং পরে মগবাজারে তাদের অফিস তুলে দেওয়া হয়। এসবই হচ্ছিল দেশব্যাপী এক মৃদু গৃহযুদ্ধের মাঝে। সংঘাতের বিস্তৃতি ছিল এসময় পুরো প্রায় দেশজুড়ে– তবে প্রধানত শিক্ষাঙ্গনে। আর শ্রমিক অঙ্গনে চলছিল জাতীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি।

মেসবাহউদ্দীন আহমেদের মতে, কেবল মুক্তিযুদ্ধোত্তর সামাজিক হতাশা থেকেই নয়, সর্বগ্রাসী এক নিরাপত্তাহীনতার বোধ জাসদ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। 'নতুন দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অনেকেই বিশ্বাস করতেন– আওয়ামী লীগ বা ঐ দলের ছাত্র সংগঠনে পড়ে থাকলে রাজনৈতিক ভিন্নমতের কারণে কোনোভাবেই তারা রেহাই পাবেন না। নতুন দল হলে হয়তো প্রতিরোধের একটি কাঠামো গড়ে তোলা যাবে।'[৩০৫] এসব বিবেচনায় সবার আগ্রহ তখন সশস্ত্র কার্যক্রমে। কারণ যুদ্ধের সময় পাওয়া অস্ত্র তখন অনেকের কাছে। তারপরও পদ্ধতিগতভাবে ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতি গড়ে তুলতে ক্যাডারভিত্তিক প্রশিক্ষণের

---

৩০৩ শ্রমিক লীগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সিরাজুল আলম খানের অন্যতম নির্ভরশীল সংগঠক মেসবাহ্উদ্দীন আহমেদ মুজিব বাহিনীর প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন।

৩০৪ রুহুল আমীন ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে অভিযোগটি সরকার দাঁড় করাতে পারলো তা হলো তাঁর বাড়িতে বিপুল অস্ত্রসম্ভার পাওয়া। শ্রমিক লীগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র বলেছে, ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশেই 'ভবিষ্যৎ রাজনীতি'র জন্য এসব অস্ত্র রেখে দেয়া হয়েছিল। তিয়াত্তরে এসে ঐ 'ভবিষ্যৎ রাজনীতি'র দিকচিহ্ন স্পষ্ট হতে শুরু করে।

৩০৫ মেসবাহ্উদ্দীন আহমেদ, *সাক্ষাৎকার*, ৩১ অক্টোবর ২০১২, ঢাকা।

আয়োজনও শুরু হয় চুয়াত্তর নাগাদ। ইতোমধ্যে মাহমুদুর রহমান মান্না, মার্শাল মনিরুল ইসলাম, একরামুল হক প্রমুখ ছাত্রনেতারাও আসছিলেন জাসদপন্থী শ্রমিক লীগ গড়ে তুলতে। প্রথাগত বামপন্থী শ্রমিক সংগঠকদের থেকে নিজেদের পৃথকত্ব বোঝাতে জাসদ ইতোমধ্যে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' বাদ দিয়ে নতুন শ্লোগান হাজির করে 'বাঙলার মেহনতী মানুষ এক হও'। কারণ 'জাতীয় সমাজতন্ত্র'-এর জন্য চাই 'জাতীয় শ্লোগান'!

কিন্তু পঁচাত্তরে একের পর এক রাজনীতির উত্তাল ঢেউ স্থিরতা পেতে দেয়নি পদ্ধতিগত কোনো আয়োজনকেই। 'সিপাহি বিপ্লব' ব্যর্থ হয়ে ততদিনে আবার সংগঠনে ভাটার টান শুরু হয়েছে– দফায় দফায় ভাঙতে শুরু করে জাসদ, সঙ্গে শ্রমিক লীগও। ১৯৭৮ সালে সংগঠনের নাম পাল্টে রাখা হয় 'জাতীয় শ্রমিক জোট'; আর ১৯৮৪ সালে শুরু হয় ধাপে ধাপে তার বিভক্তি প্রক্রিয়া– মোহাম্মদ শাহজাহান গেলেন জেনারেল এরশাদের নৈকট্য আকাঙ্খী আ স ম রবের সঙ্গে, রুহুল আমিন ভূঁইয়া ও ফজলে এলাহী সরাসরি জাতীয় পার্টিতে। মেসবাহউদ্দীনের ভাষায়, 'সবাই তখন যেন হারিকিরি করছিল।'[৩০৬]

জাসদ গড়ে ওঠার সময় ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগকে যেভাবে বেদনাদায়ক এক বিভক্তির কাল পেরোতে হয়েছিল কৃষক লীগের ক্ষেত্রে তেমনি ঘটেনি। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কৃষক লীগেরও প্রতিষ্ঠা সিরাজুল আলম খানের মাধ্যমে– স্বাধীনতার পরে, ১৯৭২ সালের ১৯ মে। তখনও ছাত্রলীগে ভাঙনের উত্তেজনাকর অধ্যায় শুরু হয়নি– সিরাজুল আলম খান শেখ মুজিবুর রহমানকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, আওয়ামী লীগের একটি কৃষক সংগঠন থাকা দরকার। সম্মতি পাওয়ামাত্র সিরাজ একটি কমিটি তৈরি করে মুজিবের সম্মতি নিয়ে নেন। মুক্তাগাছা থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য খোন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লাহকে সভাপতি এবং হাসানুল হক ইনুকে সাধারণ সম্পাদক করে কৃষক লীগের কমিটি গঠিত হয়ে যায়। কাজী আরেফ আহমেদ এই কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন।

এ পর্যায়ের বিস্ময়কর দিক হলো সংগঠনটি গড়ে ওঠার স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের তরফ থেকে 'সমাজতান্ত্রিক কৃষি বিপ্লব'-এর এক তাত্ত্বিক দলিল হাজির করা হয় মুজিবের সামনে। যদিও এই সংগঠন তখন কিংবা পরবর্তী ২-৩ বছরে কখনোই দেশের কোথাও কৃষি বিষয়ে সাধারণ কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলার কোনো উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায় না। কিন্তু ছাত্রলীগে ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে এমন অনেক 'র‍্যাডিকাল' কর্মীকে 'সমাজতান্ত্রিক কৃষি বিপ্লব'-এর আওয়াজের মাধ্যমে কৃষক লীগে নিয়ে আসা হয় এবং তাদের মাধ্যমে সারা দেশে

---

৩০৬ এসময় নেতৃত্বের প্রশ্নে মতদ্বৈততায় জাসদপন্থী শ্রমিক লীগের সম্মেলনে তীব্র মারামারিও হয়। সৃষ্টি হয় একাধিক ধারা।

প্রচুর সাধারণ কৃষককে এই সংগঠনের সদস্যও করা হয়। কিছু দিন পরই যখন নতুন দল জাসদ গঠিত হলো তখন কৃষক লীগের পুরোটাই সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে গেল,[৩০৭] আর তার সামান্য কিছু দিনের মধ্যে প্রায় পুরো কৃষক লীগ গণবাহিনীতে পরিণত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, গণবাহিনী মানেই কৃষক লীগ। 'সমাজতান্ত্রিক কৃষি কর্মসূচি' বাস্তবায়নের 'পথ' সম্পর্কে এসময় কৃষক লীগের তরফ থেকে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটি দেওয়া হলো এভাবে :

> '...সমাজতান্ত্রিক কৃষি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে কেবল সমাজতান্ত্রিক সরকার। বাংলাদেশে বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের মতো ধনিক শ্রেণীর সরকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সরকারের অর্থ হচ্ছে শোষিত শ্রেণীর সরকার, শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী জনগণের বিপ্লবী সরকার। কেবল সর্বহারার অগ্রণী নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক এবং মেহনতী জনগণের সহযোগিতায় সত্যিকারের সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে এরূপ সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সর্বহারার অগ্রণী নেতৃত্বে শহরে-নগরে শ্রমিকশ্রেণীর লৌহ-কঠিন সামরিক সংগঠন তার একটি পূর্বশর্ত।...'[৩০৮]

এইরূপ থিসিসকে আঁকড়ে ধরে, কিন্তু কৃষি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো আন্দোলন-সংগ্রাম ছাড়াই ১৯৭৩-এর ডিসেম্বর থেকে কৃষক লীগ ২১ দফা দাবিতে দেশব্যাপী গণবিক্ষোভের কর্মসূচি ঘোষণা করে। তাদের '২১ দফা'র প্রথম দফাই ছিল 'ব্যর্থ আওয়ামী লীগ সরকার পদত্যাগ কর।' এসময় কৃষক লীগ কর্মীরা অবিশ্বাস্য দ্রুততায় শহুরে জনপদে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকারি পেটোয়া বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং একের পর এক মারা যেতে থাকে। পরবর্তীকালে জাসদ সশস্ত্র সংগ্রাম ছেড়ে দিলেও কৃষক লীগের ঐ সশস্ত্রতা অনেক স্থানেই তাৎক্ষণিকভাবে থামানো যায়নি। ইতোমধ্যে অবশ্য সংগঠনটির সভাপতি নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আবার ফিরে গেছেন মুক্তাগাছা আওয়ামী লীগে।[৩০৯] আর

---

৩০৭ এসময় খোন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ জাসদে যোগ দেয়ায় আওয়ামী লীগ তাঁকে বহিষ্কার করে। আওয়ামী লীগে তাঁর আনুষ্ঠানিক পদ ছিল ময়মনসিংহ জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে। আওয়ামী লীগ ছেড়ে আসার ক্ষেত্রে তাঁর সাহস নতুন দল হিসেবে জাসদকে নৈতিকভাবে বেশ চাঙ্গা করে তোলে। ১৯৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে গণপরিষদ থেকেও বহিষ্কার করা হয়।

৩০৮ *সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি*, খন্দকার আবদুল বাতেন কর্তৃক পুরানো পল্টন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত, পৃ. ২৪-২৬, ঢাকা। উল্লেখ্য, খন্দকার আবদুল বাতেন বর্তমানে আওয়ামী দলীয় সংসদ সদস্য।

৩০৯ আওয়ামী লীগে ফিরে যান তিনি ১৯৯৪-এ। এখন স্রেফ উপজেলা কমিটির সদস্য। ২০১৩ সালের জুনে ৭৭ বছর বয়সী খোন্দকার শহীদুল্লাহ'র কাছে যখন তাঁর জাসদে যোগদান, গণবাহিনীর তৎপরতায় যুক্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় তখন তিনি বলেন :

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনুও আওয়ামী লীগের অনেক কাছাকাছি এসেছেন ২০১২ সালে শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় তথ্যমন্ত্রী হয়ে।

আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসার সময় ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়েও জাসদ পৃথক একটি গণসংগঠনের জন্ম দেয় 'জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ' নামে। প্রথমে এই সংগঠনে নেতৃত্ব দেন মেজর এম এ জলিল ও হাবিবুল হক বেনু, পরে মেজর জিয়াউদ্দিন। শেষোক্তজন বর্তমানে আওয়ামী পরিবারের একজন সদস্য। জাসদের একটি নারী শাখাও ছিল 'মহিলা সাংগঠনিক কমিটি' নামে। এর সভাপতি ছিলেন মমতাজ বেগম, সহ-সভাপতি ছিলেন রাজিয়া হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক হন হাসনা রহমান। ১৯৭৩ সালের ৯ মে এটি গঠিত হয়েছিল। ছাত্রলীগে সিরাজুল আলম খান গ্রুপে এবং পরে জাসদ গঠনের পর এই দলের সাংগঠনিক বিকাশে শামসুন্নাহার ইকু, ফরিদা খানম সাকি, রাবেয়া সিরাজ, আমেনা সুলতানা বকুল, লুৎফা হাসিনা রোজী প্রমুখ নারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। জাসদ গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে আরেকটি সংগঠন দলটির সমাবেশ ক্ষমতা প্রদর্শনের বিশেষ হাতিয়ার ছিল, তা হলো বাস্তুহারা সমিতি। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্বে আবুল কালাম আজাদ এই সংগঠনের মূল সংগঠক ছিলেন। যুদ্ধের পর জাসদ গড়ে ওঠবার মুহূর্তে তিনি আওয়ামী সমর্থক হিসেবে থেকে যান এবং বেলায়েত হোসেন ও আবদুল খালেকের নেতৃত্বে বাস্তুহারা সমিতির একাংশ জাসদকে সমর্থন দেয়।

সাংগঠনিক উপরোক্ত ঘটনাবলি এবং তার প্রস্তুতি ও বিকাশে ব্যক্তির ভূমিকাও জাসদ গঠনকালীন পরিস্থিতি অনুধাবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। যুদ্ধোত্তর সময়ে ছাত্রলীগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত মুজিব বাহিনীর প্রধান প্রধান কুশীলবদের ব্যক্তিগত পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন এক রাজনৈতিক পর্যায়ের জন্ম দিতে যাচ্ছিল তারও বিবরণ আমরা দেখবো পরবর্তী অধ্যায়ে। (৪.ক উপ-অধ্যায়েও এইরূপ কিছু বিবরণ রয়েছে।)

'...অন্তত আমার মধ্যে তখন দোদুল্যমানতা ছিল। আমরাই একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করলাম, আবার আমরাই তাকে উৎখাতের জন্য নেমেছি...নিজের কাছে কনভিন্স ছিলাম না। এটা বিশ্বাসঘাতকতা হয় কি না তাও ভাবছিলাম।..অনেক পরে মনে হয়েছে, সরকার ভুল করেছিল আর আমরা তা সংশোধন করতে গিয়ে আরও বড় ভুল করলাম। এও মনে হয়েছে, সরকারের মধ্যে থেকেও আমরা তার ভুলগুলো সংশোধন করতে পারতাম।...আমি অনেকটা রাগের মাথায় জাসদে যোগ দিয়েছিলাম।' উল্লেখ্য, জাসদের বিভিন্ন পর্যায়ের ভাঙনে শহীদুল্লাহ প্রথমে আ স ম রবের সঙ্গে, দ্বিতীয় পর্যায়ে শাহজাহান সিরাজের সঙ্গে এবং তৃতীয় দফায় মীর্জা সুলতান রাজার সঙ্গে ছিলেন। সর্বশেষ তিনি আওয়ামী লীগে চলে আসেন।

৪.ছ. ২৩ জুলাই ১৯৭২; মুজিব ও সিরাজুল আলম খান দু'দিকে

> আমরা ইতিহাসকে নতুন করে গড়তে পারি না, কিন্তু মাঝে-মধ্যে ইতিহাসকে পুনরায় মূল্যায়ন করা ভবিষ্যতের পথ নিরূপণে অবশ্যই সহায়ক হতে পারে।
>
> –অশোক মিত্র, মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ; ১৯৭৭-৮৭ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ছিলেন;[৩১০]

> ফেব্রুয়ারি মাসে (১৯৭২) একটা প্রস্তাব এসেছিল, খুব সম্ভব কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে; 'তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের 'গ্রাম কর্মীবাহিনী' হিসেবে গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নিয়োগ করার। এই পরিকল্পনা পাশ হয়নি। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বাইরে যুদ্ধের অভিজ্ঞতালব্ধ এবং জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত এ রকম একটি 'বাহিনী'র হাতে কখনও গ্রামকে ছেড়ে দেওয়া যায় না!...দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংল্যান্ডে সমাজতন্ত্রের স্তম্ভ ছাড়াই রানীকেও সপ্তাহে একটিমাত্র ডিম খেতে দেওয়া হতো। আমাদের নেতৃবৃন্দ এটুকুও পারলেন না। খুব শিগগির স্পষ্ট হয়ে যায়, *কোন আশা নেই*।
>
> –আনিসুর রহমান, অর্থনীতিবিদ, স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য[৩১১]

রাশিয়া কিংবা চীনে তো বটেই, প্রথাগতভাবে বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও এবং সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষিণ এশিয়াতেও সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম শ্রমিক ও কৃষক অঙ্গনেই প্রথম প্রস্ফুটিত হলেও জাসদের রাজনীতির প্রাথমিক চারণভূমি ছিল দেশের শিক্ষাঙ্গন। ছাত্র সংগঠকদের আহ্বান ও কার্যক্রমকে তখন স্রেফ অনুসরণ করছিল তাদের সমর্থক শ্রমিক ও কৃষক সংগঠকরা। শ্রমিক লীগের ভাঙন কিংবা কৃষক লীগের বিনা বাক্যব্যয়ে জাসদকে অনুসরণকে তাই অভিহিত করা যায় ছাত্রলীগের তৎপরতার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে। পূর্ববর্তী উপ-অধ্যায়ে ইতোমধ্যে বিস্তারিত রূপে সে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সিরাজপন্থী তিন নেতা (আ স ম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ ও শরীফ নুরুল আম্বিয়া) যখন জাতীয় বিপ্লবী সরকার গঠন, জরুরি অবস্থা ঘোষণা, গণপরিষদ ও মন্ত্রিসভা বাতিলসহ অন্যান্য দাবিসমূহ উত্থাপন করছিলেন– তখন তাদের পেছনে সমর্থনের শক্তি দেখাতেই শ্রমিক লীগ নেতাদের দিয়েও বিবৃতি দেওয়ানো হলো। সিরাজপন্থীদের বিবৃতিতে উপস্থাপিত উপরোক্ত বক্তব্যকে ঘিরে

---

৩১০ বিভাজনের পশ্চাৎপট: বঙ্গভঙ্গ ১৯৪৭, *ভূমিকা*, সম্পাদনা: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা, ২০১৩।

৩১১ উন্নয়ন জিজ্ঞাসা, *কেন হলো না*, ব্র্যাক, ১৯৯২, ঢাকা, পৃ. ৪, ৮।

শ্রমিক পরিমণ্ডলে বেশি মনোযোগ সৃষ্টি না হলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। শেখ মণি 'বাংলার বাণী'তে নিজ কলামে এসব বিবৃতির পেছনের শক্তিকে 'প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী' হিসেবে অভিহিত করে সরাসরি রাজনৈতিক মেরুকরণে অংশ নেন এবং বলেন, 'যারা বঙ্গবন্ধুর সরকারকে ভেঙে নতুন সরকার গঠনের প্রস্তাব করছেন তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো :

ক. দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি;

খ. বঙ্গবন্ধুকে ডিক্টেটর করে তোলা;

গ. সংবিধান রচনার পথে বাধা সৃষ্টি করা এবং

ঘ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশের সম্মান নষ্ট করা।'[৩১২]

ছাত্রলীগ বা মুজিববাদপন্থীদের মাঝে এরূপ মতদ্বৈততার মাঝেই ঢাকায় এসময় ছোট একটি ঘটনা ঘটে যা মুজিব বাহিনীর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে মূলধারার বামপন্থীদের অতীত আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। বর্তমানে ঢাকায় বারডেম হাসপাতালের পাশে যেখানে পিজি হাসপাতাল রয়েছে সেখানেই স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে 'শাহবাগ' নামে একটি হোটেল ছিল। এই হোটেল ভবনকে পিজি হাসপাতালের একাংশে পরিণত করার বিরুদ্ধে সেসময় হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলন করে যাচ্ছিল। এই হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠিত করত তখন বামপন্থী রাজনীতিবিদ, বিশেষত শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের কমিউনিস্টরা। একাত্তরের ষোল ডিসেম্বরের পরও এই আন্দোলনের রেশ জারি ছিল। কোনোভাবে যখন ঐ হোটেল শ্রমিকদের আন্দোলন দমানো যাচ্ছিল না তখন সরকারের একটি অংশ সেটা মোকাবেলার জন্য মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এক পর্যায়ে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা আন্দোলনরত শ্রমিকদের

---

৩১২ একইরূপ বক্তব্য নিয়ে মণি'র একাধিক ক্ষুরধার কলাম (৩ জুন ১৯৭২, ৬ অক্টোবর ১৯৭২ ইত্যাদি) প্রকাশিত হয় এই সময় দৈনিক বাংলার বাণীতে। মণি এ সময় তাঁর লেখনির মাধ্যমে সিরাজুল আলম খানদের রাজনৈতিক অবস্থানের মোকাবেলার পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদের কাজেরও তীব্র সমালোচনা করতেন (দেখুন, *বাংলার বাণী*, ৩১ আগস্ট ১৯৭২)। তাজউদ্দীনকে 'সমাজতন্ত্রের শত্রু' হিসেবেও অভিহিত করা হতো। মণি'র এরূপ ভূমিকায় তাজউদ্দীন আহমদ শেষপর্যন্ত দলে প্রভাবের জায়গা ধরে রাখতে পারেননি। এতে সিরাজুল আলম খান ও তাঁর অনুসারীদের মাঝে এই ধারণাই জোরালো হয়, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ থেকে তাঁদের আজ কিংবা কাল বের হতেই হবে। সেক্ষেত্রে তাজউদ্দীনের মতো নিঃসঙ্গ অবস্থার শিকার না হয়ে ভিন্ন আদর্শিক অবস্থান নিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে বের হওয়াই উত্তম। এরূপ উপলব্ধি জাসদ গঠন প্রক্রিয়াকে তীব্রতা দেয়। আগ্রহী পাঠক শেখ ফজলুল হক মণি'র কলামগুলো একসঙ্গে দেখতে পারেন নিম্নোক্ত সংকলনে: *দূরবীণে দূরদর্শী*, গ্রন্থণা ও সম্পাদনা, ফকীর আবদুর রাজ্জাক ও বিমল কর, আগামী প্রকাশনী, ২০১১, ঢাকা।

মিছিলে গুলি চালায়। এরপর হোটেলকে হাসপাতালে পরিণত করতে বেগ পেতে হয়নি সংশ্লিষ্ট আগ্রহীদের। অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিক ইউনিয়নেও এই ঘটনা নীরব এক আশঙ্কাজনক বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল দ্রুত।[৩১৩]

এসব কার্যক্রম সত্ত্বেও এসময় ছাত্রলীগে সিরাজুল আলম খান ও শেখ মণি গ্রুপের দ্বন্দ্বও ছিল বহমান। ফল হিসেবে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ (ডাকসু)-এর স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম নির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত না হয়েও ছাত্রলীগের তরফ থেকে দুটি প্যানেল জমা পড়ে এবং নির্বাচনে উভয় প্যানেল বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্যানেলের কাছে পরাস্ত হয়।[৩১৪]

---

৩১৩ তবে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ওপর পদ্ধতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী আক্রমণ আসে আরও পরে– আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন 'শ্রমিক লীগ'-এর তরফ থেকে। এরূপ সংঘাতের বড় এক কেন্দ্র ছিল টঙ্গী। দেশের প্রধান শিল্পাঞ্চল তখন এটি। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে এখানে শ্রমিকদের মাঝে প্রভাবশালী সংগঠক ছিলেন শফিকুর রহমান মজুমদার, কাজী জাফর আহমেদ ও হায়দার আকবর খান রনো। ঐ সময়কার পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে শেষোক্তজন লিখেছেন, 'টঙ্গীর পরিস্থিতি তখন অন্যরকম। মালিকরা চলে গেছে, যেহেতু অধিকাংশ ছিল পাকিস্তানি। সরকার মিলে মিলে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে।..রাতারাতি সেখানে শ্রমিক লীগ গজিয়ে উঠল। গায়ের জোরে টঙ্গী দখল করবে– এটাই ছিল লক্ষ্য। একবার টঙ্গী থানার সামনে মেশিনগান বসিয়ে তারা মনু টেক্সটাইল মিলের কলোনি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে জিনাত টেক্সটাইলের শ্রমিকরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বন্দুকধারীরা নদীতেও গুলি চালায়।'

উল্লেখ্য, টঙ্গীতে শ্রমিক লীগের কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কাজী মোজাম্মেল। একপর্যায়ে সেখানে পরিস্থিতির এতটাই অবনতি ঘটে, অসহায় শত শত শ্রমিক স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল করে ঢাকায় এসে পড়ে। দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে এসে তাঁরা গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের অফিসের সামনে অবস্থান নেয়। পরে সেখান থেকে তাঁরা পল্টন ময়দানে যায় এবং তিন রাত–তিন দিন সেখানে অবস্থান করে। এ ঘটনা শিল্পাঞ্চলের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির প্রতি জাতীয় মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে নাটকীয় ভূমিকা রেখেছিল। পরে সরকারি তরফ থেকে টঙ্গীর শিল্প ইউনিটগুলোতে শ্রমিক প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। তাতে জাফর ও রনোদের 'বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন' প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ করে। কিন্তু ১৯৭৩-এর মার্চে জাতীয় নির্বাচনের পর স্থানীয় শ্রমিক লীগ জাফর ও রনোদের সব সংগঠককে এই বলে টঙ্গী থেকে তাড়িয়ে দেয় যে, 'জাতীয় নির্বাচনে যেহেতু আওয়ামী লীগ জিতেছে– তাই টঙ্গীসহ সব এলাকা আমাদের দখলে থাকবে।' বিস্তারিত দেখুন, হায়দার আকবর খান রনো'র আত্মজৈবনিক গ্রন্থ, *শতাব্দী পেরিয়ে*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩১০-১২। টঙ্গী ছাড়া অন্যত্রও তখন সরকার বিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের কোনো সুযোগ ছিল না– প্রধানত 'লাল বাহিনী'র কারণে। এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩১৪ ডাকসুতে ছাত্রলীগের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'পন্থীদের ভিপি প্রার্থী ছিলেন মো. জিনাত আলী। 'মুজিববাদ' ও মণি সমর্থকরা প্রার্থী করে শেখ শহিদুল ইসলামকে, যিনি শেখ মুজিবুর রহমানের নিকটাত্মীয়ও ছিলেন। ছাত্র ইউনিয়নের প্রার্থী হন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। নির্বাচনে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম-মাহবুব জামান পরিষদ অধিকাংশ পদে জয়লাভ করে।

এসময় ছাত্রলীগ অনানুষ্ঠানিকভাবে দু'ভাগ হয়ে যায়। সিরাজুল আলম খান গ্রুপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হন শরীফ নুরুল আম্বিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ আগের পদেই থাকলেন। একইভাবে বিপরীত শিবিরে সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী আগের পদে থাকেন, আর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক করা হয় ইসমাত কাদির গামাকে। মনিরুল ইসলাম দাবি করেছেন[৩১৫], নূরে আলম সিদ্দিকীরাই প্রথম ছাত্রলীগে ভাঙন প্রক্রিয়ার সূচনা করে শাজাহান সিরাজসহ সিরাজুল আলম খানের অনুসারী প্রভাবশালী সকলকে বহিষ্কারের মধ্য দিয়ে। পরে অবশ্য শেষোক্তরাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে।

পারস্পরিক এই বহিষ্কার ও পাল্টা বহিষ্কারের পরপর '৭২-এর জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে দুই গ্রুপ ঢাকার বুকে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় সমাবেশ ডেকে। সেই সময় উভয় গ্রুপই ভাবছিল সাংগঠনিক কার্যক্রমে ব্যাপকতা ও সমাবেশশক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমেই তারা মুজিবকে জয় করবেন এবং কাছে রাখবেন। বস্তুত সেটাই (সমাবেশশক্তি) তখন ছিল কার্যত রাজনীতিতে সঠিকতা ও বেঠিকতার মানদণ্ড। বাহাত্তরের মে-জুনে ছাত্রলীগের ঠাণ্ডাযুদ্ধকালীন এই পরিবেশে মুজিব প্রাথমিকভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলেন– যদিও যুদ্ধের মেঠো উপাদান ছিল 'মুজিববাদ'-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। একপর্যায়ে মুজিব সিরাজুল আলম খান বিরোধীদের সম্মেলনস্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অতিথি হিসেবে হাজির হয়ে উপরিউক্ত ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসান ঘটান এবং ছাত্রলীগের বিভক্তিকে পূর্ণতা দেন। এভাবেই ভাঙে বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীও।

ছাত্রলীগের একাংশের সম্মেলনে মুজিবের এই উপস্থিতির প্রতীকী মূল্য ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়া বিপুল হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে তার তাৎপর্য নিয়ে কমই আলোকপাত করা হয়েছে। ছাত্রলীগের ঐ সময়কার বিভক্তি প্রক্রিয়া থেকে স্পষ্ট ছিল, সংগঠনটির অধিকতর সংগ্রামী ও মেধাবী অংশই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ডাক দিয়ে এগোচ্ছে এবং সংখ্যায়ও তারা শেখ মণি ও তোফায়েল সমর্থকদের চেয়ে বেশি ছিল। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রপন্থীরা, যাদের

'মুজিববাদ' সমর্থক প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ছিলেন মনিরুল হক চৌধুরী। আর সিরাজুল আলম খানের অনুসারীদের প্যানেলে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী হন মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিশ। এই প্যানেলের অন্যান্য প্রার্থী ছিলেন সামাজিক আপ্যায়ন সম্পাদক পদে আসলাম ভুঞা, ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদক পদে ঝীলু সামসুন নাহার ইকো, মিলনায়তন সম্পাদক পদে মো. হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ। এই প্যানেল থেকে কেবল সদস্য পদে মমতাজ বেগম জয়লাভ করেন। উল্লেখ্য, এই প্যানেলের পরিচিতিমূলক যে পুস্তিকা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছিল তাতে বিভিন্ন সময় দেয়া শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের সর্বমোট ছয়টি উদ্ধৃতি ছিল! পুস্তিকাটির নাম দেয়া হয়েছিল 'এক ও অভিন্ন!'

৩১৫ মনিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৯।

সম্মেলন হচ্ছিল পল্টন ময়দানে– ভেবেছিলেন দুটি স্থানে সম্মেলন হলেও মুজিব নিশ্চয়ই কোনোটাতেই যাবেন না। কিন্তু মণি, রাজ্জাক ও তোফায়েল সমর্থকদের মাঝে হাজির হয়ে মুজিব কার্যত সিরাজুল আলম খান অনুসারীদের বাধ্য করলেন নতুন একটি দল গঠনে এগিয়ে যেতে। 'বাইশে জুলাই গণকণ্ঠ প্রথম পাতায় দুই সম্মেলনের সচিত্র সংবাদ ছাপা হলো, দুই কলাম করে। বাঁয়ে শেখ মুজিবের ছবি। হেডিং ছিল গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র হবে। ডানে আ স ম রবের ছবি। হেডিং ছিল, গণতন্ত্র দিয়ে সমাজতন্ত্র হবে না। মুজিব আর আ স ম রব সমান বরাদ্দ পেলেন।'[৩১৬] মুজিবের সেদিনের রাজনৈতিক পদক্ষেপ বাংলাদেশের রাজনীতির পুরো ছক পাল্টে দিয়েছিল।[৩১৭] সিরাজুল আলম খান ও তাঁর সহযোগীদের সামনে তখন এক রূঢ় বাস্তবতা।

জুলাইয়ের দ্বিধাবিভক্তির পর থেকে সিরাজ গ্রুপ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' বলা বন্ধ করে দেন। মনিরুল ইসলামের বিবরণ থেকে দেখা যায়, 'মুজিবের নীরবতা ও নিরপেক্ষতা ভঙ্গ'-এর আকস্মিকতায় সিরাজপন্থীরা তখন 'হতবিহ্বল'।[৩১৮] তবে মুজিবের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সিরাজ ও রবপন্থীদের সম্মেলনে অতিথি হিসেবে গণকণ্ঠের সম্পাদক আল মাহমুদ যে প্রবন্ধ পড়েছিলেন তা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রশংসায় ঠাসা।[৩১৯]

---

৩১৬ মহিউদ্দিন আহমদ, *এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল*, সিডিএল, ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ১৫২।

৩১৭ ছাত্রলীগের এই অংশের তরফ থেকে তখন নতুন একটি শ্লোগানও শোনা যেত, 'কমরেড শেখ মুজিব লও লও–লও সালাম।' ছাত্রলীগে থেকে তাঁরা যেভাবে নানান কর্মসূচির মাধ্যমে একাত্তর পূর্ববর্তীকালে মুজিবকে ক্রমাগত স্বাধীনতার ধারণার দিকে ঠেলে দিতে পেরেছিলেন এবারও মুজিবকে নতুন ধারার শ্লোগানের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে– এমনি বিবেচনাবোধ দ্বারা তাড়িত হচ্ছিল ছাত্রলীগের এই অংশ তখন। তাদের মাঝে এসময় আরেকটি পরিকল্পনাও কাজ করেছে। যেভাবে তাঁরা একাত্তর-পূর্ববর্তী সময়ে স্বাধীনতার দাবি তুলে গতানুগতিক বামপন্থীদের রাজনীতি কেড়ে নিতে পেরেছিল, এবারও সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের আওয়াজ তুলে এবং মুজিবকে 'কমরেড' বানিয়ে মাঠ পর্যায়ের প্রথাগত কমিউনিস্টদের রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা যাবে। কিন্তু মুজিব তাঁর শ্রেণী অবস্থানেই রয়ে গেলেন– দ্বিধাবিভক্ত ছাত্রলীগের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রপন্থীদের সম্মেলনস্থলে গেলেন না তিনি। মুজিবের ঐতিহাসিক ঐ সিদ্ধান্তে সিরাজ অনুসারীদের 'কমরেড শেখ মুজিব লও লও–লও সালাম' শ্লোগানের করুণ সমাপ্তি ঘটল।

উল্লেখ্য, ছাত্রলীগের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রপন্থী এই অংশ একাত্তরের পূর্বে প্রথাগত কমিউনিস্টদের নানানভাবে হেয় করার চেষ্টা করত– যার মধ্যে তাদের প্রিয় একটি শ্লোগান ছিল: 'হো হো মাও মাও – চীন যাও ব্যাঙ খাও।' সেই স্মৃতির কারণে একাত্তরের পর একই তরুণরা যখন 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-এর ধারণা উত্থাপন করলেন তখন সবাই বিষয়টি অস্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছিল।

৩১৮ মনিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৮।

৩১৯ আল মাহমুদ, *কবির মুখ*, আদর্শ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৬০।

এ পর্যায়ের সামগ্রিক ঘটনাবলি যে মুজিব ও সিরাজের পারস্পরিক বোঝাপড়ার একেবারে বাইরে ঘটেনি সেরকম সাক্ষ্যও মেলে। মুজিব ও সিরাজ উভয়ে একটি বিষয়ে এ সময় একমত ছিলেন, 'সমাজতন্ত্রের শ্লোগানধারী জঙ্গী একটি দলের জন্ম ছাড়া স্বাধীনতা-উত্তর উত্তাল এই তারুণ্যকে সর্বহারা পার্টি, মাওবাদী নকশাল, সিপিবি বা ন্যাপ থেকে সরিয়ে রাখার আর কোনো উপায় নেই।'[৩২০]

এই দৃষ্টিভঙ্গি যে কতটা সঠিক তার প্রমাণ মেলে মাঠ পর্যায়ের তাৎক্ষণিক চিত্র থেকে। ১৬ ডিসেম্বরের পরপর বাহাত্তরে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছে তার প্রায় সব কয়টিতে ছাত্র ইউনিয়ন জয়লাভ করে। মূলত তাদের সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিই তরুণদের আকর্ষিত করে। কিন্তু পরের বছর যখন দেখা যায় সিপিবির অঙ্গসংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ক্রমে মুজিবকে অন্ধভাবে সমর্থন দিচ্ছে আর ছাত্রলীগেরই একটি ধারা মুজিবের বিরোধিতা এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধ্বনি দিয়ে জঙ্গী অবস্থান নিয়েছে তখন একই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে একচেটিয়াভাবে জাসদপন্থী ছাত্রলীগ জয়লাভ করতে শুরু করে। জাসদপন্থী ছাত্রলীগ তখন ছাত্র ইউনিয়নকে বলত 'বি-টিম'। আর ছাত্র ইউনিয়নের কাছে প্রথমোক্তরা ছিল 'বিভ্রান্ত মাওবাদী।'

---

৩২০ ৯৩ নং ফুটনোটে উল্লিখিত সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠ সূত্রটির তরফ থেকেই এই মন্তব্যটি পাওয়া। এ ধরনের বিশ্লেষণ বর্তমান লেখক মাঠপর্যায়ে অনেক জাসদ নেতার তরফ থেকেই পেয়েছেন। যেমন সিরাজগঞ্জের জাসদ নেতা আবদুর রউফ পাতা বলেন, 'আমি জেলে থাকতে জাসদ গঠন ও এর রাজনীতি নিয়ে নিজের মধ্যে কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়। আমি সেখান থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আট পাতার একটা চিঠি লিখি। আমার ভেতরে প্রশ্ন ছিল– জাসদ কি স্বাধীনতা-উত্তর তারুণ্যের সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা ধারণ করার জন্য তৈরি হয়েছে? না-কি সেই আকাঙ্ক্ষাধারী তরুণদের একটি জালে আটকানো হয়েছে? আমার চিঠির উত্তরে আ ফ ম মাহবুবুল হক ১৩ পাতার উত্তর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারিনি সেদিন।' আবদুর রউফ পাতার সাক্ষাৎকার, *পূর্বোক্ত*। ২০১৪ সালে মারা গেছেন আবদুর রউফ পাতা।

উল্লেখ্য, 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' ও 'মুজিববাদ'পন্থী[৩২১] উভয় অংশ তাদের ঐতিহাসিক সেই দ্বিধাবিভক্ত সম্মেলনের শেষ দিন ২৩ জুলাই দুপুরে ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়। এভাবেই কার্যত স্বাধীন বাংলাদেশে মুজিব বাহিনীর প্রথম দফা ভাঙন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রায় একই সময় কৃষক লীগ ও শ্রমিক লীগে[৩২২]ও উপরিউক্ত দুই ধারার অনুসারীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশ শেষে মুজিববাদপন্থী ছাত্রলীগের সভাপতি করা হয় শেখ

---

৩২১ এ সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে 'মুজিববাদ' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হিসেবে আবির্ভূত হয়। শেখ মণি তাঁর সম্পাদিত 'বাংলার বাণী'তে এবং তোফায়েল আহমেদ বিভিন্ন জনসভায় এ বিষয়ে প্রায়ই গুরুত্বের সঙ্গে আলোকপাত করতেন। সাংবাদিক আশরাফ কায়সারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ প্রথম শাসক দলের দর্শন হিসেবে 'মুজিববাদ'-এর উল্লেখ করেন। তিনি মুজিববাদকে বিশ্বের 'তৃতীয় মতবাদ' হিসেবে উল্লেখ করেন। (দেখুন, আশরাফ কায়সার, *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ৩৮)। 'মুজিববাদ' বলতে আর্থসামাজিকভাবে কী বোঝানো হচ্ছে সে বিষয়ে মুজিবুর রহমান নিজে আলোকপাত করেছেন কমই। এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে তাঁর মতামত চাইলে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছিলেন তিনি :

> একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। কাজেই কৃষকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে আমি জানি শোষণ কাকে বলে। এ দেশে যুগ যুগ ধরে শোষিত হয়েছে কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবীসহ মেহনতী মানুষ। কিন্তু তাদের মুক্তির পথ কী? এই প্রশ্ন আমাকেও দিশেহারা করে ফেলে। পরে আমি পথের সন্ধান পাই। আমার কোন কোন সহযোগী শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলেন। আমি বলি জাতীয়তাবাদের কথা। আমি বলি যার যার ধর্ম তার তার– এরই ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা। সেইসঙ্গে বলি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কথা। কিন্তু রক্তপাত ঘটিয়ে নয়– গণতান্ত্রিক পন্থায়, সংসদীয় মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ। দেখুন, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *মুজিববাদ*, ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭২।

উল্লিখিত গ্রন্থের একেবারে শুরুতে শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকারটি মুদ্রিত হয়েছে। উল্লেখ্য, শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত 'বাকশাল'-এ আওয়ামী লীগের বাইরে যে ১০ ব্যক্তি স্থান পেয়েছিলেন তাদের একজন ছিলেন উপরোক্ত 'মুজিববাদ' গ্রন্থের লেখক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস। লক্ষ্যণীয়, মুজিব নিজে 'গণতন্ত্র'কে মুজিববাদের প্রথম স্তম্ভ হিসেবে, উল্লেখ করলেও বাস্তবে তিনি একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন এবং ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ঐ একদলীয় ব্যবস্থার পক্ষে জাতীয় সংসদে ২৯২ জন সদস্য সমর্থন জানিয়েছিলেন। না সূচক কোনো ভোট পড়েনি তাতে। মুজিববাদকে 'প্রথম বিপ্লব'-এর তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে নিয়ে মুজিব 'বাকশাল'কে অভিহিত করেন 'দ্বিতীয় বিপ্লব' হিসেবে। দেখুন, ১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুমোদন কালে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ।

৩২২ শ্রমিক লীগের ভাঙন প্রক্রিয়াটিও ছিল উত্তেজনা বহুল। এই সংগঠনটি বরাবর আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু তার একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা রুহুল আমীন ভূঁইয়া যখন সিরাজুল আলম খানদের পক্ষাবলম্বন করতে শুরু করেন তখন ১৯৭২-এর ৬ ডিসেম্বর তাঁকে আটক করা হয়। তবে হাজার হাজার উত্তেজিত শ্রমিক তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকার রমনা থানা ঘেরাও করে ছাড়িয়ে-নিয়ে যান তাঁকে।

শহিদুল ইসলামকে, সাধারণ সম্পাদক হন এম এ রশিদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হন শফিউল আলম প্রধান। অপরদিকে, পল্টনের সমাবেশ থেকে সিরাজুল আলম খান সমর্থক ছাত্রলীগের নতুন যে কমিটি ঘোষণা করা হয় তাতে সভাপতি পদে শরীফ নুরুল আম্বিয়াই রইলেন, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এলেন আ ফ ম মাহবুবুল হক আর সাংগঠনিক সম্পাদক হলেন বদিউল আলম। তবে শেষোক্তদের রাজনীতি তখন আর শিক্ষাঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকলো না। ততদিনে শুরু হয়ে গেছে নতুন দল গড়ার কর্মযজ্ঞ। প্রায় দু মাস পরে ১৭ সেপ্টেম্বর পল্টনে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী ছাত্রলীগের পরবর্তী এক জনসভায় আ স ম আব্দুর রব নতুন দল প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন। এসময় শেখ মণি চেষ্টা করছিলেন গণমাধ্যমে শেষোক্তদের প্রচার যেন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রচার কৌশলের মাধ্যমে সিরাজ অনুসারীরা দেশে নতুন একটি শ্লোগান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন : 'আমরা লড়ছি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য।' ইতোমধ্যে মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল ও লে. কর্নেল তাহেরের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের যোগাযোগ ঘটে গেছে।[৩২৩] 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' নামে পার্টির নামও ঠিক হয়ে গেছে। ১৯৭২-এর ৩১ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে দলটি গঠিত হলেও ১৭ নভেম্বর বায়তুল মোকাররমে এর প্রথম জনসভা হয়; আর বড় আকারে প্রকাশ্য সাংগঠনিক প্রকাশ ঘটে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ২৩ ডিসেম্বর। ১৯৭৩-এর ১১ মে জাসদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন বসে পল্টনে। ঐ সম্মেলন চলে তিন দিনব্যাপী। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। যদিও সাধারণ্যে তখনও এরা ছাত্রলীগের 'রব গ্রুপ' বা 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী গ্রুপ' মাত্র– কিন্তু ইতোমধ্যে

---

৩২৩ এই যোগাযোগ ঘটে উভয়ে সেনাবাহিনীতে থাকা অবস্থাতে। মুক্তিযুদ্ধের পরপর যশোর-খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে জনসভা করে ভারতীয় বাহিনীর কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় মেজর জলিলের সঙ্গে তৎকালীন কর্তৃপক্ষের দূরত্ব তৈরি হয় এবং আটক হন তিনি। পরে সামরিক আদালতে তাঁর বিচার হয়– যে আদালতের বিচারক ছিলেন লে. কর্নেল আবু তাহের। বিচার শেষে জলিল অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেলেও সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে আসেন। জলিলের বিচার শেষ হওয়ার কিছুদিন পরই ১৯৭২ সালের আগস্টে আবু তাহের এডজুটেন্ট জেনারেলের পদ থেকে কুমিল্লা সেনানিবাসে বদলী হন ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে। সেখানে থাকাবস্থাতে এক মাস পর ২২ সেপ্টেম্বর তিনিও সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন। জলিলের মাধ্যমেই সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে আবু তাহেরের পরিচয় হয় বলে দাবি করেছেন গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ, 'তাহের-জিয়া ও ৭ নভেম্বর', *প্রথম আলো*, ২ জুন ২০১৩, ঢাকা। উল্লেখ্য, বিচারকালে সেক্টর কমান্ডার জলিলের বিরুদ্ধে বিজয়োত্তর খুলনায় অন্তত দু'জন বিহারি নারীকে লাঞ্ছনারও অভিযোগ আনা হয়েছিল। তবে এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসককে সাক্ষ্য হিসেবে হাজির করা হয়নি সামরিক আদালতে।

সদস্যেই জাসদ তার কেন্দ্রীয় কমিটির[৩২৪] সদস্যদের নাম ঘোষণা করে, যার পাঁচ জন সহ-সভাপতির একজন হন লে. কর্নেল আবু তাহের[৩২৫]–যদিও তাঁর নামটি

---

৩২৪ কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন, সভাপতি: মেজর এম এ জলিল, সাধারণ সম্পাদক: আ স ম আবদুর রব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: শাজাহান সিরাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক: নূর আলম জিকু প্রমুখ। লক্ষ্যণীয়, দলটির মূল উদ্যোক্তা ও তাত্ত্বিক সিরাজুল আলম খান নিজেকে কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কোনো দায়িত্বে সম্পৃক্ত করেননি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পূর্বে শ্রমিক লীগের সদস্য হওয়া ছাড়া সিরাজুল আলম খান আর কখনো কোনো সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেননি। শ্রমিক লীগ ভেঙে গেলে ঐ সংগঠনের সদস্যপদও ত্যাগ করেছিলেন তিনি।

৩২৫ তাহেরের জাসদে যোগদান ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, তাহের শুধুই একজন প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন ১১ ভাই-বোন, যারা সবাই ছিলেন কমবেশি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁদের পুরো পরিবার মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং সাহসী ভূমিকা রেখেছিল। আবু তাহের ছাড়াও এ পরিবারের আরও তিন সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্রীয় খেতাব পেয়েছিলেন। তাহেরের সঙ্গে তাঁর এই 'ব্রাদার্স প্লাটুন'ও জাসদে সক্রিয় হয়। জাসদে যোগ না দিলে এই পরিবার যে তাহেরের নেতৃত্বে অন্যকোন বামপন্থী দলে যোগ দিত তাও নিশ্চিত। কারণ সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগের পরই তাহের বদরুদ্দীন উমর, আবুল বাশার, শিরাজুল হোসেন খান প্রমুখ তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন বলে জানা যায়। *দেখুন, আলতাফ পারভেজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।* কেবল সামরিক দিক থেকেই নয়, তাহেরদের এই ব্রাদার্স প্লাটুন রাজনৈতিকভাবেও ছিল শিক্ষিত। তাহের নিজে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের পূর্বে চট্টগ্রামের ফতেহবাদে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। ঐ স্কুলে ছিলেন মাস্টার দা সূর্যসেনের কয়েকজন অনুসারী। তাহের এদের দ্বারা রাজনৈতিকভাবে বিশেষ অনুপ্রাণিত ছিলেন। রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিতদের সামরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের ধারণাটি তিনি এরূপ উৎস থেকে পেয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তাহেরের অন্য ভাইয়েরাও জাসদের মূলশক্তিভিত 'মুজিব বাহিনী'র রাজনৈতিক দিক নির্দেশনার একেবারে উল্টো ঘরানার অরিন্টেশন প্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর দুই ভাই আনোয়ার হোসেন ও আবু সাঈদ তরুণ বয়সে সিরাজ সিকদারের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ১৯৬৭ থেকে। এদের মাধ্যমেই স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৬৯ সালে তাহেরের পরিচয় ঘটেছিল সিরাজ সিকদারের সঙ্গে। তাহের ও সিরাজ সিকদার ঢাকায় '৬৯-এর জুলাইয়ে যৌথভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক সামরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছিলেন। পরে সিরাজ সিকদার ও তাহেরের মাঝে নেতৃত্বজনিত বিবাদ ও আস্থাজনিত সংকটে সেই প্রকল্প ভেঙে যায়। আনোয়ার হোসেনের মাধ্যমে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে পরিচয় এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের 'ফরিদপুর হাউজ'-এ (বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা আবু ইউসুফ বীরবিক্রমের বাসা) দু'নেতার একাধিক বৈঠক শেষে জাসদে যোগ দেন তাহের। তবে জাসদেও তাহের ও তাঁর পরিবারের রাজনৈতিক মতাদর্শ এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যে ভিন্নভাবে প্রবাহমান ছিল তার প্রমাণ দেখা যায়, পঁচাত্তরে গণবাহিনী ও সিপাহী অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক কার্যক্রমে। কেবল সাতই নভেম্বরই নয়, ২৬ নভেম্বর তাহেরের ভাইয়েরা প্রায় নিজস্ব সিদ্ধান্তে, পার্টিকে অবহিত না করেই, ঢাকস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে অপহরণের চেষ্টার মধ্য দিয়ে জাসদ রাজনীতিতে তাদের পরিবারের স্বাতন্ত্র্যমূলক কার্যক্রমের আরেক ঝুঁকিপূর্ণ নজির রাখেন। ঐ অপারেশনে তাহেরের এক ভাই মারা যান। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে তাহের ছিলেন কোয়েটায়। পালিয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বালুচ রেজিমেন্টে থাকার কারণে

প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়নি তখন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৮০৫ জন কাউন্সিলর যোগ দিয়েছেন জাসদের প্রথম সম্মেলনে– যা ছিল দলটির দেশব্যাপী দ্রুত সাংগঠনিক বিস্তৃতির প্রাথমিক এক লক্ষণ।

প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলনের পর নতুন দলের নীতিনির্ধারকরা কয়েকটি অঙ্গ সংগঠন গড়ে তোলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেও কার্যত তাদের শক্তিভিত হয়ে থাকলো ছাত্রলীগই। তেহাত্তরের জুনে পরের সম্মেলনে জাসদ-ছাত্রলীগের নেতা হয়ে এলেন সভাপতি হিসেবে আ ফ ম মাহবুবুল হক এবং সম্পাদক হিসেবে মাহমুদুর রহমান মান্না।[৩২৬] ইতোমধ্যে দেশের প্রধান প্রধান ক্যাম্পাসে এই 'জাসদ ছাত্রলীগ'ই প্রধান সংগঠন হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিহাত্তরের আগস্টে যখন কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদের নির্বাচন এল দেখা গেল এদের ঠেকাতে ছাত্রলীগের মুজিববাদপন্থী গ্রুপ ও ছাত্র ইউনিয়ন একজোট হয়ে গেছে। এই জোটের তরফ থেকে ছাত্র ইউনিয়নের নূহ-উল-আলম লেনিনকে ভিপি এবং ছাত্রলীগের ইসমাত কাদির গামাকে জিএস প্রার্থী করে একক প্যানেল দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীদের বিজয়[৩২৭] যখন রোখা যাচ্ছিল না এবং

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তাঁর বন্ধুত্বের পরিধি ছিল সীমিত– যার উল্টোটি আমরা দেখবো তাঁদের ক্ষেত্রে– যারা ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন। সম্পর্কের এই দিকগুলো পরবর্তীকালে তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত সিপাহী অভ্যুত্থানের সাফল্য-ব্যর্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

৩২৬ আ ফ ম মাহবুবুল হকের পর মাহমুদুর রহমান মান্নাকে স্বাধীনতা-উত্তর ছাত্রলীগের (জাসদপন্থী) বড় চমক বলা যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির শিক্ষার্থী ছিলেন। জন্ম ১৯৫০-এ। স্বাধীনতাত্তোর প্রথম চাকসু নির্বাচনে (১৯৭২) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ঐ নির্বাচনে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের শামসুজ্জামান হীরা; সংসদের ২৭টি পদের মধ্যে ২৫টিতে ছাত্র ইউনিয়ন জয়লাভ করে, কিন্তু মান্নার জনপ্রিয়তার কাছে ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হেরে যান।

বাগ্মীতার জন্য খ্যাতিমান ছিলেন মান্না। তাঁর সাংগঠনিক সম্ভাবনাকে শনাক্ত করেই সিরাজুল আলম খান ও আ স ম রব যৌথসিদ্ধান্তে তাঁকে চাকসু নির্বাচনের পরই ঢাকা নিয়ে আসেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক করে– যা ছিল তখন খুবই ব্যতিক্রমী এক সিদ্ধান্ত। কারণ জাসদ-ছাত্রলীগে তখন সম্ভাব্য সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঢাকাকেন্দ্রিক অন্তত ছয় নেতা (বদিউল আলম, রেজাউল হক মোশতাক, জেড আই খান পান্না, রায়হান ফেরদৌস মধু, একরামুল হক, জালাল উদ্দীন শোয়েব প্রমুখ)। তাছাড়া মান্না তখনও স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শুরু করেননি। এ পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হন গণিতশাস্ত্রে। পরে ডাকসু নির্বাচনে পরপর দু'বার ('৭৯-'৮০ এবং '৮০-'৮১) ভিপি পদে বিজয়ী হন। প্রথমবার জাসদ ছাত্রলীগ থেকে– পরে বাসদ ছাত্রলীগ থেকে।

৩২৭ ডাকসুতে তিহাত্তরে জাসদপন্থী ছাত্রলীগের ভিপি প্রার্থী আ ফ ম মাহবুবুল হক ছিলেন ক্যাম্পাসে ব্যাপক জনপ্রিয়। পুরো নির্বাচনে জাসদ তাঁকেই সামনে নিয়ে এসেছিল। ফলে ভোট গণনার সময় দেখা গেল ডাকসুসহ সব হলে (শুধু জগন্নাথ হল ব্যতীত) মাহবুবুল হক-

ভোট গণনাকালে যখন দেখা গেল ছাত্র ইউনিয়ন ও আওয়ামী ছাত্রলীগের যৌথ প্যানেলের চেয়ে জাসদ-ছাত্রলীগের মাহবুব-জহুর প্যানেল সকল পদে ব্যাপক ভোটে এগিয়ে আছে তখনি এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে– ছাত্রলীগের শেখ মণি গ্রুপ ও ছাত্র ইউনিয়ন মিলে যৌথভাবে ভোট গণনা কার্যক্রম বানচালের জন্য সন্ধ্যার আঁধারে ভোট গণনাস্থলে এসে সশস্ত্র হামলা চালায়।[৩২৮] এর আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও স্বাধীনতা-উত্তর ছাত্র-ছাত্রী সংসদের প্রথম নির্বাচন ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের মধ্য দিয়ে পণ্ড হয়ে গিয়েছিল। সেখানেও আক্রান্ত ও আক্রমণকারী উভয়ে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার অনুরূপ। দেশের প্রধান দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ অভিজ্ঞতার পরপরই দেশজুড়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু হয় মুজিব বাহিনীর সশস্ত্র সক্রিয়তার নতুন আরেক তরঙ্গ। আর তাতে শুরুর বলী হয় ছাত্র ইউনিয়ন। ছাত্র রাজনীতিতে মূল দ্বন্দ্বের জায়গা থেকে ছিটকে পড়ে পুরানো এই সমাজতন্ত্রীরা। মুজিববাদী ছাত্রলীগের 'মুখোমুখি দাঁড়া'য় তখন জাসদ-ছাত্রলীগ। রাজনীতিমুখী সাধারণ শিক্ষার্থীরাও সংখ্যাগরিষ্ঠই এভাবে মেরুকৃত হয়ে পড়ে কিংবা তাদের মাঝে এইরূপে মেরুকরণ ঘটানোই ছিল এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

জহুর প্যানেলের প্রার্থীরা এগিয়ে আছে। আ ফ ম মাহবুবুল হক সম্পর্কে আরও তথ্য দেখুন ১৭৫ নং তথ্যসূত্রে।

৩২৮ সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন (তিনি ভোট গণনা প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন): ...নির্বাচনের ফল আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছিল সব হলে বিরোধীরা জয়ী হয়েছে। অথচ সারা দিন এলাকাজুড়ে শোনা গিয়েছিল শুধু 'লেনিন-গামা', 'লেনিন-গামা'।...আসলে ব্যালট বিপ্লব হচ্ছিল নীরবে। ...হলগুলোতেই গণনা হয়েছে প্রথমে। ডাকসুরটা গণনা হওয়ার কথা শেষে। সন্ধ্যার পরে, যখন ডাকসুর নির্দিষ্ট ব্যালট বাক্সগুলো নির্দিষ্ট স্থানে নেয়া হবে।...হলের ফল দেখেই সন্দেহ রইল না ডাকসুতে ফল কী হবে।...কলাভবনের চারতলায় গণনার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে, হঠাৎ সব বাতি নিভে গেল। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে কে বা কারা এসে ব্যালট বাক্সগুলো নামিয়ে নিয়ে চলে গেল।..বোমার বিস্ফোরণও ঘটিয়েছিল ওরা। প্রতিরোধের মতো কেউ ছিল না। ...চারতলা থেকে আমরা নিচে এলাম। উপাচার্যও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কলাভবনের সামনে দেখলাম চিফ রিটার্নিং অফিসার প্রফেসর ওদুদুর রহমান গাড়িতে চড়ছেন। তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন জানার কৌতূহল ছিল। কে যেন বলল বত্রিশ নম্বরে। ঐ যাত্রায় সত্য-মিথ্যা জানা হয়নি।

দেখুন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *আত্মজীবনী: দুই যাত্রায় এক যাত্রী*, *সাপ্তাহিক*। http://www.shaptahik.com/v2/print_publication/index.php?DetailsId=4128 (৮ জুন ২০১৩ তারিখে সংগৃহীত)। ১৯৭৩-এ উপরোক্ত ঘটনার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ছিলেন ড. আবদুল মতিন চৌধুরী এবং শিক্ষকদের তরফ থেকে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিবাদ দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, মতিন চৌধুরী ছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর দ্বিতীয় উপাচার্য।

৫

মুজিব বাহিনী থেকে রক্ষীবাহিনী : পটভূমি, বিকাশ ও বিস্তৃতি

৫.ক. ভারতে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণের প্রধান দিক : রাজনৈতিক প্রশাসন দখল ও কমিউনিস্টদের মোকাবেলা

> এই বাহিনীর (মুজিব বাহিনীর) সদস্যভুক্তির জন্য সর্বাধিনায়ক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে শেখ ফজলুল হক মণি'র প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেই শপথনামা পাঠ করা হতো।
>
> –মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১*, পৃ. ৭১

> আমরা যখন শিবপুরে (নরসিংদী) পাক বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করে চলেছি তখন ভারতের মাটিতে আওয়ামী লীগের একটা মহল থেকে আমাদের বিরুদ্ধে শুরু হয় এক গভীর ষড়যন্ত্র। ...সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বিএলএফ-এর একটি দল শিবপুরে আসে। এই দলের সঙ্গে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তাদের গোপন উদ্দেশ্য ছিল মান্নান ভাইকে (আবদুল মান্নান ভূঁইয়া) হত্যা করা। কিন্তু শিবপুরে এসে এবং আমাদের কার্যক্রম দেখে তারা বুঝতে পারে– মান্নান ভাইকে হত্যার কোন রকম প্রচেষ্টা নিলে তারা কেউ আর শিবপুর থেকে ফিরে যেতে পারবে না।
>
> –হায়দার আকবর খান জুনো, মুক্তিযোদ্ধা[৩২৯]

---

৩২৯ ১৯৭১ সালে দেশের অভ্যন্তর থেকে স্ব-উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ গড়ে তোলার যেসব প্রচেষ্টা ছিল তার মধ্যে নরসিংদী জেলার শিবপুরের অভিজ্ঞতা অনন্য। 'কমউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি'-এর পরিচালনায় এখানে বিশাল এক মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠেছিল আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, হায়দার আকবর খান জুনো প্রমুখের নেতৃত্বে। বামপন্থীদের এই ধারার অন্যান্য নেতা ছিলেন কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন ও হায়দার আকবর খান রনো। দেখুন, *একাত্তরের রণাঙ্গন: শিবপুর*, দীপ্র প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১।

উল্লেখ্য, নরসিংদীতে মুক্তিযুদ্ধের আরেকজন বিখ্যাত সংগঠক ছিলেন ন্যাভাল সিরাজ (পুরো নাম সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে চাকরি করতেন বিধায় তাঁকে *ন্যাভাল সিরাজ* বলা হতো)। আবদুল মান্নান ভূঁইয়াদের সঙ্গে সমন্বয় করেই তাঁর বাহিনী যুদ্ধ করছিল। একাত্তরে আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার হত্যা চেষ্টা সফল না হলেও যুদ্ধের পর বাহাত্তরের জানুয়ারিতে ন্যাভাল সিরাজ খুন হয়ে যান একই শক্তির হাতে। বামপন্থী

ইতোপূর্বে (৪.ক ও ৪.ঘ উপ-অধ্যায়ে) বলা হয়েছে, একাত্তর-পূর্ব পাকিস্তানে মনোযোগ আকর্ষণী একটি ভাষাগত প্রপঞ্চ ছিল 'সোনার বাংলা'। মুজিব এবং সিরাজুল আলম খান অনুসারীরাই এই জাদুকরী শব্দযুগলের সবচেয়ে উচ্চকিত প্রচারক ছিলেন। যুদ্ধের পর সিরাজপন্থীরা পুরানো শ্লোগান বদলে নতুন আরেকটি প্রপঞ্চ হাজির করে– 'সমাজ বিপ্লব'। এবারও তাদের 'সমাজ বিপ্লব'-এর আওয়াজ বিদ্যুতায়িত করে তোলে শিক্ষাঙ্গনগুলোকে। তবে সিরাজুল আলম খানরা 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়ে এসময় নতুন দল গড়ার কাজে নেমে পড়লেও মুজিব বাহিনীতে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে গতানুগতিক বাম শিবিরে তখন বিস্তর প্রশ্ন। মুজিব বাহিনী সংক্রান্ত আলোচনায় যে প্রশ্নগুলো এসময় খুব যৌক্তিকভাবে উঠছিল, তা হলো, ভারত কেন মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি এ ধরনের একটি ভিন্ন বাহিনী গঠনে ভূমিকা রেখেছে? তাছাড়া, যাদের নিয়ে এ বাহিনী গড়ে ওঠে তাদের অতীত সম্পর্কে কতটুকু অবহিত ছিল ভারত কিংবা এরূপ যোগাযোগ কতটা পূর্ব থেকে ছিল? ইত্যাদি।

এ লেখায় ইতোমধ্যে দেখানো হয়েছে, মুজিবের পছন্দকৃত ব্যক্তি ডা. আবু হেনা ও চিত্তরঞ্জন সূতারের মাধ্যমেই ছাত্র-যুবনেতাদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটেছিল। সুতরাং আওয়ামী ও মুজিবের প্রতি এদের আনুগত্য ভারতের কাছে ছিল সন্দেহাতীত। ভারতীয় গোয়েন্দারা নিজস্ব সূত্রেও যে যুবনেতাদের সম্পর্কে 'নিঃসন্দিগ্ধ' ছিল সে বিষয়ে উবানের ভাষ্য ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধে মুজিবের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব সম্পর্কে চার নেতার মধ্যে কোন দ্বিমত ছিল না। ভারত মনে করেছে এরাই মুজিবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী অনুসারী। তবে সিরাজুল আলম খানদের সমাজতান্ত্রিক অভিলাষ সম্পর্কে ভারত শুরুতে অবহিত ছিল বলে মনে হয় না। কিংবা তারা এটাকে বিপজ্জনক মনে করেনি। শ্রেণিসংগ্রামের ধারণা বর্জিত মধ্যবিত্ত তরুণদের এইরূপ সমাজতান্ত্রিক মনোভঙ্গি এক ধরনের কৌশলগত ভাবালুতা বলেও প্রতীয়মান হয়ে থাকতে পারে। কারণ বরাবরই সিরাজুল আলম খানরা 'মুজিবের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র কায়েমে'র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন[৩৩০] এবং ভারতীয় জাতীয়

রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতাই তাঁকে মুজিব বাহিনীর কালো তালিকায় ফেলে দেয়।

৩৩০ এ বিষয়ে চমৎকার এক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ২০১২ সালের আগস্টে ড. আবুল হোসেন ভূইয়া, যিনি আলাপচারিতার সময় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ভাষায় : দেরা দুনে বিএলএফ-এর প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে যুদ্ধের কলাকৌশল শেখা ছাড়াও সুযোগ পেলেই আমরা আলাপ জুড়ে দিতাম *স্বাধীন বাংলাদেশ কী রূপ নেবে* সে সম্পর্কে। লক্ষ্য করা যেত মনিরুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল তখন বলতো *মুজিব যা বলবেন সেভাবেই গড়ে তুলবো আমরা দেশ*। আরেক গ্রুপ *মুজিবের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র* গড়ার কথা বলত– এদের নেতা ছিলেন আফতাব আহমাদ। প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে শেষোক্ত বক্তব্যের আবেদন ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক। (এটা

কংগ্রেসেরও সেসময় নিরীহ ধাঁচের এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি ও ইমেজ ছিল। অনেক পর্যবেক্ষকের দাবি, নিজস্ব ক্যাডারদের সমাজতন্ত্রমুখী শ্রেণি উপাদান মুক্ত রাখার জন্য মুজিব বাহিনীর রিক্রুটমেন্টকারীরা ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। এ প্রসঙ্গে যুদ্ধকালীন যুবশিবিরের মহাপরিচালক এস আর মীর্জা বলেছেন,

> '...মুজিব বাহিনীতে একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি, এই বাহিনীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবার ছাড়া কোন গরিব কিংবা চাষী পরিবারের ছেলেদের নেওয়া হয়নি। কোন শ্রমজীবী মানুষকেও এই বাহিনীতে নেওয়া হয়নি। তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল এই আন্দোলন বা যুদ্ধ যাতে বামপন্থীদের হাতে চলে না যায়। সে জন্যই কোন গরিব মজুর, চাষী বা সাধারণ ঘরের মানুষকে নেয়া হয়নি। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের যে গেরিলা বা গণবাহিনী– সার্বিকভাবে যারা ছিল মূলধারার মুক্তিযোদ্ধা, তাদের ৭০ ভাগই ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষত কৃষক পরিবারের।...মুজিব বাহিনী ছিল ডানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল একটি বাহিনী।'[৩৩১]

এস আর মীর্জার বক্তব্যের শেষাংশ সম্পর্কে প্রবল ভিন্নমত পোষণ করেও রিক্রুটমেন্ট সম্পর্কিত ওইরূপ বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের মুজিব বাহিনী সদস্য জিয়ারুল ইসলাম (পঞ্চম ব্যাচ)। এই বাহিনীতে তিনি রিক্রুট হন নদীয়ার করিমপুরের শিকারপুর ক্যাম্প থেকে। তাঁকে রিক্রুট করেন কুষ্টিয়ার আবদুল বারী– যার ঊর্ধ্বতন নেতা ছিলেন নূর আলম জিকু। যুদ্ধ শেষে জিয়ারুল ইসলাম শিক্ষা জীবনে ফিরে যান এবং তারপর সরকারি চাকরিতে। দীর্ঘ পেশাগত জীবন শেষে বর্তমানে অবসরে থাকা জিয়ারুল ইসলাম ২০১৩ সালের ৯ অক্টোবর ঢাকায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে শিকারপুর ক্যাম্পের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'মুজিব বাহিনীর সংগঠকরা ক্যাম্পে শুধু শিক্ষিত তরুণদের খুঁজতেন। অন্যদের আলাদা করে রাখা হতো– যারা আবার সুযোগ পেলেই মুক্তিবাহিনীতে চলে যেত। আর আমাদের, অর্থাৎ মুজিব বাহিনীর জন্য বাছাইকৃতদের বোঝানো হতো, এই বাহিনী হবে আলাদা। এটা হবে একটা পলিটিক্যাল গেরিলা ফোর্স। এটা একটা এলিট বাহিনী। এই ফোর্স দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লড়বে; মূলত মুজিবের বাহিনী হবে। সাধারণ যুদ্ধ তো সেক্টরভিত্তিক হচ্ছেই...এই বাহিনীর কাজ হবে মুজিবের আদর্শ রক্ষা করা।...শিলিগুড়িতে আমাদের প্রশিক্ষণ-

---

অস্বাভাবিক নয় যে, ১৬ ডিসেম্বরের পর মনিরুল হক চৌধুরী প্রমুখ মণির অনুসারী হয়েছেন এবং আফতাব আহমাদ প্রমুখ সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে জাসদ গঠন করেছেন। তবে 'মুজিবের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র' কায়েমের কোনো সুযোগই পাননি তাঁরা। পাশাপাশি এও দেখতে হয়েছে, মনিরুল হক চৌধুরী পরবর্তী জীবনে জেনারেল এরশাদের দলে যোগ দিয়েছেন এবং আফতাব আহমাদ বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন– *লেখক*।)

৩৩১ এ কে খন্দকার ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০-১২১।

পূর্ব যে ব্রিফিং হয় (৫ আগস্ট) সেখানেও সিরাজুল আলম খান দীর্ঘ বক্তৃতায় জানান, এ যুদ্ধের মহানায়ক মুজিব। মুজিবের কারণেই ভারত সাহায্য করছে। আমাদের বাহিনীকে পলিটিক্যাল কাজ করতে হবে। চীন এ যুদ্ধে সমর্থন দেয়নি। অথচ দেশের ভেতরে চীনের বহু সমর্থক রয়েছে। এদের কমব্যাট করতে হবে। এদের মটিভিশন থেকে জনগণকে রক্ষা করতে হবে।'

এ পর্যায়ে ২ নম্বর সেক্টরে মেজর এ টি এম হায়দার বীর উত্তমের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া ঢাকার একজন মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল কাদের রাজু'র একটি অভিজ্ঞতা তুলে ধরাও প্রাসঙ্গিক হবে। সিরাজুল কাদের ছিলেন রসায়ন প্রকৌশলী এবং ছাত্রলীগ না করলেও ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় সংগঠকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সূত্রে তাঁর বন্ধু ছিল। মুজিব বাহিনী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা হলো :

> "কলকাতা থেকে আগরতলা যাই ট্রেনিং নেয়ার জন্য। মেলাঘরে গেলাম। ওখানে দেখা হলো তোফায়েল, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রব প্রমুখের সঙ্গে। সিরাজুল আলম খান বললেন, ট্রেনিং নেবে, সেতো খুবই ভালো কথা। তবে আর্মস এন্ড এ্যামুনেশন নিয়ে দেশে ঢোকার পরে যুদ্ধ করো না। সব কিছু ভাঁজ করে ফেলো পলিথিনে ভরে। দেশ স্বাধীন ইন্ডিয়ায়ই করবে। আমাদের লড়তে হবে মুজিববাদ বিরোধীদের সঙ্গে। তারাও এখন দেশে যুদ্ধ না করে অস্ত্র ডাম্প করছে। তুমি লড়বে মুজিববাদের জন্য। ...বেশ তর্ক হয়েছিল সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে। রাগারাগি করেই বেরিয়ে এসেছিলাম সেখান থেকে।"[৩৩২]

প্রশিক্ষণকালে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের কী ধরনের রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হতো সেটাও এ পর্যায়ে বিবেচনাযোগ্য এক জরুরি প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রে বিএলএফ-এর অন্যতম জনপ্রিয় মুখ এবং পরবর্তীকালে জাসদ ছাত্রলীগের অন্যতম চুম্বক সংগঠক আ ফ ম মাহবুবুল হক বলেছেন, 'বিএলএফ-এর প্রথম ব্যাচ হিসেবে আমাদের সামনে বক্তব্য তুলে ধরা হলো, ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পর্যুদস্ত অবস্থা থেকে উন্নীত হয়ে ভারত এই অঞ্চলের সামরিক শক্তি হিসেবে আস্থাযোগ্য অবস্থায় এসে পুনরায় দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধী পরাশক্তিদের মোকাবেলা করে এই যুদ্ধে সহযোগিতা করা ও তাকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া তার জন্য অসুবিধাজনক হবে না। আমরা যারা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছি, তাদের যেমন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে, তেমনি কমিউনিস্টদেরও মোকাবেলা করতে হবে।'[৩৩৩]

---

৩৩২ পুরো সাক্ষাৎকারের জন্য দেখুন, আফসান চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১১।

৩৩৩ আ ফ ম মাহবুবুল হক, *বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স : একটি পর্যালোচনা*, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা, সম্পাদনা : মেসবাহ কামাল, গণপ্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৬৩। গুরুত্ব বিবেচনায় এই লেখাটি পরিশিষ্টে যুক্ত করা হলো। দেখুন, *সংযুক্তি: দুই*।

আরেক সংগঠক ও প্রশিক্ষণার্থী আফতাব আহমাদ প্রশিক্ষণকালীন বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, 'মোটিভেশন ক্লাসে এ রকম বলা হতো, একজন রাজাকারকে যদি তোমরা ধর– তাকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবে। প্রয়োজনে তথ্য পেতে কিছু শারীরিক নির্যাতনও করতে পারো। তথ্য সংগ্রহ শেষে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেবে। আর যদি কোনো কমিউনিস্টকে ধরো সঙ্গে সঙ্গে প্রাণসংহার করবে।'[৩৩৪]

কেবল নিজ উদ্যোগে কমিউনিস্টদের পাকড়াও ও প্রাণসংহারের শিক্ষাই নয় মুজিব বাহিনীর সদস্যরা কমিউনিস্ট কর্মীদের আটক বা নির্মূল করার ক্ষেত্রে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকেও সহায়তা করত। কমিউনিস্ট নেতা হায়দার আকবর খান রনো এ বিষয়ে জানাচ্ছেন :

> ...ভারতে চলাফেরা আমাদের জন্য নিরাপদ ছিল না। চীনপন্থী সন্দেহে অনেক ন্যাপ ও কমিউনিস্ট কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। অনেকের কোন হদিসও পাওয়া যায়নি। একবার ত্রিপুরায় কিছু সংখ্যক ন্যাপ কর্মী গ্রেফতার হলে আমরা সিপিএম অফিসে গিয়ে খবরটা জানাই। সিপিএম নেতা কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে আগরতলায় অবস্থিত আওয়ামী লীগ অফিসে যান এবং শেখ ফজলুল হক মণি'র কাছে এই গ্রেফতারের কারণ জানতে চান। মণি উত্তর দেন, 'আমরা তো কিছু জানি না, এটা তো ভারত সরকার...।' নৃপেন চক্রবর্তী বেশ রেগে গিয়েই উত্তর দিলেন, আপনারা খবর না দিলে কি করে ভারত সরকার জানবে কে ন্যাপ, কে কমিউনিস্ট আর কে আওয়ামী লীগ?...দেখুন, এ দেশে থাকতে হলে এ দেশের জনগণের সহযোগিতা নিয়েই থাকতে হবে। সিপিএম এখানকার জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যথায় মাসি-পিসি (অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী) কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না।' আশ্চর্যজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করলাম, নৃপেন চক্রবর্তীর এই হুমকির পরই আটক ন্যাপ কর্মীরা ছাড়া পান।[৩৩৫]

স্পষ্টত এখানে এস আর মীর্জা, আ ফ ম মাহবুবুল হক, অধ্যাপক আফতাব আহমাদ এবং হায়দার আকবর খান রনোর বক্তব্য অনেকাংশে মিলে যাচ্ছে। সিরাজুল কাদের রাজু'র অভিজ্ঞতারও উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে বাংলাদেশের তরুণদের মাঝে এভাবে সমাজতন্ত্রীদের মোকাবেলার পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর এটা বলা অবশ্যই প্রশ্নসাপেক্ষ যে, 'আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যকার সমাজতন্ত্রের আদর্শিক মিল'ই ভারতকে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সহযোগিতায় উৎসাহিত করে থাকবে। ভারত স্পষ্টত

---

৩৩৪ দুঃসময়ের চালচিত্র : সরাসরি, *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ১৫ এপ্রিল ২০০০।

৩৩৫ হায়দার আকবর খান রনো, *রাজনীতির কথা প্রসঙ্গে*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ:. ১০৪।

পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা, অত্র অঞ্চলে মাওপন্থী বিদ্রোহের বিস্তৃতি প্রতিরোধ এবং তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর স্বাধীনতার সংগ্রামকে প্রতিরোধের জাতীয় স্বার্থেই লড়ছিল।

এ প্রসঙ্গে সেই সময়কার একজন বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা কাজী জাফর আহমদ-এর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটিও উল্লেখ করা যেতে পারে– যা তিনি বয়ান করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ১৫ শ' খণ্ডে (১৯৮৫; পৃ. ২০২) :

> দেশে ফেরার পথে জুনের মাঝামাঝি আগরতলায় আমাকে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' আটক করে নিয়ে যায় শিলংয়ের একটি ডাকবাংলোয়। সেখানে আমাকে সাতদিন রাখা হয়। ঘটনাটিকে আমি গ্রেফতার বলবো না। কেননা কোন খারাপ আচরণ করা হয়নি। কিন্তু সাত দিনব্যাপী অবিরাম প্রশ্নের মাধ্যমে আমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়। আমাকে প্রশ্ন করছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান মি. সুব্রামনিয়াম। তিনি অবশ্য সমগ্র ব্যাপারটিকে 'নিজেদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ আলোচনা' হিসেবে বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই আলোচনায় দেশের অতীত ও বর্তমান রাজনীতিতে বামপন্থীদের ভূমিকাসহ বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসেছিল। তিনি বারবার আওয়ামী লীগ ও ভারতের প্রতি বামপন্থীদের মনোভাব সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন।...

বামপন্থা ও বামপন্থীদের প্রতি এইরূপ সতর্ক মনোভাবের আবহেই 'র' মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছিল। মাঠ পর্যায়ে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের আচরণ থেকেও বিএলএফ-এর প্রশিক্ষণ কারিকুলাম সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। যুদ্ধকালের অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে নবম সেক্টরের স্টাফ অফিসার ওবায়দুর রহমান মোস্তফা লিখেছেন, 'মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর যদিও লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা, কিন্তু দুই বাহিনীর হাইকমান্ড ভিন্ন থাকায় যুদ্ধকালে মাঝে মাঝে রণক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।...মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে ওদের খতম করাসহ গোলাবারুদ ও স্থাপনা ধ্বংস এবং অধিগ্রহণ করে নিত। কিন্তু মুজিব বাহিনীর মূল কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সৃষ্ট মুক্তাঙ্গনে রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ও দৃষ্টিকোণ দিয়ে ঐসব এলাকায় বিজয় পরবর্তী বেসামরিক প্রশাসনসহ স্থানীয়ভাবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শগত অবস্থান দৃঢ় করা।...মুক্তিযোদ্ধারা দলমত নির্বিশেষে যুদ্ধ করেছে দেশ শত্রুমুক্ত করতে, বেসামরিক প্রশাসন দখল বা রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা নজর দেবার মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করেনি। মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সেভাবেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করত।'[৩৩৬]

---

৩৩৬ ওবায়দুর রহমান মোস্তফা, *মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টর ও আমার যুদ্ধকথা*, ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০৭, ঢাকা, পৃ. ১২০।

নোয়াখালী অঞ্চলের বিএলএফ সংগঠক আ ও ম শফিক উল্ল্যাহ্'র বক্তব্য থেকেও ওবায়দুর রহমান মোস্তফা'র বক্তব্যের সত্যতা মেলে। শফিক উল্ল্যাহ্ সাক্ষাৎকারে বলছেন, 'নেতৃস্থানীয় বিএলএফ কমান্ডারদের আমাদের লিডাররা বলতেন, বেশি ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজন নেই। এমুহূর্তে সিরিয়াস যুদ্ধে involve হওয়া যাবে না। রাজাকার নিধনই যথেষ্ট। ঝুঁকি নেয়ার সময় এলে আমরা তোমাদের বলবো।...তবে সাধারণ কর্মীদের এসব কথা জানানো হতো না।...আমাদের লিডাররা ভাবতেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে।'[৩৩৭] মুজিব বাহিনীর আরেকজন যোদ্ধা এও জানিয়েছেন, প্রশিক্ষণকালে তাদের এ রকম ধারণাও দেওয়া হয়, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও ভারত কনফেডারেশন গড়ে তুলবে।[৩৩৮]

উপরিউক্ত বয়ানগুলো থেকে এই উপসংহারে আসা যায় যে, ভারত মুজিব বাহিনীর মাধ্যমে ন্যূনতম চারটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে চেয়েছিল : ১. মুক্তিযুদ্ধকালে এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তার নিয়ন্ত্রণাধীন একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক-সামরিক ফোর্সকে প্রস্তুত রাখা। ২. যুদ্ধকালে 'মুক্ত এলাকা'য় এবং যুদ্ধোত্তর সমাজে 'স্বাধীন দেশে'-এর রাজনীতি ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়া। ৩. মুজিব ফিরে না এলে এবং যুদ্ধকালে বা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তাজউদ্দীন ও আওয়ামী লীগের প্রবীণ প্রজন্ম কোনো কারণে ব্যর্থ হলে কিংবা 'বিশ্বাসঘাতকতা' করলে সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স হিসেবে ভারতের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি শক্তিকে সে স্থানে অভিষিক্ত করা। ৪. মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে কট্টর ধারার উদীয়মান বামপন্থী শক্তিকে দমন করা এবং যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সাধারণ আর্থসামাজিক পরিস্থিতির ওপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ নির্বিঘ্ন রাখা। এ ছাড়া ভারত সরকার সে সময় এমন একটি তত্ত্ব দ্বারাও চালিত হচ্ছিল– বাংলা করলে যার অর্থ দাঁড়ায়, 'এক বাক্সে সব ডিম রেখো না।'[৩৩৯] এই তত্ত্বের

---

৩৩৭ আ ও ম শফিক উল্ল্যাহ্, *পূর্বোক্ত*।

৩৩৮ মুজিব বাহিনীর এই যোদ্ধা, মেজর (অব.) রেজা, পরে রক্ষীবাহিনীতেও নিয়োগ পান। এই লেখার অন্যত্রও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। মুজিব বাহিনী থেকে রক্ষীবাহিনী পর্যন্ত নানান বিষয়ে ২০১২ সালের জুলাইয়ে ঢাকার ধানমন্ডিতে তাঁর সঙ্গে লেখকের আলাপচারিতা হয়।

দেরা দুনের তান্দুয়া ক্যাম্পের পঞ্চম কোর্সের আরেক প্রশিক্ষণার্থী জিয়ারুল ইসলাম জানান, 'প্রশিক্ষণকালে আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানানভাবে ধারণা দেয়া হতো যে, বাহিনীটি ইন্দিরা গান্ধীর আশীর্বাদপুষ্ট। যেমন এক সেট শার্ট-প্যান্ট দেয়ার সময় বলা হতো এটা ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষ থেকে উপহার। কিংবা শরীরচর্চা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে শেষপর্যায়ে এলে বলা হতো এবার ইন্দিরা গান্ধির নামে একটা ফ্রগ জাম্প দাও তো, ইত্যাদি।' সাক্ষাৎকার, *পূর্বোক্ত*।

৩৩৯ সাক্ষাৎকার, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র (১৫ শ' খণ্ড)*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫। প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন সম্প্রতি ভারত থেকে পদ্মভূষণ খেতাবপ্রাপ্ত

ধারাবাহিকতা আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পরও লক্ষ্য করবো মুজিব বাহিনীর পরবর্তী বিকাশ ধারায়। তাজউদ্দীনকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিলেও ভারতীয়দের কিছু কিছু পরিকল্পনা মুজিব আরও অধিক যত্নের সঙ্গে এগিয়ে নিতে শুরু করেন। এসময় আওয়ামী লীগ ও মুজিবের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐকতানের নানারূপ মূর্ত হয়ে উঠতে শুরু করে। একদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাকে ভারতীয় শাসক কংগ্রেসের তাত্ত্বিকরা দ্বিজাতিতত্ত্বের সংশোধন, উপমহাদেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদের কাঠামোগত বিপর্যয় এবং পাকিস্তানের এক অংশের ভারতের কাছে প্রত্যাবর্তন হিসেবে যেমন দেখছিলেন– তেমনি নেহেরু জ্যাকেটের আদলে 'মুজিব কোর্ট' চালু, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরোক্ষ সহায়তা দিতে মুজিবের সেখানে গিয়ে বক্তৃতার প্রস্তাব, তাঁকে মহাত্মা গান্ধীর মানসপুত্র হিসেবে অভিহিত করা ইত্যাদি ছিল উপরিউক্ত পারস্পরিক আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক উচ্ছ্বাসেরই বিবিধ প্রকাশ। উল্লেখ্য, ভারতে কংগ্রেস এসময় নেহেরু মডেলের সমাজতান্ত্রিক আবরণে নকশালবাড়ি বিদ্রোহের মূল উৎপাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চলেছে– আর বাংলাদেশেও ঠিক তখনি 'সমাজতন্ত্র'-এর আওয়াজের মাঝেই 'নকশাল'দের মোকাবেলায় রক্ষীবাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে রক্ষীবাহিনীর আবির্ভাবের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক দিক ছিল এটাই। এটা স্রেফ মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত কোনো সমস্যা ছিল না।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানও। তাঁর ভাষায়, 'ভারতীয় কর্তৃপক্ষ *এক ঝুড়িতে সব ডিম* রাখতে চাননি। বৈধ সরকার ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন সেনাবাহিনীর সমান্তরালে সেই সরকারের প্রকাশ্য সমালোচক একটি সশস্ত্র বাহিনীও তারা গড়ে তোলেন।' দেখুন, *আমার একাত্তর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৫১। উল্লেখ্য, আমিরুল ইসলাম ও আনিসুজ্জামান উভয়ে ছিলেন যুদ্ধকালে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

৫.খ. স্বাধীনতা-উত্তর মুজিব বাহিনী : রক্ষীবাহিনীর গঠন ও আত্তীকরণ প্রক্রিয়া

> আমরা সব সময়ই বর্তমানে বাস করি। কিন্তু বর্তমানের মাঝে থেকেও শুধুই সমকালীন হয়ে থাকা বোধ হয় সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। ইতিহাস নানান চাতুরি জানে। নানান ছদ্মবেশ ধারণ করে সে প্রতিনিয়ত হাজির হয় বর্তমানে। আগের বহু দৃশ্যপট থাকে তার বর্তমানের মুখোশে। এটাই তার এগোবার কৌশল। আমরা তার এসব কৌশল বুঝতে অনেক সময় ব্যর্থ হই, আর তাতে খেলার বহু তাৎপর্য আমাদের বোধবুদ্ধির বাইরে থাকার উপক্রম হয়। প্রতিবারই নাটকের পর্দা যখন ওঠে, অতীত ধারাবাহিকতাটুকু বোঝা জরুরি। তবে না বুঝলে– সেই দোষের ভাগিদার ইতিহাস নয়। সমস্যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদৃষ্টিতে; যে আবার বরাবরই স্মৃতি আর বয়ানে ভারাক্রান্ত থাকে– যা সে শিখেছে এবং দেখেছে অতীতে। বর্তমানকে যখন আমরা আসলে দেখি, তখন অতীতই সেখানে প্রবলভাবে আরোপিত হয়ে থাকে। এমনকি যখন বর্তমানকে এক বৈপ্লবিক কাল বলেও মনে হয়।
>
> *–Regis Debray, Revolution in the Revolution?*[৩৪০]

দু' জন সেক্টর কমান্ডার (কাজী নূরুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম)সহ বহু নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধার ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ভাষ্য থেকেই দেখা গেছে, বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী সম্পর্কে একাত্তরের মূলধারার সশস্ত্র সংগ্রামী অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের[৩৪১] ধারণা ছিল সন্দেহময়– তথা নেতিবাচক। মুজিব বাহিনীর ভিন্ন কমান্ড, তাজউদ্দীন বিরোধিতা, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক এ বাহিনীর প্রতি বিশেষ আনুকূল্য এবং কমিউনিস্ট র‍্যাডিক্যালদের প্রতি এই বাহিনীর আক্রমণাত্মক নীতির কারণেই এমনটি ঘটেছিল। যুদ্ধকালে তৃণমূল পর্যায়ে এই বাহিনীর বাস্তব ভূমিকাও বিস্তর সংশয় এবং অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। ফলে সিরাজুল আলম খানদের দীর্ঘমেয়াদে বিপুল রাজনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিশাল পরিসরে যুদ্ধদিনে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক-সমাজতন্ত্রকামী তারুণ্যের সঙ্গে

---

৩৪০ *Translation from English and Spanish: Bobbye Ortiz, Penguin Books, 1968, p.19* উদ্ধৃতির ইংরেজি থেকে অনুবাদ বর্তমান লেখকের।

৩৪১ 'মুক্তিবাহিনী' পদটি সাধারণত দুই ধরনের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেশের ভেতর থেকে বেসামরিক পেশার যেসব মানুষ গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং যাদের আরেকটি নাম ছিল 'ফ্রিডম ফাইটার'; দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভিন্ন নিয়মিত বাহিনী থেকে যেসব বাঙালি সৈনিক ও অফিসার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং যাদের বলা হতো 'মুক্তিফৌজ' বা 'নিয়মিত বাহিনী'– এই দুইয়েরই সমন্বয়ে 'মুক্তিবাহিনী।' মুজিব বাহিনী ছিল এই ধারার বাইরের ভিন্ন একটি ধারা। মুক্তিবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সব ধারাই মুজিবনগরের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন ও অনুগত ছিল; কিন্তু মুজিব বাহিনী নয়। শেষোক্ত বাহিনীর ছিল পৃথক নিয়ন্ত্রক কাঠামো।

সংযোগ ঘটার বাস্তব সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছে উল্লিখিত সংশয় ও বৈরিতার মধ্য দিয়ে। দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর জাসদকে নিয়ে সমাজের প্রগতিশীল মহলে যে শঙ্কা ও প্রশ্ন কাজ করত তারও উৎস ছিল বিএলএফ-এর সঙ্গে সিরাজুল আলম খানদের সংযুক্তি।[৩৪২] তাছাড়া মাঠ পর্যায়ের সরাসরি যুদ্ধেও সিরাজুল আলম খানরা অবদান রাখতে পেরেছেন খুব কম। এও তাদের সম্পর্কে অবিশ্বাস তৈরিতে জ্বালানি হিসেবে কাজ করেছে। যদিও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অনেকে তাৎক্ষণিকভাবে জানতেন না সিরাজুল আলম খান গ্রুপের অনেকেই যুদ্ধের শেষ মাসে দেরা দুনের তান্দুয়া প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ভারতীয় বাহিনীর হাতে অনেকটা বন্দি দশায় থেকেছেন। সে বিষয়ে ইতোমধ্যে ৩.৬ উপ-অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের আরেকটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। মুজিব বাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'জাতি যখন একটি নেতৃত্বের পেছনে ঐক্যবদ্ধ ও আস্থাবান তখন যুবশক্তিকে নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা বা বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের জন্য যেমন সহায়ক হয়নি, তেমনি পরে দেশ পুনর্গঠনের কাজেও তা অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে। আমীরুল ইসলাম 'মুজিব বাহিনী' গড়ে তোলার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে গোপন রাখার ভারতীয় প্রচেষ্টাকে 'পীড়াদায়ক' বলেও অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান জানিয়েছেন, বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী যখন মুজিব বাহিনীর বিষয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা চাইতেন তখন ইন্দিরা সেটা তার ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করতে বলতেন আর ক্যাবিনেট সেক্রেটারির কাছে ব্যাখ্যা চাইলে তিনি সেটা এড়িয়ে যেতেন– এসবই ছিল (তাজউদ্দীনের জন্য) আত্মসম্মান হানিকর।[৩৪৩] বলাবাহুল্য, অসন্তোষ, ক্ষোভ ও গ্লানি থাকলেও মুজিবনগর সরকার মুজিব বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় পরিকল্পনা থামাতে পারেনি।

---

৩৪২ সিরাজুল আলম খান ও তোফায়েল আহমেদ মুজিব বাহিনীর 'অবিচ্ছেদ্য চার'-এর দু'জন হলেও 'জাসদ' গঠনকে তোফায়েল আহমেদ 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'স্বাধীনতা বিরোধিরা সর্বপ্রথম জাসদের ছত্রছায়ায় সমবেত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। সে দিন (জাসদ গঠনকালে) তারা নিজেদের এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে।' মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৬। মুজিব বাহিনীতে সিরাজুল আলম খানের আরেক সহযোদ্ধা আবদুর রাজ্জাক জাসদ গঠনকে 'সিরাজুল আলম খানের পশ্চিমবঙ্গে অতিবামদের সঙ্গে মেলামেশার ফল' হিসেবে অভিহিত করেছেন। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯। পাঠকের হয়তো স্মরণ রয়েছে, ছাত্রলীগের স্বাধীনতা-পূর্ব কথিত 'নিউক্লিয়াস'-এ এই আবদুর রাজ্জাকই ছিলেন সিরাজুল আলম খানের প্রধান সহযোগী।

৩৪৩ আমীরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র* (১৫ শ' খণ্ড), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৩১। আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সমাপ্তির পর মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রধানত পাঁচটি ধারায় নতুন রূপে দেখা যায়। এর প্রধান একাংশকে জাতীয় রক্ষীবাহিনী (জেআরবি)[৩৪৪]তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্য অংশগুলোর বিবরণ দেওয়ার আগে বর্তমান উপ-অধ্যায়ে মুজিব বাহিনীর প্রধান এই বিকাশধারাটির দিকেই যদি আমরা মনোযোগ নিবদ্ধ রাখি তাহলে দেখতে পাবো, রক্ষীবাহিনী ছিল একই সঙ্গে সরকার প্রধানের এমন এক 'নিজস্ব' প্রহরীদল– যাদের কার্যক্রম ছিল ঝড়ো পুলিশের মতো এবং যাদের ভবিষ্যৎ অবয়বটি ফুটে উঠছিল বিকল্প সেনাবাহিনীর আদলে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব যখন ভারতীয়দের হাতে তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ বাহিনী পুনর্গঠনের কাজটি দেশের নিজস্ব ব্যবস্থাপনাতেই হচ্ছিল। এই বৈপরীত্য ছিল বিস্ময়কর ও প্রশ্নবোধক। আরও বিস্ময়কর ছিল পরিকল্পিতভাবেই রক্ষীবাহিনীকে রাখা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর অধীনে– স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়। আবার এই বাহিনীর পোশাক রাখা হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো। রক্ষীবাহিনীর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার এ.এন.এম নূরুজ্জামান 'বাকশাল'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ১১২ নম্বর সদস্য ছিলেন।[৩৪৫] ১৯৭৪ সালের ২৫ জানুয়ারি দৈনিক গণকণ্ঠে প্রকাশিত জাতীয়

---

৩৪৪ প্রথমে এই বাহিনীর নাম নিয়ে বিভিন্নমুখী চিন্তা ছিল। একটা মত ছিল– এর নাম হবে 'বেঙ্গল মিলিশিয়া', আরেকটা মত ছিল– এর নাম হবে এনএসএফ বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্স। শেষপর্যন্ত অবশ্য এর নাম হয় রক্ষীবাহিনী। মুজিব বাহিনীর 'অতি অনুগত' একাংশ ছাড়াও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বহু সংখ্যক নতুন রিক্রুমেন্টও হয়েছিল এ বাহিনীতে। বিশেষত অফিসার পর্যায়ে ৫ম থেকে পরবর্তী ব্যাচগুলো। তবে মুজিব বাহিনীর সদস্যরাই ছিল রক্ষীবাহিনীর মূল 'নিউক্লিয়াস'–যেভাবে ছাত্রলীগে একটি নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব দেখেছি আমরা পূর্বে। রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা সারোয়ার হোসেন মোল্লা দাবি করেছেন, তাদের বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ১২ হাজার। দেখুন, কর্নেল সারোয়ার বলছি, *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২ নভেম্বর, ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৪। অন্যদিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বেঙ্গল ল্যান্সারের প্রথম অধিনায়ক মেজর নাসির উদ্দিন– যিনি রক্ষীবাহিনীর একাংশের সঙ্গে তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানেরও অন্যতম সংগঠক– রক্ষীদের সংখ্যা '১৬ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল' বলে দাবি করেছেন। দেখুন, *গণতন্ত্রের বিপন্নধারায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৭৫।

৩৪৫ এ পর্যায়ে নূরুজ্জামান সম্পর্কে আরও কিছু বিবরণ তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে। একটি রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রধান করা হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তিনি ছিলেন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত একজন ক্যাপ্টেন মাত্র। নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার সায়েদাবাদ গ্রামে তাঁর জন্ম। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র ২৮ নং অভিযুক্ত ছিলেন তিনি। পাকিস্তান সেনবাহিনী থেকে ক্যাপ্টেন হিসেবে অবসর দেয়া হলে ব্যবসায় যুক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেও তিনি ঠিকাদারিতে নিযুক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ১৯৭১ সালের জুনে তিনি ৩ নং সেক্টরে শফিউল্ল্যাহ'র বাহিনীতে যোগ দেন। '৭১-এর জুন থেকে '৭২-এ রক্ষীবাহিনীর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর মাঝ পথে মাত্র কয়েক মাসে তিনি কয়েক দফা পদোন্নতি পেয়ে

সংসদের প্রশ্নোত্তরের বিবরণ থেকে দেখা যায়, কেবল ১৯৭৩ সালে রক্ষীবাহিনী ৪ হাজার ১৯৬ ব্যক্তিকে আটক করেছিল।

রক্ষীবাহিনীর গঠন প্রক্রিয়ায় মুজিব বাহিনী তথা এই বাহিনীর প্রধান চার নেতার কীরূপ প্রভাব কাজ করেছে তার একটি উদাহরণ হিসেবে এই বাহিনীর উপপরিচালক সারোয়ার হোসেন মোল্লার নিয়োগ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাষ্যকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। সারোয়ার হোসেন মোল্লা ছাত্রাবস্থায় মাদারিপুরের নাজিমুদ্দিন কলেজে রাজনীতি করতেন। মুজিব বাহিনী সৃষ্টি হলে তিনি এই বাহিনীর প্রথম ব্যাচে অন্তর্ভুক্ত হন এবং মাদারিপুর অঞ্চলের 'কমান্ডার' হিসবে দেশে প্রবেশ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিব বাহিনীর কার্যক্রমে কেন্দ্রীয়ভাবে এই অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণ করতেন তোফায়েল আহমেদ। তবে রাজনৈতিকভাবে সারোয়ার মোল্লা ছিলেন মুজিব বাহিনীর চার প্রধান সংগঠকের অন্যতম আবদুর রাজ্জাকের যোগসূত্রের। আওয়ামী লীগ নেতা ফণিভূষণ মজুমদারেরও খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। রক্ষীবাহিনীতে নিয়োগের পটভূমি তুলে ধরে সারোয়ার মোল্লা লিখেছেন :

> ৩০ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর কাছে অস্ত্রসমর্পণ করার জন্য আমরা ৮-১০টি লঞ্চযোগে মাদারিপুর থেকে ঢাকায় আসি।

যান। নূরুজ্জামানের মতোই সুপ্রসন্ন ছিল তাঁর বাহিনীরও ভাগ্য। যুদ্ধোত্তর সংকটে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন যখন নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে– রক্ষীবাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া আর্থিকভাবে তখন ছিল স্বচ্ছন্দ। আট হাজার জনবল নিয়ে শুরু হলেও দ্রুত তা ২৫ হাজারে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। মাঠ পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের পাশাপাশি তাদেরও নিয়োগ করে সরকার। কিন্তু তার অপারেশনের ধরন 'রাষ্ট্রীয়' না হয়ে 'দলীয়' রূপ পরিগ্রহ করে। জাসদসহ বিরোধী দলকে প্রতিরোধে এই বাহিনীর ভূমিকা প্রতিবাদের জন্ম দিচ্ছিল। এভাবে সমাজে যে বিরূপতার জন্ম হয় জাসদ তা রাজনৈতিকভাবে পুঁজি করতে শুরু করে। জাসদ, সর্বহারা পার্টি ও রক্ষীবাহিনীর এই সংঘাত মাঠ পর্যায়ে চরম অরাজক অবস্থা তৈরি করে। তৃণমূলের সবচেয়ে অগ্রসর ও সাংগঠনিকভাবে দক্ষ রাজনীতিকরা খুন হতে থাকেন। শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত এই পরিস্থিতি বহাল থাকে। এতে দেশজুড়ে সমাজের ভেতরে কয়েক দশক ধরে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সামর্থ্য ভেঙে পড়ে। আশির দশকে এসে সে স্থান অন্যভাবে পূরণ হয়। দেশে নতুন আদলে বিদেশি প্রভাবের পথও সুগম করে তোলে তা। রক্ষীবাহিনী সৃষ্টির এই নেতিবাচক দিক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সেই সময়কার সেনাকর্মকর্তা মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী লিখেছেন,

> "যারা সে সময় রক্ষীবাহিনীর সদস্য নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, পোশাক ও পরিচালনা ইত্যাদির ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাদের এরূপ বাহিনী সম্পর্কে জ্ঞান, মেধা ও দূরদর্শিতার প্রচণ্ড অভাব ছিল অথবা সজ্ঞানে তাঁরা নিজেদের হীন স্বার্থে সরকারকে বিপথগামী করেছিলেন।...রক্ষীবাহিনী নিয়ে বিভিন্ন স্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং সত্য-মিথ্যা নানানরকম রটনার কারণে সরকারি প্রশাসনের ওপর কালিমা পড়ে। এই অবস্থা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তায়ও চিড় ধরায়।" দেখুন, *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য: স্বাধীনতার প্রথম দশক*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০, ঢাকা, পৃ. ৩৯-৪০।

> সদরঘাটে আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই, তোফায়েল ভাই উপস্থিত ছিলেন। তোফায়েল ভাই প্রথমে আমাকে বলেন, তোমার জন্য একটি নতুন দায়িত্বের কথা চিন্তা করেছি। মণি ভাই তোমাকে জানাবে। এরপর সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাইও আমাকে একই কথা বললেন। ব্যাপারটি আমার কাছে রহস্যজনক মনে হলেও কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। অস্ত্রসমর্পণের পরদিন সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই, তোফায়েল ভাই আমাকে নিয়ে মণি ভাইয়ের বাসায় যান। মণি ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর অফিসে যাই। সেখানে আনোয়ার উল আলম শহীদের সঙ্গে দেখা হয়। বঙ্গবন্ধু আমাকে দেখে বললেন,...আমি একটা নতুন ফোর্স করতে চাই। কমান্ডার যাকে বানাবো সে ইতোমধ্যে নির্ধারণ হয়ে আছে। আমি দু'জন ডেপুটি কমান্ডার চেয়েছিলাম। মণি-সিরাজ-রাজ্জাক-তোফায়েল তোকে এবং শহীদকে সিলেক্ট করেছে।'[৩৪৬]

সারোয়ার হোসেন মোল্লার উপরিউক্ত ভাষ্য থেকে রক্ষীবাহিনীর গঠন উদ্যোগের একেবারে শুরুর দিককার কিছু দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় বটে তবে তা অতি সামান্য– যদিও সেখান থেকেই শুরু করা যেতে পারে স্বাধীন বাংলাদেশের অভিনব এই সামরিক কাঠামোর উদ্ভব, বিকাশ ও আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান অধ্যায়। নূরুজ্জামান ও সারোয়ার মোল্লার পর এই বাহিনীতে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ছিল আনোয়ার উল আলম শহীদের। তিনি ছিলেন টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। বলা বাহুল্য, পুরোপুরি রাজনৈতিক নিয়োগ ছিল এগুলো।

---

৩৪৬ সারোয়ার মোল্লার উপরোক্ত ভাষ্য নানান দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মুজিব বাহিনীর প্রধান চার সংগঠকই যে সংশ্লিষ্ট ও সক্রিয় ছিলেন এই ভাষ্য তা স্পষ্ট করে। উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় যে জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খানও সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাও দেখা যাচ্ছে তাঁর বক্তব্য থেকে। দ্বিতীয়ত. ইতোমধ্যে এ লেখায় যেমনটি বলা হয়েছে, শুধু মুজিব একা নন– তাঁর অনুপস্থিতিতে গড়ে ওঠা 'মুজিব বাহিনী' এবং বিশেষ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে রক্ষীবাহিনীর গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত এবং বাহিনীর মানবসম্পদ এবং যান্ত্রিকসম্পদ– অনেকখানিই উপরোক্ত সম্মিলিত প্রক্রিয়ারই ফসল– তা অনেকটা স্পষ্ট হয় রক্ষীবাহিনীর উপ-পরিচালক জনাব মোল্লার বক্তব্য থেকে। দেখুন, *কর্নেল সারোয়ার বলছি*–দ্বিতীয় কিস্তি, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২ নভেম্বর ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৪।

রক্ষীবাহিনীর সরঞ্জাম ও পোশাক পাওয়ার বিষয়টি কীভাবে সরাসরি এ বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে জেনারেল উবানের স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল বি এন সরকারের Civil Affairs Organization-CAO-এর মাধ্যমে সমাধা হতো তার মনোযোগ আকর্ষণী বিবরণ দেখুন, আনোয়ার উল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭। অন্যদিকে CAO সম্পর্কে দেখুন বর্তমান গ্রন্থের ৪.ক উপ-অধ্যায়।

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথম দিকে রক্ষীবাহিনী নামক সামরিক কাঠামোটির মূল জনশক্তি এসেছিল মুজিব বাহিনী থেকে। যেহেতু এই বাহিনী নিয়ে নীতিনির্ধারক মহলে ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল সে কারণে মুজিব বাহিনীর বাইরের কিছু 'বিশ্বস্ত' মুক্তিযোদ্ধারও অন্তর্ভুক্তি ঘটে তাতে। এমনকি এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা নন এমন সামরিক কর্মকর্তাদেরও নেয়া হয় এই বাহিনীতে। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত কিছু আর্মি অফিসারও রক্ষীবাহিনীতে নিযুক্তি পেয়েছিলেন।[৩৪৭] সেটা হয় বাহিনী প্রধান হিসেবে নূরুজ্জামানের পছন্দ অনুসারে। মেজর এ কে এম আজিজুল ইসলাম, লে. কর্নেল সাবিহ উদ্দিন আহমেদ, মেজর শরিফউদ্দিন আহামেদ এবং ডেপুটি ডিরেক্টর মেজর আবুল হাসান খান ছিলেন সেরকম কয়েকজন। অন্যদিকে রক্ষীবাহিনীতে মুজিব বাহিনী বহির্ভূতদের প্রধান এক অংশ এসেছিল কাদের সিদ্দিকীর মুক্তিযুদ্ধকালীন বাহিনী থেকে। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম ব্যাচের রক্ষী অফিসারদের সেনাবাহিনীর রিক্রুটমেন্টের মতো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বাছাই করা হলেও বাহিনীর মূল শক্তিভিত ছিল মুজিব বাহিনীর সদস্যরাই। এক থেকে চার নম্বর ব্যাচের নিয়োগ সরাসরি মুজিব বাহিনী থেকে হয়েছিল। ৭টি ব্যাচে এভাবে রিক্রুট করা কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৩-৪ শত।[৩৪৮] আনোয়ার উল আলম এই সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে ২১৩ জন বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৪৯] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ রাইফেলস্ ও রক্ষীবাহিনীকে একীভূত করা কিংবা এই দুয়ের সমন্বয়ে জাতীয় একটি মিলিশিয়া গঠনের অস্পষ্ট একটি পরিকল্পনা ছিল নীতিনির্ধারকদের মাঝে প্রথম দিকে। এ নিয়ে উভয় বাহিনীতে ছিল অনাগ্রহ, যার ভিত্তিতে এক দফা বিধ্বংসী সংঘর্ষও হয় পিলখানাতে– যে বিষয়ে ৪.খ উপ-অধ্যায়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে ।

১৯৭২ সালের ৭ মার্চ রক্ষীবাহিনী সম্পর্কিত আইনগত কাঠামোর প্রকাশ্য ঘোষণা আসে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে। তবে তার আগেই ২১ ফেব্রুয়ারি রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের ২১ জুন রক্ষীবাহিনীর প্রথম কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় ৬ ডিসেম্বর। এই বাহিনীর সদর দপ্তর ছিল ঢাকার শেরেবাংলা নগরে (বর্তমানের এরোপ্লেন মোড়ের কাছে)। প্রধান প্রশিক্ষণকেন্দ্র ছিল ঢাকার সাভারে। প্রথমে এর অফিসারদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল আড়াই মাস। পরে তা ছয় মাস করা হয়। বিজ্ঞাপন দিয়ে রিক্রুটদের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ১০ মাসে উন্নীত করা হয়। বাহিনী অন্তর্ভুক্তদের অনেকের ক্ষেত্রে ভারতেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। নাম প্রকাশে

---

৩৪৭ মে. জেনারেল মইনুল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।

৩৪৮ বর্তমান লেখকের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর ৫ম ব্যাচের অফিসার মেজর (অব.) রেজার অপ্রকাশিত আলাপচারিতা থেকে, *পূর্বোক্ত*।

৩৪৯ আনোয়ার উল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫।

অনিচ্ছুক রক্ষীবাহিনীর সপ্তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা– যিনি পরবর্তীকালে লে. কর্নেল পদমর্যাদায় সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন– ২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে ঢাকার নিউডিএইচএস-এ আলাপচারিতায় জানিয়েছেন, ছয় মাস মেয়াদি তাদের মূল পেশাগত প্রশিক্ষণ দেরা দুনেই হয়। ওই কর্মকর্তা এও জানান, প্রশিক্ষণের জন্য দেরা দুন যাওয়ার আগে স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান গণভবনে তাদের নির্দেশনামূলক ব্রিফিং দেন এবং বিদায় জানান। রক্ষীদের ভারতে প্রশিক্ষণের এই প্রক্রিয়া শুরু ১৯৭২ সালের এপ্রিলে– যখন বাহিনীর সর্বোচ্চ স্তরের একটি দল ভারত গমন করে প্রশিক্ষণের জন্য। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ২১ জন্য 'লিডার'– যারা ছিলেন পুরো বাহিনীর মেরুদণ্ডস্বরূপ।

রক্ষীবাহিনীর গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ মিল ছিল ভারতের সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্স-এর। কৌতূহলোদ্দীপক দিক হলো রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্বও পেয়েছিলেন জেনারেল উবান, যিনি ছিলেন 'র'-এর স্পেশাল ফোর্সের ইন্সপেক্টর জেনারেল। এই বাহিনীরও প্রশিক্ষণ হয় মুজিব বাহিনীর যেখানে প্রশিক্ষণ হয়েছিল সেসব ক্যাম্পে। সিআইএ'র সহায়তায় যে সশস্ত্র অবকাঠামো তৈরির পটভূমি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ৩.খ ও ৩.ঘ উপ-অধ্যায়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর জন্য ভারতীয় সরঞ্জাম পরিবহনের জন্য 'এএন ১২' ধরনের বিশেষ পরিবহন বিমানও বরাদ্দ করেছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।[৩৫০]

মুজিব বাহিনীর ধারাবাহিকতা হিসেবে এই বাহিনী গড়ে তোলার বিষয়টি যে রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেকাংশে ভারতীয় নজরদারিতে হয়েছে তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন মুখ্য সচিব পরমেশ্বর নারায়ণ হাকসারের মাধ্যমেই রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষক হিসেবে জেনারেল উবানের নিযুক্তি ঘটেছিল– যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে উবানের পদমর্যাদা ছিল 'প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা'।[৩৫১] প্রকাশ্যে রক্ষীবাহিনীর কমান্ডে ছিলেন ক্যাপ্টেন (পরে কর্নেল এবং ব্রিগেডিয়ার) নূরুজ্জামান। নূরুজ্জামানের পর বাহিনীতে প্রধান কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন মেজর (অব.) আবুল হাসান খান (উপ-পরিচালক, প্রশাসন), লে. কর্নেল সাবিহউদ্দিন আহমেদ (উপ-পরিচালক, সিগন্যালস্), লে. কর্নেল আজিজুল ইসলাম (প্রথমে উপ-পরিচালক, প্রশিক্ষণ এবং পরে কমান্ডার, চট্টগ্রাম), সারোয়ার হোসেন মোল্লা (উপ-পরিচালক, অপারেশন), আনোয়ার উল আলম শহীদ (উপ-

---

৩৫০ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭। আনোয়ার উল আলমের বিবরণ থেকে স্পষ্ট কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের পরও উবানের নেতৃত্বাধীন স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রক্ষীবাহিনীর সরঞ্জাম ও সম্পদের প্রধান উৎস ছিল। রক্ষীবাহিনীর পক্ষ থেকে আনোয়ার উল আলম নিজেই একবার এসএফএফ-এর কেন্দ্রীয় দপ্তরে গিয়েছিলেন এসব সরঞ্জাম আনার জন্য। সেখানে এসএফএফ-এর ব্রিগেডিয়ার ব্রিজভূষণ ভাটনগর এই সরবরাহ ব্যবস্থা তদারক করছিলেন।

৩৫১ এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, জেনারেল উবান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০-৪১।

পরিচালক, প্রশিক্ষণ) প্রমুখ। উল্লেখ্য, পরিচালকের পর উপ-পরিচালকদের মাঝে শেষোক্ত দু'টি পদই ছিল রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এদের দু'জনকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৭৩-এর সেপ্টম্বরে ছয় মাসের জন্য ভারত পাঠানো হয়েছিল। ইতোমধ্যে এও উল্লেখ করা হয়েছে, আনোয়ার উল আলম শহীদকে নেয়া হয় 'কাদেরিয়া বাহিনী' থেকে এবং সারোয়ার হোসেন ছিলেন মুজিব বাহিনীর মাদারিপুর অঞ্চলের একজন কমান্ডার। বাকি গুরুত্বপূর্ণ পরিচালকরা অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্তান প্রত্যাগত সামরিক অফিসার। সুতরাং এ ভাষ্যটিও ঠিক নয় যে, 'দক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের কাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে' রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর বিশাল অফিসার গোষ্ঠী থেকে নূরুজ্জামান ব্যতীত কারোই ঠাঁই হয়নি রক্ষীবাহিনীর সর্বোচ্চ পরিসরে– যা ছিল সামরিক দিক থেকে তাৎপর্যবহ। এ পর্যায়ের মূল কৌশলগত রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিব বাহিনীর গঠন যেভাবে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে তার আস্থার সংকট তৈরি করেছিল এবং ফলে পুরো যুদ্ধ-প্রক্রিয়ায় প্রবাসী সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সার্বভৌমত্ব যেভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছিল তেমনিভাবে দেখা গেল– স্বাধীনতার পর রক্ষীবাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে এই বাহিনীর সঙ্গে সেনাবাহিনীর আস্থার সংকট সৃষ্টি হচ্ছে (আরও ব্যাপকতর রূপে) এবং এটা পুরো দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক কাঠামো এবং তার মনস্তত্ত্বকে বিপজ্জনক নাজুকতার দিকে ঠেলে দেয়।

রক্ষীবাহিনীর গঠন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সচেতনভাবে দূরে রাখা ও এর গঠন প্রক্রিয়ায় ভারতীয়দের সম্পৃক্তির পাশাপাশি এই সময়টিতে এমন আরও কিছু ঘটনা ঘটছিল যা স্বাভাবিকভাবে সাধারণ্যে এবং সুনির্দিষ্টভাবে সেনাবাহিনীর মাঝে বিব্রতকর অবস্থা তৈরি করে। যেমন ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান জেনারেল অরোরা ১৬ ডিসেম্বরের পরবর্তী ২-৩ মাস যতবার ঢাকা এসেছেন ততবারই ঢাকা সেনানিবাসের 'কমান্ড হাউজ'-এ তাঁর থাকার ব্যবস্থা হতো। যেখানে স্বাধীনতার আগে থাকতেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্ব-পাকিস্তানস্থ প্রধান। অরোরা ঐ সময় ঢাকায় চলাফেরার সময় তাঁর গাড়িতে ইস্টার্ন কমান্ডের পতাকা শোভা পেত। তাঁর গাড়ির সামনে পেছনে ভারতীয় রক্ষীরা রাস্তার স্বাভাবিক চলাচল বন্ধ করে যাতায়তের ব্যবস্থা করতেন। অনেকটা এখন যেভাবে দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে করা হয়। অরোরার 'চলাফেরার এই ধরন' এতটাই বিস্ময় তৈরি করে যে, সেই সময়কার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সুবিমল দত্তকে স্বপ্রণোদিত হয়ে তাতে হস্তক্ষেপ করতে হয়। এ বিষয়ে জনাব দত্তের সঙ্গে ডেপুটি হাইকমিশনার জে এন দীক্ষিতের যে কথোপথন হয় তার উল্লেখ করে শেষোক্তজন লিখছেন,

'তিনি (সুবিমল দত্ত) আমাকে বললেন, ভারতের এখন উপলব্ধি করা উচিত, তাদের সামরিক কর্মকর্তাদের বাংলাদেশে এভাবে চলাফেরার সুযোগ নেই। এটা একটা স্বাধীন দেশ এবং ভারতও তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। জেনারেল অরোরার সফরকালে লজিস্টিক সাপোর্টে অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে। একটি বিদেশী দেশে তিনি কোনভাবেই ইস্টার্ন কমান্ডের পতাকা উড়িয়ে চলাফেরা করতে পারেন না। তাঁর চলাচলকালে এ দেশের গাড়ি-ঘোড়া সরানোর দায়িত্বও ভারতীয় সৈনিকদের পালন করার কোন সুযোগ নেই। উপরন্তু ঢাকা সেনানিবাসের কমান্ড হাউজে তিনি কোনভাবেই থাকতে পারেন না। তাঁর থাকা উচিত সেখানকার ভিআইপি গেস্ট হাউজে– যদি তিনি তাদের আমন্ত্রণে এসে থাকেন। এ ছাড়া এ দেশে এসেই প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের কাছে সরাসরি চলে যাওয়ার অভ্যাসও ত্যাগ করা উচিত অরোরার। তাঁর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হতে হবে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে।'[৩৫২]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও এ থেকে বাংলাদেশের তৎকালীন সমাজে ভারত-বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভারতীয় ও বাংলাদেশের ঊর্ধ্বতন মহলের দায়-দায়িত্বের কিছুটা আঁচ করা যায়। ভারতীয় একজন পেশাদার কূটনীতিবিদের চোখে যেটা অস্বাভাবিক ও অগ্রহণযোগ্য হিসেবে ধরা পড়ছিলে স্বাধীনতায় উদ্বেল বাংলাদেশের সৈনিক-জনতার কাছে তা নিশ্চিতভাবেই আরও গভীর মর্মবেদনার সঙ্গে দৃষ্টিকটু ঠেকছিল। ঠিক এই সময়টিতেই সরকার রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় ভারতীয়দের সংশ্লিষ্ট করছিলেন। সেই সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে ঐ বাহিনীর উপ-পরিচালক সারোয়ার মোল্লা সম্প্রতি স্পষ্টভাবেই বলেছেন, 'এই বাহিনী তৈরির পেছনে আসলে যে উদ্দেশ্য কাজ করেছে, তা হলো সদ্য স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনীর পরিসর এবং সংখ্যা বাড়ানো হলে– এ বিষয়টি ভারত সরকার হয়তো ভালোভাবে দেখবে না। সুতরাং ভারতের সাহায্য এবং সহযোগিতায় একটি প্যারা মিলিটারি ফোর্স দাঁড় করানো হলে, ভারত হয়তো মনে করবে এই ফোর্স তাদের অনুগত থাকবে। এ কারণে ভারত সরকার বিনা দ্বিধায় সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করবে।'[৩৫৩]

সারোয়ার মোল্লার উপরিউক্ত বক্তব্য পুরোপুরি সত্য হলেও তাতে রক্ষীবাহিনী সৃষ্টির 'রাজনীতি'টুকু আড়াল করতে গিয়ে অনেক প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। ভারত বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে সাহায্য করবে না, কিন্তু রক্ষীবাহিনীকে সাহায্য করবে– এর কারণ কী? নিশ্চিতভাবে রক্ষীবাহিনীর অতি-উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তার এই বক্তব্যের গভীর তাৎপর্য রয়েছে এবং সেই তাৎপর্যের যোগ রয়েছে

---

৩৫২ J. N. Dixit, *Ibid*, p. 146.

৩৫৩ সারোয়ার মোল্লা, *পূর্বোক্ত*।

একদিকে যেমন মুজিব বাহিনীর সৃষ্টির মাঝে তেমনি বাহাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের ভবিষ্যতের মাঝেও। সারোয়ার মোল্লার বক্তব্য থেকে আরও যে ধাঁধা তৈরি হয়– তা হলো, একাত্তরের নয় মাসে ভারত উদারভাবে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে সাহায্য করলেও কেন মাত্র কয়েক মাস পরে আর তাকে সাহায্য করবে না বলে ধরে নেয়া হচ্ছে এবং কেনই-বা সেই একই ভারত মুজিব বাহিনীকে অন্য নামে ব্যাপক সাহায্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকতা দিতে যাচ্ছে; উপরন্তু বাংলাদেশ সেই সাহায্য আগ্রহ ভরে নিচ্ছে– এমনকি হবু দল জাসদের নেতারাও কেন ঐ প্রক্রিয়ায় যুক্ত? রক্ষীবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা সারোয়ার মোল্লার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যে সিরাজুল আলম খানও সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে বিবরণ ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া বাকি অন্যান্য প্রশ্নেরও উত্তর পাবো আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে। তার আগে এই বাহিনীর গঠন, আইনগত কাঠামো এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কিছু মৌলিক তথ্য তুলে ধরা যাক।

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতীয় শিবিরে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষকদের মধ্যে যারা সমাজতন্ত্র বিরোধী মনোভাবাপন্ন ছিলেন বলে ধারণা তৈরি হয়– দেখা যায়, তাদেরই বাছাই করে রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষক করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি অদ্ভূত ব্যাপার ছিল– এর অফিসারদের (এবং ক্ষেত্রবিশেষে সুবেদারদেরও) প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো ভারতে এবং সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো ঢাকার সাভারে। ভারত থেকে আগত মেজর রেড্ডির নেতৃত্বাধীন একটি দল প্রথম দিকে সাভারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। রেড্ডি ছিলেন একজন খ্যাতনামা প্রশিক্ষক। তবে আনোয়ার উল আলমের মতে, জনৈক 'মেজর ত্রিবেদীদের নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিনজন কর্মকর্তা ও ৪-৫ জন জেসিও ও এনসিও ঢাকায় এসেছিলেন রক্ষীদের প্রশিক্ষণের জন্য।'[৩৫৪] উল্লেখ্য, নানান স্তরে রক্ষীবাহিনীর প্রাক্তন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও মেজর 'মালহোত্রা', মেজর 'ত্রিবেদী' প্রভৃতি নামগুলোর পুরো বিবরণ সংগ্রহ করা যায় নি– তাদের সামরিক ক্যারিয়ারের পূর্বাপর জানা যায়নি, যা জরুরি ছিল।

রক্ষীবাহিনীর সর্বনিম্ন পদ ছিল রক্ষী এবং সর্বোচ্চ পদ ছিল ডিরেক্টর জেনারেল। নিম্নপদ থেকে ঊর্ধ্ব পদের দিকে অধিনায়কদের তারা *লিডার* বলত। লিডার-ডেপুটি লিডার-এসিসট্যান্ট লিডার এভাবে ছিল অফিসার পদের নিম্নমুখী ধারাবাহিকতা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল (অব.) মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক (যিনি নিজেও স্বল্প কিছু দিন রক্ষীবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন) তাঁর এক গ্রন্থে রক্ষীবাহিনীর জনবল সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তাতে দেখা যায়, রক্ষীবাহিনীর অফিসার সম্প্রদায়ের রিক্রুটমেন্ট হয়েছে

---

[৩৫৪] আনোয়ার উল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪।

নিম্নোক্তভাবে : প্রথম ব্যাচ : ১০ জুলাই, ১৯৭২; দ্বিতীয় ব্যাচ : ২৭ অক্টোবর ১৯৭২; তৃতীয় ব্যাচ : ২৮ অক্টোবর ১৯৭২; চতুর্থ ব্যাচ : ১ অক্টোবর ১৯৭৩; পঞ্চম ব্যাচ : ২৮ এপ্রিল ১৯৭৪; ষষ্ঠ ব্যাচ : ১ মে ১৯৭৫; সপ্তম ব্যাচ : ১ নভেম্বর ১৯৭৫। শেষের ব্যাচটি (যার সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৭ জন) প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে রক্ষীবাহিনী সেনাবাহিনীতে আত্তীকৃত হয়ে যায়।[৩৫৫] শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের পরিকল্পনা ছিল, বাকশালের অধীনে প্রত্যেক জিলা গভর্নরকে এক ইউনিট করে রক্ষী দেওয়া হবে। ফলে দ্রুত এই বাহিনীর বিকাশ ঘটানো হচ্ছিল। পনেরো আগস্টের ক্যু'র পূর্ব মুহূর্তে জেলা গভর্নররা প্রশিক্ষণরত অবস্থায় ছিলেন এবং চৌদ্দ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকেলেও এই 'গভর্নর'দের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন একজন রক্ষী কর্মকর্তা![৩৫৬]

উল্লেখ্য, আইনগতভাবে রক্ষীবাহিনী ছিল ব্যাপক ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বাহিনী। এই লেখার শেষে রক্ষীবাহিনী আইন ও তার সংশোধনীগুলো সংযুক্ত করা হলো। যা থেকে এই বাহিনীর ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে আঁচ করা সম্ভব। ১৯৭৫ সালের ৬ অক্টোবর খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন সরকার এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দেয়। বলা হয় : 'সেনাবাহিনীতে যারা যোগদান করতে চাইবে ও যোগদানের উপযুক্ত বিবেচিত হবে শুধু তাদেরই নেয়া হবে কতগুলো শর্তে।' এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হয় ৯ সেপ্টেম্বর। উপরিউক্ত নির্দেশনায় রক্ষীবাহিনীর যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, ব্যাংক ব্যালেন্স, যানবাহন ইত্যাদি সেনাবাহিনী অথবা অন্যান্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় ঢাকার সাভার, চট্টগ্রামের

---

৩৫৫ বিস্তারিত দেখুন, মেজর জেনারেল (অব.) মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক *সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ২৮-২৯। আরও দেখুন, মেজর জেনারেল এস এস উবান, *পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০* এবং মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য: স্বাধীনতার প্রথম দশক*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০, ঢাকা।

৩৫৬ এই দিনই (১৪ আগস্ট সন্ধ্যায়) প্রায় চার সপ্তাহের এই প্রশিক্ষণপর্বটি শেষ হয় প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল হক মণি ও আব্দুর রাজ্জাকের লেকচারের মধ্য দিয়ে। সমাপনী দিনে বক্তাদের এই সন্নিবেশ ও তাদের বক্তব্য থেকে নবীণ গভর্নররাও বুঝে নিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ প্রশাসনের আদলটি। ১৯৭৫-এর ২০ জুলাই থেকে এই প্রশিক্ষণটি হয়েছিল সাধারণ কোনো প্রশাসনিক ভবন বা আমলাদের কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে নয়– বঙ্গভবনে। সেখানকার একটি কক্ষকে এক মাসের জন্য ক্লাশরুমের রূপ দেয়া হয়েছিল। মোট গভর্নরের সংখ্যা ছিল ৬২– যাদের মধ্যে ৫০ জন ছিলেন সরাসরি আওয়ামী লীগের নেতা, একজন ছিলেন সেনা কর্মকর্তা এবং বাকি ১১ জন ছিলেন আমলা। শেষোক্তদের একজন মোফাজ্জল করিম। তিনি গোপলগঞ্জের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। প্রশিক্ষণকালে শেষদিন তাঁদের উদ্দেশ্যে মুজিব বাহিনীর প্রধান তিন নেতার বক্তব্যের জন্য দেখুন, *জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪।

ভাটিয়ারী, খুলনার গিলতলা, সিলেটের বটেশ্বর ইত্যাদি স্থানের বিপুল ভূ-সম্পদের মালিকানা ছাড়াও সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর আত্তীকরণকে বাংলাদেশে সেনা আমলাতন্ত্রের জন্য নিজেকে বিস্তৃত করার এক অভাবনীয় উপলক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা যায়– শিগগির যার প্রভাব প্রতিভাত হতে শুরু করে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা, রাজনীতি ও আর্থসামাজিক পরিমণ্ডলে।

সেনাবাহিনীতে রক্ষীদের আত্তীকরণ শুরু হয় ১৯৭৫-এর ১২ অক্টোবর থেকে। খুব ধীরে ধীরে এই আত্তীকরণ সম্পন্ন হচ্ছিল। অফিসারদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্তীকরণ করা হয়। এই পুরো পদক্ষেপটি আইনগতভাবে সঠিক ধারায় এগোলেও প্রশাসনিকভাবে ছিল অভিনব ও বিস্ময়কর। পঁচাত্তর পরবর্তী সরকার নিজেদের 'শেখ মুজিবুর রহমানের ভুল থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য' আবির্ভূত বলে কথিত হলেও তারা এমন একটি 'বাহিনী'কে দেশের সুশৃংখল প্রতিরক্ষা কাঠামোতে একীভূত করে নেয়– যে বাহিনী স্বরাষ্ট্র বা প্রতিরক্ষা কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত ছিল না, যে বাহিনী গড়ে উঠেছিল ভিন্ন একটি দেশের সেনাকর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতায়, যে বাহিনীর জনবলের বিরাট এক অংশের সামরিক জীবনের শুরু হয়েছে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে এবং যে বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিবেচনাযোগ্য অভিযোগ ছিল, তাকে কোনো ধরনের প্রকাশ্য তদন্ত বা জবাবদিহিতার মুখোমুখি না করেই এবং তার সদস্যদের মেধা, যোগ্যতা ও অতীত রাজনৈতিক সম্পৃক্তি সম্পর্কে জনমানসে প্রশ্ন থাকার পরও রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর মতো সুশৃঙ্খল একটি বাহিনীতে একীভূত করা হয়। তবে রক্ষীবাহিনীর কাছ থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহিতা আদায়ে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে ১৯৭৩ সালে প্রণীত 'রক্ষীবাহিনী সংশোধনী আইন'-এর উল্লেখ করা যায়। এই বাহিনীর কার্যক্রম শুরুর দীর্ঘ ২০ মাস পরে তার 'অতীত কার্যকলাপ'-এর বৈধতা দিয়ে ঐ সংশোধনী আইনটি তৈরি হয়।

উল্লেখ্য, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রক্ষীবাহিনীর পঞ্চম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন (যিনি পরে সেনাবাহিনীতেও আত্মীকৃত হন এবং মেজর হিসেবে অবসরে যান), ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাভারে ও দেশের অন্যত্র তাদের এক ধরনের উত্তেজনাকর অবস্থা তৈরি হয়েছিল। তবে 'সেনাবাহিনীতে যথাযথ মর্যাদায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে' এইরূপ আশ্বাসে শান্তি পূর্ণভাবে তারা অস্ত্রসংবরণ ও সমর্পণ করে। সেসময় রক্ষীবাহিনীর খুলনা কেন্দ্রে অবস্থানকারী ঐ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ১৫ আগস্টের পর প্রতিশোধমূলক তৎপরতার জন্য তারা প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বাহিনীর কেন্দ্র তখন ছিল নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনাহীন। নূরুজ্জামান বাইরে থাকায় ঐ সময় রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ছিলেন মেজর আবুল হাসান খান। খুলনায় অবস্থানকারী ঐ কর্মকর্তার ভাষায়, 'সে সময় প্রতীয়মান হচ্ছিল, ১৫ আগস্টের ঘটনাবলির পেছনে

সেনাবাহিনীর সমর্থন বিদ্যমান। এরূপ অবস্থায় পুরো সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে যে নেতৃত্ব প্রয়োজন তা পাওয়া যাচ্ছিল না।' কার্যত রক্ষীবাহিনী তখন প্রতিরোধ বা প্রতিশোধমূলক কোনো তৎপরতায় অংশ নেয়নি। উল্লেখ্য, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ সাভারের ক্যাম্পে রক্ষীবাহিনীর প্রায় এক হাজার সৈনিক ও অফিসার ছিলেন বলে জানা যায়। অধিকাংশ ছিল রিক্রুট ব্যাটালিয়ন– নিয়মিত ব্যাটালিয়ন নয়। অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে এখান থেকে কিছু রক্ষী পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে এবং একাধিক রক্ষী আত্মহত্যাও করে।[৩৫৭]

রক্ষীবাহিনীর উপ-পরিচালক (অপারেশন) সারোয়ার মোল্লার ভাষ্য থেকে জানা যায়, ১৫ আগস্টের পর তাঁরা 'সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যাওয়া'র কথাও চিন্তা করেছিলেন।[৩৫৮] তবে সেই প্রকল্প তাঁরা বাদ দেন এই ভেবে যে, '১৯৭১ সালে আমরা যে সাহায্য পেয়েছিলাম এবারও তা অব্যাহত থাকবে এমনটা আশার করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আরও একটা শঙ্কার কারণ ছিল– রক্ষীবাহিনীকে সাহায্য করার নামে তার ছদ্মাবরণে যদি ভারতীয় সেনাবাহিনী পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করে, তাহলে এ দেশের মানুষ বংশপরম্পরায় রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের *মীর জাফর* হিসেবে গালাগাল করবে।'[৩৫৯]

সারোয়ার মোল্লার ঐ ভাষ্য থেকে এও জানা যায়, ১৫ আগস্ট দুপুর থেকে তোফায়েল আহমেদ নিজ বাসা থেকে যেয়ে রক্ষীবাহিনীর সদরদপ্তরে অবস্থান করছিলেন। একই ভাষ্য থেকে এও প্রতীয়মান হয়, তোফায়েল আহমেদের রক্ষীবাহিনীর সদরদপ্তরে গমন ছিল তাঁর নিরাপত্তার প্রয়োজনে। আনোয়ার উল আলমের বিবরণ থেকে জানা যায়, তোফায়েল আহমেদকে রক্ষীবাহিনীর ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা দীপক কুমার হালদার বাসা থেকে বাহিনীর কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিরাপত্তা

---

৩৫৭ আনোয়ার উল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬১।

৩৫৮ আমি সারোয়ার বলছি (অষ্টম কিস্তি), *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৮ নভেম্বর ২০১২, ঢাকা।

৩৫৯ সারোয়ার মোল্লার এই বক্তব্য সমপর্যায়ের রক্ষীবাহিনীর আরেকজন কর্মকর্তার বক্তব্যের অনুরূপ। সাংবাদিক আফসান চৌধুরী ১৫ আগস্ট পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে রক্ষীবাহিনীর ঐ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেন ২০১০ সালের নভেম্বরে। সেই বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

> I interviewed a gentleman who was near the top of the Rakkhi Bahini leadership in 1975 and was once posted abroad after the coup mess was over. I asked him, why he didn't intervene from Savar when Sheikh Mujib was killed. He said, "We could have attacked and held off the army for two days and that would have been enough for the Indians to intervene. But I had been to India as a freedom fighter and didn't think well of them. If they came, they would never leave I thought. So I didn't order the troops to move."

মূল লেখাটি দেখুন, *http://opinion.bdnews24.com/2010/11/08/what-really-happened-in-1975/* [retrieved 30th Dec. 2013]

দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।[৩৬০] এইরূপ আসা-যাওয়ার পথে, রক্ষীবাহিনীর যানবাহন চলাচলে ঐ সময় অভ্যুত্থানকারীদের পক্ষ থেকে কোনোরূপ বাধা দেওয়া হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরে অভ্যুত্থানকারীদের চাপে তোফায়েল আহমেদকে সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে হস্তান্তরের পরও তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়নি। অন্যদিকে এ বিষয়ে কর্নেল সারোয়ার হোসেন মোল্লার সদ্য প্রকাশিত ভাষ্যটি নিম্নরূপ :

> (১৫ আগস্ট) আনুমানিক সকাল ১০টা বা সাড়ে ১০টার দিকে আমরা রাজ্জাক ভাইয়ের বাসায় টেলিফোন করি। সেখান থেকে জানানো হলো তিনি বাসায় নেই। তারপর তোফায়েল ভাইয়ের বাসায় ফোন করলাম। হঠাৎ দেখি উনি টেলিফোন ধরেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এখনো বাসায় আছেন? কারণটা কী? উনি বললেন, কী করবো বুঝতে পারছি না। তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে পারো, তোমাদের ওখানে? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা চেষ্টা করতে পারি।..আমরা একজন অফিসারের নেতৃত্বে কয়েকজন রক্ষীসহ একটি ট্রাক পাঠিয়ে তোফায়েল ভাইকে সদর দফতরে নিয়ে আসি।...তোফায়েল আহমেদ সবকিছু জানার পর মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন।...ঐদিন বিকালে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ টেলিফোন মারফত জানতে চান তোফায়েল আহমেদ আমাদের হেডকোয়ার্টারে আছেন কিনা? হ্যাঁ-সূচক জবাব দেওয়ায় তিনি জানালেন, প্রেসিডেন্ট মোশতাক সাহেবের ইচ্ছা তাঁকে বঙ্গভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।...সন্ধ্যার দিকে এই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি ই এ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করি।..ই এ চৌধুরী জানালেন, রাত ৮টা-৯টার দিকে সিটি এসপি সালাম সাহেবকে আপানাদের অফিসে পাঠাচ্ছি। রাতে ১০টা-সাড়ে ১০টা নাগাদ এসপি সালাম সাহেব রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে আসেন। তাঁর কাছে লিখিতভাবে তোফায়েল আহমেদকে হস্তান্তর করি। (পরে) এসপি সালাম সাহেব তোফায়েল আহমেদকে লিখিতভাবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হস্তান্তর করেন এবং টেলিফোনে বিষয়টি আমাদের অবহিত করেন।[৩৬১]

রক্ষীবাহিনীর ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তার উপরিউক্ত বয়ান দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করা হলো এ কারণে যে, এ থেকে নিম্নোক্ত উপাত্ত পাওয়া যায় :

> প্রথমত, একটি বাহিনীর উপ-পরিচালকরা প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব, যিনি আবার প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় ছিলেন তাঁকে 'ভাই'

---

৩৬০ আনোয়ার উল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৩।

৩৬১ কর্নেল সারোয়ার হোসেন মোল্লা (অব.), 'রক্ষীবাহিনী নিয়ে ব্যর্থ হলাম যে কারণে', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৫ আগস্ট ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১।

> হিসেবে সম্বোধন করতেন। এ থেকে বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও রাজনৈতিক চরিত্রের বিশেষত্ব সম্পর্কে একরূপ ধারণা গঠন কঠিন নয়;
>
> দ্বিতীয়ত, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রায় সারা দিনই তোফায়েল আহমেদ যে রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে ছিলেন সেটাও উপরোক্ত বয়ান থেকে স্পষ্ট। এই বিষয়ে প্রায় হুবহু বিবরণ দিয়েছেন এই বাহিনীর আরেক উপ-পরিচালক আনোয়ার উল আলম– সেটাও আমরা উপরে দেখেছি এবং তিনি এও জানিয়েছিলেন, রক্ষীবাহিনীর কোন্ অফিসার জনাব তোফায়েল আহমেদকে নিরাপত্তা দিয়ে বাহিনীর সদর দফতরে নিয়ে এসেছিল;[৩৬২] এবং এরূপ আসা-যাওয়ার পথে জাতীয় পর্যায়ের ক্যু সংগঠকরা কখনো কোন বাধা দেয়নি।

কিন্তু একই বিষয়ে জনাব তোফায়েল আহমেদের ২০১৩ সালের ১৫ আগস্ট জানালেন একবারেই ভিন্ন এক ভাষ্য। তিনি লিখেছেন,[৩৬৩]

> ভোর থেকেই দিনটি (১৫ আগস্ট) ছিল বিভীষিকাময়। হত্যাকাণ্ডের পরপর সকালে আমাকে প্রথমে গ্রেফতার করে গৃহবন্দি করা হয়। ধানমন্ডির যে বাসায় আমি থাকতাম সেই বাসাটি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে দেওয়া হয়নি।...

১৫ আগস্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে মুজিব বাহিনী ও কাদেরিয়া বাহিনীর উপরোক্ত তিন নেতা– যাঁরা তখন রক্ষীবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক– তাদের নিজস্ব অবস্থান প্রশ্নে এত ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেওয়া থেকে এটাই সাধারণভাবে প্রতীয়মান হয়, অন্তত একটি ভাষ্য তার সত্য নয়। এমনকি ক্যু-এর প্রতি সমর্থনের প্রশ্নেও কাদেরিয়া বাহিনী থেকে আগত রক্ষীবাহিনী কর্মকর্তা আনোয়ার উল আলমের বক্তব্য মেলে না খোদ কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান কাদের সিদ্দিকীর বক্তব্যের সঙ্গে। কাদের সিদ্দিকী লিখেছেন, 'রক্ষীবাহিনীর আনোয়ার উল আলম শহীদ বঙ্গবন্ধুদের হত্যাকারীদের সর্বপ্রথম সমর্থন জানিয়েছিলেন।'[৩৬৪] কিন্তু একই বিষয়ে আনোয়ার উল আলম বলেছেন,

> পরিস্থিতিদৃষ্টে তখন আমাদের মনে হয়েছিল, সব বাহিনীপ্রধান যেহেতু নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে সেহেতু

---

৩৬২ আনোয়ার উল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৪, ১৬০।

৩৬৩ তোফায়েল আহমেদ, 'চোখ হাত বেঁধে নিয়ে যায় আমাকে', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৫ আগস্ট ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৫। উল্লেখ্য, আলোচ্য লেখায় ১৫ আগস্ট ক্যু পরবর্তী ঘটনাবলি বর্ণনা করা হলেও কোথাও উল্লেখ নেই যে, লেখক ঐদিন রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে ছিলেন। অথচ ঐ বাহিনীর মুখ্য দুই উপ-পরিচালকই জানাচ্ছেন, জনাব আহমেদ সেদিন রাত ১০টা পর্যন্ত এই বাহিনীর সদর দফতরেই ছিলেন।

৩৬৪ কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম, 'এক মহাবিপর্যয়ের দিন', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৫ আগস্ট ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৪।

> রক্ষীবাহিনীর আনুগত্য প্রকাশ না করে উপায় নেই। তাই আমরা ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আবুল হাসান খানকে রেডিও স্টেশনে পাঠাই।...আমাদের দুজনকে (আনোয়ার উল আলম ও সারোয়ার মোল্লা) রেডিও স্টেশনে যাওয়ার জন্য কয়েক বার বলা হয়।...চারিদিকের উপর্যুপরি সুপারিশের কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তখন আমাদের দু'জনকেও রেডিও স্টেশনে যেতে হয়। এ ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না।[৩৬৫]

উপরোক্ত বিবরণগুলো থেকে স্পষ্ট, শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁর সৃষ্ট ও ব্যক্তিগতভাবে কেবল তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রক্ষীবাহিনী ও এর কর্মকর্তারা সামরিক ও কৌশলগতভাবে অভ্যুত্থান সংগঠকদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কোনো অবস্থান নিয়েছেন বলে দেখা যায় না।

এরপর আমরা রক্ষীবাহিনীর ১৫ আগস্ট ঘটনা পরবর্তী গতিপ্রকৃতি বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করতে পারি। সেনা-অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরই জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টের লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমিন আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি গ্রুপ রক্ষীবাহিনীর সাভার ক্যাম্প থেকে ভারতীয় প্রশিক্ষকদের তুলে নিয়ে ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসে হস্তান্তর করে। এইরূপ প্রশিক্ষকদের অন্তত একজন ছিলেন মেজর বালা রেড্ডি।

উপরোক্ত সামরিক অভ্যুত্থানের প্রায় ৫০-৬০ দিন পরে শুরু হয় সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর আত্তীকরণ প্রক্রিয়া। রক্ষীবাহিনীকে শান্তিপূর্ণভাবে একীভূত করতে পারা সেসময় সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কৃতিত্ব হিসেবে দেখা হয়েছিল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে এই কর্তৃত্বপূর্ণ অভিযানে নেতৃত্ব দেন তৎকালীন এডজুটেন্ট জেনারেল (এ.জি.) ব্রিগেডিয়ার মইনুল হোসেন চৌধুরী (পরে মেজর জেনারেল), এজি অফিসের লে. কর্নেল ওয়াজিউল্লাহ প্রমুখ।[৩৬৬] তবে এক্ষেত্রে একদিকে রক্ষীবাহিনী ও সেনাবাহিনীকে এইরূপ একীভূতকরণের জন্য মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত করা এবং অন্যদিকে তৎকালীন সরকারকে একীভূত করার স্বপক্ষে রাজি করাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও সেনাবাহিনীর আরেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার এম এ মঞ্জুর। মোশতাক সরকারে এসময় প্রতিরক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকা (প্রেসিডেন্টের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা) ওসমানী দৃঢ়ভাবে চাইছিলেন রক্ষীবাহিনী ভেঙে দেওয়া হোক।[৩৬৭] এক্ষেত্রে ওসমানীর বিপক্ষে জিয়া ও মঞ্জুরের যৌথ বিপরীত

---

৩৬৫ আনোয়ার উল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২-৫৩।

৩৬৬ বিস্তারিত দেখুন, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮০।

৩৬৭ বঙ্গভবনে রক্ষীবাহিনীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণী সভায় ওসমানীর বক্তব্যের জন্য দেখুন, *আমি সারোয়ার বলছি*–দশম কিস্তি, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১০ নভেম্বর ২০১২, ঢাকা।

অবস্থানের পেছনে কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ কাজ করছিল বলে ধারণা করা হয়। জিয়াউর রহমান এসময় প্রথমত, রক্ষীবাহিনীর একীভূত করার মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীর স্ফীতি ঘটাতে আগ্রহী ছিলেন। যার পরিণতিতে পরবর্তীকালে, ব্রিগেড কাঠামো থেকে ডিভিশন কাঠামোতে উত্তরণ সহজ হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য।[৩৬৮] আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে রক্ষীদের প্রায় ১৬টি ব্যাটালিয়ন পেয়েছিল সেনাবাহিনী। দ্বিতীয়ত. রক্ষীবাহিনীর সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির পেছনে জিয়াউর রহমানের মাঝে আরেকটি কৌশলগত বিবেচনাও কাজ করে থাকতে পারে– তা হলো, উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এত বিপুল সংখ্যক রাজনীতিমনস্ক জনবলকে সেনাশৃঙ্খলায় না রেখে জনসমাজে ফিরিয়ে দিলে তা দেশের নিরাপত্তার জন্য ভবিষ্যতে হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে মঞ্জুর চাইছিলেন রক্ষীবাহিনীর অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীতে 'মুক্তিযোদ্ধা'দের সংখ্যা বৃদ্ধি।[৩৬৯] কারণ তিনি ভালোভাবেই রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ববর্তী পরিচয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পরপর মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুরের ঢাকায় উপস্থিতিও ছিল রহস্যময়। কারণ অভ্যুত্থানকালে তিনি ছিলেন ভারতে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে। কিন্তু দ্রুত ঢাকায় এসে সক্রিয় হয়ে উঠেন তিনি এবং পলাতক অবস্থা থেকে নূরুজ্জামানকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও মুখ্য কুশীলব হয়ে ওঠেন। মঞ্জুরের মতোই নূরুজ্জামানকেও পরে দেখা যায় সেনাবাহিনীতে রক্ষীদের আত্মীকরণে লক্ষ্যণীয় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে। নূরুজ্জামানের এইরূপ 'ভূমিকা'কে তাঁর সহযোগী আনোয়ার উল আলম 'কৌশলগত' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৩৭০]

সেনাবাহিনীতে একীভূত হওয়ার পর পদোন্নতি ও পোস্টিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তারা পদ্ধতিগতভাবে কোনো ধরনের বৈষম্যের শিকার না হলেও রাজনৈতিক সরকারের উত্থান-পতনে তাদের পেশাগত জীবন প্রভাবিত হয়েছে। বিএনপি সরকার এলে তাদের অনেককে যেমন অবসরে যেতে হয়েছে তেমনি আওয়ামী লীগ সরকার এলে তাদের প্রমোশন প্রয়োজনীয় গতি পেয়েছে। এর মাঝেই 'রক্ষীবাহিনী থেকে কয়েকজন মেজর জেনারেল হয়েছেন স্বাভাবিক নিয়মে এবং সময়ে'।[৩৭১] আবার অনেক রক্ষীবাহিনী কর্মকর্তাকে আত্তীকরণ পর্যায়ে

---

৩৬৮ *পূর্বোক্ত*।

৩৬৯ *পূর্বোক্ত*।

৩৭০ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৭।

৩৭১ জেনারেল ইব্রাহিম, *মিশ্রকথন*, অনন্যা, ২০১১, পৃ. ২১১। জেনারেল ইব্রাহিম ২-৩ জন রক্ষী কর্মকর্তার মেজর জেনারেল হওয়ার কথা বললেও অন্তত আট জন রক্ষী কর্মকর্তা সেনাবাহিনীতে মেজর জেনারেল হয়েছেন বলে জানা যায়– যাদের মধ্যে অন্তত দু' জন লেফটেন্যান্ট জেনারেলও হয়েছেন। অন্যদিকে এই লেখার বর্তমান উপ-অধ্যায়ে ইতিমধ্যে

'অতিরিক্ত উচ্চতর পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে' বলে সেনাবাহিনীতে ক্ষোভও ছিল। বিশেষত দু' জন উপ-পরিচালক সারোয়ার হোসেন মোল্লা ও আনোয়ার উল আলম শহীদকে 'লে. কর্নেল' র‍্যাংক প্রদান করায় সেনাবাহিনীতে তাদের চেয়ে অধিক বয়সী অনেকে র‍্যাংকের দিক থেকে তাদের 'জুনিয়র'-এ পরিণত হন। এই সংকট নিরসনে জিয়াউর রহমান পরে (১৯৭৮) উপরোক্ত কর্মকর্তাদের চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করেন। যার পরিণতিতে সারোয়ার হোসেন মোল্লা থাইল্যান্ডে এবং আনোয়ার উল আলম শহীদ ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ পান। রক্ষীবাহিনী প্রধান নূরুজ্জামানের চাকরিও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়েছিল, তবে তা আরেক নাটকীয় পটভূমিতে। সে বিষয়ে এই লেখার অন্যত্র আলোকপাত করা হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পর ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানকে দেশে ফিরিয়ে আনা, তিনিসহ রক্ষীবাহিনীর ঊর্ধ্বতনদের চাকরিকেন্দ্রিক পদমর্যাদা ও প্রয়োজনীয় সম্মানপ্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান বরাবর উদার মনোভাব গ্রহণ করলেও জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে পরিচালিত অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্তত চারজন ছিলেন রক্ষীবাহিনী থেকে আসা। সংশ্লিষ্টরা অবশ্য একে কাকতালীয় বলে অভিহিত করেন। আবার রাষ্ট্রপতি জিয়ার সঙ্গে নিহত তাঁর এডিসি ক্যাপ্টেন আশরাফুল আজিজ খানও ছিলেন রক্ষীবাহিনী থেকে আত্মীকৃত কর্মকর্তা।

তবে একই বছরের (১৯৭৫) তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানে রক্ষীবাহিনীর অংশগ্রহণ যে পরিকল্পিত ছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে ঐ অভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক শাফায়াত জামিলের বয়ানে। তিনি বলছেন, "অক্টোবরের (১৯৭৫) মাঝামাঝি কোনো একদিন সেনাসদরে রক্ষীবাহিনীর দুই প্রভাবশালী কর্মকর্তা আনোয়ার উল আলম শহীদ ও সারোয়ার মোল্লার সঙ্গে অবৈধ সরকারকে প্রতিরোধের ব্যাপার নিয়ে আলাপ করি। তারা আমার সঙ্গে একমত হলেন।...অক্টোবরের ২৮-২৯ তারিখ হবে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আমাকে বললেন, 'কিছু কি ভাবছো? জিয়া এগিয়ে আসবে না। ডু সামথিং।' ব্রিগেডিয়ার খালেদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনী প্রধান ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানের আলাপ হয়েছিল এ ব্যাপারে। খালেদ আমার মতো চাইলেন। আমি বললাম, 'দিন-তারিখ

রক্ষীবাহিনীর সপ্তম ব্যাচের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যে কর্মকর্তার উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর ভাষায়– আত্তিকরণের পর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাঁরা সেনাবাহিনীতে বৈষম্যের শিকার না হলেও তাঁদের পৃথকভাবে দেখার একটা আবহ ছিল। ফলে, তাঁর ভাষায়, রক্ষী কর্মকর্তাদের মধ্যে মেধাবী একাংশ স্বল্প সময়ের মধ্যে অবসর নিয়ে চলে যান। এই কর্মকর্তা আরও জানান, রক্ষী অফিসারদের মধ্যে প্রথম চার ব্যাচ এবং পরবর্তী তিন ব্যাচে শিক্ষা-মেধা-যোগ্যতায় স্পষ্টত পার্থক্য ছিল; 'নিয়োগ প্রক্রিয়ার পৃথক ধরনের কারণে এটা ঘটেছিল।'

বলেন। আমি প্রস্তুত।...১ নভেম্বর খালেদ, নূরুজ্জামান ও আমি খালেদের অফিসে বসলাম। বিস্তারিত আলোচনার পর খালেদ সিদ্ধান্ত দিলেন ২ নভেম্বর দিবাগত রাতে বঙ্গভবনে মোতায়েন আমার দুটো কোম্পানি ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসবে, সেটাই হবে আমাদের অভ্যুত্থান সূচনার ইঙ্গিত।"[৩৭২]

তেসরা নভেম্বর অভ্যুত্থানে রক্ষীবাহিনী সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্তির বিষয়ে এই বাহিনীর কর্মকর্তাদের আরও কিছু বক্তব্য এ পর্যায়ে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। উল্লেখ্য, আনোয়ার উল আলম শহীদ ও সারোয়ার হোসেন মোল্লা সরাসরি মেজর র‍্যাংকে নিযুক্ত হয়েছিলেন রক্ষীবাহিনীতে। পরে তাঁরা পদোন্নতিও পান। মেজর জেনারেল ইবরাহিমের ভাষায়, কমিউনিস্ট যুগের ভিয়েতনাম বা রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে সামরিক অধিনায়কদের পাশাপাশি যেমন 'পলিটিক্যাল কমিশার' থাকত অনেকটা ঐ নিয়মেই বা ঐ কায়দায় তাঁরা রক্ষীবাহিনীতে কাজ করতেন।[৩৭৩] রক্ষীবাহিনীর আলোচ্য দুই কর্মকর্তা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আত্মীকৃত হন ১৯৭৫ সালের অক্টোবরে। আর ঐ মাসেই যে তাঁরা ক্যু পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন (যেমনটি বলেছেন শাফায়াত জামিল) তার সত্যতা পাওয়া যায় আনোয়ার উল আলম-এর বয়ানেও। তিনি লিখেছেন :

> ...অক্টোবরের (১৯৭৫) মাঝামাঝি একদিন সেনাবাহিনীর নতুন অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল নূরুল ইসলামের অফিসকক্ষে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তখন তিনি ছিলেন না। হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হন শাফায়াত জামিল। তাঁর সঙ্গে আমার আগে থেকে ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমাকে কক্ষের এক কোণায় নিয়ে যান তিনি এবং সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন, মোশতাকের অবৈধ সরকারকে উৎখাতের ব্যাপারে আমার মতামত কী? কোন উদ্যোগ নেয়া হলে রক্ষীবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যরা কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে? আমি তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর সঙ্গে একমত হই। জানাই, অবৈধ সরকার উৎখাতে আমরা সমর্থন জানাব; সরাসরি অংশগ্রহণ করবো।...[৩৭৪]

তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানে রক্ষীবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ রয়েছে ঐ অভ্যুত্থানের আরেক সংগঠক মেজর নাসির উদ্দিনের বয়ানে। সেখানে তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন কীভাবে শুরু থেকে রক্ষীবাহিনী প্রধান নূরুজ্জামান এই অভ্যুত্থানে সম্পৃক্ত হন। ঢাকার মিরপুরে এবং সাভারে এসময় রক্ষীবাহিনীর ৫টি ব্যাটালিয়নকে অভ্যুত্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন নূরুজ্জামান। এমনকি ঐ অভ্যুত্থানে সামিল হতে গিয়ে তিনি যে সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর

---

৩৭২ দেখুন, কর্নেল শাফায়াত জামিল (অব.), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১-৩২।

৩৭৩ মেজর জেনারেল ইবরাহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮।

৩৭৪ আনোয়ার উল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৩।

আত্তীকরণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত করছিলেন সে বিষয়ে ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার স্বীকৃতি রয়েছে মেজর নাসিরের জবানিতেও।[৩৭৫]

রক্ষীবাহিনীর একজন সিনিয়র কর্মকর্তা সাবিহ উদ্দিন (পরবর্তীকালে মে. জেনারেল এবং অবসরপ্রাপ্ত) এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন,[৩৭৬] এই বাহিনীর সদস্যরা বেসামরিক প্রশাসনের প্রতি অনুগত থাকার প্রশিক্ষণ এত আন্তরিকতার সঙ্গে আত্মস্থ করেছিল যে, সেনাবাহিনীতে আত্মীকৃত হয়ে যাওয়ার পর কোন ধরনের সামরিক অভ্যুত্থানে শামিল হয়নি। তাঁর এই বক্তব্য যে মোটেই বাস্তবসম্মত নয় উপরে তেসরা নভেম্বর অভ্যুত্থানের দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই তা স্পষ্ট হয়। এমনকি ১৯৭৫-এর নভেম্বরে সিপাহী অভ্যুত্থানেও সামিল হয়েছিল রক্ষীবাহিনী থেকে আসা সাধারণ রক্ষীরা।[৩৭৭] উপরন্তু '১/১১' নামে খ্যাত ২০০৭ সালের অভ্যুত্থানধর্মী সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ও ঘটনাবলির অন্যতম নায়ক ছিলেন রক্ষীবাহিনী (ষষ্ঠ ব্যাচ) থেকে আত্মীকৃত সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরী। যিনি পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেলও হয়েছিলেন।

রক্ষীবাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সরকার, বিশেষত শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাপক সমালোচনার শিকার হলেও বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ অলি আহাদ দাবি করেছেন, মুজিবের জন্য এই বাহিনী গঠনের বাধ্যবাধকতাটি তৈরি করে রেখেছিল আসলে ১৯৭১ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশের প্রবাসী অস্থায়ী সরকারই। ভারত সরকারের সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন সরকার সাত দফা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে ঐ সময়। অলি আহাদের ভাষায়, ঐ চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদ ছিল এ রকম : 'বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি প্যারামিলিশিয়া গঠন করা হবে।'[৩৭৮] মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লি মিশনপ্রধান হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী পরবর্তীকালে অলি আহাদ কথিত এই চুক্তির সত্যতা স্বীকার করলেও বলেন, এটা কোনো 'প্যাক্ট' ছিল না– ছিল 'এগ্রিমেন্ট।' প্রবাসী সরকারের পক্ষে এটা স্বাক্ষর করেছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম। হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর

---

৩৭৫ দেখুন, *গণতন্ত্রের বিপন্নধারায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১০৯-১১০।

৩৭৬ S A Karim, *ibid*, p. 272-73.

৩৭৭ দেখুন, মেজর নাসির, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

৩৭৮ অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৫-১৯৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০০৪, ঢাকা, পৃ. ৪৩৩। লেখক এখানে সাত দফা চুক্তির পুরোটারই বিবরণ দিয়েছেন এবং তাঁর তুলে ধরা এই তথ্য সম্পর্কে কখনোই দেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকদের তরফ থেকে কোন ভিন্নমত বা আপত্তি দেখা যায়নি।

মতে অক্টোবরের ঐ 'এগ্রিমেন্ট'ই হলো রক্ষীবাহিনীর 'উৎস।'[৩৭৯] ১৯৭২ সালের ১৯ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে সৈয়দ নজরুল ইসলামও (তখন তিনি শিল্পমন্ত্রী) ঐ চুক্তির বিষয়টি স্বীকার করেন। তাঁর মতে, ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের শর্ত ছিল ঐ চুক্তি।[৩৮০] তাজউদ্দীন আহমদ অবশ্য ১৯৭৩-এর ২ জুন সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে 'দেশের স্বার্থ বিক্রি করে' ভারতের সঙ্গে কোন চুক্তির বিষয় অস্বীকার করেন। তবে 'কোনো চুক্তি হয়নি' সরাসরি এমন বক্তব্যও রাখেননি তিনি।[৩৮১]

তবে উৎস ও পটভূমি যাই-ই হোক– রক্ষীবাহিনীকে মুজিব বাহিনীরই একাংশের সম্প্রসারিত সংস্করণ হিসেবে অভিহিত করার সুযোগ ছিল এবং তার আবির্ভাবের পরই মুজিব বাহিনীর অপরাংশ দ্বারা গঠিত হয় জাসদ।[৩৮২] এরপর মুজিব বাহিনীর তৃতীয় এক অংশের অন্তর্ভুক্তি ঘটে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে ১৯৭২ ও '৭৩ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। ১৯৭৩ সালের মধ্যেই পেশাগত প্রশিক্ষণবিহীন অবস্থাতে অনেক 'ম্যাজিস্ট্রেট'-এর পদায়ন সম্পন্ন হয়, অভিযোগ উঠেছিল, এদের অধিকাংশ মুজিব বাহিনীর সদস্য।[৩৮৩] তড়িঘড়ি করে এভাবে বিশেষ ক্যাডার নিয়োগের পেছনে যেসব উদ্দেশ্য ছিল বলে অনুমান করা হয় তার মধ্যে রয়েছে প্রশাসনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের চলে যাওয়াজনিত শূন্যতা পূরণ; এবং 'নিজস্ব লোক' বসিয়ে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। তবে রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ যেমন মূল সামরিক আমলাতন্ত্র মেনে নিতে পারেনি, তেমনি প্রশাসনে রাজনৈতিক কর্মীদের অন্তর্ভুক্তিকেও বেসামরিক আমলাতন্ত্র চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছিল। আমলাতন্ত্রের এইরূপ মনোভাব সম্পর্কে নীতিনির্ধারকরা যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ হিসেবে তখনকার দৈনিক বাংলার বাণীতে শেখ মণি'র কলামগুলোর উল্লেখ করা যায়। যেমন ১৮ সেপ্টেম্বর (১৯৭২) তিনি লিখছেন, 'এরা (আমলারা) বর্তমান সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন।...এদের কেউ কেউ প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তে মেতে উঠতে পারে।...এরা আমেরিকাসহ পশ্চিমা শক্তির দ্বারা

---

৩৭৯ পূর্বোক্ত। ১৯৮৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর লেখক মাসুদুল হককে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী চুক্তির সত্যতা সম্পর্কে জানান। দেখুন, মাসুদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪১-৪২।

৩৮০ আবদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৪।

৩৮১ *দৈনিক গণকণ্ঠ*, ৩ জুন ১৯৭৩, ঢাকা।

৩৮২ রক্ষীবাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশের কয়েক মাস পরই জাসদের জন্ম হয় ১৯৭২-এর ৩০ অক্টোবর।

৩৮৩ অনেকটা এই অভিযোগের স্বীকৃতি দিয়েই সেসময় তাত্ত্বিক যুক্তি হিসেবে শেখ মণি বাংলার বাণীতে লিখেন, 'মোনায়েম খান, নুরুল আমীনের রিক্রুট করা রাজ কর্মচারী দিয়ে শেখ মুজিবের সোনার বাংলা গড়া যাবে না। মুজিবের শাসনে এরা কেবল বেমানানই নয়, একান্ত ই অবাঞ্ছিত।' *দেশ সমাজ রাজনীতি: শেখ মণি'র ভাবনা*, সম্পাদনা : ফকীর আবদুর রাজ্জাক, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৮-২৯।

লালিত হয়েছে। চীনের সঙ্গে এদের সংযোগ ছিল। এরা সমাজতন্ত্রের বিরোধী।' সুতরাং 'এদের বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান নয়, উচ্ছেদ অভিযান চালাতে হবে।'[৩৮৪] এইরূপ হুমকি কেবল কথার কথা ছিল না। একাত্তরের জানুয়ারির শেষ দিকে ৫৩ জন সরকারি কর্মকর্তাকে এই বলে চাকরিচ্যুত করা হয় যে, তারা 'উৎসাহের সঙ্গে'

---

৩৮৪ দেখুন, বাংলার বাণী, *দুর্নীতি ও আমলাতন্ত্র*, ১১ মে ১৯৭২, ঢাকা। বেসামরিক প্রশাসন সম্পর্কে ১৯৭২ সালে শেখ ফজলুল হক মণি বাংলার বাণীতে ধারাবাহিকভাবে প্রচুর কলাম লিখেছেন। এসব সিরিজ লেখার একক শিরোনাম দিয়েছিলেন তিনি *'বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লব আসবে।'* অর্থাৎ আমলাতন্ত্রকে তিনি সম্ভাব্য প্রতিবিপ্লবের প্রধান এক ভরকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এর বিকল্পও বলে দিয়েছিলেন তিনি এভাবে : *'মুজিবের শাসন চাই, আইনের শাসন নয়।'* দেখুন, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিই প্রশাসনে রাজনৈতিক মতাদর্শের কর্মীদের অন্তর্ভুক্তি বেগবান করে। যেসব সরকারি কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধকালে কলকাতা গিয়েছিল এবং যারা যায়নি উভয়ের মধ্যে একটি ভেদরেখা টেনে প্রথমোক্তদের অধিক বিশ্বস্ত হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টাও লক্ষ্যণীয় ছিল এ সময়। যদিও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যতই চরমপন্থী 'কমিউনিস্টদের' প্রতিবাদ-বিক্ষোভ বাড়ছিল ততই পুরানো 'অভিজ্ঞ' আমলাদের ডাক পড়ছিল সরকারে– যাদের এতদিন 'দালাল' হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এক পর্যায়ে দেখা যায়, সেন্ট্রাল সার্ভিস অব পাকিস্তানের ১৯১ জন বাঙালি কর্মকর্তার ১৮০ জনই মুজিব প্রশাসনে জায়গা করে নিয়েছেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধকালীন কলকাতার প্রবাসী সরকারে যোগ দেয়া সিএসপি কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ১৩। ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। ডাক পাওয়া এই কর্মকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন একাত্তরের আগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষিত এ বি এম সফদার, আবদুর রহিম প্রমুখ। এরা দু'জনই ছিলেন পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসের লোক। সফদার যুদ্ধের সময় ঢাকায় পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা ছিলেন। যুদ্ধের পর পশ্চিম পাকিস্তানিদের 'সহযোগিতা'র জন্য এক দফা আটকও হন। কিন্তু তাঁকেই মুজিব Invigilation Director করেন– যার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার তদারকি। জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্থা এনএসআই-এরও প্রধান করা হয় তাঁকে। অন্যদিকে আবদুর রহিমকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের একজন সেক্রেটারি করে নেয়া হয়। শাসনামলের শেষের দিকে মুজিব পুরানো আমলাদের ওপর কতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন তার নজির হিসেবে লক্ষ্য করা যায় 'সমাজতন্ত্র' কায়েমের জন্য যখন তিনি বাকশাল নামক দলের পত্তন করেন তখন তার ১১৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৯ জন সিএসপি কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। যারা আবার বাকশালের আওতায় 'জেলা গভর্নর'ও ছিলেন। অথচ এই একই আমলাদের সম্পর্কে মুজিব শাসনামলে রচিত প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন সদস্যদের মূল্যায়ন ছিল এ রকম:

> They (the bureaucrats) can be neither innovators nor catalytic agents for social change....It is only a political cadre with firm roots in the people and motivated by the new ideology and willing to live and work among the people as one of them that can mobilize the masses and transform their pattern of behavior.

Aftab Ahmed, *Politics Ethnicity and Security: Bangladesh and South Asian Perspective*, Riverside Press, 2012, Dhaka, p. 15, 20, 33.

পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন দিয়েছিলেন।[৩৮৫] অন্যদিকে একই অভিযানের অপর অংশ হিসেবে স্বাধীনতা-উত্তর নতুন দেশের প্রশাসনে সরকার তার পছন্দসই 'মুক্তিযোদ্ধা'দের 'নিয়োগ' দেওয়ারও উদ্যোগ নেয়। এক্ষেত্রে মুজিব বাহিনীর তরুণরা যে অগ্রাধিকার পেয়েছিল সে বিষয়ে ইতোমধ্যে এই বাহিনীর অন্যতম সংগঠক আবদুল মান্নান চৌধুরীর বক্তব্য এই লেখার অন্যত্র তুলে ধরা হয়েছে।[৩৮৬]

সাধারণত প্রশাসনের উচ্চতর পদে নিয়োগের বিষয়টি তদারকের দায়িত্ব পাবলিক সার্ভিস কমিশনের। বাংলাদেশে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কার্যক্রমের ওপর স্বনামধন্য একজন গবেষক হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ (পরবর্তীকালে তিনি ত্রিশালের কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।) তাঁর দেওয়া বিবরণ[৩৮৭] থেকে জানা যায়, স্বাধীনতার পর প্রশাসনে মানবসম্পদের যে ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়– তার মোকাবেলায় দ্রুত নিয়মতান্ত্রিক কোনো নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা যায়নি। ১৯৭২ সালের অক্টোবরে প্রথম 'আনুষ্ঠানিকভাবে' প্রশাসনের উচ্চতর পদে (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে) নিয়োগ শুরু হয় এবং তা কেবল 'মুক্তিযোদ্ধা'দের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় লিখিত পরীক্ষা ছিল না। স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং 'মুক্তিযোদ্ধা' হলেই যেকেউ 'মৌখিক পরীক্ষা' দিয়ে এই নিয়োগ পেতে পারতেন। প্রশাসনের প্রথম ব্যাচের ঐ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ২ হাজার ৩৫১ জন অংশ নিয়েছিলেন এবং প্রায় সকলে নিয়োগ পান।

এরপর ১৯৭৩ সালের জুনে আবার অনুরূপ নিয়োগ উদ্যোগ নেয়া হয়। এবার অবশ্য মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি 'মুক্তিযোদ্ধা নয়' এমন প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ রাখা হয় এবং প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সের একটি মানদণ্ডও ঠিক

---

৩৮৫ পরে অবশ্য এই কর্মকর্তাদের মধ্যে দুইজন ছাড়া আর সবাই নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন। দেখুন, Aftab Ahmed, *ibid*, p.18. বাস্তবে প্রশাসনে এসময় ভিন্ন একটি বাস্তবতা কাজ করছিল– যার আলোকপাত করেছেন সেই সময়কার প্রাজ্ঞ আওয়ামী লীগ নেতা মো আবদুল মোহাইমেন। তিনি ১৯৭০-এ প্রাদেশিক ও ১৯৭৩-এ জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন। বাহাত্তরে দেশের প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে শেখ মণিদের ধারাবাহিক সমালোচনা ও তিরস্কার সত্ত্বেও মোহাইমেন লিখেছেন, '১৯৭২-এ আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন আমলা ও অফিসারদের সংখ্যা সমগ্র দেশে কমপক্ষে ৫০ হাজার ছিল। সীমান্ত অতিক্রম করে প্রবাসী সরকারে যারা যোগ দিয়েছে তাদের সংখ্যা এক হাজার হবে কি না সন্দেহ। এমতাবস্থায় উপরোক্ত ৫০ হাজার আমলা অফিসারদের অপসারণ করলে সেই শূন্যতা আমরা পূরণ করতাম কাদের দিয়ে?...প্রশাসন, ভূমি রাজস্ব, বিচার ও পুলিশ বিভাগ পরিচালনার মতো উপযুক্ত জ্ঞান সম্পন্ন প্রয়োজনীয় লোক পার্টিতে পাওয়া যেত কি না খুবই সন্দেহের বিষয়...।' দেখুন: মো. আবদুল মোহাইমেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮।

৩৮৬ দেখুন, ১১ নং তথ্যসূত্র।

৩৮৭ Syed Giasuddin Ahmed, *Ibid*, p. 103-105.

করা হয়েছিল এবং মৌখিক পরীক্ষার আগে সংক্ষিপ্ত লিখিত পরীক্ষাও হয়। এই দ্বিতীয় ব্যাচে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল ১০৭৪ জন। উপরোক্ত দুটি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অধ্যাপক সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ তাঁর গবেষণাগ্রন্থে লিখেছেন :

> Most of the 1972 and 1973 recruits lacked such qualification and personal traits as high academic achievements, caliber, integrity and leadership generally demanded of a civil servant.[৩৮৮]

আরেকজন গবেষক শেখ আবদুর রশিদের অনুসন্ধান থেকে সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ উল্লিখিত ১৯৭২ সালের উপরোক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। আবদুর রশিদ তথ্য-প্রমাণসহ জানাচ্ছেন,[৩৮৯] ১৯৭২ সালের জুনে এবং জুলাইয়ে এসে দুটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এইরূপ 'স্পেশাল সুপিরিয়র সার্ভিস'-এ নিয়োগের জন্য। প্রথম বিজ্ঞাপন ছিল শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য; দ্বিতীয়টি ছিল শুধু অমুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। একই পদের জন্য হলেও দুটি বিজ্ঞাপনে প্রার্থীদের জন্য শর্ত ছিল ভিন্ন। যেমন অমুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীদের জন্য বয়সের শর্ত ছিল ২১ থেকে ২৭; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সেই শর্ত ছিল অনেক নমনীয়– ২১ থেকে ৩৫ বছর। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিজ্ঞাপনে ৩৫০টি পদের উল্লেখ থাকলেও নিয়োগ পেয়েছিলেন সেখানে ১ হাজার ৩১৪ জন। মুক্তিযোদ্ধা প্রমাণের শর্তও ছিল অনেক নমনীয়। সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়কের প্রমাণপত্রের বদলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের দেওয়া সনদপত্র হলেও যে কোনো প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত হতেন। উল্লেখ্য, মূলত বিএলএফ-এর যোদ্ধারাই যে স্বরাষ্ট্রসচিবের সনদপত্রধারী ছিলেন সে বিষয়ে এ লেখার অন্যত্র আলোকপাত করা হয়েছে। পুরো চাকরি জীবনে এই *মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা*রা বিসিএস (প্রশাসন), বিসিএস (সচিবালয়)সহ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডারে চাকরি করলেও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হলো, দীর্ঘ আট বছর চেষ্টার পরও পাবলিক সার্ভিস কমিশন এদের 'মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কিত তথ্যাদি' হালনাগাদ করতে পারেনি। এ বিষয়ে *সংযুক্তি আটাশ*-এ বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

---

৩৮৮ দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনে উক্তরূপ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে চেয়ারম্যান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কিউ এম বজলুর করিম এবং সদস্য ছিলেন, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (সরকারি কলেজে প্রাক্তন প্রিন্সিপাল), আলিমদাদ খান (প্রাদেশিক প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা), আওলাদ হোসেন (প্রাদেশিক প্রকৌশল বিভাগের একজন কর্মকর্তা)।

৩৮৯ Sheikh Abdur Rashid, *Civil Service At the Cross-roads*, Muktochinta Prokashona, Dhaka, 2008, p. 99. এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া (পৃ. ৩৬৭) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ১৯৭২ সালের আলোচ্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন সংযুক্তি *ছাব্বিশ*-এ।

অন্যদিকে আরেকজন প্রখ্যাত আমলা ও প্রশাসন বিষয়ে গবেষক এ এম এম শওকত আলীর অনুসন্ধান থেকে জানা যায়,[৩৯০] ১৯৭২-৭৩ সালে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উচ্চতর পদগুলোতে 'মুক্তিযোদ্ধা'দের সুবিধাজনক উপায়ে নিয়োগ দেওয়ার পাশাপাশি– জাতীয়করণকৃত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চতর পদগুলোতেও শুধু একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগ পান ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে।[৩৯১] শিল্প মন্ত্রণালয়ের 'ন্যাশনালাইজড ইন্ড্রাস্ট্রিজ ডিভিশন' (NID)-এর মাধ্যমে এই নিয়োগ দেওয়া হয় কেবল মৌখিক পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে। প্রথমে বলা হয়েছিল, এরা এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ পাচ্ছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এভাবে নিযুক্তদের ক্যাডার নাম দেওয়া হয়, 'ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস' (IMS)। নিয়োগের দীর্ঘ তিন বছর পর এইরূপ নিয়োগের বিধিবিধানের গেজেট প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে। অর্থাৎ 'রিক্রুটমেন্ট রুল' তৈরির তিন বছর আগেই রিক্রুটমেন্ট হয়ে গিয়েছিল আলোচ্য ক্ষেত্রে! বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশন ও ব্যাংকে বিচরণ শেষে এইভাবে নিয়োগপ্রাপ্তদের ১৫০ জনকে ১৯৮২ সালের ১৪ নভেম্বর বিসিএস (প্রশাসন)-এ সংযুক্ত করে নেয়া হয়েছিল– যদিও IMS-দের সর্বমোট সংখ্যা ছিল আরো অনেক বেশি এবং বাকিরা অন্যত্র কর্মরত থেকে যান। এসব নিয়োগ সম্পর্কে পাবলিক সার্ভিস কমিশনেরও কোনো মতামত নেয়া হয়নি– যদিও সংবিধানের ১৪০(২) ধারা অনুযায়ী তার প্রয়োজন ছিল। এতদবিষয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মন্তব্য ছিল : 'এসব নিয়োগ নিশ্চিতভাবেই ব্যতিক্রমধর্মী এবং অস্বাভাবিক। ইহাতে প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে প্রার্থী নির্বাচন সংক্রান্ত সংবিধানের ধারা লঙ্ঘিত হইয়াছে।'[৩৯২] উপরোক্ত তথ্যাদি উল্লেখ শেষে এ এম এম শওকত আলী বলেছেন,

> Politicalization of the recrument process started with politics of patronage for the freedom fighters by waiving the requirement of written examination as a test for recrument.

উল্লেখ্য, প্রশাসনে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের প্রক্রিয়াটি এ দেশে পরেও আর খুব বেশি রাজনৈতিক স্বীকৃতি পায়নি বরং মুজিব সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রথম যে অন্তবর্তীকালীন নিয়োগ নীতি ঘোষণা করেছিল তাতে প্রবর্তিত কোটা পদ্ধতিতে মেধার ভিত্তিতে পূরণের জন্য মাত্র ২০ শতাংশ পদ বরাদ্দ করা হয়!

---

৩৯০ A M M Shawkat Ali, *Bangladesh Civil Service, A political-Administrative Perspective*, UPL, Dhaka, 2004, p. 96-97.

৩৯১ ঐ রেজুলেশনের স্মারক নং ছিল : NID [estbt] 36/73-2538. August 1, 1973.

৩৯২ আইএমএস ক্যাডারের নিয়োগসংক্রান্ত অনিয়ম সম্পর্কে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পর্যবেক্ষণের জন্য দেখুন: সংযুক্তি *সাতাশ*।

প্রশাসনের উচ্চতর স্তরে পছন্দ মাফিক নিয়োগের পটভূমি হিসেবে এ সময় খোদ পাবলিক সার্ভিস কমিশনও পছন্দ মাফিকভাবে গড়ে তোলা হয়। ১৯৭২ সালের মে মাসে প্রথম পাবলিক সার্ভিস কমিশন গড়ে তোলার সময় যাঁকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় সেই ড. এ কিউ এম বজলুল করিম ছিলেন মৃত্তিকা বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক! সাধারণ বিবেচনা এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আশা করা হয়েছিল নবীন দেশটির প্রশাসন গড়ে তোলার জনসম্পদ বাছাই করতে নবীন এই কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা হবেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে উচ্চতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন খ্যাতনামা বাঙালি কর্মকর্তা বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লোক প্রশাসনের খ্যাতনামা শিক্ষক। কিন্তু তা কার্যত ঘটেনি বরং কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়া তীব্র হতাশার জন্ম দেয় ঐসময়। যার ছাপ পড়ে অধ্যাপক সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদের নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণে :

> Chairman Dr. B. Karim had no previous experience in the government service, nor was he known to have any special ability in the sphere of public or personal administration. He had, however, been a teacher of an influential political leader, Tufail Ahmed, who served as the Political Secretary to Sheikh Mujib during the AL regim. Perhaps that link was the basis for Dr. Karim's appointmen as Chairman of the PSC (First). It is likely that the appointment of the other three members was made on a similar basis.[৩৯৩]

তোফায়েল আহমেদ ও ড. বি. করিমের মাঝে সম্পর্কের যে ইঙ্গিত করেছেন অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ সেই সূত্রেই বাহাত্তর-তিহাত্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় পদে 'মুক্তিযোদ্ধা'দের নিয়োগ অগ্রাধিকার অনেকাংশে মুজিব বাহিনীর নিয়োগ অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছিল এবং এরই ফলে নিয়োগপ্রাপ্তদের অনানুষ্ঠানিক প্রশাসনিক পরিচয় হয়ে ওঠে 'তোফায়েল ক্যাডার।'

জাসদ, রক্ষীবাহিনী এবং প্রশাসন ছাড়াও চতুর্থ আরেকটি ধারাতে সচেতনভাবে মুজিব বাহিনীর এক দল সংগঠক থেকে যায়– তা হলো আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন 'যুবলীগ'-এ। ১৯৭২ সালের ১১ নভেম্বর এর গোড়াপত্তন।[৩৯৪] শেখ ফজলুল হক মণি হন প্রথম সভাপতি এবং নূরে আলম

---

৩৯৩ Syed Giasuddin Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, The University of Dhaka, 1986, P. 291, Dhaka.

৩৯৪ যুবলীগের প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ ছিল বলে দাবি করেছেন শেখ মণি। ১৯৭৪ সালের ১১ নভেম্বর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক আলোচনাসভায় তিনি

সিদ্দিকী ছিলেন প্রথম সাধারণ সম্পাদক। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এর দ্বিতীয় সম্মেলনেও মণি এর সভাপতি থাকেন এবং সাধারণ সম্পাদক করা হয় সৈয়দ আহমদকে। মুজিব বাহিনীতে সৈয়দ আহমদ ছিলেন আবদুর রাজ্জাকের প্রধান সহকারী। উল্লেখ্য, বাকশাল গঠনের সময় যুবলীগের প্রধান হন মুজিব বাহিনীর প্রধান চারজনের আরেকজন তোফায়েল আহমেদ। এসময় তাঁর আরেকটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় ছিল 'রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী' তথা 'রাজনৈতিক সচিব।'[৩৯৫] রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে রাজনৈতিক সচিবের মাধ্যমেই রক্ষীবাহিনীতে রাজনৈতিক নির্দেশনা আসত বলে ধারণা করা হতো।[৩৯৬] তাঁকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাও দেওয়া হয়– যদিও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে প্রশাসনিকভাবে তাঁর উপরেই অবস্থান ছিল মুখ্যসচিব রুহুল কুদ্দুসের। রক্ষীবাহিনীর কাজে তোফায়েল আহমেদের প্রভাব সম্পর্কে ভিন্নতর মতামত দিয়েছেন এই বাহিনীর উপ-পরিচালক আনোয়ার উল আলম। তাঁর ভাষায়, 'প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব রুহুল কুদ্দুস রক্ষীবাহিনী সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁকে সাচিবিক সহায়তা করতেন প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের যুগ্ম-সচিব মনোয়ারুল ইসলাম।...রক্ষীবাহিনী সম্পর্কিত কোনো নথি বা ফাইল প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবের কাছে যেতে দেখিনি।...তোফায়েল আহমেদ রক্ষীবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন এটা একেবারেই মিথ্যা।'[৩৯৭] তবে আনোয়ার উল আলম একই গ্রন্থে (পৃ. ১৫৪) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

> 'তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে আমরা (লেখক ও অন্য উপ-পরিচালক সারোয়ার হোসেন মোল্লা) বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। ঠিক হলো, আমরা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবো। তাঁর সঙ্গে

বলেন: 'স্বাধীনতার পর যুবসমাজ নৈরাজ্য ও অবক্ষয়ে ভুগিতেছিল উহা কাটাইয়া উাার প্রয়োজনে ও অর্জিত স্বাধীনতাকে জোরদার ও অর্থবহ করার জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যুবলীগ গঠন করা হয়।' *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ নভেম্বর ১৯৭৪, ঢাকা।

৩৯৫ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের এই শক্তিশালী অবস্থান আওয়ামী লীগে বরাবর ধরে রেখেছিলেন তোফায়েল আহমেদ। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত দলটির দ্বিতীয় দফা শাসনামলে তিনি শিল্পমন্ত্রী হন। ২০০৯ থেকে দলটির তৃতীয় দফা শাসনামলে তিনি জাতীয় সংসদের শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি হন।

৩৯৬ সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে ছিলেন একজন যুগ্ম-সচিব। প্রধানমন্ত্রী থেকে সিদ্ধান্ত যেত রাজনৈতিক সচিবের কাছে; সেখান থেকে যেত নির্ধারিত যুগ্মসচিবের মাধ্যমে রক্ষীবাহিনীর পরিচালকের কাছে– এই ছিল রক্ষীবাহিনীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া।

৩৯৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩-১৪।

আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, সারোয়ার ও আমি সাভারে যাবো। লিডার শেখ দলিল উদ্দিনকে সাভারে যাওয়ার পথ রেকি করতে পাঠানো হয়...।'

উপরোক্ত দু'টি বক্তব্য স্পষ্টত পরস্পর বিরোধী। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব রুহুল কুদ্দুসই যদি আলোচ্য বাহিনীটির *যাবতীয় বিষয়* নিয়ন্ত্রণ করতেন– যেমনটি দাবি করেছেন আনোয়ার উল আলম, তাহলে কেন বঙ্গবন্ধু হত্যা প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিতে তোফায়েল আহমেদের প্রয়োজন হলো। প্রশাসনিকভাবে এইরূপ স্পর্শকাতর প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমেদের ভূমিকা রাখার সুযোগইবা কোথায় বা তিনি সরকারের একটি বাহিনীকে প্রতিরোধ যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত দেওয়ার এখতিয়ার কীভাবে রাখেন; একটি শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা এভাবে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির সিদ্ধান্তে কোনো ধরনের যুদ্ধে নামতে পারেন কি না– এসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠে। উপরোক্ত কর্মকর্তা অবশ্য তাঁর গ্রন্থে এসব প্রসঙ্গের কোনো ব্যাখ্যা দেননি। বাস্তবে রক্ষীবাহিনীর তৎপরতাকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে দেশের সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন যে পুরোপুরি কর্তৃত্বহীন ছিল সে বিষয়টি ৫.ঙ উপ-অধ্যায়ে একজন বামপন্থী নেতার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে পাঠক দেখতে পাবেন। উল্লেখ্য, রক্ষীবাহিনী ছাড়াও 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে' মুজিব শাসনামলে ঢাকায় পুলিশের একটি 'স্পেশাল বাহিনী'ও সক্রিয় ছিল। তখনকার বামপন্থী নেতা হায়দার আকবর খান রনোর ভাষায়, 'বড় ভয়ংকর ছিল এদের (স্পেশাল বাহিনী) কাজ। সাদা টয়োটা গাড়িতে ঘুরে বেড়াত তারা। হঠাৎ কাউকে সন্দেহজনক মনে হলে গাড়িতে তুলে নিয়ে উধাও হতো। আর খোঁজ পাওয়া যেত না তার।'[৩৯৮]

দেশে স্বাধীনতা-উত্তর নতুন পরিস্থিতিতে জাসদ, যুবলীগ, রক্ষীবাহিনী ইত্যাদির বাইরে মুজিব বাহিনীর পঞ্চম এক ক্ষুদ্র বিকাশ ধারা হিসেবেই চিহ্নিত করা যায় স্বেচ্ছাসেবক লীগকে। এটা গড়ে উঠেছিল আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে। শেখ মণি ও তোফায়েল আহমেদের বাইরে এসময় মুজিবের পাশে মুজিব বাহিনীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন আবদুর রাজ্জাক। উল্লেখ্য, পঁচাত্তরের পরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলেও যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের কার্যক্রম ও সক্রিয়তায় কোনো ছেদ পড়েনি কখনো।

উপরোক্ত ধারাগুলোর বাইরেও সেই সময়ের আরেকটি বহুল আলোচিত সংগঠন ছিল 'লাল বাহিনী।' গণবাহিনী ও রক্ষীবাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনাকালে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলো ছিল অনেকাংশে মুজিব বাহিনীর জনবলেরই নতুন কাঠামোগত রূপ। কিন্তু লাল বাহিনীর উৎস ছিল সে

---

৩৯৮ হায়দায় আকবর খান রনো, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৩।

অর্থে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এটা ছিল রক্ষীবাহিনীর একটি সহায়ক মারমুখী শক্তি– যা গড়ে উঠেছিল আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন 'শ্রমিক লীগ'-এর নেতৃত্বে। এই বাহিনী গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নান। স্বাধীনতার আগে এই আবদুল মান্নান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন করতেন। যে সংগঠনটি গড়ে তুলেছিল কমিউনিস্ট পার্টি 'আরএসপি'। এই সংগঠনের সঙ্গে নির্মল সেন, নেপাল নাহা, রুহুল আমিন কায়সার প্রমুখ যুক্ত ছিলেন। মান্নান ছিলেন নেপাল নাহা'র তৈরি সংগঠক। কিন্তু ছয়দফা আন্দোলনের সময় ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খানদের নৈকট্যে ও প্রভাবে আওয়ামী অঙ্গ সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগে আসেন। তবে জাসদ গঠনের পর আবদুল মান্নান আর সিরাজুল আলম খানদের সঙ্গে থাকেননি। তিনি তখন শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ মণি'র প্রভাববলয়ে চলে যান।

স্বাধীনতার পর লাল বাহিনীর তৎপরতার কেন্দ্র ছিল দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল। প্রথমে এই বাহিনী একটি ইতিবাচক উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন শিল্পাঙ্গনে সরকারি ও উর্দুভাষীদের কারখানা দখলের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল ঐ সময়। এইরূপ অবৈধ ও নৈরাজ্যকর অবস্থা থেকে কলকারখানা রক্ষার জন্যই প্রথমে লাল বাহিনীর গোড়াপত্তন। কারখানা রক্ষার সঙ্গে শ্রমিকদের রুটি-রুজির সম্পর্ক ছিল। তবে দ্রুত এই বাহিনীর মূল লক্ষ্য হারিয়ে যায়। অনেকটা একাত্তরের স্বাধীনতার আগে যেভাবে শিক্ষাঙ্গনে মোনায়েম খানের আনুকূল্যে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন বা এনএসএফ নামের পেটোয়া ছাত্র সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছিল সেভাবেই বিভিন্ন শিল্পাঙ্গনে শ্রমিক নামধারীদের 'লাল বাহিনী'র কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী বাম সংগঠনগুলোকে উৎখাত করা এবং সর্বগ্রাসী চাঁদাবাজি হয়ে পড়ে এদের কার্যক্রমের প্রধান অংশ। বিরোধী দলগুলোর সমর্থক প্রায় সব সিবিএ ইউনিয়ন হাইজ্যাক করে এরা। তবে 'রাজাকার ও সমাজ বিরোধীদের নির্মূল'-এর নামেই এসব হচ্ছিল। লাল বাহিনী বিশেষভাবে 'বিহারি' নামে পরিচিত উর্দুভাষীদের ওপর আক্রমণাত্মক ছিল। ঢাকায় বাহাত্তরের মে দিবসের সমাবেশে আবদুল মান্নান ঘোষণা দেন, 'সরকার যদি বিহারিদের আটক ও বিচার না করে তাঁর সংগঠনই সেই কাজটি করবে।' লাল বাহিনীর ক্যাডাররা লাল জামা পরত। মাথায় লাল একটি শিরস্ত্রাণও থাকত তাদের।

১৯৭২-এর জুন থেকে লাল বাহিনী ঘোষণা দিয়ে কথিত 'সমাজ বিরোধী'দের বিপক্ষে 'শুদ্ধি অভিযান' শুরু করে। এমনকি নিজস্ব অভিযানকালে আটককৃতদের 'শাস্তি' প্রদানের আইনগত ক্ষমতাও চাচ্ছিল তারা।[৩৯৯] এইরূপ এক শুদ্ধি

---

[৩৯৯] দেখুন, আশরাফ কায়সার, *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৯।

অভিযানেরই করুণ শিকার হন আহমেদ ফজলুর রহমান। যিনি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ, আগরতলা মামলায় সহ-অভিযুক্ত এবং মুক্তিযুদ্ধের আগে যেসব উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে গোপনে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন তাদের একজন। ১৯৭৩ সালের ৩০ এপ্রিল 'মে দিবস'-এর পূর্বদিন ঢাকায় ব্যাপকভিত্তিক 'শুদ্ধি অভিযান'কালে লাল বাহিনীর কয়েক ডজন সদস্য আহমেদ ফজলুর রহমানকে ধানমন্ডির বাসভবন থেকে মারতে মারতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় শ্রমিক লীগ অফিসে। সেখানে স্বয়ং বাহিনী প্রধান আবদুল মান্নানের জেরার মুখে পড়েন ফজলুর রহমান। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর ১৩টি পেট্রোল পাম্প দখলের অভিযোগ আনে লাল বাহিনী। পরে খোদ প্রধানমন্ত্রিকে ফোন করে শ্রমিক লীগ অফিস থেকে মুক্তি পান জনাব রহমান। পরদিন ঢাকার অনেক দৈনিকে এই খবর প্রকাশিত হয়। আহমেদ ফজলুর রহমান লালবাগ থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করেছিলেন (নম্বর : ১৪/৩০ এপ্রিল)।[৪০০]

বলা বাহুল্য, এইরূপ অভিযান ও শাস্তি উভয়ই ছিল প্রশাসনিক নৈরাজ্যের চরম দৃষ্টান্ত এবং অভিযানকালে আটককৃত সবার পক্ষে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সহানুভূতি পাওয়া সম্ভব ছিল না। টঙ্গী, বাড়বকুণ্ড, কালুরঘাট ইত্যাদি স্থানে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলোর বহু শ্রমিক সংগঠক নির্মম নির্যাতনের শিকার হয় এই বাহিনীর হাতে। তবে জাসদপন্থী শ্রমিক লীগের নেতা মেসবাহ্উদ্দীন আহমেদ মনে করেন, 'কিছুকিছু ক্ষেত্রে লাল বাহিনীর নেতিবাচক কর্মকাণ্ড বাস্তবতার তুলনায় অতিরিক্ত প্রচার পেয়েছে।'[৪০১]

১৯৭৫ সালের ২ জানুয়ারি বাকশাল গঠনকালে লাল বাহিনীর নেতা আবদুল মান্নান শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক উদ্যোগের বিরোধিতা করলে দুর্নীতির অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে এই বাহিনীর কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত হয়। এর আগে মান্নান বাকেরগঞ্জ থেকে পার্লামেন্ট মেম্বারও নির্বাচিত হয়েছিলেন। মান্নানকে অপসারণের পর অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, লাল বাহিনীর কার্যক্রম ছাড়াও তিয়াত্তর-চুয়াত্তরে শিল্পাঞ্চলগুলোতে ব্যাপকভাবে আঞ্চলিকতার বিষবাষ্পও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শিল্প উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। শিল্পাঙ্গনে এরূপ অস্থিরতার মাঝেই ১৯৭৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ড শিল্পাঞ্চলে আর আর

---

৪০০ ১ ও ৩ মে, *দৈনিক গণকণ্ঠ*, ঢাকা। আলোচ্য ঘটনার পুরো বিবরণ দিয়ে আহমদ ফজলুর রহমান গণমাধ্যমে যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি এও উল্লেখ করেন যে, শ্রমিক লীগ অফিসে লাল বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে যখন নিপীড়ন চালাচ্ছিলো তখন সেখানে সরকারপন্থী ছাত্রলীগের সভাপতি শহীদুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন।

৪০১ মেসবাহ্উদ্দীন আহমেদ-এর সাক্ষাৎকার, *পূর্বোক্ত*।

টেক্সটাইল মিলে কেবল একটি ঘটনাতেই প্রায় ২২ জন শ্রমিক মারা যায়। স্থানীয় জেলা প্রশাসন অবশ্য প্রেসরিলিজে ৯ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে। আর দৈনিক গণকণ্ঠ মৃতের সংখ্যা ৫০ বলে উল্লেখ করে। বাঁশের তৈরি গুচ্ছগ্রামের মতো শ্রমিক কলোনিতে চারদিক থেকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারপর তিন দিক থেকে গুলি ছোড়ার মাধ্যমে এই আক্রমণ হয়। এ নিয়ে পরদিন চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লায় হরতাল পালিত হয়।[৪০২] গণমাধ্যমের ভাষ্য থেকে জানা যায়, নোয়াখালী অঞ্চলের শ্রমিক প্রাধান্যপূর্ণ এই কারখানায় কিছুদিন পর সিবিএ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল– কিন্তু কোনোভাবেই সরকার দলীয় শ্রমিক সংগঠনটি তার শাখা স্থাপন করতে পারছিল না; তারই প্রতিশোধ ছিল এই হামলা।[৪০৩]

৫.গ. মুজিব বাহিনীর অন্তর্বিরোধ যখন সংবাদপত্র শিল্পে : বাংলার বাণী বনাম গণকণ্ঠ

> One cannot wage war under present conditions without the support of public opinion, which is tremendously molded by the press and other forms of propaganda.
>
> - General Douglas MacArthur
> (26 January 1880 – 5 April 1964)

> The media—stenographers to power.
>
> - Amy Goodman (born April 13, 1957) is an American broadcast journalist

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে, স্বাধীনতা-উত্তর মাত্র ১২ মাসের মধ্যে পাঁচটি ধারায় মুজিব বাহিনীর নব আঙ্গিকে বিকাশ ধারার সূচনা ঘটে। সাংগঠনিক এই বিস্তৃতির গুরুত্বপূর্ণ এক নতুন উপাদান ছিল সংবাদপত্র শিল্পে মুজিব বাহিনীর বিভিন্ন গ্রুপের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ ফজলুল হক মণি ১৯৭২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি 'বাংলার বাণী' পত্রিকা দৈনিক হিসেবে প্রকাশ শুরু করেন। তিনিই এর সম্পাদক-প্রকাশক-মুদ্রাকর ছিলেন। যদিও ১৯৭০ সালের ১১ জানুয়ারি যখন বাংলার বাণী সাপ্তাহিক হিসেবে প্রথম প্রকাশ শুরু হয় তখন তার মালিক-সম্পাদক ছিলেন

---

৪০২ দেখুন, Kamruddin Ahmad, *Labour Movement in Bangladesh*, Inside Library, Dhaka, 1978, p. 117.

৪০৩ দৈনিক *গণকণ্ঠ*, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, ঢাকা।

জনৈক হাফেজ হাবিবুর রহমান।[৪০৪] স্বাভাবিকভাবে ধারণা করা যায়– মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে এর মালিকানা পরিবর্তন হয়। যুদ্ধকালে এই পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশের দায়িত্বে ছিলেন আমির হোসেন।[৪০৫] দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মালিকানা পরিবর্তন হয়ে নতুন ব্যবস্থাপনায় প্রকাশের শুরু থেকে 'মুজিব বাহিনী'র শেখ মণি গ্রুপের স্বাধীনতা-উত্তর মুখপাত্র হয়ে ওঠে বাংলার বাণী। পরে তা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগেরই তাত্ত্বিক মুখপত্র হয়ে ওঠে। ফজলুল হক মণি ১৯৭৪ সালের ৭ মে বাংলাদেশ টাইমস্-এরও সম্পাদক হন। সিনেমা নামেও একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি ১৯৭৩ সালের আগস্টে। এভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী মাত্র ২০ মাসে তিনি সংবাদপত্র শিল্পের এক বিশাল ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখনিও ছিল ক্ষুরধার ও সাহসী। বিপরীতে সিরাজুল আলম খানকে ঐ সময়ে লিখতে দেখা যায়নি। তবে বাংলার বাণীর পাল্টা হিসেবে মুজিব বাহিনীর সিরাজুল আলম খান গ্রুপ প্রকাশ করেছিল দৈনিক গণকণ্ঠ।

মুজিব বাহিনীর উভয় পক্ষই তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে গণমাধ্যমের গুরুত্ব বুঝে ছিলেন চটজলদি। কিন্তু প্রচার সাম্রাজ্যে তাঁদের সূচনা মুখ্যত জবরদস্তিমূলকই ছিল বলা যায়। স্বাধীনতার পর সিরাজুল আলম খান গ্রুপের পক্ষ থেকে আফতাব আহমাদ অবস্থান নেন ৩১/এ র‍্যাংকিন স্ট্রিটে জামায়াতে ইসলামীর মুখপাত্র 'সংগ্রাম'-এর প্রেসে,[৪০৬] যার নাম ছিল জনতা প্রিন্টিংপ্রেস এন্ড প্যাকেজিং। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বরের পর 'সংগ্রাম' কর্তৃপক্ষ তাদের কাগজটির প্রকাশনা বন্ধ রেখে নিজেরা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সেখান থেকে সিরাজপন্থীরা 'গণকণ্ঠ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করে। ঐ দিনই শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ বন্দিজীবন শেষে বাংলাদেশে ফিরে আসছিলেন আর গণকণ্ঠের প্রথম পাতায় যে দুটি ছবি ছাপা হয়েছিল উভয়ই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের আর সম্পাদক আল মাহমুদ মুজিবকে নিয়ে আবেগে উদ্বেল যে সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন তার শিরোনাম ছিল 'অন্তরে তাঁর পদধ্বনি বাজে।' ঠিক একবছর পর ১৯৭৩ সালের ১০ জানুয়ারি গণকণ্ঠ পরিবার যখন বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে তাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে– সেখানেও ক্রোড়পত্রের প্রথম পাতায় ছিলেন কেবল মুজিব ও তাজউদ্দীন; ছবিতে দেখা যাচ্ছে দু'জনই তাঁরা গণকণ্ঠ পড়ছেন।

---

৪০৪ Mahfuz Ullah, *ibid*, p. 90.

৪০৫ এই আমির হোসেনের ভাষ্য (বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ১৮) থেকে জানা যায়, যুদ্ধকালে মুজিব বাহিনীর চার নেতা ভবানীপুরে রাজেন্দ্র স্ট্রিটের যে বাড়িতে অবস্থান করতেন সেখান থেকেই বাংলার বাণী প্রকাশিত হতো। উল্লেখ্য, ভবানীপুরের এই বিশেষ বাড়িটি সম্পর্কে ২.ক ও ৩.খ উপ-অধ্যায়ের আলোচনায় বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

৪০৬ এই পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়েছিল ১৭ জানুয়ারি ১৯৭০; সম্পাদক ছিলেন আখতার ফারুক।

এমনকি ঐ ক্রোড়পত্রের জন্য মুজিব নিম্নোক্ত বাণীও দেন : 'তোমরা গণকণ্ঠে নির্যাতিত মেহনতী মানুষের কথা বলবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছো। আমি তোমাদের এ ইচ্ছা ও ঐকান্তিকতাকে অভিনন্দন জানাই। জয়বাংলা।'

গণকণ্ঠ প্রথম দিকে 'সাপ্তাহিক' হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে। সাপ্তাহিক রূপে গণকণ্ঠ সরকারি কোন অনুমতি ছাড়াই প্রকাশিত হতো। এভাবে চার সপ্তাহ চলার পরে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে তা দৈনিকে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে পাঁচজনের (আফতাব আহমাদ, আ ফ ম মাহবুবুল হক, মাসুদ আহমেদ রুমী, রায়হান ফেরদৌস মধু, শাজাহান সিরাজ) সম্মিলিত এক আবেদনে তাজউদ্দীন আহমদ প্রশাসনিক সহায়তা দেন; ফলে দৈনিক হিসেবে গণকণ্ঠ প্রকাশনার অনুমতি মেলে।[৪০৭] এর চট্টগ্রামেও ব্যুরো ছিল– যার প্রধান ছিলেন ইমামুল ইসলাম লতিফী।

প্রকাশনার শুরুতে গণকণ্ঠ তার সম্পাদক হিসেবে নাম ঘোষণা করে কবি আল মাহমুদের– যদিও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা শেষে তখনও কলকাতা থেকে দেশে ফেরেননি তিনি। আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'কবির মুখ'-এ আল মাহমুদ জানিয়েছেন,[৪০৮] মূলত আফতাব আহমাদের অনুরোধে দেশে ফেরার পর তিনি এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত হন; এতে জাসদের অন্যান্য প্রধান সংগঠকদেরও বিশেষ আগ্রহ ও অনুমোদন ছিল। সম্পাদক থাকাকালে আল মাহমুদ জাসদপন্থী ছাত্রলীগের অনেক জনসভাতেও আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। যুদ্ধের আগে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকে কাজ করতেন। আল মাহমুদকে সম্পাদক করার পাশাপাশি আফতাব আহমাদ নিজেও গণকণ্ঠের কার্যনির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কাজী আরেফ আহমেদ। মনিরুল ইসলাম মার্শাল ছিলেন প্রকাশক। আল মাহমুদ গ্রেফতার হওয়ার পর প্রিন্টার্স লাইনে কাজী আরেফ আহমেদের নাম ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দেখা যায়। উল্লেখ্য, 'পরিত্যক্ত' সম্পত্তি হিসেবে জনতা প্রিন্টিং প্রেসের 'প্রশাসক' হয়েছিলেন মার্শাল মনিরুল ইসলাম। আর 'গণকণ্ঠে'র 'ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মার্শাল মণি'র কাছ থেকেই 'ভাড়া'য় সেই দপ্তরটি ব্যবহারের অনুমতি নেন!![৪০৯]

---

৪০৭ দেখুন, Mahfuz Ullah, *ibid*, p. 79.

৪০৮ আল মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫১।

৪০৯ উল্লেখ্য, ১৬ ডিসেম্বরের পরপর পাকিস্তান সরকারের মালিকানাধীন বা সরকার সমর্থকদের মালিকানাধীন বা অবাঙালিদের মালিকানাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই অনেক গণমাধ্যম 'পরিত্যক্ত' অবস্থায় পাওয়া যায়। বাহাত্তরের ২ জানুয়ারিতে সেগুলোতে 'প্রশাসক' নিয়োগের একটি নির্দেশ জারি হয়। তারও তিন দিন পর এ বিষয়ক *'অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি অর্ডার ১'* ঘোষণা করা হয়।

সিরাজপন্থীদের সংগ্রাম কার্যালয়ে অবস্থান গ্রহণের মতোই ডিসেম্বরে ফজলুল হক মণিও অবস্থান নেন তেজগাঁওয়ে উর্দু দৈনিক 'পাসবান'-এর প্রেসে। সেখান থেকে নবউদ্যোমে প্রকাশ শুরু হয় দৈনিক 'বাংলার বাণী'র– আগে যেটি সাপ্তাহিক হিসেবে ঢাকার হাটখোলা থেকে প্রকাশ হতো। নতুন পর্যায়ে সরকারি সাহায্যও মিলল।[৪১০] ফজলুল হক মণি'র লক্ষ্য ছিল দৈনিক বাংলা ও মর্নিং নিউজ। কিন্তু সেটা নিয়ন্ত্রণে নেয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বাধা ছিল প্রবল। ফলে 'পাসবান' প্রেস পেয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট হতে হয়। আগেই বলা হয়েছে, এসব সম্পত্তি 'সরকার' ততদিনে 'পরিত্যক্ত হিসেবে অধিগ্রহণ' করে নিয়েছিল।[৪১১]

বাংলার বাণী দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশকালে আদর্শ হিসেবে নিয়েছিল 'মুজিববাদ'কে। অন্যদিকে 'গণকণ্ঠ' প্রকাশের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে কিউবার বিপ্লবীদের পত্রিকা 'গ্রাণমা'। সংবাদপত্র শিল্পে মুজিব বাহিনীর প্রধান দুই ধারার এই শক্ত অবস্থানকে ঘিরে এসময় বুদ্ধিজীবী পরিমণ্ডলেও মেরুকরণ লক্ষ্য করা যায়। আহমদ ছফা, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ লেখক ও কবিরা গণকণ্ঠের সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আল-মাহমুদ,

---

৪১০ বাংলার বাণীর প্রতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার গুরুত্বপূর্ণ এক নজির ছিল এর সর্বোচ্চ সরকারি বিজ্ঞাপন প্রাপ্তি। সেসময় সংসদে দেয়া (২২ জুন ১৯৭৩) তথ্যমন্ত্রীর হিসাব থেকে দেখা যায়, ১৯৭২ সালের মার্চ থেকে ১৯৭৩ সালের মে পর্যন্ত বাংলার বাণী দৈনিক গণকণ্ঠের চেয়ে চার গুণ বেশি বিজ্ঞাপন পেয়েছে এবং তা দেশের অন্য সব দৈনিকের চেয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ। সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়ার ক্ষেত্রে সেসময় বাংলার বাণী ছিল প্রথম স্থানে এবং গণকণ্ঠ ছিল দশম স্থানে। দেখুন, Mahfuz Ullah, *ibid*, p. 89 এবং দৈনিক *গণকণ্ঠ*, ২৩ জুন ১৯৭৩, ঢাকা।

৪১১ উল্লেখ্য, *পাসবান* পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু হয় ১৯৪৮ সালে এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বন্ধ হয়েছিল শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটের কারণে। বন্ধ হওয়ার পরও এর মতিঝিল অফিস ও তেজগাঁওয়ের প্রেস যথারীতি বহাল ছিল। এর সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ মোস্তফা হাসান। ১৯৬৫ সালে ঢাকায় পত্রিকা শিল্পে প্রথম অফসেট-প্রিন্টিং প্রেসের সংযোজন ঘটিয়েছিল এই কাগজের মালিকরাই। পাসবানে যারা সাংবাদিক হিসেবে তখন কাজ করেছেন তাদের একজন আহমেদ ইলিয়াস। ঢাকার উর্দুভাষী বিশিষ্ট কবি ও গবেষক জনাব ইলিয়াসের সঙ্গে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আলাপচারিতার সূত্রে জানা যায়, পাসবানের মালিক ছিল বগুড়ার জামিল গ্রুপ। এই গ্রুপেরই সুপরিচিত ব্র্যান্ড ছিল 'রমনা সিগারেট'। আলফা ইন্সুরেন্সেরও মালিক ছিল এই শিল্প গোষ্ঠী। প্রথমে ঢাকার পুরানো কোর্ট হাউস এলাকা থেকে প্রকাশিত হলেও পরে ১৯৬০ সালের দিকে সরকার এই কাগজের মালিকদের তেজগাঁওয়ে ও মতিঝিলে একটি শিল্প ও একটি বাণিজ্যিক প্লট দিয়েছিল। ফলে পত্রিকার নিউজ সেকশন মতিঝিলে এবং প্রেস সেকশন তেজগাঁওয়ে চলে আসে। মালিকপক্ষ এসময় উন্নত প্রেস আমদানি করেছিল বিদেশ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের পর মতিঝিলের কার্যালয়টি জামিল গ্রুপেরই একজন কর্মকর্তা দখল করে নেন। আর প্রেসের বিষয়টি ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। পাসবানের পাশাপাশি এসময় ঢাকায় আরও যেসব উর্দু দৈনিকের অপমৃত্যু ঘটে তার মধ্যে ছিল মাশরাকি পাকিস্তান, সরফরাজ ও ওয়াতান।

নির্মলেন্দু গুণ ছাড়াও আবু করিম, আবু কায়সার, অসীম সাহাসহ অন্তত ৫-৬ জন কবি এ কাগজে কাজ করতেন– যা বাংলাদেশের সংবাদপত্র শিল্পে এক অনন্য ঘটনা। বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও মাঝে মাঝে এ পত্রিকায় লিখতেন। এ কাগজে কখনো শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' ব্যবহার করা হতো না। অন্যদিকে গণকণ্ঠের মতোই বাংলার বাণীর সম্পাদকীয় বিভাগেও আবদুল গাফফার চৌধুরী, কামাল লোহানী প্রমুখ রাজনৈতিক লেখকের সমাবেশ ঘটেছিল। শেষোক্তজন বাংলার বাণীতে বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাহাত্তরের ১৭ মার্চ মুজিবের জন্মদিনে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে এলে 'বাংলার বাণী' এবং 'গণকণ্ঠ' উভয় কাগজেই এই উপলক্ষ্যে বিশাল ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়।

পুরো দেশের সংবাদপত্র শিল্প ১৯৭২-এ বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়লেও মুজিব বাহিনীর হাতে ছিল তখন কয়েকটি তরতাজা কাগজ। তবে বিস্ময়কর হলো স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এই বাহিনীর দুই ধারা নানানভাবে দেশের রাজনীতির মঞ্চের প্রভাবশালী কুশীলব হলেও কেউ তাদের উল্লিখিত কাগজ দুটি টিকিয়ে রাখতে পারেনি। ২০০১ সালে ১৪ এপ্রিল 'বাংলার বাণী' চূড়ান্ত রূপে বন্ধ হয়ে যায়। দৈনিক গণকণ্ঠ বন্ধ হয় তারও বহু আগে।

১৯৭৩ সালের মার্চে থেকে 'গণকণ্ঠ'কে তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হয়। জাসদ ও জাসদসংশ্লিষ্টদের ওপর সরকারের ব্যাপক বৈরি আচরণের মুখে পত্রিকাটির প্রকাশনা একদফা বন্ধ হয়ে যায় তিয়াত্তরের মার্চের শেষ সপ্তাহে। এসময় সরকারের তরফ থেকে মনিরুল ইসলামকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগরীর নেতা হাশিমুদ্দিন হায়দার পাহাড়িকে 'জনতা প্রিন্টিং প্রেস' নামক পরিত্যক্ত সম্পত্তিটির 'প্রশাসক' নিযুক্ত করা হয়। এর মধ্য দিয়ে র‍্যাংকিন স্ট্রিটের বাড়ি থেকে পত্রিকাটি উৎখাত হয়। নিউজপ্রিন্টের কোটা কমিয়ে দিয়েও পত্রিকাটিকে জব্দ করার চেষ্টা হয়েছিল। শুরুতে এই কাগজকে মাসে ৪৫ টন নিউজপ্রিন্ট সরবরাহ করা হতো। পরে তা ২৫ টন এবং ১৯৭৪-এর আগস্টে তা ৭ টনে নামিয়ে আনা হয়।[৪১২] এসময় সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও গণকণ্ঠের প্রতি সরকারি বৈরিতার নিন্দা জানায়। প্রায় ১৫ দিন পর ১৩ এপ্রিল থেকে এটি আবার প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে কে জি মুস্তফার মধ্যস্থতায় খোদ গণভবনে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দরকষাকষিমূলক দীর্ঘ বৈঠক হয়েছিল গণকণ্ঠ-এর উদ্যোক্তাদের।[৪১৩] প্রথম দিকে গণকণ্ঠের প্রকাশনায়

---

৪১২ দেখুন, *দৈনিক গণকণ্ঠ*, ৯ আগস্ট ১৯৭৪, ঢাকা।

৪১৩ উল্লেখ্য, কে জি মোস্তফা ছিলেন 'মুজিববাদ' নামক গ্রন্থের লেখক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস-এর ভাই। শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত 'বাকশাল'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে

আর্থিক সহায়তা প্রদানকারীদের অন্যতম ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর ঐ সময়কার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সহযোগী গাজি গোলাম মোস্তফা।[৪১৪] যদিও ১৯৭২ সালের ২৫ জুন গণকণ্ঠ কার্যালয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সরকারের সমালোচক লেখক-শিল্পীদের সংগঠন 'বাংলাদেশ শিল্পী সংসদ'– আল মাহমুদ ছিলেন যার আহ্বায়ক। এই 'সংসদ'-এ কবি শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখও সদস্য ছিলেন।

চুয়াত্তরের মার্চে এসে চূড়ান্তভাবে সরকারি রোষানলে পড়ে গণকণ্ঠ দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই আঘাতে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানের আইয়ুব খান সরকারের তৈরি কুখ্যাত প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স'কেই ব্যবহার করেছিল– যদিও তার নামটি ততদিনে পাল্টে নেয়া হয় 'মুদ্রণ ও প্রকাশনা অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৩' নামে। ১৯৭৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর এই আইন সংসদে যেদিন আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয় সেদিনই তা পাস হয়ে যায়। মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত এই আইনে গণমাধ্যমের ওপর চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। নবীন দেশে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এই আইনে অনুমোদন দিয়েছিলেন। যে আইনটি ছিল বস্তুত পাকিস্তান শাসনামলের অনুরূপ আইনেরই নবসংস্করণ মাত্র এবং এইরূপ আইনকে 'কালো আইন' হিসেবে অভিহিত করেই যুদ্ধ-পূর্ব সময়ে ওই সংসদ সদস্যরা পূর্ব-পাকিস্তানের সংবাদকর্মীদের অধিকতর গণতান্ত্রিক এক সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সংবাদপত্র দলনের জন্য তিয়াত্তরের এই আইনকেও অবশ্য সরকার যথেষ্ট মনে করছিল না– যার জন্য কয়েক মাস পর ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে সরকার যে বিশেষ ক্ষমতা আইন তৈরি করে তাতেও প্রধান এক বিষয় হয়ে উঠেছিল গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ। আবার, চুয়াত্তরের নভেম্বরে তিয়াত্তরের মুদ্রণ ও প্রকাশনা আইনের আরেক দফা সংশোধন করে নেয়া হয় জাতীয় সংসদে। বলা বাহুল্য, আইনটিকে কঠোরতর করার জন্যই ছিল এইরূপ সংশোধনী। পরের মাসেই আরও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেশে আবির্ভূত হয় 'জরুরি অবস্থা।'

মূলত মুজিব বাহিনী ও আওয়ামী লীগের যুদ্ধোত্তর তৎপরতার সমালোচনা করার কারণেই এসময় গণকণ্ঠের পাশাপাশি 'গণশক্তি' (মোহাম্মদ তোয়াহা সম্পাদিত), 'লাল পতাকা, 'হক কথা' (মাওলানা ভাসানী প্রকাশিত), 'মুক্তপত্র', 'স্পোকসম্যান' (ইংরোজি সাপ্তাহিক; ফয়জুর রহমান সম্পাদিত), 'নয়াযুগ', 'দেশবাংলা' (চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত) বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ ঘোষিত পত্রিকার নেতৃস্থানীয় সাংবাদিকদের আটক করা হয়েছিল। চুয়াত্তরের ১৯

আওয়ামী লীগের বাইরে যে ১০ ব্যক্তি স্থান পেয়েছিলেন তাদের একজন ছিলেন খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস।

৪১৪ দেখুন, *Press Under Mujib Regime*, Mahfuz Ullah, Kakali Prakashani, 2002, Dhaka, p. 79.

মার্চ রক্ষীবাহিনী গণকণ্ঠ-এর প্রেসের যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে যায়– যা ছিল গণমাধ্যমের প্রকাশনা বন্ধে ঐ সময়কার এক অভিনব নজির। এভাবে, যে ধরনের মুক্ত গণমাধ্যমকে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা বিলুপ্ত হয় পঁচাত্তরে এসে। গণকণ্ঠ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেশে কী ঘটছে সে সম্পর্কে সরকারি ভাষ্যের বিকল্প উৎস বহুলাংশে নিঃশেষ হয়ে যায়। দৈনিক হিসেবে এটাই ছিল তখন বিকল্প কণ্ঠস্বর। মুজিব শাসনামলে গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ যেসব কারণে সরকারের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে একটি ছিল রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রম। বস্তুত গণমাধ্যমকে 'মুক্ত' অবস্থায় রেখে দিলে রক্ষীবাহিনীকে কোনভাবেই এতটা 'মুক্ত'হস্তে তাদের কার্যক্রম চালাতে দেওয়া সম্ভব হতো না। রক্ষীবাহিনীর 'অবাধ' ভূমিকার স্বার্থেই গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয়া হয়েছিল।

গণকণ্ঠ বন্ধের দীর্ঘ পরে জাসদ পরিবার থেকে 'লড়াই' নামে আরেকটি কাগজ বের হয়।[৪১৫] 'লড়াই'-এর আগে-পরে জাসদের পক্ষ থেকে অপর তিনটি প্রকাশনা ছিল 'মশাল', 'লাল ইশতেহার' এবং 'সাম্যবাদ'। শেষোক্ত দুটি মূলত অভ্যন্তরীণ প্রচারের জন্য প্রকাশিত হতো। তবে এই দুই পত্রিকাকে ঘিরেই জাসদ রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ এক ক্ষমতার দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে '৭৩-'৭৪ পর্যায়ে।

১৯৭২ সালে 'রাজনৈতিক দল' হিসেবে জাসদ প্রতিষ্ঠা হলেও এক সময়, বিশেষ করে ১৯৭৩ সাল নাগাদ এই দলের নেতৃবৃন্দ একে 'পার্টি' না বলে একটি 'মাল্টিক্লাস সংগঠন' হিসেবে অভিহিত করতে শুরু করেন এবং পাশাপাশি তাদের এই 'সংগঠন'-এর মধ্যেই একটি 'বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া' শুরু করেন। আরও সহজভাবে বললে, তাঁদের মতে জাসদ হলো একটা গণসংগঠন এবং সেখান থেকে তাঁরা একটি বিপ্লবী পার্টির কর্মী সংগ্রহ করবেন। এই উদ্যোগের তাত্ত্বিকভিত্তি হিসেবে এসময় বলা হতো, 'শ্রমিক শ্রেণির পার্টি কখনো গঠন করা যায় না– এইরূপ পার্টি গড়ে ওঠে।'[৪১৬] সেই গড়ে ওঠার 'প্রক্রিয়া'র (১৯৬২

---

৪১৫ 'লড়াই' প্রথম জাসদের ভেতরকার 'পার্টি প্রক্রিয়া'র মুখপত্র হিসেবেই প্রকাশিত হতো। এভাবে অল্প কিছু দিন পর প্রকাশিত হওয়ার পর এটা বন্ধ হয়ে যায়। জাসদ বিভক্ত হওয়ার পর আ ফ ম মাহবুবুল হক অনুসারীরা (বাসদ) আবারও 'লড়াই' প্রকাশ করে কিছু দিন। এর পর ১৯৮৭ সালে এই কাগজের প্রকাশক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন নেন শাজাহান সিরাজ। এসময় কাগজটির সম্পাদক ছিলেন সুমন মাহমুদ। তাঁর মতে, '৮৭-৮৮ সালে লড়াই শেষবার যখন প্রকাশিত হতো তখন কোনো পার্টি-কাগজ হিসেবে নয়, পেশাদার একটি সাপ্তাহিক কাগজ হিসেবেই এটি প্রকাশিত হতো।' তবে এ পর্যায়েও মাত্র এক বছর পত্রিকাটি টিকে ছিল। উল্লেখ্য, শাজাহান 'লড়াই'-এর প্রকাশক হওয়ার পর মাহবুবুল হক'রা তাঁদের তরফ থেকে আর 'লড়াই' প্রকাশ করেননি।

৪১৬ সাঈদ তারেক, *বীরোত্তম কর্নেল তাহের–লাল নভেম্বর এবং বামপন্থী রাজনীতি*, ঝর্ণাধারা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ৫৭। এসময় এও বলা হয়, 'জাসদ গঠনের উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা নয়– সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সহায়তা করা।' পৃ. ৫৮।

সালের নিউক্লিয়াস থেকে যার শুরু) অভিব্যক্তি হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে এসময় 'লাল ইশতেহার' নামের পত্রিকাটি। এতে প্রথম দিকে মূলত ভারতের এসইউসি-আই এর বিভিন্ন দলিলপত্রের আলোকে এই বক্তব্যই প্রচার পাচ্ছিল যে, কীভাবে বাংলাদেশে একটি নতুন ধারার সর্বহারা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা যায়। বিশেষ করে এসইউসি-আই নেতা শিবদাস ঘোষের 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এসইউসিআই একমাত্র সাম্যবাদী দল'-এর মূল অংশ ছাপা হয় তাতে। 'শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে পার্টি গড়বার প্রচেষ্টা এবং তার প্রয়োগ ও অনুশীলনের প্রশ্ন থেকেই এসময় জাসদ সংগঠকদের মাঝে বিতর্ক, বিভেদ, বিভ্রান্তি, বিচ্যুতি দেখা দিতে থাকে।'[৪১৭]

১৫ দিন পরপর প্রকাশের কথা থাকলেও ছয়টি সংখ্যা প্রকাশের পর 'লাল ইশতেহার' বন্ধ হয়ে যায়। এরপর জাসদ প্রকাশ করে 'সাম্যবাদ'। লাল ইশতেহার বন্ধ হওয়া এবং সাম্যবাদ প্রকাশিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ছিল ঘটনাবহুল। কেন আগেরটি বন্ধ করে নতুন নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে তার ব্যাখ্যা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলা না হলেও সেই সময়কার জাসদ সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে[৪১৮] নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় : 'লাল ইশতেহার প্রক্রিয়া'র সঙ্গে জাসদের অনেক 'গণচরিত্রের নেতা'– যেমন রব, জলিল প্রমুখকে যুক্ত করা হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সিরাজুল আলম খান ও তার কাছে 'নির্ভরযোগ্য' হিসেবে বিবেচ্য ১২ তরুণ নেতা– যেমন আ ফ ম মাহবুবুল হক, হাসানুল হক ইনু, মনিরুল ইসলাম, কাজী আরেফ আহমেদ, শরীফ নুরুল আম্বিয়া প্রমুখ। মূলত 'দোদুল্যমান' ও 'পেটিবুর্জোয়া' বৈশিষ্ট্যের জন্য 'গণচরিত্রের নেতা'দের ঐ প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। ফলে এক পর্যায়ে শেষোক্তরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সেই ক্ষোভের মুখে সিরাজুল আলম খান পূর্বোক্ত 'প্রক্রিয়া' ভেঙে নতুন একটি প্রক্রিয়া চালু করেন– যার অভিপ্রকাশ হিসেবে দেখা দেয় 'সাম্যবাদ।' 'নির্ভরযোগ্য' সংগঠকরাই সাম্যবাদের কপি পেতেন। তবে সাম্যবাদও ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে নীরব হয়ে যায়।

---

৪১৭ মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, *'বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি ও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ'*, পূর্বোক্ত। উল্লেখ্য, পার্টি গড়বার প্রশ্নে শিবদাস ঘোষের চিন্তার বিশেষ দিক ছিল 'একটি বিপ্লবী পার্টির সংগঠকদের কেবল পার্টি জীবন নয়– ব্যক্তি জীবনকেও মার্কসবাদের আলোকে পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ও পারিবারিক জীবনের প্রচলিত ধারণা ত্যাগ করতে হবে। দলকেই পরিবার মনে করতে হবে। সংগঠকরা দলের অভ্যন্তরে যৌথভাবে জীবন-যাপন করবেন এবং যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তুলবেন। শিবদাস ঘোষের জন্ম ১৯২৩ সালে ঢাকায় এবং মৃত্যু ১৯৭৬ সালে কলকাতায়।

৪১৮ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আ ও ম শফিক উল্লা ও অন্যান্য, *জাসদ-বাসদের ভ্রান্ত দোদুল্যমান ও বিভ্রান্তিকর রাজনীতি প্রসঙ্গে*, লক্ষীপুর খোলাচিঠি গ্রুপ, ১৬.০৭.১৯৮১। পুস্তিকার সাত লেখকের সবাই জাসদের সংগঠক ছিলেন।

১৯৭৪ সালের এপ্রিল-মে-জুন নাগাদ শুরু হওয়া ওই পার্টি গঠন প্রক্রিয়ায় জাসদ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ ইত্যাদি সংগঠনের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল (ইতঃপূর্বে যাদের 'দোদুল্যমান' ও 'পেটিবুর্জোয়া' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল তাদেরসহ)। এই প্রক্রিয়া থেকে এক পর্যায়ে সংশ্লিষ্টরা 'সিওসি' (সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং কমিটি) নামে বৃহত্তর একটি কাঠামো গড়ে তোলেন এবং এর সদস্য সংখ্যা কারাবন্দি পাঁচ গুরুত্বপূর্ণ নেতাসহ ৩২ পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। সিওসি'র পুরো নাম ছিল 'সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং কমিটি অব দ্য কমিউনিস্ট রেভলূশনারিজ'। সাত সদস্যের একটি স্ট্যান্ডিং কমিটিও ছিল এর। বৃহত্তর এই সাংগঠনিক কাঠামোকেই এক পর্যায়ে 'কেন্দ্রীয় ফোরাম' হিসেবে অভিহিত করা শুরু হয় জাসদ পরিবারে।

সাংগঠনিক এসব নিরীক্ষার মাঝেই এ সময় জাসদের অভ্যন্তরে তীব্র এক মতাদর্শিক বিতর্ক চলছিল। যেসব বিষয়কে ঘিরে বিতর্ক আবর্তিত হচ্ছিল তার মধ্যে রয়েছে : গণবাহিনীর ভূমিকা যাচাই, গণবাহিনীর সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করা, আওয়ামী লীগ সম্পর্কে রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করা, মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী পার্টি গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করা ইত্যাদি। এসব বিতর্ককালে দেখা যায়– জাসদের অভ্যন্তরে এরূপ প্রতিটি বিষয়ে ব্যাপকতর অস্পষ্টতা ও মতভিন্নতা বিদ্যমান। সিরাজুল আলম খানকে ঘিরে এসময় গণবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ চার নেতা ইনু-আম্বিয়া-আরেফ-মনি'র একটি শক্তিশালী বলয় দলটির একটি নতুন সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে।[৪১৯] শেষপর্যন্ত সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে 'সিওসি' কিংবা সিরাজুল আলম খান উপরোক্ত বিতর্কের কোনো সারসংকলনে আসতে পারেননি সে সময়। ফলে 'পার্টি' গঠনের কাজে হাত না দিয়ে সিওসি'র তরফ থেকে সে 'দায়িত্ব' ১৯৭৬ সালে এসে 'এক ব্যক্তির হাতে' ছেড়ে দেওয়া হয়– নিশ্চিতভাবেই সেই ব্যক্তিটি ছিলেন সিরাজুল আলম খান।

সিওসি ভেঙে দেওয়ার সময় তার তরফ থেকে একটি 'বিশেষ বিজ্ঞপ্তি' প্রকাশ করা হয় এবং তাতে বলা হয়, 'অস্থিরতা, দোদুল্যমানতা,...ও পেটিবুর্জোয়া ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে এবং আমাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি চালু না

---

৪১৯ এ বিষয়ে ৬.খ উপ-অধ্যায়েও আলোকপাত করা হয়েছে। জাসদের অভ্যন্তরে এসময় কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হয়ে সিরাজুল আলম খানকে ঘিরে সৃষ্ট নতুন এই 'বলয়'কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিতে ১৯৬৬ থেকে পরবর্তী দশকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকালে মাও-এর স্ত্রী চিয়াং ছিং [Jiang Qing]-এর নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে ওঠা 'চার কুচক্রী' বা 'Gang of Four'-এর সঙ্গেও তুলনা করতে শুরু করেন। উল্লেখ্য, চীনে 'চার কুচক্রী'র অন্য তিন সদস্য ছিলেন চাং ছুনছিয়াও, ইয়াও ওয়েনহউয়ান ও ওয়াং হোংওয়েন (Zang Chunqiao, Yao Wenyuan, Wang Hongwen).

থাকায় কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি ভেঙে দেওয়া হলো।'[৪২০] উল্লেখ্য, সিওসি ভেঙে দেওয়ার স্বল্প কিছুদিন পরই 'পার্টি গঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি'টি আকস্মিকভাবে সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে আটক হয়ে যান। এভাবে জাসদের অভ্যন্তরে বিপ্লবী পার্টি গঠন প্রক্রিয়াটির সমাপ্তি ঘটেছে বলে ধরে নেয়া হয়[৪২১] এবং পরে আর কখনও জাসদের অভ্যন্তরে পার্টি প্রক্রিয়া নামক কাঠামোর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এভাবে কার্যত দলটির নেতৃত্ব সচেতনভাবে তাদের কর্মী বাহিনীকে– যাদের অনেকেই, তখনও মাঠ পর্যায়ে সশস্ত্র অবস্থায় ছিল, অপ্রস্তুত ও প্রতিরক্ষাবিহীন অবস্থায় বিলোপবাদী স্বতঃস্ফূর্ততার হাতে সঁপে দেন। এর দীর্ঘ পর, ১৯৮১ সালে সিরাজুল আলম খান যখন কারাগার থেকে মুক্তি পান তখন জাসদে বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার পরিবর্তে মুখ্য হয়ে উঠেছিল ভাঙনের শুরু। যে বিবরণ এ পর্যায়ে আর প্রাসঙ্গিক নয়।

---

৪২০ *সর্বহারা শ্রেণির দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে* ও সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য, খালেকুজ্জামান ভূইয়া ও অন্যান্য, ১২.০৩.১৯৮১, ঢাকা, পৃ. ৭।

৪২১ সিরাজুল আলম খান আটক হয়েছিলেন ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার এলাকা থেকে। আটকের দিন একটি মোটর সাইকেলে করে নিজস্ব গোপন সেন্টারে যাচ্ছিলেন তিনি। সঙ্গে তাঁর ভাই পিয়ারু ছিলেন। গোয়েন্দা সংস্থার বিপুল উপস্থিতি দেখে তাঁর ভাই পালাতে সক্ষম হলেও সিরাজুল আলম খান ধরা পড়েন। তাঁর আটক সম্পর্কে এ পর্যায়ে জাসদের অভ্যন্তরে ব্যাপক বিভ্রান্তি তৈরি হয়। যার ছাপ মিলে নিম্নোক্ত বক্তব্যে :

> সিরাজুল আলম খানের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে সংগঠনের অভ্যন্তরে নেতা-কর্মীদের মাঝে বিভিন্ন জল্পনা, কল্পনা ও মন্তব্য শুরু হয়ে যায়। কেউ বলছেন, সিরাজ ভাইকে অমুক চক্র ধরিয়ে দিয়েছে, কেউ বলেছেন, তমুক চক্র ধরিয়ে দিয়েছে– আবার কেউ বলছেন, সংগঠনের চরম বিপর্যয়ের দায়-দায়িত্ব উপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং কর্মীদের হাজারো প্রশ্নকে ধামাচাপা দেওয়া ও পাশ কাটানোর উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই আত্মসমর্পণের মাধ্যমে নিজেকে ধরিয়ে দিয়েছেন।...পরবর্তী পর্যায়ে ভাওয়াল গড়ে অনুষ্ঠিত জাসদের গোপন বর্ধিতসভায় বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিরা সিরাজ ভাইয়ের গ্রেফতার সংক্রান্ত বিবরণী প্রকাশের জোর দাবি জানান।...' দেখুন, *লক্ষ্মীপুর খোলাচিঠি গ্রুপ, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭-২৮।

৫.ঘ. রক্ষীবাহিনী, সামরিক আমলাতন্ত্র ও একটি 'অসফল অভ্যুত্থান'-এর কাহিনী

> তিনি (মুজিব) আমার সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করলেন এবং আমাকে একমত দেখে এই বাহিনী গড়ে তোলার আদেশ দিলেন। বাহিনীর নাম দিলেন তিনি জাতীয় রক্ষীবাহিনী। আদেশ দিলেন, শুরুতে এতে ১২ হাজার অফিসার ও জওয়ান থাকবে। এর সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য একে তিনি নিজ কমান্ডের অধীনে রাখলেন।...আমাকে অনুরোধ করলেন, এ বাহিনীকে সংগঠিত, প্রশিক্ষিত ও সজ্জিত করতে সাহায্য করার জন্য।... সৌভাগ্যক্রমে আমার সরকার বাংলাদেশ সরকারের এই অনুরোধ মেনে নিল এবং বাহিনীর 'লিডার'রা আমাদের স্থাপনায় প্রশিক্ষণ লাভ করলো।
>
> –মেজর জেনারেল উবান[৪২২]

a coup d'état is usually a violent political engineering.
-Wikipedia

মুজিব বাহিনী থেকে রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি এবং তার সঙ্গে কাঠামোগতভাবে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে ইতোমধ্যে ৫.খ উপ-অধ্যায়ে যেসব বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে– বলা বাহুল্য, তা ছিল নীতিগত সম্মতির ভিত্তিতেই। ভারতীয় নিয়মিত বাহিনী যেদিন বাংলাদেশ থেকে চলে যায় সেদিন থেকেই রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়।[৪২৩] যদিও তার আইনগত ভিত্তি তৈরি হয় আরও অনেক পরে। মুজিব বাহিনী সৃষ্টির পেছনে যেসব 'উদ্দেশ্য' কাজ করেছে (পূর্ববর্তী অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়গুলোতে উল্লিখিত) তার অধিকাংশই স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশেও জরুরি থাকায় মুজিব সরকার এবং 'অনুরোধ'প্রাপ্ত ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অগ্রাধিকারভিত্তিক গুরুত্বের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রম এগিয়ে নিতে থাকে। মাত্র তিন বছরে সাতটি অফিসার ব্যাচের নিয়োগ এবং তাদের জন্য দেশব্যাপী নিজস্ব স্থাপনার বিস্তার থেকে স্পষ্ট, নীতিনির্ধারকরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাঁদের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছিলেন। এক্ষেত্রে যখন আইনগত ভিত্তি তৈরিতে হাত দেওয়া হয় তখন দেখা গেল– মৌলিক মানবাধিকার চেতনা পুরোপুরি অবজ্ঞার শিকার– অথচ যা ছিল নবীন দেশটির অন্যতম সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা।[৪২৪]

---

৪২২ মেজর জেনারেল উবান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪১-১৪২।

৪২৩ *en.wikipedia.org/wiki/National_Defence_Force*; ১৮.০৯.২০১২ তারিখে প্রদর্শিত বিবরণী থেকে উদ্ধৃত। উইকিপিডিয়াতে এই ঠিকানায় রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে– যা বাংলাদেশে আজও স্বল্প প্রচারিত।

৪২৪ ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। প্রায় একই সময়ে রক্ষীবাহিনীকে গড়ে তোলা ও এর অপারেশনাল কার্যক্রমও চলছিল। এটা খুবই কৌতুককর যে নিদারুণ স্ববিরোধিতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা তাদের শাসন প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। রক্ষীবাহিনীকে যখন তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনে দায়মুক্তি দেয়া

রক্ষীবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তৃতি আরেকভাবেও স্বাধীনতার চেতনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে সামগ্রিকভাবে পুরো দেশের জনগণ এবং বিশেষভাবে পূর্ববাংলার মানুষ সামরিক আমলাতন্ত্রকে দেখতে পাচ্ছিল গণতন্ত্র বিকাশের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে। শেখ মুজিবুর রহমানকেও একাত্তর পূর্ববর্তী রাজনৈতিক জীবনে সামরিক আমলাতন্ত্রের হাতে বিস্তর হেনস্তা হতে হয়েছে। এই দুটি কারণে মনে করা হচ্ছিল, নবীন দেশটিতে সকল উপায়ে সামরিক আমলাতন্ত্রের সংস্কার সাধিত হবে এবং হয়তো ভিন্ন ধাঁচের এক প্রতিরক্ষা কাঠামো দেখা যাবে। এখানে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম শর্ত ছিল উৎপাদন বিচ্ছিন্ন সেনা আমলাতন্ত্রের বিলোপ বা সংস্কার। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রক্ষীবাহিনীর গঠন এবং মূল সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন উভয় ক্ষেত্রে সামরিক আমলাতন্ত্রের নির্মাণযজ্ঞ যেভাবে এগোতে থাকে তা ছিল স্বাধীনতার স্বপ্নের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বিস্ময়করভাবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে এসব উদ্যোগের কোনো পর্যালোচনামূলক প্রতিবাদ ছিল না; বরং সামরিক বাহিনীতে লে. কর্নেল জিয়াউদ্দীন ও লে. কর্নেল আবু তাহের প্রমুখ তাৎক্ষণিকভাবে পেশাগত ঝুঁকি নিয়ে এইরূপ প্রবণতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সূচিত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিতে উপনিবেশিক ধাঁচের সামরিক আমলাতন্ত্র পুনর্গঠন নয়– চাইছিলেন এর কাঠামোগত বিকল্প। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কঠোর হাতে এসব ভিন্নমত দমন করা হয়। ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়ক থাকাকালে সংবাদপত্রে ভিন্নমত প্রকাশের দায়ে কর্নেল জিয়াউদ্দীনকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছিল।[৪২৫] যদিও বরখাস্তের আদেশ জারি হওয়ার আগেই ব্রিগেড সদরদপ্তরে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে

হচ্ছে তখনি রাষ্ট্রের সংবিধানের একেবারে প্রথম পাতায় 'প্রস্তাবনা'য় বলা হচ্ছে, 'আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ...অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে...এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার...নিশ্চিত হইবে।'

৪২৫ নিজস্ব মননশীলতার জন্য 'দালাইলামা' নামে খ্যাত জিয়াউদ্দীনের বরখাস্তের আদেশ ছিল সেই সময় সেনাবাহিনীতে ভূমিকম্পতুল্য। আপন ব্যক্তিত্বে তিনি তখনকার তরুণ সেনা অফিসারদের মোহাবিষ্ট করে তুলেছিলেন। যে লেখার জন্য তাঁকে সেনাবাহিনী ছাড়তে হয় তার শিরোনাম ছিল `Hidden Prize.' ১৯৭২ সালের ২০ আগস্ট এটি প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি ভারতের সঙ্গে মুজিব সরকারের 'গোপন চুক্তি' নিয়ে প্রশ্ন তোলা ছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমানকে ইঙ্গিত করে লিখেন, We fought without him and won, and now if need be, we will fight again, nothing can beat us. We can be destroyed but not defeated. (এই লেখার পুরো বিবরণ দেখুন সংযুক্তি উনিশে)। সেনাবাহিনী ছেড়ে যাওয়ার কিছুদিন পরই ঘনিষ্ঠ সেনা অফিসারদের একটি চিরকুটে জিয়াউদ্দীন প্রতীকী বার্তা পাঠান, 'আমি সীমান্ত অতিক্রম করেছি।' সৈনিক পরিমণ্ডল থেকে জলিল, জিয়াউদ্দীন ও তাহেরের বিদায় সেসময় পুরো সেনাবাহিনীকে একটি প্রশ্নে তীব্রভাবে ভাবিয়ে তোলে, 'দেশ চলেছে কোথায়?' উল্লেখ্য, পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিতে জিয়াউদ্দীনের ছদ্মনাম ছিল 'কমরেড হাসান'।

জিয়াউদ্দীন সেনানিবাস ছেড়ে যান। তাঁর সেনাবাহিনী ত্যাগের কিছুদিন পরই লে. কর্নেল আবু তাহেরও একই পথ অনুসরণ করেন।[৪২৬]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, পাকিস্তান ধাঁচের এডভেঞ্চারধর্মী সেনা আমালতন্ত্রের সুশৃঙ্খল বিকল্প হিসেবে রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছিল– এমন ভাবনার পক্ষেও রক্ষীবাহিনীর গঠন প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের বাস্তব লক্ষণ মেলেনি বরং ১৯৭৫ সালে নভেম্বরে এবং পরেও সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অভ্যুত্থানধর্মী ঘটনাবলিতে রক্ষীবাহিনী থেকে আত্মীকৃত কর্মকর্তাদের ব্যাপক সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ এ লেখার বিভিন্ন স্থানেই তুলে ধরা হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান ছাড়াও, লে. কর্নেল হাওলাদার, ক্যাপ্টেন দীপক প্রমুখ রক্ষীবাহিনী কর্মকর্তা ১৯৭৫-এর তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শেষোক্তজনই ৪ নভেম্বর সাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে বঙ্গভবনে ঢুকে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদকে গুলী করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।[৪২৭] তেসরা নভেম্বরের অসফল অভ্যুত্থান যে 'ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট' হিসেবে চিত্রিত হয়েছিল তার পেছনে প্রধান প্রমাণ হিসেবে কাজ করে ঐ অভ্যুত্থানে রক্ষীবাহিনী থেকে সদ্য রূপান্তরিত সেনা পদাতিক ব্যাটালিয়নগুলোর অপারেশনাল উপস্থিতি।[৪২৮] ঢাকার মিরপুরের ও

---

৪২৬ তবে সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করলেও তাহের সরকারি চাকরি ছাড়েননি। সেনাবাহিনী ত্যাগের পর সরকারি ড্রেজার সংস্থার পরিচালক হন তিনি এবং এই পদে থেকেই জাসদ রাজনীতি ও গণবাহিনীর কার্যক্রমে শামিল ছিলেন ১৯৭৫-এর নভেম্বরে আটক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৪২৭ মেজর নাসির উদ্দিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩২।

৪২৮ এই অভ্যুত্থান 'বাকশাল ও ভারতীয় সমর্থনপুষ্ট' হিসেবে চিত্রিত হওয়ার নিম্নোক্ত কারণসমূহ (এককভাবে বা যৌথভাবে) চিহ্নিত করা যায় :

ক. অভ্যুত্থানের পূর্বে এর সংগঠকরা বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ব্যক্তি ও দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। যার মধ্যে বাকশালও ছিল। দেখুন, মেজর নাসির উদ্দিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫ ও আনোয়ার উল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৭। ১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যে যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল করবে সে বিষয়টি অক্টোবরেই নির্ধারিত ছিল। দেখুন, সিপিবি, *তৃতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, ১৯৮০, ঢাকা, পৃ. ৩৫-৩৬।

খ. খালেদ মোশাররফ ভারতপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার আরেকটি কারণ হতে পারে, 'র'-এর পাকিস্তান শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত এস শংকর নায়ারের (যিনি কর্নেল মেনন ছদ্মনাম নিয়ে চলতেন) সঙ্গে মোশাররফের সত্তর-একাত্তরে যুদ্ধকালীন যোগাযোগ। অশোকা রায়নার *'ইনসাইড র'* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ঐ সময় শংকর নায়ার বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে অবিরাম যোগাযোগের জন্য অনেক 'নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র' খোলেন। খালেদ মোশাররফকে শংকর নায়ারের একজন 'কেন্দ্র প্রধান' হিসেবে অভিহিত করেছেন রায়না। দেখুন, অশোকা রায়না, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২। এমনকি অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে যে খালেদ ও নূরুজ্জামান ভারতে পালিয়ে যাবেন তাও নির্ধারিত ছিল। (আনোয়ার উল আলম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৭)

সাভারের ৫টি রক্ষী ব্যাটালিয়নকে এই অভ্যুত্থানে সংশ্লিষ্ট করা হয়। তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানে ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান তার রক্ষীদের নিয়ে কতটা উদ্দীপনার সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন তা উপলব্ধির স্বার্থে এ পর্যায়ে মেজর নাসির উদ্দিনের ভাষ্য থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য, মেজর নাসির ছিলেন ঐ অভ্যুত্থানের আরেকজন মূল সংগঠক ও প্রাথমিক পরিকল্পনাকারীদের একজন। তিনি লিখেছেন :

> অফিসের ইন্টারকমে সিজিএস (খালেদ মোশাররফ) আমাকে ঢেকে পাঠালেন। রুমে প্রবেশ করেই দেখা আরেক আগন্তুক ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানের সঙ্গে।...কুশল বিনিময়ের পর খালেদ আমাকে বললেন, রক্ষীবাহিনীর শক্তিকে অংক থেকে (অভ্যুত্থান পরিকল্পনা থেকে) বাদ দিচ্ছ কেন? প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্য তারা তো প্রস্তুত।...এবার নূরুজ্জামান যুক্ত হলেন আলোচনায়। তিনি বললেন, প্রয়োজনে ঢাকার ৫টি ছাড়াও রক্ষীর অপর

গ. তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থান 'ভারতপন্থী' ক্ষমতা দখল প্রচেষ্টা হিসেবে চিত্রিত হওয়ার অন্তত আরও একটি সুনির্দিষ্ট কারণ ঘটিয়েছিলেন ঢাকাস্থ তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেন। তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থান পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় বঙ্গভবনে ক্ষমতার নাটকীয় পরিবর্তন যজ্ঞে, বিশেষ করে খালেদের সেনাপ্রধান হওয়া এবং বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করার প্রক্রিয়ায় সমর সেন সক্রিয় ছিলেন বঙ্গভবনে। ৫ নভেম্বর সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে দেখুন, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮। রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ সাংবাদিক হিসেবে তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়টিতে বঙ্গভবনে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। উপরোক্ত গ্রন্থে তিনি তাঁর সেদিনের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ঘ. তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের খবর প্রচারে ভারতীয় গণমাধ্যমের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসও এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশি জনমতকে প্রভাবিত করেছিল। দেখুন, অ্যান্থনী মাসকারেণহাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৬।

ঙ. উপরোক্ত প্রসঙ্গে আরেকটি কারণের দিকে আলোকপাত করেছেন পিটার কাস্টার্স তাঁর *IRONIES OF A PALACE INTRIGUE : THE SHORT-LIVED PUTSCH STAGED ON NOVEMBER 3, 1975* শীর্ষক রিপোর্টে। এটি এখনও অপ্রকাশিত। কারাগারে থাকাবস্থায় তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত বিমানবাহিনীর সাত কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপচারিতার ভিত্তিতে পিটার এই রিপোর্টটি লিখেন ১৯৭৭ সালে। সেখানে তিনি বলেছেন,

> ...It is true that during the month of October, pro-Indian groups and political parties had started leafleting around Dhaka. And Khaled Mosharraf apparently did have indirect affiliations with the former government party, the Awami League, via members of his family.

তেসরা নভেম্বর অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ে অভ্যুত্থানকারী পাইলটদের থেকে পাওয়া পিটারের রিপোর্ট, মেজর নাসিরের উল্লিখিত তথ্য এবং অক্টোবরে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের রাজনৈতিক উদ্যোগসমূহ স্পষ্টত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ব্যাটালিয়নগুলোর সহায়তা দেওয়া যাবে। তবে যা করার সহসাই করে ফেলতে হবে। কেননা, রক্ষীবাহিনীর কর্তৃত্ব একবার পুরোপুরি হাতছাড়া হলে তা ফিরে পাওয়া দুঃসাধ্য হবে। নূরুজ্জামান আরও বলেন, তিনি বিভিন্ন অজুহাতে রক্ষীবাহিনীর (সেনাবাহিনীতে) হস্তান্তর প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার চেষ্টা করবেন।...[৪২৯]

তেসরা নভেম্বর অভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক মেজর নাসিরের উপরোক্ত দীর্ঘ বর্ণনার সবচেয়ে নাটকীয় দিক হলো, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান ঐ অভ্যুত্থানের শেষলগ্নে খোদ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকেই নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিতে আরেকটি অভ্যুত্থান করতে চেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের কাছ থেকে বলপূর্বক সেনাপ্রধান পদে নিয়োগ লাভের পর খালেদ যখন সকল ধরনের সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিয়ে তাঁর অভ্যুত্থানের সমাপ্তি টানতে চাচ্ছিলেন তখনি ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জানের নতুন প্রকল্পের শুরু হতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ৬ নভেম্বর রাতে জাসদের অধীনের সংগঠিত সাধারণ সিপাহীদের বিদ্রোহ সেই পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দেয়। খালেদ তাঁর অভ্যুত্থানকে স্রেফ সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফেরত আনার একটি উদ্যোগ হিসেবে দেখতে চাইলেও নূরুজ্জামান চাইছিলেন আরও অনেককিছু। যার মধ্যে ছিল ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত অফিসার-জওয়ানদের শাস্তি, আগস্ট পূর্ববর্তী অবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে নতুন রাজনৈতিক সংস্কার ইত্যাদি। মেজর নাসিরের নিম্নোক্ত বিবরণ থেকে বিস্তারিত জানা যায়– কীভাবে তেসরা নভেম্বর অভ্যুত্থানের মূল মূল নায়কদের নিয়ে নূরুজ্জামান আরেকটি অভ্যুত্থানের পথে হাঁটতে শুরু করেছিলেন :

(স্থানঃ ঢাকা সেনানিবাস, চতুর্থ ইস্টবেঙ্গলের অস্থায়ী দফতর, সময়ঃ ৫ নভেম্বর)...নূরুজ্জামান বলে চললেন, আমাদের করণীয় অনেককিছু এখনও অসম্পূর্ণ। বসে থাকলে চলবে না।...আমরা সবকিছু হারাতে বসেছি। চারিদিকে বিদ্রোহের আলামত পাচ্ছি (সাতই নভেম্বরের সিপাহী অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে)। তোমরা (মেজর হাফিজ, মেজর নাসির ও কর্নেল গাফফারকে উদ্দেশ্য করে) যদি রাজি থাকো, খালেদকে সরিয়ে আপাতত সাভারে (রক্ষীবাহিনীর দপ্তরের কথা বলা হচ্ছে) রেখে দিই। ওই জিয়া ব্যাটাকেও ঢাকা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আমাদের আরও শক্ত না হলে চলবে না। কি বলো তোমরা? গাফফার ও হাফিজ দু'জনই বলে উঠলো, শাফায়াতকে বোঝাবে কে? নূরুজ্জামান বললেন, সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। এভাবেই একটা পাল্টা অভিযানের বীজ রোপিত হলো ৫ নভেম্বর দ্বিপ্রহরের আগেই। আগামী ৪৮-৭২ ঘণ্টার মধ্যে অভ্যুত্থানটি কার্যকর করতে

---

৪২৯ মেজর নাসির উদ্দিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০।

হবে। এবার নূরুজ্জামান থাকবেন পুরোধা হিসেবে। আমরা সবাই আগের মতোই তা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবো...।'[৪৩০]

উল্লেখ্য, রক্ষীবাহিনী প্রধান নূরুজ্জামান তাঁর পরিকল্পিত অভ্যুত্থানে অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্ল্যাহকেও সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন।[৪৩১] তবে সেনাবাহিনী ও দেশের সৌভাগ্য যে প্রচুর রক্তপাতের সম্ভাবনায় পূর্ণ তাঁদের পরিকল্পিত শেষোক্ত সেই অভ্যুত্থান আর ঘটেনি বা ঘটতে পারেনি। তাঁরা কাজে নামার আগেই সিপাহি অভ্যুত্থানের উদ্যোক্তারা নিজেদের কার্যক্রম অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। নূরুজ্জামানদের পরিকল্পনার ১২ ঘণ্টার মধ্যে জাসদ ও তাহের তাদের বিপ্লবী সিপাহি সংস্থার মাধ্যমে আঘাত হানে সেনা আমলাতন্ত্রের মর্মমূলে। এ পর্যায়ে গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয়, তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানে এবং তার মাঝেই পরিকল্পিত দ্বিতীয় অভ্যুত্থানটিতে ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানের শক্তির উৎস ছিল মুজিব বাহিনীর গর্ভজাত রক্ষীবাহিনীর ব্যাটালিয়নগুলো।[৪৩২] অন্যদিকে জাসদ যেভাবে আশা করেছিল– তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সিপাহিদের অভ্যুত্থান শেষে দেশব্যাপী তাদের 'গণবাহিনী' পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নেবে– সেই গণবাহিনীরও শক্তিভিত ছিল মুজিব বাহিনী থেকে আসা যোদ্ধারা। অর্থাৎ তেসরা নভেম্বর অভ্যুত্থান এবং তার বিরুদ্ধে সংঘটিত পাল্টা অভ্যুত্থান– উভয় ক্ষেত্রে চালকের আসনে দেখা যাচ্ছে মুজিব বাহিনীর দ্বিতীয় প্রজন্মের সংগঠনগুলোকে।

তবে নূরুজ্জামান এবং তাঁর সহযোগীদের মতো জাসদের উদ্যোগও ব্যর্থ হয়েছিল সেদিন। এটাই ছিল মুজিব বাহিনীর বহুমাত্রিক অগ্রাভিযানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হোঁচট খাওয়া। অর্থাৎ ১৯৭৫-এর নভেম্বরে এসে মুজিব বাহিনীর প্রধান দুটি ধারাকে প্রথমবারের মতো থমকে দাঁড়াতে হয়– ততদিনে অবশ্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ খাদের প্রায় কিনারে পৌঁছে গেছে। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বড় হেঁয়ালি এই যে, সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার জন্য মুজিব বাহিনী থেকে উত্থিত কোন জাসদ-নেতাকে বড় ধরনের শাস্তি বা দায় বইতে হয়নি– ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে কেবল লে. কর্নেল আবু তাহেরকে, যিনি দলটিতে যুক্ত হয়েছিলেন ভিন্ন এক রাজনৈতিক-সামরিক

---

৪৩০ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৭।

৪৩১ এ বিষয়ে অভ্যুত্থানের দুই গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক নূরুজ্জামান ও নাসির উদ্দিনের ৬ নভেম্বরের কথোপথন দেখুন, মেজর নাসির উদ্দিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৩।

৪৩২ সেনাশৃঙ্খলা বিরোধী উল্লিখিত নানারূপ ভূমিকার কারণেই ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানকে পরে সেনাবাহিনী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ১৯৭৫ সালে রক্ষীবাহিনী প্রায় পুরোটা জাতীয় সেনাবাহিনীতে আত্মীকৃত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সামরিক আমলাতন্ত্রের স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

ঘরানা থেকে। অন্যদিকে তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার দায়ও কেবল ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বইতে হয়েছে– ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান বা মুজিব বাহিনী-রক্ষীবাহিনীর কাউকে নয়। লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে বরাবর এ প্রশ্নই ঘুরপাক খেয়ে থাকে, খালেদকে কারা গুলী করেছিল– কিন্তু কখনো এ প্রশ্ন আজও খতিয়ে দেখা হয়নি যে, খালেদের জন্য মৃত্যুর পটভূমি তৈরির ক্ষেত্রে মুজিব বাহিনীর দ্বিতীয় প্রজন্মের দুটি ধারা হিসেবে রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তারা এবং গণবাহিনীর সৈনিকেরা কীরূপ ভূমিকা পালন করেছিল। যেমনটি আমরা দেখবো শেখ মুজিবুর রহমানের নিহত হওয়ার ক্ষেত্রেও। তিনি ও তাঁর পরিবারকে কারা কারা গুলী করেছিল সেটা ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছে– ঠিক তদ্রুপ ব্যাপকতায় আড়াল করে রাখা হয়েছে কারা (এবং কীভাবে) তাঁর মৃত্যুর রাজনৈতিক-সামরিক অনিবার্যতা তৈরি করেছিল এবং সেদিন তাঁকে রক্ষায় রক্ষীবাহিনীও কেন কোনো ভূমিকা পালন করল না।[৪৩৩]

তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির একটি বিশেষ দিক ছিল– মূল নেতৃত্ব পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে যাবেন। এ বিষয়ে আনোয়ার উল আলম অভ্যুত্থানের ৭২ ঘণ্টা আগে ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার বিবরণ দিয়েছেন নিজ গ্রন্থে।[৪৩৪] খালেদ নিহত হওয়ায় সেই পরিকল্পনা আর সফল হয়নি তবে নূরজ্জামান ঠিকই ভারতে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। এসব ঘটনাবলির আরেকটি কাকতালীয় দিক হলো খালেদ ঢাকায় শেরেবাংলা নগরে সেনাবাহিনীর যে মিলব্যারাকে নিহত হয়েছিলেন সেটি ছিল রক্ষীবাহিনীরই প্রধান কার্যালয়– মাত্র কয়েকদিন আগে যা সেনাবাহিনীতে আত্তীকৃত হয়েছিল এবং যেখানে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ইউনিট অবস্থান করছিল। অন্যদিকে খালেদ মোশাররফের সঙ্গে নিহত কর্নেল নাজমুল হুদার স্ত্রী নীলুফার হুদা সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে খালেদ, হুদা ও হায়দারের নিহত হওয়ার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, ঢাকার শেরেবাংলা নগরে নিহত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে খালেদ, হুদা ও হায়দার রক্ষীবাহিনী প্রধানের ধানমণ্ডির বাসভবনে ছিলেন। মিসেস হুদার বিশাল সেই বিবরণের চুম্বক অংশ নিম্নরূপ :

---

৪৩৩ উল্লেখ্য, তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীরা বারংবার সেনাশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কথিত লক্ষ্যের কথা বললেও ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীদের সপরিবারে বিদেশে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তারাই। বাংলাদেশ বিমানের ফকার-ফ্রেন্ডশিপ বিমানে করে তাদের বিদেশ যাওয়ার জন্য উভয়পক্ষের মাঝে যোগাযোগ ও দরকষাকষির দায়িত্ব পালন করেন তখনকার বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস-মার্শাল এম জি তওয়াব। তেসরা নভেম্বর অভ্যুত্থানের মূল সংগঠকদের সম্মতিতেই এই 'আপস মীমাংসা' চলে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন Dr. Peter Custers, *পূর্বোক্ত*।

৪৩৪ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৪।

(তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে আঁচ করতে পেরে) ৬ নভেম্বর গভীর রাতে হুদা, হায়দার ও খালেদ বঙ্গভবন থেকে বের হন।...সেখান থেকে তাঁরা আসেন ধানমন্ডি ৮ নম্বর রোডে রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক নূরুজ্জামানের বাড়িতে।...এখানে তিনজনই বেসামরিক পোশাক পরে নেন।...এরপর তারা গাড়িতে করে দশম বেঙ্গলে রওয়ানা দেন।..এরপর ভোর রাতে তারা নিহত হন।[৪৩৫]

খালেদ যে বঙ্গভবন থেকে বের হয়ে হুদা ও হায়দারকে নিয়ে নূরুজ্জামানের বাসায় গিয়েছিলেন তার স্বীকৃতি রয়েছে মেজর হায়দারকে নিয়ে লেখা সাম্প্রতিক আরেক গ্রন্থেও।[৪৩৬] উপরোক্ত কোনো গ্রন্থকার অবশ্য এটা জানাচ্ছেন না যে, (নতুন) সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফ এত রাতে নূরুজ্জামানের বাসায় কেন যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে আবার যখন তাঁরা শেরেবাংলা নগরে যাচ্ছেন তখন অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা হয়েও নূরুজ্জামান কেন যাচ্ছেন না তাঁদের সঙ্গে? বর্তমান অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় থেকে অধিক বিচ্যুতি ঘটবে বিধায় এখানে এ প্রসঙ্গে আর অধিকতর আলোচনা করা হচ্ছে না।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে ১৯৭৫ সালের তিনটি অভ্যুত্থানের প্রথম ও শেষটি নিয়ে বহুমুখী আলোচনা ও অনুসন্ধান হলেও বিপুল রক্তক্ষয় ও সেনাশৃঙ্খলা বিধ্বংসী তৎপরতা হওয়া সত্ত্বেও তেসরা নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থান ও তার রাজনৈতিক-সামরিক চরিত্র সম্পর্কে অনুসন্ধানের ঘাটতি রয়ে গেছে আজও। আলোচ্য অভ্যুত্থানে রক্ষীবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীতে কীরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মেজর জেনারেল ইব্রাহিম (অব.) তাঁর 'মিশ্রকথন' নামক গ্রন্থে :[৪৩৭]

> 'একটি রক্ষীবাহিনী ব্যাটালিয়ন যেটি ২২ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট হয়েছিল সেটি ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ এর অভ্যুত্থানে অধিনায়কের নির্দেশে অংশগ্রহণ করেছিল। দু' বছর পর বগুড়া সেনানিবাসেও শৃঙ্খলা বহির্ভূত কর্মে লিপ্ত হয়েছিল ৪৮ ঘণ্টার মতো একটি সময়ে, যার কারণে এ ব্যাটালিয়নটিকে ডিসব্যান্ড বা ভেঙ্গে ফেলা হয়। আজ অবধি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ১ থেকে ২১ তম ব্যাটালিয়ন আছে, আবার ২৩তম থেকে পরবর্তী ব্যাটালিয়নগুলো আছে। ২২ ইস্টবেঙ্গল বলে কোন ব্যাটালিয়ন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নেই।'

তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থান নিয়ে চলতি অনুসন্ধানকালে বর্তমান লেখককে আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য দেন সর্বহারা পার্টির এককালের কেন্দ্রীয় নেতা

---

৪৩৫ নীলুফার হুদা, *কর্নেল হুদা ও আমার যুদ্ধ*, প্রথমা, ২০১১, ঢাকা, পৃ. ১৩২-৩৫।

৪৩৬ জহিরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৫।

৪৩৭ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১১।

রইসউদ্দিন আরিফ।[৪৩৮] তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সিরাজ সিকদার জীবিত থাকাবস্থাতেই সর্বহারা পার্টি তাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা লে. কর্নেল জিয়াউদ্দীনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে কর্মকর্তা পর্যায়ে প্রচুর রাজনৈতিক সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এই সংযোগেরই একটি ফল হিসেবে সর্বহারা পার্টি সমর্থক মধ্যসারির তরুণ অফিসাররা লে. কর্নেল জিয়াউদ্দীনের নেতৃত্বে (যদিও তিনি তখন সেনাবাহিনীতে নেই) একটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নিয়েছিল। কয়েক দফা বৈঠক শেষে বিশেষ রাজনৈতিক ঐকমত্যের আলোকে এই অভ্যুত্থান সংঘটনের সম্ভাব্য সময় ধরা হয়েছিল পঁচাত্তরের ২৮ অক্টোবর। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ পায়নি। কারণ সেনাবাহিনীর 'উচ্চপর্যায়ে' জিয়াউদ্দীনকে নিয়ে তাঁর 'কমিউনিস্ট' পরিচিতির কারণে ভীতি কাজ করেছিল– ফলে তারা এইরূপ অভ্যুত্থানে সমর্থন দিতে রাজি ছিল না। রইসউদ্দিন আরিফের মতে 'ঐ পরিকল্পনারই একটি সংশোধিত রূপ হলো তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থান– যদিও খালেদ মোশাররফকে নেতা হিসেবে বাছাইয়ের সিদ্ধান্তটিকে পূর্বাহ্নেই 'ভুল' হিসেবে চিহ্নিত করে নিজস্ব সামরিক অফিসার বন্ধুদের লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।' জিয়াউদ্দীন ও সর্বহারা পার্টি যে তেসরা নভেম্বর অভ্যুত্থান থামাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে সেটা অপর এক গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ-এর বক্তব্য দ্বারাও সমর্থিত হয়।[৪৩৯] তিনি এও জানাচ্ছেন, পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির জিয়াউদ্দীনদের সঙ্গে তখন তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীদের প্রধান যোগসূত্র ছিলেন মেজর ইকবাল, মেজর হাফিজ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে বিশ্বে মোট ৭টি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল– তার মধ্যে তিনটিই ঘটে বাংলাদেশে।[৪৪০] যার মধ্য দিয়ে এ দেশের সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বিশেষ প্রচারণার বিষয় হয়ে ওঠে। তার ইমেজ খাটো করার প্রচেষ্টাও চালানো হয় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মহল থেকে। কিন্তু এই সেনাবাহিনীর মাঝে রাজনৈতিক অস্থিরতার বীজ কখন, কীভাবে, কাদের দ্বারা রোপিত হয়েছে এবং রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর আগমন কতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষাজাত আর কতটাইবা মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে রোপিত বিভেদবৃক্ষের দায়ভার ও প্রতিক্রিয়া– সেসব প্রশ্নের উত্তর চাপা পড়ে গেছে উল্লিখিত প্রচারণার আড়ালে।

---

৪৩৮ বর্তমান লেখকের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রদত্ত তথ্য, ১৬ জুন ২০১৪, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৪৩৯ মহিউদ্দিন আহমদ, ৭ নভেম্বরের সাত-সতেরো, *প্রথম আলো ঈদ সংখ্যা*, জুলাই ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ২৪৪।

৪৪০ অন্য অভ্যুত্থানগুলো ঘটে কমরোস, নাইজেরিয়া, চাদ ও গ্রীসে।

৫.ঙ. রক্ষীবাহিনী আইন : একদিকে স্বাধীনতার মৌল চেতনার বিপর্যয় অন্যদিকে ভয় ও অবিশ্বাসের উৎস

> অনুন্নত দেশসমূহে ক্ল্যাসিক্যাল ধারায় অনেক সময়ই পুঁজির বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এবং সংশ্লিষ্ট দেশের আধাকাচড়া ও কমবেশি মুৎসুদ্দি চরিত্রসম্পন্ন পুঁজির স্বার্থকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং শোষিত শ্রেণীর আন্দোলন ও ক্ষমতা দখল ঠেকানোর উদ্দেশ্যেই অনুন্নত দেশসমূহের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ক্ষেত্র বিশেষে ফ্যাসিবাদের আশ্রয় নেয়। এ কাজে তারা প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে।
>
> –'ফ্যাসিবাদ', রাজনীতিকোষ, হারুনুর রশীদ, মাওলা বাদ্রার্স, ১৯৯৯, পৃ. ২১১, ঢাকা।

১৯৭২ সালের ২১ নম্বর প্রেসিডেন্ট অর্ডারে রক্ষীবাহিনী গঠিত হয়। গেজেট অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী এতে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তা কার্যকর দেখানো হয় ঐ বছরের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে। অর্থাৎ আইন তৈরি হওয়ার প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে থেকে তা কার্যকর দেখানো হয়! এর কারণ হলো, আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হওয়ার আগেই এই বাহিনী তার কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছিল।[৪৪১]

বাহ্যিক এই তাড়াহুড়োর আরেকটি প্রতিফলন হিসেবে দেখা যায়, গঠনকালে রক্ষীবাহিনী আইনটিতে এর কার্যধারা, জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের ধরন, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতির ছাপ ছিল না। এর মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনায় বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। অথচ মাত্র তিন বছরে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে এর ১৫টি ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলা হয়। এর কারণ হিসেবে তৎকালীন রাজনীতিবিদ ও গবেষক মওদুদ আহমেদের মূল্যায়ন ছিল, 'প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক প্রেরণা থেকেই এই বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।'[৪৪২]

---

৪৪১ মওদুদ আহমেদ, *বাংলাদেশ ঃ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল*, ইউপিএল, ১৯৮৭, ঢাকা, পৃ. ৭৫।

৪৪২ *পূর্বোক্ত*। [বর্তমান সময়ের একজন আইনজীবী ও আইন বিষয়ে গবেষক-একটিভিস্ট *হাসনাত কাইয়ূম* অবশ্য মনে করেন, "মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন কিংবা দেশের অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে 'রাজনৈতিক প্রেরণা থেকে' একটি বাহিনী সৃষ্টি মোটেই অস্বাভাবিক হতো না যদি তার মাঝে কোনো ইতিবাচক দার্শনিক লক্ষ্য কাজ করত বরং তা জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবেই দেখা হতো। বিশেষ করে সেনা ও অন্যান্য বিদ্যমান বাহিনী কাঠামোর যে উপনিবেশিক ধরন তার বিকল্প

রক্ষীবাহিনী কী ধরনের ব্যক্তিনির্ভর একটি বাহিনী ছিল তার একটি ব্যবহারিক উদাহরণ পাওয়া যায় বামপন্থী নেতা হায়দার আকবর খানের নিম্নোক্ত ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁদের এক 'কমরেড'কে রক্ষীবাহিনীর কাছ থেকে উদ্ধারের বিবরণ দিতে গিয়ে আত্মজৈবনিক গ্রন্থে লিখেছেন :

> ১৯৭৪ সাল। একদিন খবর পেলাম মতিঝিলের এক রেষ্টুরেন্ট থেকে শিবপুরের মুক্তিযোদ্ধা ঝিনুককে রক্ষীবাহিনী তুলে নিয়ে গেছে। তার যে বন্ধু খবরটি দিল সে তখন আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছে। তার কাছে খবর ছিল রাত এগারোটায় ঝিনুককে মেরে ফেলা হবে। বন্ধুর জীবন বাঁচাতে সে আমাকে ও মেননকে খবর দেয়। তার পক্ষে কিছু করার ছিল না। ঢাকার ডিসিকে ফোন করা হলো। জবাব দিলেন, 'বোঝেন তো সবকিছু, আমার করার কিছু নাই।' তখন আওয়ামী লীগের সভাপতি কামরুজ্জামান। সব ঘটনা বলে ছেলেটাকে বাঁচানোর আবেদন করলাম। অনুরোধ করলাম আমাদের নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যেতে। তিনি তখন আমাদের কিছু প্রবোদবাক্য শুনিয়ে বিদায় করতে পারলে বাঁচেন। শেষে মেনন ও আমি শেখ মুজিবুর রহমানকেই ফোন করেছিলাম।.. মুজিবের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের কারণে ঝিনুক সেবার বেঁচে গিয়েছিল। শিবপুরে এখনো শিক্ষকতা করে সে। পার্সোনাল এপ্রোচ করতে পারলে এ রকম আরও অনেককে হয়তো বাঁচানো যেত। কিন্তু তা কি সব সময়, সবার পক্ষে সম্ভব?'[৪৪৩]

উল্লেখ্য, হায়দার আকবর খান রনো বর্তমানে সিপিবি'র পলিটব্যুরোর সদস্য। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট, দেশের পুরো সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন রক্ষীবাহিনীর ব্যাপারে কর্তৃত্বহীন ছিল। ফলে এই বাহিনীর মধ্যে জবাবদিহিহীনতার একটি ভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরূপ অবস্থায় কর্তৃত্বের অপব্যবহার ছিল স্বাভাবিক। যদিও গঠনকালে এর প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল দুটি : 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা' এবং 'প্রয়োজন মুহূর্তে সশস্ত্রবাহিনীকে সহায়তা'– কিন্তু গঠিত হওয়ার পরক্ষণে বিরোধী রাজনীতিবিদরা এই বাহিনী সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে নানান অনুমান করতে শুরু করেন। এর কারণ হলো, 'অচিরেই এটা আইনের সাধারণ আওতাবহির্ভূত

অন্বেষণ স্বাধীনতার চেতনায় স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রক্ষীবাহিনী সৃষ্টির প্রক্রিয়া, এর জনবল সংগ্রহের ধরন, এর জবাবদিহিহীনতার আইনী কাঠামো, প্রশিক্ষণ কাঠামো, এর ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ধরন ইত্যাদি মিলে– রাষ্ট্রীয় পোশাকে পরিহিত একটি ব্যক্তিগত বাহিনীর অভিব্যক্তি চলে আসে এর মাঝে।" *বর্তমান লেখক কর্তৃক ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল গৃহীত অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার থেকে।*

৪৪৩ হায়দার আকবর খান রনো, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৪-১৫।

বেসরকারি বাহিনী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। তারা যে কোনো বাড়িতে প্রবেশ করতে পারত, দেশের গোটা গ্রামাঞ্চলে শিবির স্থাপন করে নারী-শিশু নির্বিশেষে যে কাউকে সেই শিবিরে আটক রাখতে পারত।'[৪৪৪]

মূল আইনটিকে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে ভয় পাওয়ার কিছু না থাকলেও একের পর এক যখন সংশোধনী আসতে থাকে তখনি রক্ষীবাহিনী সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ও ধারণা জনসম্মুখে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৭৩-এর ২২ অক্টোবর এর প্রথম সংশোধনী আনা হয়। এতেও আবু সাঈদ চৌধুরীর স্বাক্ষর দেখা যায়। বিস্ময়করভাবে এই সংশোধনীকেও ১৯৭২-এর ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর দেখানো হয়। অর্থাৎ একটি আইনে যখন কোনো সংশোধনী আনা হচ্ছে তখন তার কার্যকারিতা দেখানো হচ্ছে প্রায় ২১ মাস আগে থেকে!

প্রথম সংশোধনীতে মূল আইনে সংযোজনের জন্য ৮(ক) নামে নতুন একটি ধারার প্রস্তাব করা হয়। এই ধারার মাধ্যমে পরোয়ানা ছাড়াই আটক করার 'ক্ষমতা' ছাড়াও রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা আরও অনেক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। মর্যাদার বিচারে এই সংশোধনীকে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি দণ্ডবিধির প্রাসঙ্গিক বিধিগুলোর উপরে ঠাঁই দেওয়া হয়। যার আওতায় রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের প্রাপ্ত 'ক্ষমতা'গুলোর মধ্যে আরও ছিল : যে কাউকে যে কোন স্থানে তল্লাশির ক্ষমতা, তল্লাশিকালে প্রাপ্ত যে কোন কিছু প্রয়োজনে জব্দ করার ক্ষমতা। এ ছাড়া এই সংশোধনীর মাধ্যমে পুরানো আইনে নতুন আরেকটি ধারাও (১৬-ক) এই মর্মে যুক্ত করা হয়, যাতে দেখা যায়– 'ক্ষমতা' চর্চাজনিত কোন কার্যক্রম নিয়ে এই বাহিনীর কারও বিরুদ্ধে কোন মামলা মোকদ্দমা করা যাবে না। এইরূপ দায়মুক্তি বাহিনীটির অপারেশনমূলক কার্যক্রমে ব্যাপক গতি এনে দেয় এবং সারা দেশে এক বিভীষিকাময় অবস্থা তৈরি হয়ে যায়।[৪৪৫]

'দুষ্কৃতকারী'দের 'দমন' রক্ষীবাহিনীর অভিযানের কথিত লক্ষ্য থাকলেও মাঠ পর্যায়ে কার্যত তা জাসদের গণবাহিনী ও অন্যান্য বামপন্থীদের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যার উৎসবে পরিণত হয়। সৃষ্টির সময় গঠনগত প্রক্রিয়ার কারণেই মুজিব বাহিনীর যেমন একই সঙ্গে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ দেখার দায় ছিল– পরে তা থেকে সৃষ্ট নতুন বাহিনীকেও দেশীয় শাসক এলিটদের পাশাপাশি তাদের বিদেশি সহযোগিদের স্বার্থের দিকেও নজর রাখতে হচ্ছিল– বিশেষত যারা

---

৪৪৪ মওদুদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭।

৪৪৫ লক্ষ্যণীয়, এটা ছিল স্বাধীনতা-উত্তর দ্বিতীয় তরঙ্গের দায়মুক্তি। প্রথম দফা দায়মুক্তির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধকালে অবাঙালি ও উর্দুভাষীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধ থেকে সংশ্লিষ্টদের অব্যাহতি দেয়া (বিস্তারিত দেখুন ৪.গ উপ-অধ্যায়।) দ্বিতীয় পর্যায়ের এই দায়মুক্তির লক্ষ্য ছিল প্রধানত বামপন্থী প্রতিপক্ষকে বিচারবহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের দায় থেকে মুজিব বাহিনীর পরবর্তী সংস্করণ হিসেবে অভিহিত 'রক্ষীবাহিনী'কে অব্যাহতি দেয়া।

এ অঞ্চলে কমিউনিস্ট বিপ্লব নিয়ে উৎকণ্ঠিত ছিল তখন। সে কারণেই একাত্তরে যেটা ছিল বামপন্থীদের যুদ্ধ থেকে দূরে রাখার কার্যক্রম বাহাত্তর পরবর্তীকালে তা রূপ নেয় সরাসরি বামপন্থী দমন অভিযানে। বিশেষত মাওবাদীদের উৎখাতের বিষয়টি রক্ষীবাহিনীর প্রধান এক প্রাত্যহিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছিল এ পর্যায়ে এবং এ বিষয়ে মাত্র দু বছরের মধ্যে তারা অভাবনীয় 'সফলতা' পায়। '৭৩-৭৪ পর্যায়ে কেবল পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির ৪৬ জন প্রথম সারির সার্বক্ষণিক সংগঠক নিহত হয় রক্ষীবাহিনী ও তার সহযোগীদের হাতে।[৪৪৬] এটা ছিল জাসদ ও অন্যান্য বামপন্থীদের অতিরিক্ত। শেষোক্তদের ক্ষেত্রে কিছু অঞ্চলে, যেমন- বাজিতপুর, পাকুন্দিয়া, শরিয়তপুর, যশোরের নড়াইল, কালিগঞ্জ, দশমিনা, গাইবান্ধা, চুয়াডাঙ্গা, ঘোড়াশাল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী ইত্যাদি স্থানে বিচার বহির্ভূত হত্যার অনেক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়।

বাজিতপুরে প্রফেসর ইয়াকুব আলীর নেতৃত্বে 'পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে; পরে এরা সাম্যবাদী দলে রূপান্তরিত হয়)'-এর দৃঢ় সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল। তৎকালীন ক্ষুদ্র এই থানায় ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে অপারেশনে এসে রক্ষীবাহিনী ওই দলের ১৫৫ জন সংগঠককে হত্যা করে বলে দলটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। সেখানে ইকোরটিয়ায় জনৈক আবদুল বারীকে নিজের হাতে ছেলের মাথা কেটে দিতে বাধ্য করেছিল রক্ষীবাহিনী। সাম্যবাদী দলের কর্মীরা আবদুল বারীর বাড়িতে একদিন খেয়েছিল– এই ছিল ঐ পরিবারের অপরাধ।[৪৪৭] বাজিতপুরের পার্শ্ববর্তী পাকুন্দিয়ায় মারা হয় ১৪৩ জনকে।

সিরাজগঞ্জের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি মোহন রায়হান বলেন; '১৯৭৩ সালেই এখানে শ' পাঁচেক বামপন্থী ও জাসদ কর্মী নিহত হয়। পুরো মুজিব আমলে এখানে নিহতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। কেবল শহরেই চারটি নির্যাতন ক্যাম্প ছিল।'[৪৪৮] যশোরের কালিগঞ্জে রক্ষীবাহিনী আসে ১৯৭৪ সালে। কালিগঞ্জ থেকে সাত মাইল দূরে কালার বাজারের কাছে ১৯৭৫ সালের

---

৪৪৬ বিস্তারিত দেখুন, মুনীর মোরশেদ, *সিরাজ সিকদার ও পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি : ১৯৬৭-১৯৯২*, ঘাস ফুল নদী, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ৮৭।

৪৪৭ লোমহর্ষক এ রকম আরও বহু হত্যাকাণ্ডের বিবরণের জন্য দেখুন, আহমেদ মুসা, *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব : ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, পরিবেশক : ডানা পাবলিশার্স, ঢাকা। তবে মুজিব বাহিনীর মতোই রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রম নথিবদ্ধ করার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে রহস্যময় নীরবতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দলিলপত্রের অভাব লক্ষ্যণীয়।

৪৪৮ আহমেদ মুসা, *পর্বোক্ত*, পৃ. ৮০-৮১। পুরো সিরাজগঞ্জে রক্ষীবাহিনীর প্রায় ১৫টি বৈধ ক্যাম্প ছিল বলে জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেকজন রাজনৈতিক কর্মী। ৭.ক উপ-অধ্যায়ে মোহন রায়হান সমগ্র সিরাজগঞ্জের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ২১টি বলে দাবি করেছেন। দৈনিক গণকণ্ঠের ১৯৭৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর সংখ্যার এক প্রতিবেদন থেকেও দেখা যায়, এই মহকুমায় রক্ষীদের ২১টি ক্যাম্প ছিল।

পর রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহতদের গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে তাদের প্রধান টার্গেট ছিল পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও ভাসানী ন্যাপের কর্মীরা।[৪৪৯]

রাজশাহীর তানোরে সাম্যবাদী দলের ঘাঁটি এলাকা ধ্বংস করতে এসে রক্ষীবাহিনী ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে ১৯৭৩ সালের ১১ ডিসেম্বর একই ঘটনাস্থলে ৪৪ জনকে অর্ধমৃত অবস্থায় মাটি চাপা দিয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। হত্যার সময় নিহতরা সবাই ছিল নিরস্ত্র এবং আটকাবস্থায়।[৪৫০] পার্শ্ববর্তী আত্রাইয়ে অনুরূপ আক্রমণের শিকার হয় আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন আর টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি[৪৫১]-এর সশস্ত্র কমিউনিস্টরা। সেখানে স্থানীয় নেতা অহিদুর রহমানের নেতৃত্বে কৃষকদের বাহিনীগুলো রাষ্ট্রীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে তখন রীতিমতো যুদ্ধে লিপ্ত।[৪৫২] রক্ষীবাহিনীর উচ্চস্তরের অন্তত একজন

---

৪৪৯ আরও বিস্তারিত দেখুন, ৫.ছ উপ-অধ্যায়ে।

৪৫০ বিস্তারিত দেখুন, ৫.ছ উপ-অধ্যায়ে।

৪৫১ এই পার্টি পরে নানা পর্যায়ে জটিল এক বিভক্তি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। এক অংশ ছিল মনিরুজ্জামান তারার নেতৃত্বাধীন। অপর অংশ মতিন-আলাউদ্দিন-টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট লীগ নাম ধারণ করে ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

৪৫২ আত্রাইয়ে কৃষকদের ক্ষুদে বাহিনীগুলো অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলে শেষ পর্যায়ে প্রতিপক্ষ হিসেবে সেনাবাহিনীই প্রধান ভূমিকা নেয়। এখানে স্থানীয় নেতা অহিদুর রহমানের নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামের বিকাশ ঘটেছিল, জাতীয় পরিসরে যারা ছিলেন পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) সংগঠনভুক্ত। ২০১২-এর ৯ অক্টোবর এক সাক্ষাৎকারে টিপু বিশ্বাস সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জানিয়েছেন, মূলত আত্রাই-রাণীনগর-বাঘমারা, এই তিন থানা জুড়ে তাঁদের গেরিলা অঞ্চলটি গড়ে উঠেছিল। যেখানে ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে তাঁদের কর্মীরা একই সঙ্গে মুজিব বাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে লড়লেও বাহাত্তর থেকে 'প্রধান' প্রতিপক্ষ হয়ে পড়ে মুজিব বাহিনী ও মুজিববাদী অন্যান্যরা। টিপু বিশ্বাস নিজে ২৬ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত বিশাল বাহিনী নিয়ে পাবনা মুক্ত রেখেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাবনায় 'মুজিববাদ অনুসারীদের হামলায় টিকতে না পেরে' প্রায় দেড় শত সদস্যের বাহিনী নিয়ে তাঁরা আত্রাই চলে আসেন। সেখানে বাহাত্তরের জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে জুন নাগাদ সংঘাত-সংঘর্ষ উত্তুঙ্গে পৌঁছায়। তাত্ত্বিকভাবে এই দল তখন চারু মজুমদারের 'লাইন' অনুসরণ করছিল। এক পর্যায়ে পুরো এলাকা প্রায় ২০ হাজার সরকারি বাহিনী ঘেরাও করে ফেলে। অহিদুর রহমান গ্রেফতার হয়ে যান। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মুখে পশ্চাৎপসারণ ও গেরিলাদের বিকেন্দ্রিকরণের সিদ্ধান্ত দেয়া 'পার্টি'। সে অনুযায়ী আবদুল মতিন, বাদল দত্ত ও টিপু বিশ্বাস প্রায় ২৫ জন সহযোদ্ধা নিয়ে কুষ্টিয়ায় পশ্চাৎপসারণ করতে গিয়ে নাটোর অঞ্চলে সরকারি বাহিনীর হামলায় পড়েন। আবদুল মতিন এখানে আহত হন ও ধরা পড়েন (১৯৭২-এর ৪ জুন)। টিপু বিশ্বাস ঘেরাও থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন। টিপু বিশ্বাস দাবি করেছেন, সম্মুখ যুদ্ধে তাঁরা বারবার হিন্দিতে আত্মসমর্পণের আহ্বান শুনেছেন প্রতিপক্ষের কাছ থেকে। তাঁর মতে, আত্রাই দমনাভিযানে সরকার যে বাহিনী নিয়োগ করে তাতে ভারতীয় সৈনিকরাও ছিল। (তাঁর এই দাবি আর কোনো সূত্র দ্বারা যাচাই করা যায়নি। তবে সিরাজগঞ্জের অভিজ্ঞতা থেকে সেখানকার জাসদ নেতা কবি মোহন রায়হানও অনুরূপ দাবি করেছেন; দেখুন ৭.খ *উপ-অধ্যায়*) ১৯৭৩-এর ফেব্রুয়ারিতে টিপু বিশ্বাসও আটক হয়ে

কর্মকর্তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়, রাষ্ট্রীয় বাহিনী বলা হলেও তারা মূলত আওয়ামী লীগ নেতাদের নির্দেশ মতো তাদের স্বার্থে স্থানীয় পর্যায়ে অপারেশন পরিচালনা করতেন।[৪৫৩] দেশের বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা হায়দার আকবর খান রনো 'রক্ষীবাহিনীর হাতে (উপরোক্ত ধাঁচের অপারেশনগুলোতে) দশ হাজারের বেশি কমিউনিস্ট, বামপন্থী কর্মী বা তাদের সমর্থক ও সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন' বলে দাবি করেছেন।[৪৫৪] বর্তমান অধ্যায়ের পরবর্তী উপ-অধ্যায়গুলোতে রক্ষীবাহিনীর উপরে উল্লিখিত আঞ্চলিক অভিযানগুলোর কয়েকটি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে আলোকপাত করা হবে।

তবে দেশের অসংখ্য জেলায় ওইরূপ দমনমূলক অভিযানের মুখেও জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার কর্মীদের অহিংস প্রতিরোধ বা প্রচারণা আন্দোলন ছিল সেসময় খুব সীমিত। তাছাড়া রক্ষীবাহিনী আইনের প্রথম সংশোধনীতে তাকে যে দায়মুক্তি দেওয়া হয় সেটাও তার কার্যক্রমকে বিশেষ গতি এনে দেয়। তবে জবাবদিহিতাহীনতার অবারিত দায়মুক্তির পরও এলিট বাহিনী হিসেবে 'রক্ষী'রা আরও আইনগত বিস্তৃতি চাচ্ছিল। মূল রাজনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ীই তা প্রয়োজন হয়ে পড়ে– যদিও সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটানো হচ্ছিল ধাপে ধাপে। ফলে, ১৯৭৫ সালের ১৭ জুলাই আরেকটি সংশোধনী আনা হয় মূল আইনে। সংশোধনীটি মূলত রক্ষীবাহিনীর মর্যাদা ও কাঠামোগত বিস্তৃতির লক্ষ্যে

যান ঢাকার রাজারবাগ থেকে। এভাবে সাধারণভাবে আত্রাই অধ্যায় শেষ হয়। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আত্রাইসহ অত্র অঞ্চলে 'নকশাল দমনাভিযান'-এর পরিচালনায় ছিলেন প্রথমে কর্নেল সাফায়াত জামিল– যাঁকে পরে আমরা দেখেছি (৫.ঘ উপ-অধ্যায়ে) সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর একাংশের সঙ্গে মিলে তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে। চুয়াত্তরের জুন থেকে সে দায়িত্ব দেয়া হয় কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদাকে। কুমিল্লা থেকে বদলি হয়ে গিয়ে কর্নেল হুদাও নতুন 'দায়িত্ব'-এ বিশেষ সফলতা প্রদর্শন করেন। এ বিষয়ে তাঁর স্ত্রী'র স্বীকৃতি ও সন্তুষ্টির বিবরণ দেখুন, নীলুফার হুদা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১। উল্লেখ্য, নাজমুল হুদাও তেসরা নভেম্বর অভ্যুত্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকাবস্থায় অজ্ঞাত সৈনিকদের হাতে নিহত হন।

৪৫৩ দেখুন, মে. জে. (অব.) সাবিহ উদ্দিনের সাক্ষাৎকার, S A Karim, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৩। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন এই লেখক। সাবিহ উদ্দিনের সঙ্গে আলাপচারিতার ভিত্তিতে উপরোক্ত গ্রন্থে তিনি লিখেছেন,

> The major weakness of the Rakkhi Bahini in the long run was its close association with the Awami League Since the local Awami League leaders often the targets of various leftist groups, Rakkhi Bahini began by acting as their protector and ended up by taking orders from them. Mushtaque and Osmani for instance had Rakkhi Bahini units posted in their constituencies to enhance their hold over them. Rakkhi Bahini was utilized also by some prominent Awami League leaders to intimidate voters to vote for them during the 1973 elections.

৪৫৪ হায়দার আকবর খান রনো, *রাজনীতির কথা প্রসঙ্গে*, তরফদার প্রকাশনী, ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৩২।

প্রণীত। সংবিধানে 'ডিসিপ্লিন ফোর্স' বলতে যা বোঝানো হয় সেই মর্যাদা দেওয়া হয় রক্ষীবাহিনীকে এই সংশোধনীর মাধ্যমে। এতে বাহিনীতে প্রত্যেক ইউনিটে অনেকগুলো কোম্পানি এবং কোম্পানিতে অনেকগুলো প্ল্যাটুন সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়। 'রেজিমেন্ট' নামে কয়েকটি কোম্পানি নিয়ে একটি সিগন্যাল ইউনিট সৃষ্টির বিষয়টিও আসে সংশোধনীতে। বাহিনীটি বিস্তৃতির সবচেয়ে জোরালো ইঙ্গিত পাওয়া যায় যখন সংশোধনীতে কয়েকটি ইউনিট নিয়ে 'জোন' গড়ে তোলার ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়। সংশোধনীতে বাহিনী প্রধানের পদকে 'ডিরেক্টর জেনারেল' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ ছাড়া তার অধীনে আটটি স্তরে অফিসারদের মর্যাদার বিস্তারিত কাঠামোও গড়ে তোলা হয়, যদিও গঠনের সময় মূল আইনে এর মাত্র তিন স্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ছিল। যথা : ডিরেক্টর, অফিসার ও রক্ষী।

এই সংশোধনী জনসম্মুখে প্রকাশের পর রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনে ধারণা জন্মে– সরকার একে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রথাগত সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার দিকে এগোচ্ছে। তবে সেনাবাহিনী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কেন সরকার বা রক্ষীবাহিনীর গোপন ও প্রকাশ্য নীতিনির্ধারকরা এইভাবে আরেকটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার দিকে এগোচ্ছে তার প্রকাশ্য কোনো ব্যাখ্যা না থাকায় জনসমাজে সর্বত্র সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হতে থাকে। বিশেষত বিদ্যমান সেনাবাহিনীতে ওইরূপ অবিশ্বাসের সর্বাধিক ছাপ পড়ে সেই সময়। এইরূপ অবিশ্বাসের অন্যতম বাস্তবভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই এই বাহিনীর জন্য পরপর তিনটি অফিসার ব্যাচ সংগ্রহ প্রক্রিয়া দেখে। এ বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ইবরাহিম তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে সেই সময়কার স্মৃতিচারণ করে মন্তব্য করেছেন, 'আমাদের (সেনাবাহিনীর) মানসপটে তখন রক্ষীবাহিনী একটি প্রতিপক্ষ।' সেনাবাহিনীতে মুজিব ও আওয়ামী লীগ যে প্রথম থেকে উপরোক্ত সন্দেহ ও অবিশ্বাসের শিকার তার প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় তিয়াত্তরের নির্বাচনে সেনানিবাসগুলোতে সৈনিকরা আশি শতাংশই নৌকা মার্কার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। এ বিষয়ে অ্যান্থনী মাসকারেণহাস লিখেছেন, 'সেনানিবাসগুলোর ভোটের ঐ ফল প্রকাশ করা না হলেও শেখ মুজিব ও তাঁর উপদেষ্টাগণ সযত্নে তা লক্ষ্য করেন।'[৪৫৫] বলা বাহুল্য, এরূপ বাস্তবতা মুজিবকে রক্ষীবাহিনী প্রকল্পে অধিক মনোযোগী করে থাকবে।

তবে কেবল মূলধারার সশস্ত্র বাহিনীতেই নয়, জনসমাজেও রক্ষীবাহিনী রাজনৈতিক সরকারের জন্য বিধ্বংসী বিদ্বেষের কারণ ঘটিয়েছিল। বিশেষত মাঠ পর্যায়ে রক্ষীবাহিনীর শৃঙ্খলা সংক্রান্ত গাফিলতি তখনকার রাজনৈতিক সরকারের জন্য ক্ষতিকর ফল বয়ে আনে। এক্ষেত্রে আমরা যুদ্ধপরবর্তী এক শহীদ জায়ার

৪৫৫ অ্যান্থনী মাসকারেণহাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮।

অভিজ্ঞতার সামান্য অংশ তুলে ধরতে পারি এ পর্যায়ে। এই শহীদ জায়া আয়েশা ফয়েজ হলেন জনপ্রিয় লেখক প্রয়াত হুমায়ূন আহমেদ ও মুহাম্মদ জাফর ইকবালের মা। তাঁর স্বামী (পুলিশ কর্মকর্তা ফয়েজুর রহমান) সরকারি দায়িত্ব পালনকালে একাত্তর সালে মারা যান। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আয়েশা ফয়েজ যুদ্ধ পরবর্তী তাঁর জীবনযুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

> ১৯৭২ সালে প্রথম ঢাকায় আসি। সে সময় সন্তানদের নিয়ে অনেকটা উদ্বাস্তু জীবন গেছে। স্বাধীনতার পর শহীদ পরিবার হিসেবে মোহাম্মদপুরে একটি বাড়ি দিল সরকার। তিন দিন পর সেই বাড়িতে রক্ষীবাহিনী এসে হাজির। আমাদের মতো মানুষদের উচ্ছেদ করতে ট্রাক ভর্তি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসে। সুবেদার মেজর হাফিজ বাসার পর্দা-টর্দা ছিড়ে ফেললো। অশালীনভাবে আমাদের উচ্ছেদ করা হলো। এ সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো কবি আহমদ ছফা। রক্ষীবাহিনীর অন্যায়ের প্রতিবাদে কেরোসিন ঢেলে নিজের গায়ে আগুন ধরানোর হুমকি দিল সে। পাশের বাড়িতে থাকতেন ডা. মনোয়ার হোসেন, রাতে তাঁর বাড়িতে থাকলাম। পরেরদিন একটা বাসা খুঁজে সেই ভাড়াবাসায় উঠে গেলাম।..."[৪৫৬]

রক্ষীবাহিনী উক্তরূপভাবে অনেক তুচ্ছ ঘটনায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজনৈতিক সরকারের জন্য জনরোষ বয়ে এনেছিল। যেমন ১৯৭৩ সালের ২৯ জুন চট্টগ্রাম ইস্টার্ন রিফাইনারীর একটি বাস এই বাহিনীর একটি ট্রাককে ওভারটেক করলে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা ঐ গাড়ি ঘেরাও করে তাতে গুলিবর্ষণ করে। এতে একজন শ্রমিক ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আহত হয় অনেকে।[৪৫৭]

রক্ষীবাহিনী গঠনকালে মূল আইনে বলা হয়েছিল এটি কেবল বেসামরিক প্রশাসনকে ও সামরিক বাহিনীকে সহায়তার জন্য তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু কাঠামোগত বিস্তৃতির লক্ষ্যে মূল আইনে দ্বিতীয় সংশোধনীটি আনার পর সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের অনেকে ভাবতে শুরু করেন, মুজিব বাহিনী ও কাদেরিয়া বাহিনীর এই নতুন কাঠামোগত বিস্তৃতি আসলে ভিন্ন পরিকল্পনা ধরে এগোচ্ছে এবং তার সঙ্গে প্রবাসী সরকার বনাম মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিব বাহিনীর দ্বন্দ্বের পূর্বাপর অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ রক্ষীবাহিনী বনাম সেনাবাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ছিল একাত্তরে মুজিব বাহিনী বনাম মুক্তিবাহিনীর দ্বন্দ্বের অনুরূপ। এইরূপ উত্তেজনাকর দোলাচলের মধ্যেই ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা। এসময় রক্ষীবাহিনী আইনে আরেকটি সংশোধনী (যা জারি হয় ১৯৭৫

---

৪৫৬ আয়েশা ফয়েজের পুরো সাক্ষাৎকারের জন্য দেখুন, *শিলালিপি*, দৈনিক কালের কণ্ঠের সাপ্তাহিক প্রকাশনা, ৩ আগস্ট ২০১২, ঢাকা। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মারা যান।

৪৫৭ দেখুন, আশরাফ কায়সার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯।

সালের ৪ অক্টোবর; স্বাক্ষর করেন তাতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ)-এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে আত্তীকৃত করে নেয়া হয় এর সকল কিছু– যে প্রক্রিয়া নিয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে, রক্ষীবাহিনীর কার্যকালে সংগঠিত মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনাবলিতে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ ও ক্ষতিপূরণ বিষয়ে এ দেশের প্রশাসন ও রাজনৈতিক সাহিত্য খুব কমই মনোযোগ দিয়েছে।

বর্তমান লেখার পরবর্তী দুটি উপ-অধ্যায়ে রক্ষীবাহিনীর মাঠপর্যায়ের অপারেশন নিয়ে সুনির্দিষ্ট আরও কিছু কেসস্টাডি তুলে ধরা হয়েছে যা এই বাহিনীর কার্যক্রম ও তৎকালীন রাজনীতিতে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপলব্ধির জন্য প্রাসঙ্গিক। তবে এ পর্যায়ে এই বাহিনীর মানবাধিকার দলন সম্পর্কে আদালতকেন্দ্রিক কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরাও জরুরি। এই আলোচনার সূত্রে দেখা যাবে কীভাবে রক্ষীবাহিনীর মানবাধিকার দলন দেশের শাসন-সংস্কৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

বাহিনী হিসেবে বিলুপ্তির আগে– এর কার্যক্রম যখন তুঙ্গে তখন রক্ষীবাহিনীর সুনির্দিষ্ট কিছু অপারেশনের নিরীহ শিকার জনগণের স্বজনদের পক্ষে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে কয়েকটি মামলায় লড়েছিলেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার। সেরকম এক মামলার (এস. মোহসীন শরীফ বনাম রাষ্ট্র, ২৭ ডিএলআর, ১৯৭৫, হাইকোর্ট, পৃ. ১৮৬) শুনানিকালের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে ব্যারিস্টার মওদুদ লিখেছেন,

> 'আদালতের কাছে প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা স্বীকার করেছেন, তাদের কোন কার্যবিধি কিংবা আচরণবিধি ছিল না। নিজেদের কার্যক্রমের কোন বিবরণী কিংবা কাগজপত্র বা দলিল তারা সংরক্ষণ করতেন না। কোন গ্রেফতার কিংবা তল্লাশির রেকর্ডও তারা রাখতেন না। তাহলে তারা কীভাবে কাজ করছে, আদালতের এমন প্রশ্নের জবাবে রক্ষীবাহিনীর একজন সিনিয়র ডেপুটি লিডার হাফিজ উদ্দীন উদ্ধতভাবে জবাব দিয়েছিলেন, *আমরা যেভাবে কাজ করা ভালো মনে করি সেভাবেই করি*। প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে হাফিজ উদ্দীন আরও জানান, কোন অভিযানের ব্যাপারে তারা কোন ডায়েরি রাখতেন না। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদের হিসাবের জন্য কোন রেজিস্ট্রারও তাদের ছিল না।[৪৫৮]

একই পিটিশনে (নম্বর : ৪৬/১৯৭৪) বিচারপতি দেবেশ সি. ভট্টাচার্য রায়ে উল্লেখ করেন :

---

৪৫৮ মওদুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮১।

> The Deputy Director (Administration), Rakkhi Bahini, who has deposed in this court, when specifically asked about the rules under which they are to perform their various functions, stated that no rules have yet been framed under the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972 (President's Order No. 21 of 1972) under which The Jatiya Rakkhi Bahini has been constituted. On an examination of the various provisions of the aforesaid Order is appears to us that it is extremely doubtful that the functing of the Jatiya Rakkhi Bahini without any rules framed under the said Order has the necessary legal foundation.[৪৫৯]

উল্লেখ্য, এই মামলায় বাদি তখনকার বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার নড়িয়া থানার বাসিন্দা মোহসীন শরীফের ১৮ বছর বয়সী ভাই শাহজাহানকে রক্ষীবাহিনীর হাতে ঢাকায় আটকাবস্থা থেকে আর ফিরে পাওয়া যায়নি। ১৯৭৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর শাহজাহানকে ঢাকার গুলিস্তান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তার কাছে অবৈধ অস্ত্রের হদিস রয়েছে বলে দাবি করা হলেও সে দাবির পক্ষে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ তুলে ধরতে পারেনি রক্ষীবাহিনী। যার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

> The story of the discovery of arms on the showing of Shahjahan and his subsequent escape hardly inspires any sense of belief in the said story in view of the highly irregular manner in which the operations were conducted by the Jatiyo Rakkhi Bahini party and the complete absence of any dependable materials in support of operation have shown a complete disregard of the case.[৪৬০]

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এসব পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী ছিল অপ্রতিরোধ্য। তাদের উপরোক্ত ধাঁচের প্রশ্নসাপেক্ষ কর্মকাণ্ডের বিপরীতে জাসদের গণবাহিনী এবং অন্যান্যদের তরফ থেকে সরকার বিরোধী সশস্ত্র তৎপরতাও এসময় এক নৈরাজ্যকর মাত্রায় পৌঁছায়। এক পর্যায়ে এটা বোঝা জনগণের জন্য সত্যি দুরূহ হয়ে পড়েছিল, কোন্ 'অ্যাকশন'টি (action) শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে সশস্ত্র শ্রেণি সংগ্রামের অংশ এবং কোন্‌টা স্রেফ খুনোখুনি বা ডাকাতি। ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত এক ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান দাবি করেন, স্বাধীনতা-উত্তর মাত্র ১৫ মাসে '১৩২ জন আওয়ামী

---

৪৫৯ এস. মোহসীন শরীফ বনাম রাষ্ট্র, ২৭ *ডিএলআর*, ১৯৭৫, হাইকোর্ট, পৃ. ১৯৭.

৪৬০ *পূর্বোক্ত*।

লীগ কর্মীকে রাতের আঁধারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।' এ সময় দেশের গুরুত্বপূর্ণ এক দৈনিক ছিল ইত্তেফাক। পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধির স্বার্থে এই পত্রিকার ১৯৭৩ সালের কয়েকটি সংবাদ শিরোনাম তুলে ধরা হলো :

–'২৮ দিনে ২০ জন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত।' *২ মার্চ*

–'জামালপুরে আড়াই মাসে ৪৮টি হত্যাকাণ্ড, ২৭৩টি ডাকাতি। *২৭ মে*

–'কুষ্টিয়ার তিন থানায় ৬ মাসে ৬০ জন নিহত।' *১৭ জুন*

–'স্বাধীনতার পর প্রথম নয় মাসে ৭৩ জন পুলিশ ও বিডিআর নিহত।' *২৫ সেপ্টেম্বর*

–'রাজশাহীতে পুলিশ ফাঁড়ি ভস্মিভূত; ৭ পুলিশসহ নিহত ১২।' *৩০ সেপ্টেম্বর*

–'রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময়; নিহত ৮।' *৫ অক্টোবর*

মুজিবের মৃত্যুর আগে উপরোক্ত পরিস্থিতির আর উন্নতি হয়নি। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়,[৪৬১] কেবল ১৯৭৩ সালে সর্বহারা পার্টি ১৪টি থানা, ফাঁড়ি, ব্যাংক দখল করেছে বা করার চেষ্টা চালিয়েছে। পরের বছর এই সংখ্যা ছিল অন্তত ১০টি। সর্বহারা পার্টির পাশাপাশি জাসদও তখন নানারূপ সশস্ত্র তৎপরতা চালাচ্ছিল। আবার এই দুই দলের নামে অপবাদ পড়লেও স্রেফ সম্পদ তৈরির উপায় হিসেবেও ডাকাতির পথ বেছে নিয়েছিল অস্ত্রধারী অনেক তরুণ। এসবের আলোকেই ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে মুজিব দাবি করেছিলেন, 'দুস্কৃতকারী'দের হাতে তাঁর দলের চারজন সংসদ সদস্যসহ সর্বমোট তিন হাজার নেতা-কর্মী মারা গেছে।' নিহতদের মধ্যে ছিলেন মোতাহার উদ্দিন (ভোলা; ১৯৭৪-এর ১০ জানুয়ারি নিহত হন), নূরুল হক হাওলাদার (শরিয়তপুর; ১৯৭৩ সালের ৩ মে নিহত হন), গোলাম কিবরিয়া (কুষ্টিয়া; ১৯৭৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর নিহত হন), গাজি ফজলুর রহমান (নরসিংদী; ১৯৭৪ সালের ১৬ মার্চ নিহত হন) প্রমুখ। এ ছাড়াও আওয়ামী লীগের আরও গুরুত্বপূর্ণ যেসব নেতা এসময় খুন হন তার মধ্যে ছিলেন–আবদুল গফুর (খুলনা), সওগাতুল আলম সগির (মঠবাড়িয়া), ইমান আলী (ময়মনসিংহ), আবদুল খালেক (নেত্রকোণা) প্রমুখ। এ পর্যায়ে অবস্থা চরম উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে যখন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং 'লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেওয়া'র ঘোষণা দেন। তাঁর এই হুঁশিয়ারি কথার কথা থাকেনি। ফলে স্বাভাবিক শাসন প্রক্রিয়া এতই বিপন্ন হয়ে পড়ে যে, ১৯৭৪-এর ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে 'সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার স্থগিত' করে দেশ চালানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। এর এক মাস পর আসে একদলীয় শাসনব্যবস্থা। কিন্তু প্রচণ্ডভাবে বহুধা বিভক্ত একটি জাতির পক্ষে তখন কোনোভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পাশাপাশি বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও চোরাচালানের

---

৪৬১ মুনীর মোরশেদ, *পূর্বোক্ত*।

মতো নতুন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছিল না। ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারিতে আরেকজন সাংসদ খুন হন (আব্দুল খালেক, নেত্রকোণা)।

ভুল রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা এসময় কীভাবে সমাজকে বিপন্ন করে তুলেছিল তার বড় নজির দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যে বাংলাদেশে মাথাপিছু খাদ্য প্রাপ্যতা সবচেয়ে বেশি ছিল ১৯৭৪ সালে। আবার মুজিব নিজেই ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি পার্লামেন্টে উল্লেখ করেন, 'বিগত তিন বছরে সরকার ২ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা সমতুল্য বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে।' অন্যদিকে সে সময় মুজিবের অন্যতম রাজনৈতিক মিত্র সিপিবি'র তৃতীয় কংগ্রেসের রিপোর্টের ভাষ্য অনুযায়ী : 'আওয়ামী লীগ শাসনামলে ৫ হাজার ৬৭০ কোটি টাকার (১ ডলার = ১৫ টাকা হিসাবে) বিদেশী সাহায্য এসেছিল।'[৪৬২] এত বিপুল সাহায্যের পরও চুয়াত্তরে মানুষ ভয়াবহ খাদ্য সংকটে ভোগে। কারণ সেসময় দেশে যে বন্যা হয় তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৃষ্ট কর্মহীনতা ও দীর্ঘমেয়াদে এর অন্যান্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশাসনের পক্ষে সঠিক তথ্য আহরণ ও পাওয়ার সুযোগ কমে যায় তার দমন-পীড়নমূলক মনোভঙ্গির কারণে। সরকারি ভাষ্য মতেই প্রায় ২৭ হাজার মানুষ মারা যায় দুর্ভিক্ষে।[৪৬৩] বেসরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি বলা হতো। চুয়াত্তরের জুলাই থেকে পরবর্তী চার মাস ধরে চলে এই মৃত্যুর মিছিল।

উল্লেখ্য, ১৯৪৩ সালের পর বাংলায় এত বড় দুর্ভিক্ষ আর হয়নি। এই দুই দুর্ভিক্ষের কাকতালীয় দুটি দিক হলো, সদ্য প্রকাশিত শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে দেখা যায়[৪৬৪]– ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের মাঝেই মুজিব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সদস্য হয়েছিলেন; তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর। তাঁর সেই রাজনৈতিক জীবন যখন চূড়ান্ত সফলতা পায়– তখনি, ৫৪ বছর বয়সে তাঁকে মুখোমুখি হতে হয় আরেক দুর্ভিক্ষের। এ ছাড়া '৪৩ এর দুর্ভিক্ষের জন্য যেমন স্থানীয় দায়িত্বশীলদের তরফ থেকে মূলত দোষের ভাগীদার হয়েছে শাসক ইংরেজরা– তেমনি চুয়াত্তরেও দুর্ভিক্ষের জন্য আরেক বিদেশি শক্তি যুক্তরাষ্ট্র থেকে একদফা খাদ্য সাহায্য যথাসময়ে না পাওয়াকে সরকার সমর্থক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে 'দুর্ভিক্ষের কারণ' হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছিল। সেক্ষেত্রে এটা প্রায় এড়িয়ে যাওয়া হয় যে, বাহাত্তরের শেষে ও তিয়াত্তরে বাংলাদেশ সরকার

---

৪৬২ *রাজনৈতিক রিপোর্ট*, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত, জুন ১৯৮০, ঢাকা, পৃ. ১৫।

৪৬৩ এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে, *Amartya* Sen, *Development as Freedom*, Oxford University Press, New Delhi, 2000, p. 165. বেসরকারি হিসাবে কেবল রংপুর জেলাতেই ১০ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। আরও দেখুন, Where do the grants go?, Weekly *HOLIDAY*, October 16, 1974, Dhaka.

৪৬৪ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১৭।

দু'বার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে খাদ্য সাহায্যের যে আবেদন করে তাতে দেশটি শেষপর্যন্ত ইতিবাচক সাড়াই দিয়েছিল (যদিও প্রথমদিকে সাহায্যের বিষয়ে হাতগুটিয়ে ছিল তারা)। উপরন্তু, ১৯৭৪-৭৫ সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ৫৭.৭ কোটি ডলার সহায়তা দেয়, যা ছিল সেই সময়কার ভারতীয় সাহায্যের প্রায় দ্বিগুণ।[৪৬৫] এসময় ভারতীয় সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি ডলারের কাছাকাছি। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ১১ কোটি ডলারের সমপরিমাণ।[৪৬৬]

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সময়মত খাদ্য সরবরাহ করেনি বলেই দুর্ভিক্ষ ঘটেছে'–এই ব্যাখ্যাকে উপজীব্য করে পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক মৈত্রীতে আবদ্ধ সিপিবি'র তরফ থেকে তাদের নেতা অজয় রায় লিখিত 'খাদ্য সংকট কেন? সমাধানের উপায় কী?' শীর্ষক একটি পুস্তিকাও ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এই পুস্তিকায় তিনি আওয়ামী লীগকে দুর্ভিক্ষের দায় থেকে অব্যাহতি দেন। যদিও দুর্ভিক্ষের পুরো বিষয়টি ছিল বাস্তবে শাসকযন্ত্রের চরম ব্যবস্থাপনাগত সংকট এবং 'দুর্ভিক্ষের পর দেশে খোলাখুলিভাবে চিন্তা করা হচ্ছিল মুজিব আর কতদিন টিকবেন, টিকে থাকবেন কি না সে প্রশ্ন তখন মীমাংসিত'।[৪৬৭]

---

৪৬৫ দেখুন, নুরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭ ও ১৭৬। বাংলাদেশকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র যে প্রথম দিকে বিশেষ কূটনীতিক টানাপোড়েনে ছিল সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন '*সংযুক্তি : তেইশ*।'

৪৬৬ দেখুন, *Flow of External Resources,* MoF, GoB, 1984, Pp. 22-76.

'বন্ধু' রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য-সহযোগিতার এ বিষয়টি এ পর্যায়ে আরো বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ভারত স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম পাঁচ বছর বাংলাদেশকে ঋণ ও অনুদান সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৩১১ মিলিয়ন ডলার। যার মধ্যে বাস্তবে ছাড় করা হয়েছিল ২৭৫ মি. ডলার। এই ছাড়ের মধ্যে অনুদান ছিল ৬৯ মি. ডলার। অন্যদিকে একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ঋণ ও অনুদান সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয় ৭৬৩ মি. ডলার। যার মধ্যে ছাড় করা হয় ৬৮৮ মি. ডলার। উক্ত ৬৮৮ মি. ডলারে অনুদান ছিল ১৮৩ মি. ডলার। একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল ২০৭ মিলিয়ন ডলারের। পাওয়া গেছে তার ১১৯ মি. ডলার এবং এর মধ্যে অনুদান ছিল মাত্র ৩০ মিলিয়ন ডলার। লক্ষ্যণীয়, স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম পাঁচ বছর ভারত বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু রাষ্ট্রের অবস্থানে থাকলেও এবং সে সময়ে বাংলাদেশের জন্য সব ধরনের সাহায্য-সহায়তা জরুরি হলেও ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশ যে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়েছে তা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত অনুরূপ সহায়তার ৪০ শতাংশ। একই সময়ে, বাংলাদেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মিত্র সেই সময়কার অন্যতম বিশ্বশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে বাংলাদেশ যে সহায়তা পায় তা যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত সহায়তার ১৭ শতাংশ মাত্র। দেখুন, *Flow of External Resources,* Economic Relation Division, MoF, GoB, Dhaka, 22 Jan. 2013, P. 94, 109, 114.

৪৬৭ আসফাক আলম স্বপন, *লরেন্স লিফসুলৎসের প্রতিবেদন অনুসরণে মুজিব হত্যা চক্রান্ত*, ত্রিধারা প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ.২৩।

বস্তুত চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের নব্য ধনিক শ্রেণির সামনে সম্পদ পুঞ্জিভবনের একটি বড় দরজাও উন্মোচন করে দেয়। শহরে খাদ্য ব্যবসার মাধ্যমে লাগামহীন মুনাফার পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ প্রচুর মধ্য ও ক্ষুদে চাষি পরিবারকে জমি ছাড়তে বাধ্য করে এবং এর মধ্য দিয়ে জমির ব্যাপক কেন্দ্রীভবন ঘটে মুষ্টিমেয়ের হাতে। দুর্ভিক্ষের মূল আঘাত চুয়াত্তরে ঘটলেও অন্তত দু' বছর আগে থেকে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, দুর্ভিক্ষ আসন্ন। বাহাত্তরের ২২ জানুয়ারি দেশে ফিরে মার্চে মাওলানা ভাসানী প্রথম যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন তার বিষয়বস্তু ছিল 'মহাদুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন।'[৪৬৮] সংবাদপত্রগুলোতে আসন্ন দুর্ভিক্ষ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে এসময়। ১৯৭২-এর মার্চে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নিউজউইকের প্রচ্ছদ রচনা `Bangladesh : Fight for Survival'-এ স্পষ্ট বিবরণ ছিল, বাংলাদেশে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সংকট দুর্ভিক্ষের জন্ম দিতে যাচ্ছে এবং 'দেশটিতে মানবিক বিপর্যয় ঘটবে।'[৪৬৯] প্রতিবেদনটিতে 'কয়েক সপ্তাহের মধ্যে খাদ্যদাঙ্গারও আশঙ্কা করা হচ্ছিল। ১৯৭৩ সালের ১০ অক্টোবর দেশের সুপরিচিত দৈনিক– গণকণ্ঠের সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল : 'ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি।' এসব সংবাদভাষ্য থেকে স্পষ্ট, সরকার দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় যথেষ্ট সময় পেয়েছিল এবং এটা স্রেফ বন্যা বা অপর কোনো দেশ থেকে খাদ্যের একটি চালান আসা না-আসার তাৎক্ষণিক কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল না।

বলা বাহুল্য, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ সমকালীন রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল প্রবলভাবে। রাজনৈতিক সাহিত্য ও সাধারণ সাহিত্যেও এর বিস্তর প্রভাব পড়ে। তবে সেসব ছাড়িয়ে বর্তমানকালের একজন তরুণ ব্লগারের একান্ত ব্যক্তিগত নিম্নোক্ত উপলব্ধিতেই যেন বাংলাদেশে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের পুরো সমাজতত্ত্বটি উঠে এসেছে নির্মোহ এক পূর্ণাঙ্গতায়।

> ...ভাতের মাড়ও খাওয়া শিখলাম ১৯৭৪ সালে। বাসায় বাসায় ভাতের মাড় খাওয়ার চল হলো। লবণ মিশিয়ে খেতে ভালোই লাগতো। আমরা এটাকে মজা হিসেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি এটাকে চরম অপমান হিসেবে নিয়েছিল। আসলে এটা ছিল আকাল। ভিক্ষুকরা বাসায় বাসায় ঘুরে ভাতের মাড় চাইতো। তাও সহজে পেত না।...[৪৭০]

---

৪৬৮ *হককথা*, ১৭ মার্চ।

৪৬৯ পুরো প্রতিবেদনটির অনুবাদ দেখুন 'সংযুক্তি তেইশ'-এ।

৪৭০ দেখুন, *স্মৃতির ঝাঁপি : চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ*, সানাউল্লাহ, http://www.cadetcollegeblog.com/999/11533. (retrieved on 1st July. 2013)

উল্লেখ্য, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষকালেই রচিত হয়েছিল কবি রফিক আজাদের কবিতা 'ভাতদে হারামজাদা'– যা সেসময় শহুরে পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিচিতি পায়। সেই কবিতা[৪৭১]-এর দুটি লাইন ছিল খুবই তাৎপর্যবহ :

সর্বপরিবেশগ্রাসী হ'লে সামান্য ভাতের ক্ষুধা
ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে নিমন্ত্রণ করে।

কয়েক মাসের মধ্যে বোঝা যায়, অদৃশ্য কোনো নিয়তি সমকালীন এই কবিকে দিয়ে আসলেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য ভয়াবহ পরিণতির এক অমোঘ বাণী লিখিয়ে নিয়েছিল।

৫.চ. রক্ষীবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর অভিযানের বাস্তব ধরন যাচাই; *কেসস্টাডি বাজিতপুর, তানোর ও কালীগঞ্জ*

যতদিন সিংহ শিকারীরা শিকারের ইতিহাস রচনা করবে ততদিন সেই রচনায় শিকারীর শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হবে; আর সিংহরা হেয় প্রতিপন্ন হবে।
–আফ্রিকান প্রবাদ

সম্পন্ন হওয়ার চার দশক পরও যখন কোন বিপ্লব মুক্তি আর ন্যায়ের সন্ধান করে, তখন বুঝতে হবে, তা ব্যর্থ হয়েছে।
–ভারতীয় সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার, বাংলাদেশকে উদ্দেশ্য করে; ১৩ জুন ২০১৩, দৈনিক *প্রথম আলো*, ঢাকা।

বাজিতপুর, তানোর ও কালীগঞ্জে রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রম বিষয়ে ইতঃপূর্বে অন্যত্র কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও এখানে পৃথকভাবে একটি উপ-অধ্যায় আকারে একই বিষয়ে বাড়তি বিবরণ তুলে ধরার কিছু কারণ রয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে রক্ষীবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য, কমিউনিস্ট শক্তির সশস্ত্রতা মোকাবেলায় তার ভূমিকার সত্য-মিথ্যা যাচাই এবং তার অভিযানকালে সহযোগী শক্তি হিসেবে মুজিব বাহিনীর অংশগ্রহণের ব্যাপকতা ও ধরন বোঝার জন্য বাজিতপুর, নিকলী, কুলিয়ারচর এলাকাকে একটি ইউনিট, রাজশাহীর তানোর সংলগ্ন এলাকাকে একটি ইউনিট এবং যশোরের কালীগঞ্জের ঘটনাবলিকে আরেকটি ইউনিট ধরে তিনটি কেসস্টাডি তুলে ধরা হচ্ছে এখানে। এই তিন

[৪৭১] পুরো কবিতাটি দেখুন সংযুক্তি : *চব্বিশ*-এ।

কেসস্টাডির মধ্যে রক্ষীবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর অভিযানকেন্দ্রিক সম্পর্কের তিনটি ধরন দেখা যায় :

–যৌথভাবে, তবে নেতৃত্বে মুজিব বাহিনী;
–যৌথভাবে, তবে নেতৃত্বে রক্ষীবাহিনী ও সেনাবাহিনী;
–রক্ষীবাহিনী এককভাবে;

বাজিতপুরের অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশের রাজধানী থেকে দূরবর্তী হাওরকেন্দ্রিক এক ক্ষুদ্র লোকালয় হওয়া সত্ত্বেও বাজিতপুর এবং সংলগ্ন উপরোক্ত জনপদের বামপন্থী প্রভাবকে তৎকালীন শাসকশক্তি কতটা মনোযোগের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল এবং রক্ষীবাহিনী ও মুজিব বাহিনী তাদের সেই মনোযোগ ও তা থেকে সৃষ্ট দিকনির্দেশনাকে কীভাবে কাজে অনুবাদ করেছে তার উপলব্ধির স্বার্থে বাজিতপুরের অভিজ্ঞতা জাতীয় পরিসরে তুলে ধরা জরুরি। আরেকটি কারণেও বাজিতপুরের অভিজ্ঞতা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে তা হলো, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে থেকেই যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করা একেবারে অসম্ভব ছিল না তারও প্রমাণ এই জনপদের মুক্তিযুদ্ধ।[৪৭২]

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাজিতপুর থানার প্রধান রাজনৈতিক শক্তি ছিল বামপন্থী মতাদর্শের কিছু ব্যক্তি ও গ্রুপ। দুই শতের অধিক মুক্তিযোদ্ধা ছিল বাজিতপুরে এসব গ্রুপের অধীনে। যাদের মূল অংশ যুদ্ধের পরপর যোগ দিয়েছিল বাংলাদেশ সাম্যবাদী দলে। একাত্তরের আগে স্থানীয় কমিউনিস্ট এই গ্রুপটি 'পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী)' অংশ হিসেবে কাজ করতো। জাতীয় পর্যায়ে এই দলের নেতা ছিলেন তখন মোহাম্মদ তোয়াহা, সুখেন্দু দস্তিদার প্রমুখ। আর স্থানীয় মুখ্য সংগঠক ছিলেন ইয়াকুব আলী, সাইফুল মাস্টার, আনিসুর রহমান প্রমুখ। তবে বাজিতপুরে এই বামপন্থী কর্মীরা মূল রাজনৈতিক পরিচয় গোপন রেখে প্রকাশ্য কাজ করতো 'মাঝি-মাল্লা সমিতি' নামে একটি গণসংগঠনের মাধ্যমে। বাজিতপুরের প্রকৃতির হাওরধর্মী চরিত্রকে বিবেচনায় নিয়েই উপরোক্ত ধারায় গণসংগঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বাহাত্তর পর্যন্ত এই সাংগঠনিক কৌশল বজায় ছিল।

---

৪৭২ প্রায় অনুরূপ অভিজ্ঞতা আমরা দেখেছি নরসিংদীর শিবপুরে। 'কমউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি'-এর পরিচালনায় একাত্তরে এখানে যে বিশাল এক মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে ৩২৯ নং [ও ৪৭৪ নং] তথ্যসূত্রে আলোকপাত করা হয়েছে। আরও লক্ষ্যণীয় যে, সেখানেও যুদ্ধের স্থানীয় প্রধান সংগঠক আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে হত্যার জন্য যুদ্ধকালেই মুজিব বাহিনীর একটি ছোট দল এসে হাজির হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালে বাজিতপুরের এই যোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে নেমেছিলেন। প্রথম দিকে আনিসুর রহমান, আবদুল হাই প্রমুখের নেতৃত্বে তীর-ধনুক, টেটা-বল্লম নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলেও পরে নানাভাবে স্বয়ংক্রিয় অনেক অস্ত্রও যোগাড় করতে সক্ষম হয় তারা পার্শ্ববর্তী নরসিংদীর বেলাবো থেকে। যেখানে আবদুল হাই নামে আরেকজন কৃষকনেতা স্থানীয়ভাবে কৃষক যোদ্ধাদের বিরাট এক বাহিনীকে সংগঠিত করে ফেলেছিলেন।

পুরো একাত্তর জুড়ে বাজিতপুরের যোদ্ধাদের সামগ্রিক যুদ্ধ তৎপরতা ছিল বেশ গোছানো এবং সুপরিকল্পিত। ফলে একাত্তরের অক্টোবরের দিকে তারা বাজিতপুর প্রায় মুক্ত করে আনেন এবং তখনি সেখানে আসে ভারত থেকে প্রশিক্ষিত মুজিব বাহিনী। বাজিতপুরে মুজিব বাহিনীর স্থানীয় এই ইউনিটের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা আজিজুর রহমান। আজিজুরের শক্তির উৎস ছিলেন তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় আওয়ামী লীগের জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম। পুরো কিশোরগঞ্জের রাজনীতি তখন নিয়ন্ত্রণ করতেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও জিল্লুর রহমান। আজিজুর ব্যতীত মুজিব বাহিনীর আরও দুই খ্যাতনামা সংগঠক ছিলেন শাহজাহান ও বাচ্চু। এদের বাইরে বাজিতপুরে যারা আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন তাঁরা যুদ্ধকালে ভারতেই অবস্থান করেন।

মুজিব বাহিনী বাজিতপুরে আসা মাত্র কমিউনিস্ট মতাদর্শের গ্রুপগুলোর সঙ্গে তাদের নীরব একটি দ্বন্দ্ব[৪৭৩] শুরু হয়– যদিও স্বাধীনতা পরবর্তী ৮-১০ মাস দু'পক্ষে কোন ধরনের সংঘর্ষ ঘটেনি। বাহাত্তরের শেষ দিকে এসে সাম্যবাদী দলের সংগঠকদের ওপর প্রথম আঘাত আসে– আতাউর নামে এই গ্রুপের স্থানীয় এক প্রধান সংগঠককে ঢাকার তেজগাঁও স্টেশন থেকে অপহরণ করে নিয়ে মেরে ফেলা হয়। এলাকাবাসীর ভাষ্য মতে, বাজিতপুরের মুজিব বাহিনীই এই কাজটি করেছে– যদিও এইরূপ বক্তব্যের পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে

---

৪৭৩ এই দ্বন্দ্বের ভিত্তি কেবল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই বা ভিন্ন আদর্শ ছিল না– বরং এর গভীর এক সমাজতাত্ত্বিক কারণও ছিল। এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের কাছে মনোযোগ আকর্ষণী এক ব্যাখ্যা হাজির করেছেন বাজিতপুরের তৎকালীন রাজনৈতিক সংগঠক আবদুল হাইয়ের পুত্র আশির দশকের সেখানকার 'ভাসান পানিতে মাছ ধরার অধিকার' বিষয়ে জেলেদের আন্দোলনের সংগঠক এডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম। তাঁর মতে, 'দেশের ভেতরে থেকে যাঁরা সাম্যবাদী দলের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ করেছে তাঁদের মাঝে সমাজের চাষাভূষা পরিবারের সন্তানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যদিকে একাত্তরের শেষলগ্নে যারা মুজিব বাহিনীর নামাবলী গায়ে দিয়ে এলাকায় এলেন এরা একাত্তর পূর্ববর্তী সময়ে ছাত্রলীগ করতেন এবং ছিলেন স্থানীয়ভাবে মিয়া বাড়ি, খাঁ বাড়িধর্মী ধনী জোতদার পরিবারগুলোর সন্তান। মুক্তিযুদ্ধ শেষোক্তদের সামাজিক কর্তৃত্ব ও প্রতাপ নির্মূলের লক্ষ্যেই ধাবিত হচ্ছিলো, কিন্তু ছাত্রলীগের ঐ সংগঠক ও কর্মীদের মুজিব বাহিনীতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় তা আর সফল হলো না। ফলে যুদ্ধোত্তর সমাজের নিম্নবর্গের মুক্তিযোদ্ধারা দেখলো, যাদের কর্তৃত্ব কমানোর স্বপ্ন দেখে তারা যুদ্ধ করেছে– তারা বরং আরও শক্তিশালী ও সশস্ত্র হয়ে ঝেঁকে বসতে যাচ্ছে।'

আতাউরের মৃত্যু ছিল যেন এক অবিশ্বাস্য অধ্যায়ের সূচনা– দ্রুত পুরো থানা জুড়ে রক্তাক্ত সংঘাত শুরু হয়ে যায় দু'পক্ষে।

তিয়াত্তরের শুরুতে সাম্যবাদী দলের স্থানীয় মূল সংগঠক ইয়াকুব আলীকে সুনির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই গ্রেফতার করা হয়। এই আটকের প্রতিবাদে স্থানীয় সাম্যবাদী দল ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় ঘেরাও করলে আরও ২৪ জন কর্মী গ্রেফতার হন সেখান থেকে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট বিরোধী স্থানীয় শক্তির কাছে স্পষ্ট হয়– *মাঝি-মাল্লা সমিতি* আসলে সমাজ পরিবর্তনের এক বড় উদ্যোগের স্থানীয় অংশ মাত্র। এই উদ্যোগের মূল মূল সকল সংগঠককে তারা সেদিন চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়।

বাহাত্তরের শেষার্ধে সূচিত সংঘাতপূর্ণ এইরূপ অবস্থার কারণে সাম্যবাদী দল দলগতভাবে বাজিতপুরে 'সশস্ত্র লাইন' গ্রহণ করে এবং তিয়াত্তরের মার্চে ঘোষিত জাতীয় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। সাম্যবাদীদের সশস্ত্র কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিতেন ইয়াকুব আলী ও মহিউদ্দিন আহমেদ, আর এই কার্যক্রমের পলিটিক্যাল কমিশার ছিলেন সাইফুল মাস্টার। ইয়াকুব আলী প্রথম আটকাবস্থা থেকে মুক্ত হয়েই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। পঁচাত্তরের ৭ আগস্ট তিনি আবারও আটক হয়েছিলেন।

ইতোমধ্যে তিয়াত্তরে দলটি জাতীয় নির্বাচন বর্জন করায় ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে মোকাবেলার মতো একমাত্র শক্তিশালী স্থানীয় শক্তি থাকে ন্যাপ (মোজাফফর)। আওয়ামী লীগের প্রার্থী মনজুর আহমেদ বাচ্চু মিয়ার বিপরীতে স্থানীয় ন্যাপ প্রার্থী দেয় মোজাম্মেল হক খান রতনকে। রতনের পক্ষে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নেন আবদুল হাই। ইতোমধ্যে নির্বাচনকে উপলক্ষ করে এই থানায় রক্ষীবাহিনীও এসে উপস্থিত হয়।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কোনোরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না– বিশেষত ন্যাপের মতো একটি দলের বিপরীতে, কারণ জাতীয় পর্যায়ে ন্যাপ ছিল শাসক দলের ঘোষিত মিত্র। স্থানীয় ন্যাপের এই আচরণকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ দেখেছিল এক ধরনের ঔদ্ধত্য হিসেবে। ফলে বাচ্চু মিয়া বিজয়ী হলেও নির্বাচনের পরদিন থেকে রক্ষীবাহিনী মোজাম্মেল হক খান রতনের নির্বাচনী সংগঠকদের ওপর চড়াও হয়। এইরূপ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তখন সপরিবারে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন। সেই স্মৃতি স্মরণ করে রতনের প্রচারাভিযানের অন্যতম প্রধান সংগঠক আবদুল হাইয়ের পুত্র হাসনাত কাইয়ূম বলেন, 'সেই যে আমাদের বাড়ি ছাড়া হতে হয় তারপর পঁচাত্তরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাড়ি গিয়ে স্কুলে ভর্তি হতে পেরেছিলাম। এভাবে বহু 'নির্দোষ' মানুষ ঐ সময়ে বাজিতপুরে নিগৃহীত হয়েছে। বাবা রাজনীতি করতেন সেই জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্র রাজনীতি করতেন সেই জন্য বাবাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা বাজিতপুরে বিস্তর।'

তিয়াত্তর থেকে পরবর্তী প্রায় ত্রিশ মাস এইরূপ নিপীড়নমূলক অবস্থা বহাল ছিল; আর তাতে প্রায় ১৫৫ ব্যক্তি খুন হয়। প্রতিটি খুন, অপহরণ ও গুমের ঘটনাই পৃথক পৃথকভাবে লোমহর্ষক। উপরোক্ত ১৫৫ জনের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ছিলেন বামপন্থী আদর্শের মানুষ বা তাঁদের নিকটাত্মীয়রা। বাকিরা ছিলেন আওয়ামী লীগ সমর্থক বা কর্মী বা সরাসরি মুজিব বাহিনীর সদস্য। বাজিতপুরের এই সময়কার ঘটনাবলির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, আওয়ামী লীগ থেকে এমপি নির্বাচিত হলেও মনজুর আহমেদ বাচ্চু মিয়া সকল ধরনের সংঘাত থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। ইতোমধ্যে এখানে ছাত্রলীগের একাংশ রফিকুল মিয়া ও মোবারক মিয়ার নেতৃত্বে জাসদ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও সরকার সমর্থক– বিশেষত রক্ষীবাহিনীর আগ্রাসী বিরোধিতার মুখে তারা দাঁড়াতেই পারল না এবং পরে আবারও আওয়ামী লীগেই ফিরে গেল।

একাত্তর পরবর্তী এই সময়টিতে মুজিব বাহিনী প্রশাসনিক কোন একক না হওয়া সত্ত্বেও এই থানায় তাদের একটি প্রকাশ্য ক্যাম্প ছিল। তাদের অস্ত্র ভাণ্ডারও ছিল উন্নত ও বিপুল। রক্ষীবাহিনী এবং সেনাবাহিনীরও একটি করে ক্যাম্প ছিল বাজিতপুরে। তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে সরকারের এখানকার অভিযানমূলক কার্যক্রমের লক্ষ্যণীয় ভিন্নতা ছিল এই যে, মুজিব বাহিনীই এখানে কমিউনিস্টদের দমনে মূল কার্যক্রম চালাত– রক্ষীবাহিনী তার সশস্ত্র এক সহযোগীর মতো ভূমিকা রাখতো মাত্র। উভয় বাহিনী এইরূপ যৌথ ভূমিকা রাখতে গিয়ে প্রশাসনিক নিয়ম নীতি মেনে চলার ধৈর্য প্রদর্শন করত কমই। শহরের বসন্তপুরের ডাকবাংলোতে ছিল রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প এবং এর ৫০ গজের মধ্যে এমপি বাচ্চু মিয়ার বাড়িতে ছিল মুজিব বাহিনীর ক্যাম্প। অনেক সময়ই মুজিব বাহিনী তাদের প্রতিপক্ষকে ধরে রক্ষীবাহিনীর হাতে তুলে দিত– এরপর আর তাদের পাওয়া যেত না। বাজিতপুরে এক পর্যায়ে কমিউনিস্ট গেরিলাদের আটকের জন্য গ্রাম ঘেরাও করার কাজে বিমান বাহিনীর প্যারাট্রুপারদেরও ব্যবহার করা হয়। এটা ঘটে ১৯৭৪ সালে নিকলী এলাকার ছাতির চরে– যা ছিল হাওরবেষ্টিত এক জনপদ। এই নিকলির'র করগাঁও এলাকাতেই সাম্যবাদী দলের নেতা সাইফুল মাস্টারকে তিন সহযোগীসহ জবাই করে রেখে যায় স্থানীয় মুজিব বাহিনী চুয়াত্তরের এক রাতে। সঙ্গের দুই সহযোগী মারা গেলেও সাইফুল মাস্টার অলৌকিকভাবে বেঁচে যান ভয়াবহ সেই সময়ের জীবন্ত ইতিহাস হিসেবে।

১৯৭৩-এর প্রথম থেকে শুরু হয়ে সংঘাতপূর্ণ ত্রিশ মাসে বাজিতপুরে গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ৫টি রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে কেবল একটি ঘটনায় যুক্ত খুনীদের– যে ঘটনায় থানা থেকে তুলে নিয়ে মাহবুব নামে এক ব্যক্তিকে মেরে ফেলেছিল মুজিব বাহিনীর

দুর্ধর্ষ পাঁচ কমান্ডো। পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক শাসনামলে সামরিক আদালতের বিচারে ওই পাঁচ খুনীর চারজনের ফাঁসির আদেশ হয় এবং একজন পালিয়ে বেঁচে ছিলেন। অপহৃত মাহবুবের অপরাধ ছিল তিনি ছিলেন সাম্যবাদী দলের তিন প্রধান নেতার একজন আনিসুর রহমানের ভাই। এই মামলায় আজিজুর, শাহজাহান প্রমুখ মুজিব বাহিনীর প্রধান নেতারাও আসামি ছিলেন– কিন্তু কালক্রমে 'মুক্তিযোদ্ধা' পরিচয়কে ব্যবহার করে তারা কারাগার থেকে বের হয়ে যান এবং মামলা থেকে খালাস পেতে সক্ষম হন। কিছু সময়ের মধ্যে তাঁদের বিরোধীপক্ষের জীবিত সদস্যরাও আটকাবস্থা থেকে বের হতে শুরু করেন– কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন এক উপায়ে। সাম্যবাদী দলের মুখ্য নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকারের সঙ্গে এসময় আপসমূলক অবস্থান নেন এবং বিনিময়ে সারা দেশে মুজিব আমলে আটক তাঁদের নেতৃবৃন্দ ছাড়া পেতে শুরু করে। তোয়াহার এ সময়কার অনেক কৌশলই আবার পার্টিতে ভিন্নমত তৈরি করে– ফলে দলটি ক্রমে নানান উপদলে বিভক্ত হতে থাকে। যার রেশ পড়ে বাজিতপুরেও। আপস ও বিভক্তির এই প্রক্রিয়ায় কালক্রমে সাম্যবাদী দল সেখানে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।[৪৭৪]

তানোরের অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজশাহীর তানোরের বিশেষ 'পরিচিতি' মূলত এ কারণে যে, ১৯৭৩-এর ১১ ডিসেম্বর একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট কর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল এখানে– যেমনটি ইতোমধ্যে পূর্ববর্তী ৫.৬ উপ-অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। নিহতরা যে পার্টির সংগঠক ও কর্মী ছিলেন সেই সাম্যবাদী দলের বিভিন্ন লিখিত দলিলে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য রক্ষীবাহিনীকে দায়ী করা হলেও দলের মধ্যে এ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তিও দেখা যায়। বাস্তবে ঐ ঘটনার

---

৪৭৪ এ পর্যায়ে দুটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে– প্রথমত. ব্যাপক সাংগঠনিক ভিত্তি সত্ত্বেও বাজিতপুরে কমিউনিস্ট মুক্তিযুদ্ধোরা কেন মুজিব বাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযানের মুখে বিধ্বস্থ হয়ে গেল– যেমনটি সম্ভব হয়নি নরসিংদীর শিবুপরে এবং কেনইবা পরবর্তী সময়ে একই ধারার রাজনীতি বাজিতপুরে দ্রুত দুর্বল হয়ে গেল– নরসিংদীর শিবপুরে যা হয়নি। এ রকম প্রশ্নের উত্তরে সেখানকার পরবর্তী প্রজন্মের রাজনৈতিক সংগঠক হাসনাত কাইয়ূম বলেন, 'বাজিতপুরে কমিউনিস্টদের ব্যাপক শক্তিভিত সত্ত্বেও তারা মুজিব বাহিনীর হাতে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলো তার প্রধান কারণ স্থানীয় মুজিব বাহিনী রাজনীতির একেবারে কেন্দ্র থেকে একজন অত্যন্ত ক্ষমতাধরের আশীর্বাদ পেতো। শিবপুরে সম্ভবত তেমনটি ঘটেনি। অন্যদিকে ব্যাপক ক্ষতির পরও স্থানীয় এই সাম্যবাদীরা আবারও উঠে দাঁড়াতে পারতো যদি তাঁরা জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আপোসের কৌশল না নিতেন।' পরে তানোর ও কালীগঞ্জের কেসস্টাডিতেও আমরা দেখবো, রক্ষীবাহিনীর আক্রমণের পাশাপাশি মুখ্যত সংশ্লিষ্ট কমিউনিস্ট সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক দুর্বলতা, দোদুল্যমানতা ও কৌশলগত নির্দেশনাহীনতার কারণেই স্ব স্ব এলাকায় তারা বিধ্বস্ত অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

জন্য এককভাবে রক্ষীবাহিনী দায়ী নয়। এটা ছিল অনেকাংশে একটি যৌথ অপারেশন। নিহতরা সবাই সেসময় সেনাবাহিনীর হাতে আটকাবস্থায় ছিলেন এটা সকল সূত্রই নিশ্চিত করেছে। কিন্তু ইতিহাসের এই সময়টিতে রাষ্ট্রীয় তরফ থেকে 'অত্র অঞ্চল (রাজশাহী-নওগাঁ-নাচোল সংলগ্ন ৬-৭টি থানা জুড়ে) সেনাবাহিনী, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী ও পুলিশের একটি যৌথ কমান্ডের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল'[৪৭৫] শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে *চিরুনী অভিযান* চালানোর জন্য; আর নিহতরা সবাই পুরো বাহাত্তর ও তিয়াত্তর জুড়ে সে এলাকায় পুলিশ, রক্ষীবাহিনী ও সেনাবাহিনীর উক্ত কমান্ডের বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধ আন্দোলন' চালাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁরা যখন সশস্ত্র সংগ্রাম স্থগিত রেখে, পার্টির কাছে অস্ত্র জমা রেখে–'গেরিলা অঞ্চল' ছেড়ে পার্শ্ববর্তী থানা মোহনপুরে অপেক্ষাকৃত একটি শান্ত ও নিরাপদ অঞ্চলে যাচ্ছিলেন তখনই গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর একটি দল নিরস্ত্র অবস্থায় চৌবাড়িয়া নামের একটি স্থানে তাঁদের আটক করে। চৌবাড়িয়ায় ছিল অত্র অঞ্চলে রক্ষীবাহিনীর সবচেয়ে বড় ক্যাম্প। চৌবাড়িয়া থেকে আটককৃতদের প্রথমে রাখা হয় তানোরের ডাকবাংলোতে। সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য, যিনি একই সঙ্গে রাজশাহীরও বাসিন্দা– বর্তমান লেখককে বলেছেন, গেরিলারা আটকাবস্থায় হঠাৎ রাজশাহী থেকে হেলিকপ্টারে করে একদল লোক আসে (একজন মহিলাও ছিলেন যে দলে)– যারা মূলত রাজশাহী শহরের সুপরিচিত মুজিব বাহিনীর সংগঠক– তারাই সেনাবাহিনী থেকে অস্ত্র নিয়ে তানোরের গোল্লাপাড়া হাট সংলগ্ন ফুড গোডাউনের পাশের মাঠে বন্দিদের হত্যা করে। ধারাবাহিকভাবে নিহত ৪৪ জনের মধ্যে ১৭ জনই ছিলেন পার্টির অত্র অঞ্চলের গেরিলা কমান্ডার। যাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কিংবদন্তিতুল্য কমান্ডার এরাদ আলী ও মন্টু মাস্টারও ছিলেন (মন্টু মাস্টারের প্রকৃত নাম ছিল এমদাদুল হক বাবু)।

উপরোক্ত ঘটনায় সেনাবাহিনী প্রথমে আটককৃতদের সাম্যবাদী দলের রাজনীতি পরিত্যাগের প্রস্তাব দিলেও তাঁরা নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সেই পথে মুক্তির দরকষাকষি নাকচ করে দিয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ হিসেবে সাম্যবাদী দল পরবর্তীকালে আর্মির ইনফরমার হিসেবে দায়ী মনির নামের এক তরুণকে রাজশাহী শহরে হত্যা করে। মনির ছিলেন আওয়ামী লীগের একজন কর্মী।

---

৪৭৫ সাম্যবাদী দলের তৎকালীন স্থানীয় নেতা মাহমুদ জামাল কাদেরীর মন্তব্য। বর্তমান লেখক কর্তৃক গৃহীত অপ্রকাশিত *সাক্ষাৎকার*, ১ জুলাই ২০১৩, ঢাকা। জনাব কাদেরী এও মন্তব্য করেছেন যে, তানোর কৃষক আন্দোলন সশস্ত্ররূপ নেওয়ার ক্ষেত্রে আত্রাইয়ের সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভিন্নমতের কারণে কাদেরী ১৯৭৮ সালে সাম্যবাদী দল ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা আনোয়ার উল আলমের দেয়া তথ্য (*পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১) থেকে জানা যায়, রাজশাহীর তানোরে রক্ষীবাহিনীর অপারেশনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বাহিনীর কর্মকর্তা লুৎফর রহমান।

১৯৭৭ সালে সাম্যবাদী দল তার সশস্ত্র কার্যক্রম বন্ধ করলেও– তানোর অঞ্চলের অস্ত্রগুলোর হদিস পাওয়া যায়নি। পার্টির সূত্র এও নিশ্চিত করেছে, বামপন্থী সশস্ত্র সংগ্রাম দমনে রক্ষীবাহিনীর পাশাপাশি সেনাবাহিনী মোতায়েন করলেও গেরিলাদের একেবারে প্রাণে মেরে ফেলার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছিল। সেদিন এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়া এবং গেরিলাদের হত্যার কাজে সেনাবাহিনীকে চাপে ফেলায় যিনি প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছিলেন মুজিব বাহিনীর সেই সংগঠক এখনও অত্র অঞ্চলে রাজনীতি করে যাচ্ছেন এবং ২০০৯-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোরের একটি এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, তানোর হত্যাকাণ্ডের সময় সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলেন সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, শান্তি সেন, নগেন সরকার প্রমুখ। আর রাজশাহী জেলার নেতৃত্বে ছিলেন মাহমুদ জামাল কাদেরী, মোজহারুল ইসলাম, আমিরুল ইসলাম, এরাদ আলী, এমদাদুল হক প্রমুখ। বাহাত্তর থেকে সেখানে পুলিশের সঙ্গে কৃষক গণআন্দোলনের কর্মীদের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলেও রক্ষীবাহিনী তাতে শামিল হয়েছিল তিয়াত্তরে। ইতিহাসের এসময়টিতে সারা দেশের মতো তানোরের অর্থনীতিও ছিল ভীষণভাবে বিপর্যস্ত। বিশেষত, এক ফসলী বরেন্দ্র এলাকার নানাস্থানে তখন ছিল চরম খাদ্যাভাব। পরিস্থিতি সামাল দিতে সাম্যবাদী দল এসময় বিশেষভাবে ধনী কৃষকদের গোলা থেকে ধান নিয়ে গরিব কৃষকদের মাঝে বিতরণ শুরু করলে রাষ্ট্রীয় বাহিনী তাতে হস্তক্ষেপ করে।

ধান দখল ও বণ্টনের এই কর্মসূচিকে স্থানীয়ভাবে 'ধাননামা' বলা হতো। গোদাগাড়ি থানার পাকড়ি, রিসিকুল ইউনিয়ন; পবা থানার দর্শনাপাড়া ইউনিয়ন; নাচোল থানার নিজামপুর ইউনিয়ন; নিয়ামতপুর থানার পারোল ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে শুরু হলেও ধাননামা কর্মসূচি দ্রুত অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রায় একই সময়ে, বাহাত্তরের শেষদিকে রিলিফ চোরদের বিরুদ্ধে স্থানীয় ভূমিহীন ও গরিব চাষিদের কৃষক কমিটিগুলো গণআদালত বসাতে শুরু করে– যার মধ্য দিয়েও স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর একেবারে ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছিল সাম্যবাদী দলের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি। এসময় এলাকায় পুলিশী তৎপরতা বেড়ে যায়।[৪৭৬]

এই আন্দোলনে সশস্ত্র না নিরস্ত্র রূপ বজায় রাখা হবে এ নিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বের মাঝে ব্যাপক বিতর্ক শেষে প্রথমোক্ত 'লাইন' আপেক্ষিকভাবে জয়লাভ করে। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী আত্রাইয়ের সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের প্রভাব এসময় তানোরের কৃষক আন্দোলনকে প্রভাবিত করছিল। আবার মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বিপুল অস্ত্র ও যুদ্ধকালীন প্রশিক্ষণ থাকার কারণে সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেখানে সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি না দিলেও চান্দুরিয়া এলাকায় মাহমুদুর

---

৪৭৬ মাহমুদ জামাল কাদেরী, *তানোর কৃষক আন্দোলন প্রসঙ্গে*, অপ্রকাশিত, ৭ জানুয়ারি ২০০৯, ঢাকা। জনাব কাদেরী নিজেই বর্তমান লেখককে তাঁর অপ্রকাশিত এই লেখাটি দিয়েছিলেন।

রহমান উজ্জ্বল নামের একজন কর্মীকে পুলিশকর্তৃক হত্যার পর (১৯৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর) স্থানীয় কৃষকরা সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করতে পার্টিকে প্রভাবিত করেছিল।[৪৭৭] এসময় কেন্দ্রীয়ভাবে সাম্যবাদী দল তানোরের মতো ধনী কৃষকদের গোলা দখল করে তা গরিব চাষিদের মধ্যে বিতরণের আন্দোলন আরো কয়েকটি জেলায় সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে আলোকে সশস্ত্র প্রস্তুতিও নিতে শুরু করে। এসবেরই সম্মিলিত ফল হিসেবে সাম্যবাদী দলের সংগঠকরা তানোর-গোদাগাড়ি সীমান্তে গোদাগাড়ি এলাকায় 'পুরাখালি' গ্রামকে কেন্দ্র করে একটি গেরিলা অঞ্চল গড়ে তোলে এবং ধীরে ধীরে পুলিশ, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে শুরু হয়। ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে পাল্টা হামলায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ার আগে কৃষকদের সংগ্রামী অংশ ছাড়াও সাম্যবাদী দল এখানে প্রায় দেড় শত জনের একটি যোদ্ধাদল তৈরি করতে পেরেছিল। এলাকাটি পবা থানারও নিকটবর্তী। বর্তমান গ্রন্থের শেষে 'সংযুক্তি সতেরো'তে তানোরে নিহত মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক কর্মীদের তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

কালীগঞ্জের অভিজ্ঞতা

যশোরের কালীগঞ্জে ষাটের দশক থেকে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মতিন-আলাউদ্দিন এর নেতৃত্বাধীন)-এর সক্রিয় অবস্থান ছিল। পার্টি প্রধানত তখন কৃষকদের সংগঠিত করত ভাসানী ন্যাপ ও কৃষক সমিতির ব্যানারে। স্থানীয় সংগঠক ওয়াজেদ আলী ও আবদুর রাজ্জাক এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছিলেন। শেষোক্তজন একাত্তরে পাকিস্তান বাহিনীর হাতে নিহত হন। আর ওয়াজেদ আলীকে চুয়াত্তরে রক্ষীবাহিনী হত্যা করে। এ ছাড়াও এখানে গুরুত্বপূর্ণ যেসব বামপন্থী সংগঠক রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হন তারা হলেন আমজাদ হোসেন, রশিদা, মহিউদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, গওহর মালিথা, নূর মোহাম্মদ রশিদ, হাসান আলী প্রমুখ।

একাত্তরে কালীগঞ্জে উপরে উল্লিখিত কমিউনিস্ট পার্টি চারু মজুমদারের নকশালবাড়ির আদলে শ্রেণিশত্রু খতমের লাইন গ্রহণ করে, কিন্তু বেশি ব্যাপকতা পায়নি তা। ১৯৭০ সালের ১৬ অক্টোবর স্থানীয় নলডাঙ্গায় জনৈক চান্দ আলী মিয়াকে 'মৃত্যুদণ্ড' দেওয়ার মধ্য দিয়ে অত্র অঞ্চলে শ্রেণিশত্রু খতমের কার্যক্রম শুরু হয়। তবে পাশাপাশি 'পাটি' পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করার প্রশ্নেও সক্রিয় ভূমিকা নেয়। কিন্তু মাওলানা ভাসানী সত্তরের নির্বাচন বয়কট করায় স্থানীয় রাজনীতিতে এই বামপন্থীদের কর্তৃত্ব কমে যায়। যদিও যুদ্ধকালীন নয় মাসে রাজনৈতিকভাবে পার্টির নিয়ন্ত্রণেই ছিল কালীগঞ্জ। যুদ্ধকালে এখানে পার্টির প্রায় এক শত সশস্ত্র

---

৪৭৭ সাম্যবাদী দলের অন্যতম সংগঠক এবং পারিবারিকভাবে এই দল ও তানোর অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত নেতা ফেরদৌস কামাল মাসুমের সঙ্গে বর্তমান লেখকের ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যায়ে ঢাকায় গৃহীত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত।

যোদ্ধার কমান্ডার ছিলেন রফিকুল ইসলাম এবং তাঁর পলিটিক্যাল কমিশার ছিলেন আবদুস সালাম। শেষোক্তজনের সঙ্গে আলাপের সূত্রে জানা যায়, একাত্তরের নভেম্বরের শেষের দিকে কলকাতাস্থ আওয়ামী লীগ সমর্থিত মুক্তিযোদ্ধারা কালীগঞ্জে প্রবেশ করে। কমিউনিস্টদের গণফৌজের সঙ্গে তখন তাদের ছোটখাটো সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ সমর্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে ছিলেন হাতেম আলী ও ওলাদ হোসেন। শেষোক্তজন মুজিব বাহিনীকে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। ১৬ ডিসেম্বরের পর মুক্তিবাহিনীর প্রতিশোধ স্পৃহার মুখে আত্মগোপনে চলে যায় কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠকরা। এসময় ১৯৭৩ সালের জুনে কালীগঞ্জের নকশালরা সদলবলে যোগ দেয় আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিতে।

জোতদারদের ফসল দখল ও গরিব কৃষকদের মাঝে তা বিলি করা এবং 'জাতীয় শত্রু' খতমই ছিল কালীগঞ্জে উল্লিখিত 'পার্টি'র কাজের প্রধান ধারা তখন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ইতোমধ্যে কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান শুরু করেছে। পুলিশকে নকশাল অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে অভিযান চালাতে উসকে দিত তারা। তিয়াত্তর থেকে কালীগঞ্জে পুলিশী আক্রমণ শুরু হয় পার্টির ওপর। পার্টির গেরিলাদের হাতে পাঁচ পুলিশ অস্ত্র হারালে সঙ্গত কারণেই শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। ইতোমধ্যে অপারেশনে যুক্ত হয় রক্ষীবাহিনী। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী মিলে নিপীড়ন শুরু হয় তখন। চুয়াত্তরের ১১ অক্টোবর পার্টির ক্যাডারদের সঙ্গে জয়নগর মাঠে রক্ষীবাহিনীর বড় এক সংঘর্ষ বাঁধে। এখানেই ওয়াজেদ আলী ও আরেকজন কর্মী কামরুজ্জামান মোনা আহত অবস্থায় রক্ষীদের হাতে ধরা পড়েন। হেমন্ত সরকারও এদের সঙ্গে ছিলেন– তবে তিনি পালাতে সক্ষম হন। পরে নিখোঁজ দুই সংগঠককে খুঁজে পাওয়া যায়নি আর। এভাবে স্থানীয় মাওবাদীদের একের পর এক বিপর্যয় শুরু হয়। পঁচাত্তর নাগাদ পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তারা।

কালীগঞ্জে রক্ষীবাহিনীর স্থানীয় দুটি ক্যাম্প ছিল। একটি কালীগঞ্জ বাজারে, অপরটি ছিল গাজির হাটে (কালার বাজার নামে পরিচিত); আর এগুলো নিয়ন্ত্রণ হতো পার্শ্ববর্তী ঝিনাইদহের নারিকেলবাড়িয়া এলাকা থেকে। সেখানে ছিল রক্ষীদের অপেক্ষাকৃত বড় একটি ক্যাম্প। কালার বাজারে রক্ষীবাহিনী একটি গণকবরস্থান গড়ে তুলেছিল, জানালেন সেই সময়কার নকশাল নেতা আবদুস সালাম। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে গৃহীত তাঁর সাক্ষাৎকার সূত্রে এও জানা যায়, অত্র অঞ্চলে রক্ষীবাহিনীর একটি আলোচিত অপারেশন ছিল কুলবিলায়– যেখানে ২০-২৫ গ্রামের মানুষকে একত্রিত করে শুয়ে পড়তে অর্ডার দেওয়া হয়, তারপর সেসব মানুষদের উপর দিয়ে মার্চ করে যায় রক্ষীবাহিনী। নকশালদের প্রতি সহানুভূতি থাকার দায়ে এ শাস্তি দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের।

পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর পাশাপাশি যুবলীগও এখানে 'অপারেশন'-এ নামে। কালীগঞ্জে যুবলীগের কার্যক্রমের প্রধান এক ধরন ছিল গণপিটুনী। নকশাল ধারার

পার্টিসমূহের প্রতি সামান্যতম সহানুভূতি রয়েছে এমন কারোই তখন কালীগঞ্জে থাকার উপায় ছিল না।[৪৭৮] এসময় 'পার্টি'র হাতেও অনেক যুবলীগ সমর্থক খুন হয়। পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে পার্টির উদ্যোগে স্থানীয় সাধুহাটি ফার্মের ধান লুট হয়। রাষ্ট্রপতি মুজিব মারা যাওয়ার পর এখানে সশস্ত্র তৎপরতা কমে আসে। তবে গেরিলা স্কোয়াডগুলো নিয়মিতই চলাফেরা করত। গ্রামাঞ্চলে প্রবল প্রভাব ছিল তাদের। কিন্তু তারপরও পুরো পার্টিকে ধীরে ধীরে তীব্র হতাশা গ্রাস করে ফেলে– ক্যাডার ও সংগঠক কেউই বুঝতে পারছিল না– এরপর কী হবে? বিপ্লব কীভাবে হবে? এক্ষেত্রে জাসদের গণবাহিনীর মতোই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-কৌশলের অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতায় পড়ে যায় কালীগঞ্জের নকশালরা তখন।

৪৭৮ দেখুন হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম*, গণপ্রকাশনী, ১৯৮২, ঢাকা, পৃ. ১৬৩-৬৪।

৫.ছ. রক্ষীবাহিনী ও নাগরিক অধিকারের বিপর্যয়; *কেসস্টাডি চঞ্চল সেন, সিরাজ সিকদার এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন*

> সংবিধানে যেসব স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে তার সবগুলোকে হরণ করবে বিশেষ ক্ষমতা আইন।
>
> –মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা; *জাতীয় সংসদে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ওপর বিতর্ককালে প্রদত্ত বক্তব্য*[৪৭৯]

> Terror is kill and overkill- it is the persecutor of the soul, the repressor of consciousness.
>
> -Enayetullah Khan[৪৮০]

'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ'কে মোকাবেলার জন্য রক্ষীবাহিনী, মুজিব বাহিনী এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য বাহিনীর মিলিত অভিযানের ধরন ও ফলাফল সম্পর্কে পূর্ববর্তী উপ-অধ্যায়ে তিনটি স্থানে তিন ধরনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এইরূপ অভিযানের ফলে সেসময় নাগরিক অধিকারের কীরূপ লাঞ্ছনা ঘটেছে এবং সমাজে এইরূপ অভিযানের মাধ্যমে কীভাবে ভীতির

---

৪৭৯ *Proceedings of the Jatiya Sangsad*, Vol. 3, No. 4, p. 818-821. উল্লেখ্য, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন ১৯৭৩-এর নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্বল্পসংখ্যক বিরোধীদলীয় সদস্যের একজন। তিনি ১৯৭০-এর নির্বাচনেও প্রাদেশিক পরিষদীয় সদস্য হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত হন। সেই সূত্রে স্বাধীনতা পরবর্তী গণপরিষদেরও সদস্য ছিলেন। এই গণপরিষদই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে; কিন্তু সংবিধান প্রণয়নকালে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃ গোষ্ঠীগুলোর জাতিগত পৃথকত্বের স্বীকৃতি বিষয়ে লারমার সংসদীয় আবেদন (৩১ অক্টোবর ও ২ নভেম্বর দু' দফায়) অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি পরিষদ কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করে প্রতিবাদ জানান। জেনারেল উবান প্রশিক্ষিত মুজিব বাহিনী পরিচয়ধারী মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলোর নিগ্রহ (বিস্তারিত দেখুন তথ্যসূত্র ১৭৮) এবং তার কয়েক মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদে তাদের জাতিগত পরিচয়ের বিষয়টি অগ্রাহ্য হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়েই লারমা (ও বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা)-এর নেতৃত্বে ১৯৭২ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যক্রম শুরু হয় পার্বত্য জনসংহতি সমিতির। এই সংগঠনেরই সামরিক শাখা হলো শান্তি বাহিনী– ১৯৭৩ সালে যার প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এর নেতৃবৃন্দ এক পর্যায়ে ভারত সরকারের আশ্রয়ে থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়; রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে ফারুয়া পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের শুরু। এভাবে, যে সমস্যার উদ্ভব ভারত প্রশিক্ষিত মুজিব বাহিনীর মাধ্যমে– তাকে আরও জটিল করার সুযোগও পায় ভারতই। এম এন লারমার জন্ম ১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর; মৃত্যু ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর।

৪৮০ Enayetullah Khan, The Face of Terror, *A Testament of Time*, Holiday Publication, Dhaka, 1999, p.237.

সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করা হয়েছে তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে চঞ্চল সেনের ঘটনাটি এ পর্যায়ে সংক্ষেপে তুলে ধরা যেতে পারে। এটা ছিল ১৯৭৪ সালের এ রকম বহু ঘটনার একটি। চুয়াত্তর সালটি বহুভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় বছর হয়ে আছে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বহুদলীয় গণতন্ত্র থেকে একদলীয় শাসনব্যবস্থায় যাত্রা, গণমাধ্যমের সংকোচন ইত্যাদি নানান বিপজ্জনক উপাদানে সমৃদ্ধ ছিল ঐ বছরটি। ইতিহাসের ঐ সময়টির রাজনৈতিক আঁচ উপলব্ধির লক্ষ্যেই এই উপ-অধ্যায়ে তখনকার তিনটি অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে আনা হয়েছে।

প্রথমেই চঞ্চল সেনের কাহিনী। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে আমরা যখন চঞ্চল সেনের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন তাঁর বয়স ৬৬ বছর। এই হিসাবে ১৯৭৪ সালে তাঁর বয়স ছিল ২৭ বছর। ঐ বয়সেই ১৯৭৪ সালে জাতীয় গণমাধ্যমের আলোচিত এক চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন চঞ্চল সেন। শরীয়তপুরের ভেদেরগঞ্জের রামভদ্রপুরে তাঁর জন্ম। শুরুতে ছাত্র ছিলেন স্থানীয় রেবুতি মোহন হাইস্কুলে। বাবা শান্তি সেন প্রথমে বিপ্লবীদের 'যুগান্তর' গ্রুপের এবং পরে জেলে থাকাবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। মা'ও ঐ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। বাবা-মায়ের বিয়েও তাঁদের পার্টির মাধ্যমে। চঞ্চল সেনের মা অরুণা সেনকে 'পার্টি' শান্তিনিকেতন থেকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে এসেছিল বৃহত্তর ফরিদপুরে দরিদ্র নারীদের হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ দেয়ানোর জন্য। অন্যদিকে শান্তি সেন ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের দায়িত্বে।

বাবা-মায়ের গোপন রাজনীতির কারণে প্রায়ই চঞ্চল সেনকে নানান প্রশাসনিক জিজ্ঞাসাবাদে পড়তে হতো। তাই লেখাপড়ার স্বার্থে তাঁকে একপর্যায়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজবাড়ীতে শান্তি সেনের বন্ধু সমর সিংহের কাছে। সেখানে গোয়ালন্দ মডেল হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাস করে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন এবং আইএসসি পাস করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও রাজনৈতিক কারণে সে পাঠ আর শেষ করা হয়নি। ইতোমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে নতুন একটি দলের গোড়াপত্তন হয়– *সাম্যবাদী দল* নামে।

১৯৭৪ সালে শান্তি সেন সাম্যবাদী দলের তিনজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার একজন (বাকি দু'জন ছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদার)। শরীয়তপুরে তখন এই দলের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও রক্ষীবাহিনীর প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হচ্ছিল। চঞ্চল সেনও ততদিনে এই দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হয়ে উঠেছেন। এসময় পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে সাম্যবাদী দলের একটি গ্রুপের সংঘর্ষ হয় স্থানীয় শিবচরে আর তাতে গুলিবদ্ধ হন সুরুজ তালুকদার নামে দলের এক তরুণ কর্মী। চঞ্চলের ওপর দায়িত্ব পড়ে চিকিৎসার প্রয়োজনে সুরুজকে নিয়ে ঢাকায় আসার। ২৯ মার্চ

সুরুজকে ঢাকার একটি স্থানে রেখে মোহাম্মদপুরে এসেছিলেন চঞ্চল রাত্রিযাপনের জন্য। ৩০ মার্চ ভোরে আবার যখন তিনি সুরুজের কাছে ফিরছিলেন তখনি সাত মসজিদ রোডে গ্রাফিক আর্টস কলেজের সামনে চঞ্চলকে দেখে ধরে ফেলেন মোহাম্মদপুর থানা যুবলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট লুৎফর সর্দার ও তার এক বন্ধু।

লুৎফর ছিলেন চঞ্চলের পুরানো ক্লাসমেট ও পরিচিত। তাঁদের পরিবারের রাজনৈতিক পরিচয়ও লুৎফর জানতেন। শরিয়তপুরে লুৎফরের এক ভাই সাম্যবাদী দলের হাতে মারা গিয়েছিল এবং লুৎফরের ধারণা চঞ্চলই সে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী– তাই ঢাকার মোহাম্মদপুরে দেখা মাত্র চঞ্চলকে অপহরণের চেষ্টা চালায় লুৎফর। কিন্তু হইচই-এর এক পর্যায়ে গ্রাফিক আর্টস কলেজের শিক্ষার্থীরা বাধ সাধে লুৎফরের চেষ্টায়। চঞ্চলকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পরই সেখানে আসে রক্ষীবাহিনীর ৭-৮টি ট্রাক। অত্যন্ত ক্ষমতাধর অবস্থান থেকে যে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল রক্ষীবাহিনীর বিপুল উপস্থিতি তারই সাক্ষ্য বহন করছিল। পুরো গ্রাফিক আর্টস কলেজ ঘেরাও করে ২৭ বছরের ঐ তরুণকে আটক করা হয় এবং নিয়ে যাওয়া হয় পিলখানার ভেতরে অবস্থিত রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে। তার পরের পাঁচ দিনের বিবরণ দিয়েছেন চঞ্চল সেন এভাবে :

> আমাকে হাত-পা বেঁধে শরীরের কাপড় খুলে স্যাঁত স্যাঁতে একটি বাথরুমে ফেলা রাখা হতো। এর মাঝেই প্রতিদিন নিয়ম করে ভোর থেকে সকাল ১০-১১ টা পর্যন্ত একদফা এবং সন্ধ্যা থেকে রাত ১০-১১ টা পর্যন্ত আরেক দফা পেটানো হতো। দীপক হালদার[৪৮১] নামে একজন কর্মকর্তা এই নারকীয় নির্যাতন চালাতেন। সামান্য কিছু খাবার দেওয়া হতো। একবার চা খাওয়ানোর নাম করে আমার মুখে মরিচ গোলানো পানি ঢেলে দেওয়া হয়। এর ফলে আমার গলায় ঘা হয়ে যায়। আমি ভেবেছিলাম আস্তে আস্তে মেরেই ফেলবে। ষষ্ঠ দিন একজন সাধারণ সিপাই আমাকে গোপনে জানালো, পত্রিকায় সে দেখেছে আমার নামে হাইকোর্টে একটি মামলা হয়েছে।...

চঞ্চলকে রক্ষীবাহিনী তুলে নিয়ে যাওয়ার পরই তাঁর মা অরুণা সেন বাদী হয়ে দেশের উচ্চ আদালতে একটি রীট পিটিশন করেন পুত্রের খোঁজ চেয়ে। সাংবাদিক অচিন্ত্য সেন (সাপ্তাহিক হলিডে), রাজনীতিবিদ বদরুদ্দীন উমর, ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী পিনাকী দাশ প্রমুখ এক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। অরুণা সেনের পক্ষে মামলাটি করেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ও ব্যারিস্টার জমিরুদ্দিন সরকার এবং তাতে স্বরাষ্ট্রসচিব ও রক্ষীবাহিনীর পরিচালকসহ পাঁচজনকে বিবাদী

---

৪৮১ দীপক হালদার ছিলেন রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাচের কর্মকর্তা; দেখুন, সংযুক্তি *সাত*।

করা হয়। স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি তখন জাতীয় গণমাধ্যমে আসে। ফলে রক্ষীবাহিনী তাড়াহুড়ো করে চঞ্চল সেনকে তুলে দেয় পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের হাতে। ঐ বিভাগের কর্মকর্তা নূর মোহাম্মদ রক্তাক্ত ও বিধ্বস্ত চঞ্চলকে দেখে রক্ষীবাহিনী কর্মকর্তাদের ভর্ৎসনাও করেন। এরপর কোর্টে হাজির করা হলে চঞ্চলকে এমন একটা কাগজে স্বাক্ষর করতে বলা হয় যার ভাষ্য অনুযায়ী তাঁকে পাঁচ দিন আগের তারিখে আদালতে উপস্থিত করা হচ্ছে। এতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করা হলে জবরদস্তিমূলকভাবে তাঁর হাতের টিপসই নেয়া হয় ঐ কাগজে। এরপর শুরু হয় একের পর এক মামলা দায়ের। মুখ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ তখন চঞ্চলের বিপক্ষে হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদির অভিযোগ আনে। তবে বিষয়টি উচ্চআদালতে ওঠায় নির্যাতনের ঘটনা আর ঘটেনি।

পুত্রের মুক্তির জন্য অরুণা সেনের আর্তি এবং তার বিপরীতে রাষ্ট্রপক্ষের বিবিধ অভিযোগের পর্যালোচনা শেষে আলোচ্য মামলার মীমাংসা করতে গিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য রায়ে লিখেন,

> This matter came up for hearing on the 17th June 1974 but no materials were placed before this court by the respondents for determining where there was reasonable basis for the satisfaction of the detaining authority as required under the law. No copy of the grounds of detention was produced in courts nor it was avered in the affidavit field on behalf of the respondents that such grounds were served upon the detenu within the line as directed in the constitution.[৪৮২]

এইরূপ পর্যবেক্ষণ শেষে আদালত বিশেষ ক্ষমতা আইনে চঞ্চল সেনের আটককে অবৈধ বলে উল্লেখ করেন ১৭ সেপ্টেম্বর। কিন্তু তাতে মুক্তি পাননি তিনি। এরপর একের পর খুনের মামলা দেওয়া হতে থাকে তাঁর বিরুদ্ধে। কার্যত

---

৪৮২ আদালতে এই মামলার শিরোনাম ছিল Mrs. Aruna Sen vs. Govt. of Bangladesh. যার পিটিশন নং ছিল : ৪০৭/১৯৭৪। বিচারক ছিলেন দেবেশ সি. ভট্টাচার্য ও আবদুর রহমান চৌধুরী। মামলার শুনানি হয় ১৯৭৪ সালের ১৭, ২০, ২১ ও ২২ আগস্ট। রায় দেয়া হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। রায়টি প্রদান করেন বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য; অপর বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী তাতে সম্মতি প্রদান করেন। আরও বিস্তারিত দেখুন, *DLR, Vol. XXVII*, 1974, p.122-154, Dhaka. বর্তমান উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে ডিএলআর-এর ১৩৩ নং পৃষ্ঠা থেকে। একই আদালত প্রায় অনুরূপ আরেকটি মামলা S. Mohsin Sharif vs. Govt. of Bangladesh-এরও বিচারক ছিলেন। শেষোক্ত মামলাটির শুনানি হয় ১৯৭৪ সালের মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে। দেখুন, *DLR, Vol. XXVII*, 1974, p. 186-199, Dhaka. যার পিটিশন নং ছিল : ৪৬/১৯৭৪।

তখন শরীয়তপুর, মাদারিপুরে সাম্যবাদী দলের হাতে আওয়ামী লীগের অনেকে মারাও যাচ্ছিল– কিন্তু চঞ্চল সেন যে সেটা করেছে আদালতে সরকার কোনোভাবে তা প্রমাণ করতে পারেননি। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে সরকার পরিবর্তন হয়ে যায়। ১৯৭৭ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পান চঞ্চল। কিন্তু ততদিনে জীবন থেকে হারিয়ে গেছে চারটি মূল্যবান বছর। শরীরও বিধ্বস্ত। তীব্র নির্যাতনের কারণে কারাগারেই তিনি এক দফা নিউরো আথ্রাইটিসে আক্রান্ত হন। ২০১৩ সালে এসেও চঞ্চল সেন জানান, নির্যাতনে যেসব জায়গা ভেঙে বা মচকে গেছে সেসব স্থানে প্রায়ই ব্যথা বোধ করেন তিনি। কেবল তিনি নিজে নন– তাঁর মাকে ঐ সময় আরও দুই তরুণীসহ (মিস রিনা সিনহা এবং মিস হনুফা বেগম) আটক ও নির্যাতন করা হয়েছিল (দেখুন : সংযুক্তি *নয়*)। পারিবারিক বিপর্যয়ের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে চঞ্চল সেন জানান, 'একাত্তরে শান্তি বাহিনী ও রাজাকাররা আমাদের ঘর ভেঙে নিয়ে যায়, শুধু রান্নাঘরটি ছিল; বাহাত্তরে সরকারি দলের লোকেরা তাও নিয়ে নেয়।'

বিশেষভাবে তাঁদের পরিবারের ওপর এই আক্রোশ ও আক্রমণ সম্পর্কে চঞ্চল সেন সরকার ও রক্ষীবাহিনীর পাশাপাশি দায়ী করেন ঐসময়ের মুজিব বাহিনীর নেতা আবদুর রাজ্জাক ও ফণীভূষণ মজুমদারকেও। তাঁর দাবি অনুযায়ী, 'সাম্যবাদী দলের রাজনীতির কারণে ডামুড্যা ও ভেদেরগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা ফজলা ও হোসেন খাঁ[৪৮৩] আমাদের বিপক্ষে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়। আর পর্দার আড়াল থেকে সবকিছু করাতেন আবদুর রাজ্জাক সাহেব। ফণীভূষণও যে এর সঙ্গে জড়িত তা আমরা জানতে পারি– তাঁর বাড়িতে আমাদের একজন চর ছিল, তার মাধ্যমে। সে জানাত, আবদুর রাজ্জাক ও ফণীভূষণ মজুমদার নিয়মিত আমাদের বিরুদ্ধে অভিযানের বিষয়ে ঐ বাড়িতে বৈঠক করতেন।

প্রায় দুই যুগ হলো চঞ্চল সেন আর সক্রিয় রাজনীতিতে নেই। সাম্যবাদী দলও এখন মৃত প্রায় এবং ২০০৯ পরবর্তী সরকার গঠনে খোদ আওয়ামী লীগেরই শরিক তারা। ১৯৮৮ সালে চঞ্চল সেনের বাবা এবং ২০০৫ সালে মা মারা গেছেন। তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া নিপীড়নের কালপর্ব চার দশক আগে গত হয়েছে। কিন্তু জানালেন, দুঃসহ সেই স্মৃতি ও ভয়ের বোঝা তাঁকে এখনও তাড়া করে। তবে চঞ্চল সেন এক অর্থে ভাগ্যবানও বটে– কারণ এখনও বেঁচে আছেন তিনি; হয়তো প্রথম কাতারের কোনো রাজনীতিবিদ ছিলেন না বলেই। কিন্তু প্রথম সারির বহু বামপন্থী সংগ্রামীর ক্ষেত্রে অন্যরকমও ঘটেছে।

---

৪৮৩ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাম্যবাদী দলের মাদারীপুরকেন্দ্রিক একটি সূত্র বর্তমান লেখকের কাছে স্বীকার করেছে যে, ডামুড্যা ও ভেদেরগঞ্জের উল্লিখিত দু'জন আওয়ামী লীগ নেতাকে সাম্যবাদী দল পরবর্তী সময়ে হত্যা করে। এসময় ঐ অঞ্চলে মাদারিপুরকে কেন্দ্র করে সাম্যবাদী দলের প্রায় ৫০ সদস্যের একটি গেরিলা গ্রুপ সক্রিয় ছিল।

এ পর্যায়ে বিশেষ করে আমরা সিরাজুল হক সিকদারের মৃত্যুর অধ্যায়টি স্মরণ করতে পারি। তাঁর সম্পর্কে ২.ক উপ-অধ্যায়ের শুরুতেও একপ্রস্ত আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, একাত্তরের যুদ্ধের সময়ই দেশের অভ্যন্তরে নিজস্ব শক্তিতে যুদ্ধরত তাঁর নেতৃত্বাধীন মাওবাদী যোদ্ধারা মুজিব বাহিনীর নিশানা হয়েছিলেন। যুদ্ধের পর দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যার সবচেয়ে অগ্রাধিকারমূলক শিকারও ছিলেন তাঁরা– যার সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র ছিলেন সিকদার নিজে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের বিশেষ শাখার মাধ্যমে আটক হলেও মুজিব বাহিনী থেকে সৃষ্ট রক্ষীবাহিনীর হেফাজতেই তিনি নিহত হন (১ জানুয়ারি ১৯৭৫ দিবাগত রাতে) বলে অভিযোগ উঠেছিল– কারণ মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে তিনি এই বাহিনীর সদর দপ্তরেই ছিলেন। এ বিষয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রসচিব এস এ করিম লিখেছেন, 'সিরাজ সিকদারকে আটকের খবর শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথম দেন পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ই এ চৌধুরী। জনাব চৌধুরী ছিলেন গোয়েন্দা সংস্থা স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা। এরপর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে ঐ দিন বিকালে সিরাজকে নিয়ে কী করা হবে এ বিষয়ে বৈঠক হয়। ই এ চৌধুরী ছাড়াও সেখানে ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম প্রমুখ। এরা সবাই উপলব্ধি করেন, তাঁকে পুলিশ হেফাজতে রাখা ঠিক হবে না। সে কারণে পরক্ষণে তাঁকে মালিবাগস্থ পুলিশের বিশেষ শাখা থেকে শেরে-ই-বাংলা নগরে রক্ষীবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।' এস এ করিম এই ভাষ্য লিখেছেন পুলিশ কর্মকর্তা ই. এ. চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতার ভিত্তিতে।[৪৮৪] অন্যদিকে অ্যান্থনী মাসকারেণহাস সিরাজ সিকদারের বোন ভাস্কর শামীম সিকদারের বক্তব্য উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, 'সিরাজের দেহে গুলির চিহ্নগুলোর ধরন পরিষ্কার প্রমাণ করছিল, স্টেনগান দিয়ে তাঁকে ছয়টি গুলি করা হয়।'[৪৮৫]

সরকারি বিবরণী থেকে সেসময় জানানো হয়েছিল, সিরাজ নিহত হন সাভার এলাকায়– যখন তাঁকে নিয়ে সর্বহারা পার্টির অস্ত্রের খোঁজে বের হয়েছিল পুলিশ এবং যখন তিনি পালাতে গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, এই সাভারেই সর্বহারা পার্টির উত্থানকালীন (তখনও এই রাজনৈতিক গ্রুপটি 'দল' আকারে আত্মপ্রকাশ করেনি) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা সামিউল্ল্যাহ আজমীকে আরও ২-৩ জন কেন্দ্রীয় নেতাসহ আলোচনার কথা বলে আমন্ত্রণ জানিয়ে হত্যা করেছিল মুজিব বাহিনী সংশ্লিষ্ট

---

৪৮৪ দেখুন, S A Karim, *Sheikh Mujib : Triumph and tragedy*, UPL, ২০০৯, Dhaka, p. 356.

৪৮৫ দেখুন, অ্যান্থনী মাসকারেণহাস, *বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ*, অনুবাদ : মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানি পাবলিশার্স, ১৯৮৮, ঢাকা, পৃ. ৫২।

একটি গ্রুপ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম লগ্নেই।[৪৮৬] সর্বহারা পার্টির ইতিহাসে তাই সাভার ঐতিহাসিক এক বধ্যভূমি হিসেবেই চিহ্নিত।

সিরাজ সিকদারের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যে ব্যাপক রাজনৈতিক সমালোচনার জন্ম দেবে তা জানা সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনীকে যে এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল তার মাধ্যমেও মুজিব বাহিনীকে রক্ষীবাহিনীতে রূপান্তরের রণনৈতিক দিকনির্দেশনার হদিস মিলে। এই হত্যাকাণ্ডের পর বাংলার বাণীর সম্পাদকীয়তে (৫ জানুয়ারি ১৯৭৫) লেখা হয় : *বিপ্লব করিবার জন্য চারু মজুমদারকে*[৪৮৭] *যে কল্পনা বিলাসে পাইয়া বসিয়াছিল তার পরিণতি সকলের জানা থাকার কথা। সিরাজ সিকদারের পরিণতি তাহার চাইতে ভিন্নতর কিছুই হয় নাই...সিরাজ সিকদার ধৃত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবার পর আশা করা যায় যাহারা এই দেশে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা অতঃপর নিজেদের ভুল ধরিতে পারিয়াছেন।*

বাংলার বাণীর এই সম্পাদকীয় থেকে স্পষ্ট, রক্ষীবাহিনীকেন্দ্রিক তৎকালীন প্রশাসনিক রণনীতি সরকারের ভেতরে থাকা মুজিব বাহিনীর প্রতিনিধিত্বকারীদের বলিষ্ঠ সমর্থন পাচ্ছিল। প্রশাসক হিসেবে মুজিব যে এইরূপ সমর্থনকারীদের মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তার প্রমাণ হিসেবে দেখা যায়, সিরাজের মৃত্যুর প্রায় তিন সপ্তাহ পর ২৫ জানুয়ারি তিনি নিজেই জাতীয় সংসদে এক ভাষণে বলে উঠেন, 'কোথায় আজ সিরাজ সিকদার? তাকে যখন ধরা গেছে, তার সহযোগীরাও ধরা পড়বে।' এ থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি এই হত্যাকাণ্ডকে এক ধরনের কৃতিত্ব হিসেবেই বিবেচনা করছিলেন। উল্লেখ্য, সিরাজ সিকদারকে ধরার ক্ষেত্রে তথ্য দিয়ে সহায়তা করায় সরকার অন্তত দু'জনকে বিদেশে পাঠিয়ে পুনর্বাসিত করে

---

৪৮৬ বর্তমান লেখককে প্রদত্ত সর্বহারা পার্টির সাবেক নেতা রইসউদ্দিন আরিফের অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার; *পূর্বোক্ত*।

৪৮৭ উল্লেখ্য, ঢাকায় সিরাজ সিকদারকে হত্যার আদলেই বাহাত্তরের ২৮ জুলাই কলকাতায় আটকাবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল চারু মজুমদারকে। তাঁকে আটক করা হয় ১৬ জুলাই। মৃত্যুর পর বাবাকে থানায় দেখতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা দিতে গিয়ে চারু মজুমদারের মেয়ে অনিতা মজুমদার লিখেছেন, 'আমরা, মানে আমাদের পরিবারের সবাই সেদিনও একমত ছিলাম, আজও একমত, আমার বাবাকে ওরা মেরে ফেলেছে।...আমাকে যখন ওরা (পুলিশ) এসএসকেএম (Seth Sukhlal Karnani Memorial Hospital) হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল তখন এক পুলিশ অফিসার অন্য একজনকে খুব সাধারণভাবে বলে ফেলেছিলেন, শেষমুহূর্ত পর্যন্তও চারু বাবু মাথা নোয়ালেন না।' পরবর্তী সময়ে জানা যায়, লালবাজারে আটকাবস্থায় গুরুতর অসুস্থ তাঁকে জীবনরক্ষাকারী ওষুধের সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। বিস্তারিত দেখুন : http://www.mongoldhoni.net/tribute-to-comrade-charu-majumdar/ (১১.০৮.২০১৩)। চারু মজুমদারের গ্রেফতার ও মৃত্যুর সঙ্গে সিরাজ সিকদারের গ্রেফতার ও মৃত্যু প্রক্রিয়ার আরও কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বলেও জানিয়েছেন রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা আনোয়ার উল আলম।[৪৮৮] মৃত্যুর ১৭ দিন আগে ১৯৭৪ সালের ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর দেশব্যাপী এক সফল সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়ে সিরাজ সিকদার শাসক গোষ্ঠীর শীর্ষ ব্যক্তিদের সামনে প্রবল এক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তারই পাল্টা আঘাত হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাঁর নিহত হওয়াকে। ঐ হরতালের পর বিবিসি রেডিওর বাংলা বিভাগের সংবাদ শিরোনাম ছিল : *বাংলাদেশে এক অদৃশ্য মানবের ডাকে হরতাল পালিত*। হরতালের মাধ্যমে সর্বহারা পার্টি তখন সশস্ত্র সংগ্রামকে গণঅভ্যুত্থানমুখী করে তুলতে সচেষ্ট ছিল। উল্লেখ্য, সিরাজ সিকদারের হত্যাকাণ্ড নিয়ে ১৯৯২ সালে একটি মামলা করেছিলেন 'সিরাজ সিকদার পরিষদ'-এর সভাপতি জনৈক শেখ মহিউদ্দীন। এই মামলার কোন অগ্রগতির কথা জানা যায় না।[৪৮৯]

বস্তুত সিরাজ সিকদারের মতো জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বা চঞ্চল সেনের মতো সাধারণ একজন বামপন্থী তরুণের নির্মম নিপীড়নের শিকার হওয়াকে তৎকালীন বাংলাদেশের কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ ছিল না– বরং এসব প্রশাসনিক অভিপ্রকাশের পেছনে কাঠামোগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করছিল রাষ্ট্রীয় 'বিশেষ ক্ষমতা আইন।'

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষকে উপলক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করে এই দানবীয় আইনটি (১৯৭৪ সালের ১৪ নম্বর আইন) তৈরি করে নেয়া হয়েছিল। ঐ দুর্ভিক্ষের আগে থেকে মজুদদারি ও চোরাকারবারি এক বড় সামাজিক ব্যাধি হিসেবে আবির্ভূত হয়। সরকারি দলের সশস্ত্র ব্যক্তিরা এসব কাজে যুক্ত থাকায় এদের পাকড়াও করাও সম্ভব হচ্ছিল না– কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে জনরোষ ছিল তীব্র। চুয়াত্তরে এসে মুজিব ঐ জনরোষকে ব্যবহার করে 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' তৈরি করেন। প্রথমে প্রচার করা হয়– এই আইনে কালোবাজারী, ভেজাল খাদ্য বিক্রয়কারী ও মজুদদারদের দমনকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে জনগণ প্রাথমিকভাবে উদ্যোগটিকে প্রয়োজনীয় মনে করেছিল। কিন্তু আইনটির পূর্ণাঙ্গ

---

৪৮৮ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০২।

৪৮৯ ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০২ ও ১০৯ ধারায় এই মামলায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় : ঢাকার সাবেক পুলিশ সুপার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক এমপি, তোফায়েল আহমদ এমপি, সাবেক আইজিপি ই এ চৌধুরী, রক্ষীবাহিনীর সাবেক প্রধান নূরুজ্জামান ও মো. নাসিম এমপি। দেখুন, শওকত মাসুম, *বিপ্লবের ভেতর-বাহির*, http://www.amrabondhu.com/masum/6406 (১৬.০৬.২০১৩ তারিখে সংগৃহীত)। উল্লেখ্য, মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম ১৯৭৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োগ পান। এর পর উত্তেজক ২৯টি মাস তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। এই পদে নিয়োগের পূর্বে তিনি ছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নানের প্রাইভেট সেক্রেটারি।

ভাষ্য প্রকাশ পাওয়া মাত্র দেখা যায়, এটি আঘাত হানতে যাচ্ছে মূলত ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর। 'বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে' এমন কার্যক্রম মোকাবেলা, 'ট্রেড ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ করা' ইত্যাদি সেখানে আইন তৈরির প্রকৃত লক্ষ্য হিসেবে রাখা হয় এবং এইরূপ 'ক্ষতিকর কাজ' যিনি করবেন তাকে কারণ না দর্শিয়েই নিবর্তনমূলক আটকের অধিকার দেওয়া হয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে।

উল্লেখ্য, বাহাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রথম যে সংবিধান প্রণয়ন করে তাতে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান ছিল না। তিয়াত্তরের সেপ্টেম্বরে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী'র[৪৯০] মাধ্যমে (এই সংশোধন বিলটি সংসদে উত্থাপিত হয় ১৮.০৯.৭৩ তারিখে; গৃহীত হয় ২০.০৯.৭৩ তারিখে এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে ২২.০৯.৭৩ তারিখে) এইরূপ আইন তৈরির জন্য সংবিধানকে উপযোগী করে তোলার পাঁচ মাস পর যখন বিশেষ ক্ষমতা আইনটি তৈরি হয়– তখন এর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কার্যত পাকিস্তান শাসকরা যে আইনের শক্তিতে একাত্তর-পূর্ব সময়কার বিরোধী রাজনীতি দমন করতেন সেই কুখ্যাত 'জন নিরাপত্তা আইন'-এরই নতুন সংস্করণ মাত্র এটা।[৪৯১]

পাকিস্তানের জননিরাপত্তা আইন-এর পাশাপাশি মুজিবের বিশেষ ক্ষমতা আইনের সাযুজ্য মেলে ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধীকর্তৃক তৈরি কুখ্যাত 'Maintenance of Internal Security Act'-এর। এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্তত এক যুগ আগে ভারত 'Armed Forces Special Power Act' নামে যে আইন তৈরি করে তারও ছায়া দেখা যায় মুজিব সরকারকর্তৃক তৈরি বিশেষ ক্ষমতা আইনে। অরুণাচল, আসাম, মনিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরার মতো তথাকথিত 'disturbed area'গুলোকে নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় ঐ আইনের ঘোষিত লক্ষ্য হলেও দেশটির মানবাধিকার কর্মীদের নিকট দ্রুতই তা কুখ্যাত আইনের স্বীকৃতি পায় 'tool of state abuse, oppression and

---

৪৯০ উল্লেখ্য, জরুরি আইন বলবৎ থাকাকালীন জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রাখার বিধানও উপরোক্ত সংশোধনীতে ছিল। অথচ সংশোধনীটির পক্ষে সেদিন সরকারি দলের ২৭৬ জন সদস্য ভোট দেন। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় সদস্যরা এই বিল সংসদে গৃহীত হওয়ার সময় প্রতিবাদে ওয়াকআউট করেছিলেন।

৪৯১ কীভাবে দুটো আইন হুবহু একই বিষয়বস্তুকে ধারণ করে তৈরি তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন মওদুদ আহমেদ; দেখুন, *বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল*, ইউপিএল, ১৯৮৩, ঢাকা, পৃ. ১৯৪-৯৫ ।

discrimination' হিসেবে।[৪৯২] তারপরও বাংলাদেশ দ্বিধাহীনভাবে উপরোক্ত মডেলের একটি আইন প্রণয়নের দিকে এগিয়ে যায় চুয়াত্তরে।

উল্লিখিত আইনগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে অনায়াসে তাদের দার্শনিক ও প্রায়োগিক সাদৃশ্যগুলো চোখে পড়ে। বাংলাদেশের আইনটির ক্ষেত্রে নতুনত্ব ছিল এই যে, বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২ নম্বর ধারার 'চ' উপধারার ব্যাখ্যার আলোকে ভারতের সমালোচনা শাস্তিযোগ্য হয়ে ওঠে। এমনকি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন রিপোর্ট 'সত্য হউক বা মিথ্যা যাই হউক' 'ক্ষতিকর কাজ' হিসেবে চিহ্নিত করে এই আইন। আলোচ্য আইন আটককৃতদের আইনজীবীর সাহায্য গ্রহণের অধিকারও অগ্রাহ্য করে (দেখুন, ধারা ১১)। বলা বাহুল্য, আইনটি তৈরি হওয়া মাত্র রক্ষীবাহিনীর 'অভিযান' বেগবান হয়ে উঠে। কিন্তু চোরাচালানি বা মজুদদারদের এই আইনে ব্যবহার করে বিধান মতো 'মৃত্যুদণ্ড' দেওয়া তো দূরের কথা সামান্যতম নিয়ন্ত্রণও করা যায়নি বা করা হয়নি– বরং বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীরাই আইনের প্রধান শিকার হয়েছে। এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, ১৯৭৪ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের শাসকরা প্রায় দু' লাখ রাজনৈতিক কর্মীকে এই আইনে আটক ও নির্যাতন করেছে। ১৯৯২ সালে কেবল এক মাসে (জুলাই) এই আইনে ৪ হাজার ৫০০ মানুষকে আটক করা হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইনে এভাবে আটককৃতদের মাত্র ৮.৫৭ শতাংশের ক্ষেত্রে আটকের স্বপক্ষে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে পেরেছে সরকার।[৪৯৩]

গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এই আইনের কীরূপ অপব্যবহার হয়েছে তার উদাহরণ হিসেবে ১৯৭৩-এর মে মাসে হলিডে সম্পাদক এনায়েতুল্লা খানের আটকের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। মূলত সাপ্তাহিক হলিডে'র সরকার বিরোধী অবস্থানের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনকে প্রয়োগ করা হয় এবং এও দেখা গেছে, রক্ষীবাহিনীর হাতে চঞ্চল সেনের মতো অনেকের আটকের বিরুদ্ধে এনায়েতুল্লা খান ছিলেন একজন সোচ্চার কলম সৈনিক।

উল্লেখ, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ রাষ্ট্র কীভাবে তৎকালীন শাসকদের দ্বারা সাংবিধানিকভাবে প্রায় তাৎক্ষণিক একটি নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হয় তার একটি ক্ষুদ্র নমুনা হলো উপরোক্ত বিশেষ ক্ষমতা আইন। এর ভিত্তি হিসেবে কাজ

---

৪৯২ বিস্তারিত দেখুন, http://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_%28Special_Powers%29_Act,_1958 (08.02.2013).

৪৯৩ দেখুন, http://www.lawyersnjurists.com/resource/article-and-assignment/preventive-detention-is-the-most-arguable-topicsp-of-law-in-recent-time/ (05.11.2012).

করেছে আসলে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী। দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মতাদর্শিক চরিত্রে ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বোঝার জন্য আমরা নিচে পরপর দুটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। প্রথম উদ্ধৃতিতে ১৯৭২ সালের আদি সংবিধানের ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদটি তুলে ধরা হচ্ছে। পরে মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের ভেতর ১৯৭৩-এর ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর দ্বিতীয় সংশোধনী (১৯৭৩ সালের ২৪ নম্বর আইন)-এর মাধ্যমে একই অনুচ্ছেদকে কীভাবে 'সংশোধন' করে রক্ষীবাহিনীর মতো একটি ফোর্সের অভিযানের আইনগত ভিত্তি হিসেবে বিশেষ ক্ষমতা আইনের সাংবিধানিক পটভূমি তৈরি করা হয়– তা তুলে ধরা হচ্ছে।

১৯৭২ সালের আদি সংবিধানে মৌলিক অধিকার বিষয়ে ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদ ছিল নিম্নরূপ

৩৩। (১) কোন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং ওই ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (তাহাকে আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) আদালতে হাজির করা হইবে এবং আদালতের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখা যাইবে না।

(৩) কোন বিদেশী শত্রুর ক্ষেত্রে উপরিউক্ত দফাসমূহের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

১৯৭৩ সালে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর পর উপরিউক্ত ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদ নিম্নোক্ত রূপে পাল্টে দেওয়া হয়

৩৩। (১) গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথা শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং ওই ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (গ্রেফতারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,

(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা

(খ) যাহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান–সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেফতার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।

(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দু'জন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার আগে তাহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ দানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে ওই ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।

(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশ দানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং ওই আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগ দান করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

৬
মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী : ঢাকায় ম্যারিগেল্লার 'মিনিম্যানুয়েল'

৬.ক. শিবদাস ঘোষের 'গাইড লাইন' : বিপ্লবের স্তর যখন 'সমাজতান্ত্রিক'

> বাংলাদেশের শতকরা আশি ভাগ জমির অধিকারী কৃষক। তাদের সোশ্যালিজমের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করে তা গ্রহণ করার দাবি জানালে আমার বিশ্বাস হাতের কাস্তে নিয়ে তাড়া করে আসবে। আমি এসব কথা বলছি, তাই বলে আপনারা ভাববেন না, আমি সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে। সোশ্যালিজমে আসার একটা পথ আছে।...কোন দেশে সমাজতন্ত্র সামাজিক বিপ্লব ছাড়া এবং কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্ব ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ কি সোশ্যালিস্ট দল? কেন বলা হচ্ছে সোশ্যালিজম চাই? এটা কি প্রহসন? প্রহেলিকা? না প্রবঞ্চনা?
>
> –ড. মাযহারুল হক;[৪৯৪] স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ।

> I think there is a case for strong action and intervention when there is criminality and when the leaders are corrupt or behaving in a criminal fashion.
>
> -Jay Weatherill, রাজনীতিবিদ, অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিক দলের নেতৃস্থানীয় সংগঠক;

পূর্ববর্তী উপ-অধ্যায়ে মুজিব বাহিনীর একটি নবপর্যায় হিসেবে রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রমের বিবিধ অভিমুখের সুনির্দিষ্ট কিছু অভিপ্রকাশ তুলে ধরা হয়েছে কেসস্টাডি রূপে। তারও আগে পাঁচটি ধারায় মুজিব বাহিনীর পুনর্গঠন ও

---

৪৯৪ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত। ড. হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন যাঁরা পাকিস্তান পর্যায়ে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঞ্চনা বিষয়ে 'টু-ইকোনমি' তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এখানে উল্লিখিত তাঁর ভাষণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য দেখুন, মুনীর উদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত) : *বাংলাদেশ : ৭২ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮০, ঢাকা, পৃ. ১৫৬। বাহাত্তরের ২২ মে ড. হক মারা যান।

পুনর্বিন্যাস-পরবর্তী ঘটনাবলির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রও তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, মুজিব বাহিনী ও তার বিকাশ ধারার আরও অনেক কারণ ও ফলাফল এখনও অজানা। এ সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে জাতীয় সেনাবাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত, সিভিল প্রশাসনের সঙ্গে সামরিক প্রশাসনের সমন্বয়হীনতা ও টানাপোড়েন, শেখ মুজিবুর রহমানের নিহত হওয়া, ১৯৭৫ সালে জাসদ ও তাহেরের দ্বিতীয় দফা অভ্যুত্থান চেষ্টার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর জিরো টলারেন্স নীতি, পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিতিশীলতা ও অত্র অঞ্চলে সামরিকায়নের আধিক্য মুজিব বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধকালীন সেনাবাহিনীর পুরানো অবিশ্বাস ও বৈরিতারই নানামুখী ফল ও ধারাবাহিকতা মাত্র। আর এতসব বহুমুখী দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাসের কারণে ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রগতি বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সর্বোচ্চ মাত্রায় যে ঐক্য প্রয়োজন ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে। এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হলো, দেশটি একাধারে সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক– নীতিগত প্রায় সকল প্রশ্নে ক্রমে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশের চেয়ে রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগতভাবে বিভক্ত (এবং পারস্পরিক রক্তাক্ত কলহে লিপ্ত[৪৯৫]) বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার ও হস্তক্ষেপ করা অনেকের পক্ষে সহজ হয়েছে– বিশেষত যারা চায়নি বাংলাদেশের সাবলীল ও শক্তিশালী উত্থান দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য নিপীড়িত জাতিসত্তাকে মুক্তির পথ দেখাক।[৪৯৬] আর এও বিস্ময়কর নয় যে, মুক্তিযুদ্ধকালেই অনেকেই বুঝতে

---

৪৯৫ বাংলাদেশের ঐ সময়কার পরিস্থিতি আঁচ করা যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি বক্তব্য থেকেও। ১৯৭৩-এর জুলাইয়ে সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে তিনি জানান, *'৭২-এর ১ জানুয়ারি থেকে '৭৩-এর ১৫ জুন পর্যন্ত দুষ্কৃতকারীদের হাতে ৪ হাজার ৯২৫ জন নিহত হয়েছে দেশে। এর মধ্যে '৭২-এর ১ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী চার মাসে গুপ্তঘাতকদের হাতে প্রাণ হারায় ২০৩৫ জন মানুষ।* প্রতিদিন প্রায় ১৭ জন!! আবদুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৪। উল্লেখ্য, এ সময় নিহতদের তালিকায় সরকারের রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের সংখ্যা অধিক থাকলেও আওয়ামী লীগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও আততায়ীদের আক্রমণের শিকার হচ্ছিলেন। পুলিশ রিপোর্ট উদ্ধৃত করে অপর এক সূত্র জানায়, ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দেশে প্রায় ১১ হাজার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। প্রতিদিন প্রায় ১০টি। বিস্তারিত দেখুন, মুনির উদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশ : ৭২ থেকে ৭৫*, জাতীয় গ্রন্থ বিতান, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৩৩-৩৪। উপরোক্ত সব তথ্য উক্ত সময়ে অস্ত্রের ব্যাপক ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকে নির্দেশ করে। এসময় রাজনীতিবিদদের মুখের ভাষাও অস্ত্রের ভাষাকে উৎসাহ যোগাচ্ছিল। খোদ শেখ মুজিবুর রহমান পার্লামেন্টে যে ভাষণগুলো দেন (দেখুন, *জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, সম্পাদনা : শেখ হাসিনা ও বেবী মওদুদ, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮, ঢাকা) তার অনেকখানি জুড়ে ছিল বিরোধীদের প্রতি তীব্র আক্রমণ।

৪৯৬ প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের অন্যান্য নিপীড়িত জাতিগুলোর সংগ্রামে উল্টো প্রতিক্রিয়া ঘটে। বিশেষভাবে মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি এবং

পেরেছিলেন, মুজিব বাহিনী'কে দিয়ে এরূপ কোনো বিশেষ 'কাজ' করানো হবে। তারই নিরুপায় স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান এ কে খন্দকার এভাবে : 'এই বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে মনে হয়েছিল তারা মুক্তিযুদ্ধের চেয়েও বেশি আগ্রহী দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের ভূমিকা নিয়ে। স্বাধীন দেশে যে তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা থাকবে– সে বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।...এই বাহিনী কোন কোন কাজ বা দায়িত্ব পালন করবে সে সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না। এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, মুজিব বাহিনীকে নানানভাবে ব্যবহার করা হবে।...চূড়ান্ত যুদ্ধের সময়ও আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল, এই বাহিনীর শক্তি অটুট রাখা হচ্ছে যাতে দেশ স্বাধীন হওয়ার

সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধে 'র' ও ভারতের সংশ্লিষ্টতা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে নিপীড়িত জাতিগুলোর সংগ্রামকে যে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তা আরেক কৌতূহলোদ্দীপক অনুসন্ধানের বিষয়। ১৯৭১-এ 'র' এবং ভারতীয়দের প্রতিরোধে শোচনীয় ব্যর্থতায় পাকিস্তানিরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিশোধের নানান সুযোগ খুঁজতে শুরু করেছিল। এক্ষেত্রে তারা নাগা ও মিজোদের কিছু সংগ্রামী সংগঠককে সহায়তা ছাড়াও ১৯৮০ থেকে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হয় পাঞ্জাবের খালিস্তান আন্দোলনে। যার চূড়ান্ত পরিণতিতে এক পর্যায়ে স্বর্ণমন্দিরে অভিযান চালায় ভারতীয় বাহিনী এবং তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯৮৪ সালে নিহত হন ইন্দিরা গান্ধী। অনেক ভারতীয় নীতিনির্ধারক এখনও মনে করে, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু ছিল শিখদের মাধ্যমে আইএসআই-এর একাত্তরের প্রতিশোধ। যদিও তার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি আজও ভারতীয়রা। অন্যদিকে খালিস্তান আন্দোলনে আইএসআই-এর সংশ্লিষ্টতার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে 'র' ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়ে করাচি ও বালুচিস্তানে। করাচিতে সিন্ধি, পশতু ও মোহাজিরদের ত্রিমুখী সংঘাত ও বালুচিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনে 'র' গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয় সত্তরের দশক থেকে। সিন্ধি নেতা জি এম সাঈদকে তারা সরাসরি হাত করে, আর বালুচদের হাত করার ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করে আফগান গোয়েন্দা সংস্থা 'খাদ' (KhAD)। এমনকি শ্রীলংকার তামিল সংকটেরও তীব্রতম অংশের সূচনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসংশ্লিষ্ট। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারত যখন পাকিস্তান বিমানবাহিনীকে আসা-যাওয়ার সময় তার আকাশসীমা ব্যবহার বন্ধ করে দেয় তখন শ্রীলংকা তাদের কাতুনায়ের বিমানবন্দরে পাকিস্তানের বিমানকে জ্বালানি সহায়তা দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর বিরাগভাজন হয়। 'ভারতের নিরাপত্তার ব্যাপারে সংবেদনহীনতা'র ধুয়ো তুলে এর পরই তামিলদের 'সহযোগিতা'র জন্য 'র'কে দায়িত্ব দেন ইন্দিরা। আবার তাঁর পুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়ে 'শান্তিরক্ষা'র জন্য সেখানে পাঠান ভারতীয় সেনাবাহিনী। পরিণতিতে এক পর্যায়ে তামিল আত্মঘাতিদের হাতে নিহত হন তিনি। অন্যদিকে মুজিব নিহত হওয়ার ঘটনাবলীকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভারতের গোয়েন্দা ও রাজনৈতিক কাঠামোতে বিবিধ মত দেখা গেলেও এক পর্যায়ে এটা লক্ষ্য করা যায়, তারা বাংলাদেশের নতুন সরকারকে চাপে ফেলার নীতি নিয়েছে– কারণ এখানকার পরিস্থিতি আগের মতো আর অবারিত ছিল না তাদের গোয়েন্দা তৎপরতার জন্য। সেই আলোকে তাৎক্ষণিকভাবে ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙালি সংগ্রামীদের সঙ্গে সামরিকভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে; বিদ্যুৎগতিতে বিস্তৃতি পায় শান্তিবাহিনীর তৎপরতা। যার পরিণতিতে বাংলাদেশ সরকারও অত্র অঞ্চলে ব্যাপক সামরিকায়ন ঘটায়। এভাবে দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে ভারত-পাকিস্তানের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিতে সহিংসতা যেমন বেড়েছে তেমনি প্রকৃত জাতিগত সংগ্রামীদের জন্য স্বাধীনভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনাও দুরূহ হয়ে পড়েছে।

পর তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।'[৪৯৭] রক্ষীবাহিনী ও যুবলীগ যে এ কে খন্দকারের অনুমানকৃত ভূমিকা পালন করেছিল তা অস্পষ্ট নয়। প্রশ্ন ওঠে, 'জাসদ'ও কী ঐ লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছিল।' এর কোন স্পষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। লক্ষ্যণীয়, জাসদের সভাপতি করা হয় মেজর জলিলকে– যিনি যুদ্ধোত্তর দেশে ভারতীয় ভূমিকার সবচেয়ে কঠোর সমালোচক ছিলেন এবং তাঁকেই আবার সর্বাগ্রে এই দল ছাড়তে হয়েছিল– উপরন্তু জাসদের কোনো শাখা-প্রশাখাতেই জলিলকে আর স্মরণ করা হয় না এখন।

তবে 'মুজিব বাহিনী'র স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কাঠামোগত বিকাশকে যেভাবেই বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হোক না কেন– এই সংস্থা কিংবা রক্ষীবাহিনী ও জাসদের তাবৎ সংগঠক ও কর্মীদের রাজনৈতিক-সামরিক ভূমিকাকে এক কাতারে ফেলে মূল্যায়ন করতে যাওয়া গুরুতর এক ভ্রান্তি। 'কর্মী' ও 'নেতা'দের ভূমিকাকে এক্ষেত্রে পৃথকভাবে দেখার অবকাশ রয়েছে। মুজিব বাহিনী পর্যায়ে যেমন রক্ষীবাহিনী ও জাসদ পর্যায়েও তেমনি– সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-পরিকল্পনা সম্পর্কে কর্মীদের স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে এসব নেতৃবৃন্দ কাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন তাও মাঠ পর্যায়ের কম কর্মী-সংগঠকই জানতেন। এ রকম অস্পষ্টতা নিয়েও আন্তরিকতার সঙ্গে একাত্তরে যুদ্ধে যেতে মোটেই দ্বিধান্বিত ছিলেন না তাঁরা; আবার বাহাত্তরে 'এস্টাবলিশমেন্টের সঙ্গে' থাকার মোহ ত্যাগ করেই 'সমাজতন্ত্র'-এর ঝুঁকিপূর্ণ বীরোচিত সংগ্রামে নামতেও পিছপা হননি। সবই ঘটেছিল 'শোষণ মুক্তির' দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা থেকে। যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তখন বিশ্বব্যাপী তরুণদের প্রধান রাজনৈতিক প্রবণতা[৪৯৮] এবং যে প্রবণতায় ব্যাপকভাবে মিশেল ঘটে গিয়েছিল আবেগ ও রোমান্টিকতারও। জাসদের কর্মীরাই প্রথমবারের মতো 'সমাজতন্ত্র'কে রাজনৈতিক

---

৪৯৭ বিস্তারিত দেখুন, এ কে খন্দকার ও অন্যান্য, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮ ও ১২০।

৪৯৮ যে প্রবণতার স্রষ্টা এশিয়ায় গণচীন ও ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ আমেরিকায় কিউবা। তবে তাদের পাশাপাশি জাসদ বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয় শ্রীলংকার জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী 'জনতা বিমুক্তি পেরামুনা' [পিপলস্ লিবারেশন ফ্রন্ট]-এর উত্থানে। ১৯৬৫ সালে এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয় পুরোপুরি জাসদের মতো তরুণ একদল সিংহলী সংগঠকের মাধ্যমে– যাদের নেতা ছিলেন রোহানা উইজেউইরা। উইজেউইরা'র জন্ম ১৯৪৩-এর ১৪ জুলাই; মৃত্যু (আটকাবস্থায় গুলিতে) ১৯৮৯ সালের ১৩ নভেম্বর। উইজেউইরার নেতৃত্বে জেভিপি ১৯৭১ সালে এবং ১৯৮৭ সালে দুই দফা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ডাক দিয়েছিল। এর মধ্যে কেবল প্রথম ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরই তাদের ১৫ হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে আরও দেখুন :
http://www.google.com.bd/search?q=janata+Vhimukti+peramuna+Sri+lanka&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a&source=hp&channel=np&gws_rd=cr

আদর্শ হিসেবে এ দেশের তৃণমূলে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন– যেটা মস্কো ও পিকিং ঘরানার সমাজতন্ত্রীরা বহু আগে কার্যক্রম শুরু করেও পারেননি।

সাধারণভাবে দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের সময় জাসদের দুটি পদক্ষেপ ছিল বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক। সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা এ পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক হবে। বাংলাদেশ যখন মুক্তিযুদ্ধে যায় এবং যুদ্ধের পরে যখন জাসদ গঠিত হয় তখন এ দেশে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও সেতুংয়ের আদর্শের অনুসারী দলের সংখ্যা অনেক। কৃষক ও শ্রমিকদের মাঝে এসব দলের সাংগঠনিক ভিত্তিও ছিল উল্লেখযোগ্য। এসব বাম দল সেসময় যদিও মস্কো ও পিকিং ঘরানায় বিভক্ত ছিল– কিন্তু অধিকাংশের কর্মসূচি ছিল 'শ্রমিক শ্রেণির পার্টির নেতৃত্বে দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব' সম্পাদন করা। পিকিংপন্থী দলগুলো একে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' হিসেবে অভিহিত করতো। কিন্তু জাসদ সে সময় 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর কর্মসূচি নিয়ে হাজির হয়। বাংলাদেশের সমাজ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ আখলাকুর রহমানের বিশ্লেষণকে দলটি এসময় তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করে। যাতে বলা হয়, এ দেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটে গেছে– ফলে এখানে 'বিপ্লবের স্তর' হবে সমাজতান্ত্রিক– গণতান্ত্রিক নয়। চিরায়ত অর্থে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে থাকে প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রের বিলোপ সাধন, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা, উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। ঘোষিত বিশ্লেষণ অনুযায়ী জাসদের রাজনৈতিক কর্মসূচিসমূহ এসব লক্ষ্য অর্জনের দিকেই ধাবিত হওয়ার কথা।

লক্ষ্যণীয় যে, এসময় জাসদের নেতৃত্ব, সংগঠক ও কর্মী পর্যায়ের অধিকাংশ ছিল ছাত্র কিংবা যুবক। যারা প্রধানত ছাত্রলীগ থেকে মুজিব বাহিনীতে গিয়েছিল 'মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম করতে।' ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি, কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ও শারীরিকভাবে মোকাবেলাও তাদের অপ্রকাশ্য শক্তিশালী লক্ষ্য করে তোলা হয়েছিল প্রশিক্ষণকালে কিংবা তার আগে-পরে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখা গেল সেই একই শক্তি বিভিন্ন নতুন নামে আবির্ভূত হয়েছে 'সমাজতন্ত্র' ও 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে। যুদ্ধোত্তর সমাজে যখন তরুণরা প্রকৃতই একাত্তর পূর্ব সময়ের চেয়ে ভিন্ন এক বাংলাদেশ দেখতে ইচ্ছুক এবং যখন এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে মার্কসবাদ ও মাওবাদ তরুণদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে, সর্বোপরি যখন নকশালবাড়ির আগুনে পুড়ছে পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ– সেসময় মুজিব বাহিনীর সংগঠকদের 'জাসদ' ও অন্যান্য নামে সমাজতন্ত্রের রণধ্বনি অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের কাছেই ছিল বিস্ময়ের বিষয়। কেউ কেউ তাতে শংকিতও হয়ে ওঠেন। প্রলেতারিয়েত (যারা শ্রম বিক্রি করে চলে) আর বুর্জোয়া (যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক)-এর

মাঝখানের পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণি (Petite bourgeoisie; যারা শ্রমও বিক্রি করে না, উৎপাদনের উপায়েরও মালিক নয়– মূলত মধ্যবিত্ত)-এর 'সমাজতন্ত্র'-এর আওয়াজকে কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে মার্কস-এঙ্গেলস্ 'প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন[৪৯৯] সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাসদের ব্যানারে এবং ক্ষেত্র বিশেষে মুজিবপন্থী অপরাপর ছাত্র-যুবদের 'সমাজতন্ত্র'-এর ধ্বনিকেও সেসময় একইভাবে সমালোচনা করেছিল মস্কো ও পিকিং ঘরানার বিদ্যমান বামপন্থী দল ও গ্রুপগুলো। অনেক বাম তাত্ত্বিকের (পরোক্ষে জাসদকে উদ্দেশ্য করে উত্থাপিত) এই প্রশ্নটি বিশেষ যথার্থই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজে সামন্ততন্ত্রের জের বা অবশেষ বিদ্যমান এমন একটি দেশে, যার আবার অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও স্বাধীনতা খুবই সীমিত, রাষ্ট্র ক্ষমতায় রয়েছে দালাল চরিত্রের রাজনীতিবিদ ও আমলারা, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অশিক্ষিত, পুঁজিবাদ অনুন্নত, সাংস্কৃতিক ও কৃৎকৌশলগত মান বেশ নিচু এবং কৃষি বিপ্লব অসম্পূর্ণ– সেদেশে এ মুহূর্তে সমাজতন্ত্রের কর্মসূচি গ্রহণ আদৌ মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মত কি না? এইরূপ সমালোচকদের মতে, সমাজের অর্থনৈতিক গঠনে পুঁজিবাদের প্রাধান্য দেখা দিলেই তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি নির্দেশ করে না। কারণ পুঁজিবাদের বিকাশ আর বিকশিত পুঁজিবাদ এক বিষয় নয়। অন্যান্য অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশের মতোই এখানকার শ্রমজীবী জনগণ ভুগছে কেবল পুঁজিবাদী বিকাশের জন্য নয়– তার বিকাশের অসম্পূর্ণতার জন্যও বটে।[৫০০]

উল্লেখ্য, আখলাকুর রহমানের মাধ্যমে উপস্থাপিত জাসদের উপরিউক্ত তাত্ত্বিক ভিত্তি আরও বিকশিত ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে অনেক পরে জাসদ থেকে সৃষ্ট নতুন দল বাসদ (খালেক)– তাদের *বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র* শীর্ষক প্রকাশনায়।[৫০১] এই দলিলে (পৃ. ৭৬-৭৭) বাসদ স্পষ্টভাবে দাবি করে, বাংলাদেশ একটি জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র, এখানে উৎপাদনের চরিত্র ধনতান্ত্রিক এবং বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হলো বুর্জোয়া শ্রেণিকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ। জাসদ এবং পরে বাসদের 'উৎপাদন পদ্ধতি' ও 'বিপ্লবের স্তর' সম্পর্কিত উপরিউক্ত বিশ্লেষণের সঙ্গে হুবহু মিল লক্ষ্য করা যায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'এসইউসি আই'-এর তাত্ত্বিক দলিলগুলোর। বিশেষত ১৯৭০ সালের নভেম্বরে এসইউসি আই কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত শিবদাস ঘোষের 'ভারতের কৃষি সমস্যা ও চাষি আন্দোলন'-এর সঙ্গে ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে জাসদের তাত্ত্বিক নেতা আখলাকুর রহমানের নামে প্রচারিত 'বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ' (সমীক্ষণ

---

৪৯৯ *মার্কস-এঙ্গেলস্ নির্বাচিত রচনাবলি*, খণ্ড ১, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯, পৃ. ১৭০-১৭১।

৫০০ দেখুন, এম আর চৌধুরী, *বাংলাদেশ নয়া উপনিবেশিক অনুন্নত পুঁজিবাদী*, প্রকাশক : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন প্রক্রিয়া, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১০৮।

৫০১ দেখুন, *বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র*, বাসদ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, ঢাকা।

পুস্তিকা, ঢাকা) শীর্ষক প্রকাশনার ছিল আশ্চর্য রকমের মিল। জাসদ চুয়াত্তরে যা বলেছে তা 'এসইউসি আই' নেতা শিবদাস ঘোষের এতদসংক্রান্ত প্রকাশিত বক্তব্যের অনুকরণ মাত্র। যদিও আখলাকুর রহমানের বিশ্লেষণ শিবদাস ঘোষের চেয়ে অনেক বিস্তারিত ছিল।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে এটা তুলে ধরা হয়েছে (৩.গ উপ-অধ্যায়ে), তিয়াত্তরের আগস্টে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে শিবদাস ঘোষের কয়েক দফা রাজনৈতিক বৈঠক হয়েছিল এবং তা জাসদের তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে পরবর্তীকালে স্পষ্টত প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে শিবদাস ঘোষের 'এসইউসি-আই কেন ভারতবর্ষে একমাত্র সাম্যবাদী দল' শীর্ষক পুস্তিকাটি এসময় জাসদ নেতৃত্বকে বিশেষভাবে চমকিত করেছিল। জাসদের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য তাত্ত্বিক দলিল তৈরির ক্ষেত্রেও শিবদাস ঘোষের বক্তব্যকে 'গাইডলাইন' হিসেবে ধরা হচ্ছিল। এক্ষেত্রে জাসদ ও গণবাহিনীর ঐ সময়কার তরুণ কর্মী মহিউদ্দিন আহমদ-এর বক্তব্য প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে পারে। তিনি লিখেছেন,

> ...জাসদের মধ্যে যে গোপন পার্টি প্রক্রিয়া চালু হয় এবং তার মধ্য থেকে যে রাজনৈতিক সাহিত্য প্রকাশিত হতে থাকে, তাতে এসইউসি আই'র রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও বক্তব্যের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট।...এসময় জাসদের পক্ষ থেকে একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা প্রকাশিত হয়– 'কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ'। রচয়িতা হিসেবে আখলাকুর রহমানের নাম ছিল। যদিও বইটি ছিল জাসদ নেতৃত্বের সম্মিলিত চিন্তার ফসল। লেনিনের গবেষণাধর্মী রচনা 'রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ'-এর আদলে এটা লেখা হয়।[৫০২]

উপরিউক্ত অভিজ্ঞতার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক হলো, জাসদ যখন নিজেকে কেবল 'গণসংগঠন' হিসেবে মূল্যায়ন করছে এবং যখন সে কেবল 'পার্টি' গড়ে তোলার কথা ভাবছে– তার বহু আগেই সে বিপ্লবের রণনীতি নির্ধারণ করে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে দেয়, বাংলাদেশে বিপ্লবের স্তর হবে 'সমাজতান্ত্রিক'! সুতরাং সংগ্রামের এইরূপ 'স্তর'-এ 'পুরানো রাষ্ট্রযন্ত্রের বিলোপ সাধন'-এর জন্য তরুণদের সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আর কী করণীয়ের কথা বলতে পারে সে! দলীয় মুখপত্র 'সাম্যবাদ'-এর প্রথম সংখ্যাতেই তাই জাসদ ঘোষণা করে 'গণতান্ত্রিক পথে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন করা সম্ভব নয়।'[৫০৩]

---

৫০২ দেখুন, মহিউদ্দিন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৪।

৫০৩ দেখুন, *সাম্যবাদ*, সংযুক্তি বারো।

৬.খ. বাহাত্তরের জনসমাজে সমাজতন্ত্র ও শ্রেণিসংগ্রাম যেভাবে ভীতিকর এক বিষয় হয়ে ওঠে

> শ্রমজীবী জনগণকে শ্রেণীসংগ্রামে সংগঠিত করার কষ্টকর কাজকে পাশ কাটিয়ে, কিছু বাছাই করা কর্মী দিয়ে সশস্ত্র ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দ্রুত বিপ্লব হাসিল করার তত্ত্বকে বার বার নতুন কায়দায় হাজির করা হচ্ছে। মার্কসবাদ যুগে যুগে এই তত্ত্বকে বাতিল করে এসেছে। সাম্প্রতিক অতীতে বিপ্লবী বিকাশের পক্ষে অসীম ক্ষতিকর এই ধরনের কর্মকাণ্ডের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। বহু আত্মনিবেদিত কর্মী হারিয়ে গেছে, প্রতিক্রিয়ার হাত শক্ত হয়েছে, শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলার পথে অনেক প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে; ইতোমধ্যে এদের অনেকে এই পন্থার অসারতা বুঝেছেন, কিন্তু ঘোর কাটেনি।
>
> –অমল সেন[৫০৪]

> কমিউনিজম হলো যৌথ মালিকানা ও যৌথ স্বার্থের সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিবাদমুক্ত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের তীব্র সংগ্রাম ব্যতীত চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বার্থপরতার এই যুগে কমিউনিস্ট আন্দোলন তাই বেশি দূর এগোতে পারে না।
>
> –মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, কেন্দ্রীয় নেতা, বাসদ।[৫০৫]

মুজিব বাহিনী যেমন স্বাধীনতার নয় মাসে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রধান এক চমক ছিল জাসদও তেমনি একের পর এক চমক তৈরি করে যাচ্ছিল স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে। সূচনালগ্নে জাসদের তরফ থেকে প্রধান চমক ছিল বিপ্লবের স্তর নির্ধারণকেন্দ্রিক। সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী উপ-অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে সেখানেই থেমে থাকেনি তারা, দ্রুত সশস্ত্র পথেও ধাবিত হয় দলটি। স্বাধীনতার মাত্র ১০ মাসের মধ্যে সমাজ বিশ্লেষণের ভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে তারা যেমন একটি সমাজতান্ত্রিক 'দল'-এর 'জন্ম' দেয়– তেমনি দল গড়ার এক বছরের সামান্য কিছু পরেই তারা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি ছেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের 'লাইন' গ্রহণ করে। তাজউদ্দীনের সবল ও সক্রিয় উপস্থিতি সত্ত্বেও

---

৫০৪ প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত রাজনৈতিক মূল্যায়নের জন্য দেখুন, অমল সেন, *সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও জনগণের বিকল্প শক্তি*, কমরেড অমল সেন স্মৃতি ট্রাস্ট, ঢাকা, পৃ. ৩৩।

৫০৫ ১২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে *বাসদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি* বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে পঠিত বক্তব্য থেকে উদ্ধৃত।

মুজিব ছিলেন পুরো যুদ্ধকালে যাদের ভাবাদর্শিক নেতা– সেই একই সংগঠকরা ১৯৭২ সালের ২৩ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাসদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্মেলনে মূল আদর্শিক দলিলে (সংযুক্তি *এগারো*-এ দেখুন) শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিহিত করেন 'নয়া উপনিবেশিক শক্তি' হিসেবে। ঐ একই দলিলে তাঁরা পরোক্ষে এও অস্বীকার করেন, শেখ মুজিবুর রহমান এই যুদ্ধের ভাবাদর্শিক নেতৃত্বে ছিলেন। দলিলে লেখা রয়েছে, '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-মেহনতী মানুষ সশস্ত্র বিপ্লবী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল *যুব সমাজের আহ্বানে*।' একই ঘোষণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্রেফ 'ভৌগোলিক স্বাধীনতা' হিসেবে অভিহিত করে জাসদ এবং এর জন্য দায়ী করে যুদ্ধে 'ভারতের অসময়োচিত প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ'কে!![৫০৬] অথচ মাত্র কিছু দিন আগেও জাসদ সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে (ছাত্রলীগের অন্তর্কলহ যখন তীব্র, কিন্তু আনুষ্ঠানিক বিভক্তি শুরু হয়নি) তখন সিরাজুল আলম খানপন্থীরা 'কমরেড শেখ মুজিব লাল সালাম', 'বিশ্বে এল নতুন বাদ – মুজিববাদ, মুজিববাদ' ইত্যাদি শ্লোগানও দিতেন। কিন্তু যখনি মুজিব জুলাইয়ে ছাত্রলীগের মণি-মাখন-নূরে আলম সিদ্দিকীপন্থীদের সমাবেশে হাজির হলেন তখনি সিরাজ অনুসারীদের সব শ্লোগান পাল্টে যায়।

নতুন এই দলের 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' নাম গ্রহণও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। 'জাতীয় সমাজতন্ত্র' বা 'National Socialism' সাধারণভাবে 'Nazism' এর সমার্থক হিসেবে বিবেচ্য। হিটলারের গ্রন্থ 'Mein Kampf'কে এই মতাদর্শের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উৎকট জাত্যাভিমান ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ছিল নাজিদের জাতীয় সমাজতন্ত্রের ধারণার মূলকথা। এরূপ কিছু লক্ষ্যণীয় মিলকে ভিত্তি করে বাহাত্তরের বাংলাদেশে, জাসদের উৎস সংগঠন মুজিব বাহিনীর সঙ্গে নাৎসিবাদের তুলনা করতে দেখা যায় অনেককে। নাৎসিদের মূল শক্তি ছিল জঙ্গি তারুণ্য।[৫০৭] মুজিব বাহিনী ও এর দ্বিতীয় প্রজন্মের অন্যান্য সংগঠনের ক্ষেত্রেও ছিল তাই।

---

৫০৬ এই সংগঠকরাই মাত্র এক বছর আগে স্ব-ইচ্ছায় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন 'মুজিববাদ' কায়েমের জন্য! মুজিব বাহিনীর এই সংগঠকরা যখন যুদ্ধ শেষে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতার নতুন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তখন তাঁদের পূর্বতন ভূমিকার কোনো ব্যাখ্যা দেননি বা জবাবদিহিতা করেননি। ফলে অন্যান্য বামপন্থীদের সন্দেহ ও বিস্ময়ের উদ্রেক না হয়ে উপায় ছিল না।

৫০৭ ১৯৩৩ সালে নাৎসিরা জার্মানির রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তাদের তথাকথিত 'জাতীয় সমাজতন্ত্র' কায়েম করে। ১৯৩৩ সালে এ দলকে একমাত্র আইনানুগ দল ঘোষণা করা হয়। তবে ১৯৪৫ সালে নাৎসি জার্মানির পতনের সঙ্গে সঙ্গে 'জাতীয় সমাজতন্ত্র'ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নামে সমাজতন্ত্রী হলেও এ দল ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রীদেরই অধিক ক্ষতি করে বলে

প্রতিষ্ঠার স্বল্পকাল পরেই 'গণবাহিনী' নামে সশস্ত্র শাখা গড়ে তোলে জাসদ। মুজিব বাহিনীর অপর অংশও 'রক্ষীবাহিনী'র মাধ্যমে আরও সশস্ত্র রূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। এসব অভিজ্ঞতা ছিল নাৎসিদেরই অনুরূপ। নাৎসিরাও Gestapo (জার্মান শব্দ 'Geheime Staatspolizei'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) নামে একটি ঝটিকা বাহিনী গঠন করেছিল এবং তার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরও গোপন যোগাযোগ ছিল– যেমনটি ছিল গণবাহিনীর সঙ্গেও। যদিও Gestapo-এর চরিত্র ছিল যেখানে আক্রমণাত্মক সেখানে গণবাহিনীর ধরন ছিল অপেক্ষাকৃত আত্মরক্ষামূলক। তবে এসব বিতর্ক এড়াতেই বোধহয় জাসদ বা 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' কখনো তার নামের ইংরেজি ভাষ্য হিসেবে National Socialist Party লিখত না বরং লিখত Jatiya Samajtantrik Dal (JSD)। এ ছাড়া জাসদের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য National Socialist Party-র কোনো ধরনের ভ্রাতৃপ্রতিম যোগাযোগ সূত্রও লক্ষ্য করা যায় না।[৫০৮] তবে মুখ্য নেতৃত্ব যে সচেতনভাবেই 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' নাম গ্রহণ করেছিল তার প্রমাণ মেলে দলটির শুরুর সময়কার একজন তাত্ত্বিক মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সাম্প্রতিক এক ভাষ্যে। ২০১২ সালের আগস্টে ঢাকার পাশে সাভারের গণবিশ্ববিদ্যালয়ে বাসদের সাত দিনব্যাপী এক শিক্ষা শিবিরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে জনাব হায়দার জাসদ গঠনকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন,

> 'এখানে প্রথম যখন এলাম (পশ্চিমবাংলা থেকে), জাসদের সঙ্গে– তৈরি হয়নি জাসদ তখনও। একটা পিরিয়ডে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে পরিচয় হলো, খালেকুজ্জামানের সঙ্গেও পরিচয় হলো। এই পরিচয়ের এক পর্যায়ে সিরাজুল আলম খানের মোটরসাইকেলে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াই। হঠাৎ দেখি কাগজে নতুন পার্টির আবির্ভাব। বললাম, এটা কি নাম দিলেন– এটা তো জার্মান ফ্যাসিস্ট পার্টির নাম, ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টির নাম। বললেন, না না– এ দেশে জাতীয়তাবাদের যে তীব্র বাস্তবতা এখানে এভাবে যদি নাম না দিই তাহলে আমাদের দাঁড়াতে দেবে না।...আমিও এর মধ্যে ঢুকি।'[৫০৯]

শেষোক্তদের অভিযোগ ছিল। দেখুন, হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

৫০৮ তবে লক্ষ্যণীয়, উইকিপিডিয়াতে 'non-european National Socialist Party (not related to Nazis)'-এর যে তালিকা রয়েছে (*পর্যবেক্ষণ তারিখ ২৫.১২.১২*) তাতে সাতটি দলের মধ্যে জাসদের নামও রয়েছে। এই তালিকার চারটি দলই ভারতীয়। দেখুন, http://en.wikipeia.org/wiki/National_Socialist_Party

৫০৯ জনাব মুবিনুল হায়দার চৌধুরী কীভাবে জাসদে যুক্ত হন এবং কীভাবে পরে জাসদ থেকে বেরিয়ে বাসদ গড়ে তোলেন সে বিষয়ে অন্যত্র বিবরণ রয়েছে। বর্তমানে যে বক্তৃতার উল্লেখ

মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর উপরিউক্ত বক্তৃতায় এও বিস্তারিত বিবরণ ছিল যে, তাত্ত্বিকভাবে কীরূপ অপ্রস্তুত অবস্থায় জাসদ সংগঠকরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ডাক দিয়েছিলেন সেদিন এবং কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসইউসি-আই দলটির তাত্ত্বিক দলিলপত্র এনে সে সংকট মোকাবেলায় ভূমিকা রাখছিলেন তিনি।[৫১০] তবে প্রথম কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ পরই ১৯৭৩ সালের ১৪ জানুয়ারিতে, দলের ঘোষণাপত্র প্রকাশকালে জাসদ নিজেকে 'মার্কসবাদী' দল হিসেবে দাবি করে জানায়, বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটে গেছে, ফলে এখানে বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। জাসদ সেসময় বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে যেসব তাত্ত্বিক অনুসিদ্ধান্ত হাজির করে তা ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

- জাতীয় বুর্জোয়াদের দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এখানে একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে। এ বুর্জোয়া রাষ্ট্র সম্ভবপর আপেক্ষিক দ্রুততার সঙ্গে দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করছে।
- বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান ৮ শতাংশ এবং কৃষির অবদান ৫৮ শতাংশ। এই দুটিই কেন্দ্রীয় খাত। শিল্পের ক্ষেত্রে বলা যায়, তার চরিত্র তথা উৎপাদন সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে ধনতান্ত্রিক।
- অন্যদিকে কৃষিতে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্রমে দেশের বেশিরভাগ জমি কেন্দ্রীভূত হতে থাকা, গ্রামের অধিকাংশ লোকের ক্রমে সর্বহারা ও অর্ধ-সর্বহারা স্তরে নেমে আসার হার বৃদ্ধি পাওয়া, জমি পুঁজি বিনিয়োগের উপায় হিসেবে রূপান্তরিত হওয়া, মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হওয়া এবং সর্বোপরি কৃষিজাত উৎপাদন জাতীয় পুঁজিবাদী বাজারের পণ্যে পর্যবসিত হওয়া– এসব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে, বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি।
- এই ধনতান্ত্রিক বিকাশধারাকে সংহত করাই হচ্ছে মুজিববাদী সরকারের উদ্দেশ্য। এই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাই বর্তমানে দেশের ও জনজীবনের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ। ফলে *বিপ্লবের আঘাতে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে* তার পরিবর্তে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বহারা ও গরিব চাষীর সুদৃঢ়

করা হচ্ছে তা পরে বাসদ কর্মীরা রেকর্ড থেকে ট্রান্সক্রিপ্ট করে মুদ্রণ করলেও সর্বসাধারণে প্রচার করা হয়নি। কেবল দলীয় কর্মীদের মাঝে ঐ মুদ্রিত কপি বিতরণ করা হয়।

৫১০ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বর্তমানে বিরোধী অবস্থানে থাকলেও বাসদের অপর একটি গ্রুপের নেতা খালেকুজ্জামানদের তৈরি একটি দলিলেও (*জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ গড়ে ওঠার পটভূমি*, মার্চ, ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৪) এরূপ বক্তব্য রয়েছে যে, মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মাধ্যমে এসইউসি-আই থেকে প্রাপ্ত বইপত্রই জাসদের অভ্যন্তরে মতাদর্শিক সংগ্রাম চালাতে তাদের সাহায্য করেছিল। ১৯৭৩-এ ঐরূপ সংগ্রামের ফলেই জাসদের অভ্যন্তরে একটি 'বিপ্লবী দল' গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

মৈত্রীর ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন ছাড়া বাংলার শোষিত মানুষের মুক্তি নাই।[৫১১]

জাসদের এই তাত্ত্বিক দাবি দেশব্যাপী পরিবর্তন-আকাঙ্ক্ষী তরুণ সমাজকে পুরানো বামধারাসমূহের– যারা দেশে 'গণতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর জন্য কাজ করছিল– তাদের থেকে সরিয়ে আনতে কার্যকর প্রমাণিত হয়।[৫১২] এসময় জাসদ দেশব্যাপী 'ঘেরাও আন্দোলন' নামের গণবিক্ষোভের ডাক দেয়– যা কার্যত সরকারের সঙ্গে দলটিকে সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যায়। ঘেরাও আন্দোলনের পরিকল্পনার আগেই ১৯৭৪ সালের ৩০ জানুয়ারি এবং ৮ ফেব্রুয়ারি দু' দফায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ও হরতাল পালন করে জাসদ দেশজুড়ে আন্দোলনমুখী জঙ্গী অবস্থা তৈরি করে। ৮ ফেব্রুয়ারির হরতাল শেষে জাসদ তাদের '২৯ দফা'র সকল দাবি মেটানোর জন্য সরকারকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। ৯ ফেব্রুয়ারি দৈনিক গণকণ্ঠে আট কলাম জুড়ে হেডলাইন ছিল– 'শেষ সময় : ১৫ মার্চ'; পাশাপাশি এও বলা হয়, '১৫ মার্চের মধ্যে দাবি না মানলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হবে।'

এসময়, পুরো তিয়াত্তর জুড়ে জাসদের প্রধান তৎপরতা ছিল প্রায় প্রতিদিন দেশের কোথাও না কোথাও জনসভা করা। জলিল, রব, শাজাহান সিরাজ প্রমুখ এসব সভায় বক্তৃতা দিতেন এবং প্রচুর লোকসমাগম হচ্ছিল তাতে। কিন্তু চুয়াত্তরের শুরু থেকে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির এই ধারায় কেন্দ্রীয় জাসদের আগ্রহ কমে আসে। এসময় জাসদের মুখপত্র গণকণ্ঠের লেখনিতেও লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের নায়ক গিয়াপের 'জনযুদ্ধ', 'ঘাঁটি এলাকা' ইত্যাদি সংক্রান্ত লেখা এবং 'পার্টি গঠন' সম্পর্কে মাও সেতুঙের বিশাল বিশাল লেখা

---

৫১১ বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিপ্লবের পর্যায় সম্পর্কে খসড়া থিসিস ('৭৪-*এর থিসিস* নামে পরিচিত), জাসদ, ১৯৭৪, ঢাকা, পৃ. ২০-৩০।

৫১২ এ সময় বিশেষভাবে সিপিবি ঘরানা থেকে অভিযোগ ওঠে, জাসদ দেশের বামপন্থী রাজনীতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য মাঠে নেমেছে। আলোচনার জন্য দেখুন, নজরুল ইসলাম, *জাসদ রাজনীতি : একটি নিকট বিশ্লেষণ*, প্রাচ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১। সিপিবি প্রথম থেকে জাসদের প্রতি ছিল আক্রমণাত্মক। জাসদ নেতৃবৃন্দ যখন মুজিবকে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান তখন সিপিবি'র মুখপত্র 'একাতা'য় এর ব্যাখ্যা দিয়ে লেখা হয় (১ জুন ১৯৭২) : *আ স ম রবের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ এবং তার সমর্থক শ্রমিক লীগের অনুসারীরা যেসব নীতির কথা বলছে তাকে আপাতদৃষ্টিতে বামপন্থী– এমনকি মার্কসবাদী চরিত্রের মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এদের অবস্থান প্রগতি বিরোধী মহলকে শক্তি যোগাবে। শ্রেণিসংগ্রামের নামে এরা আসলে এমন এক মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছে যখন জাতীয়করণের মতো কর্মসূচি দক্ষিণপন্থী দলগুলো কর্তৃক তীব্রভাবে সমালোচিত হচ্ছে।*

উল্লেখ্য, সিপিবি এসময় ন্যাপ (*মোজাফফর*)-এর সঙ্গে মিলে 'স্থিতিশীলতা ও দেশ পুনর্গঠনের স্বার্থে' আওয়ামী লীগের সঙ্গে 'ঐক্যবদ্ধ' হতে চাচ্ছিল। যা ১৯৮০ সালে এসে তাদের তৃতীয় কংগ্রেসে 'অদূরদৃষ্টি' সম্পন্ন নীতি হিসেবে মূল্যায়িত হয়। দেখুন, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৭ মার্চ ১৯৮০, ঢাকা।

ধারাবাহিকভাবে ছাপা হতে থাকে কাগজটিতে। অথচ মাত্র কয়েক বছর আগেও ঢাকায় স্থানীয় মাওবাদী ছাত্রসংগঠনগুলো ছাত্রলীগের এ অংশের চক্ষুশূল ছিল। বস্তুত এসময় জাসদের কর্মকাণ্ড থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়ার পথ খুঁজছিল[৫১৩] এবং ১৯৭৪ সালে ১৭ মার্চ ঢাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাসভবন ঘেরাওয়ের ফলে সৃষ্ট ঘটনাবলি তাদের সেই সুযোগ করে দেয়। ওই ঘেরাওকালে দেশের অন্যত্রও অন্তত ২৯টি জায়গায় দলটির সশস্ত্র 'কিছু' ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫১৪] আসলে ১৯৭৪ সালের মার্চে ঢাকায় দলের এক বর্ধিত সভায় জেলা প্রতিনিধিরা মত প্রকাশ করেন যে, *ঢাকায় একটি টোকেন ঘটনা না ঘটালে সারা দেশে ঘেরাও আন্দোলন শুরু করতে অসুবিধা হবে।*[৫১৫] এর ফলেই ১৭ মার্চের 'টোকেন ঘটনা'র পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং পরিকল্পিত রূপ পেয়ে সেটি আর কার্যত 'টোকেন' থাকেনি বরং অনুমান করা হয়, ১৭ মার্চ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে জাসদ নেতৃত্ব স্পষ্টভাবেই *গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ছেদ* টানতে চাইছিলেন।[৫১৬]

---

৫১৩ জাসদ থেকে সৃষ্ট খালেকুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন বাসদ এই ঘটনাকে অভিহিত করেছে 'গণআন্দোলন ও পেটি বুর্জোয়া রাজনীতিকে বিপ্লবী সংগ্রামে উত্তরণ ঘটানোর যান্ত্রিক প্রচেষ্টা' হিসেবে। দেখুন, *জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ গড়ে ওঠার পটভূমি*, পূর্বোক্ত।

৫১৪ আশরাফ কায়সার, *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ৪৩; আশরাফ কায়সার তার তথ্যের স্বপক্ষে জাসদ নেতা মাহবুবুর রব সাদীর গ্রন্থ *'বাংলাদেশের সামাজিক বিকাশ ও সমাজ বিপ্লব'* থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। তবে বর্তমান লেখকের সঙ্গে ২০১২ সালের ২৯ অক্টোবর এক সাক্ষাৎকারে মাহবুবুর রব সাদী জানিয়েছেন, বিভিন্ন জেলায় 'উল্লেখযোগ্য' কিছু ঘটানোর পরিকল্পনা থাকলেও কেবল হবিগঞ্জে এবং খুলনায় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়। হবিগঞ্জে একজন যুবলীগ নেতা (আবদুল মতিন) নিহত হন এবং শেষোক্ত জেলায় (কামরুজ্জামান টুকুর নেতৃত্বে) একটি থানা আক্রান্ত হয়। সাদী নিজে ১৭ মার্চের মিছিলে ছিলেন না। তবে তিনি বলেছেন, সেদিন যা ঘটেছে তা পরিকল্পিত এবং 'আরও বড় কিছুও ঘটতে পারত। খোদ মেজর জলিলও নিহত হতে পারতেন।' উল্লেখ্য, এসব অভিজ্ঞতার আলোকেই মাহবুবুর রব সাদী কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম ব্যক্তি হিসেবে জাসদে পদ্ধতিগতভাবে ভিন্নমত তুলে ধরেছিলেন। যদিও দল ছেড়ে যাননি। জাসদ ভেঙে যখন বাসদ সৃষ্টি হয় তখন সাদী জাসদে থেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। তাঁর ভাষায় 'মাহবুব-মান্না-আখতারদের বের করে দেয়া ছিল তখনকার জাসদ নেতাদের সুস্পষ্ট ষড়যন্ত্র।'

৫১৫ নজরুল ইসলাম, *আগামীদিনের বাংলাদেশ ও জাসদ রাজনীতি*, অনন্যা, ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১০৬।

৫১৬ জাসদের অভ্যন্তরে এই সময়কার পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মাহমুদুর রহমান মান্না দাবি করেছেন, 'সিরাজুল আলম খানের ভূমিকা সেদিন সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মূল নেতা হিসেবে মুখ্য ছিল না। ১৭ মার্চ [১৯৭৪] মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাওয়ের পর গণআন্দোলনের ছেদ ঘটিয়ে তাকে বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরের বক্তব্যের সঙ্গে যদিও তিনি একমত ছিলেন [যা জাসদের মূল লাইনের পরিপন্থী ছিল], কিন্তু পরবর্তীকালে কয়েক বার তিনি গণসংগঠন বাদ দিয়ে

ঐদিনটি ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। স্বভাবত কঠোর কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য এই দিনকে বাছাই করার মধ্যেই এক ধরনের উস্কানি ছিল। বিকালে জাসদ যখন উদ্বিগ্ন ঢাকার পল্টন ময়দান থেকে সমাবেশ শেষে মিছিল নিয়ে মিন্টো রোডে মন্ত্রিপাড়ায় রওনা হয় তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী বাড়িতে ছিলেন না। তারপরও জাসদ নেতৃবৃন্দ তাঁর কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে অবস্থান করতে থাকে। এটা ছিল তাদের দেশব্যাপী ঘোষিত 'ঘেরাও আন্দোলন'-এর সূচনালগ্ন। মিন্টো রোাডে পৌঁছে এক পর্যায়ে মেজর জলিল ও আব্দুর রবের নেতৃত্বে বিক্ষোভকারীরা মন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বসে পড়েন। প্রকৃতিতে তখন প্রায় সন্ধ্যা। এ সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বাধা প্রদান করে, মিছিলকারীরাও হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এসময় মিছিলকারীদের দিক থেকেই কর্তব্যরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনের উপর প্রথম গুলিবর্ষণ হতে দেখা যায়। কয়েকজন আহত হয় এতে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে কর্তব্যরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাও মিছিলকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করে। জাসদের মুখপত্র দৈনিক গণকণ্ঠের ভাষ্য অনুযায়ী তাতে ১১ জন নিহত হয়– যদিও তারা মাত্র চারজনের পরিচয় জানাতে সমর্থ হয়। আর সরকারি প্রেসনোট অনুযায়ী মারা যায় তিনজন।'[৫১৭] নিহতদের অন্যতম ছিলেন বরিশাল বিএম কলেজের জিএস জাফর।

১৭ মার্চের ঘটনার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে শিগগির জাসদ 'সাম্যবাদ' নামে একটি সার্কুলারের প্রথম সংখ্যা প্রচার করে। সার্কুলারে বলা হয়- এটা হলো 'বিপ্লবীদের মুখপত্র।' সেখানে ১৭ মার্চে রক্ষীবাহিনীর গুলিবর্ষণে ৫০ জন নিহত হয় বলে দাবি করা হয় এবং হামলার জন্য সরকারকে দায়ী করা হয়।

ঘটনাটি যে একেবারে অপরিকল্পিত ছিল না তার প্রমাণ হিসেবে দেখা যায়, ঐদিন পল্টন থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়ই আ স ম রব ঘোষণা করেছিলেন, 'আজ ডাইরেক্ট এ্যাকশন শুরু হলো।' এমনকি জনসভা ও ঘেরাওয়ের পূর্বদিন ঢাকায় প্রস্তুতিমূলক যে মশাল মিছিল হয় তাতেই জাসদকর্মীদের পুরোপুরি নতুন একটি শ্লোগান দিতে দেখা যায়– 'আগামীকালের ঘোষণা – জনযুদ্ধের সূচনা।' খোদ ১৭ মার্চের দৈনিক গণকণ্ঠেও যে জাসদ ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছিল তা অবশ্য সেদিন সকালেও অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকার বুঝতে পারেননি। পত্রিকাটিতে এদিন জনসভা সংক্রান্ত রিপোর্টটি ছিল নিম্নরূপ :

গণবাহিনীতে যোগ দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন।' মান্না অবশ্য এও দাবি করেছেন যে, ১৭ মার্চে নিপীড়নের ঘটনা ছিল গণতন্ত্রের *কফিনে শেষ পেরেকের* মতো। মিথ্যা ইতিহাসের ওপর জাতি দাঁড়াতে পারে না, *পূর্বোক্ত*।

[৫১৭] বিস্তারিত দেখুন, মোহাঃ রোকনুজ্জামান, *জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশের রাজনীতি*, মীরা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৬০-৬২।

আজ পল্টনে জাসদের জনসভা :
শোষিত জনতার ২৯টি দাবি আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ
সংগ্রামের কর্মসূচি দেওয়া হবে

স্টাফ রিপোর্টার : আজ ১৭ মার্চ, ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে জাসদের জনসভা। শোষিত, নির্যাতিত, মেহনতী মানুষের মুক্তি তথা শোষক ও শোষণ নির্মূল করার প্রত্যক্ষ কর্মসূচি ঘেরাও আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপক সংগ্রামের সূচনা ঘটবে। শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।...আজকের দিনটি তাই জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।...জনতার শোষণ মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে ১৭ মার্চ ১৯৭৪ এক অযুত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে শোষিত মেহনতী জনতার সম্মুখে আজ সমাগত। ঐতিহাসিক সতেরোই মার্চ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অস্থিরতম দিনগুলোর যবনিকা ঘটাবে।...[৫১৮]

বস্তুত ঘটেছিল উল্টোটি। চুয়াত্তরের ১৭ মার্চ বাংলাদেশের রাজনীতিক ইতিহাসকে নতুন এক অস্থিতিশীল অধ্যায়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে সেদিনের গুলির ঘটনা সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে জাসদ নেতা নূর আলম জিকু বলেছেন, 'পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীকে লক্ষ্য করে বিনা উস্কানিতে তৎকালীন ছাত্রনেতা আ ফ ম মাহবুবুল হকসহ আরও অনেকে স্টেনগান দিয়ে ব্রাশফায়ার শুরু করেন'।[৫১৯]

স্বভাবত এ ঘটনার পর রক্ষীবাহিনীসহ সরকারের পুরো সশস্ত্র কাঠামো রাজনৈতিক বিরুদ্ধমতের ওপর অভিযান শুরুর বাস্তব বৈধতা পেয়ে যায়। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর পর যার জন্য অপেক্ষা করছিল শাসকরা। সংঘাতের এই নতুন তরঙ্গেও উভয়পক্ষে মুজিব বাহিনীর সংগঠকরাই নেতৃত্ব দেন। ১৮ মার্চ তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখের নেতৃত্বে রাজধানীতে শাসকদলের মিছিল বের হয় এবং দুপুর ১২টায় মিছিলের একাংশ গিয়ে জাসদ অফিস পুড়িয়ে দেয়। জাসদ-ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়েও এভাবে প্রকাশ্যে অগ্নিসংযোগ করা হয়[৫২০] পাশাপাশি সারা দেশে কয়েকশত নেতা-কর্মীকে

---

৫১৮ *দৈনিক গণকণ্ঠ*, ১৭ মার্চ ১৯৭৪, ঢাকা।

৫১৯ মোহাঃ রোকনুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*।

৫২০ জাসদ কার্যালয়ে আগুন লাগানোর রিপোর্টটি দৈনিক বাংলার বাণী'তে ছাপা হয় এভাবে :

নেতারা পালিয়ে যান : কেউ হতাহত হননি
জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভস্মীভূত
স্টাফ রিপোর্টার

গতকাল দুপুর বারটার দিকে একটি বিরাট জঙ্গী শোভাযাত্রা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় দফতরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এতে কেউ হতাহত হয়নি।

আটক করা হয়। গণকণ্ঠের সম্পাদক কবি আল মাহমুদও গ্রেফতারের হাত থেকে রেহাই পাননি।[৫২১] গণকণ্ঠ ঘোষণা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া না হলেও এর প্রকাশনার জন্য জরুরি যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে যায় সরকারের আধা-সামরিক বাহিনী। এ দফায় ১৩ দিন বন্ধ থাকে পত্রিকাটি। সর্বগ্রাসী এই আক্রমণের মুখে 'আত্মরক্ষার্থে' জাসদের নতুন সাংগঠনিক পরিচয় হয়ে ওঠে গণবাহিনী।[৫২২]

জাসদ নেতারা বিক্ষুব্ধ শোভযাত্রা দেখে পালিয়ে যান।...গতকাল সার্কিট হাউস আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে একটি সভা ডাকা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংসদ সদস্য গাজী গোলাম মোস্তফা।...সভা শেষে একটি বিরাট শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণে বের হয়। মিছিলের অগ্রভাগে অন্যদের মধ্যে ছিলেন গাজী গোলাম মোস্তফা, তোফায়েল আহমেদ ও আবদুর রাজ্জাক।...জিপিও অফিসের সামনে আসতেই মিছিলের একটি অংশ জাসদের সাইনবোর্ড দেখে আক্রোশে ফেটে পড়ে এবং সেখানে ঢুকে পড়ে। তারপরই জাসদ অফিস থেকে আগুনের ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।...*দৈনিক বাংলার বাণী*, ১৯ মার্চ ১৯৭৪, ঢাকা।

১৯৭৪ সালের মার্চে মিন্টো রোডের এই ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া কাকতালীয়ভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল স্বস্ত্রীক লর্ড মিন্টোর ওপর ১৯০৯-এর নভেম্বরে আহমেদাবাদে চরমপন্থী বিপ্লবীদের বোমা হামলার কথা। আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐ ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে [ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়া; ১৮৪৫-১৯১৪] মিন্টো বিপ্লবীদের ওপর ব্যাপকভাবে প্রশাসনিক নিপীড়ন জারি করেছিলেন এবং যার আওতায় বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ আটক হন।

৫২১ ১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ সোমবার আল মাহমুদ আটক হন। আটক করেই তার বিরুদ্ধে চারটি মামলা দায়ের করা হয়। প্রায় এক বছর কারাগারে থাকতে হয় তাঁকে। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগে যোগ দেন। পরবর্তীকালে জাসদের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্য করা যায় নি আর। আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'কবির মুখ'-এ জাসদ গণকণ্ঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার আদ্যপান্ত উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, কারাগার থেকে মুক্তির পর একদিন শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে ডেকে নিয়ে শিল্পকলা একাডেমিতে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। মুজিব চাইছিলেন না আল মাহমুদ আর কোনো গণমাধ্যমে ফিরে যান। ততদিনে অবশ্য গণকণ্ঠও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উল্লিখিত গ্রন্থে এমনও ইঙ্গিত মেলে, কারাগারে থাকাকালেই তাঁর সঙ্গে জাসদের সম্পর্ক শীতল হতে শুরু করে এবং তাঁর একজন নিকটাত্মীয় আমলা [এইচ টি ইমাম]ও তাঁর মুক্তি ও চাকরির ব্যাপারে সরকারকে প্রভাবিত করেছিলেন, দেখুন, আল মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫১-২৬৭। উল্লেখ্য, আল মাহমুদ আটক থাকাবস্থায় কবি নির্মলেন্দু গুণ ঐ কাগজের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সংখ্যায় 'বন্দি মানুষের গান' নামে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি কবিতা লিখেছিলেন।

৫২২ ১৯৭৪-এর মার্চের উপরোক্ত ঘটনাবলি এবং তার উত্তেজক পরবর্তী অধ্যায়কেই গণবাহিনী'র কার্যক্রম শুরুর আনুষ্ঠানিক সময় হিসেবে বর্তমান লেখায় উল্লেখ করা হলেও বিচ্ছিন্ন আকারে যে এই বাহিনীর তৎপরতা আরও অনেক আগেই জেলা পর্যায়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল তার বিবরণ সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবেই রয়েছে। তবে সম্প্রতি ২০১৪ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও সাধারণ সম্পাদক শরীফ নুরুল আম্বিয়া এই বাহিনীর সৃষ্টিকাল সম্পর্কে দাবি করেছেন, *১৯৭৫ সালে মুজিব কর্তৃক সংসদীয় রাজনীতির অবসানের পরই কেবল 'বিপ্লবী গণবাহিনী' গঠন করা হয়।* দেখুন, 'বঙ্গবন্ধু হত্যার জন্য দায়ী অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রকারীরা', ৭ জুলাই, *প্রথম আলো*, ঢাকা।

এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ শেষে মুজিব বাহিনীর অব্যবহৃত অস্ত্র ব্যবহারের নতুন করে সুযোগ তৈরি হয়। নতুন আরেক সশস্ত্র যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। অতীতে পূর্ববাংলা মাওবাদীদের গ্রামীণ শ্রেণি-সংগ্রাম দেখেছিল, এবার শুরু হলো তার নতুন আরেক রূপ। নবপর্যায়ের ত্রিমুখী (রক্ষীবাহিনী–গণবাহিনী–নকশাল) এই শ্রেণিযুদ্ধ জেলা পর্যায়ে কীরূপ আধা-গৃহযুদ্ধাবস্থা তৈরি করেছিল সেটাই অনুসন্ধান করা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ের শুরুতে– অনেকগুলো জেলার কেসস্টাডির আলোকে।

উল্লেখ্য, জাসদ ও ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় সংগঠকদের মাঝে কেবল শরীফ নুরুল আম্বিয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না থাকা অবস্থায় তাঁর বাড়ি ঘেরাওয়ের যৌক্তিকতা নিয়ে পূর্বাহ্নে আপত্তি তুলেছিলেন। এর বাইরে দলের এই কর্মসূচির বিরুদ্ধে ঢাকার বাইরে সবচেয়ে সংগঠিত প্রতিবাদ হয় চট্টগ্রামে 'বৃহত্তর চট্টগ্রাম ছাত্রলীগ সমন্বয় কমিটি'র পক্ষ থেকে। তারা ১৮ মার্চ এক বৈঠকে পূর্বদিনের ঢাকার কর্মসূচিকে 'হঠকারিতা' হিসেবে মূল্যায়ন করে। এমনকি সেখানে তখনকার মেধাবী ছাত্রনেতা গোফরানুল হক[৫২৩] এই হঠকারিতার প্রতিবাদে জাসদই ত্যাগ করেন। চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের এই ভূমিকার কারণে অন্তত একবছর কেন্দ্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বন্ধ ছিল। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ঐ কর্মসূচি নিয়ে আপত্তি শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্যদিকে ঐ সময়কার জাসদের এক তরুণ সংগঠক লিখেছেন, '১৭ মার্চের সভা শেষে মিছিল কোন দিকে যাবে অনেক নেতা-কর্মীই তা জানতেন না।'[৫২৪] স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে হামলার সিদ্ধান্তটি আসলে কার?

তবে হামলার পরিকল্পনা যার বা যাদেরই হোক আওয়ামী লীগ ও রক্ষীবাহিনীর নীতিনির্ধারকদের জন্য এই পরিস্থিতি একটি 'সুযোগ' হিসেবে আবির্ভূত হয়। জাসদ যতই 'সমাজতন্ত্র'-এর দাবিতে এভাবে জঙ্গী রূপ নিচ্ছিল শেখ মণিসহ মুজিবের পাশের রক্ষণশীলদের জন্য ততই আশীর্বাদ হিসেবে আবির্ভূত হয় তা। কারণ সেটা জাসদকে উপলক্ষ্য করে সকল ধারার বামপন্থী ভিন্নমতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সুযোগ করে দিচ্ছিল। মুজিব বাহিনীর দু' তরফ থেকে এইরূপ ধারাবাহিক 'উপলক্ষ্য' তৈরি ও 'সুযোগ' গ্রহণের সম্মিলিত ফল হয়েছিল এই, দেশে দু-আড়াই বছরের মধ্যে হাজার হাজার পরিবর্তন-আকাঙ্ক্ষী তরুণকে জীবন দিতে হয়। সমাজতন্ত্র ও শ্রেণিসংগ্রাম পুরোপুরি এক ভীতিকর বিষয় করে তোলা হয় জনসমাজে। নতুন এই পরিস্থিতি জাসদ, অন্যান্য বামপন্থী শক্তি, শেখ মুজিবুর রহমানসহ কেউই আসলে সামাল দিতে পারেনি বরং এ থেকে

---

৫২৩ যিনি তখন চট্টগ্রাম-উত্তর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। চট্টগ্রামের সেই সময়কার আরেক ছাত্রনেতা সাহাবউদ্দীন সাথী সাক্ষাৎকারে এই তথ্য প্রদান করেছেন।

৫২৪ দেখুন, মহিউদ্দিন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৮। খালেকুজ্জামানরা '১৭ মার্চ'-এর ঘেরাওকে অভিহিত করেছেন 'হঠকারী' এক পদক্ষেপ হিসেবে– যা জাসদকে 'গণবিচ্ছিন্ন' করে ফেলে। দেখুন, *জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জাসদ গড়ে ওঠার পটভূমি*, পূর্বোক্ত।

চূড়ান্ত 'সুযোগ' গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শক্তি, যারা পূর্ববাংলার যেকোনো ধরনের সমাজতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করার ঘোরতর বিপক্ষে ছিল এবং যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সংশ্লিষ্ট ছিল মুজিব বাহিনী গঠনে; এবং নতুন পরিস্থিতির স্রষ্টা ও আপাতদৃষ্টিতে প্রধান প্রধান প্রতিপক্ষ উভয়ে ছিল মুজিব বাহিনীজাত। এভাবে কার্যত '১৬ ডিসেম্বর'-এর আগে যেমন বিদেশি হস্তক্ষেপে স্বাধীনতা সংগ্রামকে 'অপহৃত' হতে দেখা যায়– ঠিক তেমনি '১৬ ডিসেম্বর'-এর পরে অপহৃত হয় সমাজতন্ত্রের সংগ্রামও। ফলে উপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোই জারি থাকে 'বাংলাদেশ' নামে; নতুন রূপে; আরও আক্রমণাত্মক আকারে; তবে পুরানো ঢঙে।

সেই সময়কার জাসদের গুরুত্বপূর্ণ নেতা আ স ম আবদুর রব অবশ্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৭ মার্চের ভূমিকার উপরিউক্ত ব্যাখ্যা মেনে নিতে একেবারেই প্রস্তুত নন। সুদূর নিউ ইয়র্কের সুপরিচিত বাংলা কাগজ সাপ্তাহিক ঠিকানায় নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তর রূপে তিনি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন :

> **ঠিকানা : অনেকে বলেন, স্বাধীনতার পরপর আপনারা জাসদ করলেন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে আন্দোলন করলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করলেন, কেউ কেউ মারা গেলেন– এ সবের কারণেই নৈরাজ্য সৃষ্টি হলো এবং বঙ্গবন্ধু মারা গেলেন–**
>
> আ স ম রব : রিলিফ, কম্বল, টিন এগুলো কি আমরা চুরি করেছিলাম? লুণ্ঠনের প্রতিবাদ হবে না? সম্পদ লুণ্ঠনের প্রতিবাদ করবে না জনগণ? প্রতিবাদের জন্য ইনিসিয়েটিভ লাগে। (১৭ মার্চ) আমরা ইনিসিয়েটিভ নিয়েছিলাম। অল্টারনেটিভ ছিল না। আমরা বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম– না মেরে ফেলার জন্য এটা করেছিলাম– সেই মোটিভ জানতে হবে। অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করার অর্থ হচ্ছে– অন্যায় থেকে বিরত রাখা। আপনি আরও অন্যায় করেন এবং ধ্বংস হয়ে যান তার জন্য তো প্রতিবাদ করা হয়নি।...[৫২৫]

মাঠপর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে তাড়া করতে তৎকালীন শাসক এলিটদের জন্য '১৭ মার্চ' ছিল এক তাৎপর্যময় উপলক্ষ– তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৭ মার্চের ঘটনার দুই দিন পর শেখ মুজিবুর রহমান মস্কো যান 'চিকিৎসার জন্য'। এই সফর ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যময় এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের আরেকটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। ক্ষমতায় থাকাকালে মুজিব ১৭ বার বিদেশ সফর করেছিলেন– তার মধ্যে মস্কো গিয়েছিলেন দু'দফা। সর্বশেষ

---

[৫২৫] বিস্তারিত দেখুন,
http://www.bostonbanglanews.com/index.php?options=com_content&view=article&id=14719%3A2012-08-19-10-42-39&catid=35%3A2010-10-11-16-49-55&Itemed=138

এই দফায় সেখানে তাঁর ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসা হয় এবং ২১ দিন পর ৯ এপ্রিল প্রথমে দিল্লি এবং তারও তিন দিন পর ঢাকায় ফেরেন তিনি। এসময় ঢাকায় মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিকে জাসদ কর্তৃক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওয়ের ঘটনার তীব্র সমালোচনা করতে দেখা যায়। ২২ মার্চ নিজস্ব মুখপত্র সাপ্তাহিক একতায় জাসদের ১৭ মার্চের কার্যক্রমকে তারা 'দেশদ্রোহীতামূলক' হিসেবে অভিহিত করে এবং 'জনগণের স্বার্থেই এর মোকাবেলা করা দরকার' বলে অভিমত ব্যক্ত করে।

এ পর্যায়ে উদীয়মান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সামাল দিতে শেখ মুজিব এক ধরনের ভারসাম্যের নীতি নিয়েছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়। জাসদের ঘেরাও আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্তে ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি পাকিস্তানও গিয়েছিলেন। তার আগের দিনই পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ভারসাম্যের এই নীতির মাঝে নানান স্ববিরোধী লক্ষণও ছিল। দিল্লি ও মস্কো সফর করার কিছুদিন পর তাজউদ্দীন আহমদকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হয়। আবার মুজিবের লাহোর সফরের কিছুদিন পরই প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতা সবুর খানকে গ্রেফতার হতে দেখা যায়। এসব বিপরীতমুখী পদক্ষেপ স্ববিরোধী বার্তা দিচ্ছিল। ফলে, অভ্যন্তরীণ ফ্রন্টে নিয়ন্ত্রণ হারাতে বসা মুজিবকে রক্ষায় প্রভাবশালী বহিঃশক্তিসমূহ কেউই এসময় শেষপর্যন্ত এগিয়ে আসেনি।

দেশের মানুষ এসময় বিক্ষুব্ধ না হলেও তাদের মাঝে অস্থিরতার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল। ৯ জুলাই ১৯৭৪ বাংলাদেশ অবজারভার রিপোর্ট করে, ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭৩-৭৪ সময়ে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেছে শতকরা ১৮৪ ভাগ। এসময়কার দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতির অসহনীয় ঊর্ধ্বগতি, তার কাঠামোগত উৎস ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে পরের উপ-অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে শুধু এটাই উল্লেখ করা হচ্ছে যে, মুজিব ইতোমধ্যে 'সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ' হিসেবে (১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ) শিল্প-ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি জাতীয়করণের যে নীতি ঘোষণা করেন তাতে ছিল প্রচণ্ড রকম বিভ্রান্তি।

প্রথমত, দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববাংলার শিল্পপতিদের উদ্যোগগুলো (যা ছিল এ অঞ্চলের শিল্পের প্রায় ৮৫ ভাগ) রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা হলেও ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো তা থেকে বাদ থাকে। যেমন বিশাল চা খাতে ব্রিটেনের নাগরিকদের বিনিয়োগ কোনোভাবে সরকারি হস্তক্ষেপের শিকার হয়নি।[৫২৬]

---

[৫২৬] উপরন্তু এসময় বঙ্গোপসাগরে তেল উত্তোলনের জন্য কয়েকটি বিদেশি কোম্পানিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়– যার মধ্যে ইউগোশ্লাভ ও জাপানি দুটি কোম্পানি ব্যতীত বাকি সব ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রিত অংশ ছয়ভাগ করে যেসব কোম্পানিকে ঐ সময় বরাদ্দ দেয়া হয় তার মধ্যে ছিল : এটলান্টিক রিচফিল্ড অয়েল কোম্পানি [যুক্তরাষ্ট্র], ইউনিয়ন অয়েল অব ক্যালিফোর্নিয়া [যুক্তরাষ্ট্র], এ্যাসল্যান্ড পেট্রোলিয়াম কোম্পানি [যুক্তরাষ্ট্র],

দ্বিতীয়ত, শিল্পপ্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করা মানেই যে সমাজতন্ত্র নয়– তা বোঝার পরও কেবল আওয়ামী লীগ নয়, কমিউনিস্ট পার্টি এবং ন্যাপ (মোজাফফর)ও তুমুল হর্ষধ্বনি তোলে এতে। *সমাজতন্ত্রের পথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ* হিসেবে মুজিব একদলীয় ব্যবস্থা ঘোষণা করলে এসব দল নিজ নিজ অস্তিত্ব বিলীন করে বাকশালে একীভূত হয়ে যায়। কিন্তু তথাকথিত এই সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপের পরও শোষণমূলক সামাজিক সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন দেখছিল না শ্রমজীবী মানুষ।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পর তা পরিচালনার জন্য এমন একদল নির্বাহীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় যাদের 'সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে ধারণা এবং আগ্রহ কোনটাই ছিল না। ফলে দ্রুত প্রতিষ্ঠানগুলো শিকার হয় অব্যবস্থাপনার। এতে দুই তিন দশকে গড়ে ওঠা এ জনপদের শিল্প ভিত (যার মধ্যে ছিল অন্যান্য অনেককিছুর পাশাপাশি ৭০টি পাটকল, ১৭টি চিনিকল, ৭২টি বস্ত্রকল, ৩টি কাগজকল এবং এমনকি তেলশোধনাগারও!) লোকসানে লোকসানে জাতীয় বোঝায় পরিণত হয় এবং সরাসরি তাতে লাভবান হয় কয়েকটি বিদেশী দেশ। মুজিব এক্ষেত্রে প্রচণ্ডভাবে ভুল পরামর্শের শিকার হন পরিকল্পনা কমিশনের তরফ থেকে।[৫২৭] তাঁকেই স্বাভাবিকভাবে এসবের অব্যবস্থাপনাজনিত দুর্নামের রাজনৈতিক দায়ভার বইতে হলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে নিম্নোক্ত উক্তিতে : '...যাকে যেখানে বসাই সে-ই চুরি করে। অবস্থাপন্ন ঘরের শিক্ষিত ছেলেদের বেছে বেছে নানা কলকারখানায় প্রশাসক বানালাম, দু'দিন যেতে না যেতে তারাও চুরি করতে শুরু করলো। যাকে পাই বলি আমি সৎ লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি।...'[৫২৮]

ক্যানাডিয়ান সুপিরিয়র অয়েল কোম্পানি [কানাডা], জাপান পেট্রোলিয়াম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন [জাপান] এবং ইনা-ন্যাপথালিন [হিউগোশ্লাভিয়া]। দেখুন, মফিজ চৌধুরী, *বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায়*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৭৮। মফিজ চৌধুরী ছিলেন ঐসময়কার জ্বালানিমন্ত্রী। যে কমিটির মাধ্যমে এই বরাদ্দ চূড়ান্ত হয় তাতে তাজউদ্দীন আহমদও সদস্য ছিলেন। মফিজ চৌধুরীর বিবরণ থেকে এও জানা যায়, উক্ত বরাদ্দকালে 'প্রোডাকশন শেয়ারিং' সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে 'সহায়তা' দিতে ভারতের জয়েন্ট সেক্রেটারি পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা এ দেশে এসেছিলেন।

৫২৭ এ সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত ও আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখুন, S. M. Ali, *After The Dark Night*, UPL, 1994, p. 108-29; Enayetullah Khan, *Properties : Abandoned and Otherwise*, Ibid, p. 353-55.

এ ছাড়া জাতীয়করণকৃত শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত দেখুন পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে। এ বিষয়ে করাচির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল এন্ড ইকোনমিক রিসার্চ-এর কিছু উপাত্ত রয়েছে সেখানে।

৫২৮ তৎকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবু ফজলের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় মুজিব উপরোক্ত মন্তব্য করেন। দেখুন, আবুল ফজল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে অদক্ষতা বিপজ্জনক সব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করে। যেমন ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বরে ঘোড়াশাল সার কারখানাটি অকেজো হয়ে গেলে দেশে ইউরিয়া উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে। ১৯৭৩-৭৪ সালে ইউরিয়া উৎপাদন হয় ২ লাখ ৬৯ হাজার টন। পরের বছর হয় মাত্র ৮২ হাজার টন।[৫২৯] কৃষি আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এতে। আবার বণ্টন ব্যবস্থার রাজনীতিকীকরণের ফলে ইউরিয়া আমদানি করেও পরে কৃষকদের কাছে সময়মতো পৌঁছানো যায়নি। অন্যদিকে পাট রপ্তানি কমে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি ছিল, ফলে প্রয়োজনীয় ইউরিয়া আমদানিও করা যায়নি।

আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায়, মুজিব শাসনামলে যে, 'সমাজতন্ত্র'-এর নামে এরূপ নানান অঘটন ঘটবে তা যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় দূতাবাস গোপন প্রতিবেদনের মাধ্যমে ১৯৭০-এর জানুয়ারিতেই পূর্বাভাষ আকারে ওয়াশিংটনে জানিয়ে দিয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, `nationalization' as conceived by the AL seems to us (local staff of USA) to mean `Bengalization' whereby West pakistani managers would be replaced by East Pakistanis and economic power would be shifted into local hands rather than controlled by `outsiders.'[৫৩০]

অর্থনৈতিক বিপর্যকর এই সময়টিতে মুজিব বাহিনীর যে অংশ প্রধানমন্ত্রীর পাশে শক্ত অবস্থানে ছিল তারা প্রভাব বিস্তারের আন্তঃসংগ্রামে পরস্পর রাজনৈতিকভাবেও শক্তিক্ষয়ে লিপ্ত হয়। বিশেষত এ সময় শেখ মণি ও তোফায়েল আহমেদের দ্বন্দ্বের ছাপ পড়ে ছাত্রলীগের সরকার সমর্থক অংশে। '৭৪-এর ৩০ মার্চ ছাত্রলীগ নাটকীয়ভাবে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে জনসভা করে দুর্নীতিবাজদের তালিকা প্রকাশ করে। ষাট ব্যক্তিকে তারা এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। এ সময় ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন মনিরুল হক চৌধুরী। তিনি ছাড়াও ঐ সভায় আরও বক্তৃতা করেন শফিউল আলম প্রধান, ইসমাত কাদির গামা, সওগাতুল আলম সেলিম ও ওবায়দুল কাদের। ওবায়দুল কাদেরই দুর্নীতিবাজদের তালিকাটি পাঠ করেছিলেন। সভায় বলা হয়, '২৯ এপ্রিলের মধ্যে দুর্নীতিবাজদের বিচার শুরু না হলে জনগণই তাদের বিচার করবে।'[৫৩১] উল্লেখ্য, এর কিছুদিন আগে (অক্টোবর) আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী মতিউর রহমানও মন্ত্রিসভার সদস্যদের ব্যাংক হিসাব ও সম্পদের বিবরণ প্রকাশের দাবি জানান। তবে

---

৫২৯ *ঘোড়াশাল সার কারখানা বিপর্যয় : মুষড়ে পড়েছিলেন বঙ্গবন্ধু*, দৈনিক বণিক বার্তা, ১৫ আগস্ট ২০১৩, http://www.bonikbarta.com/first-page/2013/08/15/12291#sthash.bqHcP9Gi.dpuf

৫৩০ Roedad Khan, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬৪।

৫৩১ দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ এপ্রিল ১৯৭৪, ঢাকা।

বিশেষভাবে ছাত্র অঙ্গ সংগঠনের দুর্নীতি বিরোধী নাটকীয় ভূমিকা ক্ষমতাসীনদের মাঝে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস তীব্র করে তোলে। অনেকে একে তোফায়েল আহমেদ ও ফজলুল হক মণি'র দ্বন্দ্বের প্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

আওয়ামী লীগে বরাবরই 'শক্তির উৎস' হলো ছাত্রলীগ। এসময় যুবলীগের পাশাপাশি শেখ মণি ছাত্রলীগেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। মুজিবের পাশে থাকা মুজিব বাহিনীর 'অবিচ্ছেদ্য চার'-এর অপরজন আবদুর রাজ্জাক তখন তোফায়েলের চেয়ে মণি'র কাছাকাছি। কিন্তু ছাত্রসংগঠনটির কর্তৃত্ব ছিল তখন শফিউল আলম প্রধানের হাতে এবং তিনি পরিচিত ছিলেন তোফায়েলপন্থী হিসেবে। ছাত্রলীগের উপরিউক্ত দুর্নীতি বিরোধী ভূমিকার এক সপ্তাহের মধ্যে (৪ এপ্রিল) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসীন হলে সাতজন ছাত্রলীগ কর্মী এক ব্রাশফায়ারে নিহত হন[৫৩২] এবং এই হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে শফিউল আলম প্রধান মিরপুর থেকে গ্রেফতার হন। এরপর ঢাকার স্পেশাল ৪র্থ ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার শুরু হয়। হত্যা মামলার বিচার চলাকালে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ (সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক) বিবৃতি দিয়ে শফিউল আলম প্রধানের পক্ষ নেয়। দুর্নীতি বিরোধী জনমত গঠনের চেষ্টায় শফিউল আলম মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল। পুরো মুজিব শাসনামলে কেবল এই একটি আলোচিত হত্যাকাণ্ডই তদন্ত ও বিচারের আওতায় এসেছিল। শফিউল আলম প্রধানের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল বের হলে তাতে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা গ্রেনেড ছুড়ে মারে। এরপরই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় দীর্ঘদিনের জন্য। শিক্ষাঙ্গনে ভূমিকম্পের মতো সৃষ্ট এসব ঘটনাকে রাজনৈতিক মহল তখন বিবেচনায় নিয়েছিল মুজিব বাহিনীর সরকার সমর্থক অংশের পারস্পরিক বৈরিতার সশস্ত্র ফল হিসেবে।

উল্লেখ্য, মহসীন হল হত্যাকাণ্ডের জন্য শফিউল আলম প্রধান অভিযুক্ত হলেও ১৯৭৫ সালের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কয়েক মাস পর তিনি ছাড়া পান এবং এখনও তিনি দিব্যি রাজনীতি করে যাচ্ছেন দেশে। মহসীন হলে সাত ছাত্রলীগ কর্মী খুনের কয়েক মাস আগে ১৯৭৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রাতে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সঙ্গে আসাদ, শহীদ, মিন্টু ও মোশতাক নামে আরও চার যুবককে হত্যা করা হয়েছিল। এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী না হলেও ছাত্রলীগ কর্মী ছিল। এও ছিল মুজিব বাহিনীর একাংশের উপদলীয় কোন্দলের

---

৫৩২ নিহতরা হলেন নাজমুল হক কোহিনূর, মোহাম্মদ ইদ্রিস, সৈয়দ মাসুম আহমেদ, বশির উদ্দীন আহমেদ জিন্নাহ, আবুল হোসেন ও রেজোয়ানুল। নিহত হওয়ার পরদিন ছাত্রাবাসে এদের কক্ষ থেকেও বিপুল অস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল।

জের।[৫৩৩] উপরোক্ত দুটি ঘটনা দেশের প্রধান শিক্ষাপীঠের পরিবেশকে তীব্রভাবে ভীতিকর করে তোলে। অন্যদিকে এসময় শেখ মণি'র বিরুদ্ধে বিশেষত ঢাকাকেন্দ্রিক আওয়ামী পরিমণ্ডলে গাজী গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে আরেকটি উপদলের জন্ম হয়েছিল।[৫৩৪] রেডক্রসের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগরীর রাজনীতিতে তিনি তখন প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। শাসকদলের একেবারে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে এসব কোন্দল যে কতটা পারস্পরিক আস্থার সংকট তৈরি করে তার একটি নজির পাওয়া যায় রক্ষীবাহিনীর তখনকার উপ-পরিচালক সারোয়ার মোল্লার সাম্প্রতিক এক ভাষ্যে।[৫৩৫] যেখানে তিনি জানাচ্ছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানকারী শক্তি যখন শেখ মণি'র বাসায় আক্রমণ করে তখন (ঐ বাসার বাসিন্দাদের তরফ থেকে) ধরে নেয়া হয়েছিল এটা রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা করছে। উল্লেখ্য, তখন এটাই অনুমিত হতো যে, রক্ষীবাহিনীর প্রতি প্রশাসনিক নির্দেশনা আসত প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হিসেবে তোফায়েল আহমদের মাধ্যমে।

যুদ্ধোত্তর এই সময়টিতে Super-autonomous কাঠামো হিসেবে মুজিব বাহিনীর নতুন অবয়বে বিস্তৃতি যেমন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বহুমুখী বিভেদ, অবিশ্বাস ও সংঘাতের জন্ম দেয় তেমনি Supra-authority হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন-এর ভূমিকাও রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের মাঝে ব্যাপকভিত্তিক অবিশ্বাস ও বৈরিতার সৃষ্টি করেছিল। দ্বন্দ্ব ও বিভেদ সৃষ্টিকারী এই দুটি ভরকেন্দ্রই আবার

---

৫৩৩ এই তরুণরা খুন হন শামসুন নাহার হলের পার্শ্ববর্তী শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায়। এ ঘটনায় চারজন মারা গেলেও ইদ্রিস নামে একজন আহত অবস্থায় বেঁচে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. বি. ওয়াজিউর রহমানের স্ত্রী বিলকিস রহমান– যিনি তখন দ্য মর্নিং নিউজ পত্রিকায় কাজ করতেন, উল্লিখিত ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে পত্রিকায় মতামত প্রকাশের কারণে সরকারি চাপে মর্নিং নিউজ থেকে চাকুরিচ্যুত হন তিনি। তবে ১৯৭৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আহত ইদ্রিসের জবানিতে দ্য মর্নিং নিউজে এই হত্যাকাণ্ডের নায়কদের সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়লে তা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী অনেকের জন্য বিব্রতকর হয়ে ওঠে। বিস্তারিত দেখুন, Mahfuz Ullah, *Ibid*, p. 100.

৫৩৪ গাজী গোলাম মোস্তফা ছিলেন আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগরী শাখার সভাপতি। রেডক্রস নামক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসেবে যুদ্ধোত্তর সময়ে পুনর্বাসন কাজে এবং বিশেষভাবে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় জনাব মোস্তফার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত। প্রচুর বিদেশি সহায়তা আসছিল তখন রেডক্রসের মাধ্যমে। কিন্তু অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির প্রচুর অভিযোগ উঠে প্রতিষ্ঠানটির বিপক্ষে। এর বাইরে গোলাম মোস্তফা বিশেষভাবে পরিচিতি পান তৎকালীন এক সামরিক কর্মকর্তা মেজর শরীফুল হক ডালিম ও তাঁর স্ত্রী নিম্মীকে ঢাকার লেডিস ক্লাব থেকে অপহরণের ঘটনায় সংশ্লিষ্টতার কারণে। উল্লেখ্য, ডালিমও বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত– ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানে ভূমিকার কারণে।

৫৩৫ *আমি সারোয়ার বলছি*, অষ্টম কিস্তি, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৮ নভেম্বর ২০১২, ঢাকা।

আবর্তিত হচ্ছিল সমাজতন্ত্রের উচ্চকিত শ্লোগানকে ব্যবহার করে এবং তার ভীতিকর রূপটি একেবারে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয় ১৭ মার্চের সংঘর্ষমূলক ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে। জাসদেরই একটি ভিন্ন মতাবলম্বী গ্রুপ[৫৩৬] পরে দলটির ১৭ মার্চের কর্মসূচি মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলে,

---

[৫৩৬] লক্ষীপুর *খোলাচিঠি গ্রুপ* নামে এই ভিন্নমতালম্বীরা বিশেষ পরিচিতি পান। ১৯৮১ সালের জুলাইয়ে গ্রুপের পক্ষে আ ও ম শফিক উল্যা, মোহাম্মদ মহিউদ্দীন বি এ., আতিকুর রহমান, আলমগীর কবির, ওমর ফারুক, মোহাম্মদ ইসমাইল ও মতিউর রহমান খান 'জাসদ-বাসদের ভ্রান্ত, দোদুল্যমান ও বিভ্রান্তিকর রাজনীতি প্রসঙ্গ' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেখান থেকেই উপরোক্ত উদ্ধৃতি দেয়া হলো, পৃ. ৩০-৩১।

জাসদ কেন ১৭ মার্চের কর্মসূচি নিয়েছিল– যা কার্যত উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া মনে হয়েছে, তার একেবারে ভিন্ন একটি বিশ্লেষণ দিয়েছেন সেই সময়কার জাসদপন্থী শ্রমিক লীগের নেতা মেসবাহ্উদ্দীন আহমেদ– ২০১২ সালের ৩১ অক্টোবর বর্তমান লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। তাঁর মতে 'সেই সময়কার দুটি ঘটনা হয়তো জাসদ নেতৃবৃন্দকে এভাবে দ্রুত *একটা কিছু করার* দিকে *ঠেলে* দিয়ে থাকবে। একটি ঘটনা ছিল ঢাকায় ভুট্টোকে নিয়ে জনতার উচ্ছ্বাস এবং অপরটি ছিল দাউদ হায়দারের একটি কবিতা নিয়ে দক্ষিণপন্থীদের মিছিল-সমাবেশ। এই দুটি ঘটনায় মনে হয়ে থাকতে পারে, মুজিববিরোধী জনমত যে কোনোভাবে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে নিতে পারে। তাই জাসদ দ্রুত আন্দোলনকে একটা উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে উচ্চাভিলাষী হয়ে থাকতে পারে।' মেসবাহ্উদ্দীন এও জানান, গণবাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্তটি জাসদের র‍্যাংক এন্ড ফাইলের সর্বব্যাপক কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না– কেন্দ্রীয় অর্গানাইজিং কমিটির মতামতে এ কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। বলা হচ্ছিল, 'আত্মরক্ষা এবং প্রতিরোধ করা না গেলে কর্মীদের ধরে রাখা যাবে না।' মেসবাহউদ্দীন বর্তমানে রাজনৈতিকভাবে গণফোরামের সঙ্গে আছেন, তবে নিষ্ক্রিয়।

[উল্লেখ্য, 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায় কালো বন্যায়' শীর্ষক কবিতাটির জন্য তীব্র জনঅসন্তোষ দেখা দিলে দাউদ হায়দারকে সরকার কলকাতাগামী একটি বিমানে তুলে দিয়েছিল ১৯৭৪ সালের ২১ মে। বিস্তারিত দেখুন,
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A6_%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0 [reterived on 20th Feb. 2013.]

জাসদের কুমিল্লাকেন্দ্রিক অন্যতম জাতীয় নেতা হাবিবুল্লাহ চৌধুরীও মেসবাহউদ্দীনের মতো জাসদের অভ্যন্তরে সমরবাদিতা বিকশিত হওয়ার পেছনে নিজস্ব কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন বর্তমান লেখককে। যার মধ্যে ছাত্রলীগের জাসদ-বিরোধী অংশের উচ্ছৃঙ্খলতা ও আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গির কথা বলেন তিনি। ১৯৭২-এর ৪ জানুয়ারি ঢাকায় সচিবালয়ের সামনে থেকে সুপরিচিত মুক্তিযোদ্ধা স্টুয়ার্ট মুজিবের অপহরণকে তিনি সেই সময়কার একটি ভয় ছড়ানো ঘটনা হিসেবে তুলে ধরেন। স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান [জন্ম : ১৯৪০] ছিলেন আগরতলা মামলার ৩ নং আসামি এবং মুক্তিযুদ্ধকালে মাদারিপুর অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা কমান্ডার। এর প্রায় দুই সপ্তাহ আগে ফরিদপুর অঞ্চলের আরেকজন খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমানকেও একইভাবে হত্যা করা হয়। হাবিবুর রহমান ছিলেন আগরতলা মামলার আসামি কমান্ডার মোয়াজ্জেমের অন্যতম সহযোগী এবং নৌবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য। ১৮ ডিসেম্বর তাঁকে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ বিজয় দিবসের মাত্র দু'দিন পর।

'ঘেরাও আন্দোলনের এই ব্যর্থ কর্মসূচিটি ছিল মূলত জাসদ রাজনীতির নিছক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রথম উন্মত্ত প্রচেষ্টা। মুজিবী দুঃশাসন ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ জনগণকে সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে– বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা একটি বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত করার বদলে– বিক্ষুব্ধ, অসচেতন ও নেগেটিভ সমর্থনদানকারী হাজার হাজার জনতাকে উত্তেজিত করে ঘেরাও অভিযানে ঠেলে দেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়?...১৭ মার্চের কর্মসূচিটি সঠিক অর্থে বিপ্লবীকর্ম নয়। বড় জোর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের একটি ব্যর্থ কর্মকাণ্ড– যা সফল হলে একটি নব্য ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রশক্তির জন্ম দেওয়া ছাড়া আর কিছুই সম্ভব ছিল না।'

জাসদের মাঠ পর্যায়ের একজন নেতা সিরাজগঞ্জের আবদুর রউফ পাতার ভাষায়, 'আমরা ঐ দিন দলকে জনআন্দোলনের ধারা থেকে অস্ত্রের রাজনীতিতে নিয়ে গেলাম। ১৭ মার্চ না ঘটলে আমাদের জনসম্পৃক্তির ধারা অব্যাহত থাকত এবং তিয়াত্তরের নির্বাচনে না পারলেও পরের নির্বাচনে জনগণ আমাদের বিজয়ী করত। তিয়াত্তরে মানুষ আমাদের বলছিল, এবার তোমাদের দিচ্ছি না, পরেরবার দেবো। মুজিবকে তারা তখনও সময় দিতে চাইছিল।'[৫৩৭]

কেন্দ্রীয়ভাবে জাসদ নেতৃবৃন্দ অবশ্য এরূপ বিশ্লেষণ একেবারেই মানতে নারাজ ছিলেন। নিজস্ব তাত্ত্বিক মুত্রপত্র 'সাম্যবাদ'-এ তারা ঐদিনের ঘটনাকে তুলনা করে রাশিয়ার ১৯০৫ সালের ২২ জানুয়ারির 'রক্তাক্ত রবিবার', ১৯ ডিসেম্বরের স্টিল শ্রমিকদের মস্কো অভ্যুত্থান; চীনের ১৯১৯ সালের '৪ঠা মে আন্দোলন' এবং কিউবার বিপ্লবীদের ১৯৫৩ সালের মনাকাডা দুর্গ আক্রমণের সঙ্গে।[৫৩৮]

জাসদ আশা করেছিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে সৃষ্ট ঘটনাবলি একটা স্ফুলিঙ্গ ঘটাবে, বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে কয়েকজন ছাত্রের মৃত্যু যেমনটি ঘটিয়েছিল। কিন্তু ১৭ মার্চ নিহতের সংখ্যা বায়ান্ন সালের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ্যে তা পর্যাপ্ত আলোড়ন তোলেনি। এর চেয়ে, ১৯৭৩-এর মে মাসে মাওলানা ভাসানী যখন 'দ্রব্যমূল্য কমানো, দমননীতি বন্ধ করা এবং জানমালের নিরাপত্তা' সংক্রান্ত তিনদফা দাবিতে অনশন ধর্মঘটের মতো অহিংস কর্মসূচি পালন করছিলেন তখন মানুষ অধিক আগ্রহী হয়ে উঠেছিল বিরোধী দলের

---

৫৩৭ সিরাজগঞ্জে জাসদের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন তিনি। তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয় ঢাকায় ২০১২ সালের ১৬ নভেম্বর। সেসময় তিনি স্থানীয়ভাবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৫৩৮ বিস্তারিত দেখুন, সংযুক্তি *বারো*-এ।

প্রতি।[৫৩৯] কিন্তু জাসদের ১৭ মার্চের পর জনগণ ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। যে কারণে লক্ষ্য করা যায় ১৭ মার্চের হত্যালীলার প্রতিবাদে জাসদ আহুত পরের দিনের হরতাল পালিত হয় অবিশ্বাস্য নির্লিপ্ততা ও উদ্বেগের সঙ্গে। উপরন্তু এদিন সরকারি দলের কর্মীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঢাকায় বিশাল মিছিল করে জাসদকে শায়েস্তা করার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেয়। জাসদ কর্মীদের মোকাবেলায় এসময় দেশের প্রায় সকল জেলা শহরে ১৪৪ ধারা জারি হয়। তারপরও জাসদ নিজস্ব চলমান রণনৈতিক অবস্থানের পক্ষে ছিল দৃঢ়; তাদের ভাষায়,

> "১৭ মার্চের ঘটনা আকস্মিক ছিল না। এটা ছিল স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক বিকাশেরই অনিবার্য ধাপ। নিরস্ত্র জনতার ওপর খুনী মুজিব সরকারের সেদিনের গুলিবর্ষণ ২৫ মার্চের গণহত্যার সঙ্গে তুলনীয়। ২৯ দফা দাবিতে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনকে নস্যাৎ করাই ছিল সরকারের এই হঠকারি কাজের উদ্দেশ্য। এ ঘটনা বাংলাদেশের রাজনীতিকে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এটা উৎপাদন করতে বাধ্য সেই স্ফুলিঙ্গ– যা বিরাটকায় অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে। ১৭ মার্চ প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশের আজকের পরিস্থিতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সাধারণ হরতাল

---

[৫৩৯] মাওলানার অনশনকে ঘিরে সেসময় বিরোধী দলগুলোর মাঝে এক দফা ঐক্য গড়ে ওঠার পরিবেশ তৈরি হয়। সেসময় রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ২২ মে (১৯৭৩) সর্বদলীয় সভা ডাকা হবে। ২৯ মে থেকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে। কিন্তু শিগগির জাসদ এই ঐকমত্য থেকে বেরিয়ে যায়– যা অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে বিস্মিত করে। অন্যদিকে আওয়ামী কর্মী-সমর্থকরা সর্বদলীয় সভাটিও পণ্ড করে দেয়। মিছিল করে এসে তারা মাঠের সমাবেশস্থলে গুলি চালায়। জাসদ ও আওয়ামী লীগের এরূপ প্রতিক্রিয়ায় সে দফায় মাওলানার অনশন ব্যর্থ হয়। ১৫ মে শুরু করে ১৮০ ঘণ্টা অনশন শেষে সহকর্মীদের অনুরোধে তিনি নিজেই এক পর্যায়ে কর্মসূচি ত্যাগ করেন। ঐ সময় আরেকটি ঘটনার মাধ্যমেও রাজনৈতিক অঙ্গনে জাসদ অন্যান্য বাম দলের কাছে নিজেকে সন্দেহের বিষয় করে তোলে– তা হলো ১৯৭৩-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে। সে অবস্থার বিবরণ দিয়ে সাংবাদিক-রাজনীতিক নির্মল সেন লিখেছেন :

> সেসময় সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিলো নির্বাচন অবাধ হবে না। আওয়ামী লীগের সঙ্গে মূল সংঘর্ষ হচ্ছিলো জাসদের। তাদের অনেক প্রার্থী হাইজ্যাক হচ্ছিলো। কিন্তু মুস্কিল হলো জাসদ নির্বাচনের মাঠে থাকলে তা বর্জনের অবকাশ কোথায়? তাদের সেকালের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হতো নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করানোর জন্যই তারা মাঠে নেমেছে। জাসদ নেতৃবৃন্দ প্রতিদিনই হুমকি দিচ্ছিলেন, এ ধরনের আর একটি ঘটনা ঘটলে তারা নির্বাচন বর্জন করবে। কিন্তু এ ধরনের বিবৃতি দিয়েই তারা নির্বাচনপর্ব পার করে দিলেন।... দেখুন, নির্মল সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮৬-৮৭।

তবে একই বিষয়ে জাসদের ব্যাখ্যা ছিল, *সামাজিক বিপ্লবের পক্ষে জনমত গঠন ও সংগঠনকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে* তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে। দেখুন, জাসদের প্রথম কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্মেলনে আহ্বায়ক কমিটির বক্তব্য, সংযুক্তি *এগারো*।

সংগ্রামের স্বাধীন ও প্রধান ধরন হিসেবে প্রায় অচল।...বিপ্লবী অভ্যুত্থান একটি আর্ট, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাহসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আক্রমণ।"[৫৪০]

এসব উত্তেজক বক্তব্য ফ্যাসিবাদকে প্রায় আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছিল বলা যায়। কিন্তু সেদিনের বাস্তবতা প্রমাণ করে, জাসদ সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর পাল্টা আঘাত মোকাবেলা করতে পারেনি। রাজনীতির নিরস্ত্র পথে বস্তুত তা সম্ভবও ছিল না। সরকারপন্থী প্রধান দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ (রক্ষীবাহিনী ও যুবলীগ) ছিল প্রকাশ্য কিংবা পরোক্ষে সশস্ত্র। তাছাড়া আওয়ামী লীগের ছিল তৃণমূল পর্যন্ত শক্তিশালী এক সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক। পাল্টা আক্রমণ সামাল দিতে তাই প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসেবে 'গণবাহিনী' গড়ে তোলার কাজে পুরো শক্তি নিয়োজিত করে জাসদ। এসময় চারজন নেতা– হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, কাজী আরেফ আহমেদ ও মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনি নামে যিনি পরিচিত ছিলেন) বিশেষভাবে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন দলের সাংগঠনিক পরিসরে। গণবাহিনীর কাণ্ডারি ছিলেন তাঁরা। এভাবে দলে নতুন একটি প্রভাবশালী উপদল তৈরি হয়। কেউ কেউ যে আবার শ্লেষ সহকারে এদের 'গ্যাং ফোর' হিসেবে অভিহিত করতেন সে বিষয়টি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিপরীতে 'গণনেতা' রব-জলিল-শাজাহান সিরাজের আবেদন ও ভূমিকা খর্ব হয়ে পড়ে। এসময় নিজস্ব তাত্ত্বিক মুখপত্র 'সাম্যবাদ'-এর দ্বিতীয় সংখ্যাতে জাসদ মাও সেতুঙকে উদ্ধৃত করে ঘোষণা দেয়– দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা চলছে– *এখানে সংগ্রামের প্রধান রূপ হচ্ছে যুদ্ধ আর সংগঠনের প্রধান রূপ হচ্ছে সৈন্যবাহিনী।*[৫৪১] জাসদ কর্মীদের শ্লোগানগুলোও তখন পাল্টে যায়; জঙ্গী হয়ে ওঠে। আগে শ্লোগান ছিল : 'সংগ্রাম সংগ্রাম শ্রেণীসংগ্রাম'; 'জনগণের মন্ত্র– বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'

---

৫৪০ ১৭ মার্চ সম্পর্কিত ঘটনার বিষয়ে জাসদের তৎকালীন পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, 'সাম্যবাদ' (প্রথম সংখ্যা)। পত্রিকাটিতে প্রকাশকাল, সম্পাদকীয় কার্যালয় ইত্যাদির কোন উল্লেখ ছিল না। সাম্যবাদের প্রথম সংখ্যা পুরোটাই প্রকাশিত হয় '১৭ মার্চের বিপ্লবী শিক্ষা' শিরোনামে দীর্ঘ এক লেখা নিয়ে। সংযুক্তি : *বারো*।

৫৪১ 'সাম্যবাদ'-এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি পুরোপুরি গণবাহিনী গঠন ও এর অভিযানকেন্দ্রিক দার্শনিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিকের ওপর আলোকপাত করে প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যাতেও প্রকাশকাল, সম্পাদকীয় কার্যালয় ইত্যাদির উল্লেখ ছিল না। দেখুন, সংযুক্তি *তেরো*।

উল্লেখ্য, ১৭ মার্চের সৃষ্টি এবং সাম্যবাদের দ্বিতীয় সংখ্যার উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জাসদের তখনকার একজন জ্যেষ্ঠ নেতা হাবিবুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'জাসদের অভ্যন্তরীণ একটি গোষ্ঠী সচেতনভাবে এসব করেছে। তারা চেয়েছিল একটা কিছু ঘটিয়ে গণসংগঠনের নেতাদের জেলে ঢোকার পটভূমি তৈরি করতে এবং সশস্ত্র শ্রেণিভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলতে। কিন্তু শেষোক্ত কাজে যাদের নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয় তাদের গণসংগঠনের কাজের অভিজ্ঞতা ছিল অতি নগণ্য। ফলে দ্রুত তারা পুরো কার্যক্রমকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।' *পূর্বোক্ত*।

ইত্যাদি। গণবাহিনীর কার্যক্রম শুরুর পর শোনা যেতে থাকে : 'রাইফেলের বিরুদ্ধে রাইফেল তুলে নাও– এলএমজির বিরুদ্ধে এলএমজি তুলে নাও'; 'শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল সন্ত্রাস ছড়িয়ে দাও' ইত্যাদি শ্লোগান।

এইরূপ জঙ্গী পরিস্থিতির প্রধান এক শিকার ছিল জাসদ-ছাত্রলীগ নিজেই। 'যেহেতু গণবাহিনীতে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ ছিল না সে কারণে গণসংগঠনগুলোর সদস্যদের মধ্যে থেকে গণবাহিনী গড়ে উঠতে লাগল। এভাবে গণসংগঠনগুলোর অপমৃত্যু ঘটতে শুরু করল।'[৫৪২] তখনকার ছাত্রনেতা মাহমুদুর রহমান মান্নার ভাষায় 'ছাত্র সংগঠনের কাজ বাদ দিয়ে গোপন ও সশস্ত্র কাজে যোগ দেওয়ার হিড়িক পড়ে যায় প্রচণ্ড উদীয়মান এই সংগঠনে।... বছর তিনেক পরে যখন এই উত্তেজনা থামল তখন তাদের বিপ্লবের অগ্নিশিখার তেমন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।'[৫৪৩] লক্ষ্যণীয়, ১৯৭২-এ জাসদ ছাত্রলীগের আবির্ভাব দেশের ক্যাম্পাসগুলো ছাত্র ইউনিয়নকে অপ্রাসঙ্গিক করে ফেলেছিল। আর ১৭ মার্চকে উপলক্ষ করে ধীরে ধীরে একই পরিসরে ছাত্রলীগকেও বিধ্বস্ত করে দেয় রাষ্ট্র। এভাবেই কার্যত অবসান ঘটে শিক্ষাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজতান্ত্রিক প্রজন্মের।

১৭ মার্চ সৃষ্ট গণবাহিনীর আরেকটি অভিপ্রকাশ দেখা যায় এ সময় সেনাবাহিনীতে। সে সম্পর্কেও এ পর্যায়ে কিছু আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে। বস্তুত জাতীয় পরিসরে দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরপর জাসদ সেনাবাহিনীতে বিস্তার কার্যক্রম শুরু করেছিল। সেনাবাহিনীতে ঐ কার্যক্রম শুরু হয় গণবাহিনীর শাখা হিসেবে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র মাধ্যমে। যে তৎপরতার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে আমরা দেখবো পঁচাত্তরের নভেম্বরে 'সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান।'[৫৪৪] এ পর্যায়ে জাসদ রাজনীতিতে, বিশেষত এর সামরিক শাখা হিসেবে গণবাহিনীর

---

৫৪২ ১৯৭৯ সালের ১৮ মার্চ প্রকাশিত জাতীয় কমিটির আত্মসমালোচনামূলক দলিল, যার শিরোনাম ছিল 'শুধু সদস্যদের জন্য।' পৃ. ২১-২২। মাহমুদুর রহমান মান্না সম্প্রতি এক লেখায় উল্লেখ করেছেন, আত্মসমালোচনামূলক ঐ দলিলটি ছিল তাঁর লেখা এবং একপর্যায়ে জাসদের কয়েকজন নেতা এর প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মিথ্যা ইতিহাসের ওপর জাতি দাঁড়াতে পারে না, *পূর্বোক্ত*। মান্নার এই বক্তব্যও বিস্ময়কর। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সহ-সভাপতি হিসেবে তিনি তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জাসদের সাংগঠনিক কেউ নন– অথচ তাঁকেই লিখতে হচ্ছে জাসদের আত্মসমালোচনামূলক দলিল। বিষয়টি আরও করুণ হয়ে ওঠে– যখন আত্মসমালোচনামূলক এই দলিল লেখার কারণে মান্নাকে বহিষ্কার করা হয় এবং এই বহিষ্কারাদেশকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ভেঙে যায়।

৫৪৩ মাহমুদুর রহমান মান্না, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১। 'গণবাহিনী গঠন থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় সবকিছুকে আমি তখন হঠকারি বলে উল্লেখ করেছিলাম'– দাবি করেছেন মান্না সাম্প্রতিক এক লেখায়। *পূর্বোক্ত*। তবে মান্না নিজেও গণবাহিনীর ময়মনসিংহ এলাকার নজরদারির দায়িত্বে ছিলেন সেসময়।

৫৪৪ এই অভ্যুত্থানের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আলতাফ পারভেজ, *পূর্বোক্ত*।

কার্যক্রমে ব্রাজিলের মার্কসবাদী বিপ্লবী কার্লোস ম্যারিগেল্লার ভাবাদর্শিক প্রভাব সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোকপাত করা দরকার।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে ইতঃপূর্বে জাসদ রাজনীতির পুরোপুরি সামরিক রূপ পরিগ্রহ করার আত্মগত ও বস্তুগত পটভূমি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় জাসদ, সামান্য ব্যতিক্রম বাদে– পুরোপুরি গণবাহিনী গঠনে অনুমোদন দিয়েছিল। কিন্তু সামরিক এই শাখার বিকাশের ধরন সম্পর্কে এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল সংগঠকদের সঙ্গে দলটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভাবনার দূরত্ব ছিল বলেই প্রতীয়মান হয়।[৫৪৫] তবে রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলি এত দ্রুত এগোচ্ছিলো এবং হাতে অস্ত্র থাকায় গণবাহিনীর সদস্যরা তাতে এত তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিচ্ছিলো যে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাতে লাগাম টেনে ধরার কোনো সুযোগই পাননি– যদিও সেরকম কোনো ইচ্ছা তাঁদের ছিল কি না তারও প্রমাণ মেলে না। এসময়ই গণবাহিনীর ঢাকাকেন্দ্রিক মূল নেতৃত্বে কার্লোস ম্যারিগেল্লার 'মিনিম্যানুয়েল অব দ্য আরবান গেরিলা' শীর্ষক গ্রন্থের চর্চা লক্ষ্য করা যায়। গণবাহিনী এসময় নিজেই এইরূপ একটি ম্যানুয়েল তৈরি করে তরুণ গেরিলাদের প্রদান করে। কিন্তু কার্যত তা ছিল কার্লোস ম্যারিগেল্লার তৈরি মূল ইংরেজি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ মাত্র।

১৯১১ সালে জন্ম গ্রহণকারী ম্যারিগেল্লা মূলত ছিলেন ব্রাজিলের কমিউনিস্ট পার্টি Partido Comunista Brasileiro – PCB এর সদস্য। কিন্তু পরে ভিন্নমতের জন্য তাঁকে দলটি বহিষ্কার করে। এরপর ম্যারিগেল্লা ও তার অনুসারীরা Ação Libertadora Nacional (ALN) নামে আরেকটি দল গঠন করেন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ এর মাঝে যখন এসব ঘটছে তখন দক্ষিণ আমেরিকাসহ বিশ্বজুড়ে কিউবার বিপ্লব ও চে গুয়েভারার বিপুল প্রভাবের মাঝেই ম্যারিগেল্লা তাঁর মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে 'মিনিম্যানুয়েল'-এর মাধ্যমে নতুন যে তত্ত্ব দেন তা হলো, র‍্যাডিক্যাল ধারায় সমাজ রূপান্তরের জন্য শহরভিত্তিক গেরিলাযুদ্ধ হলো সঠিক রণকৌশল। এর মাধ্যমেই কেবল দ্রুত বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর করে দেয়া যায়। প্রকাশের পরপর উপরোক্ত 'মিনিম্যানুয়েল' রেডআর্মি, বাস্ক ইটিএ, আইরিশ রেভ্যুলুশনারী আর্মি ইত্যাদি বিশ্বের ঝাঁঝাঁলো সব গেরিলা দলের বাইবেল হয়ে ওঠে। ম্যারিগেল্লার শহরভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বে অপহরণও এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচ্য। ম্যারিগেল্লা[৫৪৬] ও তার

---

৫৪৫ পিটার কাস্টার্সের সাক্ষাৎকার থেকে। পিটার ইতিহাসের ঐ সময়টিতে ঢাকায় গণবাহিনীর সংগঠকদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। যদিও গণবাহিনীর সামরিক কৌশল ও জাসদের রাজনৈতিক রণনীতি সম্পর্কে তাঁর ভিন্নমত ছিল বলে দাবি করেছেন তিনি। এ বিষয়ে ২০১৩-এর মার্চে গৃহীত পিটারের সাক্ষাৎকার দেখুন সংযুক্তি : *আঠারো*-তে।

৫৪৬ ১৯৬৯ সালের ৪ নভেম্বর গোপন অ্যামবুশ থেকে ম্যারিগেল্লাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

অনুসারীরা ১৯৬৯-এ ব্রাজিলের রাজধানীতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত Charles Burke Elbrick-কে ৭৮ ঘণ্টার জন্য অপহরণ[৫৪৭] করে কেবল যে বিশ্বব্যাপী একদফা হই-চই ফেলে দিয়েছিলেন তাই নয়– অন্যান্য গেরিলা দলগুলোর জন্যও এটা ছিল পথপ্রদর্শনমূলক। গণবাহিনীর সদস্যরাও অনুরূপ ভাবাদর্শিক অবস্থান থেকে ১৯৭৫ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকার ধানমন্ডিতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেনকে অপহরণ করে তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের। তবে সে উদ্যোগ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

এই ঘটনার পর জাসদ রাজনীতি সম্পর্কে কেবল যে সাধারণ জনগণ ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তাই নয়– জাসদ পরিবার নিজেও এইরূপ কার্যক্রমের রাজনৈতিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্ববিরোধী ভূমিকা নেয়।[৫৪৮] সে সময় ঢাকা মহানগর গণবাহিনীর সামরিক প্রধান ছিলেন লে. কর্নেল আবু তাহেরের ভাই আনোয়ার হোসেন। আর তাহেরের আরেক ভাই আবু ইউসুফ খান– যিনিও সাধারণভাবে গণবাহিনীর সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন, সমর সেনকে অপহরণ উদ্যোগের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন–

> 'আসলে মার্কিন দূতবাসের পরিবর্তে ভারতীয় দূতাবাসে আক্রমণ হয়ে যায়। এই সময় ফিলিস্তিনের বীর রমণী লায়লা খালেদ

---

৫৪৭ এই অপহরণ কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই ১৯৯৭ সালে Bruno Barreto তৈরি করেছেন বিখ্যাত মুভি 'Four Days in September.'

৫৪৮ ৬৬ বছর বয়সী সমর সেন ছিলেন বাংলাদেশে দ্বিতীয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। গণবাহিনীর ক্যাডারদের তরফ থেকে তাঁকে অপহরণ চেষ্টার পর ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে ভারতীয় বিমান সেনাদের পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ঐ অপহরণ চেষ্টার সময় সমর সেন ডান কাঁধে গুলীবিদ্ধ হন। দেখুন,
http://www.hindu.com/2003/03/12/stories/2003031201921300.htm (পর্যবেক্ষণ : ২০ এপ্রিল ২০১৩)। উল্লেখ্য, গণবাহিনীর ছয় সদস্যের একটি স্কোয়াড ঐ অপারেশন পরিচালনা করে– যাদের চার জন [সাখাওয়াত হোসেন বাহার, মীর নজরুল ইসলাম বাচ্চু, মাসুদুর রহমান ও হারুনুর রশীদ] সেখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। বাকি দু'জন (ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল ও সৈয়দ বাহালুল হাসান)-কে আটকের পর সামরিক আদালতে বিচার শেষে পাঁচ বছর করে সাজা দেয়া হয়। জাসদ পরে এই ঘটনাকে 'অবিপ্লবী' তৎপরতা হিসেবে অভিহিত করে এবং ঢাকা নগর গণবাহিনী থেকে আনোয়ার হোসেন অপসারিত হন। তবে আশির দশকে জাসদ ছাত্রলীগ প্রায়ই এই শ্লোগান দিয়েছে, 'বাহার-বাচ্চু-মাসুদ-হারুণ...দিকে দিকে জ্বালাও আগুন।' অন্যদিকে আহত হওয়ার পর '৭৬-এর নভেম্বরেই সমর সেনকে ভারত বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টিকালে সমর সেন জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন এবং বাংলাদেশের যুদ্ধে ভারতের ভূমিকার স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ সক্রিয়তা ছিল তাঁর। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর ওপর শারীরিক আক্রমণ ভারতের কূটনীতিক পল্লিকে চরমভাবে বিস্মিত ও বিচলিত করে। ২০১৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ৮৯ বছর বয়সে সমর সেন মারা গেছেন।

তরুণদের বিরাট অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন। আমাদের পার্টিতে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন রকম চিন্তা-ভাবনা ছিল। যদি বিপ্লব হয় তাহলে ডানপন্থীরা তো সহজে মানবে না, একটা প্রতিক্রিয়া হবেই। সেক্ষেত্রে করণীয় কী হবে? একটা ভাবনা ছিল মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে জিম্মি করে অবস্থা অনুকূলে নিয়ে আসতে হবে। সে লক্ষ্যে গণবাহিনীর ছেলেরা মতিঝিলের আদমজীকোর্টে মার্কিন দূতাবাসের ওপর বহুদিন নজরদারি করে। যখন আমরা সবাই এরেস্ট হয়ে গেলাম– তখন যারা এ কাজে জড়িত ছিল তাদের ভাবনা থেকে এ কাজটি (সমর সেনকে অপহরণ) হয়ে যায়।'[৫৪৯]

একটি মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক দল– যে দল 'বিপ্লবের স্তর' নির্ধারণ করেছে সমাজতান্ত্রিক এবং যে বিপ্লব হওয়ার কথা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে– তারা কতটা নিয়ন্ত্রণহীন রোমান্টিকতাবাদে ভুগত তার এক বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত বলা যায় ১৯৭৫ সালের ২৬ নভেম্বরের উপরোক্ত ঘটনাকে। উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্বাভাবিকভাবে তখনকার জাসদ রাজনীতির বহুমুখী দুর্বলতা আঁচ করা সম্ভব। উল্লেখ্য, আবু ইউসুফ খান নিজের এক ভাইকেও হারিয়েছিলেন ঐ ঘটনায়।

বিদেশি রাষ্ট্রদূতকে অপহরণ করে 'বিপ্লব' রক্ষা করার এমন হঠকারি চেষ্টা একটি দেশের জন্য যেমন তাৎক্ষণিক সংকট সৃষ্টি করে তেমনি সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকেও তা বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার মুখে ঠেলে দেয়। ঐ ঘটনার প্রতিক্রিয়া সামাল দিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সায়েমকে ফোন করতে হয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তাতেও যখন দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব কমছিল না তখন বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রতিনিধিদলকে ভারতে পাঠানো হয়।[৫৫০] বিচারপতি সাত্তার প্রেসিডেন্ট সায়েমের 'স্পেশাল এ্যাসিস্ট্যান্ট' হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। অন্যদিকে জেনারেল জিয়াউর রহমান পরিস্থিতি সামাল দিতে এ পর্যায়ে জাসদের প্রতি অতিকঠোর হয়ে ওঠেন। বিধ্বস্ত হয় গণবাহিনী।

জাসদ ও গণবাহিনীর একাংশের কার্যক্রমে শহরভিত্তিক সমরবাদ যে প্রবলভাবে আধিপত্য বিস্তার করে ছিল তার স্বাক্ষর সমর সেন অপহরণ অধ্যায়। 'শহরভিত্তিক গেরিলা অভিযানের কলাকৌশল' সম্পর্কে কার্লোস ম্যারিগেল্লার চিন্তার আলোকে ধারাবাহিক লেখা প্রকাশের দায়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৭-১ ধারাকে ব্যবহার করে ১৯৭৪ সালের জুলাইয়ের বিভিন্ন দিনে তৎকালীন সরকার জাসদের মুখপত্র গণকণ্ঠের অন্তত ১১টি সংখ্যা বাজেয়াপ্তও করেছিল।[৫৫১] কিন্তু

---

৫৪৯ আবু ইউসুফ খান বীরবিক্রমের সাক্ষাৎকার, *বিশেষজনের বিশেষ সাক্ষাৎকার*, সম্পাদনা : রোবায়েত ফেরদৌস ও ফিরোজ জামান চৌধুরী, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃ. ১৫০।

৫৫০ আবদুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১৯৫৩-৯৩*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৩৮৬।

৫৫১ Mahfuz Ullah, *Ibid*, p. 110.

তাতে দলটির অভ্যন্তরীণ উপরোক্ত সমরবাদ নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে কমই। এ ক্ষেত্রে জাসদের জন্য সবচেয়ে প্রাণস্পর্শী বিপর্যয় ছিল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক কুমিল্লার অধিবাসী মুক্তিযোদ্ধা নিখিল চন্দ্রের মৃত্যু। গণবাহিনীর বোমা তৈরির অন্যতম বিশেষজ্ঞ হিসেবে ১৯৭৪-এর ২৬ নভেম্বর আহুত হরতাল উপলক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে তৈরি বোমার উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে ঢাকার সায়েদাবাদ এলাকায় পুরো শরীরে অগ্নিদগ্ধ হন তিনি এবং তিন-চার দিন পরে মারা যান। ঠিক এক মাস পরেই দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়।

উল্লেখ্য, নগরভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধ বিকশিত করা গণবাহিনীর মুখ্যতত্ত্ব হিসেবে স্থান করে নেয়ার আরেকটি বস্তুগত পার্শ্ব-পটভূমি ছিল স্বাধীনতা-উত্তর সেনাবাহিনীতে জাসদের ব্যাপক যোগাযোগ। বিশেষত, সৈনিকদের মাঝে লে. কর্নেল আবু তাহের ও মেজর এম এ জলিলের বিপুল সংখ্যক অনুরাগী ছিলেন। এসব অনুরাগী সহযোগিরা মুজিব সরকারের প্রশাসনিক বিবিধ ব্যর্থতাকে পুঁজি করে সেনাবাহিনীর ভেতরে নিজস্ব যোগসূত্রের পরিধি আরও বাড়িয়ে নিতেও পেরেছিলেন। সেই যোগসূত্র থেকেই জাসদ গণবাহিনীর শাখা হিসেবে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কার্যক্রম বিকশিত করার সুযোগ পায়। তবে 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্মাড কোর তথা বেঙ্গল ল্যান্সারের সদস্য হাবিলদার বারীর বাসায় ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র জন্ম' বলে দাবি করেছেন এর জন্মকালীন সভাপতি নায়েক সুবেদার মাহবুবুর রহমান।[৫৫২]

সৈনিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহবুবর রহমান ছিলেন মূলত কাদের সিদ্দিকীর মুক্তিযুদ্ধকালীন বাহিনীর একজন সদস্য। আরেক নায়েক সুবেদার জালাল উদ্দিন আহমেদ ছিলেন সংস্থার সহ-সভাপতি এবং বিমানবাহিনীর কর্পোরেল ফখরুল আলম ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। গঠিত হওয়ার আগে থেকেই আবু তাহের ও এম এ জলিলের মাধ্যমে এই সংগঠনের মূল সংগঠকরা জাসদের কাছাকাছি ছিলেন।[৫৫৩] এভাবেই জাসদ পরিবারে মুজিব বাহিনী বহির্ভূত আরেকটি রাজনৈতিক-সামরিক ধারার মোটাদাগে অন্তর্ভুক্তি ঘটতে শুরু করে। 'তাহের ও জাসদের অন্যান্য নেতাদের, বিশেষ করে যারা সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য বা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন– তাদের সঙ্গে যেসব সৈনিকের যোগাযোগ ছিল, তাদের

---

৫৫২ দেখুন, মাহবুবর রহমান, *সৈনিকের হাতে কলম*, প্রকাশক : সংলাপ, জার্মানি, প্রকাশকাল : উল্লেখ নেই, প্রাপ্তিস্থান : আলীগড় লাইব্রেরি, ঢাকা। উল্লেখ্য, জিয়াউর রহমানের শাসনকালে মাহবুবুর রহমানসহ সাতজনকে ক্যানবেরা, মস্কো ও কুয়ালালামপুরের বাংলাদেশ দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরে (জুন, ১৯৭৮) মাহবুবুর জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। এই লেখার সময় (২০১৪ সালে) সেখানেই ছিলেন তিনি।

৫৫৩ নায়েক সুবেদার মাহবুব অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁর সঙ্গে জাসদ নেতা শাজাহান সিরাজের আগে থেকে পরিচয় ছিল– যেহেতু দু'জনই টাঙ্গাইলের অধিবাসী। দেখুন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩।

সংগঠিত করেই প্রাথমিকভাবে এই গোপন সংগঠন করা হয়।...১৯৭২ সাল থেকে জাসদের কর্মকর্তাদের অনেকের সঙ্গে অনেক জওয়ান, জেসিও, এনসিও ও সামরিক অফিসারদের যোগাযোগ ছিল।'[৫৫৪] প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত জাসদ নেতাদের সঙ্গে এসব সৈনিকদের বৈঠক হতো। পরে এম এ জলিল আটক হলে কর্নেল আবু তাহের এই সংগঠনকে বিস্তৃতি দেন এবং প্রশিক্ষিত করে তোলেন। সিরাজুল আলম খানও বিষয়টি পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টেই সৈনিক সংস্থার শাখা ছিল। তবে পদাতিক ব্যাটালিয়নগুলোতে এর প্রভাব কম ছিল। সাংগঠনিকভাবে এর বিস্তৃতি বেশি হয় সেনাবাহিনীর ল্যানসার, আর্টিলারী, সিগন্যাল ইউনিটগুলোতে এবং বিমান বাহিনীতে। সৈনিক সংস্থার সংগঠকদের মধ্যে অধিক অগ্রসরদের নিয়ে পাঠচক্রধর্মী নিয়মিত রাজনৈতিক আলোচনারও ব্যবস্থা করা হয় মূল দলের উদ্যোগে। বিভিন্ন সেনা ইউনিটে সৈনিক সংস্থার শাখাগুলোকে বলা হতো 'ফোরাম'। এই ফোরাম-এর সাংগঠনিক আদলটি ছিল পাকিস্তান শাসনামলে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে সিরাজুল আলম খানদের গড়ে তোলা 'নিউক্লিয়াস'-এর মতো। তবে নিউক্লিয়াসে যেভাবে বিশেষভাবে যাচাই-বাছাই করে সদস্য রিক্রুট করা গিয়েছিল সৈনিক সংস্থার ক্ষেত্রে তা করা হয়নি বা করা যায়নি। প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানকালে সৈনিকরা অনেক জেলায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে অনেক অবিপ্লবী কাজেও লিপ্ত হয়ে পড়ে– যা এই বিপ্লবের চরিত্র সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি ও শঙ্কা তৈরি করে। এমনকি রংপুর গণবাহিনীর সংগঠক অলোক সরকার এও বলেছেন, 'এক পর্যায়ে এই সৈনিকদের ক্যান্টনমেন্টে ফেরত পাঠানোই আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো।'

জাসদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের উপরোক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রাথমিক রাজনৈতিক ও সামরিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ইব্রাহিম লিখেছেন, 'এতে জাসদ হাতে লাঠি পায়, আর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা মাথার উপর ছাতা পায়।'[৫৫৫] গণবাহিনী গঠন ও মাঠ পর্যায়ে সশস্ত্র কার্যক্রমের পাশাপাশি সেনাবাহিনীতে অনুরূপ কাজে নামার ক্ষেত্রে তখন অগ্রসর ভূমিকায় ছিলেন আবু তাহের, ড. আখলাকুর রহমান ও হাসানুল হক ইনু। তবে ১৯৭৫-এর সাতই নভেম্বর সিপাই অভ্যুত্থানের ডাক দেওয়ার ক্ষেত্রে ড. আখলাকুর রহমান নিরুৎসাহী ছিলেন। বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানমূলক পরিস্থিতির জন্য জাসদের আরও অপেক্ষা করা উচিত বলে সেসময় তিনি মনে করতেন। তবে

---

৫৫৪ হায়দার আকবর খান রনো, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮০।

৫৫৫ মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, *মিশ্রকথন*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৮৯।

তাহেরের পীড়াপীড়িতে জাসদ সেদিন অনেকটা অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে সিপাহী অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্তের পেছনে ধাবিত হয়।[৫৫৬]

১৯৭৪-৭৫ এ জাসদ ছাড়াও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গেও সেনাবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের নানারূপ রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল। এসব যোগাযোগ ছিল বস্তুত মুক্তিযুদ্ধকালীন সম্পর্কেরই একধরনের ধারাবাহিকতা। কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন ও হায়দার আকবর খান রনোদেরও সেনাবাহিনীতে সংগঠন করার একটি উদ্যোগ ছিল।[৫৫৭] লে. কর্নেল জিয়াউদ্দীন-এর মাধ্যমে পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টিও অফিসার পর্যায়ে যথেষ্ট যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল। তবে তুলনামূলকভাবে জাসদের উদ্যোগের আদর্শিক ও রাজনৈতিক ধরন এবং ব্যাপকতা ছিল অন্যদের চেয়ে অনেক অগ্রসর ও কৃতিত্বপূর্ণ। বেসামরিক পরিসরে সংগঠন করার ক্ষেত্রে শ্রেণিচেতনার কঠোরতা মোটাদাগে এড়িয়ে গেলেও– সেনাবাহিনীতে মূলত 'উর্দিপরা কৃষক'দেরই দলবদ্ধ করছিল জাসদ। উপনিবেশিক আদলের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জওয়ানরা যে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের অংশ হিসেবে আমূল সংস্কারবাদী রাজনীতির এক অপরিহার্য মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে– জাসদের আগে বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রীরা আর কখনো এত সফলভাবে তা তুলে ধরতে পারেনি। আবু তাহের ও এম এ জলিল এক্ষেত্রে প্রকৃতই ব্যাপক সফলতা দেখিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বিপ্লবী রাজনীতিতে এরূপ সফলতার দ্বিতীয় কোনো নজির নেই।

গণবাহিনী ও বিপ্লবী সিপাহী সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে এসময় গণবাহিনীর ঢাকা শাখা পিটার কাস্টার্স নামে একজন বিদেশি নাগরিকের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছিল বলে জানিয়েছেন বাহিনীর নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য। ঢাকায় পিটারের অফিস ও বাসস্থান গণবাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করত। জাসদের রাজনীতি এবং গণবাহিনীর কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কৌতূহলোদ্দীপক ও রহস্যঘেরা এই পিটার কাস্টার্স অধ্যায়– আন্তর্জাতিক পরিসরে যিনি এখন একজন বামপন্থী পণ্ডিত হিসেবে সুপরিচিত।

১৯৪৯ সালে হল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী পিটার ছাত্রাবস্থায় পড়ালেখা করেছেন ঐ দেশের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বর নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের জনহপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন তিনি। সেখানে আন্তর্জাতিক আইন ও এশীয় সমাজ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন পিটার।

---

৫৫৬ আবু তাহের কীভাবে এবং কী পরিস্থিতিতে জাসদ নেতৃত্বকে সিপাহী অভ্যুত্থানে সম্মত হতে পীড়াপীড়ি করছিলেন সে আলোচনার জন্য দেখুন, মহিউদ্দিন আহমদ, তাহের-জিয়া ও ৭ নভেম্বরের সাতকাহন, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ জুন ২০০৩, ঢাকা।

৫৫৭ দেখুন, হায়দার আকবর খান রনো, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫৩-৫৪।

উচ্চতর অধ্যয়নকালে জনহপকিন্সে একদল মার্কসবাদী তাত্ত্বিকের সঙ্গে গভীর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল তাঁর। যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ছড়িয়ে পড়া ভিয়েতনামের যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় চে গুয়েভারার উত্থান ও মৃত্যুও এ পর্যায়ে পিটারকে বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি বিশেষ আগ্রহী করে তোলে। এসময় বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আমেরিকায় গড়ে ওঠা সংহতি আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে পিটার এদেশটি নিয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে তিনি প্রথম বাংলাদেশে আসেন এবং তিন মাস থাকেন। আমেরিকায় পরিচয় হওয়া এক বাংলাদেশি বন্ধুর ঢাকাস্থ কলাবাগানের বাসায় উঠেছিলেন সেবার তিনি। পিটারের বাঙালি সেই বন্ধু ছিলেন একজন বিখ্যাত আমলার ভাই এবং সিপিবি'র রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরে Revo Conti ছদ্মনাম নিয়ে সাংবাদিক পরিচয়ে আবারও বাংলাদেশে আসেন পিটার। এ পর্যায়ে সাংবাদিক পরিচয়ে থাকলেও মূলত বিপ্লবী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়াই ছিল তাঁর কাজের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে তিনি সারা দেশ ঘোরেন এবং এখানকার সমাজ কাঠামোর ওপর কয়েকটি 'দলিল' প্রস্তুত করেন। এসময় বিশেষভাবে জাসদ ও সর্বহারা পার্টির কর্মীদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পথ-প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক সংলাপ হয় তাঁর। কিন্তু রণকৌশলগত ভিন্নতার কারণে ১৯৭৫-এর মাঝামাঝি তিনি ও তাঁর অনুসারীরা 'সর্বহারা ঐক্য আন্দোলন' নামে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক উদ্যোগ নিতে শুরু করেন এবং এ পর্যায়ে জাসদের সিপাহী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়াজনিত ধর-পাকড় শুরু হয় এবং পিটারও আটক হয়ে যান।

তবে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে কারাদণ্ড ও দেশ থেকে বিতাড়নের পরও স্থানীয় বামপন্থী শক্তিসমূহের সঙ্গে পিটারের নানান পর্যায়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ পিপলস্ সলিডারিটি সেন্টার (বিপিএসসি) নামে হল্যান্ডভিত্তিক একটি সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন তিনি। ইয়োরোপে বাংলাদেশ বিষয়ে তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের একটি শীর্ষ দৈনিকের সঙ্গে ইয়োরোপীয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন এবং দক্ষিণ এশীয় সমাজে ইসলামের সুফী ঘরানার প্রভাব বিষয়ে গবেষণারত।

জাসদ রাজনীতিতে পিটারের সম্পৃক্তির ধারণা এবং তাঁকে ঘিরে বাংলাদেশে জীবন্ত কৌতূহলের কারণে বর্তমান লেখক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কয়েক দফায় তাঁর বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সেই কথোপকথনে পিটার জানান, বাংলাদেশে 'বিপ্লবী পরিবর্তনে ভূমিকা রাখা'র লক্ষ্যেই তিয়াত্তর-চুয়াত্তরে ঢাকায় অনেক বামপন্থী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন তিনি। প্রাথমিকভাবে তিনি গণবাহিনী ও জাসদকে পৃথক সত্তা হিসেবেই মনে করতেন। সাক্ষাৎকারে পিটার স্বীকার করেন, কর্নেল তাহেরের সঙ্গে তাঁর 'বিশেষ সখ্যতা' গড়ে উঠেছিল। বললেন, 'তাঁকে আমার প্রকৃতই এক বিপ্লবী মনে হয়েছিল।' বাংলাদেশের বিপ্লবী

রাজনীতিতে সশস্ত্র সংগ্রাম গ্রামভিত্তিক হবে– না শহরভিত্তিক হবে এ নিয়ে তাঁদের মাঝে সুনির্দিষ্ট মতভিন্নতা থাকলেও পরস্পর তাঁরা নিজেদের সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, বাংলাদেশের 'বিপ্লবী পরিবর্তন' হবে গণঅভ্যুত্থানমূলক– চীনা ধাঁচের গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, যদিও চীনের মতোই প্রধানত গ্রামীণ ভূমিহীনরাই এখানে প্রলেতারিয়েত হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বিপ্লবেও এদের নির্ধারক ভূমিকা থাকবে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐকমত্যেরই ফসল ছিল গণবাহিনীর ঢাকা মহানগর শাখার সঙ্গে তাঁর পরোক্ষ যোগাযোগ। সেসময় গণবাহিনীর ঢাকা মহানগর কার্যক্রমে তাহেরের তিন ভাই সরাসরি যুক্ত ছিলেন। পিটার নগরভিত্তিক গণবাহিনীর এই যোদ্ধাদের বিভিন্ন উপায়ে সহযোগিতা করতেন। তবে এক সময় তাত্ত্বিক রণকৌশলগত ভিন্নতা তৈরি হলে তীব্র চাপ ও হুমকি সত্ত্বেও পিটার বাড়তি সহায়তায় আপত্তি করছিলেন।[৫৫৮] সিরাজুল আলম খান, ড. আখলাকুর রহমান এবং রব-জলিলের সঙ্গেও পিটারের পরিচয় ছিল। তবে জাসদের Mode of Production বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সঠিক নয় বলে মনে করতেন তিনি। তাঁর ভাষায়, 'গ্রামীণ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ নিয়েই আমাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। বিশেষ করে বিপ্লবী রূপান্তরে মাঝারি ও বৃহৎ কৃষকের ভূমিকা কী হবে এ বিষয়ে মতভিন্নতা ছিল।' অন্যদিকে গণবাহিনী সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'এর গঠনে জাসদের কেন্দ্রীয় যাঁরা অনুমোদন দিয়েছেন এবং বাস্তবে এটা যাঁরা পরিচালনা করতেন– তাঁদের উভয়ের সকল চিন্তা ও পরিকল্পনা এক রকম ছিল এমন বলা যাবে না। নেতৃত্বের ধরনেও পৃথকত্ব ছিল। কাজের ক্ষেত্রে *এডভেনচারিস্ট লাইন* প্রাধান্য পাচ্ছিলো।'

এরূপ উপলব্ধি থেকেই ঐসময় পৃথক একটি বিপ্লবী প্রক্রিয়ার গোড়াপত্তন করেছিলেন পিটার। গ্রামীণ বিভিন্ন জনপদে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমের

---

৫৫৮ সাতই নভেম্বরের সিপাই অভ্যুত্থানকে একটি ভুল ও অপরিণত পদক্ষেপ হিসেবে শনাক্ত করার কারণেও গণবাহিনীর সদস্যরা পিটারের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁকে এসময় তারা 'সিআইএ'র চর হিসেবে শনাক্ত করারও চেষ্টা চালান। গণবাহিনীর সদস্যরা বেশ হেনস্থা করেছিলের তখন তাঁকে। বাংলাদেশ নিয়ে পিটারের মাঝে বিপুল বিপ্লবী রোমান্টিকতা ছিল। জাসদ ও গণবাহিনীর মুষ্টিমেয় কর্মী সেই রাজনৈতিক আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে তাঁকে 'নানানভাবে ব্যবহার' করতে চেষ্টা চালিয়েছিল। বিষয়টি শেষপর্যন্ত ভয়ভীতি প্রদর্শনের পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। বিশেষ করে প্রত্যাশিত সহায়তা না পাওয়ায় ঢাকার ল্যাবরেটরি রোডে এক বাড়ির ছাদ থেকে ফেলে হত্যার হুমকিও দেয়া হয় তাঁকে। *ঘটনাস্থলে উপস্থিত গণবাহিনীর নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সদস্য লেখককে এই তথ্য জানিয়েছেন।* তবে বর্তমান লেখককে প্রদত্ত 'আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার'-এ পিটার গণবাহিনীর সদস্যদের কোনো ধরনের বস্তুগত সহায়তা প্রদানের বিষয় অস্বীকার করেন। দেখুন, সংযুক্তি *আঠারো*। উল্লেখ্য, পিটার গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁদের পরিচালনাধীন এনজিওটি [BOFE]-র তাবৎ সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

আড়ালে পিটারের কর্মীরা ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে তাদের এই কর্মসূচি শুরু করার কিছু দিন পরই দেশে পরপর তিনটি অভ্যুত্থান ঘটে এবং ১৯৭৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকার এলিফ্যান্ট রোড থেকে পিটার সহযোগীদের নিয়ে আটক হন।[৫৫৯]

উল্লেখ্য, নেদারল্যান্ড থেকে পিটার কাস্টার্স প্রথমে সাংবাদিক পরিচয়ে বাংলাদেশে আসলেও পরে বাংলাদেশে নিজ কার্যক্রমের অরাজনৈতিক আচ্ছাদন হিসেবে গড়ে তোলেন 'BOFE' (Bangladesh Organization for Functional Education) নামের একটি এনজিও। তবে যেমনটি বলা হয়েছে – বরাবরই বাংলাদেশের রাজনীতির বিপ্লবী রূপান্তরেই ছিল তাঁর মূল আগ্রহ। বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানমূলক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে গ্রামভিত্তিক ভূমিহীন কৃষকদের গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার বিষয়ে পিটারের দৃষ্টিভঙ্গিকে জাসদের গণবাহিনীর সংগঠকরা পারস্পরিক 'সম্পর্ক'-এর একটি ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সম্পর্ক বিকশিত হয়নি। গণবাহিনীর কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন এভাবে : 'রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার আগেই সামরিক ভিত্তি গড়ে তোলার যে চেষ্টা নেয়া হয়েছিল সেটা বিকশিত হওয়ার সুযোগ ছিল না; ভূমি ও কৃষি সংস্কারের সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচিও ছিল না তাদের।'

বলা বাহুল্য, তারপরও যে কোনো উপায়ে জাসদের রাজনীতির ঐ সময়কার সামরিক রূপ পরিগ্রহ করাকে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক নব অধ্যায় হিসেবে যেমন দেখার যথার্থতা রয়েছে তেমনি একে সংগঠন হিসেবে মুজিব বাহিনীর অভিপ্রকাশের একটি নতুন পর্যায় হিসেবে ব্যাখ্যারও সুযোগ রয়েছে। কারণ গণবাহিনীর মাধ্যমে জাসদ যে সশস্ত্রতার ডাক দিয়েছিল এবং তাকে প্রতিরোধের জন্য ভারতীয় প্রশিক্ষণে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে রক্ষীবাহিনী নামে ইতোমধ্যে যে কাঠামো গড়ে উঠতে দেখেছি আমরা– উভয়ে ছিল একই সাংগঠনিক সত্তার ঐতিহাসিক অংশীদার। এসময় গণবাহিনীর পেছনে যেমন বিশাল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও অভিলাষ নিয়ে কার্যরত ছিলেন সিরাজুল আলম খান তেমনি শেখ মুজিবুর রহমানকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা (২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪) এবং সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের

---

[৫৫৯] তাঁকে কীভাবে গোপন বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছিল সে বিবরণ দেখুন *সংযুক্তিতে* [আঠারো]। ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে পিটার কাস্টার্স বাংলাদেশের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, বর্তমান লেখকের নিজস্ব অনুসন্ধানে দেখা যায়– গোয়েন্দাদের হস্তগত পিটারের ডায়েরিতে এমন বহু নাম পাওয়া গিয়েছিল যাঁরা তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে পরিচিত হলেও তাঁর রাজনৈতিক উদ্যোগে শামিল ছিলেন না। যেমন বদরুদ্দীন উমর, এনায়েতুল্লা খান, ড. আনিসুর রহমান, ড. কামাল সিদ্দিকী প্রমুখের নামও পাওয়া গিয়েছিল পিটারের ডায়েরিতে। গোয়েন্দাদের নিগ্রহ থেকে বাঁচতে উপরোক্ত ব্যক্তিদের অনেককে তখন দেশে-বিদেশে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। বর্তমান লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পিটার কাস্টার্স অবশ্য এসব বিষয়ে কথা বলতে অস্বীকার করেন।

মতো বিধ্বংসী সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম জায়গায় ছিলেন ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ। যা ধীরে ধীরে বাংলাদেশকে ১৯৭৫-এর মাঝামাঝি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের এমন এক চূড়ান্ত অনিবার্যতার দিকে নিয়ে যায়– যা ছিল পুরোপুরি অস্বাভাবিক ধাঁচের এবং নবীন 'রাষ্ট্র'-এর অস্তিত্বই প্রায় বিপন্ন করে তুলেছিল তা।[৫৬০]

জাসদের অধীনে 'গণবাহিনী' নামে মুজিব বাহিনীর একটি অংশের নবতর বিকাশের কিছু পৃথক পটভূমিও এ পর্যায়ে উল্লেখের দাবি রাখে। ইতোমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি, স্বাধীনতার পর মুজিব বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্রসমপর্ণের বিষয়টি ছিল অনেকখানিই প্রতীকী। 'পরাজিত শত্রুরা আবার হামলা করতে পারে' এই যুক্তিতে শেখ মণি সমর্থক অংশ যেমন যুদ্ধোত্তর সমাজে তাদের সশস্ত্র সামর্থ্যের অনেকখানিই রেখে দিয়েছিল– তেমনি সিরাজুল আলম খান সমর্থক অংশও অস্ত্র ধরে রেখেছিল। শেষোক্তদের জন্য 'শত্রুর হামলার আশঙ্কা' ছিল বরং দ্বিমুখী। ফলে তারা অস্ত্র রক্ষা করা রাজনৈতিক কর্তব্য হিসেবেই নিয়েছিল। যেহেতু যুদ্ধের শেষপর্যায়ে এসে মুজিব বাহিনীতে প্রায় ৯০ ভাগ কর্মীই সিরাজ গ্রুপের সমর্থকে পরিণত হয় ফলে অস্ত্রও তাদের হাতেই ছিল বেশি। তাছাড়া রাজাকারদের থেকেও প্রচুর অস্ত্র পাওয়া যায় ১৬ ডিসেম্বরের পর। যুদ্ধের পর রাজনৈতিক মেরুকরণের পাশাপাশি অস্ত্রধারী এই কর্মীদের 'শৃঙ্খলার ভেতরে নিয়ে আসা' সিরাজ গ্রুপের নেতৃস্থানীয় সংগঠকদের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফলে সশস্ত্রতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার মাধ্যমে একটি বাহিনীর গোড়াপত্তনের কার্যক্রমটি তখন থেকেই শুরু হয়। মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষক ভূমিকার কারণে হাসানুল হক ইনু ও পাশাপাশি মার্শাল মনিকে এ কাজে নেতৃত্ব দিতে বলা হয়েছিল। তখন এও একটি দলীয় মৌখিক সিদ্ধান্ত ছিল– যারা অস্ত্রধারণ ও সংরক্ষণ করবেন তারা প্রকাশ্য রাজনীতির পরিচিতির জায়গায় থাকবেন না; উপরন্তু তারা অধিকতর শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন-যাপন করবেন। এভাবেই কোনো ধরনের বিপ্লবী তাগিদ ছাড়াই অনেকটা পরিস্থিতি দ্বারা চালিত হয়ে

---

৫৬০ ১৯৭৩-৭৫ সময়ের সংবাদপত্রগুলো লক্ষ্য করলে একটি গতানুগতিক সংবাদ চোখে পড়ে, তাহলো প্রায় প্রতিদিন ঢাকায় প্রচুর বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের কর্মাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ওয়াহেদ ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, সর্বশেষ ছয় মাসে কেবল ঢাকায় তারা ২ হাজার ৪৪টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন করেছেন। এই ধারাবাহিকতা দীর্ঘ কয়েক বছর অব্যাহত ছিল। প্রমাণ হিসেবে দেখা যায়, ১৯৭৫ সালের ২ জানুয়ারি *দৈনিক গণকণ্ঠে* একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল : *গতকাল আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম ঢাকায় আরও ২৫টি লাশ দাফন করলো*। এটা ছিল আর্থসামাজিক নৈরাজ্যের ভীতিকর এক প্রকাশ– যদিও নিয়মিত তখন এরূপ সংবাদ দেখা যেত।

জাসদকে একটি সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনা শুরু করতে হয়। 'গণবাহিনী' নামটিও চূড়ান্ত হয়নি তখনো।

অন্যদিকে আগেই যেমনটি বলা হয়েছে– জলিল ও তাহের জাসদে যোগ দেওয়ার পর প্রায়ই সেনাবাহিনীতে কর্মরত জওয়ানরা সেনানিবাস থেকে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এ পর্যায়ে এদেরও একটা 'শৃঙ্খলাপূর্ণ কাঠামো'র অধীনে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় নতুন দলে এবং প্রথমে মেজর জলিল এবং পরে কর্নেল তাহের সেই দায়িত্ব পালন করেন। চুয়াত্তরের ১৭ মার্চ জলিল গ্রেফতার হওয়ার পর সামরিক বাহিনীতে যোগাযোগের বিষয়টি প্রায় একচেটিয়াভাবে তাহেরই করতেন। এই কার্যক্রমের শুরুর দিকের বিবরণ দিতে গিয়ে মহিউদ্দিন আহমদ লিখেছেন :[৫৬১]

> এটা (সেনাবাহিনীতে জাসদের সাংগঠনিক কার্যক্রম) মূলত শুরু হয় মেজর জলিলের অনুগত সৈনিকদের নিয়ে।...তেহাত্তরের ২০ নভেম্বর ঢাকার নাখালপাড়ায় তিনি জেসিও-এনসিওদের নিয়ে একটি সভা করেন। সভায় সার্জেন্ট রফিক, ফ্লাইট সার্জেন্ট রোকনউদ্দীন ও সার্জেন্ট কাদের উপস্থিত ছিলেন। সভায় তিনি সারা দেশকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য একজনকে দায়িত্ব দেন। তাদের কাজ ছিল সেনানিবাসগুলোতে জাসদের আদর্শে সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা।...এই গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন কর্পোরাল আবদুল মজিদও।

এভাবেই তেহাত্তরের শেষ এবং চুয়াত্তরের শুরুতে জাসদ সামরিক ও বেসামরিক পরিসরে দুটি সশস্ত্র শাখা পরিচালনার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেয়। এ পর্যায়ে একটির নামকরণ হয় গণবাহিনী এবং অপরটিকে উল্লেখ করা হয় 'বিপ্লবী সিপাহী সংস্থা' হিসেবে। পরে এই দু'টিকেই *গণবাহিনী* হিসেবে অভিহিত করা হতো এবং তার প্রধান হিসেবে লে. কর্নেল আবু তাহেরকে এবং উপ-প্রধান হিসেবে হাসানুল হক ইনুকে বিবেচনা করা হতো। ইনু যেমন সেনাবাহিনীর বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী জওয়ানদের রাজনীতির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তেমনি সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী থেকে গণবাহিনীতে আগতদের সামরিক প্রশিক্ষণে দেখা গেছে তাহেরকে। কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ছাড়াও ইনু জেলা হিসেবে মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইলেরও পলিটিক্যাল কমিশার ছিলেন।[৫৬২] কেন্দ্রীয় স্তরে গণবাহিনীর পলিটিক্যাল কমিশার ছিলেন মোহাম্মদ শাহজাহান।

---

[৫৬১] মহিউদ্দিন আহমদ, ৭ নভেম্বরের সাত-সতেরো, *প্রথম আলো ঈদ সংখ্যা*, জুলাই ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ২৪৪।

[৫৬২] সাংগঠনিকভাবে কৃষক লীগের নেতা হলেও হাসানুল হক ইনু কীভাবে গণবাহিনীর নেতৃত্ব পর্যায়ে উঠে এলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মাহমুদুর রহমান মান্না লিখেছেন : '...বাংলাদেশের মতো সমতল ভূমির একটি দেশে যাকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো কোনো

তাহের ও ইনুর পরই কেন্দ্রীয় স্তরে গণবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন শরীফ নুরুল আম্বিয়া, কাজী আরেফ আহমেদ, মার্শাল মনিরুল ইসলাম প্রমুখ। এদের মধ্যে আম্বিয়া ছিলেন বর্তমানের বরিশাল বিভাগ, খুলনা বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুরের পলিটিক্যাল কমিশার। কাজী আরেফ ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের পলিটিক্যাল কমিশার। মার্শাল মনি ছিলেন রাজশাহী বিভাগের পলিটিক্যাল কমিশার। জেলাগুলোর বাইরে শহর ঢাকারও বিশেষ গুরুত্ব ছিল গণবাহিনীর কর্মকাণ্ডে। কর্নেল তাহেরের ভাই আনোয়ার হোসেন ছিলেন ঢাকা মহানগরী গণবাহিনীর কমান্ডার। তাঁর পলিটিক্যাল কমিশার ছিলেন এল সি রফিক।[৫৬৩] ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন আবুল হাসিব খান। ঢাকার ১২টি থানাতেই গণবাহিনীর এক প্ল্যাটুন করে সশস্ত্র কর্মী ছিল। এসব সশস্ত্র কর্মীদের পরিচালনায় প্রতি থানাতেই ছিলেন একজন কমান্ডার। যেমন মতিঝিল থানায় ছিলেন আবদুস সালাম, সূত্রাপুরে গোলাম মাহমুদ, কোতয়ালীতে আবু বকর সিদ্দিকী, ডেমরায় খালেকুজ্জামান চৌধুরী, মোহাম্মদপুরে খায়রুজ্জামান বাবুল, মিরপুরে নজরুল ইসলাম প্রমুখ। এসব কমান্ডারদের অন্যতম একজন রাজনৈতিক প্রশিক্ষক ছিলেন কুমিল্লার লাকসামের আবদুল বাতেন চৌধুরী। সহযোদ্ধাদের কাছে যিনি এবিসি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হাবিব সানোয়ার মিলন এবং রায়হান ফেরদৌস মধুও ঢাকায় গণবাহিনীর কার্যক্রমে নেতৃত্ব পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন।

১৯৭৩-এর জুন থেকে গণবাহিনীর সংঘটিত কার্যক্রমের আগে বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ হিসেবে কিছু অপারেশন হলেও চারটি ঘটনা গণবাহিনী গঠনকে বিশেষ বেগবান করে তোলে। প্রথমত, বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলে আখচাষিদের সঙ্গে সরকারি প্রশাসনের বিরোধকে কেন্দ্র করে ১৯৭২ থেকেই এক ধরনের সশস্ত্র গণসংগ্রাম বেগবান হয়ে উঠেছিল। এ অঞ্চলে সাধারণত আখের ব্যাপক ফলন হয়। চাষরা নিজস্ব উদ্যোগে মাড়াই করতে চাইলেও প্রশাসন চাইছিল তারা যেন সুগারমিলে আখ জমা দেয়। সেজন্য সুগারমিল এলাকাতে আখ মাড়াই নিষিদ্ধ করা হয়। আখের সরকারি মূল্য ছিল মণপ্রতি আট টাকা। কিন্তু গুড় বানালে লাভ হতো বেশি। চাষিদের অনেকে ছিল জাসদ সংগঠকদের অনুসারী এবং অস্ত্রধারী। ফলে সেখানে চাষীরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে নেমে পড়ে। ফলে

প্রতিবেশী দেশও নেই সেখানে গেরিলাযুদ্ধ কীভাবে সম্ভব– এ প্রশ্ন যখন দলের কেন্দ্রীয় ফোরামের প্রায় সবাই তুলেছিলেন তখন হাসানুল হক ইনু সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে গণবাহিনী গঠনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিলেন। তাকে গণবাহিনীর সেকন্ড-ইন-কমান্ড বানানো হয়েছিল।' দেখুন, মিথ্যা ইতিহাসের ওপর জাতি দাঁড়াতে পারে না, *পূর্বোক্ত*।

৫৬৩ উচ্চতায় খাটো ছিলেন বলে তাঁকে সহযোদ্ধারা 'লিটল কমরেড' [এল সি] রফিক বলতেন। তবে গণবাহিনী সংশ্লিষ্ট এরূপ একটি মতও রয়েছে যে, ঢাকা নগর শাখার পলিটিক্যাল কমিশার ছিলেন আ ফ ম মাহবুবুল হক। দেখুন, মহিউদ্দিন আহমদ, *পূর্বোক্ত*। এল সি রফিক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।

গণবাহিনীর কার্যক্রম শুরুর আগেই জাসদের অধীনে সেখানে কৃষকদের সশস্ত্র একটি বাহিনী বিকশিত হয়ে পড়ে। জাসদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্যতম ব্যক্তি নূর আলম জিকু ছিলেন যার নেতৃত্বে। পরবর্তীকালে দলীয়ভাবে যাদের সশস্ত্র শাখার মুখ্য সংগঠকের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাদের একজন হাসানুল হক ইনু'র বাড়িও ছিল কুষ্টিয়া। প্রভাবশালী জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমেদও ছিলেন কুষ্টিয়ার অধিবাসী। এসবের মিলিত ফল হিসেবে দাবি আদায়ের মাধ্যম হিসেবে এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সেখানে সশস্ত্র উত্তাপ চলে আসে। পরবর্তী যেসব ঘটনা জাসদের সশস্ত্র কার্যক্রম বেগবান করে তার মধ্যে রয়েছে, ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চের ঘটনা; রব-জলিলসহ দলের নেতৃস্থানীয় সংগঠকদের আটক হয়ে পড়া এবং চতুর্থত, শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক দেশে জরুরি অবস্থা জারি। এই চার অভিজ্ঞতার পর জাসদ তার রাজনীতি এগিয়ে নেয়ার জন্য সেই কাঠামোটি পুনরুজ্জীবিত করে যেটি সে সংরক্ষণ ও ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল স্বাধীনতার পর থেকে এবং যে বিষয়ে ইতোমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি। এভাবে এক পর্যায়ে পুরো দেশে গণবাহিনী জাসদের বিকল্প পরিচিতি হয়ে ওঠে। এই সশস্ত্র বিকল্পের মাধ্যমে প্রধানত যেসব কাজ হতো তার মধ্যে রয়েছে :

- রক্ষীবাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা এবং প্রতিরোধ (ধারণা করা হচ্ছিলো শারীরিক সুরক্ষা না দিলে কর্মীরা মাঠ ছেড়ে চলে যাবে);
- রক্ষীবাহিনীর আক্রমণ থেকে জাসদের সভা-সমাবেশকে সুরক্ষা দেওয়া;
- শহরগুলোর গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে সশস্ত্র পাহারায় দেয়াল লিখন;
- রক্ষীবাহিনী ও সরকারের অন্যান্য বাহিনীর হামলার বিপক্ষে প্রতিশোধমূলক হামলা চালানো;
- রাজনৈতিক শত্রু খতম করা (যেমন কুমারখালীতে আওয়ামী লীগ এমপি গোলাম কিবরিয়াকে ঈদের দিন প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়);
- রাজনৈতিক প্রচারমূলক বিভিন্ন হামলা চালানো (যেমন- ঢাকার একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল হোটেলটিতে হামলা করা, বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাস জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি);
- শহরতলী ও গ্রামীণ জনপদে সশস্ত্র হয়ে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানো; ইত্যাদি।

এর বাইরে গণবাহিনী কয়েকটি স্থানে খাসজমি দখল করে গরিব কৃষক ও ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করে। বগুড়ায় এরূপ একটি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়।

তবে অন্তত দেশের একটি অঞ্চলে জাসদের সশস্ত্র কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কোনো ছাপ পড়েনি। তা হলো সিলেট। কারণ এই অঞ্চলে যাঁকে সশস্ত্রতা বিকশিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল (মাহবুবুর রব সাদী) তিনি তাত্ত্বিকভাবে মনে করতেন এভাবে রাজনীতিকে সশস্ত্র সংগঠন ও তৎপরতানির্ভর করা ভুল

হচ্ছে। প্রতিনিয়ত তিনি বিষয়টি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তুলে ধরলেও তা অবজ্ঞাত হয়। দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় এ সময়, যদিও শুরুতে সিদ্ধান্ত ছিল, যিনি সশস্ত্র শাখায় থাকবেন তিনি সাধারণ রাজনীতির প্রকাশ্য কাজে থাকবেন না– কিন্তু গণবাহিনী বিকশিত হওয়ার পর দেখা গেল অনেক অঞ্চলেই যারা রাজনীতির মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন সশস্ত্র পর্যায়ে এসেও তাঁরাই মুখ্য ব্যক্তি থাকছেন। টাঙ্গাইলে খন্দকার আবদুল বাতেন, বগুড়ায় এ বি এম শাহজাহান প্রমুখের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। এই দুই জনের অধীনেই নিজ নিজ অঞ্চলে গণবাহিনীর কার্যক্রম উতুঙ্গে উঠেছিল এবং দুই জনই পরে ভিন্ন ভিন্ন দলে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথমজন আওয়ামী লীগে এবং পরের জন জাতীয় পার্টিতে। বাম আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ সংগ্রামী এলাকাগুলোতে গণবাহিনীর ব্যাপক তৎপরতা এবং পরে মূল নেতৃত্বের দল ও আদর্শ পরিবর্তনের এইরূপ দৃষ্টান্ত বিশেষ তাৎপর্যবহ। উল্টোদিকে, যেখানে মাওবাদী নকশাল ধারার রাজনীতি খুব বেশি ছিল না– সেখানে গণবাহিনীও খুব বেশি সক্রিয়তা দেখাতে পারেনি। যেমন কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি। এ পর্যায়ের আরেকটি তাৎপর্যবহ ঘটনা এই যে, সশস্ত্র কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ঘোষিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের 'শান্তি বাহিনী'র মতো সশস্ত্র গ্রুপগুলোর জন্য সরকারের ব্যাপক পুনর্বাসন কার্যক্রম থাকলেও গণবাহিনীর মতো সংগঠনের কর্মীদের জন্য তদ্রুপ কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কমিউনিজম সম্পর্কে ভীতি ও ব্যর্থতার নজির জারি রাখতেই হয়তোবা এইরূপ বাহিনীর কর্মী ও অস্ত্র উভয়ই মাঠপর্যায়ে থেকে যায়। উল্লেখ্য, সিপাহী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়া, তাহেরসহ পরবর্তীকালে বহু সৈনিকের ফাঁসি সত্ত্বেও ১৯৮১ পর্যন্ত জাসদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সৈনিকদের বিচ্ছিন্ন আকারে রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল বলে জানিয়েছেন ঐ দলের একজন প্রাক্তন সংগঠক। ফলে 'গুটিয়ে ফেলা'র নির্দেশ সত্ত্বেও গণবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে গুটিয়ে গেছে– এমনটিও বলা যায় না।

বিশেষত, এরপর গণবাহিনী ও জাসদের অনেক তরুণ কর্মীকে সুদূর লেবাননে যেতেও দেখা যায় প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশে যুদ্ধ করার জন্য। ১৯৮২ সালে লেবাননে ইসরায়েলের সরাসরি আগ্রাসনের পূর্ব পর্যন্ত এইরূপ 'সংহতি' অব্যাহত ছিল– যা বিশেষভাবে বেগবান হয় ঢাকায় ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে মেজর জলিলের এক সংক্ষিপ্ত আলাপের পর। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক পরিসরে এক জটিকা সফরের প্রাক্কালে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ঢাকা বিমানবন্দরে যাত্রাবিরতি করেন আরাফাত, তখনি নিজস্ব কর্মীদের জন্য উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণের ঐ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন জলিল। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে লেবানন গমনকারী এইরূপ স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা এক হাজারের

মতো ছিল।[৫৬৪] এদের কেউ কেউ ইসরায়েলের হাতে ধরা পড়েছিলেন। অনেকে লেবাননে থাকতে না পেরে সেখান থেকে ইয়োরোপে পাড়ি জমান। কেবল আরাফাতের ফাত্তাহ গ্রুপেই নয়– পিএলও'র অভ্যন্তরে আহমেদ জিবরিলের অধিকতর বামপন্থী গ্রুপেও অনেক বাংলাদেশি যোদ্ধাকে দেখা যেত তখন। বাংলাদেশে আজও প্যালেস্টাইনিদের সংগ্রামে নিয়োজিত এইরূপ বামপন্থী স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংকলিত হয়েছে বলে জানা যায় না। জাসদও পরবর্তীকালে এইরূপ যোদ্ধাদের অবদান সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে কখনো স্মরণ করেছে বলে শোনা যায়নি। যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা ফটোগ্রাফার Pteele Perkins হলেন জাসদের গণবাহিনীর যোদ্ধাদের লেবানন অধ্যায়ের একমাত্র ঐতিহাসিক প্রমাণ সংরক্ষণকারী।[৫৬৫] এটা কাকতালীয় যে, Pteele Perkins ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে আসার মধ্য দিয়েই তার আন্তর্জাতিক আলোকচিত্রী জীবনের শুরু করেছিলেন। উল্লেখ্য, লেবাননের পর লিবিয়াতেও অনেক গণবাহিনী সদস্যকে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল বলে জানা যায়। প্যালেস্টাইনিদের জন্য যুদ্ধকারী গণবাহিনী সদস্যদের অন্যতম ছিলেন কর্নেল আবু তাহেরের ভাই ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল। তিনি সেখানে প্ল্যাটুন কমান্ডার পর্যায়ের যোদ্ধা ছিলেন। এই ওয়ারেসাত হোসেন বেলালকেই ১৯৭৬ এ ঢাকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে অপহরণ প্রচেষ্টায়ও যুক্ত থাকতে দেখেছি আমরা (উপ-অধ্যায় ৬.খ এবং তথ্যসূত্র *৫৪৮*)। এদিকে, সম্প্রতি প্রকাশিত এক চিঠি থেকে দেখা যায় (সংযুক্তি *উনত্রিশ*-এ উপস্থাপিত) খোদ লে. কর্নেল আবু তাহেরও এক সময় প্যালেস্টাইনিদের পক্ষে যুদ্ধে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৭৩-এর অক্টোবরে নারায়ণগঞ্জে সরকারের সী-ট্রাক ইউনিটের ম্যানেজার থাকাকালে তিনি প্যালেস্টাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সেখানে যাওয়ার লক্ষ্যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে আনুষ্ঠানিক অনুমতিও চেয়েছিলেন। তবে এইরূপ অনুমতি তিনি পেয়েছেন বলে জানা যায় না।

---

[৫৬৪] স্বাধীন প্যালেস্টাইনের জন্য জাপানের রেড আর্মি এবং আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির মতো সংগঠনগুলো থেকেও অনেক যোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তখন লেবাননে যুদ্ধরত ছিলেন।

[৫৬৫] http://english.al-akhbar.com/content/remembering-past-bangladeshi-fighters-palestine-1980s (reterived on 04.07.2014)। উল্লেখ্য, গণবাহিনীর যোদ্ধারা যেমন ঐ সময়ে লেবানন গিয়েছেন– তেমনি প্যালেস্টাইন তরুণদের একটি দলও তখন বাংলাদেশে এসেছিল সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য। প্রশিক্ষণ শেষে লেবানন ফেরত যাওয়া মাত্র এরা ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হাতে আটক ও নিহত হয়। দেখুন, http://www.somewhereinblog.net/blog/shoummo71/28893049 (retrieve on 11.07.2014)

৬.গ. জাসদ গঠনে জ্বালানি : ধ্বংস ও দারিদ্র্যের মাঝে শাসক এলিটদের লুণ্ঠন প্রবণতা

> আমি বাংলাদেশে কোন শ্রেণী থাকতে দেব না। এ দেশে শ্রেণী একটাই হবে। সেটা হবে বাঙালি শ্রেণী।
>
> – ঢাকার পিলখানায় জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী (পরবর্তীকালে রক্ষীবাহিনী)-এর ক্যাম্পে প্রদত্ত শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ।[৫৬৬]

> স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। কিন্তু একটি সামন্তবাদী এবং আধা-সামন্তবাদী সমাজ-ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার স্তর এড়িয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সাহসিকতা, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন তদানীন্তন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে তার যথেষ্ট অভাব ছিল। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, অসমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়িয়ে দেশ এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।...অচিরেই একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে এক নতুন ধরনের শোষণযন্ত্রের উদ্ভব করা হয়েছে।
>
> –বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি হিসেবে ড. মহিউদ্দিন আলমগীরের ভাষণ, মার্চ ১৯৭৬[৫৬৭]

পূর্ববর্তী উপ-অধ্যায়ে এটা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জাসদ কর্তৃক ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চের ঘটনা এবং তৎপরবর্তী গণবাহিনীর কার্যক্রম শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ও সমর্থকদের জন্য কমবেশি একটি রাজনৈতিক আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে সেসময় দেশের অর্থনীতি এত দ্রুত মুখ থুবড়ে পড়ছিল যে, গণতান্ত্রিক পরিবেশে জনবিক্ষোভ সামাল দেওয়ার

---

৫৬৬ ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খান সমর্থক অংশ স্বাধীনতা উত্তর ডাকসু'র প্রথম নির্বাচনে তাদের প্রার্থীদের পরিচিতিমূলক 'এক ও অভিন্ন' নামে ৪০ পৃষ্ঠার যে পুস্তিকা প্রকাশ করে সেখানে মুজিবের এই উক্তিকে প্রধান শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করেছিল। বর্তমান লেখায় সেখান থেকেই উদ্ধৃত।

৫৬৭ ড. আলমগীরের ঐ ভাষণের পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন, Political Economy, Vol. 2, No. 1, *Journal of Bangladesh Economic Association*, Department of Economics, DU, Dhaka, 1977, p.1-14. বর্তমানে [২০১৩] এই অর্থনীতিবিদ ইটালিতে অবস্থান করছেন বলে জানা যায়।

একটিই কেবল উপায় থাকত– তা হলো ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো– মুজিব ও মুজিববাদ সমর্থকরা কোনোভাবে যার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। স্বাধীনতার প্রায় দেড় বছরের মাথায় দেখা যায়, জিডিপি ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ পড়ে গেছে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত জিডিপি গড়ে প্রায় ৯ শতাংশ পড়ে গিয়েছিল। জিনিসপত্রের দাম গড়ে সব দ্বিগুণ হয়ে যায়। মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে শুরু করে বছরে প্রায় ৪০ শতাংশ হারে।[৫৬৮] ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচক ১৯৭২ সালে ৫২ শতাংশ বেড়ে যায়। খাদ্য উৎপাদন কমে এক-দশমাংশ। সত্তরের নির্বাচনে মুজিব চালের দাম অর্ধেকে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতারোহণের পর ঘটে উল্টোটি। কিছু জেলায় চালের দাম কয়েকশ শতাংশ বেড়ে যায়। শিল্প উৎপাদনও কমে ৭০-৭১ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ। কারখানায় উৎপাদন না থাকলেও ব্যাংক থেকে আগাম ঋণ নিয়ে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দেওয়া হচ্ছিল।

যদিও 'সমাজতন্ত্র' বলতে সমগ্র সমাজের জন্য শোষণ প্রতিরোধক এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থার কথাই বলেছেন মার্কস ও লেনিন, কিন্তু বাংলাদেশে বাহাত্তরে শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণকেই সমাজতন্ত্র হিসেবে ধরে নেয়া হয়। শ্রমিকরাও এই পদ্ধতি কায়েম রাখতে আওয়ামী লীগ নেতাদের ধরে এনে একের পর সংবর্ধনা দিয়ে যাচ্ছিল। কারণ কাজ না করেও বেতন পাওয়ার একটা সংস্কৃতি শক্তি পাচ্ছিল তাতে। সেসময় ১৯৭৪ সালের ১৫ জানুয়ারি ও ১৯ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের 'মঞ্চ-নেপথ্যে' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয়ের দুটি লেখায় পাটমন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে জানানো হয়, স্বাধীনতার পরপর পাটকলগুলোতে (তখন ৭৭টি) প্রায় ১২ থেকে ১৫ হাজার ভুয়া শ্রমিক তালিকাভুক্ত হয় এবং তাদের পেছনে বছরে ছয় কোটি টাকা করে গচ্চা যাচ্ছে সরকারের। এইরূপ বাস্তবতারই তীব্র সমালোচনা করতে গিয়ে সেই সময়কার অন্যতম জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ড. মযহারুল হক ১৯৭৪ সালের মার্চে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, 'গত দুই বছরে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হয়েও উৎসবধর্মী খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছি আমরা– সেটা পাপের সমতুল্য এবং লজ্জাকরও, কারণ একই সময়ে বিশ্বের অন্যান্যরা বাংলাদেশকে রক্ষা করতে ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকার সহায়তা দিয়েছে।'[৫৬৯]

বাস্তবে স্ববিরোধী এসব তৎপরতাকে অর্থনীতির সর্বগ্রাসী এক কাঠামোগত দুর্বলতার পটভূমিতে বিবেচ্য– যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও আর্থিক

---

৫৬৮ দেশের ঐ সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা, মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতির বিস্তারিত চিত্র পেতে দেখুন, মুনীর উদ্দীন আহমদ [সম্পাদিত], *বাংলাদেশ : ৭২ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮০, ঢাকা, পৃ. ১৫৩-১৭৮ এবং *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ মার্চ ১৯৭৪, ঢাকা।

৫৬৯ পুরো ভাষণটির জন্য দেখুন, মুনির উদ্দীন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬০।

খাতের জাতীয়করণ এবং জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সীমাহীন দুর্নীতি ও অদক্ষতা। সীমান্ত উন্মুক্ত থাকায় চোরাচালান ব্যাপকতা পায়। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি তীব্র হয়ে ওঠে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও কমতে থাকে।[৫৭০] জাতীয়করণ প্রকৃত ব্যবসায়ীদের আস্থাও নষ্ট করে চূড়ান্তভাবে। স্বভাবত এরা সরকারের ওপর চরম ক্ষুব্ধ ছিল। জাসদ রাজনীতির ভিত্তি হয়ে ওঠে এই ক্ষোভ।

আবার বাহাত্তর পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চাপও আসছিল জাসদের তরফ থেকেই। জাসদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি এসময় 'বাংলার বাণী'র মাধ্যমে শেখ মণি'র জাতীয়করণভিত্তিক সমাজতন্ত্রের প্রাত্যহিক রণধ্বনির দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল দেখে পুরো বিষয়টিকে স্পষ্টত এক ধরনের ষড়যন্ত্র হিসেবেও অভিহিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ বিবিধ 'সমাজতন্ত্র' শিগগির যখন দেশকে কেবল দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাই উপহার দিল তখন তার জন্য দোষারোপের ভাগিদার হলো স্রেফ তত্ত্ব হিসেবে মার্কসবাদ ও সাম্যবাদ। আর পুরো আশির দশক জুড়ে এই অপপ্রচারে নেতৃত্ব দিল দৈনিক ইত্তেফাক– যে দৈনিকটি মুজিবের 'দ্বিতীয় বিপ্লব' তথা সমাজতান্ত্রিক 'বাকশাল' কর্মসূচি অনুমোদিত চারটি দৈনিকেরই একটি ছিল! এ বিষয়ে নির্মল সেন লিখেছেন, 'সমাজতন্ত্রকে চিরতরে নির্বাসন দেওয়ার জন্যই সেদিন পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নাম দেওয়া হয় সমাজতন্ত্র। এই উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়া মাত্রই এক শ্রেণির সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী একে সমাজতন্ত্রের সমার্থক করে তার বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করলেন। সেই ষড়যন্ত্র আজও চলছে। রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যর্থতাকে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা হিসেবে চালানো হলেও বেসরকারি খাতের লুটপাটের জন্য পুঁজিবাদকে কখানো দোষারোপ করা হয়নি। সে নিয়ে তারা উদ্বিগ্নও নন।'[৫৭১]

প্রায় অনুরূপভাবে জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের বিবরণ শেষে সেই সময়কার আওয়ামী লীগ নেতা মো. আবদুল মোহাইমেন লিখেছেন, '...সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তো হলোই না, মাঝখান থেকে সমাজতন্ত্র মানে লুটপাট– এই ধারণাই সাধারণ লোকের মনে বদ্ধমূল হলো। অবস্থা এমন হলো যে, ... '৭৪-'৭৫ এ সমাজতন্ত্রের নামে কোন কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়লো– ফলে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন কমপক্ষে ৫০ বছর পিছিয়ে গেল।'[৫৭২]

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে করাচির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোসাল এন্ড ইকোনমিক রিসার্চ ও স্থানীয় স্টক একচেঞ্জ পূর্ব-পাকিস্তানে পশ্চিম

---

৫৭০ ঐ সময়ের আর্থিক অবস্থার একাডেমিক আলোচনার জন্য সম্মিলিতভাবে দেখুন, S A Karim, *ibid*, p. 311. and Akand Akhtar Hossain, Macroeconomic Developments, Politics and Issues in Bangladesh 1972-2007, in *Bangladesh Economy in the 21st Century*, Ed. Munir Quddus and Farida C. Khan, UPL, Dhaka, p. 385-432.

৫৭১ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮৭-৮৮।

৫৭২ মো. আবদুল মোহাইমেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪।

পাকিস্তানীদের 'খোয়া যাওয়া' ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প স্থাপনার বিষয়ে এক সমীক্ষা চালায়। তার ভিত্তিতে বাহাত্তরের মার্চে দাবি করা হয়, বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের প্রায় ৭২০ কোটি রূপির শিল্প ও ব্যবসা যুদ্ধের ফলে হাতছাড়া হয়।[৫৭৩] এরূপ হাতছাড়া বা খোয়া যাওয়া তথা 'পরিত্যক্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো' অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ঢাকার সরকার আইনগত কাঠামো প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি [The Bangladesh (Taking over the control and management of Industrial and Commercial concerns) Order, 1972, Acting President's Order No. 1; এটি সাধারণত *এপিও-১* নামে নীতিনির্ধারক পরিমণ্ডলে পরিচিতি পায় তখন।]। এই আইনের লক্ষ্য ছিল 'অনুপস্থিত মালিক'দের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা। তবে এও বলে নেয়া হয়, 'জনস্বার্থে' উপস্থিত কোনো মালিকের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনাও সরকার গ্রহণ করতে পারবে!

এসময় পাকিস্তানি মালিকদের 'ফেলে যাওয়া' সর্বমোট ৭২৫টি প্রতিষ্ঠান শনাক্ত হয়– যার সেই সময়কার মূল্য ছিল ২৮৮ কোটি টাকা। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল স্বাধীনতাপূর্ব পূর্ব-পাকিস্তানের সমগ্র শিল্প-বাণিজ্যের প্রায় ৪৭ ভাগ। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা ছিল প্রায় ৭১ ভাগ।[৫৭৪] এসময় 'পরিত্যক্ত আকারে' সরকার বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৩ হাজার ৮০০ দোকান এবং ২২ হাজার ৯৪৮টি বাড়িও পেয়েছিল[৫৭৫]– যেগুলো পরবর্তীকালে সরকার সমর্থকরা লীজ আকারে ভোগ করার সুযোগ পায়। কেউ কেউ রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে লীজ বা অন্য কোনোভাবে অনুমোদন না করিয়েও এসব সম্পত্তি ভোগ করেছে।

উল্লেখ্য, এপিও-১-কে সরকার পরে The Abandoned Property (control, mamagement and disposal) Order 1972 (P. O. NO. 16 OF 1972) নামের আরেকটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এপিও-১ যেখানে ছিল সম্পত্তি দখল সংক্রান্ত– পরের আইনটি সেখানে বিক্রয়ের অধিকারও দেয় সরকারকে। এসব আইন সরকারকে দখলকৃত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য 'ব্যবস্থাপনা বোর্ড' বা 'প্রশাসক' নিয়োগের দায়িত্ব দেয়। এভাবেই বিপুল সম্পত্তিতে সরকার সমর্থকদের প্রবেশাধিকার তৈরি হয়। ঠিক এই পর্যায়েই মুজিব বাহিনীর উভয় অংশ এবং সিপিবি-ন্যাপ সকল তরফ থেকে 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার চাপে পড়েন মুজিব এবং

---

৫৭৩ আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক : সম্পদ-বণ্টন ইস্যু, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, যুক্তসংখ্যা ৮৩-৮৪, ঢাকা, পৃ. ৬২-৬৩।

৫৭৪ এই উদ্যোগের পূর্বাপর সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Rehman Sobhan, *The Crisis of the Burgoeis Order and the Growth of Authoritarian Political Trends in Banglaesh*, South Asian Studies 2, OUP, Delhi, 1982.

৫৭৫ *দৈনিক মানবজমিন*, ১ নভেম্বর ২০১২ এবং দৈনিক *গণকণ্ঠ*, ১৯ জুন ১৯৭৩, ঢাকা।

১৯৭২-এর ২৬ মার্চ পাট-বস্ত্র-চিনি শিল্প, ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি 'জাতীয়করণ' করা হয়। এভাবে 'পরিত্যক্ত সম্পত্তি'গুলো 'রাষ্ট্রীয় খাত' হিসেবে চিহ্নিত হয়; পাশাপাশি বলা হলো, সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্যই এই জাতীয়করণ। কিন্তু পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য যে মানবসম্পদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের সমাজতান্ত্রিক কোনো দীক্ষা ছিল না। ফলে ঐ জাতীয়করণ প্রথমে 'রাষ্ট্রীয়করণ' ও পরে লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। 'জাতীয়কৃত' সম্পত্তির ওপর সমগ্র জাতির কর্তৃত্বের বদলে পুঁজিপতি শ্রেণি, তাদের প্রতিভূ আমলাতন্ত্র ও এক শ্রেণির কায়েমি স্বার্থবাদী শ্রমিক নেতার কর্তৃত্ব তৈরি হয় এবং তাদেরই ভোগে লেগেছিল তা। এভাবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত 'জাতীয়করণ' থেকে স্থানীয় প্রভাবশালীরা প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহ করে পরে দেশে অবাধ পুঁজিবাদ কায়েম করে 'শিল্পপতি' হিসেবে নিজেদের নতুন পরিচয় নির্মাণ করে। মওদুদ আহমদ তাঁর গবেষণায় ১৯৭৩ সালের ৪ঠা মার্চ ঢাকার সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত সরকারি ক্রোড়পত্র থেকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, ঐ সময় পর্যন্ত ২৩৭টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়েছিল এবং ৫২৬টি উৎপাদনমুখী শিল্প ইউনিটকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছিল। ১২টি ব্যাংক এবং ৪৪টি বীমা প্রতিষ্ঠানকেও জাতীয়করণ করা হয়।[৫৭৬] স্বভাবত সরকার নিযুক্ত 'প্রশাসক' ও 'পরিচালক'দের (যাদের কারোই প্রায় শিল্প বা ব্যাংক পরিচালনার কোন পূর্বাভিজ্ঞতা ছিল না) সম্পদ সংগ্রহের জন্য এ ছিল বিপুল এক ক্ষেত্রভূমি। যেমন ঢাকার তেজগাঁওয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলোর পরিচালক ছিলেন গাজী গোলাম মোস্তফা। আমরা ইতঃপূর্বেই দেখিয়েছি (৫.গ উপ-অধ্যায়ে), গাজী গোলাম মোস্তফা রাজনৈতিকভাবে তখন মুজিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাজন হলেও মুজিব বাহিনীর সরকারি বিরোধী গ্রুপকেও আর্থিক অনুদান দিতেন তিনি। অর্থাৎ রাজনীতির পুরো পরিমণ্ডলেই তখন জাতীয়করণের 'সুফল' পাওয়া যাচ্ছিল।

সাধারণত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে জাতীয়করণ ঘটে সেটা হয় সামাজিকীকরণ। রাষ্ট্রীয়করণ ও সামাজিকীকরণ পুরোপুরি বিপরীত চরিত্রের বিষয়।[৫৭৭] পরে (৭.খ উপ-অধ্যায়ে) আমরা এও দেখবো, তৎকালীন সরকার যে ১৯৭৫ নাগাদ একদলীয় শাসন কাঠামো দিয়ে হলেও মরিয়াভাবে ক্ষমতায় থাকতে চাচ্ছিল তাতে পরোক্ষ দায় হিসেবে কাজ করেছিল মূলত 'জাতীয়করণ' থেকে সরকারের অনুসারী তথা নতুন রাজনৈতিক এলিটদের হাতে স্থানান্তরিত সম্পদ রক্ষার দায়। এইরূপ সম্পদ স্থানান্তর প্রশ্নাতীত করতে ১৯৭৩ সালে ঘোষিত 'দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল লিবারেশন স্ট্রাগল (ইনডেমনিটি) অর্ডার'-এর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাও এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য ছিল। আবার এসব ব্যক্তি পর্যায়ে স্থানান্তরিত

---

[৫৭৬] মওদুদ আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল, ইউপিএল, ১৯৮৩, ঢাকা, পৃ. ৫০-৫১।

[৫৭৭] দেখুন, হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ১৩৫।

'সম্পদ' তার অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের কারণেই পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজছিল এবং পরিণতি হিসেবে দেখা যায়, ১৯৭৪-এর জুলাইয়ে এসে সরকার বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ সীমা ২৫ লাখ থেকে এক লাফে ৩ কোটিতে উন্নীত করে এবং ১৮টি খাত রেখে বাকিগুলো ওইরূপ বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। যদিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে একদলীয় ব্যবস্থা হিসেবে বাকশাল কায়েমের পূর্বাপর কারণ ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে কিন্তু তাতে 'পরিত্যক্ত সম্পত্তি' ও উপরোক্ত আইনটির প্রভাবক ভূমিকা অনালোচিতই থেকে গেছে। উল্লেখ্য, মুজিব তাঁর সমাজতন্ত্র অভিমুখীন এইরূপ শহুরে জাতীয়করণ কর্মসূচি থেকে গ্রামীণ ভূমি সংস্কারের প্রসঙ্গটিকে অতিযত্নের সঙ্গে যে দূরে রেখেছিলেন সে বিষয়েও ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুজিবকে জাতীয়করণনির্ভর সমাজতন্ত্রের বিধ্বংসী পথে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুজিব বাহিনীর উভয় অংশের চাপ ও ভারত-রাশিয়ার উৎসাহের পাশাপাশি তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশনই মুখ্য ভূমিকায় ছিল। পূর্বোক্ত ৩.গ উপ-অধ্যায়ে মুজিব বাহিনী সম্পর্কিত আলোচনায় সাংবাদিক এনায়েতুল্লা খানের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে– যেখানে তিনি মুজিব বাহিনীর বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেন Super-autonomous সংস্থা হিসেবে। ইতোমধ্যে দেখানো হয়েছে Super-autonomous এই বাহিনী নানান কাঠামোতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে কী বিবিধ উপায়ে স্বাধীনতা-উত্তর সময়কে বিবাদময় করে তুলেছিল। ঠিক একই সময় মুজিব সরকারের মাঝে আরেক Supra-authority ছিল সেই সময়ের পরিকল্পনা কমিশন এবং তারও শক্তিভিত তৈরি মূলত ভারতে মুক্তিযুদ্ধকালে। বর্তমান সমীক্ষায় যদিও স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিপর্যয়ে কেবল মুজিব বাহিনীর ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে কিন্তু কার্যত সেই দুর্ভাগ্যের পেছনে উল্লিখিত Supra-authority-এর ভূমিকাও ছিল মোটাদাগে। মুজিব বাহিনী সৃষ্ট বিভেদের দায় মুজিব নিজ জীবন দিয়ে শোধ করেলেও পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত ভুল নির্দেশনার দায় শোধ করতে হয়েছে মুজিবের পাশাপাশি দেশের প্রত্যেক মানুষকে।

'প্ল্যানিং কমিশন' নামক চার অধ্যাপকের[৫৭৮] আলোচ্য ভরকেন্দ্রের যাত্রা প্রকৃত অর্থে কলকাতায় প্রবাসী সরকারের কাঠামোতে। সেখানে এর নাম রাখা হয়েছিল 'প্ল্যানিং সেল'। পরে এর নাম করা হয় 'প্ল্যানিং বোর্ড'। প্রথম থেকে এই সেল বা বোর্ড প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের অধীনস্ত ছিল। মুজিব বাহিনীর বিবিধ কাঠামো থেকে মুজিব যখন সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য তীব্র চাপের শিকার তখন সেই

---

[৫৭৮] রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমান, মোশাররফ হোসেন এবং নূরুল ইসলাম। এদের মধ্যে শেষোক্তজন ছাড়া অন্য তিনজনই আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; তবে মুজিবের সঙ্গে সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি নিবিড় ছিল চতুর্থজনের।

'সমাজতন্ত্র'-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কের ভূমিকা পেয়ে যায় ঐ প্ল্যানিং বোর্ড। ইতোমধ্যে ১৯৭২-এর জানুয়ারিতে এর নাম আরেক দফা পাল্টে হয় 'পরিকল্পনা কমিশন'। কমিশন সমাজতন্ত্রের ব্যাপক কর্মযজ্ঞ সামাল দিতে ১০টি বিভাগের জন্ম দেয়। দু-তিনটি মন্ত্রণালয়কে কেন্দ্র করে এক-একটি বিভাগ কাজ করত। এসব বিভাগের প্রধানদের পূর্ণ সচিবের মর্যাদা দেওয়া হয়। কমিশনের সদস্যরা নিজেদের জন্য প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর মর্যাদা অনুমোদন করিয়ে নেন। মর্যাদার এইরূপ ব্যাপকতা রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিরাট ছন্দপতন ঘটায় এবং ব্যাপকভিত্তিক এক রেষারেষির জন্ম দেয়। পরিকল্পনা কমিশনের নীতি ও কৌশল মাঠপর্যায়ে যে বিপর্যয়ের জন্ম দিচ্ছিল তা দেখে ১৯৭৪ থেকে মূলধারার আমলাতন্ত্র ক্রমে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে থাকে। বিশেষ করে ১৯৭২-এর ২৬ মার্চ জাতীয়করণ কর্মসূচি ঘোষিত হলেও তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলার ব্যবস্থাপনায় নজরদারি করতে কাঠামোগত নির্দেশনা এবং ৯টি কর্পোরেশন গড়ে তুলতে কয়েক মাস লেগে গিয়েছিল। এসব দায়িত্ব ছিল পরিকল্পনা কমিশনের। কমিশনের ভাবধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ভবিষ্যৎ রচনা করতে গিয়ে একপর্যায়ে চুয়াত্তরের এপ্রিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ১৭ জন অর্থনীতিবিদের এক দল তাত্ত্বিককেও নিয়ে আসা হয়। কিন্তু এসব আয়োজনের সামগ্রিক ফল ছিল, দ্রুত দেশে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়।

এ রকম পরিস্থিতিতে মূলধারার আমলাতন্ত্রের পরামর্শ মতো মুজিব প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য আরেকটি সেল খোলেন। প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ব্যুরো নামে আরেকটি কাঠামোও গড়ে তোলা হয় একই সময়ে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রমের যথার্থতা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য। মূলধারার আমলাতন্ত্রের এসব পাল্টা উদ্যোগের মধ্য দিয়ে পঁচাত্তর নাগাদ পরিকল্পনা কমিশন কাগুজে বাঘে পরিণত হয় এবং এর সদস্যরাও একে একে তাদের আদি পেশায় ফিরে যান। ততদিনে দুর্ভিক্ষের অভিঘাতসহ বহু উপায়ে অর্থনীতির বিপর্যয় সম্পন্ন হয়। পরিকল্পনা কমিশনের ব্যর্থতার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ঐ সময় (১৯৭৫ সালের ১৯ জানুয়ারি) সাংবাদিক এনায়েতুল্লা খান সাপ্তাহিক হলিডেতে লিখেন :

> All these they did in good faith as they had studied Economics in the Anglo-Saxon schools and earned that quaint radicalism that invariably goes with a lack of social consciousness. From Keynes to Galbraith or Marx to Sweezy, everyone is on their fingertips. But what they knew not are the country and the people, and the preconditions necessary for a socialist transformation.

এ পর্যায়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকার ২৪ বছর পূর্ববাংলার অর্থনীতি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের মতোই ধনতান্ত্রিক। হঠাৎ করে সেখানে জাতীয়করণের অভিঘাত ছিল স্বাভাবিকভাবে ভূমিকম্পতুল্য। নানানভাবে অর্থনীতিকে বেসামাল করে তোলে তা। বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সংকট তৈরির ক্ষেত্রে পাটখাত নিয়ে সরকারের আত্মঘাতি নীতি-কৌশল সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেখানে ১৯৭০ সালে পূর্বপাকিস্তান থেকে পাট রপ্তানি হয়েছিল ৩৫ লাখ বেল, ১৯৭৪-৭৫ সালে সেই রপ্তানির পরিমাণ নেমে আসে ১৫ লাখ বেলে।[৫৭৯] এটা আবার বৈদেশিক মুদ্রার সংকট তৈরি করে। ফলে সময়মতো ইউরিয়া সার আমদানি করা যায়নি তখন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ৬.খ উপ-অধ্যায়েও কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতাকালে বাংলাদেশের প্রায় ৪০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সামর্থ্য ছিল– যার মধ্যে ৮০ ভাগ হিস্যা ছিল পাট খাতের। কিন্তু ১৯৭২-৭৩ সালে পাট খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আসে মাত্র ১০৪ কোটি টাকার সমপরিমাণে।[৫৮০]

বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের জন্য জাতীয়করণ নীতিই স্পষ্টত দায়ী ছিল। কারণ এই নীতির কারণে এসময় বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে বেসরকারি উদ্যোক্তারা বহিষ্কৃত হন। দ্বিতীয়ত, পাট রপ্তানিতে পাকিস্তান সরকার যে বাড়তি প্রণোদনামূলক সহায়তা দিত সেটা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার বন্ধ করে দেয়। সরকারি এই সিদ্ধান্তের সরাসরি সুবিধাভোগী ছিল ভারত। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পাটের প্রতিযোগী ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের পাট। শেষোক্তদের রপ্তানি কমে যাওয়া মাত্রই ভারত পুরো বাজারের ওপর কর্তৃত্ব পেয়ে যায়। ফলে ভারতে পাটের চাহিদা বিপুলভাবে বেড়ে যায় এসময়। আর তার যোগান দিতে বাংলাদেশ থেকে স্রোতের মতো পাটের চোরাচালান শুরু হয়। এসময় ভারতের বাজারে প্রতি বেল (১৮০ কেজি) পাটের দাম ছিল বাংলাদেশ থেকে অন্তত ১৩ টাকা বেশি।[৫৮১] চোরাচালান, জাতীয়করণের ফলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সৃষ্ট দুর্নীতি, অবাঙালি ও রাজাকারদের ঘরবাড়ি দখল ইত্যাদির মাধ্যমে এসময় রাতারাতি একদল মানুষ ধনী হয়ে ওঠে। লুণ্ঠনের স্বার্থেই এরা ছিল 'আওয়ামী লীগপন্থী'। 'অবাঙালিদের প্রায় ৬০ হাজার বাড়ি এ সময় সরকার সমর্থকরা অধিকারভুক্ত করতে পেরেছিলেন'।[৫৮২] ধ্বংস ও দারিদ্র্যের মাঝে

---

৫৭৯ দৈনিক বণিকবার্তা, *পূর্বোক্ত*।

৫৮০ *বাংলাদেশ : ৭২ থেকে ৭৫*, মুনির উদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮০, ঢাকা, পৃ. ৩২৯।

৫৮১ দেখুন, মোহাম্মদ সেলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৬।

৫৮২ দেখুন, Ahmed Ilias, *The Indian Emigres in Bangladesh*, Shamsul Huque Foundation, Syedpur, Bangladesh, 2003, p. 139.

সরকারি দলের একদল সমর্থকের এরূপ লুণ্ঠন প্রক্রিয়া সমাজে যে বিষক্রিয়ার জন্ম দেয় তা জাসদ গঠনে বিশেষ সামাজিক জ্বালানি হিসেবে ভূমিকা রেখেছিল।[৫৮৩]

ঐরূপ পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে সমাজের নিচুতলাতে আঘাত হেনেছিল নির্মমভাবে। তাদের প্রকৃত আয় কমে যাচ্ছিল প্রতিদিন এবং তা ছিল বামপন্থী উত্থানের জন্য এক আদর্শ পটভূমি। মুজিব ও তাঁর দেশি-বিদেশি পরামর্শকরা পরিস্থিতির গভীরতা বুঝতে মোটেই বিলম্ব করেননি– জরুরি আইন জারি, চতুর্থ সংশোধনী অনুমোদন, একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু, গণমাধ্যম দলন, বিচারবহির্ভূত হত্যা তীব্রতর করা সবই শুরু হয় স্বল্প সময়ের মধ্যে।[৫৮৪] আর এসব শুরুর প্রয়োজনে দোষারোপের জন্য প্রতিপক্ষ হিসেবে পাওয়া যায় জাসদের সশস্ত্র কার্যকলাপকে। যা বিশেষভাবে শুরু হয় ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চের পর।

চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস হওয়ার পরে ক্ষমতাসীন সরকার তার প্রথম প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে জাসদের মুখপত্র দৈনিক গণকণ্ঠ কার্যালয়ে পুলিশ প্রেরণ করে এবং পত্রিকাটির সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হয়– প্রকাশনাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৫৮৫] এইরূপ পদক্ষেপের মাধ্যমে এ পর্যায়ে জাসদের প্রতি সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতিরই প্রকাশ ঘটছিল। প্রশাসন ও প্যারামিলিশিয়া বাহিনীর হাতে বিশেষ ক্ষমতা আইন থাকায় সরকারের উল্লিখিত নীতি জনসমাজে এক ধরনের বন্যতা তৈরি করে। রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীকে যখন-তখন দীর্ঘ সময় ধরে আটক রাখা, নিপীড়ন কিংবা মেরে ফেলা ইত্যাদি রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ করে ফেলা হয়। যা পরোক্ষে স্বাধীনতার মাধ্যমে অর্জিত শাসকদের নৈতিক শক্তিকে প্রায় ধূলিসাৎ করে দেয়। কারণ এইরূপ অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' তৈরি হয়েছিল।

এ সময় গণবাহিনীর মাধ্যমে জাসদ যে নতুনধারার 'সংগ্রাম'-এর সূচনা করে তাতে প্রধানত 'প্রতিপক্ষ চিহ্নিত করা' হতো একাত্তর ও একাত্তর পরবর্তী

---

৫৮৩ এ বিষয়ে বিশ্লেষণী আলোচনার জন্য দেখুন, আহমদ ছফা, *পূর্বোক্ত*।

৫৮৪ জরুরি অবস্থা জারি হয় চুয়াত্তরের ২৮ ডিসেম্বর। তার পর ২৮তম দিনে (২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫) পাস করিয়ে নেয়া হয় বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রত্যাহারমূলক সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী। (এই সংশোধনী পাসের পর বিস্ময়করভাবে ঐদিনই সংসদ ভবনেই শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। প্রধান বিচারপতির বদলে স্পিকার আবদুল মালেক উকিল সেই শপথ কার্যক্রম পরিচালনা করেন–এও ছিল বিস্ময়কর।) এর ২৯ দিন পরে গঠিত হয় জাতীয় 'একক দল।' একদলীয় এই ব্যবস্থার চার মাসেরও কম সময়ের মধ্যেই পঁচাত্তরের ১৬ জুন চারটি দৈনিক ছাড়া সব দৈনিক সংবাদপত্র বন্ধের ঘোষণা আসে। এভাবে একাত্তর-উত্তর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি গণতন্ত্র বিরোধী এক অভিনব রূপে হাজির হয় জনসমাজে।

৫৮৫ সাঈদ তারেক, *ফিরে দেখা একাত্তর*, সাপ্তাহিক এখন সময়, নিউ ইয়র্ক, ৮ ডিসেম্বর ২০০৯। লেখক ঐ সময় দৈনিক গণকণ্ঠে স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন।

রাজনৈতিক ভূমিকা মূল্যায়নের ভিত্তিতে। অতীতে এবং তখনও সশস্ত্র সংগ্রামে নিয়োজিত এতদাঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো যেভাবে 'শ্রেণীশত্রু' চিহ্নিত করত– গণবাহিনীর পদ্ধতি ও পদক্ষেপ ছিল তা থেকে প্রকৃতই পৃথক। মার্কসবাদী আবরণে পরিচালিত হলেও গণবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছিল মুখ্যত আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থকদের লক্ষ্য করে। ফলে দুটি ঘটনা ঘটে। প্রথমত জাসদ ও গণবাহিনীর পরিসরে এমন লোকও রাজনৈতিকভাবে এসে জড়ো হয় যারা স্রেফ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে বিরোধিতার জন্য একটি রাজনৈতিক মঞ্চ খুঁজছিলেন। জাসদের তাত্ত্বিক আদর্শের সঙ্গে যাদের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের কোনো সংস্রব ছিল না। এ সম্পর্কিত এক চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন মহিউদ্দিন আহমদ। তিনি লিখেছেন,

> একাত্তরের দিনগুলোতে যারা সামরিক জান্তার দালালি করেছিল, তাদের অন্যতম ছিলেন মাওলানা মতিন। পুরানো ঢাকার শ্রমিকদের মাঝে তাঁর ভালো সংগঠন ছিল। বিশেষ করে হোটেল-রেঁস্তোরা শ্রমিক ও পুস্তক বাঁধাই শ্রমিকদের মাঝে। মতিন এক পর্যায়ে জাসদে যোগ দিলেন এবং ঢাকা মহানগরী শাখার সভাপতি হয়ে গেলেন। এসময় ঢাকার এক পত্রিকায় একটি ছবি ছাপা হলো, দেখা যাচ্ছে, একাত্তরের জুলাইয়ে মতিন পাকিস্তানীদের সমর্থনে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই ছবি ছাপা হওয়াতে জাসদ নেতৃত্ব বিব্রত হলেন। মতিনকে সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল পরে।[৫৮৬]

মাওলানা মতিনকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও জাসদের এইরূপ 'ভুল' কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা আকারে ঘটেনি। প্রথমত, শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি তাৎক্ষণিক ক্রোধ; দ্বিতীয়ত আওয়ামী লীগের আক্রমণ থেকে সুরক্ষা পাওয়া এবং তৃতীয়ত 'শত্রুর শত্রু মিত্র'– এইরূপ বিবেচনা তাড়িত হয়ে অনেক এলাকাতে জাসদে এমন অনেক রাজনৈতিক চরিত্রের ঠাঁই হয় যারা দলটির কথিত আদর্শের সঙ্গে মানানসই অতীত বৈশিষ্ট্যের ছিলেন না। এ বিষয়ে রংপুর গণবাহিনীর পলিটিক্যাল কমিশার অলোক সরকার বলেন, 'হ্যাঁ, এরূপ ঘটেছিল। ছাত্রলীগে আমাদের বিপক্ষ শক্তির প্রতি সমর্থনের পর আমাদের মাঝে মুজিবের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। সেটা একটা কারণ ছিল। আবার ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থান নেয়ার পর আমাদের টিকে থাকার একটা প্রশ্ন আসে। এসব বিবেচনায় জাসদে বিভিন্ন আদর্শের মানুষ ঢুকে পড়েছিল।'[৫৮৭] বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে এরূপ 'উদার' সাংগঠনিক নীতি স্বাভাবিকভাবে দলটি সম্পর্কে বিভ্রান্তির উৎস হিসেবে কাজ করেছিল।

---

৫৮৬ মহিউদ্দিন আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭২।

৫৮৭ অলোক সরকার, *অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার*, ২৪ মার্চ ২০১৪, ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে তিনি আর জাসদ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত নন বলে জানিয়েছিলেন।

শুধু আওয়ামী লীগ ও মুজিব বিরোধিতার রাজনীতি জাসদের সামনে দ্বিতীয় সাংগঠনিক যে বিপদ তৈরি করে তা হলো, '৭৫-এর ১৫ আগস্টে মুজিবের মৃত্যুর পর গণবাহিনীর ক্যাডাররা যার যার সাংগঠনিক পরিসরে পুরোপুরি প্রতিপক্ষহীন হয়ে জনগণের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এবং এক জটিল ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়। এক্ষেত্রে আমরা আরও গভীরভাবে তখনকার পরিস্থিতি বোঝার জন্য পরবর্তী অধ্যায়ে দলটির কয়েকটি রাজনৈতিক জেলার মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরবো। তবে তার আগে গণবাহিনীর সশস্ত্র কার্যক্রম সম্পর্কে বিশিষ্ট বামপন্থী তাত্ত্বিক হায়দার আকবর খান রনোর নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় :

> সৈনিক সংস্থা বাদে গণবাহিনীর অন্যান্য ইউনিটসমূহ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা দখল নয়, রক্ষীবাহিনী বা সরকারি কোন বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করাও নয়, মুক্তাঞ্চল গঠন করাও নয়– তার কাজ ছিল গণআন্দোলনকে সশস্ত্র শক্তি দ্বারা রক্ষা করা বা সাহায্য করা; বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগের সশস্ত্র লোকদের হাত থেকে পার্টি কর্মীদের রক্ষা করা। বিপ্লবী গণবাহিনীর কর্মকর্তাদের মত ছিল এ রকমই।
>
> ...কিন্তু যে সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামের লক্ষ্য শুধু আত্মরক্ষা– তা সফল হতে পারে না এবং শেষপর্যন্ত চরমভাবে পরাজিত ও ধ্বংস হতে বাধ্য।...শুধু আত্মরক্ষার জন্য, তাও ব্যাপক জনগণের আত্মরক্ষা নয়– নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র তৎপরতা কখনোই সঠিক পথ নয়। এটা এক ধরনের বামপন্থী বিচ্যুতি এবং মোটেও বিজ্ঞানসম্মত নয়। এটা গণসংগ্রামকে সাহায্য করার চেয়ে ক্ষতি করে বেশি।
>
> ...সত্তর দশকের এই সশস্ত্র সংগ্রামগুলো (গণবাহিনী ও অন্যান্য মাওবাদী সশস্ত্রতা) ছিল জনগণের চিন্তা চেতনার বাইরে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত। এতে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, উদ্যোগ ও ভূমিকা ছিল না।[৫৮৮]

ভিন্নভাবে গণবাহিনী সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ মূল্যায়ন জাসদ ছাত্রলীগের খ্যাতনামা সংগঠক মাহমুদুর রহমান মান্নারও। তাঁর মতে, 'গণবাহিনী ছিল ক্রোধের ফসল। রাজনীতিপ্রসূত নয়। এটা ছিল হঠকারী। এভাবে রাজনীতি হয় না।...এটা ছিল জাসদের ভুল রাজনীতি।'[৫৮৯]

---

৫৮৮ দেখুন, হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম*, গণমুক্তি প্রকাশনী, ১৯৮২, ঢাকা, পৃ. ৬৯, ১৬৮-১৭২।

৫৮৯ মাহমুদুর রহমান মান্না, বাংলাদেশ প্রতিদিন, *পূর্বোক্ত*।

৭
রক্ষীবাহিনী-গণবাহিনী-'নকশাল' : একাত্তর পরবর্তী ত্রিমুখী গৃহযুদ্ধ

৭.ক: কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের আগেই সশস্ত্র আত্মরক্ষায় নামে জাসদ কর্মীরা

গণবাহিনীর সশস্ত্রতার সামাজিক পটভূমির খোঁজে জেলাভিত্তিক অনুসন্ধান

অতীতে একটি নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদের জন্য আপনারা একটি বিশেষ বাহিনী তৈরি করেছিলেন। এখন এই বাহিনী নেই। ঐ ধরনের রাজনীতি কি ভুল ছিল?

সরকারকে উৎখাতের জন্য নয়, তৎকালীন সরকারের সন্ত্রাসকে মোকাবেলা করার জন্যেই বিপ্লবী গণবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। আমাদের ঐ ধরনের রাজনীতি ভুল ছিল এ রকম কোন সিদ্ধান্ত আমরা নিইনি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের কারণে ১৯৭৮ সালের দিকে আমরা গণবাহিনীর কার্যক্রম স্থগিত রাখি।

তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন প্রয়োজনে পুনর্বার গণবাহিনী পুনরুজ্জীবিত করবেন?

আমাদের মতো দেশে জাতিকে ঐ ধরনের কাজে আবার যে যেতে হবে না, এ রকম নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। তবে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করার সব রকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করার নীতিকেও আমরা নাকচ করি না। এ রকম একটি গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিপ্লবী গণবাহিনীর প্রয়োজন হবে না, এটাও কেউ বলতে পারে না।

–জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনুর সাক্ষাৎকার,
'সব লেনিন লেনিন নয়–সব জাসদ জাসদ নয়',
সাপ্তাহিক সন্দীপ, ২৮ আগস্ট ১৯৮৯, ঢাকা।

প্রথমে মুজিব বাহিনী এবং পরে মুজিব বাহিনী থেকে রক্ষীবাহিনী ও গণবাহিনী গড়ে ওঠার কাহিনী ইতোমধ্যে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। জাসদের সশস্ত্র অঙ্গসংগঠন হিসেবে গণবাহিনীর কার্যক্রমে যেসব অঞ্চল তুলনামূলকভাবে বেশি জাতীয় মনোযোগ পেয়েছিল তার মধ্যে বাংলাদেশের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে মানিকগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুজিব শাসনামলের সশস্ত্র অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান

করতে এই অঞ্চলটিকে আমরা 'কেসস্টাডি' এরিয়া হিসেবে নিয়েছিলাম। এসব জনপদে অনুসন্ধানের আলোকে উপলব্ধি হলো, প্রায় সর্বত্র একাত্তরের সংঘাতেরই একধরনের ধারাবাহিকতা ও বহুমুখীকরণ চলছিল তিয়াত্তর-চুয়াত্তরেও। জাসদের সশস্ত্র শাখা হিসেবে গণবাহিনীর বিকাশ ঐসব এলাকায় সশস্ত্র সংঘাতের ত্রিমুখী (কোথাও কোথাও চতুর্মুখী) এক পরিস্থিতি তৈরি করে– যাতে শামিল ছিল গণবাহিনী ও তাদের আওয়ামী প্রতিপক্ষসমূহ ছাড়াও নকশাল ধারার সংগঠনগুলো এবং সিরাজুল হক সিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি। উপরোক্ত ছয় জেলার পাশাপাশি আমরা ফরিদপুর, রাজশাহী ও রংপুরের কিছু অভিজ্ঞতাও এ পর্যায়ে তুলে ধরবো– যা থেকে দেখা যাবে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজনীতির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেখানেও গণবাহিনী গঠন করা হয়েছে এবং তা কার্যত সরকারি প্যারামিলিশিয়া ও পেটোয়া বাহিনীগুলোর কার্যক্রমকে প্রশাসনিক ও সামাজিক বৈধতা দিয়েছে। কেসস্টাডির জন্য উপরোক্ত মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলকে বেছে নেয়ার আরেকটি কারণ ছিল বগুড়ার বাইরে এসব অঞ্চলেই গণবাহিনী নিজের 'বিকাশ' ঘটাতে পেরেছিল সর্বাধিক।

মানিকগঞ্জ

'এই জেলায় এক যোগে সকল থানা দখল এবং সেই দখল রক্ষা করার মতো জনবল ও অস্ত্র গণবাহিনীর ছিল'

মুক্তিযুদ্ধে মানিকগঞ্জে সবচেয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক দল ছিল মোজাফফর ন্যাপ। এই দলের স্থানীয় নেতা অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধকালীন নয় মাস সমগ্র জেলায় আধিপত্য করেছে। তাঁর দুই প্রধান সহযোগী ছিলেন শিবালয়ের প্রিন্সিপাল আবদুর রব এবং হরিরামপুরের আবদুল মতিন চৌধুরী। এর পাশাপাশি মাঠে ছিল মোসলেউদ্দিন খান হাবু মিয়ার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ। হাবু মিয়ার সঙ্গে এ দলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন সিদ্দিকুর রহমান, সাইদুর রহমান, এলাহি বক্স, প্রকৌশলী তবরাক হোসেন, আবুল খায়ের ঘটু প্রমুখ। ছাত্রলীগের প্রায় পুরো নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল বিএলএফ-এ। এদের নেতৃত্ব দিতেন তখন মফিজুল ইসলাম খান কামাল, আনিসুর রহমান খান, শাহাদাত হোসেন বাদল বিশ্বাস, মনসুর আলম খান, গিয়াস, ইকবাল হোসেন খান প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজে 'জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী' ভেঙে দেওয়ার পর হালিম চৌধুরীর যোদ্ধারা অস্ত্রসমর্পণ করে যে যার পুরানো পেশায় ফিরে যায়। হালিম চৌধুরী বা তাঁর সহযোগিরা ব্যাপক সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক সত্ত্বেও জেলার রাজনীতির প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে পারেননি। নিজ দলের সরকার সমর্থক ভূমিকার কারণে এক পর্যায়ে ন্যাপ (মোজাফফর) থেকে পদত্যাগও করেন হালিম চৌধুরী। এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধোত্তর সমাজে সৃষ্ট নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণে আগ্রহী হয়ে

ওঠে তখনকার ছাত্র নেতৃবৃন্দ। উপরন্তু এদের অনেকে ছিলেন ব্যাপক অস্ত্রের অধিকারী। শহরের দেবেন্দ্র কলেজ ছিল এই তরুণদের প্রধান কেন্দ্র। থানা পর্যায়েও তারা এক প্লাটুন করে অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধার শক্তি সমাবেশ করে রেখেছিলেন ক্যাম্প তৈরি করে। হরহামেশা 'দালাল' ও 'স্বাধীনতা বিরোধী' চিহ্নিত করে নানান জনকে ধরে আনা হচ্ছিল এসব ক্যাম্প। শাস্তিও দেওয়া হচ্ছিলো নানান আদলে। এ নিয়ে এক ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় 'মুক্তিযোদ্ধা'দের মধ্যে।[৫৯০] রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তখন কেবল নিজেদের অতি দুর্বল অস্তিত্ব নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টায় রত।

১৬ ডিসেম্বরের পরবর্তী সরকারের মিলিশিয়া গঠনের উদ্যোগের অংশ হিসেবে মানিকগঞ্জেও একটি মিলিশিয়া ক্যাম্প হয়। বিএলএফ তাতে যোগ দেয়নি। উপরন্তু ভারতীয় প্রশিক্ষকরা সেখানে কার্যক্রম শুরুর স্বল্প সময়ের মধ্যে শহরে বিএলএফ ও সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে মিলিশিয়া ক্যাম্পের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সরাসরি এসব দ্বন্দ্বে নেতৃত্ব না দিয়ে আর্থিক ও প্রশাসনিক দিকেই মনোযোগী হয়ে থাকেন। সর্বত্র স্বাভাবিক দলীয় আধিপত্য তখন তাদের। কিন্তু তারা চাইছিলেন আরও বেশি কিছু। এরই এক ধরনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং কেন্দ্র থেকে সিরাজুল আলম খানদের প্রভাবে এসময়ই স্থানীয় বিএলএফ-এ ভাঙ্গন ধরে। সমাজতন্ত্রের বার্তা নিয়ে একদিন হাসানুল হক ইনু এলেন মানিকগঞ্জে। প্রকৌশলী আনিসুর রহমানদের সঙ্গে পূর্ব যোগাযোগের সূত্রে এভাবেই 'আলাদা পার্টির ভিত্তি' তৈরি হলো অন্যান্য স্থানের মতো এ জেলাতেও। 'আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নতুন করে আর পুঁজিপতি শ্রেণি তৈরি হতে দেওয়া হবে না'–এমনি একটি ভঙ্গি ছিল নতুন রাজনৈতিক উদ্যোক্তাদের। শেখ ফজলুল হক মণি'র সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে মফিজুল ইসলাম খান কামালের নেতৃত্বে বিএলএফ-এর একটি অংশ নতুন এই দলে আসলেন না। স্থানীয় পর্যায়ে যাঁরা স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন না কিংবা যুদ্ধোত্তর 'মুক্তিযোদ্ধা'দের কার্যক্রমে যাঁরা বিরক্ত ছিলেন তাঁরা আগ্রহ ভরেই আনিসুর রহমানদের নতুন দলকে বেশ ভালোভাবে উৎসাহ যোগালেন। জাসদ গঠনের পরপর রাজনৈতিকভাবে পুরানো আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে যতটা না– তার চেয়ে বেশি বৈরিতা তাদের তৈরি হলো কামালের নেতৃত্বাধীন যোদ্ধাদের সঙ্গে। সিদ্দিক মাস্টার ও বাদল বিশ্বাস নামে জেলার নেতৃস্থানীয় দুই জাসদ সংগঠক দ্রুত খুন

---

৫৯০ এ রকম ঘটনা দেশের অন্যত্রও ঘটছিল ব্যাপক হারে এবং তা ছিল স্পষ্টত তাজউদ্দীন আহমদের এতদসংক্রান্ত নির্দেশনার সুস্পষ্ট বরখেলাপ। ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন, ...no arrest, search or seizure of propertity, including houses or vehicles shall be made except by the civil police or agencies specifically authorized by the Government...বিবৃতিটির পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যের জন্য দেখুন, মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০।

হলেন এই বৈরিতায়। যুবলীগও এসময় জাসদকে সশস্ত্রভাবে মোকাবেলায় নামে। বিএলএফ-এর যোদ্ধা আলমগীর ছিলেন এর নেতৃত্বে। সিদ্দিক মাস্টার ও বাদল বিশ্বাস নিহত হওয়ার পর জাসদও প্রতিশোধের রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে। বড় নেতৃত্ব না হলেও লীগ সমর্থক অনেক চেয়ারম্যান ও যুবলীগের সংগঠক তাদের হাতে নিহত হয়। এক পর্যায়ে গণবাহিনী গঠনের পর পুরো জেলার জাসদের সশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ তখন কম ক্ষেত্রেই বাড়িতে থাকতে পারতেন। এসময় তিয়াত্তরের ডিসেম্বরে সিপিবি ও ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠকদের সহায়তায় দক্ষিণ মানিকগঞ্জে নান্নু ও নাজিম নামে গণবাহিনীর দুই ক্যাডারকে পিটিয়ে মেরে ফেলার মধ্য দিয়ে গণবাহিনীর জন্য বৈরিতার আরেকটি ফ্রন্ট খুলে যায়। শাসক দলেও এসময় সশস্ত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যার পরিণতিতে আরিচাকেন্দ্রিক শ্রমিকদের লাল বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ নেতা লেবু মিয়া খুন হন।

আনিসুর রহমান খান, সারোয়ার-উল আলম চৌধুরী প্রমুখ মুজিব বাহিনীর যোদ্ধা মূল সংগঠক হলেও প্রথমে জাসদের প্রকাশ্য নেতৃত্বে রাখা হয় আওয়ামী লীগ থেকে ছুটে আসা অধ্যাপক আবদুল লতিফ ও অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে। গণবাহিনী গঠনের পর ঐ বাহিনীর সংগঠকরাই ধীরে ধীরে দলটির নেতা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন স্থানীয় সমাজে। আনিসুর রহমান (পরে দুর্ঘটনায় নিহত) ছাড়াও গণবাহিনীর প্রধান আরও কয়েকজন সংগঠক ছিলেন ইকবাল হোসেন খান, আফজাল হোসেন খান, সামছুল আলম খান প্রমুখ।

ভৌগোলিকভাবে পার্শ্ববর্তী টাঙ্গাইলের নাগরপুরে জাসদ সমর্থক 'বাতেন বাহিনী'র উপস্থিতিও মানিকগঞ্জে সশস্ত্র কার্যক্রম বিস্তারে সহায়তা করে জাসদকে। কেন্দ্রের তরফ থেকে গণবাহিনীর মানিকগঞ্জ-টাঙ্গাইল-গাজিপুর অঞ্চল তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন হাসানুল হক ইনু। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গণবাহিনী' গঠনের আগেই মানিকগঞ্জে জাসদ কর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন সশস্ত্র। স্থানীয় গণবাহিনীর সংগঠক সামছুল আলম খান বর্তমান লেখককে বলেছেন, এক যোগে জেলার সকল থানা আক্রমণ করে দখল করা এবং সেই দখল রক্ষা করার মতো যথেষ্ট জনবল এবং অস্ত্র তাদের ছিল। কিন্তু গণবাহিনী গঠিত হলেও কেন্দ্র থেকে বিশেষ কোনো কার্যক্রমের নির্দেশনা ছিল না তাঁদের। মাঝে মাঝে কিছু ডাকাত মারা হতো– যাতে ডাকাতদের ধরার অজুহাতে মাঠ পর্যায়ে পুলিশ কোনো তৎপরতা চালানোর জন্য আসতে না পারে। পুলিশ অবশ্য জাসদের প্রতি মোটেই বৈরি ছিল না। বিশেষত বাকশাল গঠনের পর। জেলার বিভিন্ন স্থানে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প থাকলেও গণবাহিনীর সঙ্গে তাদের বড় কোনো সংঘর্ষের নজির নেই।

যদিও কেন্দ্র থেকে বলা হচ্ছিল জাসদ গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সেই গণঅভ্যুত্থান যেদিন ঘটছিল (১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর) সেটা

মানিকগঞ্জের গণবাহিনীর কাউকে পূর্ব থেকে জানানোও হয়নি। রেডিওর মাধ্যমে স্থানীয় শাখা জানতে পারে–ঢাকায় সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান হচ্ছে। তবে 'সংবাদ' আসে, ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে কিছু সৈনিক মানিকগঞ্জে চলে আসতে পারে। সেজন্য অনেকগুলো বড় নৌকা প্রস্তুত রাখা হলেও ঐ সৈনিকরা আর আসেনি। জাসদের ঐ সময়ের অভ্যুত্থানকেন্দ্রিক রাজনীতির যোগাযোগহীনতার দৃষ্টান্ত হিসেবে এও দেখা যায়–তাৎক্ষণিকভাবে দলবদ্ধভাবে না এলেও সাত নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর সেনাবাহিনীতে কর্মরত স্থানীয় কয়েকজন সুবেদার এক পর্যায়ে কিছু অস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন মানিকগঞ্জে জাসদ কর্মীদের দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেটা গ্রহণের জন্য যথাস্থানে কাউকে না পেয়ে তাঁরা পরে সেনানিবাসে ফিরে যান।[৫৯১]

মানিকগঞ্জে জাসদের সশস্ত্রতার মাঝেই সর্বহারা পার্টিও কয়েকটি সফল অপারেশন করে। বানিয়াজুরি ইউনিয়নে মহাদেবপুরে রেজিস্ট্রি অফিস লুট এবং জাবরা পুলিশ ফাঁড়ি লুট ছিল এর অন্যতম। তবে স্থানীয় সমাজে এই দলের

---

৫৯১ বর্তমান লেখককে প্রায় অনুরূপ ঘটনার কথা জানিয়েছেন কুমিল্লার গণবাহিনীর পলিটিক্যাল কমিশার হাবিবুল্লাহ চৌধুরী। সেখানেও সাত নভেম্বরের ২-৩ দিন পরে বিপুল সংখ্যক সৈনিক একপর্যায়ে সেনানিবাস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল গণবাহিনীর কাছে আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু কেন্দ্র থেকে যথাযথ নির্দেশনা না থাকায় গণবাহিনী উল্লিখিত সৈনিকদের আশ্রয় দেয়নি; বরং নিজেরা আত্মগোপনে চলে যায়। পরে ঐ সৈনিকরা আবার সেনানিবাসে ফিরে যায়। রংপুরেও সেনানিবাস ছেড়ে 'বিপ্লবের ডাক দিয়ে' সৈনিকদের এভাবে বেরিয়ে আসা এবং পুনরায় সেনানিবাসে ফিরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন সেখানকার গণবাহিনীর পলিটিক্যাল কমিশার অলক সরকার। তবে কিছু স্থানে এরূপ প্রত্যাবর্তনের ব্যতিক্রমও রয়েছে। সৈনিক সংস্থার কিছু সংগঠক নভেম্বর বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর আর সেনানিবাসে ফেরত যাননি। এরা পরে গণবাহিনীর সঙ্গে বেসামরিক জনপদে কাজে যুক্ত হন। কেউ কেউ আবার জনবিচ্ছিন্ন সশস্ত্র তৎপরতা চালাতেও শুরু করেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনার জন্ম দেন মেজর জিয়াউদ্দিন। নভেম্বর বিপ্লবে আবু তাহেরের পর তিনিই ছিলেন সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সেনা কর্মকর্তা। অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি ২০-২৫ জন সেনাসদস্যকে নিয়ে ঢাকা থেকে একটি দোতলা লঞ্চ হাইজ্যাক করে প্রথমে শরণখোলা ও পরে গভীর সুন্দরবনে ঢুকে পড়েন। শরণখোলায় তাঁরা পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বেঁধে থানা থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং স্থানীয় সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে বিপুল খাদ্যশস্য লুট করে নিয়ে যান। আশপাশের অঞ্চলের গণবাহিনীর বেসামরিক যোদ্ধারাও এ পর্যায়ে বনের ভেতরে গিয়ে জিয়াউদ্দিন ও সহযোগীদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালের ৪ ডিসেম্বর সমগ্র খুলনা অঞ্চলের পুলিশ প্রশাসন ও নৌ বাহিনী মিলিত অভিযান চালিয়ে দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহের চোরাগোপ্তা যুদ্ধ শেষে ২ জানুয়ারি জিয়াউদ্দিনকে আটক করতে সমর্থ হয়। এসময় খুলনার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন মোফাজ্জল করিম। এর আগে তিনি কুষ্টিয়ার ডিসি ছিলেন। তাঁর দেয়া বিবরণ থেকে জিয়াউদ্দিনের আটকাভিযানের বিস্তারিত দেখুন, *জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১-১৯৮। তবে এই অভিযানে গণবাহিনীর সামরিক ও বেসামরিক অপরাপর যোদ্ধাদের সুন্দরবন থেকে পুরোপুরি উৎখাত করা যায়নি।

সাংগঠনিক কার্যক্রমের খুব বেশি প্রভাব ছিল না। অন্যদিকে পুলিশ গণবাহিনীর প্রতি নমনীয় থাকলেও সর্বহারা পার্টির কর্মকাণ্ডের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল। 'সর্বহারা' দমনে মানিকগঞ্জ পুলিশ গণবাহিনীর কর্মীদের কাছ থেকে তথ্য সহায়তাও পেত বলে জানিয়েছেন গণবাহিনীরই একজন সংগঠক।

কুষ্টিয়া

বিবাদ ছিল জাসদ-আওয়ামী লীগ-ইপিসিপি (এমএল)-এর মাঝে ত্রিমুখী

কুষ্টিয়ার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সেখানে একাত্তরের মার্চে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সরকারি কোষাগারে থাকা অস্ত্র লুণ্ঠনের মাধ্যমে। এলোপাথাড়িভাবেই এসব অস্ত্র জনগণের কাছে চলে যায় তখন। পরে একাত্তরের নয় মাসে জনসমাজে এভাবে অস্ত্রের অনুপ্রবেশ বেড়েছে কেবল।

একাত্তরে কুষ্টিয়ার রাজনীতিতে প্রধান শক্তি ছিল আওয়ামী লীগ। তরুণ সমাজে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে ছিল ছাত্রলীগ। আওয়ামী লীগে প্রধান নেতা ছিলেন ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, আজিজুর রহমান আক্কাস, আবদুর রউফ চৌধুরী, আনোয়ার আলী প্রমুখ। ছাত্রলীগে গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন রশিদুজ্জামান দুদু ও শামসুল আলম দুদু, এম এ বারী প্রমুখ। একাত্তরের পর এরাই কুষ্টিয়ার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন। কিন্তু এদের ছত্রছায়ায় মুক্তিযুদ্ধে নিতান্তই গৌণ ভূমিকার একদল তরুণ[৫৯২] ১৬ ডিসেম্বরের পরে পুরো কুষ্টিয়ার প্রভু হয়ে ওঠায় জনসমাজ ছিল বিক্ষুব্ধ। চারদিকে সশস্ত্র এই নবীনদের দৌরাত্ম্য ছিল বাধাহীন। রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যায় এরা। পদ্ধতি ছিল স্রেফ লুণ্ঠন। প্রকৃত ও সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা এ পরিস্থিতিতে ছিলেন একেবারেই আশাহত, বিক্ষুব্ধ। সমাজ জীবনে প্রত্যাশিত 'পরিবর্তন' না দেখে তাঁরা বিকল্প খুঁজছিলেন তখন। এদেরই একজন দৌলতপুরের রেজাউল হকের ভাষায়, 'যুবলীগ ও লালবাহিনীর সন্ত্রাস ও খুনের প্রতিবাদ করতে গিয়েই আমাদের স্বাধীন সত্তা বিকশিত হতে থাকে। অর্থাৎ এসব প্রতিরোধের একটি সেন্টিমেন্ট তৈরি হয় আমাদের মাঝে। জাসদ ছিল সেই সেন্টিমেন্টের রাজনৈতিক রূপ।'[৫৯৩]

---

৫৯২ এরা তখন কুষ্টিয়ায় 'ফাইভ স্টার' গ্রুপ নামে একটি জঙ্গী গ্রুপ গঠন করেছিল, যাদের নিয়ন্ত্রক ছিলেন আওয়ামী লীগের উপরে উল্লিখিত নেতারা। 'ফাইভ স্টার' গ্রুপের কার্যক্রম জনমনে আতঙ্ক তৈরি করে। তারাই কুষ্টিয়া শহরের অলিখিত প্রশাসক হয়ে ওঠে।

৫৯৩ জাসদ গঠিত হওয়ার পর রেজাউল হক ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার সম্পাদক। ৫৮ বছর বয়সী এই সংগঠক বর্তমানে দৌলতপুরের বড়গাঙদিয়া নাসিরউদ্দিন বিশ্বাস কলেজের অধ্যক্ষ। জাসদেও কাজ করছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে। তাঁর সঙ্গে লেখকের কথা হয় ২০১৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দৌলতপুরে।

এসময় পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (ইপিসিপি-এমএল)[৫৯৪]-এর স্বল্পসংখ্যক সংগঠকও অত্র এলাকায় সক্রিয় ছিলেন। যাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল হামিদ, আইয়ুব আলী, আনিসুর রহমান মল্লিক, মনসুর হাবিব, আবদুল মতিন প্রমুখ। এরা ছিলেন আবার ভাসানী ন্যাপের অ্যাডভোকেট বদরুদ্দৌজা, আবদুল কাদের প্রমুখের আদর্শিক সহযোগী। কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সংগঠকই তখন ন্যাপের ছত্রছায়ায় থেকে প্রকাশ্য কাজ করতেন। উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অ্যাডভোকেট বদরুদ্দৌজাকে আওয়ামী লীগ অনুসারীরা মুক্তিযুদ্ধকালেই হত্যার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। তবে বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে তাতে সফল হয় যুবলীগ; নিজ বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা প্রকাশ্যে খুন হন তিনি।

উল্লেখ্য, ইপিসিপি-এমএল সংগঠকরা তখন নকশালবাড়ি মডেলে শ্রেণিশত্রু খতমের 'লাইন' দ্বারা প্রভাবিত। আওয়ামী লীগের তরুণ ক্যাডারদের তুলনায় ইপিসিপি-এমএল'র এই তরুণদের ন্যায়নিষ্ঠ ও ত্যাগী মনোভঙ্গি জনসমাজে বিশেষ জায়গা পেতে শুরু করে। তবে জাতীয় প্রশ্নে এদের ছিল বিপজ্জনক রকমে অস্বচ্ছতা ও অস্পষ্টতা। এদের হাতেই পরে খুন হয় আওয়ামী লীগের আঞ্চলিক নেতা জসিম উদ্দিন হেডমাস্টার।

অন্যদিকে একই সময়ে ইপিসিপি-এমএল থেকে বেরিয়ে আসা আরেকটি কমিউনিস্ট গ্রুপও সক্রিয় ছিল কুষ্টিয়ায়। এদের নাম ছিল পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি-এমএল (ইবিসিপি-এমএল)। কেন্দ্রীয়ভাবে এদের নেতা ছিলেন মনিরুজ্জামান তারা। আর কুষ্টিয়া পর্যায়ে নেতা ছিলেন ভেড়ামারা কলেজের শিক্ষক 'লুৎফর প্রফেসর'। সামরিক কমান্ডার ছিলেন কামাল (কমান্ডার পাখী নামে পরিচিত ছিলেন যিনি)।[৫৯৫]

ইতোমধ্যে ঢাকায় ছাত্রলীগে দ্বিধাবিভক্তির মধ্য দিয়ে যেভাবে মুজিব ও আওয়ামী লীগের শাসন-সংস্কৃতির বিরোধিতা শুরু হয় তার ঢেউ লাগে কুষ্টিয়াতেও। সেখানে শামসুল হাদী (সদর), মারফত আলী (মিরপুর), ইয়াকুব আলী, রেজাউল হক (দৌলতপুর), আবদুল হান্নান (কুমারখালী), লোকমান হোসেন (সদর) প্রমুখ জনপ্রিয় তরুণ– যাদের অনেকেই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা,

---

৫৯৪ ১৯৭৮ সালে এই পার্টিই বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) নাম ধারণ করে এবং ধীরে ধীরে সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন ছেড়ে দেয়। কৃষক সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নামে এরা এখন প্রকাশ্যে রাজনীতির চেষ্টা করছে।

৫৯৫ রক্ষীবাহিনীর হাতে পরে নিহত হন ১৯৭৪ সালে। তাঁকে গ্রেফতার শেষে হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়– ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দেখানোর জন্য। হত্যার আগে প্রতিপক্ষকে বন্দি অবস্থায় দেখার এরূপ ঘটনা একাত্তর পরবর্তী সময়ে একাধিকবার ঘটেছে। এর মধ্য দিয়ে বিচারবহির্ভূত এসব হত্যার দায়িত্ব পরোক্ষে নীতিনির্ধারকদের ওপরও বর্তায়। আবার এরূপ আচরণ একধরনের প্রতিশোধমূলক মানসিকতারও নির্দেশ করে। সিরাজ সিকদারের ঘটনা এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

আওয়ামী লীগের অপশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেন। এদের মধ্যে মারফত আলী স্থানীয় আমলা অঞ্চলে আখচাষিদের স্বার্থে সংগঠিত আন্দোলনে সংগঠকের ভূমিকা পালন করে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। মারফত আলী ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন 'গণনেতা'। এদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর বৈরিতার পালে হাওয়া লাগে যে ঘটনায় তা হলো– একদিন আওয়ামী লীগ নেতা আজিজুর রহমান আক্কাসের অনুসারীরা ১৯টি ট্রাকে করে যখন ভারতে পাটের চোরাই চালান পাঠাছিলেন– তাতে বাধা দেন মারফত আলীরা। তখনও জাসদ গঠিত হয়নি, তবে এই বিবাদের রেশ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নেয়া হয় কুষ্টিয়া শহরের একটি গলিতে মারফতকে হত্যা করার, যদিও তিনি বেঁচে যান ঐ যাত্রা। এ নিয়ে তীব্র গোলমালে সিরাজুল আলম খান সমর্থকদের সঙ্গে সংঘাতে অবতীর্ণ হয় আওয়ামী লীগ সমর্থক বিপরীত গ্রুপের কর্মীরা– যাদের হাতে তখন প্রচুর অস্ত্র। যদিও তিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে (জাসদ, ইপিসিপি-এমএল, ইবিসিপি-এমএল) একক শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না তারা।[৫৯৬]

জাসদের শক্তি তখন ক্রমে বাড়ছিল। সামরিক তৎপরতাও। আওয়ামী লীগের স্থানীয় এমপি গোলাম কিবরিয়াকে কুমারখালীতে প্রকাশ্যে হত্যা করে তারা। এক পর্যায়ে 'পরিস্থিতি সামাল দিতে' রক্ষীবাহিনীর ডাক পড়ল। এখানে রক্ষীদের নেতৃত্বে ছিলেন 'লিডার' রেজা। তাদের 'তৎপরতা' আওয়ামী লীগকে আরও অ-জনপ্রিয় এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সরকারি দলের নেতৃবৃন্দ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তাকেই তুলে নিয়েছে রক্ষীবাহিনী। এই প্রক্রিয়াতেই ইপিসিপি-এমএল'র সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণ নেতা আবদুল হামিদও খুন হন রক্ষীবাহিনীর হাতে। বাইসাইকেলে করে যাওয়ার পথে কুষ্টিয়া রেলগেট এলাকা থেকে যুবলীগ কর্মীরা হামিদকে ধরে তুলে দেয় রক্ষীবাহিনীর হাতে– আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁর। এভাবে পুরো কুষ্টিয়া এক অভিশপ্ত জেলায় পরিণত হয় ঐসময়। কুষ্টিয়ার কমলাপুরের পাশের খালে প্রতিদিনই লাশ দেখতে পাওয়া প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিল জনগণের কাছে। প্রতিযোগিতামূলকভাবে চারদিকে 'একশান' হচ্ছে তখন। মিরপুর উপজেলার 'আটিগ্রাম' নামের একটি গ্রামের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় জাসদ-আওয়ামী লীগ-ইপিসিপি (এমএল)'র ত্রিমুখী বিবাদে অন্তত ১৯ জন মানুষ মারা গেছে এখানে। নিহতদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল গরিব চাষি পরিবারের তরুণ– মূলত বামপন্থী সংগঠনগুলোর সমর্থক হওয়ায় তারা ছিল যুবলীগ ও রক্ষীবাহিনীর নির্মম শিকার। এসব খুনের জন্য কাউকে কোনো পর্যায়ে তখনও এবং কখনোই জবাবদিহি করতে হয়নি।

---

[৫৯৬] কেবল আলমডাঙ্গায় কাজী কামালের নেতৃত্বে যুবলীগ ব্যাপক সন্ত্রাসের মাধ্যমে অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছিল।

গণবাহিনী গঠনের পর কুষ্টিয়ায় ইপিসিপি-এমএল'র একটি দুর্ধর্ষ গ্রুপ (লাল্টু-মন্টু নামের দু' ভাইয়ের নেতৃত্বে) জাসদে যোগ দেওয়ায় তাদের সামরিক শাখার অভিযান ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় এবং পুরো অঞ্চল জুড়ে খুনোখুনিও বাড়ে তাতে। এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গার জেলা সমীক্ষায় সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের শুরুতে মেহেরপুরে সরকারি কোষাগারে থাকা অস্ত্র লুট করে গণবাহিনীর এই ক্যাডাররা। পুলিশ তখন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি বা করেনি। তবে সেই অভিযানে মন্টু মারা যাওয়ায় এবং কিছুদিন পর (১৯৭৫ সালের ১১ মে) রক্ষীবাহিনীর হাতে শামসুল হাদি, মুসা, উম্মত আলী প্রমুখ কুষ্টিয়াকেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকদের প্রায় ১০-১১ জন একই সঙ্গে খুন হওয়ায় অত্র এলাকায় গণবাহিনীর অভিযানের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে আসে। দৌলতপুর ও আমলার সীমান্ত এলাকায় ছাতারপাড়া নামের গ্রামে সংগঠিত সম্মুখ যুদ্ধের এই বিপর্যয়ে গণবাহিনীর স্থানীয় প্রথম সারির সামরিক সংগঠকদের অনেকেই নিহত হন। পাশাপাশি এ সময় 'রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ'ও অধিকাংশ একে একে আটক হয়ে পড়ে সরকারের হাতে।

ছাতারপাড়ার যুদ্ধে রক্ষীবাহিনী প্রায় হাতাহাতি যুদ্ধে হত্যা করলেও শামসুল হাদিকে ব্যক্তিগতভাবে শনাক্ত করতে পারেনি; স্থানীয় আওয়ামী লীগ সংগঠকরা সে কাজে সহায়তা দেন। হাদি ও তাঁর সহযোদ্ধাদের লাশ দু'দিন ঘটনাস্থলেই পড়েছিল। পরে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসন উদ্যোগী হয়ে সেগুলো উদ্ধার ও কবরস্থ করে। সেসময় অত্র অঞ্চলে ভয়ের সংস্কৃতি এত তীব্র ছিল যে, হাদি ব্যতীত অন্যদের লাশ গ্রহণের জন্য তাঁদের কোনো নিকটাত্মীয় প্রশাসনের ডাকে সাড়া দেয়নি। পরে রাতের আঁধারে কবর থেকে সেসব লাশ তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

শামসুল হাদী– এমপি গোলাম কিবরিয়াকে হত্যায় জড়িত ছিলেন বলে স্থানীয় আওয়ামী লীগের অভিযোগ ছিল। উল্লেখ্য, শামসুল হাদী (জন্ম : ১৯৫২) ছিলেন কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়ার সন্তান এবং জাসদ সমর্থিত কৃষক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। একাত্তরের ৩ মার্চ সিরাজুল আলম খানের কুষ্টিয়াস্থ সাত সদস্যবিশিষ্ট 'নিউক্লিয়াস'-এর সবচেয়ে শিক্ষিত ও আদর্শবাদী একজন হিসেবে তিনি সেখানে প্রকাশ্য জনসভায় স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন এবং ২৩ মার্চ 'জয়বাংলা বাহিনী'র কুচকাওয়াজে নতুন দেশের পতাকা উত্তোলন করেন। কুষ্টিয়ার জাসদ রাজনীতি ও গণবাহিনীর সশস্ত্রতায় তিনি ছিলেন অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ– ফলে তাঁর মৃত্যু গণবাহিনীর জন্য ছিল প্রচণ্ড আঘাত।

রক্ষীবাহিনীর হাতে এরূপ বিপর্যয়ের আগে থেকে জাসদের সঙ্গে স্থানীয় ইপিসিপি-এমএল'এরও সশস্ত্র দ্বন্দ্ব শুরু হয়। লিয়াকত ও মোশারফ নামে শেষোক্তদের দুই গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধা মারা যায় এপর্যায়ে। উভয়ে রক্ষীবাহিনীর হাতে

খুন হন– লিয়াকত চুয়াডাঙ্গায়, মোশারফ দৌলতপুরে। এভাবে সকলেরই শক্তি ক্ষয় হচ্ছিল। যদিও চুয়াত্তর নাগাদ ইপিসিপি কুষ্টিয়ায় ৩০-৪০ জনের চৌকস এক গেরিলা বাহিনী তৈরি করে ফেলেছিল– যারা সশস্ত্রভাবেই চলাফেরা করত। মিরপুরের কাকিলাদহে তারা ১৯৭৪ সালে পুলিশের ট্রাকে আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ২০টি অস্ত্র লুট করে নেয়। কিন্তু এইরূপ উচ্চতর অভিযান ক্ষমতাও বেশি দিন ধরে রাখা যায়নি– সম্ভব হয়নি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে গেরিলা যুদ্ধ বিস্তৃত করাও। গণআন্দোলন–গণসংগ্রামে অনুপস্থিতির ফলে রাজনীতির প্রকাশ্য পরিসরে শেষবিচারে আওয়ামী প্রাধান্যই থেকে যায়।

অন্যদিকে এসময় নানান ঘটনা প্রবাহে জাসদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বৃহৎ অংশকে কারাগারে যেতে হয়। হতাশার একটি আবহ দেখা যায় তাদের জাতীয় রাজনীতিতে।[৫৯৭] ইত্যিবসরে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে ঘটনা ঘটে গেছে। জাসদ ও নকশাল, উভয় ধারার কর্মীরাই তাদের সক্রিয়তার রাজনৈতিক অভিমুখ হারিয়ে ফেলেছে ততদিনে। কিন্তু অস্ত্রের সামাজিক ব্যবহার রয়েই যায় সেই জনপদে। যার পরিণতিতে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কিংবদন্তি নেতা মারফত আলী মারা গেলেন– প্রায় রাজনৈতিক পরিচয়হীন আন্ডারগ্রাউন্ড এক শক্তির হাতে। তাঁর মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে পুরো জেলা জুড়ে দলটির রাজনৈতিক বাঁধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে শুরু করল। এলাকাকেন্দ্রিক দলাদলিও থামল না– যদিও তার কোনো জাতীয় রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকল না অনেক ক্ষেত্রেই। তবে অনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক অস্ত্রের ভয়ংকর বিপদের বিষয়টি আবারও জাতীয় মনযোগে চলে আসে যখন জাসদের অন্যতম মুখ্য নেতা এবং বিএলএফ'র অন্যতম সংগঠক খোদ কাজী আরেফ আহমেদ ১৯৯৯ সালে খুন হন কুষ্টিয়ায়।[৫৯৮]

---

৫৯৭ ঠিক এসময়টায় আলমডাঙ্গায় দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে ওয়াজ করতেও দেখা গিয়েছিল। সরকার বিরোধী তাঁর বক্তব্য সেদিন জাসদ ও ইপিসিপি-এমএল উভয়ের তরফ থেকেই নীরব সমর্থন পেয়েছিল।

৫৯৮ কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার কালীদাসপুরে ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি খুন হন কাজী আরেফ আহমেদ। মোট ৫ জন মারা যান ঐ হামলায়। অন্যরা ছিলেন জেলা জাসদের সভাপতি লোকমান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইয়াকুব আলী, ইসরাইল হোসেন তমসের ও শমসের আরী মণ্ডল। জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ঐ বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি এই হত্যাকাণ্ডকে 'পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড' হিসেবে অভিহিত করে। যদিও কথিত 'পরিকল্পনা'র বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। দেখুন, জাসদ প্রকাশনা *'জাতীয় বীর কাজী আরেফ আহমেদ অমর হোন'*, ১৮ মার্চ ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ৬।

চুয়াডাঙ্গা

গণবাহিনীতে অস্ত্র সামর্থ্যে বগুড়া ও মানিকগঞ্জের পরই ছিল চুয়াডাঙ্গার অবস্থান

প্রশাসনিকভাবে একটি স্বতন্ত্র জেলা হলেও বৃহত্তর কুষ্টিয়ার রাজনীতির সঙ্গেই জড়িয়ে চুয়াডাঙ্গার রাজনীতি। স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ববর্তী দশকে এ অঞ্চলের রাজনীতির প্রধান ধারা ছিল পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের প্রকাশ্য কাজের ক্ষেত্র ন্যাপ এবং কৃষক সমিতি। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ তখন রাজনীতির ক্ষীণ এক ধারা। কিন্তু ১৯৬৯ সালে ন্যাপ ভেঙে যায়– এক ন্যাপ ভেঙে তৈরি হয় দুটি। একদিকে বিভক্তি, অন্যদিকে পূর্ববাংলা জুড়ে ঐসময়কার উদীয়মান জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে স্থানীয় কমিউনিস্ট সংগঠকরা মাঠ পর্যায়ে কর্তৃত্ব হারাতে শুরু করেন ততদিনে। 'আমরা তখন শ্রেণিদ্বন্দ্বকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শ্রেণিসংগ্রামকে এগিয়ে নিতে চাইছিলাম', বললেন অত্র অঞ্চলে ঐ সময়ের এক সক্রিয় রাজনীতিবিদ আনিসুর রহমান মল্লিক। ১৯৭১ সালের ৮ জানুয়ারি বামাদি বাজারে বড় এক জোতদারকে হত্যার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত শ্রেণিশত্রু নিধনের লাইনের নিরীক্ষা শুরু হলেও কার্যত তা বিশেষ গতিবেগ পায়নি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই তখন গণজোয়ার। সত্তরের নির্বাচনে এখানে কেন্দ্রীয় পরিষদে ব্যারিস্টার বাদল আর. রশীদ, প্রাদেশিক পরিষদে ডা. আসাবুল হক জোয়াদ্দার হেবা এবং অ্যাডভোকেট ইউনুস আলী জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন সাংগঠনিক নানা সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে ডা. হেবাই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠেন।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ মুক্তিবাহিনী এল চুয়াডাঙ্গায়। অক্টোবরে এল মুজিব বাহিনী। মুজিব বাহিনীর মূল সংগঠক হিসেবে দেখা যায় আজাদুর রহমান আজাদ, নজির হোসেন, কাজী কামাল, আশা প্রমুখকে। যুদ্ধে মুজিব বাহিনীর উল্লেখযোগ্য কোনো সফলতা না থাকলেও যুদ্ধোত্তর রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠেন এই বাহিনীর সংগঠকরা– যার শুরু অবশ্য যুদ্ধ ময়দান থেকেই।

সেই সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে আনিসুর রহমান মল্লিক জানালেন, 'মুজিব বাহিনী একটি মিশন নিয়ে ঢুকল। তা হলো যুদ্ধরত কিংবা যুদ্ধ করছে না– এমন সকল কমিউনিস্টকে নির্মূল করতে হবে। আমাদের অনেক ছেলেও ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রক্রিয়ায় এসব বাহিনীতে ঢুকে পড়েছিল। বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গায় মুজিব বাহিনীর কমান্ডার বেলাল আহমেদকে ভারত যেতে আমিই সাহায্য করেছিলাম। ওরা গোপনে জানিয়ে দেয়– মুজিব বাহিনীর ঐ মিশন এবং গাইডলাইনের কথা। আমাদের মাঠ থেকে সরে যেতে বলে। আমাদেরও পুরো পার্টিতে তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা। দুই দিক থেকে চাপে পড়ে পার্টি। একদিকে

রাজাকার ও শান্তি বাহিনী, অন্যদিকে মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী। নভেম্বরের পর তাই এলাকা ছেড়ে ভারত চলে যাই।'

একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর স্বাভাবিকভাবে দেশের অন্যান্য অংশের মতোই চুয়াডাঙ্গা ও সংলগ্ন এলাকার রাজনীতিও পাল্টে দিল। বাহাত্তর থেকে এই জেলার আর্থসামাজিক পরিসরে প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে উঠলেন ডাক্তার আসাবুল হক জোয়াদ্দার হেবা এবং তার অনুসারী তরুণ আওয়ামী লীগ কর্মীরা– মুজিব বাহিনীও ছিল যাদের মধ্যে। এই বাহিনীর সদস্যরা সদরে দোতলা একটি বাড়িতে এবং আলমডাঙ্গায় চারতলা একটা বাড়িতে নিজেদের ঘাঁটি গেড়ে তাবৎ কার্যক্রম পরিচালনা করত বলে স্থানীয়ভাবে এদের নাম হলো 'দোতলা বাহিনী' ও 'চারতলা বাহিনী'। মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে উঠল উভয় বাহিনী।

যুদ্ধের পর নতুন এই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ শাহজাহান, সুলতান রাজা প্রমুখ গড়ে তুললেন স্থানীয় জাসদ। জাতীয় পর্যায়ে তখন আওয়ামী লীগ ভেঙে জাসদ সৃষ্টির কিছু বাস্তব রাজনৈতিক কারণ তৈরি হয়েছিল; আর চুয়াডাঙ্গার ছিল সুনির্দিষ্ট এক সামাজিক কারণ। এখানে সচরাচর রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো মল্লিক ও জোয়ার্দার গোষ্ঠী দ্বারা। মোহাম্মদ শাহজাহান ও সুলতান রাজা ছিলেন এই সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের বাইরে। জাসদের গোড়াপত্তন করে তাঁরা স্থানীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের বীজ রোপণ করলেন। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের বড় এক অংশও থাকলেন এদের সঙ্গেই। এর মধ্যে মোহাম্মদ শাহজাহান ছিলেন সিরাজুল আলম খানের সংগ্রহ আর শাহজাহানের সংগ্রহ ছিলেন সুলতান রাজা। শেষোক্তজন মুক্তিযুদ্ধে একটি ইয়ুথ ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তার ভাই লাল্টুও ছিলেন মুজিব বাহিনীর একজন যোদ্ধা।

এ পর্যায়ে নকশালরাও আবারও সক্রিয় হতে শুরু করে চুয়াডাঙ্গায়। তবে আগের মতো আর প্রকাশ্যে নয়। গোপনেই চলতে থাকে তাদের কার্যক্রম। জাসদও এক পর্যায়ে প্রকাশ্য রাজনীতির সম্ভাবনাময় পথ ছেড়ে গোপন রাজনীতিতে শরিক হয়; গণবাহিনী গঠন করে। জাসদ কর্তৃক গণবাহিনী গঠন যতটা কিছু ব্যক্তির আগ্রহ ও প্রয়োজনে ততটা স্থানীয় প্রয়োজনে নয়। কুষ্টিয়ার গণবাহিনীর সংগঠক মারফত আলীর প্রভাবে এসময় চুয়াডাঙ্গার নকশালদের স্থানীয় দুই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা মন্টু ও লাল্টু এসময় গণবাহিনীতে যোগ দেয়। আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ এই ঘটনাই চুয়াডাঙ্গার রাজনীতি ও সমাজ জীবনের পুরো ছক পাল্টে দেয় দীর্ঘদিনের জন্য।

বস্তুতপক্ষে মতিয়ার রহমান মন্টু স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে আওয়ামী লীগের ডা. হেবারই সহযোগী ছিলেন। কিন্তু চোরাচালান নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত মনোমালিন্যের এক পর্যায়ে হেবার প্রভাবে মন্টু গ্রেফতার হয়ে যান। কারাগারে তিনি নকশালদের সংস্পর্শে আসেন এবং জেল ভেঙে পালাতে সক্ষম হন। কিন্তু এ পর্যায়ে জাসদের

মারফত আলীর প্রভাবে আনিসুর রহমান মল্লিকদের ছেড়ে মন্টু ও তার ভাইয়েরা চলে আসে গণবাহিনীতে– যেমনটি আগেই বলা হয়েছে। তবে আসার সময় তারা নকশালদের কিছু অস্ত্রও নিয়ে আসে। জেলে ভেঙে পালাতে সাহায্য করার পরও তার এই আচরণে স্থানীয় নকশালরা প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ফলে নিজ নিরাপত্তায় মন্টুর প্রয়োজন হয় তখন আরও অস্ত্র ও জনবল এবং সেই দায় মেটাতে গণবাহিনীকেও নামতে হয় একের পর এক অভিযানে। এসময় বিশেষভাবে মেহেরপুরের ট্রেজারি লুট করে জাতীয় পর্যায়েও 'নজর' কাড়তে সক্ষম হয় তারা। ১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ মধ্যরাতে মেহেরপুরের ট্রেজারি লুটের ঘটনাটি দেশব্যাপী গণবাহিনীর সবচেয়ে বড় সামরিক 'সাফল্য' হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এই অপারেশনে প্রায় ৮০ জন ক্যাডার অংশ নিয়েছিল। তাদেরই একজন আনোয়ারুল ইসলাম বাবু বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন, অভিযানের আগে স্থানীয় ঐ ক্যাডারদের ১৯টি অস্ত্র ছিল; অপারেশনের সময় তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ৭৫টি অস্ত্র নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এসময় কেন্দ্রীয় গণবাহিনীর এক মূল্যায়নে অস্ত্র সামর্থ্যে বগুড়া ও মানিকগঞ্জের পরই চুয়াডাঙ্গা তৃতীয় অবস্থানে চলে আসে।[৫৯৯]

মেহেরপুর ট্রেজারি থেকে পাওয়া অস্ত্রের এক অংশ ঝিনাইদহে পাঠানো হয় সেখানকার গণবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য। তবে পরিকল্পনা ছিল অস্ত্রের বড় অংশ কুষ্টিয়ায় পাঠানো হবে– সেখানকার কারাগারে অভিযান চালানোর জন্য। মন্টুর স্ত্রী আলেয়া ছিলেন তখন কুষ্টিয়া কারাগারে। জীবিত অবস্থায় স্ত্রীকে কারাগার থেকে বের করে আনতে পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিলেন মন্টু। কেবল এ কারণেই সেখানে গণবাহিনীর ব্যানারে প্রচুর অপারেশন হয়েছে– যদিও 'বিপ্লবী জনযুদ্ধের অংশ হিসেবেই তা দেশব্যাপী মূল্যায়িত হয়ে চলেছিল।' মেহেরপুর ট্রেজারি থেকে কারাগারে অভিযান চালানোর মতো অস্ত্র পাওয়া গেলেও পরিকল্পিত অপারেশনটি আর হয়ে উঠেনি, কারণ ট্রেজারি অপারেশনে যে দু' জন গেরিলা নিহত হয় তাদের মধ্যে দলনেতা মন্টুও ছিলেন। মন্টুর মৃত্যুর কিছু দিন পর আটক হন সুলতান রাজাও (এপ্রিল ১৯৭৫)। এই দুই ঘটনা স্থানীয় গণবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেয়। অনেকে গোপনে বাহিনী ছেড়ে পালাতেও শুরু করে।[৬০০]

---

[৫৯৯] উল্লেখ্য, মেহেরপুর ট্রেজারিতে অপারেশনকালে সেখানে প্রচুর ক্যাশ টাকাও ছিল– কিন্তু গণবাহিনীর ক্যাডাররা তার একটিও স্পর্শ করেনি। প্রায় এক কোটি সাত লাখ টাকা সেখানে অক্ষতই ছিল– যা বিস্ময়কর। বাংলাদেশে তখন মাত্র দুটি ক্যাশ ট্রেজারি ছিল– একটি মেহেরপুরে এবং অপরটি বরগুনায়। ব্যাংকের মতোই ক্যাশ লেনদেন হতো এ দু'জায়গায়। মোফাজ্জল করিম [তখনকার ডেপুটি কমিশনার], *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৬।

[৬০০] গণবাহিনী মন্টুর মৃত্যুর ঘটনাকে প্রথমে প্রকাশ করেনি– যাতে কর্মীদের মনোবল ভেঙে না পড়ে। জনসমাজে প্রচার করা হতো যে, মন্টু লুকিয়ে আছে। বাস্তবে মন্টুর লাশ ট্রেজারি অপারেশনের রাতেই একটি কৃষি জমিতে কবর দিয়ে তা চাষ দিয়ে দেয়া হয়– যাতে কেউ

আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনেও ফিরে আসে কয়েকজন। এইরূপ আত্মসমর্পণকারীদের সংখ্যা ছিল অত্যল্প, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন একে তাদের কার্যক্রমের বিরাট সফলতা হিসেবে তুলে ধরতে কুষ্টিয়া কারাগার থেকে জনা পঞ্চাশেক বন্দি ধরে এনে ১৯৭৫-এর জুনে গণভবনে শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে এক চাতুর্যপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজন করে– যেখানে দেখা যায়, প্রাক্তন বিপ্লবীরা আবেগে উদ্বেল হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ছে।[৬০১]

অন্যদিকে এ পর্যায়ে অত্র অঞ্চলে গণবাহিনীর কমান্ডার হন মন্টুর ভাই নূরুজ্জামান লাল্টু।[৬০২] আর পলিটিক্যাল কমিশার ছিলেন আনোয়ার হোসেন। লাল্টু পরে ঝিনাইদহ থেকে রক্ষীবাহিনী কর্তৃক আটক হন। এসময় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা জুড়ে আঞ্চলিক চরিত্রের একটি বৃহত্তর বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা নিয়েছিল গণবাহিনী– কিন্তু তা সফল হয়নি কুষ্টিয়ার শামসুল হাদী'র মৃত্যুর কারণে, তাঁকেই সম্ভাব্য এই বাহিনীর প্রধান হিসেবে ভাবা হচ্ছিল। রক্ষীবাহিনীর আক্রমণে ১০ জন সহযোগীসহ পঁচাত্তরের ১১ মে শামসুল হাদী কীভাবে মারা যান– সে বিষয়ে ইতোমধ্যে কুষ্টিয়া জেলার কেসস্টাডিতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে নকশালদের সঙ্গেও গণবাহিনীর যুদ্ধাবস্থা শুরু হয়। 'চুয়াডাঙ্গা ও মিরপুরে আমাদের অন্তত ৮-১০ জন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী মারা গেল ওদের হাতে। সমভাবে ওদের ক্যাডাররাও মারা পড়ল আমাদের কর্মীদের হাতে। গণবাহিনীর সঙ্গে সেই বিবাদ মিটমাট হয়েছে আশির দশকে এসে', বললেন আনিসুর রহমান মল্লিক। অন্যদিকে আনোয়ারুল ইসলাম বাবুর ভাষ্য অনুযায়ী, 'মেহেরপুর ও গাংনিতে মোট চারজন যোদ্ধার মৃত্যু ব্যতীত আমাদের সকল মৃত যোদ্ধাকে আমরা হারিয়েছি নকশালদের হাতে, যাদের সংখ্যা ২০-৩০ জন হবে। বিপরীতে আমাদের হাতে ওদের মাত্র দু'জন কর্মী মারা গেছে।' গণবাহিনী ও নকশালদের এরূপ হানাহানি রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য খুবই কাঙ্ক্ষিত ছিল। ফলে চুয়াত্তরেই রক্ষীবাহিনী এসেছিল চুয়াডাঙ্গায়। সেই সময়ের স্থানীয় রাজনীতির বিবরণ দিতে গিয়ে আনিসুর

কিছু বুঝতে না পারে। মন্টুর মৃত্যুর খবর জাসদ ও গণবাহিনীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও জানতে পারে বেশ কিছুদিন পরে। মন্টু জীবিত না মৃত– এ নিয়ে সরকারি পর্যায়েও বিভ্রান্তি ও বিতর্ক ছিল। তবে পরবর্তীকালে পুলিশ কর্মকর্তা মেহরাব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল পুলিশ মন্টুর কবর শনাক্ত করে সেখান থেকে তার হাড়গোড় তুলে আনতে সক্ষম হন। মোফাজ্জল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭।

৬০১ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৩।

৬০২ জাসদের গণবাহিনীর অন্যতম কিংবদন্তি যোদ্ধা হলেও এই লাল্টুকেই পরবর্তীকালে দেখা যায় জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমেদ হত্যা মামলার অন্যতম সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে।

রহমান বলেন 'বাংলাদেশের যেসব জেলায় রক্ষীবাহিনীর হাতে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক কর্মী মারা গেছে তার মধ্যে অত্র অঞ্চলের নাম করতে হবে সর্বাগ্রে। চুয়াডাঙ্গা–দৌলতপুর–মিরপুর মিলিয়ে আমাদের প্রায় ৫০ জন কর্মী মারা গেছে রক্ষীবাহিনীর হাতে। ওরা যাকে তুলে নিয়ে যেত তাকে আর পাওয়া যেত না। ওদের পাশাপাশি যুবলীগও চরম আতঙ্ক তৈরি করে। তারা যত্রতত্র মানুষ জবাই করত। ঐ বাহিনীর প্রধান ছিল নজির।' উল্লেখ্য, নজির পরে নকশালদের হাতে নিহত হয়।

অন্যান্য জেলার মতোই কুষ্টিয়ায় মাওবাদী নকশাল ছাড়াও রক্ষীবাহিনীর প্রধান এক টার্গেট ছিল গণবাহিনী। কিন্তু পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে সদর থানার (দামুড়হুদার নিকটবর্তী) 'উক্ত' নামক গ্রামে এক অপারেশনে গিয়ে গণবাহিনীর হাতে সাত জন পুলিশ মারা যাওয়ার পর[৬০৩] থেকে পুলিশ ও রক্ষীদের মাঝে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়। জাসদের অভিযোগ ছিল, এই অপারেশনে পুলিশকে উৎসাহিত করেছিলেন তাদের তখনকার প্রতিপক্ষ ডা. হেবা। কিন্তু নিজেদের ব্যাপক জীবনহানির ফলে এরপর পুলিশ গণবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ অনেক কমিয়ে দেয়। এ পর্যায়ে প্রতিপক্ষকে মোকাবেলায় প্রশাসন বেশি ব্যবহার করত রক্ষীবাহিনীকে। জেলা সদর থেকে থানা পর্যন্ত রক্ষীদের বিস্তৃতি থাকলেও মন্টুর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এখানে রক্ষীদের সফলতার হার ছিল খুব কম। সাত পুলিশ সদস্য খুনের কিছুদিন আগে গণবাহিনী গাংনি থানায়ও এক ব্যর্থ আক্রমণ চালিয়েছিল।

উপরোক্ত 'প্রায়-গৃহযুদ্ধ'রূপী রাজনীতির পঁচাত্তর পরবর্তী অধ্যায় অতি-নাটকীয়। বিবদমান পক্ষগুলোর মূল ব্যক্তিদের মধ্যে আসাবুল হক জোয়াদ্দার হেবা যোগ দিলেন আওয়ামী লীগের মূলধারা ছেড়ে মিজান গ্রুপে। মীর্জা সুলতান রাজা মূল জাসদ থেকে বেরিয়ে প্রথমে শাজাহান সিরাজের সঙ্গে কিছু দিন থাকেন– এরপর যোগ দেন আওয়ামী লীগে। সর্বশেষ তিনি আওয়ামী লীগেই ছিলেন। জাসদ ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি প্রায় সকল কর্মী-সংগঠককেই নিয়ে যান আওয়ামী লীগে। ১৯৮৬ সালে একবার নির্বাচন করে জাতীয় সংসদ সদস্যও হন।[৬০৪]

চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া অঞ্চলে গণবাহিনীর আরেক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক মারফত আলী জনৈক সিরাজ বাহিনীর হাতে মারা পড়ার আগে যোগ দিয়েছিলেন জেনারেল

---

৬০৩ এই পুলিশদের আত্মসমর্পণ করার পরও হত্যা করা হয়। যে কারণে পঁচাত্তরের পর সব মামলা প্রত্যাহার হলেও গণবাহিনীর বিরুদ্ধে এই মামলাটি প্রত্যাহার করতে পুলিশ বিভাগ আপত্তি করে। উল্লেখ্য, গণবাহিনীর এই আক্রমণের দিনক্ষণ নিয়ে কিছু মতদ্বৈততা লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময়কার ডেপুটি কমিশনার মোফাজ্জল করিম লিখেছেন, তারিখটি ১৩ ফেব্রুয়ারি [*পূর্বোক্ত*]। অন্যদিকে গণবাহিনীর একজন সদস্য বলেছেন সেটা জানুয়ারি মাস ছিল। এখানে দ্বিতীয় মতটিকে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৬০৪ আটকাবস্থা থেকে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী অভ্যুত্থানকালে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈনিকরাই তাঁকে জেল থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছিল।

এরশাদের সহযোগী জাসদ (রব)-এ। মন্টু ও মারফত মারা যাওয়ায় অত্র অঞ্চলে গণবাহিনীর অভিযান ক্ষমতা অনেক কমে যায়। আবার সশস্ত্র নকশাল ধারার অন্যতম সংগঠক আনিসুর রহমান মল্লিক ওয়ার্কার্স পার্টির নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে চলে আসেন। মূল যোদ্ধা-চরিত্ররা 'যুদ্ধক্ষেত্র' থেকে এভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরে গেলেও অস্ত্রের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার সেখানে চলেছে নব্বুয়ের দশকের শেষপর্যন্ত। গণবাহিনীর স্থানীয় এক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় নির্দেশ পাওয়া মাত্র তারা সব অস্ত্র 'ক্যাশ' করে মাটির নিচে রেখে দেন এবং 'জাসদের নামে কাউকে এসব অস্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। কেউ করতে চাইলেও প্রয়োজনে পুলিশের সহায়তায় তাকে নিরস্ত্র করা হয়েছে।'

চুয়াডাঙ্গার আপত সংক্ষিপ্ত এই কাহিনীর সবচেয়ে চমকপ্রদ দিক এই যে, জেনারেল জিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করেই জাসদ পরে ট্রেজারি লুটের মামলা থেকে তার গণবাহিনীর যোদ্ধাদের স্থানীয়ভাবে খালাস করে নেয়। আর পুলিশ খুনের মামলাটি থেকে তারা রেহাই পায় স্বয়ং আওয়ামী লীগ নেতা ডা. হেবার সাক্ষ্যে– যিনি রক্তাক্ত ঐ অপারেশনে যেতে পুলিশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন বলে জাসদই অভিযোগ করত অতীতে। এভাবেই একাত্তর উত্তর বিভেদ এবং পঁচাত্তর পরবর্তী সহযোগিতার গোলকধাঁধায় পড়ে সমাজতন্ত্রের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় স্থানীয় জনগণের মাঝে।

ঝিনাইদহ

'জনগণ কোনো পক্ষের হয়ে সংঘাতে নামেনি;
যদিও সহানুভূতি ছিল গণবাহিনীর প্রতি'

ঝিনাইদহ একাত্তর পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক জেলা না হলেও জাসদের সাংগঠনিক পরিসরে তা রাজনৈতিক জেলা ছিল। কুষ্টিয়ার মতোই ঝিনাইদহের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাবো কীভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রেণিসংগ্রামের অংশ হিসেবে নয় একান্ত নিরাপত্তার প্রয়োজনে সৃষ্টি হয় গণবাহিনীর এবং কীভাবে তা রাজনৈতিক কর্মীদের নিরাপত্তাহীনতা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।

কেন্দ্রীয়ভাবে জাসদ মূলত ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চের পর 'আত্মরক্ষা'য় সশস্ত্র 'লাইন' গ্রহণ করলেও ঝিনাইদহে তার অন্তত এক বছর আগেই দলের কর্মীরা পুরোপুরি সশস্ত্র হয়ে উঠেছিল। যেহেতু '৭২-এর শুরু থেকে দেশের সর্বত্র মুজিব বাহিনীর দুই অংশের মধ্যে আদর্শিক ও নেতৃত্বের বিভেদ শুরু হয়ে গিয়েছিল সেহেতু ঝিনাইদহেও তার ছাপ পড়ে। এই বিভেদ তীব্র হয়ে উঠে যখন প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুই দিন পর ১৯৭৩ সালের ৯ মার্চ সেখানে জাসদ সমর্থক ছাত্রলীগের দুই গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক (আবদুর রশীদ ও রবিউল ইসলাম)-কে প্রকাশ্যে গুলি করা হয়। আবদুর রশীদ তাৎক্ষণিকভাবে মারা গিয়েছিলেন; রবিউল

পরের দিন মারা যান। ৭ মার্চের নির্বাচনে জেলার ঝিনাইদহ, শৈলকূপা ও কালিগঞ্জে যথাক্রমে শফিয়ার রহমান, মকবুল হোসেন মাস্টার ও বোরহান উদ্দীন ব্যাপক গণসংযোগের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে জাসদের জন্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলেও দু'দিন পরের উপরোক্ত হত্যাকাণ্ড রাজনীতির পুরো পরিবেশ দুঃসহ করে তোলে। শেখ মণি সমর্থক মুজিব বাহিনীর অন্যতম কেন্দ্রীয় সংগঠক এবং যুবলীগ নেতা নূরে আলম সিদ্দিকীকে এ ঘটনার জন্য দোষারোপ করা হতে থাকে। তাঁর অনুসারী এবং অতি ঘনিষ্ঠ বারি, মস্ত, দিনু, আমীর, সামাদ প্রমুখ এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় বলে অভিযোগ ওঠে। পুরো জেলার রাজনীতিকে বিদ্যুতায়িত করে তোলে এই হত্যাকাণ্ড। সিরাজুল আলম খানদের সমর্থক স্থানীয় অন্য সংগঠকরা তখন শহরাঞ্চল ছেড়ে গ্রামমুখী, কারণ সরকারি দলের ভিন্নমতাবলম্বী মাত্রই তখন মৃত্যুর ভয়ে ভীত– ঝিনাইদহে যাদের নেতা ঐ সময় ছাত্রলীগ সভাপতি একাত্তরের সাহসী মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা। একদিকে রক্ষীবাহিনী এবং অন্যদিকে যুবলীগের প্রত্যহ অত্যাচারে গোলাম মোস্তফার অনুসারীরা সকলে তখন প্রাণ ভয়ে কেবলি দৌড়াচ্ছে। এদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধেও বহু মানুষ আহত-নিহত হচ্ছে।[৬০৫] বাস্তবতার কারণেই তখন গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে জেলার সর্বত্র জাসদের তরুণ কর্মীরা সশস্ত্র হয়ে পড়ে। এসময়ই জেলায় জাসদকে সংগঠিত করার জন্য সাধারণ এক তরুণী অসম সাহস নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, যার নাম তাহেরা বেগম জলি। তাঁর ভাষায়, 'যশোরের ছাত্রলীগ সভানেত্রী সালেহা বেগম এবং ঝিনাইদহের আরও কিছু জ্যেষ্ঠ সংগঠকের সহযোগিতায় দীর্ঘ কয়েক মাস নীরবে সাংগঠনিক তৎপরতা শেষে আমরা রশীদ ও রবির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল করেছিলাম ঠিক এক বছর পর ১৯৭৪-এর ৯ মার্চে। তারপর রক্ষীবাহিনী যে পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছিল তাতে পুরো জেলায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে আর কোনো কার্যক্রম চালানোর উপায় ছিল না। স্রেফ একটি মিছিল করার 'অপরাধে' আমাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে হয়।'[৬০৬]

---

৬০৫ রক্ষীবাহিনী তখন কেবল যে জাসদ কর্মীদের ধাওয়া করছে তাই নয়। অন্যান্য সব বামপন্থী দলই তখন তাদের প্রাত্যহিক টার্গেট। ঝিনাইদহেও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

৬০৬ ঝিনাইদহের অন্যান্য গণবাহিনী সংগঠকদের বাদ দিয়ে তাঁর মতামত তুলে ধরার অনেকগুলো যুক্তি রয়েছে। একদিকে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে গণবাহিনীর যোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন প্রতিপক্ষ কর্তৃক বাধ্য হয়ে– অন্যরা যেখানে অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ নিয়ে আগেই আধা সশস্ত্র হয়ে অবস্থান করছিলেন। দ্বিতীয়ত, এক পর্যায়ে কেবল গণবাহিনী ছেড়ে নয়, জাসদ ছেড়ে বাসদে যোগ দেন তিনি। ফলে গণবাহিনীর জীবন ও তৎপরতা সম্পর্কে তাঁর অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন রয়েছে। তাঁর সঙ্গে লেখকের এই কথোপকথন হয়েছে ৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে, যখন তিনি বাসদ নামক দলটিও ছেড়ে দিয়েছেন।

এরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওকালে ১৭ মার্চের ঘটনার পর যখন সশস্ত্র ব্যূহ রচনার ডাক আসল তখন ঝিনাইদহে জাসদের স্থানীয় সশস্ত্র ক্যাডাররা এই ভেবে স্বস্তি পেয়েছিলেন, অন্তত তাদের কর্মকাণ্ড তাত্ত্বিক স্বীকৃতি ও রাজনীতির শৃঙ্খলার আওতায় আসল। যদিও কেন্দ্র গণবাহিনীর ব্যানারে যে সশস্ত্র প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিল তা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য ছিল না বরং ছিল জাসদকে 'সাহায্য' করার জন্য। ফলে এইরূপ সশস্ত্র প্রতিরোধে জনগণকে সম্পৃক্তির তাগিদও খুব বেশি প্রবল থাকার কথা নয়।... এরপর পুনঃউদ্যমে গণবাহিনী ও রক্ষীবাহিনীর সশস্ত্র সংঘাত চলতে থাকে পুরো জেলা জুড়ে। পৃথক পৃথকভাবে সংঘাতের আরও দুটি উপ-শাখাও ছিল– গণবাহিনী বনাম নকশাল ও রক্ষীবাহিনী বনাম নকশাল। আমজাদ হোসেন খান, ওয়াজেদুল ইসলাম প্রমুখ ছিলেন এই জেলায় আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন নকশাল ধারার মূল নেতা। বিশেষভাবে কালীগঞ্জে এই দলের ভালো সংগঠন ছিল। তবে মেধাবী অনেক সংগঠক সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনীর ব্যাপকভিত্তিক অভিযানে নকশালরা ধীরে ধীরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিল (এ বিষয়ে ৫.চ উপ-অধ্যায়েও আলোচনা রয়েছে)। উল্লেখ্য, নকশালদের কাছে গণবাহিনী ছিল 'জাতীয় শত্রু'– যাদের 'খতম' করতে হবে। স্বভাবত গণবাহিনীর প্রতিক্রিয়াও ছিল অনুরূপ। ১৯৭৫-এর আগস্ট পর্যন্ত এর আর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। সকল পক্ষেই আহত-নিহত হয় প্রচুর।

উল্লেখ্য, ঢাকা থেকে শরীফ নুরুল আম্বিয়া ও খুলনা থেকে কামরুজ্জামান টুকু ঝিনাইদহে গণবাহিনীর কার্যক্রম নজরদারি করতেন। সাধারণভাবে গণবাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে রক্ষীবাহিনী ছিল আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এবং গণবাহিনীর ভঙ্গি ছিল রক্ষণাত্মক। জনগণ কোনো পক্ষের হয়ে এ সংঘাতে নামেনি। যদিও তাদের সহানুভূতি ছিল গণবাহিনীর প্রতি। আগ বাড়িয়ে ধরিয়ে দেয়নি তাদের কখনো বরং ঝুঁকি নিয়ে আশ্রয় ও খাবারের সংস্থান করেছে হরহামেশা। এমনকি স্থানীয় পুলিশ বাহিনীও গোলাম মোস্তফাসহ গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকদের পরোক্ষভাবে সুরক্ষা দিয়েছে। অনেককে রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা পড়া থেকে রক্ষা করেছে। এ জেলায় গণবাহিনীর হামলায় আওয়ামী শিবিরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নেতা মারা যান তিনি হলেন যুবলীগের মোশারফ হোসেন মশা। অন্যদিকে নূরে আলম সিদ্দিকী ঢাকায় অবস্থান করে দীর্ঘদিন তাঁর প্রতি গণবাহিনীর আক্রোশ এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন।

উপরে উল্লিখিত ত্রিমুখী হামলা-পাল্টা হামলার মাঝেই আসে ১৯৭৫ সাল– রক্ষীবাহিনী দৃশ্যপট থেকে বিদায় হয়; জাতীয় পরিস্থিতির কারণে গণবাহিনীর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও দুর্বল হয়ে যায়। ফলে সশস্ত্র লাইনেরও আর প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। কেন্দ্রীয়ভাবে সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধের নির্দেশের পাশাপাশি যশোরের

ডেপুটি কমিশনার ড. মহীউদ্দিন খান আলমগীরের কাছে গাড়ি ভর্তি অস্ত্র জমা দিয়ে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি নিলেন গোলাম মোস্তফা ও ঝিনাইদহে তাঁর অনুসারীরা।

ঐসময়কার পরিস্থিতির বিবরণ দিতে যেতে ইতোমধ্যে সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে খ্যাতি কুড়ানো তাহেরা বেগম জলি জানালেন, 'কেন্দ্র সশস্ত্র ফ্রন্ট গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েই তার দায়িত্ব শেষ করলেও মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি ছিল খুবই জটিল। জীবিত যোদ্ধাদের সবার নামে তখন অল্প-বিস্তর মামলা রয়েছে। এসব মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে সকলে ছিল উদ্বিগ্ন। বলা হলো, কারাগারে যারা আছে তারা 'মার্সি পিটিশন' দেবে আর 'মুক্ত'রা আত্মসমর্পণ করবে। এক্ষেত্রেও নির্দেশ পালন অত সহজ ছিল না। প্রথম প্রশ্ন ছিল, মার্সি পিটিশন কেন দেব আমরা? এর মানে তো দাঁড়ায় কোনো না কোনো অন্যায় করেছি আমরা। কোনো কর্মীর কাছেই গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা ছিল না তাদের 'অন্যায়' সম্পর্কে। ফলে এই প্রথম জাসদ কর্মীরা অভ্যন্তরীণভাবে নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয় প্রশ্ন এল, আত্মসমর্পণ করলে জীবন-যাপনের নিরাপত্তা কে দেবে? কারণ, সশস্ত্রসংগ্রামের নানান তৎপরতায় ইতোমধ্যে স্থানীয় পরিসরে শত্রুর সংখ্যাও কম দাঁড়ায়নি প্রত্যেকের। ফলে কার্যত যা হলো, আনুষ্ঠানিক অস্ত্রসমপর্ণের পরও মাঠ পর্যায়ে অনেকেই নিরাপত্তার জন্য কিছু অস্ত্র রক্ষা করে চলেছেন।[৬০৭] অস্ত্রসমর্পণকালে গোলাম মোস্তফাকেও অন্তত দুটি অস্ত্র রাখার রাষ্ট্রীয় অনুমতিপত্র দেন মহীউদ্দিন খান আলমগীর। তবে সংগঠকদের এ ধরনের আধা সামরিক এবং আধা রাজনৈতিক জীবন স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় সমাজকে বিভ্রমে ফেলে জাসদকে নিয়ে। যা ধীরে ধীরে দলটিকে দুর্বল করে দিতে থাকে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সংগঠিত নানান হঠকারিতা এক্ষেত্রে আরও ইন্ধন যোগায়। কোণঠাসা হয়ে যান একাত্তর-

---

৬০৭ গণবাহিনীর যোদ্ধাদের কার্যক্রমে *বিপ্লবী প্রয়োজনে সশস্ত্রতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রয়োজনে সশস্ত্রতার* পটভূমি ও ফলাফল সম্পর্কে ঝিনাইদহের পাশের জেলা কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের গণবাহিনী সংগঠক রেজাউল হক নিজস্ব বিশ্লেষণ তুলে ধরেন এভাবে :

> গণবাহিনী সৃষ্টির পর আমরা দ্রুতই সশস্ত্র হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের এই সশস্ত্র হয়ে পড়ার রাজনৈতিক চরিত্র বুঝে হোক বা না বুঝে হোক; সম্ভবত না বুঝেই আমাদের ব্যক্তিগত শত্রুরা ভয় পেয়ে গেল। এরূপ ভীতি থেকে তারাও আমাদের কোন বিরোধী পক্ষের সশস্ত্রতার আশ্রয় নিয়েছে। ফলে নিরস্ত্র ব্যক্তিগত বিবাদগুলো রূপ নেয় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সশস্ত্র সংঘাতে। সর্বত্র না হলেও অনেক জায়গায় এটা ঘটেছে।
> রেজাউল হকের সাক্ষাৎকার, *পূর্বোক্ত*।

উত্তর সাহসী যোদ্ধারা। অনেকে দল পরিবর্তন করেন।[৬০৮] পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে অস্ত্রের অরাজনৈতিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করাও দুরূহ হয়ে পড়ে।[৬০৯]

সিরাজগঞ্জ

'১৪৪ ধারা আর রক্ষীবাহিনীর কারণে কোনো স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মসূচি নেয়া সম্ভব ছিল না'

সিরাজগঞ্জের অভিজ্ঞতা প্রায় ঝিনাইদহের অনুরূপ। ঝিনাইদহে গোলাম মোস্তফা যেমন জাসদ ও গণবাহিনীর প্রধান চরিত্র ছিলেন– সিরাজগঞ্জেও তেমনি এ ধারার একজন মুখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন– তিনি হলেন, আবদুল লতিফ মির্জা। গোলাম মোস্তফার মতোই লতিফ মির্জাও মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে ছিলেন জনপ্রিয়। এক্ষেত্রে তাঁর তুলনা দেওয়া যায় অত্র অঞ্চলের আরেকজন রাজনীতিবিদ কুষ্টিয়ার মারফত আলীর সঙ্গে।

যুদ্ধকালে জেলার তাড়াশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরাট সংখ্যক সদস্যকে হত্যার মধ্য দিয়ে লতিফ মির্জার 'খ্যাতি'র শুরু। অন্যদিকে ধনাঢ্য ঘরের সন্তান হয়েও অতি সাধারণ চলাফেরা ও গণসম্পৃক্তির কারণে তিনি ছিলেন প্রকৃতই 'জনগণের নেতা।' গোলাম মোস্তফার মতোই একাত্তরে তিনি ও তাঁর বাহিনী[৬১০]

---

৬০৮ উল্লেখ্য, গোলাম মোস্তফা পরে সামরিক স্বৈরশাসক জে. এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ঝিনাইদহে গণবাহিনীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা তোজাম্মেল হক তোজাম যোগ দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগে। ২০১৪ সালে গোলাম মোস্তফা মারা যান।

৬০৯ ছিয়াত্তর-সাতাত্তর পরবর্তীকালে গণবাহিনীর কার্যক্রম 'আনুষ্ঠানিকভাবে' গুটিয়ে আনা হলেও বিভিন্ন স্থানে এই বাহিনীর কর্মীদের অস্ত্রের ব্যবহার বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। একটি প্রবণতা দেখা গেছে, সশস্ত্র ধারার শ্রেণিসংগ্রামে লিপ্ত অন্যান্য বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ঐ অস্ত্রের ব্যবহার। বিশেষভাবে মাদারিপুর-শরিয়তপুর অঞ্চলে পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির কর্মীরা ছিল গণবাহিনীর প্রধান এক টার্গেট। সর্বহারা পার্টির ২৩ জন কর্মী খুন হয় সেখানে। ১৯৮০ সালে পালং থানায় সর্বহারা পার্টির অন্যতম কমান্ডার দাদন ও সুনীল নিহত হয় গণবাহিনীর অ্যামবুশে। পার্শ্ববর্তী জাজিরাতেও অনুরূপ বহু ঘটনা ঘটেছে। সর্বহারা বিরোধী রাষ্ট্রীয় অভিযানে এ সময় 'স্থানীয় জাসদ ছিল পুলিশের সমর্থক ভূমিকায়'– এমনটিই বলা হতো প্রথমোক্ত দলের রাজনৈতিক প্রকাশনায়। দেখুন, মুনীর মোরশেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৩-৮৪, ২০২। উল্লেখ্য, মাদারিপুর-শরিয়তপুর অঞ্চলে ঐ সময় গণবাহিনীর প্রধান নেতা ছিলেন শাহজাহান খান। যিনি পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন; এমপি ও মন্ত্রী হন। ঐ অঞ্চলে সর্বহারা পার্টির হাতেও জাসদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক নিহত হয়েছে। এর মধ্যে দলটির জেলা সম্পাদক হেলালুল ইসলামও ছিলেন।

৬১০ একাত্তরে যেসব এলাকায় কেন্দ্রীয় মুক্তিবাহিনীর বাইরে অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে ওঠা বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তান বাহিনীকে মোকাবেলা করা হয় তার মধ্যে একটি আলোচিত গ্রুপ ছিল লতিফ মির্জার বাহিনী। টাঙ্গাইলের আবদুল কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর মতো এর ব্যাপ্তি ও প্রচার না থাকলেও অনেক সফল অপারেশনের কৃতিত্ব ছিল এই বাহিনীর। মুক্তিযুদ্ধের সময়

ছিল আওয়ামী লীগপন্থী। তবে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ছত্রছায়ায় থাকলেও বাহাত্তরে ছাত্রলীগের কেন্দ্রে সিরাজুল আলম খানদের তরফ থেকে যখন আলাদা হওয়ার ডাক উঠল তখন স্থানীয় ছাত্রলীগের সংখ্যাগরিষ্ঠই তাঁকে অনুসরণ করে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী' হয়ে গেল। এক্ষেত্রে সিরাজগঞ্জের তরুণ ছাত্রলীগ কর্মীদের প্রভাবিত করে লতিফ মির্জার সিরাজুল আলমমুখী সিদ্ধান্ত। যে তরুণদের অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধকালে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ পেয়েছিল এবং যুদ্ধের পর সেই অস্ত্র পুরোপুরি জমা না দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল তারা; কারণ 'কেন্দ্র' থেকে সেরকমই নির্দেশ এসেছিল।[৬১১]

স্থানীয় আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা সৈয়দ হায়দার আলী, মোতাহার হোসেন তালুকদার, আনোয়ার হোসেন রতু, আমিনুল ইসলাম ভুলু, সৈয়দ হায়দার আলী, চার্লি প্রমুখ বয়োজ্যেষ্ঠরা এই দ্বিধাবিভক্তিকালে রয়ে গেলেন আওয়ামী লীগেই। যদিও তাদের অনুসারীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। আবদুল লতিফ মির্জার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ যেসব তরুণ এসময় জাসদে চলে এলেন তারা হলেন খোরশেদ আলম, আবদুল হাই তালুকদার, আবদুর রউফ পাতা, ইসহাক আলী, বিমল কুমার দাস, গোলাম কিবরিয়া, সিরাজুল ইসলাম খান প্রমুখ। এদের মধ্যে আবদুর রউফ পাতা ছিলেন নেতৃত্ব কাঠামোর ভিত্তিস্বরূপ– মির্জা ছিলেন তার প্রকাশ্য স্তম্ভরূপী। আবদুর রউফ পাতা মুজিব বাহিনীর একজন সংগঠক ছিলেন। জাসদ গঠনে মুজিব বাহিনীর আরও যেসব সংগঠক নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে ছিলেন গোলাম কিবরিয়া, ইসহাক আলী প্রমুখ।

কেন্দ্রীয়ভাবে জাসদ সৃষ্টির আগে থেকেই বস্তুত স্থানীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতৃত্বের সঙ্গে নবীন সংগঠকদের সংঘাত শুরু হয়ে যায়। তারই ধারাবাহিক পরিণতি জেলা জাসদের সৃষ্টি। ১৬ ডিসেম্বরের পরপর স্থানীয় জনপদে মুক্তিযোদ্ধাদের এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত 'প্রশাসন' গড়ে উঠেছিল; কিন্তু 'রাষ্ট্রীয় প্রশাসন' এসে যখন তাদের হটিয়ে দিতে শুরু করল তখন প্রথমোক্তদের হতাশার আশ্রয় হয়ে উঠল জাসদ। তারুণ্যের এই ভিন্ন ও ক্ষুব্ধ স্রোতেরই পরিণতি ছিল সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজের যুদ্ধোত্তর প্রথম নির্বাচনে জাসদ সমর্থিতদের বিজয়। এরপর, বিশেষ করে জাসদ সম্পর্কিত সকল ধরনের প্রচার, মিছিল, সভা ইত্যাদি বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। এরই চূড়ান্ত পরিণতি দেখা দেয় সিরাজগঞ্জে মেজর এম এ জলিল ও আ স ম রবের জাসদ গঠন-উত্তর প্রথম জনসভাকে কেন্দ্র করে। 'মুজিববাদপন্থী'রা এই জনসভার মঞ্চ জ্বালিয়ে দেয়। জনসভার পূর্বদিন তারা

মির্জার এই বাহিনীর নাম ছিল 'পলাশডাঙ্গা যুব শিবির'। মির্জা ছিলেন বাহিনীর সামরিক কমান্ডার, আর রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন আমিনুল ইসলাম চৌধুরী।

৬১১ সিরাজগঞ্জের সেই সময়কার তরুণ জাসদ সংগঠক কবি মোহন রায়হানের বর্তমান লেখক কর্তৃক ২০১২ সালের ১৩ অক্টোবর ঢাকায় গৃহীত অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার।

স্থানীয় কলেজ হোস্টেল থেকে জাসদ-ছাত্রলীগের সকলকে সশস্ত্রভাবে বিতাড়িত করে। তারপরও এই জনসভা করতে সমর্থ হয় জাসদ। কিন্তু এরপর থেকে তাদের সিরাজগঞ্জ শহর ছাড়া হতে হয়। তাদের প্রকাশ্য কার্যক্রম ছিল পুরোপুরি অনঅনুমোদিত। তবে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু কার্যকম চালাত তারা। 'সেসময় পরিস্থিতি হলো এ রকম, প্রতিদিনই বাধা, প্রতিদিনই মৃত্যু এবং প্রতিদিনই প্রতিরোধ। তবে ১৪৪ ধারা আর রক্ষীবাহিনীর কারণে আমাদের পক্ষে কোনো স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মসূচি নেয়া সম্ভব ছিল না। এক পর্যায়ে সশস্ত্র না হয়ে আর পারা গেল না; ফলে লুকিয়ে রাখা মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্ত্রের খোঁজ পড়ল; গণবাহিনী গঠিত হলো', বললেন ঐ সময়কার এক তরুণ কর্মী কবি মোহন রায়হান; যিনি পরে সিরাজগঞ্জে গণবাহিনীর একজন ডেপুটি রাজনৈতিক কমিশনার হন। সিরাজগঞ্জে এই বাহিনীর প্রধান রাজনৈতিক কমিশনার ছিলেন খোরশেদ আলম। ডেপুটি কমিশনারদের মধ্যে ছিলেন আবদুল হাই তালুকদার, গোলাম কিবরিয়া প্রমুখ। সামরিক কমান্ডারদের মধ্যে ছিলেন ইসহাক আলী, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। গণবাহিনী গঠনের সামগ্রিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আরেক নেতা আবদুর রউফ পাতা বলেন, 'এই বাহিনী সৃষ্টির রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, কর্মীদের উদ্দীপনা ও মনোবল সবই ছিল তখন। এমনকি এর মাধ্যমে সাংগঠনিক সফলতাও এসেছে। কিন্তু জনসমাজ বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি। তারা ধরে নিল জাসদ *অস্ত্রের রাজনীতিতে* ঢুকে পড়েছে।'[৬১২]

'অতীত অভিজ্ঞতা' বর্ণনাকালে মোহন রায়হান এও দাবি করলেন, সিরাজগঞ্জে রক্ষীবাহিনীর অভিযানকালে ভারতীয় বাহিনীও তাতে সংশ্লিষ্ট থাকত। অন্তত ২১টি ক্যাম্প ছিল রক্ষীদের।[৬১৩] অন্যদিকে পারিবারিক পর্যায়ের স্থানীয় অভিযোগকারীদের মতে, ঐ জেলায় রক্ষীবাহিনীর অভিযানের অন্যতম ধরন ছিল– মূলত কাউকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তীব্র নিপীড়নের শিকার হতে হতো এবং এইরূপ নিপীড়নে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হতভাগ্যরা মারা যেত।

পরিস্থিতির ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিশ্চিত করতে মুজিব বাহিনীর সরকার সমর্থক অংশও জেলার বিভিন্ন স্থানে ঐ সময় 'ক্যাম্প' বসায়। সমর ও শংকর নামের দু'জন বিখ্যাত ক্যাডার ছিল এ সময় ঐ শিবিরে। 'এমন কোনো দিন ছিল না যেদিন যমুনা কোনো লাশের রক্তে লাল হয়নি।' উল্লেখ্য, আওয়ামী ক্যাম্পগুলোর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জনসমাজে সৈয়দ হায়দার আলী, আনোয়ার হোসেন রতু, পিন্টু প্রমুখের নাম যুক্ত হয়ে পড়েছিল, যদিও তার সত্যাসত্য

---

৬১২ ২০১২ সালের নভেম্বরে গৃহীত আবদুর রউফ পাতার অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার, *পূর্বোক্ত*।

৬১৩ অন্যত্র আমরা দেখেছি, আত্রাই গেরিলা অঞ্চল থেকে পশ্চাৎপসারণকালের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে নকশাল নেতা টিপু বিশ্বাসও অনুরূপ দাবি করেছেন।

যাচাইয়ের কোনো সুযোগ ছিল না। এসব ক্যাম্পের পরিচালকরা আবার পারস্পরিক রেষারেষিতেও লিপ্ত হয়।

এসময়ই শাহজাদপুরে একসঙ্গে ছয়জনকে খুনের মতো নিষ্ঠুরতা ঘটে যায়। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধকালে সিরাজগঞ্জে যত মানুষ মারা গেছে তার কয়েকগুণ বেশি খুন হয় স্বাধীনতা-উত্তর এক-দুই বছরেই। শাহাজাদপুর হত্যাকাণ্ড ঘটে ১৯৭২ সালের ৯ জুন– যেদিন ঐ থানায় জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। হেলাল-কোরবান-ফরহাদ-দিলীপ-সকিমুদ্দি প্রমুখ কর্মীকে হত্যার জন্য জাসদ সেদিন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রহমানকে দায়ী করে।

তবে ঝিনাইদহের মতো এখানেও হত্যাকাণ্ডগুলো কেবল একতরফা হয়নি। গণবাহিনীর আক্রমণেও বহু মানুষ মারা গেছে। ঝিনাইদহের চেয়ে সিরাজগঞ্জে গণবাহিনীর আক্রমণের কৌশল ও পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত উন্নত ও দুর্ধর্ষ ছিল। যেমন বাগাবাটিতে গণবাহিনী ও রক্ষীবাহিনীর যে সংঘাত হয় তাকে ক্ষুদ্র পরিসরের এক ধরনের যুদ্ধই বলা যায়– রক্ষীবাহিনীর অস্ত্র উদ্ধার অভিযান থেকে যার শুরু। এ ছাড়া রক্ষীবাহিনীর নকল পোশাক তৈরি করে শাহাজাদপুরে ফখরুল নামের একজন নেতৃস্থানীয় মুজিববাদী কর্মীকে তাদের ক্যাম্পে গিয়ে হত্যা[৬১৪], জামতৈলে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে ওসিকে হত্যা[৬১৫] ইত্যাদি অত্র অঞ্চলে গণবাহিনীকে নিয়ে সামরিক কিংবদন্তির জন্ম দেয়। 'এমনও হয়েছে আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে গিয়ে ঘুমাতে হতো', জানালেন আবদুর রউফ পাতা। জাসদ ও গণবাহিনীর প্রতি প্রশাসনের এক অংশের যে সহানুভূতি ছিল সেটাও উল্লেখ করলেন আবদুর রউফ পাতা কথোপকথন কালে। তাঁর ভাষায়, '১৯৭৩-এ আমাকে যখন কারফিউ দিয়ে নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয় তখন কে আমাকে তত্ত্বাবধানে নেবে সে নিয়ে রক্ষীবাহিনী ও পুলিশের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়। আমাকে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ বাধা দেয়। তারা থানায় নিয়ে আমাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিলে নিশ্চিতভাবেই ব্যাপক নির্যাতনের মুখে পড়তে হতো।'

---

৬১৪ এই অভিযানটিতে নেতৃত্ব দেন সেলিম ও সালাম নামে দুজন কর্মী। এই ফখরুল ছিলেন পাবনা আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধোত্তর অন্যতম নেতা রফিকুল ইসলাম বকুলের ভাই। ফখরুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, পাবনা-সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে গাড়ি থামিয়ে নকশাল ও গণবাহিনীর কর্মী খোঁজ করতেন তিনি; আর কাউকে সামান্যতম সন্দেহ হলেই নিখোঁজ হয়ে যেত সে।

৬১৫ এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ম. মামুন ও হাকিম নামে দুজন কর্মী। কবি মামুন পরে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান এবং হাকিম আত্মগোপনে চলে যান। এখনও সে অবস্থাতে আছেন তিনি।

লতিফ মির্জা, আবদুর রউফ পাতা প্রমুখ আটকের পর জাসদের গণজোয়ার কিছু হোঁচট খায় এ জেলায়। এ সময় নকশালদের সঙ্গে বৈরিতার আরেকটি ফ্রন্টও সৃষ্টি হয়। বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রলীগের আবদুল হামিদ তালুকদার নামে একজন বড় চরিত্র নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে যে বৈরিতার শুরু হয়েছিল। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে শুরুতে জাসদ নানামুখী চাপ তৈরি করে সিরাজগঞ্জ শহরের নকশালদের বিরাট অংশকেই অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য করে। এই জেলায় মাওবাদী সশস্ত্র ধারার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন নেতা ছিলেন প্রবীর নিয়োগী, মনিরুজ্জামান তারা প্রমুখ।

পঁচাত্তরের আগস্টের পর দেশের অন্যান্য অংশের মতোই সিরাজগঞ্জের রাজনীতিও পাল্টে যায়। গোপন হাইড-আউট থেকে আটকের দীর্ঘ পরে মুখ্য নেতা লতিফ মির্জা কারাগার থেকে ছাড়া পান ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের ঘটনাবলির অনেক পরে। এরপর তিনি প্রথমে দ্বিধাবিভক্ত জাসদে শাহজাহান সিরাজের সংসদ নির্বাচনমুখী অংশে, তারপর আওয়ামী লীগের একাংশের দ্বারা গঠিত 'বাকশাল' নামক দলে এবং পরে সরাসরি আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং এমপি নির্বাচিত হন। এর আগে একবার তিনি ১৯৭৯ সালে জাসদ থেকেই সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। লক্ষ্যণীয়, ঝিনাইদহে যেভাবে প্রধান নেতা গোলাম মোস্তফা জাতীয় পার্টিতে যোগ দেওয়া এবং পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার পর স্থানীয় জাসদে অবক্ষয়ের শুরু হয় সিরাজগঞ্জেও মির্জাকে হারিয়ে তাই ঘটে এই দলে। লতিফ মির্জার পাশাপাশি আরেক গুরুত্বপূর্ণ জাসদ নেতা আবদুর রউফ পাতা জাসদ ছেড়ে কিছুদিন বাসদে এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। তবে এই জেলার জাসদ নেতৃত্বের একটি বিশেষ সফলতা হলো পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে গণবাহিনী গুটিয়ে আনার ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী সাংগঠনিক জেলা– কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ইত্যাদির চেয়ে অনেক সফলতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা।

পাবনা

স্থানীয় গ্রামজীবনে নকশালদের প্রভাব থাকায় গণবাহিনীর সশস্ত্রসংগ্রাম খুব বেশি স্বচ্ছন্দ ছিল না

পাবনা জেলার একাত্তর-উত্তর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা উপরোক্ত জেলাগুলোর মতোই। একাত্তরে এখানে মূল রাজনৈতিক শক্তি ছিল আওয়ামী লীগ ও তাদের ছাত্র শাখা 'ছাত্রলীগ'। এদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, আমজাদ হোসেন ও এডভোকেট আমজাদ হোসেন। শেষোক্তজন ছিলেন মুজিব বাহিনী ঘেঁষা। অন্যদিকে এসময় আওয়ামী শিবিরের বিপরীতে ছিল 'পূর্ববাংলা ছাত্র ইউনিয়ন।' যাদের প্রধান সংগঠক ছিলেন টিপু বিশ্বাস, ওসমান গনি, মোফাখখার চৌধুরী প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে এরাই পাবনায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্ম দেয়।

পরে এদের সঙ্গে যুক্ত হন পূর্বপাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা আবদুল মতিন ও আলাউদ্দিন আহমেদ-এর অনুসারীরা। মুক্তিযুদ্ধের শেষলগ্নে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাশাপাশি মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীও পাবনায় পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী, সাধারণভাবে যারা তখন 'নকশাল' নামে বিশেষ পরিচিত– তাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। ৩ ডিসেম্বর স্থানীয় শানির দিয়ারা চরে এইরূপ এক বড় সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনীর ৬৭ জন নিহত হয়– যে আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লে. হামিদ, আহমেদ করিম প্রমুখ। প্রথমোক্তজন ঐ লড়াইয়ে কপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। আর শেষোক্তজন পরে অন্যদের সঙ্গে জাসদ গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

পাবনায় মুজিব বাহিনীর তৎপরতার স্মৃতিচারণ করে ঈশ্বরদী এলাকার একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও সিপিবি সংগঠক শামসুজ্জামান সেলিম– যিনি বর্তমানে সিপিবির পলিটব্যুরোর সদস্য– ২০১৪ সালের ২৪ আগস্ট ঢাকায় এক আলাপচারিতায় বলেন, 'বিএলএফ নিজেদের পিসি বা পলিটিক্যাল কমাণ্ডো বলত এবং যুদ্ধ করত না। তাদের কাজ ছিল রাজাকারদের ধরে আনা; কাউকে কাউকে মেরে ফেলা এবং কাউকে কাউকে টাকা-পয়সা নিয়ে ছেড়ে দেয়া। নভেম্বরে তারা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে এক যৌথ বৈঠকে কমিউনিস্টদের হত্যার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেও সেটা অনুমোদন করাতে পারেনি।' জনাব শামুসজ্জামান সেলিম পাবনায় টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন নকশালদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান বাহিনীর যোগসাজশেরও অভিযোগ করেন।

একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের দুই দিন পর এই 'নকশাল' মুক্তিযোদ্ধারা সবাই পাবনা ছেড়ে নিরাপদ অঞ্চলের খোঁজে রাজশাহীর পথে রওনা হয়। কারণ স্বাধীনতার পর পুরো পাবনা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে 'মুজিববাদপন্থীদের দখলে' চলে যায়। ভারতীয় বাহিনী প্রবেশের পাশাপাশি পাবনায় আওয়ামী লীগের যোদ্ধা বাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তখন রফিকুল ইসলাম বকুল।[৬১৬] এই বকুলেরই অন্যতম সহযোগী ইকবাল হোসেন সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে গোড়াপত্তন করেন পাবনা জাসদের– সঙ্গে থাকলেন আহমেদ করিমও।

ইকবাল হোসেন সরাসরি পাবনার জাসদের নেতৃত্বে থাকলেও সিরাজগঞ্জেরও পরোক্ষ নেতা হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি ছিল। অন্যদিকে আহমেদ করিম ছিলেন মূলত তাত্ত্বিক চরিত্রের ব্যক্তিত্ব। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হাতে একপর্যায়ে নিহত হন তিনি– ১৯৮০ তে। তাঁর বড় ভাই আহমেদ রফিক ছিলেন সত্তরের নির্বাচিত

---

৬১৬ যিনি পরে রহস্যময় এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় রাজনীতিতে তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল। এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ছেড়ে বিএনপিতেও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাই ফখরুল, যার দ্বারা জাসদ নানাভাবে নিগৃহীত ছিল– তাকে সিরাজগঞ্জের শাহজাদাপুরে গণবাহিনী হত্যা করেছিল।

এমপিএ। নির্বাচনে বিজয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে (২৫ ডিসেম্বর) তিনিও নিহত হয়েছিলেন, পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি-এমএলদের হাতে। অন্যদিকে জাসদ গঠনকালীন অপর নেতা ইকবাল হোসেন– যিনি ছিলেন ধনী এক চিকিৎসক পিতার সন্তান, এক পর্যায়ে জাসদ ছেড়ে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। জাসদ নেতা আহমেদ করিমসহ ঐসময়কার আরও কিছু মৃত্যুর জন্য আওয়ামী লীগের সেলিম মোরশেদ বাহিনীকে দায়ী করা হতো তখন। আবার কেউ কেউ নকশালদেরও দোষারূপ করেন।

উপরোক্ত অন্যান্য জেলার অভিজ্ঞতার মতোই পাবনায়ও জাসদ এক পর্যায়ে গণবাহিনী গঠন করেছিল। তবে সিরাজগঞ্জ বা কুষ্টিয়ার মতো এখানে তাদের কাছে যথেষ্ট অস্ত্রসম্ভার ছিল না। তাছাড়া এখানকার গ্রামজীবনে নকশালদের প্রভাব থাকায় গণবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম পাবনায় খুব বেশি স্বচ্ছন্দও ছিল না। 'তপন' ছদ্মনামে পরিচিত পাবনার ঐ সময়কার একজন সুপরিচিত নকশাল কমান্ডারের ভাষায়, 'জাসদ আমাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য করলেও আমাদের বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি করার মতো শক্তি ভিত ছিল না তাদের। সব মিলে সেখানে আমাদের সম্ভবত চার জন কর্মী খুন হয় গণবাহিনীর হাতে। আমরা আওয়ামী লীগকে প্রতিপক্ষ ভাবতাম, জাসদকে মনে করতাম তাদেরই অংশবিশেষ মাত্র।'

জাসদ ও গণবাহিনী গড়ে ওঠার সময়টিতে পাবনায় রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পও গড়ে ওঠে কয়েকটি স্থানে। রক্ষীবাহিনীর অগ্রাধিকার তালিকায় সেখানে নকশালরাই ছিল সর্বাগ্রে। এইরূপ একটি ক্যাম্পেই মারা গিয়েছিলেন পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নিষ্ক্রিয় নেতা ওসমান গনি। তবে অন্তত দু' দফায় জাসদের সশস্ত্র কর্মীরাও চরাঞ্চলে রক্ষীবাহিনীর বড় ধরনের ঘেরাওয়ে পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। সামগ্রিকভাবে পাবনা'র ঐসময়কার ভয়াল স্মৃতি রোমন্থন করে সিপিবি নেতা শামসুজ্জামান সেলিম বলেন, 'ঈশ্বরদীতে ঠাকুরপাড়ায় শাসকদলের যোদ্ধারা এমন একটি নির্যাতনকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল যাকে আমরা বলতাম 'প্যালেস অব নো রিটার্ণ।'

পাবনার শহুরে রাজনীতি বরাবরই ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর পুত্ররা নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই প্রভাবের জায়গা থেকে জাসদ কিংবা নকশাল কেউই তাদের হটাতে পারেনি। এইরূপ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রে অবক্ষয় ও ভাঙন ধরা মাত্রই পাবনায় জাসদ আরও দুর্বল হয়ে যায়। তবে জনসমাজে আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভঙ্গি থাকায় জাসদের শূন্যতা পূরণ করে ধীরে ধীরে বিএনপি। ইতোমধ্যে র‍্যাডিক্যাল ভাবধারার পরাজয় সমাজে দক্ষিণপন্থী মনোভাবও বাড়ায়। পাবনায় তিনটি পুরানো মাদ্রাসা ছিল। মুক্তিযুদ্ধ এবং পরের সময়ের রাজনৈতিক ব্যর্থতার পর দেখা যায় এসব মাদ্রাসা জেলায় জামায়াতকে শক্তি সঞ্চয়ে বেশ সাহায্য করেছে। আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে বিএনপি'র পাশাপাশি তারাও।

উপরোক্ত আঞ্চলিক অনুসন্ধানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, জাসদে কেন্দ্রের তরফ থেকে পাবনা-সিরাজগঞ্জ 'দেখা'র দায়িত্ব ছিল মনিরুল ইসলাম বা মার্শাল মনি'র এবং কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের দায়িত্ব ছিল শরীফ নুরুল আম্বিয়ার ওপর। কিন্তু অনুমোদিত সশস্ত্র তৎপরতার সময় যেমন– তেমনি গণবাহিনী গুটিয়ে আনার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সংগঠকরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সফলতা দেখাতে পারেননি। যত তৃণমূলে অস্ত্র ছিল তত বেশি তা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণের আওতামুক্ত থেকে যায়। সিরাজগঞ্জের ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতাকে বাদ দিলে গণবাহিনীর অস্ত্রের অরাজনৈতিক ব্যবহার ঐসব জনপদে রয়েই যায় ব্যাপকভাবে। অনেক স্থানে এসব অস্ত্র ডাকাতির কাজেও ব্যবহার হয়েছে। যে কারণে 'কিছু জায়গায় জাসদ ডাকাত হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছে বা চিহ্নিত করা চেষ্টা হয়েছে।'[৬১৭]

উপরোক্ত কেসস্টাডিগুলোর বাড়তি বিশ্লেষণের আগে পার্শ্ববর্তী একটি এবং দূরবর্তী একটি জেলার তৎকালীন পরিস্থিতির বিবরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে। শেষোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে দেখা যাবে, কীভাবে মাঠের পরিস্থিতি নয়– বরং কেন্দ্রে কিছু ব্যক্তির ভূমিকা জাসদের সশস্ত্রসংগ্রামের রাজনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ফরিদপুর

প্রয়োজন না থাকলেও গণবাহিনী গঠন করতে হয়েছিল

উপরে যে জেলাগুলোর একাত্তর-উত্তর পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে ফরিদপুর সেগুলোর পার্শ্ববর্তী জেলা হলেও সেখানকার পরিস্থিতি তদ্রুপ উত্তেজনাকর ছিল না। '৬৯ এবং '৭০-এ উপরোক্ত জেলাগুলোর মতোই ফরিদপুরেও রাজনীতির কেন্দ্র ছিল শিক্ষাঙ্গন। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে জেলার প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজেন্দ্র কলেজ। সেখানে ছাত্রলীগের প্রধান নেতা তখন শাহ আবু জাফর (জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও রাজেন্দ্র কলেজে ছাত্র সংসদের ভিপি), সৈয়দ কবিরুল আলম মাও (জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি) প্রমুখ। এরা তখন 'স্বাধীনতাপন্থী', অর্থাৎ কেন্দ্রীয়ভাবে সিরাজুল আলম খানের গ্রুপের কাছাকাছি। এদের সঙ্গে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় 'নিউক্লিয়াস'-এর তরফ থেকে যোগাযোগ রাখতেন মূলত আবদুর রাজ্জাক।

মুক্তিযুদ্ধকালে এই জেলায় মুজিব বাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। প্রধান কমান্ডার ছিলেন শেখ শহিদুল ইসলাম; তাঁর দুই ডেপুটি ছিলেন শাহ আবু

---

৬১৭ সিরাজগঞ্জের একজন জাসদ সংগঠকের মন্তব্য। যিনি বর্তমানে ঢাকার একটি দৈনিকে বিভাগীয় সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর মতে, জাসদকে 'ডাকাত' হিসেবে চিহ্নিত করতে পঁচাত্তরের আগস্ট পরবর্তী শাসনামলেও সচেতন প্রশাসনিক প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

জাফর[৬১৮] (ফিল্ড কমান্ডার) ও শাহজাহান খান। যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি উপস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষ শাহ আবু জাফরকেই স্থানীয় মুজিব বাহিনীর মূল কমান্ডার মনে করত। অন্যদিকে সদর থানায় মুজিব বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন কবিরুল আলম। তবে একাত্তরে দীর্ঘ সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে আটকাবস্থাতেই ছিলেন তিনি। যুদ্ধকালে মুজিব বাহিনীর শাহ আবু জাফর নিয়ন্ত্রিত যোদ্ধারা 'মুক্তিবাহিনী'র সুবেদার জলিল নামে একজন কমান্ডারকে মেরে ফেললে পুরো জেলার যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে জটিলতা তৈরি হয়। পরে ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল এসে (আগরতলা মামলার আসামি এবং যুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর ফরিদপুর সাব-সেক্টর প্রধান) পরিস্থিতি 'নিয়ন্ত্রণ' করেন– অর্থাৎ মুজিব বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর বৈরিতা আর ঐ পর্যায়ে বাড়েনি।

যুদ্ধের পর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রসমর্পণ করে 'যে যার মতো পুরানো পেশায়' ফিরে গেলেও মুজিব বাহিনীর সদস্যদের ঘিরে ঢাকা থেকে গ্রুপিং শুরু হয়। শাহ আবু জাফর ও কবিরুল আলমরা ফরিদপুরে সিরাজপন্থী থাকার ইঙ্গিত দিলেও ঢাকায় এসে শেখ শহিদুল ইসলামের প্রভাবে শেখ মণি গ্রুপে যোগ দেন। সিরাজুল আলম খান তখন ছাত্রলীগের স্থানীয় আরেকজন উদীয়মান সংগঠক আবু সাঈদ খানকে কাজে লাগিয়ে জেলায় তাঁর পক্ষীয় নতুন কমিটি গঠন করান। আবু সাঈদ খান এই কমিটির সভাপতি এবং সমীর বসু সাধারণ সম্পাদক হন। রাতারাতি এদের প্রধান আদর্শ হয়ে যায় 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র।' পরে জাসদ সৃষ্টির পর মেজর জলিলের সহযোগী ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ খুরশীদকে সভাপতি এবং আতাউল হককে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় জাসদের জেলা কমিটি। পরে ক্যাপ্টেন বাবুলও জাসদে যোগ দেন এবং পুরানো নেতৃত্ব ইতোমধ্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায় স্থানীয় জাসদের সাধারণ সম্পাদক হন তিনি। মুজিব পরিবারের সঙ্গে বৈরিতার সূত্রে প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা ওবায়দুর রহমান জাসদের এই উত্থানে নীরব সহযোগিতার নীতি নেন।[৬১৯] আবার ক্যাপ্টেন বাবুল আগরতলা

---

৬১৮ শাহ আবু জাফর মুজিব বাহিনীর প্রথম ব্যাচে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। তিনি যখন প্রশিক্ষণ নিয়ে ফরিদপুরে প্রবেশ করেন তখন তাঁর পাশাপাশি মহকুমা হিসেবে মাদারিপুরে প্রবেশ করেন মুজিব বাহিনীর সারোয়ার হোসেন মোল্লা। শেষোক্তজনকে পরে আমরা দেখবো রক্ষীবাহিনীর উপ-পরিচালক (অপারেশন) হতে। আর প্রথমোক্তজন রাজনৈতিক জীবনের এক পর্যায়ে যোগ দিয়েছিলেন জাতীয় পার্টিতে এবং পরে বিএনপিতে।

৬১৯ জাসদের উত্থানে আওয়ামী লীগের ভিন্নমতাবলম্বীদের বা মুজিব বৈরিদের এরূপ সহযোগিতার দৃষ্টান্ত বিস্তর। এক্ষেত্রে বড় দৃষ্টান্ত রাজশাহীতে ১৯৭৩-এর নির্বাচনে জাসদের একটি আসন লাভ। রাজশাহী জেলার সমীক্ষাকালে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে জাসদ প্রথম যাঁকে সভাপতি বানিয়েছিল– সেই মাওলানা মতিনও এই দলে এসেছিলেন আওয়ামী বিরোধী রাজনীতি থেকে। জাসদপন্থী শ্রমিক লীগের সূচনাকালে

মামলায় রক্ষীবাহিনীর প্রধান এ এন এম নূরুজ্জামানের সহযোগী থাকায় এই জেলায় জাসদের ওপর রক্ষীবাহিনীও কমই চড়াও হয়েছে। গণবাহিনী ও রক্ষীবাহিনীর যুদ্ধাবস্থার মাঝেও নূরুজ্জামান ফরিদপুর এলে ক্যাপ্টেন বাবুলের সঙ্গে দেখা করতেন। তবে ক্যাপ্টেন খুরশীদ, আতাউল হক কিংবা ক্যাপ্টেন বাবুল– কেউ বেশিদিন জাসদে থাকেন নি। প্রথমোক্তজন রাজনীতিতে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। দ্বিতীয়জন এখনও সিরাজুল আলম খানের অনুসারী হলেও সেটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাত্র। আর শেষোক্তজন ফিরে গেছেন আওয়ামী লীগে।

ফরিদপুরে একাত্তর-উত্তর রাজনীতিতে একটি আকস্মিক পরিবর্তন ছিল– ডিগ্রি পরীক্ষায় নকল করার কারণে শাহ আবু জাফর ও কবিরুল ইসলামের ইমেজ সংকট এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারানো। ফলে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর তুলনায় এ জেলায় জাসদের যাত্রা অপেক্ষাকৃত নির্বিঘ্ন ছিল। তারপরও কেন্দ্রের চাপে পড়ে এখানেও চুয়াত্তরে গণবাহিনী গঠন করতে হয়। আবু সাঈদ খান তার পলিটিক্যাল কমিশার এবং মঞ্জুরুল ইসলাম বাহিনীর সামরিক কমান্ডার ছিলেন। কিন্তু যেহেতু জেলায় দলের প্রধান সংগঠক আবু সাঈদ খান সশস্ত্র সংগ্রামের কার্যকারিতার বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে সন্দিহান ছিলেন এবং জেলায় আওয়ামী সংগঠকদের একাংশের নীরব প্রশ্রয়ও ছিল জাসদের প্রতি সে কারণে এই জেলায় অন্যান্য জেলার মতো 'সশস্ত্র উপায়ে আওয়ামী আক্রমণ প্রতিরোধ'-এর প্রয়োজন পড়েনি, গণবাহিনীর কার্যক্রমও থেকে যায় সীমিত পর্যায়ে। 'মাত্র দুটি উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয় আমাদের। চরভদ্রাসনে আমাদের একজন ছাত্রনেতাকে মেরে ফেলা হয় এবং অন্যত্র নজরুল ইসলাম নামে একজন কর্মী অস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে মারা যায়; এর বাইরে দু'বার হামলা হয়েছে– একবার অফিসে এবং একবার মিছিলে', জানালেন জেলার প্রধান সংগঠক আবু সাঈদ খান।[৬২০] তাঁর ভাষায়, 'সরকার বিরোধিতায় পুলিশও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।' যদিও পার্শ্ববর্তী মাদারিপুর, রাজবাড়ী ইত্যাদি স্থানের পরিস্থিতি অনুরূপ ছিল না। মাদারিপুরে হেলাল ও গোলাম মাওলার নেতৃত্বে তখন রীতিমতো যুদ্ধাবস্থা চলছে। রাজবাড়ীতেও আবদুল মতিনের নেতৃত্বে এবং পাংশায় আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে প্রায় অনুরূপ অবস্থা।

প্রথমে হাসানুল হক ইনু এবং পরে মুখ্যত শরীফ নুরুল আম্বিয়া কেন্দ্রের তরফ থেকে ফরিদপুরকে 'দেখাশোনা'র দায়িত্বে ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁরা

বিভিন্ন শ্রমিক এলাকায়, বিশেষত ডেমরায় তারা আওয়ামী বিরোধী শক্তির সক্রিয় সমর্থন পেয়েছিল।

৬২০ এই জেলায় তিনি এক পর্যায়ে দীর্ঘ দশ বছর জাসদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়েছে ২০১২ সালের ২ নভেম্বর ঢাকায় দৈনিক সমকাল কার্যালয়ে। ২০১৩ সালের ৭ অক্টোবর একই স্থানে তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার কথা হয়।

ফরিদপুরকে মাদারিপুর ও রাজবাড়ীর সশস্ত্র সংগ্রামীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে রেখে দেওয়ার কৌশল নেন। পঁচাত্তর পর্যন্ত এই জেলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বস্তুত এরূপ সুশীল রূপেই থেকে যায়। একমাত্র সর্বহারা পার্টির সঙ্গেই গণবাহিনীর বৈরি সম্পর্ক ছিল দীর্ঘ সময়– বিশেষত মাদারিপুর অঞ্চলে।

১৯৭৪-এর শেষ দিকে ফরিদপুরে সর্বহারা পার্টির প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন রইসউদ্দিন আরিফ। ঐ সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার আগে ফরিদপুরে দায়িত্বে ছিলেন কমরেড রফিক। আমাদের দলের বাউফল বিপর্যয়ের পর আমি সেখানে যাই। এসময় রাজৈরকে ঘিরে মুজিব বাহিনীর সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষের যে পরম্পরা চলছিল– আমি তা বন্ধ করি।'

নিজেদের পাশাপাশি গণবাহিনী এবং অন্যান্য বামদলের সেই সময়কার সশস্ত্রতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আরিফ বলেন, 'আমাদের টার্গেট ছিল জাতীয় শত্রুরা– কারণ আমরা মনে করতাম জাতীয় স্বাধীনতা তখনও অপূর্ণ। অন্যদিকে হক-তোয়াহাদের খতমের লাইন ছিল শ্রেণিশত্রুভিত্তিক। জাসদ এক্ষেত্রে ছিল তাত্ত্বিকভাবে অস্পষ্ট, হঠকারী।'[৬২১]

উল্লেখ্য, মুজিবের মৃত্যু এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মীরা গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর জাসদের রাজনীতির উত্থানপর্বও শিগগির থিতিয়ে আসে। এরপর বিভিন্ন সময়ে একে একে, মাদারিপুরের শাহজাহান খান আটকাবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে যোগ দেন আওয়ামী লীগে এবং মঞ্জুরুল ইসলাম, গোলাম মাওলা ও রাজবাড়ীর আবদুল মতিন যোগ দেন জাতীয় পার্টিতে। রাজবাড়ীর অপর এক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক আবুল কালাম আজাদ আরও তিন সহযোগীসহ পরবর্তীকালে পাংশার কালুখালির কাছে এমবুশে নিহত হন।

রংপুর

সেনানিবাস ছেড়ে আসা সৈনিকদের ফিরিয়ে দিয়েছিল গণবাহিনী

রংপুরে ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ-এর জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন মতিউর রহমান । এ ছাড়াও গাইবান্ধার লুৎফর রহমান এর ভূমিকা ছিল বিশিষ্ট। তিনি সে সময়ে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি একজন শিল্পপতিও ছিলেন। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সেখানে দুর্বল তখন। ভাসানী ন্যাপ ছিল এদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি সক্রিয়। মুসলিম লীগের প্রাধান্য তখন অনেক কমে এসেছিল। যদিও অনেক ধনী প্রভাবশালী মুসলিম পরিবার

---

৬২১ রইসউদ্দিন আরিফ দাবি করেছেন, সেসময় বৃহত্তর ফরিদপুরে সার্বক্ষণিক, আধা-সার্বক্ষণিক ও সক্রিয় সমর্থক মিলে তাঁদের প্রায় পাঁচ হাজার জনবল ছিল। যদিও 'এর মাঝে সশস্ত্র গেরিলা পঞ্চাশের অধিক নয়।' বর্তমান লেখকের সঙ্গে অপ্রকাশিত আলাপচারিতা, *পূর্বোক্ত*।

মুসলিম লীগের অনুসারী হিসেবে গণ্য হতো। জামায়াতে ইসলামীও এসব গ্রামীণ জনপদে সংগঠন গড়ে তুলছিল।

সত্তর-একাত্তরে অত্র অঞ্চলে স্থানীয় ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্রস্থল ছিল কারমাইকেল কলেজ। প্রায় ১ হাজার ৭০০ শিক্ষার্থী ছিল তখন কলেজটিতে। ঐ সময়ে ছাত্রলীগ এখানে প্রধান ছাত্রসংগঠন। এর আগে ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া গ্রুপের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। নূরুল রসুল চৌধুরী, খালেকুজ্জামান চৌধুরী, মুফতি বেনজুবায়ার রহমান প্রমুখ ছিলেন এই সংগঠনের নেতা। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও প্রস্তুতি ছিল না।

ঢাকা থেকে মাঝে মাঝে শাজাহান সিরাজ আসতেন। স্বপন চৌধুরী আসতেন। মনিরুল হক চৌধুরীও আসতেন। স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছিলেন অলক সরকার, রফিকুল ইসলাম গোলাপ, জাকির আহমেদ সাবু, হারেস উদ্দিন সরকার, মোক্তার ইলাহি, আজিজুর রহমান রাংগা, মাহবুবুল বারী, নূরুল হাসান প্রমুখ। ঢাকার মতোই ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে এখানে দুটি গ্রুপ ছিল। শক্তিশালী গ্রুপটির প্রধান ছিলেন হারেস উদ্দিন সরকার। এদের যোগাযোগ ছিল ফজলুল হক মণি প্রমুখের সঙ্গে। অলক সরকার, মুক্তার ইলাহি ছিলেন সিরাজুল আলম খান গ্রুপের সংগঠক। প্রথমোক্তজন কারমাইকেল কলেজে ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন দু'বার। শেষোক্তজন ছিলেন কারমাইকেল কলেজের ভিপি। ধীরে ধীরে এখানে অলক সরকারের সঙ্গে সিরাজ গ্রুপের কেন্দ্রীয় নেতা মনিরুল ইসলামের সাংগঠনিক সখ্যতা গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে জাসদ ও গণবাহিনী গঠন পর্যায়ে এই দু'জনকে রংপুরে সংগঠনের প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে দেখা যাবে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এই উভয় গ্রুপই যার যার মতো করে সীমান্ত পাড়ি দেয়। আগস্ট নাগাদ বিএলএফ ক্যাডাররা রংপুর আসতে শুরু করে। প্রায় দেড় শত যোদ্ধার স্থানীয় বিএলএফ টীমের কমান্ডার ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান মুকুল এবং ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন মুক্তার ইলাহি। যদিও সাধারণভাবে ধারণা করা হতো যে, অপেক্ষাকৃত রাজনীতি সচেতনরা বিএলএফ-এ রিক্রুট হয়েছে– কিন্তু রংপুরের রিক্রুটমেন্টের ধরন তার ব্যতিক্রম ছিল বলা যায়। অনেক বিএলএফ যোদ্ধারই রাজনৈতিক বোঝাপড়া ছিল দুর্বল। যার ফল হিসেবে দেখা যায় যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বিএলএফ-এর কিছু সদস্য ডাকাতিসহ বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এরা কেউ সরাসরি কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়নি। অথচ বিএলএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রিক্রুটমেন্টে রাজনৈতিক বোঝাপড়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন বলে কথিত রয়েছে।

বিএলএফ-এর বাইরে রংপুর অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদের নেতৃত্বে ছিলেন নওয়াজেশ আহমেদ– যিনি পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হয়েছেন। রংপুরে বিএলএফ ও মুক্তিবাহিনীর আন্তঃসম্পর্কে কোনো বৈরিতা দেখা

না গেলেও রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জে মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রায় ৩০-৩৫ জন বিএলএফ যোদ্ধা মারা যায় বলে কথিত রয়েছে।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যুদ্ধকালে রংপুরে চারজন আওয়ামী লীগ এমএনএ পাকিস্তান সরকারের পক্ষাবলম্বন করে। প্রধান নেতা মতিউর রহমান প্রবাসী সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন। অন্যদিকে স্থানীয় এমপি সিদ্দিক হোসেন ২৫ মার্চ পূর্ব থেকে স্থানীয়ভাবে সিরাজুল আলম খান গ্রুপের নৈকট্যে থাকলেও জাসদ গঠনকালে বিস্ময়করভাবে তাকে বিপরীত শিবিরেই দেখা যায়।

ছাত্রলীগ কেন্দ্রে বিভক্ত হওয়া মাত্র রংপুরেও বিভক্তি চলে আসে। আনুষ্ঠানিক বিভক্তির আগে শেখ মুজিবুর রহমান রংপুর এলে সিরাজ গ্রুপ সেখানে উপর্যুপরি 'লাল-সালাম' শ্লোগানে অভিনন্দন জানাতে শুরু করলে মুজিব নিজেই তাদের থামিয়ে দেন– 'স্টপ ইট' বলে। রাজশাহীতেও এসময় একই ধরনের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সংগঠক অলক সরকারের ভাষায়, 'মুজিবের এই মনোভাব দেখেই আমরা বুঝেছিলাম– সমাজতন্ত্র হচ্ছে না। সমাজতন্ত্র করতে হলে আলাদা সংগঠন লাগবেই।'[৬২২]

সেই পৃথক সংগঠন যখন হলো তখন স্থানীয় জাসদের নেতৃত্বে দেখা গেল সভাপতি হিসেবে শাহ আনোয়ারুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রফিকুল ইসলাম গোলাপকে। শাহ আনোয়ারুল হক ছিলেন ন্যাপ নেতা। পরবর্তীকালে আহমেদ জহুরুল ইসলাম মন্টু সভাপতি হন। তরুণদের মধ্যে ছিলেন আমিরুল হক খোকন, আমিনুল ইসলাম রাজু প্রমুখ।

যাত্রা মুহূর্তে জাসদ তরুণদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করলেও রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ থেকে এই নতুন দলের সৃষ্টি স্থানীয় জনমতকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি– যার প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় ১৯৭৩-এর নির্বাচনে দলটির প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য দেখাতে পারেননি। এসম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে অলক সরকার বলেন, 'আমাদের উদ্যোগটি ছিল অপরিণত; মানুষ তখনো মুজিবকে সময় দিতে চাইছিল।' তবে জাসদ গঠন early হলেও গণবাহিনী গঠনে যথেষ্ট সময় নেয়া হয়েছিল' বলে মন্তব্য করেন অলক সরকার।

অন্যদিকে জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ না থাকলেও গোলাপ, মুকুল প্রমুখের নেতৃত্বে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই এসময় জাসদ গঠনকালে এই দলের দিকে চলে এসেছিল। ফলে এখানে যুদ্ধোত্তর সমরশক্তিতে জাসদকে কোনো শক্তিশালী পক্ষ মোকাবেলা করতে হয়নি। পুরো মুজিব আমলে ২-১টি ব্যতিক্রম বাদে জাসদ সংগঠকদের খুব বেশি নির্যাতিত হতেও হয়নি। এমনকি রক্ষীবাহিনীও এখানে

---

[৬২২] ২০১৪ সালের ৩০ মার্চ অলক সরকারের সাক্ষাৎকার নেয়া হয় ঢাকায়।

জাসদের উপর বৈরিতা প্রদর্শন করেনি– প্রতিশোধের আশঙ্কায়। তারপরও এখানে গণবাহিনী গড়ে উঠেছিল! কমান্ডার ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান মুকুল এবং পলিটিক্যাল কমিশার ছিলেন অলক সরকার। কেন্দ্রীয়ভাবে মার্শাল মনিরুল ইসলামের কাছ থেকেই এখানকার গণবাহিনীর মূল নির্দেশনা আসত। তবে 'জেলা ফোরাম'-এর মুখ্য নেতা ছিলেন অলক সরকার। সিরাজুল আলম খান কখনো রংপুর এসেছেন কি না সেটা জানা যায় না। মুক্তিযুদ্ধকালে এপক্ষীয় মুক্তিযোদ্ধারা যে সব অস্ত্র জমা দেননি– কেন্দ্রীয় নেতারাও তা জানতেন; ফলে গণবাহিনী গড়ে ওঠার পর অনিবার্য এক সশস্ত্রতা কায়েম হয়েছিল দ্রুত।

গণবাহিনীর যোদ্ধা সংখ্যা আনুমানিক কেমন ছিল? এ বিষয়ে এ বাহিনীর স্থানীয় সংগঠক অলক সরকার বলেন, সঠিক সংখ্যা মনে নেই– তবে রংপুরের তৎকালীন ৪টি মহকুমার (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী) ৩১টি থানায় আনুমানিক ১২০০/১৩০০ জনকে গণবাহিনীর সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। গণবাহিনীর আরেকজন সংগঠক আনোয়ার হোসেন বাবলু বলেন, 'প্রতিটি ইউনিয়নে আমাদের অন্তত একটি সেকশন ছিল। প্রতিটি সেকশনে ১৫ জন সদস্য থাকতেন। এমনও ইউনিয়ন ছিল যেখানে তিনটি সেকশন গড়ে উঠেছিল।'[৬২৩]

তবে এসব যোদ্ধাদের প্রতিপক্ষ ছিল না– যে কারণে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আগে গণবাহিনীর অভিযান হয়েছে এ অঞ্চলে অতি নগণ্য– কেবল কিছু 'ডাকাত' হত্যা ছাড়া। আনোয়ার হোসেনের ভাষায়, '১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আমরা ছিলাম অপ্রতিরোধ্য; জনগণও ভীষণ সহযোগিতা করত; তবে ১৫ আগস্টের পর সেটা পাল্টে যায়। মানুষ ভাবত, আমরা শুধু মুজিবের পতন চেয়েছি– এখন তিনি নেই, সুতরাং আমাদের এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। কিন্তু আমরা তখন তা করিনি, করার কারণও ছিল না– এ সময়ই জনগণের সমর্থন সরে যায়।'

খন্দকার মোশতাক আহমেদের শাসনামলেই ধরপাকড় শুরু হয়েছিল; জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তা ব্যাপকতা পায়। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে প্রায় ৭০ জন গণবাহিনী ও জাসদ কর্মী মারা যায়। অন্তত এক শত সদস্য আটক হন। রাষ্ট্রীয় বাহিনী তখন গণবাহিনী ও জাসদকে নির্মূল করার সামরিক লক্ষ্য নিয়ে প্রতিশোধপরায়ণ ছিল।

এসব হামলা মোকাবেলায় শক্তিক্ষয়ের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় জাসদের নীতিগত পরিবর্তনও ধীরে ধীরে গণবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে

---

৬২৩ আনোয়ার হোসেন বাবলু'র সাক্ষাৎকার নেয়া হয় ২০১৪ সালের ২৩ মে– ঢাকায়। সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় তিনি বাসদ [হায়দার]-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জনাব বাবলু জাসদে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৭৪ সালে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে।

স্থানীয় পর্যায়ে এই বাহিনীর কার্যক্রম কখনো বন্ধ ঘোষণা হয়নি বলে জানিয়েছেন এর সংগঠকরা। 'এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে গণবাহিনীর কাঠামো বা কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়নি কখনো, প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে এটি গড়ে উঠবার ব্যাপার ছিল এবং পরবর্তীকালে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়', বললেন অলক সরকার। আনোয়ার হোসেনের মতে, 'গণবাহিনী কখনো বন্ধ ঘোষিত হয়নি। ব্যাপক ধরপাকড়ে পুরো বাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। কারফিউ দিয়ে বাহিনীর বিরুদ্ধে কম্বিং অপারেশন চালানো হতো। আমাদের ধরিয়ে দিতে পোস্টার লাগানো হতো সর্বত্র। সামগ্রিক সাড়াশি অভিযানে বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আটককৃতদের অনেকে নির্যাতনের ফলে অস্ত্রের হদিস বলে দেওয়ায় সামরিক সক্ষমতাও কমে যায়।'

রংপুরে আওয়ামী লীগ ও রক্ষীবাহিনী জাসদের কাজে বাধা না দেওয়ার পরও গণবাহিনী গঠনের প্রয়োজন পড়ল কেন? এটা কি স্রেফ কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য? এ প্রশ্নের উত্তরে অলক সরকার বলেন, আমাদের মনে হয়েছিল সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে এটা অনিবার্যভাবে লাগবে। আর আনোয়ার হোসেন বাবলু'র ভাষায় : 'মুজিব সরকার জাসদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলল, সরকার আমাদের নিষিদ্ধ করলে কী হবে– জনগণ তো নিষিদ্ধ করেনি'– এই বলে নতুন প্রক্রিয়ায় সাংগঠনিক কাজ শুরু হয়েছিল, যা ছিল পুরোপুরি সামরিক কাজ। দিনে গ্রামে বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে থাকা এবং রাতে বৈঠক ইত্যাদি চালানো। শক্তিশালী গণবাহিনীর কাছে 'গ্রামগুলো ছিল মুক্তাঞ্চলের মতো।' যদিও বিশেষ কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়নি সেই মুক্তাঞ্চলে। 'আমাদের উল্লেখযোগ্য অপারেশন ছিল রিলিফ চোর খতম করা; ডাকাত খতম করা ইত্যাদি। চুয়াত্তরে দুর্ভিক্ষের সময় শ্যামপুর স্টেশনে ওয়াগন থেকে গম-চাল ইত্যাদি লুট করে সবার মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল একবার', জানালেন আনোয়ার হোসেন।

এর আগেই অবশ্য গণবাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় ক্যান্টনমেন্টের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কর্মীদের সংযোগ তৈরি হয়েছিল। সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থানকালে যে সংযোগের ব্যাপক ফলাফল দেখা যায় রংপুরে। কেন্দ্রীয়ভাবে গণবাহিনী ছিল বিপ্লবী সৈনিক সংস্থারই অঙ্গ সংগঠন। তবে 'সিপাহি বিপ্লব' ব্যর্থ হওয়ার পর তার সঙ্গে যুক্ত সিপাহিরা সেনানিবাস ছেড়ে গণবাহিনীর আশ্রয়ে আসতে চাইলেও অপ্রস্তুত গণবাহিনী তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল। ঐ সৈনিকদের পরবর্তী নির্মম পরিণতির জন্য জাসদ কখনো আত্মসমালোচনা করেছে বলে জানা যায় না।

অন্যদিকে রংপুরে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে নকশালদের তৎপরতা ছিল অতি ক্ষীণ– ফলে তাদের সঙ্গে গণবাহিনীর সংঘাতের ঘটনাও অতি কম। বদরগঞ্জে কেবল এইরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল বলে জানান অলক সরকার। এই বিষয়ে আনোয়ার হোসেন বাবলু আরও স্পষ্ট করে বলেন, 'জনগণের বাহিনী তো দুটি

থাকতে পারেন না। এটাই ছিল আমাদের তখনকার দৃষ্টিভঙ্গি। সে কারণে সশস্ত্র অন্যদের আমরা সর্বত্র নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে চেয়েছি।'

জিয়াউর রহমানের শাসনমালের শুরুতে বিপর্যয় শুরু হলেও একই শাসকের আমলেই শুরু হয়েছিল দলটির দ্বিতীয় পর্যায়ের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া। তবে ইতোমধ্যে উত্তাল ২-৩ বছরের কার্যক্রমের সারসংকলন করতে গিয়ে কেন্দ্রের মতোই রংপুরেও বিভক্তি দেখা দেয় দলটিতে। রফিকুল ইসলাম গোলাপ, আনোয়ার হোসেন বাবলু প্রমুখের নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত তরুণরা আলাদা অবস্থান নেন। শামসুল আলম খান, আজিজার রহমান প্রমুখও এই ধারায় ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে শেষোক্ত দু'জন আবার মূল জাসদে ফিরে যান। গোলাপ শেষপর্যন্ত যোগ দেন এরশাদের দলে। অন্যদিকে মোস্তাফিজুর রহমান মুকুল প্রমুখ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।

রাজশাহী

কেবল 'কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত'-এর কারণে গণবাহিনী গঠিত হয়

রাজশাহী উপরোক্ত জেলাগুলো থেকে কিছুটা দূরবর্তী। কিন্তু জাসদ রাজনীতিতে এই জেলার একটি বড় বিশেষত্ব হলো তিয়াত্তরের জাতীয় নির্বাচনে জাতীয়ভাবে দেশব্যাপী ব্যাপক ভোট কারচুপির মাঝেও এই জেলায় (উপ-নির্বাচনে) জাসদের একজন প্রার্থী জয়লাভ করে। যেসব জেলায় জাসদ নিজেকে সাংগঠনিকভাবে বেশি শক্তিশালী মনে করেছে এবং যেখানে জাসদের অধিক সশস্ত্র তৎপরতা ছিল সেখানেও জাসদ নির্বাচনে তাদের প্রতি জনসমর্থনকে ভোটের ফলাফলে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করতে পারেনি, অথচ রাজশাহীতে তা ঘটেছিল। তখনকার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এটা ছিল বিস্ময়কর। এ থেকে সাংগঠনিকভাবে জাসদের অনেককিছু শিক্ষণীয় ছিল। কিন্তু স্থানীয় সেই শিক্ষার চেয়েও জাসদ কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তগুলো সর্বত্র অগ্রাধিকারভিত্তিতে অনুসরণ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের আগে রাজশাহীর রাজনীতিতে সাধারণভাবে মুসলিম লীগ এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রভাবই ছিল প্রায় একচ্ছত্র। এর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ধারা ছিল ভাসানী ন্যাপ, পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন, মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের বিকাশ মূলত ১৯৬৮ সালের পর।

মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়নের দুটি অংশই বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা রাখে। আওয়ামী লীগের মধ্যে মূল নেতা কামারুজ্জামান হেনা (যার পিতা হামিদ মিয়া ছিলেন এককালে মুসলিম লীগের সভাপতি) সক্রিয় ছিলেন কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে– আর তাঁদের দলের কিছু তরুণ যুদ্ধে অংশ নেয় মুজিব বাহিনীর ব্যানারে। আওয়ামী লীগের এই মুজিব বাহিনী ঘরানার মূল নেতা ছিলেন মাসুদুল হক ডুলু। মুক্তিযুদ্ধের পর এই ডুলু, আবদুল কুদ্দুস, মাহবুব জামান ডুলু (যুবলীগ) প্রমুখের কার্যক্রমে ছাত্রলীগে মতভিন্নতা তৈরি হতে থাকে। এসময়

জাতীয় পর্যায়ে ছাত্রলীগ ভেঙে গেলে রাজশাহীতেও ভুলু ও কুদ্দুসদের বিরোধিরা আলাদা অবস্থান নেয়। এভাবেই উত্তরবঙ্গের এই কেন্দ্রীয় জেলাতে জন্ম নেয় জাসদ। নতুন এই দলের রাজশাহীতে মূল নেতা ছিলেন মাহফুজুর রহমান খান, সরকার আবদুল খালেক দুলাল, মঈনউদ্দিন আহমেদ মানিক, মোহাম্মদ আলী (মেজর) প্রমুখ। চারঘাট-বাঘা এলাকার আবদুল খালেক দুলাল দলটির রাজশাহী শাখার সভাপতি হন। মুজিববাদপন্থী অংশ এদের কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার চেষ্টা করলেও সাংগঠনিকভাবে ধীরে ধীরে এদের অগ্রগতি ঘটছিল। এক্ষেত্রে প্রধান এক উপাদান ছিল আওয়ামী লীগ রাজনীতির প্রতি এ অঞ্চলে ঐতিহাসিকভাবে যারা বৈরি তাদের তরফ থেকে জাসদ পরোক্ষ সমর্থন পেতে থাকে। যেহেতু আওয়ামী লীগ ছিল উভয়ের একক শত্রু। সাম্যবাদী দলের স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশও বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে জাসদের প্রতি অবৈরী ভূমিকা নেয়। এসবেরই সম্মিলিত ফল হিসেবে দেখা যায়, তিয়াত্তরের নির্বাচনে[৬২৪] কামারুজ্জামান হেনার (তিনি প্রথমে দুটি আসনে বিজয়ী হয়েছিলেন– রাজশাহী সদর ও তানোর-গোদাগাড়ি) ছেড়ে দেওয়া একটি আসনে (সদর) জাসদের তরুণ প্রার্থী মঈনউদ্দিন আহমেদ মানিক সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে বিপুল ব্যাবধানে বিজয়ী হয়ে যান।

প্রথম দফা ভোটে আওয়ামী লীগের এ এইচ এম কামারুজ্জামান এখানে ভোট পেয়েছিলেন ৫৯ হাজার ১৮১। জাসদের মঈনুদ্দিন আহমেদ মানিক পেয়েছিলেন ২ হাজার ৮২৬ ভোট। ন্যাপ (মো)-এর আতাউর রহমান পান ৮ হাজার ৪০৯ ভোট। ন্যাপ (ভাসানী)'র ইমরান আলী সরকার পান ৩ হাজার ৬৩৩ ভোট।

আওয়ামী লীগ প্রার্থী পরে আসনটি ছেড়ে দিলে ১৯৭৩ সালের ২২ মে তারিখে সেখানে উপনির্বাচন হয়। যাতে জাসদের প্রার্থী মানিক ভোট পান ২৭ হাজার ১৫ এবং বিজয়ী হন। এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আব্দুল হাদি ভোট পান ১০ হাজার ৩২৬। বলা বাহুল্য, মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে এখানে জাসদ প্রার্থীর ২৪-২৫ হাজার ভোট বৃদ্ধি স্বাভাবিক নয়। আওয়ামী লীগের আবদুল হাদি একজন সুপরিচিত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন– যদিও তার ইমেজ সংকটও ছিল। মূলত জাসদের আওয়ামী-সন্ত্রাস বিরোধী ভাবমূর্তির কারণেই ভোটকেন্দ্রে তাদের পক্ষে

---

৬২৪ ঐ নির্বাচনে জাসদ ২৩৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এরূপ ব্যাপকভিত্তিক মনোনয়নের মধ্য দিয়ে জাসদ দেশে প্রধান বিরোধী দলের দাবিদার হিসেবে তার অবস্থান শক্ত করে নেয়। যদিও নির্বাচনে তাদের ফল আশানুরূপ ছিল না, তবে তরুণদের মাঝে জাসদের সেই সময়কার উদীয়মান প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় সিপিবি'র '১৯৭৩ *সালের সাধারণ নির্বাচনের পর্যালোচনা রিপোর্ট*' নামের দলিল থেকে। তাতে দলটি বলে : '...নির্বাচনের মাধ্যমে ইহাও বুঝা গিয়াছে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের একটা বড় অংশ বিভিন্ন কারণে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী মনোভাব পোষণ করে। ইহাদের একটা অংশের উপর জাসদের উগ্র রাজনৈতিক প্রভাবও পড়িতেছে।...'

জনজোয়ার ঘটেছিল। যে জনজোয়ারের সুনির্দিষ্ট কোনো শ্রেণি বা আদর্শিক চরিত্র ছিল না। রাজশাহীতে তখন আওয়ামী লীগ বিরোধী যেসব দল সক্রিয়– বিশেষ করে সাম্যবাদী দল ছিল কমিউনিস্ট ধারার– নির্বাচনের পরিবর্তে বৈপ্লবিক উপায়ে সমাজ পরিবর্তনেই ছিল তাদের মনোযোগ। কিন্তু মানুষ জাসদ এবং তার নির্বাচনী পথকে আওয়ামী লীগের শাসনের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশের উত্তম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল– যার পরিণতি বিস্ময়কর ঐ নির্বাচনী ফল।

এরপরও জাসদ ঐ অঞ্চলে গণবাহিনী গঠন করে। কারণ এটা ছিল 'কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত'।[৬২৫] অথচ তখনও সাংগঠনিকভাবে দলটি তৃণমূলে শেকড় বিস্তার করতে পারেনি। ফলে তার সশস্ত্র হয়ে পড়া কোনো গণচরিত্র নিতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগকে মোকাবেলা ছাড়াও এক পর্যায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তানভীর নামে সাম্যবাদী দলপন্থী এক তরুণ কর্মীকে হত্যার মধ্য দিয়ে নকশালদের সঙ্গে সংঘর্ষের নতুন ফ্রন্ট খোলে তারা।

আগেই বলা হয়েছে, রাজশাহীতে নকশালদের প্রধান কেন্দ্র ছিল সাম্যবাদী দল। জাতীয় পর্যায়ে এই দলের নেতা ছিলেন সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, নগেন সরকার প্রমুখ। স্থানীয় সংগঠক ছিলেন মহসীন আলী, মাহমুদ জামাল কাদেরী, মোজাহারুল ইসলাম, আমিরুল ইসলাম, ইনসার আলী প্রমুখ। মহসীন আলী পরে যোগ দেন সর্বহারা পার্টিতে। অন্যরা তানোরসহ বিভিন্ন উপজেলায় কৃষক সংগঠন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু রক্ষীবাহিনী, মুজিব বাহিনী ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে এসব নকশাল ধারার সংগঠকরা এক পর্যায়ে রক্ষণাত্মক অবস্থান নিতে বাধ্য হন এবং তারপরও ব্যাপকভাবে

---

৬২৫ ঠিক একই অভিজ্ঞতা দেখা গেছে কুমিল্লার ক্ষেত্রে। জাসদের পক্ষে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে আওয়ামী লীগ বেশি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে না পারলেও কেন্দ্রের নির্দেশে এখানেও গণবাহিনী গঠিত হয়। *ঐ সময়কার জাসদ-ছাত্রলীগ নেতা আবদুল্লাহ হিল বাকি এবং চৌদ্দগ্রামের গণবাহিনী সংগঠক সাহাবুদ্দীন সাথীর সাক্ষাৎকার,* যথাক্রমে ডিসেম্বর ২০১২ ও মে ২০১৩। উল্লেখ্য, বদিউল আলম, হাবিবুল্লাহ চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন কুমিল্লায় গণবাহিনীর সংগঠক। বদিউল আলম ছিলেন সামরিক কমান্ডার, হাবিবুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন পলিটিক্যাল কমিশার। তবে সেখানে এই বাহিনীর কার্যক্রম ছিল অতি সীমিত। এর কারণ হিসেবে হাবিবুল্লাহ চৌধুরী বর্তমান লেখককে বলেছেন, 'এখানে গণবাহিনীর কার্যক্রম চালানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি বরাবর তাদের বাধা দিয়েছি। তারপরও কেন্দ্র থেকে আমাকে পাশ কাটিয়ে বদিউল আলমকে দিয়ে কিছু করার উদ্যোগ নেয়া হয়।' উল্লেখ্য, এই জেলাতেও ছাত্রলীগ বিভক্ত করে জাসদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম মূল নেতা বিএলএফ সংগঠক আনসার আহমেদ পরবর্তীকালে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। একই প্রবণতা দেখা গেছে, কেসস্টাডিভুক্ত অনেক জেলাতে। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে কেন্দ্রের মতো স্থানীয় পর্যায়েও জাসদের বিপুল সংখ্যক নেতৃস্থানীয় সংগঠক অমার্কসবাদী ধারার রাজনৈতিক দলগুলোতে যোগ দেন।

বিপর্যস্ত হন।[৬২৬] অন্যদিকে পঁচাত্তরের মাঝামাঝি এসে জাসদও হতবিহ্বল হয়ে লক্ষ্য করে মুজিব ক্ষমতা থেকে অপসারিত এবং মাঠ পর্যায়ে তার পুরানো রাজনীতির আবেদনও ফুরিয়েছে।

গণবাহিনীর ছিল না ক্ষমতা দখলের কোনো লক্ষ্য; ছিল না মুক্তাঞ্চল গড়ার কর্মসূচি বা 'শ্রেণিশত্রু খতম'-এর কোনো 'লাইন'

এ পর্যায়ে কেসস্টাডিভুক্ত জেলাগুলোর কিছু সাধারণ প্রবণতা নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। উপরোক্ত জেলাভিত্তিক মাঠচিত্রের প্রধান এক বার্তা হিসেবে আমরা দেখেছি, জাসদ ও প্রতিপক্ষ উভয় তরফে সশস্ত্র কার্যক্রমে ব্যক্তির রাজনৈতিক ও চারিত্রিক মনোভঙ্গি এক নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি অনেক জেলায় কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের আগেই সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে দেওয়া হয়। আবার অনেক জেলায় গণবাহিনীর আদৌ কোনো প্রয়োজনই ছিল না। রাজশাহী, ফরিদপুর ইত্যাদি জেলার নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে তার স্পষ্ট ভাষ্য পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে জাসদ 'বিপ্লবী গণবাহিনী'র মাধ্যমে সশস্ত্র তৎপরতায় নামলেও এবং তাদের কার্যক্রমে পুলিশের নীরব সহমর্মিতা সত্ত্বেও (দেখুন : কেসস্টাডি ঝিনাইদহ ও ফরিদপুর)– এর মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কোনো লক্ষ্য ছিল না তার; ছিল না মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার কোনো কর্মসূচি। এমনকি তাত্ত্বিকভাবে 'শ্রেণিশত্রু খতম'-এরও কোনো 'লাইন'ও ছিল না। অথচ দলটি প্রায় পুরো কর্মী বাহিনীকে তিয়াত্তর-চুয়াত্তরে সশস্ত্র করে ফেলে এবং 'প্রতিপক্ষ'-এর সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ে। 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ'-এর নামেই এই যুদ্ধ হচ্ছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শ্রমিক শ্রেণির দর্শন হলেও জাসদের সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব পর্যায়ে শ্রমিক পরিমণ্ডলের প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি নগণ্য। আবার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসা কর্মীরাও সংগঠন ও সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির দার্শনিক অবস্থানের চেয়ে জোর দিয়েছে সশস্ত্র পন্থার প্রতিপক্ষকে মোকাবেলায়। যার একদিকে ছিল সরকার– অন্যদিকে মাওবাদীরা। তবে তাদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল প্রায় কিলিং স্কোয়াডের মতো– তুলনামূলকভাবে যাদের ছিল পদ্ধতিগতভাবে অনেক উন্নত প্রশিক্ষণ। অপর ক্ষুদে প্রতিপক্ষরা চাইছিল কৃষকদের সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে সমাজ থেকে সামন্ত অবশেষের উচ্ছেদ। শেষোক্তদের ছিল কৃষকনির্ভর গেরিলা স্কোয়াড এবং শ্রেণিশত্রু নিধনের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত। তবে এইরূপ সকল ধারাই মুজিবের মৃত্যুর পর জনসমাজে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বা রাজনৈতিক আবেদন হারিয়ে ফেলে। তাদের সশস্ত্র তৎপরতাকে জনগণ তখন ভীতিকর ও আপদতুল্য বিবেচনা করতে শুরু করে। বিশেষত ১৯৭৫-এর আগস্টের পর রক্ষীবাহিনী দৃশ্যপট থেকে অপসৃত হওয়ায় গণবাহিনীর কোনো প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাচ্ছিল না জনগণ। অন্যদিকে

---

৬২৬ এ বিষয়ে ৫.চ উপ-অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

নকশালরা তাদের সংগ্রামে মুজিব আমলে 'ভারতীয় দখলদারিত্ব' ও 'ভারতীয় সৈনিকদের উপস্থিতি'কে এত গুরুত্ব দিয়েছিল যে, ছিয়াত্তর-সাতাত্তরে তাদের সশস্ত্রতাও জনগণের কাছে অবোধগম্য হয়ে পড়ে।

জাসদ নেতৃত্ব সামাজিক এই মনোভাব সবচেয়ে দ্রুত আঁচ করতে সক্ষম হন। ফলে ছিয়াত্তর পরবর্তী সময়ে দ্রুততার সঙ্গে তাঁরা দলকে মেঠো সংঘাতের জায়গা থেকে বের করে আনতে ব্রতী হন। দলের 'কেন্দ্র' তখন নির্বাচন ও সাংবিধানিক রাজনীতির ধারায় প্রত্যাবর্তনের মনোভাব ও আগ্রহ দেখাতে থাকায় স্থানীয় নেতারাও ঐমুখী হয়ে পড়েন। আসলে ততদিনে জেলা পর্যায়ের সংগঠকদের প্রধান এক অংশ তাঁদের এতদিনকার রাজনীতি নিয়ে ছিলেন ক্লান্ত। নির্বাচন-ব্যবসা-ঠিকাদারী ইত্যাদির জগতে যেতে তাঁরা তখন উদ্‌গ্রীব। বাহাত্তর থেকেই এই নেতৃবৃন্দের অনেকে আসলে ঐ জগতেই যেতে চাইছিলেন, কিন্তু আওয়ামী লীগের একাংশের কারণেই তা পারা যাচ্ছিল না– সে থেকেই দ্বন্দ্ব এবং তাঁদের ক্ষেত্রে ঐ দ্বন্দ্বেরই রাজনৈতিক আশ্রয় ছিল 'জাসদ'। আবার কর্মীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রমুখিন তরুণ এক অংশ এই রাজনীতিকেই 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-এর আদর্শিক সংগ্রাম হিসেবে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে নেতাদের 'চাপে' রেখেছিলেন। কিন্তু 'বিপ্লব' ব্যর্থ হওয়া মাত্র ছিয়াত্তর সাল পর্যায়ে এই নেতারা যে যার মতো উপযোগী দলে যোগ দিতে শুরু করলেন; পাশাপাশি অস্ত্রের ব্যবহারও একেবারে গুটিয়ে ফেলা হলো না। এর কারণ কেবল এই ছিল না যে, নির্বাচনী সংস্কৃতিতে অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল– বরং এও তাঁদের বিবেচনায় ছিল, নকশাল ও 'সর্বহারা'দের মোকাবেলার অস্ত্রের প্রয়োজন হতে পারে যে কোনো সময়ই।

জেলা পর্যায়ের জাসদ ও গণবাহিনীর মুখ্য সংগঠকদের দল পরিবর্তনের ধারাতেও তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মুজিব ক্ষমতায় থাকাকালে এই সংগঠকরা 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-এর জন্য সরকার বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম করলেও শিগগির তাঁরা একাংশ আবার আওয়ামী লীগেই ফিরে গেছেন– আর সংখ্যাগরিষ্ঠ গিয়েছেন জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টিতে। বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কোথাও অন্যকোনো বাম-প্রগতিশীল দলকে তাঁদের বিকল্প পছন্দ হিসেবে দেখা যায় না– যা চরম বিস্ময়কর। উপরোক্ত জেলাগুলোতে ফরিদপুরের মঞ্জুরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন বাবুল, পাবনার ইকবাল হোসেন, ঝিনাইদহের গোলাম মোস্তফা, রংপুরের রফিকুল ইসলাম গোলাপ, রাজবাড়ীর আবদুল মাতিন– এরা যোগ দিয়েছিলেন জাতীয় পার্টিতে। চুয়াডাঙ্গার সুলতান রাজা, সিরাজগঞ্জের লতিফ মীর্জা, আবদুর রউফ পাতা, ঝিনাইদহের তোজাম, মাদারিপুরের শাহজাহান খান ফিরে গেছেন আওয়ামী লীগে।

উপরোক্ত আঞ্চলিক সমীক্ষা থেকে এও লক্ষ্য করা যায়, জাতীয় পরিসরে সিপিবি ও ন্যাপের সঙ্গে জাসদের বরাবর যেমন একটি অহিংস বৈরি সম্পর্ক ছিল তেমনি মাঠ পর্যায়ে সিরাজ সিকদার-আবদুল হক-তোয়াহা-আবদুল মতিন-আলাউদ্দিন-টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র বা মাওবাদী ধারার কমিউনিস্টদের সঙ্গেও তাদের তীব্র বৈরিতা ছিল। বিশেষত সেসব জেলাতেই জাসদের সশস্ত্র জোয়ার পরিলক্ষিত হয় যেখানে কমিউনিস্টদের পূর্ব থেকে বিশেষ সাংগঠনিক দৃঢ়তা ছিল।

উপস্থাপিত জেলা সমীক্ষা আরও যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছে তা হলো, গণবাহিনীর মধ্য ও নিম্নসারির সাধারণ সদস্য ও নকশাল সংগঠনগুলোর সাধারণ সদস্যরা– উভয়ই ছিল গ্রামীণ গৃহস্থ পরিবারের সন্তান এবং তাদের নির্মূলের জন্য যাদের মাঠ পর্যায়ে নিয়োগ করা হয়েছিল সেই রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা (এবং ক্ষেত্রবিশেষে যুবলীগ সদস্যরাও) প্রায় অধিকাংশ ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ও কৃষি পটভূমির তরুণ। এভাবে প্রায় একই শ্রেণিকে দিয়ে সেই শ্রেণিরই বিদ্রোহ দমনের কৌশল, সেই বিশেষ মহলের অনন্য দূরদৃষ্টিই প্রকাশ করে যারা এই কৌশলের স্রষ্টা। মুজিব বাহিনীর সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ঐতিহাসিক বিকাশধারার তাৎপর্য তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান। মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মোকাবেলা, কমিউনিস্টদের নিধনে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার, এমনকি এ কাজে দেশের সেনাবাহিনীকেও প্রায় ব্যবহার না করেই লক্ষ্য অর্জন[৬২৭] ইত্যাদি যেসব সফলতা দেখা যায় বাংলাদেশে একাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যায়ে– তা তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের জন্যও মনোযোগের অনন্য দৃষ্টান্ত বৈকি। যদিও একাত্তরের মূল 'যুদ্ধ' এইরূপ বিশ্লেষকদের যতটা মনোযোগ পেয়েছে– সেই 'যুদ্ধের আড়ালে সংগঠিত অপর যুদ্ধ' ততটাই এড়িয়ে গেছেন তাঁরা।

বর্তমান অধ্যায়ে উপস্থাপিত উপরোক্ত জেলাগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে এও দেখা যায়, 'বৈধ' ও 'অবৈধ' সংগ্রাম সমন্বয়ের লেনিনীয় শিক্ষার প্রয়োগ স্বাধীনতা-

---

৬২৭ একাত্তর-উত্তর উপরোক্ত সশস্ত্র তৎপরতাগুলোর সারসংকলন করতে গিয়ে দেশের তখনকার বামপন্থী নেতা হায়দার আকবর খান এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা এ পর্যায়ে বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। তাঁর মতে, এই সশস্ত্র সংগ্রামগুলো প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতা অনুসারে গড়ে ওঠেনি। গণসংগ্রাম তার যৌক্তিক পরিণতিতে সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে– এমন নয়। এই সশস্ত্র সংগ্রামগুলো ছিল জনগণের চিন্তাচেতনার বাইরে কিছু ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত এবং অনেকটা জোর করে চাপিয়ে দেয়া। এই সশস্ত্র সংগ্রামগুলোর মধ্যে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, উদ্যোগ বা ভূমিকা ছিল না। দেখুন, হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম*, গণমুক্তি প্রকাশন, ১৯৮২, ঢাকা, পৃ. ১৭২।

উত্তর আলোচ্য কোনো বাম ধারাই কোনো পর্যায়ে করতে পারেনি বা করেনি।[৬২৮] এসব পার্টি, দল বা গ্রুপ– বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত জেলাগুলোতে যেসব সংগঠকের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা প্রায় সবাই বলেছেন, 'আত্মরক্ষামূলক' প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করেতে হয়েছিল তাঁদের। গণবাহিনীর অনেকে বলেছেন, 'রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার আমাদের বাধ্য করেছে অস্ত্র ধারণ করতে।' কিন্তু সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক পরিসরে ষাটের দশক ও সত্তরের দশকে মার্কসীয় সশস্ত্র বিপ্লবী তৎপরতার সারসংকলন হলো– গেরিলা যুদ্ধকে আক্রমণাত্মক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষপর্যায়ে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাম আন্দোলনের সারসংকলন করতে গিয়ে বামপন্থী নেতা হায়দার আকবর খান রনো তাঁর 'মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম' গ্রন্থে বিস্তারিত যেসব তথ্য, বিশ্লেষণ ও মন্তব্য করেছেন তার কিছু অংশ তুলে ধরা হয়েছে এবং সেখানে তাঁর সর্বশেষ মন্তব্য ছিল– 'আত্মরক্ষামূলক সশস্ত্রতা আত্মহত্যার মতো। এটা এক ধরনের বামবিচ্যুতিও বটে– যা মোটেই বিজ্ঞানসম্মতও নয়।'[৬২৯]

গণবাহিনীর বড় বড় সংগঠকরা উপরোক্ত 'বিচ্যুতি' থেকে উদ্ধার পেতে নতুন যে 'কৌশল' নেন সেটা ছিল আরেক বিচ্যুতি। 'বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় জনগণকে শিক্ষিত করার কাজের অংশ হিসেবে লেনিন নির্বাচনে অংশ নেয়ার কথা বলেছিলেন বটে। কিন্তু জাসদ ছিয়াত্তর-সাতাত্তরের পরে তার পুরো রাজনীতিকেই পার্লামেন্টারি ধারার নির্বাচনকেন্দ্রিক সংগ্রামে সীমাবদ্ধ করে ফেলে।'[৬৩০] তবে তিয়াত্তরের নির্বাচনে অংশ নিতে গিয়ে উল্টো ভূমিকাই রেখেছিল সেই সময়কার জাসদ। ঐ নির্বাচনে জাসদকে মোকাবেলা করতে গিয়ে মুজিব ও তাঁর দল যে কৌশল নেয় তাতে কেবল শাসকদের স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র সম্পর্কেই মানুষ ওয়াকিবহাল হয়নি রাজনীতির বিপ্লবী বিকল্পগুলো সম্পর্কেও জনসমাজে তখন ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছিল।

আঞ্চলিক পরিসরের উপরোক্ত কেসস্টাডিকালে আরেকটি অভিমত পাওয়া গেছে এ রকম যে, গণবাহিনী তার কার্যক্রমের রাজনৈতিক চরিত্র বজায় রাখতে স্থানীয় প্রতিটি ইউনিটে একজন করে পলিটিক্যাল কমিশার রাখলেও কার্যত অপারেশনগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া– সামরিক কমান্ডারদের পরিকল্পনাতেই হতো। চুয়াডাঙ্গার একজন গণবাহিনী যোদ্ধা যেমনটি

---

৬২৮ লেনিন তাঁর 'কমিউনিজমে *বামপন্থার* বাল্যব্যাধি' শীর্ষক লেখায় এক পর্যায়ে বলছেন, 'যে বিপ্লবীরা সংগ্রামের সমস্ত আইনী রূপের সঙ্গে বেআইনি রূপ মেলাতে পারে না তারা একেবারেই বাজে বিপ্লবী।' দেখুন, ভ. ই. লেনিন, *নির্বাচিত রচনাবলি*, খণ্ড-১০, প্রগতি প্রকাশন, বাংলা অনুবাদ, ১৯৮২, পৃ. ২০০।

৬২৯ দেখুন, হায়দার আকবর খান রনো, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭।

৬৩০ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯-৭০।

বলেছেন, 'পলিটিক্যাল কমিশারদের যথার্থ কোনো ভূমিকাই থাকত না– সামরিক কমান্ডাররাই সব সিদ্ধান্ত নিতেন।'[৬৩১] ফলে অনেক অদূরদর্শী অভিযানের নেতিবাচক ফল বইতে হয়েছে দলকে। এসব অভিযান বিপ্লবী নৈতিকতাও হারিয়ে ফেলে তাৎক্ষণিকভাবে। চুয়াডাঙ্গায় আত্মসমর্পণের পরও সাত জন পুলিশকে হত্যার ঘটনা এক্ষেত্রে এক বড় উদাহরণ। সেখানে এমনও দেখা গেছে জনৈক কমান্ডার স্রেফ পুলিশের হাতে আটক নিজ স্ত্রী'কে উদ্ধারের জন্য কারাগারে হামলারও পরিকল্পনা করছিলেন– যদিও তার পেছনে বিপ্লবীযুদ্ধকে এগিয়ে নেয়ার কার্যকারণই তুলে ধরা হচ্ছিল তাত্ত্বিকভাবে। এ ধরনের ঘটনা সুনির্দিষ্টভাবে গণবাহিনী এবং সাধারণভাবে বিপ্লবী শ্রেণিসংগ্রামকে অরাজনৈতিক, ডাকাত ও নৃশংস চরিত্রের সংগঠন হিসেবে উপস্থাপনে শাসক শক্তির জন্য সুবিধা হয়েছিল এবং অভ্যন্তরীণভাবেও তার ফল হয়েছিল বিধ্বংসী।

৭.খ. জাসদ ও গণবাহিনী যেভাবে প্রতিপক্ষের হাতকে শক্তিশালী করে চলেছিল

> যারা গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ব্যবস্থায় বিশ্বাসী কেবল সাময়িকভাবেই তাদের কণ্ঠরোধ করা যায়। অত্যাচার নিপীড়ন যদি বন্ধ না হয়, গণতন্ত্র যদি পুনরুজ্জীবিত করা না হয়, যদি কর্তৃপক্ষ গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলতে না দেন– তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত তেমন পরিস্থিতিতে জনসাধারণ অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বেছে নিতে পারে। আর যদি তেমনটিই ঘটে তাহলে সেটা হবে এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়।
>
> – শেখ মুজিবুর রহমানের বিবৃতি, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৪ এপ্রিল ১৯৬৪। মুজিব উপরোক্ত বিবৃতিটি দিয়েছিলেন শেখ মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখকে ১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কারের প্রতিবাদে।

শেখ মুজিবুর রহমানের উপরোক্ত বিবৃতিটি বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের এক করুণ স্ববিরোধিতাকে সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। 'গণতন্ত্র'-এর অনুপস্থিতিতে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কী দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হয় সেটাই মুজিব বলছিলেন ১৯৬৪ সালে। ঠিক ছয় বছর পর একবার এবং দশ বছর

---

[৬৩১] বর্তমান লেখকের সঙ্গে ২০১৩ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকায় আনোয়ারুল ইসলাম বাবু'র সাক্ষাৎকার। জনাব ইসলাম এখনও জাসদ রাজনীতির সাথে যুক্ত।

পর আরেকবার তাই ঘটেছিল বাংলাদেশে। কিন্তু দ্বিতীয়বার ঘটেছিল তাঁরই হাত ধরে, তাঁরই কারণে এবং শেখ মণিই ছিল তখনো তাঁর পাশে– মূলত যাঁকে উপলক্ষ করে তিনি উপরোক্ত বিবৃতিটি দিয়েছিলেন।

ইতঃপূর্বে আমরা দেখিয়েছি, কীভাবে জাসদ তিয়াত্তর-চুয়াত্তর-পঁচাত্তরে দ্রুতগতিতে গণবাহিনী গঠন করে দেশব্যাপী সশস্ত্র 'প্রতিরোধ' কার্যক্রম শুরু করে এবং এও বলা হয়েছে, জাসদের এইরূপ ভূমিকার প্রতিটি পদক্ষেপ তাদের অন্যতম প্রতিপক্ষ শেখ মণি'র হাতকে শক্তি যোগাচ্ছিল। বিশেষত তাজউদ্দীন আহমদ অপসারিত হওয়ার পর শেখ মণি এককভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রভাবিত করছিলেন।[৬৩২] এ পর্যায়ে তার একটি উদাহরণ তুলে ধরা

---

৬৩২ শেখ মণি এসময় আওয়ামী লীগের বাইরে সিপিবি ও ন্যাপ (মো) থেকেও আরেক ধরনের রাজনৈতিক সমর্থন পাচ্ছিলেন। তাজউদ্দীন সক্রিয় থাকাবস্থায় সিপিবি আওয়ামী লীগে বিশেষভাবে তাঁর ওপর নির্ভর করত। কিন্তু তাজউদ্দীন দৃশ্যপট থেকে অপসৃত হওয়া মাত্র কমিউনিস্ট পার্টি তাদের মনোযোগ ফেলে মণি'র ওপর। একদিকে দৈনিক 'বাংলার বাণী'তে মণির লেখনিতে সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মণির বোঝাপড়া (যে বিষয়ে ইতঃপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে) সিপিবি ও ন্যাপকে 'বিভ্রান্ত' করে থাকবে। মণি যে ছাত্রলীগে ও মুজিব বাহিনীতে তাঁর সমর্থকদের আদর্শিকভাবে জাসদের হাত থেকে রক্ষার জন্য সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন সিপিবি ও ন্যাপ তা না বুঝেই তাঁর হাতকে শক্তিশালী করার নীতি নেয়। দেশের বিদ্যমান বামপন্থী শক্তিসমূহ থেকে সিরাজুল আলম খানদের বিচ্ছিন্ন রাখার কাজে সিপিবিকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন শেখ মণি। ১৯৭৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপ (মো) মিলে 'দেশপ্রেমিক' ত্রিদলীয় 'গণ-ঐক্যজোট' গড়ে ওঠায় প্রধানমন্ত্রীর ওপর মণির প্রভাব আরও বেড়ে যায় এবং জাসদের সামনেও প্রতিপক্ষের আয়তন সম্প্রসারিত হয়। ১৪ অক্টোবর ত্রিদলীয় এই ঐক্যজোটের কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গড়ে উঠেছিল। তিয়াত্তরের জানুয়ারিতে ঢাকায় এবং মার্চে গোপালগঞ্জে শাসকদের হাতে নিজ কর্মী ও সংগঠকদের নির্মমভাবে হত্যার পরও সিপিবি, ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপের শর্তহীন লাগাতার সমর্থন মুজিবকে দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। এ সম্পর্কে সেই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার বিবরণ দেখুন, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, *সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন*, অনন্যা, ২০০০, ঢাকা।

সিপিবি ও ন্যাপ ফজলুল হক মণিকে মন্ত্রী করার জন্য, আরও বিশেষভাবে বললে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'দ্বিতীয় ক্ষমতাধর' ব্যক্তিতে পরিণত করার জন্য, মস্কোর সঙ্গে মিলে মুজিবকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। যা থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের তৎকালীন ভূমিকা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। দেখুন, *বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা*, ইউপিএল, ২০০৭, ঢাকা, পৃ. ১০৩।

১৯৭৩ সালের মে মাসে মাওলানা ভাসানীর অনশনকে কেন্দ্র করে পল্টনে আয়োজিত সর্বদলীয় সমাবেশ পণ্ড করার জন্য যে সশস্ত্র হামলা হয় তাতেও সিপিবি ও ন্যাপ ক্যাডাররা সরকারি দলের আক্রমণকারীদের সঙ্গে ছিলেন। দেখুন, হায়দার আকবর খান রনো, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৯-২০। উল্লেখ্য, তিয়াত্তরের সেপ্টেম্বরে ত্রিদলীয় এই জোট গড়ে ওঠার মাত্র

প্রাসঙ্গিক হবে। এই উদাহরণ থেকে স্পর্শকাতর ঐ সময়ে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনে মুজিব বাহিনী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 'ব্যক্তিগত ভূমিকা'ও পাঠক লক্ষ্য করবেন– যা আমাদের ইতিহাসবিদ্‌দের খুব বেশি মনোযোগ পায়নি এতদিন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অন্যতম বড় রাজনৈতিক ঘটনা হলো সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগের 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এর কর্মসূচি ঘোষণা। যার মূল বিষয় ছিল দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন। একদলীয় ঐ ব্যবস্থার মৌলিক রূপটি ইতোমধ্যে পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের এই সংশোধনী বিল আকারে সংসদে পেশ করা হয় এবং প্রায় বিতর্কহীন পরিবেশে তা অনুমোদিতও হয়ে যায়। বিলটির পক্ষে ২৯২ ভোট পড়ে এবং বিপক্ষে কেউ ভোট দেননি। ঐ সংসদে তখন জীবিত সদস্য ছিলেন ২৯৯ জন। তার মধ্যে ২৯২ জন ছিলেন সরকার দলীয়। এর বাইরে স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দলের ছিলেন সাত জন সদস্য।[৬৩৩] এরা সবাই মিলে বিরোধী দল নয়– 'বিরোধী গ্রুপ' হিসেবে পরিচিত ছিলেন, যার নেতৃত্ব দিতেন আতাউর রহমান খান। যেহেতু অধিবেশনের শুরুতে ঐদিন স্পিকার আবদুল মালেক উকিল বলে দিয়েছিলেন, চতুর্থ সংশোধনী বিলটির ওপর কোনো আলোচনা হবে না– তাই বিরোধী গ্রুপের নেতা আতাউর রহমান খান কিছু না বলে উঠে চলে যান। জাসদের তিন সদস্য আবদুল্লাহ সরকার[৬৩৪], মাইনুদ্দিন

ছয় মাস আগে নির্বাচন সম্পর্কিত সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ন্যাপ নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও মোজাফফর আহমদ তিয়াত্তরের ৭ মার্চের নির্বাচনকে 'প্রহসন' আখ্যায়িত করেছিলেন। *দৈনিক বাংলা*, ৯ মার্চ ১৯৭৩।

বাংলাদেশে সিপিবি'র রাজনীতির বিশিষ্ট গবেষক ড. মোস্তাফিজুর রহমান দলটির এসময়কার ('৭৪-'৭৫) রাজনীতি নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন : 'দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর (ডিসেম্বর ১৯৭৩) মোহাম্মদ ফরহাদের সঙ্গে শেখ মণি'র বেশ সখ্যতা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন বিষয়ে শেখ মণি সিপিবিতে বেশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। ফলে এই দলে মনি সিংহের অবস্থান গৌণ হয়ে যায়। সিপিবি'র আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটানো হয়। পার্টির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। নেতা-কর্মীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।' দেখুন, বাংলাদেশের মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিধারা : ১৯৭২-৭৫, *ইতিহাস: সমকালীন ঐতিহাসিকদের কলমে...০৬*, সম্পাদক : অধ্যাপক সামিনা সুলতানা, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭, ঢাকা, পৃ. ৫৪।

৬৩৩ এরা ছিলেন : আতাউর রহমান খান (ঢাকা), ব্যারিস্টার সৈয়দ কামরুল ইসলাম সালাউদ্দিন (ফরিদপুর), মাইনুদ্দিন আহমেদ মানিক (রাজশাহী), আবদুস সাত্তার (টাঙ্গাইল), আবদুল্লাহ সরকার (চাঁদপুর), মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (রাঙ্গামটি ও খাগড়াছড়ি) ও ছাই রোয়াজা (বান্দরবান)।

৬৩৪ আবদুল্লাহ সরকার সম্প্রতি মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রী তাহেরা বেগম জলি বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন, জনাব সরকার বহুবার পারিবারিক পরিবেশে আলাপচারিতায় বলেছেন– চতুর্থ সংশোধনী সংসদে উত্থাপনের আগে মুজিব একদিন সংসদ থেকে গাড়িতে করে তাঁকে

মানিক, আবদুল ছাত্তার বিলের ওপর আলোচনার দাবি জানান। স্পিকার সেটা অগ্রাহ্য করেন। প্রতিবাদে ঐ তিনজন এবং বাকি স্বতন্ত্র সদস্যরাও ওয়াকআউট করেন। এরপর স্পিকার বিলটি ভোটে দিলেন এবং বিরোধিতাহীনভাবে তা পাস হয়ে গেল। এভাবেই বাংলাদেশ সাংবিধানিকভাবে 'সমাজতন্ত্র'-এ প্রবেশ করে।

বিলটি গৃহীত হওয়ার পরপর শেখ মুজিবুর রহমান দেড় ঘণ্টাব্যাপী ভাষণে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের পটভূমি ব্যাখ্যা করেন এবং প্রধানত তাতে জাসদ কর্তৃক সৃষ্ট 'নৈরাজ্যকর' তৎপরতাকে গণতন্ত্র বিনাশের জন্য দায়ী করেন। বিশেষত তিনি কুষ্টিয়ায় ঈদুল আযহা'র জামাতে গণবাহিনী কর্তৃক সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়া হত্যার বিষয় উল্লেখ করেন। গণবাহিনীর এইরূপ অভিযানকে শেখ মণি কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন সেটা তুলে ধরতে এবার আমরা একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে ধরবো। শেখ মুজিবুর রহমানের জামাতা, শেখ হাসিনার স্বামী, আণবিক শক্তি কমিশনের কর্মকর্তা প্রয়াত ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া ইতিহাসের ঐ সময়টিতে প্রতিদিন সকালে এবং বিকালে প্রধানমন্ত্রীর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে যেতেন। নিয়মিত রাতের খাবারও খেতেন তিনি সেখানে। ১৯৭৫ সালে তেমনি এক সময়ের বিবরণ দিচ্ছেন তিনি আত্মজৈবনিক গ্রন্থে[৬৩৫] এভাবে :

> "জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা। আমার নিশান গাড়িটি বিক্রির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। বাণিজ্যমন্ত্রী তখন খন্দকার মোশতাক আহমদ।...আগামসি লেনে তাঁর বাসায় গেলাম।...খন্দকার মোশতাক আহমদ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার শশুর সংবিধান পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করছেন, সে সম্পর্কে তুমি কিছু জান কি না? এটা মারাত্মক ভুল হবে। বিস্তারিত জানতে চাইলে বলেন, মন্ত্রী হিসেবে সব কিছু প্রকাশ করা সঠিক হবে না। তুমি নিজে খোঁজ-খবর নাও। কিছুদিন পর আবার তাঁর বাসায় গেলে তিনি আবারও সংবিধান পরিবর্তনের বিষয়টি উত্থাপন করেন। আমি বললাম, কাকা, শেখ

নিজের কার্যালয়ে নিয়ে যান এবং সংবিধানের আসন্ন চতুর্থ সংশোধনী বিষয়ে সংসদে নীরব থাকার জন্য বলেন, যা ছিল কার্যত এক ধরনের হুকুমের মতো। উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ সরকার ১৯৭৩-এর নির্বাচনে চাঁদপুর (হাইমচর) থেকে প্রথমে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে ১৯৭৪ সালের ২৪ নভেম্বর তিনি জাসদে যোগ দেন এবং দলটির সহ-সভাপতি হন। নির্বাচনের পূর্বে ছিলেন চাঁদপুরে ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠক। বাকশালে যোগদান না করায় ১৯৭৫ সালের ২৮ এপ্রিল তাঁর সংসদ সদস্যপদ স্থগিত করা হয়। এরপর গ্রেফতার ও অনানুষ্ঠানিক মৃত্যুপরোয়ানা এড়াতে বৃহত্তর কুমিল্লায় আত্মগোপনে চলে যান।

৬৩৫ এম এ ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ইউপিএল, এপ্রিল ২০০০, ঢাকা, পৃ. ২৩৪-৩৫।

মণি'র সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে আলাপ করুন না কেন। তিনি বললেন, লাভ হবে না। সে তোমার শশুরের পক্ষাবলম্বন করছে।

... ২৪ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটায় অফিস ছেড়ে গাড়ি চালিয়ে সরাসরি বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাই। গেটের কাছে পৌঁছে দেখি দরজা বন্ধ। লক্ষ্য করলাম, ঐদিন থেকে বাসায় পুলিশের অতিরিক্ত হিসেবে কিছু সেনা সদস্যও ডিউটিতে নিয়োজিত।...পকেট গেটের কাছে খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে গেটের নিকটস্থ আম গাছটির নিকটে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, বাবা ওয়াজেদ, আগামীকাল তোমার শশুর সংবিধানে যে পরিবর্তন ঘটাতে চাচ্ছেন তা করা হলে সেটা শুধু একটা মারাত্মক ভুলই হবে না, দেশে-বিদেশে তাঁর ভাবমূর্তিরও অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তেতলার বৈঠকখানায় গিয়ে তাঁকে একটু বোঝাও।... মোশতাক সাহেবকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো। সম্ভবত ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে।...সোজা তিনতলায় যাই। বঙ্গবন্ধু বৈঠকখানায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছেন। পায়চারি করতে লাগলাম কখন ওনারা যাবেন তার অপেক্ষায়। কিন্তু তা না ঘটায় স্থির করলাম রাতের খাবারের পর দেখা করবো। রাত এগারোটায় হাসিনা, আমি ও বঙ্গবন্ধু খেতে বসি। সে সময় বঙ্গবন্ধু কোন কথা না বলে শয়নকক্ষে চলে যান। ঠিক ঐ মুহূর্তে শেখ মণি সেখানে ঢুকেই ছিটকানি লাগিয়ে দেন। আমার শাশুড়িকে বাইরে রেখে মণিকে ইতঃপূর্বে কখানো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে দেখিনি। রাত পৌনে একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। ততক্ষণেও তাদের আলাপ শেষ হলো না।...পর দিন সংসদে পেশ হলো চতুর্থ সংশোধনী বিল। ...

ড. ওয়াজেদ মিয়ার দীর্ঘ ব্যক্তিগত বিবরণকে উপরে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো। আগ্রহী পাঠক মূল বইয়ে উপরোক্ত উদ্ধৃতিটির বিস্তারিত ভাষ্য দেখলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারবেন কীভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তখন মুজিব বাহিনীর সর্বোচ্চ ব্যক্তি কর্তৃক প্রভাবিত হচ্ছিলেন। পাঠক এও আবিষ্কার করবেন, মিসেস মুজিব তাঁর স্বামীর একদলীয় ব্যবস্থাকে কীভাবে অপছন্দ করতেন[৬৩৬] এবং ড. ওয়াজেদ মিয়া যে ছিটকানির কাহিনী বলেছেন তা ঐ অপছন্দের কারণেই। ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারির ছিটকানির এই ব্যবহারকে যদি প্রতীকীভাবে গ্রহণ করা যায় তাহলে উপলব্ধি করা সহজ হয়, মুজিব বাহিনীর নেতৃত্ব কীভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে কেবল তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে নয়– গৌরবজনক রাজনৈতিক

৬৩৬ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৯-৪০।

অতীত থেকেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলছিল।[৬৩৭] ড. ওয়াজেদ মিয়া এ সম্পর্কে তাঁর (পূর্বোক্ত) আত্মজৈবনিক গ্রন্থে অন্যত্র দেখিয়েছেন[৬৩৮] কীভাবে সরকার প্রধান হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সম্মেলনে যোগদানে রাজি করাতে লাগাতার প্রভাবিত করছিলেন শেখ মণি। মিসেস মুজিব বরাবর স্বামীর পাকিস্তান সফরের বিরোধী ছিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের ঐ লাহোর সফরকে (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) বরাবরই তৎকালীন সরকারের বড় ধরনের নীতিগত মোড় পরিবর্তন হিসেবে দেখা হয়। মুজিবের লাহোর সফরকে এখানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো দেখেছিল নতুন করে সক্রিয় হওয়ার সবুজ সংকেত হিসেবে। এভাবেই তারা একাত্তরের ধাক্কা সামলে ওঠার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে। রক্ষীবাহিনীর আক্রমণের মুখে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে কমিউনিস্টদের দিশেহারে অবস্থার পাশাপাশি ইতিহাসের এ সময়টিতে নেজামে ইসলামী, জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের প্রতি রাষ্ট্রীয় এই পরোক্ষ আনুকূল্য বিশেষ তাৎপর্যময়।

এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তান সফর বিষয়ে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বদরুদ্দীন উমর-এর পর্যবেক্ষণটি তুলে ধরা যেতে পারে। '১৯৭৪ সালে মার্চ মাসের প্রথম দিকে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেটা ছাপা হয় ভারতের ইংরেজি দৈনিক 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায়। তাতে তিনি বলেন, ভুট্টো ও তিনি পুরানো বন্ধু এবং ভুট্টোকে তাঁর সাহায্য করা দরকার। এ সময় লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলনে তাঁর প্রতি পাকিস্তান সরকার, বিশেষ করে ভুট্টোর আতিথেয়তার কথা বলতে গিয়ে মুজিব আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, জনগণের উচিত পাকিস্তানের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতা ভুলে যাওয়া। সেই সময় স্টেটসম্যান-এ প্রকাশিত কুলদীপ নায়ারের এই বহুল আলোচিত

---

৬৩৭ কিছু দিন পরই, ১৬ জুন সরকার চারটি ব্যতীত বাকি সব জাতীয় পত্রিকা বিলুপ্ত ঘোষণা করে। ফলে দেশে ভিন্নমতের বাহন শেষ হয়ে যায়। গণমাধ্যমকে 'নিয়ন্ত্রণ'-এ সরকার এতটাই আপসহীন ছিল যে, বাকশালের শরিক দল সিপিবি'র 'একতা' নামের কাগজটিও বন্ধ করে দেয়া হয়। এসবই মুজিবের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে তোলে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন চারটি কাগজের (ইত্তেফাক, অবজারভার, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ টাইমস) মাধ্যমে জনসমাজের কোনো প্রকৃত চিত্র পাচ্ছিলেন না তিনি। প্রশাসনিক কাজেও এই অবস্থা সংকট তৈরি করে। সাংবাদিকদের কাজের সুযোগ সীমিত হয়ে যাওয়ায় প্রশাসনের পক্ষে দেশের দূরবর্তী অঞ্চলের প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। উপরোক্ত চারটি কাগজে এমন চার ব্যক্তিকে সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় (যথাক্রমে নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, ওবায়দুল হক, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী ও ফজলুল হক মণি) যাঁরা নিজ নিজ ভূমিকার মাধ্যমে মুজিবের উপরোক্ত জনবিচ্ছিন্নতাকে গতিশীল করেছিলেন মাত্র।

৬৩৮ ড. ওয়াজেদ মিয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৯।

সাক্ষাৎকার প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার কোন প্রতিবাদ জানায়নি। এর আগে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলনে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী 'আমার পুরানো বন্ধু' বলে আলিঙ্গন করেন এবং তার গালে চুমু খান।'[৬৩৯] মুজিব এসময় বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য করার পাশাপাশি ১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ ইসলামি ফাউন্ডেশনকেও পুনর্জীবিত করেন। এসব নীতিগত পরিবর্তন ক্ষমতাসীন শাসক মহলে মেরুকরণও ঘটাচ্ছিল দ্রুতলয়ে। বিশেষ করে লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী মুজিবকে তাজউদ্দীনের তরফ থেকে শক্ত বিরোধিতা মোকাবেলা করতে হয়। সেই সময়কার মন্ত্রী ফণিভূষণ মজুমদারের সঙ্গে আলাপচারিতার ভিত্তিতে সাংবাদিক আমির হোসেন ঐ বিরোধিতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

> লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের প্রশ্নে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তাজউদ্দীন এই সম্মেলনে যাওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তাছাড়া এই সম্মেলনে যোগদানকারীরা প্রায় সবাই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল। এই সম্মেলনে যোগ দিলে বন্ধুরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ ভারত অসন্তুষ্ট হবে।...বঙ্গবন্ধু এসব যুক্তি নাকচ করে বলেন, 'বাংলাদেশের পক্ষে মুসলিম দেশগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত হবে না। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তারা আজ যদি বাংলাদেশকে স্বীকার করে নেয় তাহলে আমাদের মুখ ফিরিয়ে রাখা উচিত নয়। আর ভারত অসন্তুষ্ট হবে এই ভয়ে যদি সম্মেলনে যেতে না পারি তাহলে আমাদের স্বাধীনতার মূল্য কি? অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নয়, আমাদের চলতে হবে আমাদের ভালো-মন্দ বিবেচনা করে।'[৬৪০]

ক্যাবিনেটের উপরোক্ত বিতর্ক ছিল একটি সিদ্ধান্তসূচক ঘটনা। মুজিবের পাকিস্তান সফরের মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। যুদ্ধাপরাধের দায়ে ভারতে আটকে থাকা সর্বশেষ ১৯৫ জন পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তাকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনাপত্তির কথা ভারত-পাকিস্তান উভয়কে জানানো হয়।[৬৪১] উপরন্তু মাত্র চার মাসের মধ্যে (২৬ জুন ১৯৭৪) খোদ

---

৬৩৯ বদরুদ্দীন উমর, *একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে,* জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১০, ঢাকা, পৃ. ৩-৪।

৬৪০ আমির হোসেন, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৮।

৬৪১ এসব যুদ্ধবন্দিদের বিচারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতও নিরুৎসাহিত ছিল। তার প্রমাণ মেলে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জবানিতে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের ভাষ্যে। আনিসুজ্জামান যুদ্ধকালে প্রধানমন্ত্রীর

ভুট্টো ঢাকা আসেন রাষ্ট্রীয় সফরে। ভুট্টো ঢাকায় আসার পর দেখা গেল তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে মানুষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাসের মাঝেই এক দল মানুষ ভারতীয় হাইকমিশনের গাড়ি থেকে পতাকা ছিনিয়ে নেয়। জনতাকে রুখতে লাঠিচার্জ করতে হয়েছিল সেদিন।

অভাবনীয় এই ঘটনাকে ভারত কীভাবে দেখছিল সেটা এ পর্যায়ে বিশেষ তাৎপর্যময় এবং মনোযোগ যোগ্য। ভুট্টোর সফরের তারিখ নির্ধারিত হওয়া মাত্রই ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার সুবিমল দত্ত তাঁর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। তখনও তাঁর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের এক বছর বাকি ছিল। তিনি ছিলেন ঢাকায় প্রথম ভারতীয় হাইকমিশনার। পদত্যাগের কারণে উল্লেখ করেছিলেন, '(বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পাশে থেকে) ভুট্টোকে ঢাকা বিমানবন্দরে স্বাগতম জানানো এবং তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে আমি প্রস্তুত নই।'[৬৪২] ভুট্টোর সফরের বিষয়টি পুরোপুরি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও ভারতের নীতিনির্ধারক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের এসব 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' কতটা তোলপাড় সৃষ্টি করছিল তার চূড়ান্ত এক প্রমাণ রাষ্ট্রদূত সুবিমল দত্তের পদত্যাগকালীন উপরোক্ত বক্তব্য। এসময় ঢাকায় ভারতের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত হন মিশনের ডেপুটি কমিশনার জে এন দীক্ষিত। ভুট্টোর আবির্ভাব-উত্তর ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন :

> বিমানবন্দর থেকে যখন ফিরছিলাম, তখন রাজনৈতিক ও আবেগগত দিক থেকে আমি খুব বিক্ষুব্ধ ও বিশৃঙ্খল। (ভুট্টোকে নিয়ে) মোটর শোভাযাত্রা যখন প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের অভিমুখে শহরের দিকে আসছিল রাস্তার দু' ধারে সারি সারি জনতা তখন উৎসাহের আতিশর্যে রীতিমত উন্মাদগ্রস্ত। তারা ভুট্টো ও পাকিস্তানের

ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে প্ল্যানিং সেলে কাজ করতেন। আলোচ্য বিষয়ে তার দেয়া বিবরণ দেখুন, *আমার একাত্তর*, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ১৮৩।

৬৪২ J. N. Dixit, *Liberation and Beyond : Indo-Bangladesh relation*, UPL, 1999, Dhaka, p. 189. উল্লেখ্য, সুবিমল দত্ত (১৯০৩-১৯৯২) ছিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কানুনগো পাড়ার সন্তান। জীবনের প্রথম ১৭ বছর তিনি পূর্ববাংলাতেই কাটান। বাংলাদেশে প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাঁর নিয়োগ (১৯৭২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি) ভারতের তরফ থেকে অত্যন্ত পরিণত কূটনীতির বহিঃপ্রকাশ ছিল। এই নিয়োগের অন্তত ১৫ বছর পূর্বে জনাব দত্ত ভারতের পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন। খোদ ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে 'আংকেল' বলতেন। ভারত সেসময় বাংলাদেশকে কতটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছিল বয়োজ্যেষ্ঠ একজন কূটনীতিবিদের এই নিয়োগ থেকে তা বোঝা যায়। ফলে তাঁর আকস্মিক পদত্যাগ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে কঠিন এক বাস্তবতার উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। অন্যদিকে ভারতীয় কূটনীতিবিদদের জন্য এ ঘটনার পরবর্তী অধ্যায় ছিল আরও তিক্ত। সুবিমল দত্ত-এর পরে যিনি বাংলাদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হয়ে আসেন সেই সমর সেন ১৯৭৬-এর জুনে খোদ দূতাবাসেই শারীরিকভাবে আক্রান্ত হন। এতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে আরও টানাপোড়েনে পড়ে। সমর সেন সম্পর্কে আরও দেখুন : তথ্যসূত্র ৪২৮ ও ৫৪৮।

পক্ষে শ্লোগান দিচ্ছিলো। এর মাঝে নতুনত্ব এবং বিস্ময়কর হিসেবে যা দেখলাম অনেক শ্লোগানই ছিল আওয়ামী লীগ ও মুজিবের সমালোচনায় মুখর।...পতাকা লাগানো গাড়িতে আসছিলাম আমি। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে গাড়ির সারি ধীরলয়ে এগোনের মুহূর্তে সেটা ভাঙ্গচুর হলো। উত্তেজিত জনতা ছিন্নভিন্ন করলো ভারতীয় পতাকাও। ভারত সরকার এবং স্থানীয় ভারতীয় হাইকমিশনের বিরুদ্ধে গালাগালপূর্ণ শ্লোগান শুনতে হলো। বলতে দ্বিধা নেই– অফিসে এসে যখন পৌঁছালাম, ক্ষোভে আমার চোখে তখন জল নেমেছে। টেবিলে বসেই ভুট্টোর আগমন অধ্যায় এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে দিল্লিতে টেলিগ্রাম লিখতে বসলাম।[৬৪৩]

জে এন দীক্ষিতের টেলিগ্রামে কী ছিল সেটা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। স্বাধীনতার পরপর ভুট্টোকে ঘিরে ঢাকায় এ রকম অভিজ্ঞতা ছিল বিস্ময়কর। এসময় মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহায়তার দায়ে আটক প্রায় ৪০ হাজার ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ারও নির্দেশ দেন মুজিব, অথচ ১৯৭২-এর জানুয়ারিতে এ বিষয়ে একটি আইনও তৈরি হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রীও পাল্টে নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে আবদুস সামাদ আজাদের স্থলে ড. কামাল হোসেনের নিয়োগ ছিল সুস্পষ্ট বার্তাসূচক এবং ভারতের জন্য আরেক কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা। মুজিবের স্বদেশে আগমনের আগে ভারতীয় আগ্রহে এবং প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে ডি পি ধরের সফরকালে (২৩-২৯ ডিসেম্বর) তাজউদ্দীন আহমদ তাড়াহুড়ো করে খন্দকার মোশতাককে সরিয়ে আবদুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে বসিয়েছিলেন।

সুবিমল দত্তের পদত্যাগের পর যিনি ঢাকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছিলেন সেই সমর সেনও ভুট্টোর সফরকে অবহিত করেছেন disenchantment বা মোহমুক্তি হিসেবে। তিনি বলেন, Zulfikar Ali Bhutto's visit to Bangladesh in August 1974 meant that there was, if not a growing hostility, at least disenchantment with India.[644]

সেসময় এবং এখনও বাংলাদেশের মূলধারার রাজনৈতিক সাহিত্যে শেখ মুজিবুর রহমানের লাহোর যাত্রা, ভুট্টোর আগমন, যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত আটককৃতদের ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি নাটকীয় সিদ্ধান্তের জন্য তৎকালীন সরকারের মোশতাক আহমদ প্রভাবিত অংশকে 'দায়ী' করা হলেও আসলে

---

৬৪৩ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯০। ইংরেজি থেকে অনুবাদ বর্তমান লেখকের।

৬৪৪ Samar Sen, An envoy remembers, *Frontline*, Vol. 15, No. 24, Nov. 21-Dec. 04, 1998, India.

বিষয়গুলো ঘটেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন তরফ থেকে। অন্তত ড. ওয়াজেদ মিয়ার উপরে বর্ণিত অন্তরঙ্গ অবলোকন থেকে আমরা তার কিছু ইঙ্গিত পাই। উপরোক্ত বাস্তবতার সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের অপসারণের[৬৪৫] মিলিত ফল হয়েছিল এই যে, ঐতিহাসিক সেই চুয়াত্তরেই ড. হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশ সফরে আসেন। তাজউদ্দীন আহমদ অপসারিত হন ২৬ অক্টোবর, হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশে আসেন ২৯ অক্টোবর; আর মাঝের ৪৮ ঘণ্টাতেই বিশ্বব্যাংক প্রথমবারের মতো বাংলাদেশকে ২৭৫ মিলিয়ন 'সাহায্য' দানের ঘোষণা দেয়। আর ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ ঋণ ও অনুদান সহায়তার প্রতিশ্রুতি পায় ৩৩৭.৫১০ মিলিয়ন ডলার– যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে প্রায় সাত গুণ বেশি ছিল।[৬৪৬]

উল্লেখ্য, জবরদস্তিমূলক পদত্যাগের আগে ঢাকার দৈনিকগুলোতে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের বড় বড় ছবি ছাপা হলেও তাতে মুজিবের সিদ্ধান্তের কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। তাজউদ্দীনের অপসারণ যতটা না ছিল ক্ষমতাকেন্দ্রিক রেষারেষি তার চেয়ে বেশি ছিল নীতিগত– সরকারি ভাষায় যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে 'বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে।' তবে নিঃসন্দেহে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠান্ডাযুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি ছিল এটা। রাজনীতি বিজ্ঞানের বড় কৌতুক এই, যে হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে কৌতুকের ছলে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে তলাবিহীন ঝুড়ি হতে যাচ্ছে (Bangladesh an international basket case[৬৪৭]) এবং আমাদের

---

৬৪৫ অপসারিত হওয়ার পর তাজউদ্দীন আহমদ স্থানীয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সুবিমল দত্তের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সামগ্রিক পরিস্থিতিতে 'গঠনমূলক কিছু করা'র জন্য যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে ঢাকায় তখনকার ভারতীয় উপ-হাইকমিশনার জে এন দীক্ষিতের ভাষ্যে। কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সেই আহ্বানে সাড়া দেননি। বিস্তারিত দেখুন, J. N. Dixit, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২।

৬৪৬ Flow of External Resources into Bangladesh, *Ibid*, p.109.

৬৪৭ কিসিঞ্জারের বিখ্যাত এই মন্তব্যটি সম্পর্কে কিছুটা ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি রয়েছে। ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ম্যাগাজিন 'টাইম'-এ প্রকাশিত 'Foreigen relation: The kissinger Tilt' শীর্ষক লেখা থেকে জানা যায় '৭১-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ওয়াশিংটনে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন মার্কিন নীতিনির্ধারকের এক আলোচনায় Maurice Willium নামের এক ব্যক্তি বাংলাদেশে সম্ভাব্য খাদ্য সংকটের বিষয়টি উত্থাপন করলে রাষ্ট্রদূত U. Alexis Johnson ও Henry Kissinger এ বিষয়ক এক কথোপকথনে জড়িয়ে পড়েন। যার শেষ পর্যায়ে Alexis Johnson বলে উঠেন, 'They (Bangladesh) will be an international basket case.' উত্তরে কিসিঞ্জার বলে উঠেন, 'But not necessarily our basket case.' এর পর থেকে কিসিঞ্জারের জবানিতে বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলার উপকথাটি বিশ্বজুড়ে চালু হয়ে পড়ে। কিসিঞ্জার নিজে কখনোই অস্বীকার করেননি যে, তিনি

(যুক্তরাষ্ট্রের) তাতে দায়-দায়িত্বের কিছু নেই'– সে-ই তিনিই '৭৪-এ উনিশ ঘণ্টার জন্য বাংলাদেশে এসে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে গণভবনে সাক্ষাৎ শেষে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন, 'A man of vast conception. I had rarely met a man who was the father of his nation and this was a particularly unique experience for me.'[৬৪৮]

ড. কিসিঞ্জারের এই উচ্ছ্বাসের নিশ্চিতভাবে কিছু কারণ ঘটেছিল ইতোমধ্যে। তাঁর উচ্ছ্বাস সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছিল যে, মুক্তিযুদ্ধকালে দেরাদুন প্রকল্পে তারা স্রেফ অবকাঠামোগত সহযোগী হিসেবে থাকলেও ভারতীয় বিশেষ সংস্থার সঙ্গে তাদের সেই দূরবর্তী উদ্যোগ পরবর্তী চার বছরে এমনসব জটিল রাজনৈতিক ও সামরিক সমীকরণের জন্ম দিয়েছে নবীন দেশটিতে– যার সহজ ফল হয়েছে এই, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিসরে আবার চালকের আসনে উপনীত হতে সক্ষম হয় ওয়াশিংটন। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে ২৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি বহুজাতিক সাহায্যদাতা কনসোর্টিয়ামের অধীনে নিজেকে সঁপে দিতে সম্মত হয় বাংলাদেশ। অথচ মাত্র কিছুদিন আগেই ১৯৭২-এ বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারাকে যথাযথ প্রটোকল দিতেও আপত্তি তুলেছিলেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী। এমনকি দিল্লিতে ম্যাকনামারার সঙ্গে সৌজন্য বৈঠকে বসতেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। ম্যাকনামারার অভিবাদনও গ্রহণ করেননি তিনি।[৬৪৯] আর তাজউদ্দীনের পদত্যাগের এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ৩০ অক্টোবর বাংলাদেশের তরফ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে সদ্যস্বাধীন দেশটিতে সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

তাজউদ্দীন আহমদকে অপসারণ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানানো ছাড়াও হেনরি কিসিঞ্জারের সফরের আগে-পরে এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশে নাটকীয় আরও অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। গণবাহিনী ও রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে ত্রিমুখী হানাহানিতে নকশাল ধারার প্রায় সবগুলো সংগঠন তখন

ঐরূপ কিছু বলেননি। ২০০৯ সালে কেবল সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একবার বলেছিলেন, প্রকৃত মন্তব্যটি কী ছিল তা তিনি মনে করতে পারছেন না।

৬৪৮ এম এ ওয়াজেদ মিয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৩।

৬৪৯ নূরুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৮। অর্থমন্ত্রীর অনাগ্রহ সত্ত্বেও রবার্ট এস ম্যাকনামারা শেষপর্যন্ত বাংলাদেশে এসেছিলেন। তবে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ম্যাকনামারার ঐ সফরকালে তাঁকে নানানভাবে অপমান করে বাংলাদেশ। ম্যাকনামারা যখন অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে তাঁদের তরফ থেকে করণীয় সম্পর্কে জানতে চান তখন তাঁর কাছে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হালের বলদ, গোয়াল ঘর ও দড়ির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তাজউদ্দীন! প্রতিউত্তরে ম্যাকনামারা জবাব দিয়েছিলেন, এসব জরুরি বিষয় (!) বাংলাদেশকে তার মিত্র ভারতই সরবরাহ করতে পারবে। তবে তাজউদ্দীনের এরূপ অশোভন একরোখা অবস্থান ও অপদস্থমূলক আচরণ সত্ত্বেও মুজিব ম্যাকনামারাকে সহৃদয়তার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন।

ক্ষয় আর পশ্চাৎপসারণের শেষ অধ্যায়ে। গুরুত্বপূর্ণ বামপন্থী সংগঠকরা (সিপিবি ব্যতীত) প্রায় সবাই বিশেষ ক্ষমতা আইনে কারাগারে আটক অথবা আত্মগোপনে অথবা নিহত। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধের পর তৈরি মূল সংবিধানের মৌল বৈশিষ্ট্যের বিপরীতমুখী অভিমুখ নিয়েছে। এই সময় প্রথম বিপ্লবের পর 'দ্বিতীয় বিপ্লব' মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার চেয়ে বরং উল্টোটিই ঘটিয়েছিল।

আর ভারতের বাংলাদেশ নীতি তখন আঁচ করা যায় 'র'-এর খ্যাতনামা কর্মকর্তা বি. রমনের (যিনি তখন প্যারিসে কর্মরত) নিম্নোক্ত বয়ানে :

> "১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা এবং এরপর যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতে গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে 'র' ভাবমূর্তি ও উজ্জ্বলতা হারায়। '৭৫-এর ঘটনার পর বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যাতে দেশটির ওপর ভারতের প্রভাব কমে যায়। ভারতীয়দের মধ্যে 'র'-এর সমালোচকরা এটাকে ভয়ংকর গোয়েন্দা বিপর্যয় হিসেবে সমালোচনা করেন। প্যারিসে ভারতের রাষ্ট্রদূত এ ব্যাপারে সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেন।...আমি কাওকে ('র' প্রধান) একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে সমালোচনার কথা জানাই। মুজিব হত্যার কয়েক সপ্তাহ পরে কাও জেনেভা সফর করেন। তিনি মুজিব হত্যা সম্পর্কে আমাকে জেনেভা ডেকে পাঠান এবং বলেন, *বাংলাদেশে 'র' কোনভাবেই ব্যর্থ হয়নি।*..."[৬৫০]

এসময় বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিক্রিয়াও ছিল কৌতূহলোদ্দীপক। জরুরি অবস্থা জারি করে দেশ চালাচ্ছিলেন তিনি। স্বভাবত বিরোধী দল ও মতের তখন খুবই নিষ্পেষিত অবস্থা ভারতে। ইন্দিরা গান্ধী সেই নিষ্পেষণকে যৌক্তিকতা দিতে বাংলাদেশের মুজিব হত্যাকাণ্ডকে কাজে লাগিয়ে বললেন, 'বাংলাদেশের ঘটনাবলি ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রয়োজনীয়তার নবতর প্রমাণ।'[৬৫১]

মুজিবের মৃত্যুতে ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়াও ছিল ভীষণরকমে গতানুগতিক– 'গভীরভাবে শোক ও আঘাত' পেলেও তারা এটাও জানাল যে, 'নতুন সরকারের নীতি ও মনোভাব' লক্ষ্য করেই তারাই পরবর্তী করণীয় ঠিক করবে।[৬৫২] অর্থাৎ পক্ষান্তরে তারা পনেরো আগস্ট পরবর্তী সরকারকে তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকৃতিই দেয়। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেন ১৫ আগস্ট দিল্লি

---

৬৫০ বি. রমন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯-৫০।

৬৫১ আসফাক আলম স্বপন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১।

৬৫২ J. N. Dixit, Ibid, p.212.

থাকলেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি কলকাতা হয়ে ঢাকা পৌঁছেন। ১৮ ডিসেম্বর তিনি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গেও দেখা করেন এবং তাঁকে জানান, 'বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন না করতে যায় তাহলে যা ঘটেছে তাকে দিল্লি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনা হিসেবেই দেখবে।'[৬৫৩] এসময় দিল্লিস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শামসুর রহমান খুব সহজেই দেশটিতে জরুরি অবস্থার মাঝেই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতে সমর্থ হন। শামসুর রহমানের সঙ্গে এসময় আরেক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় তথ্যমন্ত্রী ভি সি শুক্লা (যিনি এসময় ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম ডান হাত হিসেবে পরিচিত ছিলেন) এও আশ্বাস দেন যে, ভারতে বসে কেউ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবে– এমনটি তারা হতে দেবেন না। মোশতাকের স্বল্পকালীন শাসনামলের প্রথম কিছুদিন এই আশ্বাস অনেকাংশে রক্ষিত হয়। তবে দ্রুত ভারত তার কৌশল পাল্টে নেয় এবং বিশেষভাবে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পরপর আওয়ামী লীগের বিরাট সংখ্যক তরুণ কর্মী সীমান্ত অতিক্রম করে এবং ওপার থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ময়মনসিংহ-শেরপুর-নেত্রকোণা সীমান্তজুড়ে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালাতে শুরু করে। ১৯৭৫ সালের অক্টোবরে এইরূপ তৎপরতা শুরু হয় এবং চলে তা ১৯৭৭ সালে জনতা দলের হাতে ইন্দিরা গান্ধীর পতন পর্যন্ত। বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তখনকার ভাষ্য অনুযায়ী এইরূপ তৎপরতায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম এবং ১৯৭৭-এর ২৭ জানুয়ারিতে বিডিআর-এর তৎকালীন ডিজি মেজর জেনারেল গোলাম দস্তগীর আনুষ্ঠানিকভাবে জানান, পূর্ববর্তী ১১ মাসে ভারতীয় ভূমি থেকে ১ হাজার ৩১৬ বার সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনা ঘটেছে, আর তাতে মারা গেছে ৫৬ ব্যক্তি।[৬৫৪] অন্যদিকে

---

৬৫৩ বিস্তারিত দেখুন, Manash Ghosh, *Breaking news- So much for Bangladesh,* The Statesman, 15th Sep. 2011, India.
http://www.thestatesman.net/index.php?option=com_content&view=article&show=archive&id=383426&catid=35&year=2011&month=09&day=16&Itemid=66 [পর্যবেক্ষণ ২০-০৮-২০১৩]। ঐ সময়কার ঘটনায় ভারত ও তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে সমর সেন নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

> After the assassination, I took the view that we should wait and watch, but at the same time, we should establish contacts with the new regime. We did so, though there were elements in the Indian Government who did not like it. Our attitude then was that we would keep all channels open, we would try to do the fairest and the most practical things. But we would not give up on our vital interests, like Farakka or the territories that were supposed to be ceded to Bangladesh. Samar Sen, *Ibid.*

৬৫৪ এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত দেখুন, মোহাম্মদ সেলিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৬-১৩৯ এবং
http://en.wikipedia.org/wiki/Kader_Siddique; ও
http://www.ecoi.net/local_link/170025/271377_en.html. (পর্যবেক্ষণ ২০-০৮-২০১৩) উল্লেখ্য, কাদের সিদ্দিকীর অনুপস্থিতিতেই ১৯৭৮ সালের ২৪ জুলাই সামরিক আদালতে তাঁর সাজা হয় উপরোক্ত তৎপরতার অভিযোগে। এসময় তিনি ভারতে অবস্থান করছিলেন।

কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে লিখিত সাম্প্রতিক এক গণমাধ্যম প্রতিবেদন[৬৫৫]-এ দেখা যায়, তাদের ঐ তৎপরতায় অন্তত ১০৪ জন সহযোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনার কারণে যে বাকশাল ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায় তাতে ৬২ জন নির্ধারিত জেলা গভর্নরের একজন ছিলেন আবদুল কাদের সিদ্দিকী।

সাধারণভাবে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর উপরোক্ত সময়কার হামলার মূল বিস্তৃতি ময়মনসিংহ থেকে সিলেট পর্যন্ত সীমান্তজুড়ে থাকলেও এক পর্যায়ে তাদের এই বাহিনী পাবনা-সিরাজগঞ্জ সংলগ্ন নিশ্চিন্তপুরে যমুনার চরাঞ্চলে একটি 'মুক্তাঞ্চল' গড়ে তোলার মরিয়া প্রচেষ্টাও নিয়েছিল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তীব্র পাল্টা হামলায় (১৯৭৫ সালের অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে) অন্তত দু'দিনের যুদ্ধ শেষে মুক্তাঞ্চল গঠনের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৭৬-৭৭ জুড়ে সীমান্তবর্তী কিছু জেলাতে কয়েকটি ব্রিজও ধ্বংস করে এই বাহিনী।

টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহে কাদের সিদ্দিকীর সরাসরি অনুসারী ছাড়াও ঢাকা ও বিভিন্ন শহর থেকে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের একদল তরুণ কর্মী-সমর্থককে এই যুদ্ধে সামিল করা হচ্ছিল পদ্ধতিগতভাবে। যে প্রক্রিয়ায় এই লড়াইয়ে সামিল হয়ে বাহিনীর নেতৃস্থানীয় কমান্ডার হন আবদুল খালেক খসরু (বগুড়া), সৈয়দ নুরু (ঢাকা), দীপংকর তালুকদার (রাঙ্গামাটি), সুলতান মুহাম্মদ মনসুর (মৌলভীবাজার) প্রমুখ। ১৯৭৭ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রায় ২২ মাসের উপরোক্ত তৎপরতাকালে, বিশেষ করে ১৯৭৬ সালের ১৯ জানুয়ারি আক্রমণকারীরা নেত্রকোণার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা থানা দুটি কিছু সময়ের জন্য পুরোপুরি দখল করে নিয়েছিল। এটা ছিল একাত্তরের 'অপারেশন মাউন্ট ঈগল' ও পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিবাহিনীকেন্দ্রিক covert operation[৬৫৬]-এর পর ভারতীয় তরফ থেকে অনুরূপ কার্যক্রমের তৃতীয় সংস্করণ। স্বাভাবিকভাবেই হামলাকারীরা যে ভূমি থেকে তৎপরতা চালাচ্ছিল সেখানকার রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সহযোগিতাই ছিল এইরূপ কার্যক্রমের প্রধান শক্তিভিত। যার প্রমাণ মেলে– দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা হারানো মাত্র এইরূপ তৎপরতা ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসে– যেহেতু বাংলাদেশের জিয়াউর রহমান সরকার ভারতের মোরারজি দেশাইয়ের

১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকালে ১৫ বছর পর তিনি কলকাতা থেকে বাংলাদেশে আসেন। ১৭ জানুয়ারি তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। শিগগির তিনি ছাড়াও পান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

৬৫৫ 'প্রতিরোধ যুদ্ধে নিহত ১০৪', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৫ আগস্ট ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১।

৬৫৬ covert operation সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন: ৩.ঘ উপ-*অধ্যায়*।

নেতৃত্বাধীন জনতা সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।[৬৫৭] ১৯৭৭-এর ১০ জুন দেশাইর সঙ্গে জিয়াউর রহমানের সফল বৈঠকটি এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য বিরাট স্বস্তির কারণ ঘটিয়েছিল। এরপরই বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে কাদেরের গেরিলাদের জন্য রেশন বিতরণ বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রায় ৯০০ গেরিলাকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। কাদের সিদ্দিকী অবশ্য এক সাক্ষাৎকারে হস্তান্তরকৃত গেরিলাদের সংখ্যা ৬ হাজার বলে দাবি করেছেন।[৬৫৮] এসব গেরিলাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ঢাকার কাছে কলাকোপা-বান্দুরা এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত থেকে কয়েক মাইল অভ্যন্তরে (শ্রীবর্দী-হালুয়াঘাটের বিপরীতে) বনাঞ্চল ও চা বাগিচাপ্রধান আসামের চান্দুভুই নামক জায়গায় এই বাহিনীর সদরদপ্তর ছিল বলে জানা যায়।[৬৫৯] স্থানটি মেঘালয়েরও নিকটবর্তী। কাদের সিদ্দিকী এক লেখায় এও জানান, ১৯৭৫-এর আগস্ট পরবর্তী তাঁদের এই তৎপরতায় ভারতে কংগ্রেস সরকারের সহযোগিতা ছাড়াও রাজনৈতিক দল হিসেবে সেখানকার সিপিএমও সদয় ও সহযোগী ছিল।[৬৬০] উল্লেখ্য, পুরো তৎপরতা কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে পরিচালিত হলেও ঢাকাকেন্দ্রিক ছাত্রলীগের যেসব যোদ্ধা সেখানে ছিলেন তাঁরা ১৯৭৬-এর বর্ষায় একবার বিদ্রোহও করেছিলেন অধিনায়কের বিপক্ষে। সেই বিদ্রোহ শক্ত হাতে দমন করেন কাদের

---

৬৫৭ দেশাই ছিলেন ভারতের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী এবং প্রথম অকংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯– মাত্র দু'বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। এর মাঝেই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক চমৎকার মোড় নিয়েছিল; বিশেষভাবে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত গঙ্গা পানিচুক্তি ছিল উল্লেখ্যযোগ্য বড় অগ্রগতি। আলোচ্য তিন বছরে দেশাইর সঙ্গে জিয়াউর রহমানের তিনদফা বৈঠক হয়– যার মধ্যে প্রথম বৈঠক হয় লন্ডনে [১৯৭৭]। এই বৈঠকেই সীমান্তে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ভারত সম্মতি দিয়েছিল। বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি মোরারজি দেশাই গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর বাজেট কমিয়ে দিতে শুরু করেন এবং এর কার্যক্রমও সীমিত করার নির্দেশ দেন। তিনি মনে করতেন সংস্থাটি ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক ইচ্ছা পূরণের একটি হাতিয়ার হয়ে পড়েছিল।
দেখুন, http://en.wikipedia.org/wiki/Morarji_Desai (পর্যবেক্ষণ ২২.০৮.২০১৩)

৬৫৮ দেখুন, http://ns.bdnews24.com/details.php?id=147425&cid=35 (পর্যবেক্ষণ ২০.০৮.২০১৩]

৬৫৯ দেখুন, http://dnewsbd.com/single.php?id=41284 এবং
http://www.bostonbanglanews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25723:2013-08-15-01-48-02&catid=86:2011-03-28-17-55-11&Itemid=70
(পর্যবেক্ষণ ২০-০৮-২০১৩)

৬৬০ কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম, 'এক মহাবিপর্যয়ের দিন', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৫ আগস্ট ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১।

সিদ্দিকী– তবে ভারতীয় গোয়েন্দাদের হস্তক্ষেপে বিদ্রোহীদের প্রাণভিক্ষা পায়।[৬৬১] পঁচাত্তরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর পরবর্তী ২২ মাসের উপরোক্ত তৎপরতা প্রতিরোধকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশের হাতে নিহত বিদ্রোহীদের একটি তালিকা দেখুন সংযুক্তি *পঁচিশ-এ*।

উল্লেখ্য, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের বিরুদ্ধে 'প্রতিকারমূলক কিছু করা'র জন্য সিপিবি'র তখনকার নেতৃবৃন্দের একটি দলও ভারত গিয়েছিলেন – তবে তাঁরা কোনো তৎপরতা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বলে জানা যায় না। ঐ দলে সিপিবির বর্তমান সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমও ছিলেন। দেশে ফিরেই পরের বছর তিনি গ্রেফতারবরণ করেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, সিপিআই ও সোভিয়েত পার্টির কাছ থেকে সিপিবি এ বিষয়ে উৎসাহব্যঞ্জক কোনো সাড়া পায়নি সেসময়।

---

৬৬১ উল্লিখিত বাহিনীর অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দল সম্পর্কে দেখুন, http://www.somewhereinblog.net/blog/Shahnawaz/29770077 (পর্যবেক্ষণ ২০-০৮-২০১৩)

৮

উপসংহারের পরিবর্তে
কে মারল শেখ মুজিবুর রহমানকে

> শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ইন্দিরা গান্ধী– এই তিন নেতার সকলে তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করেছেন। মুজিব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন; ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং ভুট্টো তাঁর দেশের প্রধানমন্ত্রী হন।
>
> –আহমেদ ইলিয়াস, ঢাকার উর্দুভাষী লেখক[৬৬২]

> Internal developments and trends in Indo-Bangladesh relations during the first half of 1975 generated impulses which ultimately led to the assassination of Sheikh Mujibur Raham.
>
> –J. N. Dixit, *Liberation and Beyond : Indo-Bangladesh Relations*, UPL, Dhaka, p.204.

> 'বঙ্গবন্ধু হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও আওয়ামী লীগ নেতাদের পূর্ণাঙ্গ সমর্থনের অভাবে আমরা সফল হতে পারিনি।'
>
> –আবদুল কাদের সিদ্দিকী, বীরউত্তম[৬৬৩]

উপরোক্ত প্রথম উদ্ধৃতিতে লেখক যথার্থই বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ইন্দিরা গান্ধী– প্রত্যেকে তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সফল। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একই সময়ের ইতিহাসের অপর করুণ দিক হলো, আলোচ্য তিন নেতাই নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন নিজ নিজ দেশে। মুজিব নিহত হন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট; ভুট্টো ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল এবং ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর। এই তিন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান তিন রাজনৈতিক চরিত্রের শারীরিক বিদায় ঘটে।

এর মধ্যে বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘটনাবহুল ও প্রভাবশালী ঐতিহাসিক কালপর্বের সমাপ্তি। মুজিব যাঁদের সৃষ্টি, যাঁরা মুজিবকে তৈরি করেছিল– তাঁরাই ধ্বংসের চূড়ান্ত কিনারে

---

৬৬২ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৩।

৬৬৩ কাদের সিদ্দিকী, *পূর্বোক্ত*।

নিয়ে গেছে তাঁকে। তাঁর উত্থান ও ধ্বংসের সযত্ন প্রক্রিয়ার মাঝে এত কৌতূহল উদ্রেককারী, জরুরি ও শিক্ষণীয় উপাদান আছে যে মুজিবকে কে গুলি ছুঁড়েছিল, ট্যাংকে কে কোথায় গোলা ভরে দিয়েছে সে আলোচনা ভীষণ রকমে অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে ভাবীকালের ইতিহাসশাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের কাছে। যদিও আপাতত বাংলাদেশের মানুষকে সেসবই 'ইতিহাস' হিসেবে গেলানো হচ্ছে এবং সযত্নে আড়াল করে রাখা হচ্ছে মুজিবের রাজনৈতিক মৃত্যু যারা নিশ্চিত করেছিল তাদের।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার তাৎক্ষণিক পরের ইতিহাস নিয়ে ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের খোরাক হিসেবেই উপরে এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা ভারতীয় কূটনীতিবিদ J. N. Dixit-এর একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। প্রসঙ্গক্রমে এও বলে রাখা দরকার, J. N. Dixit তাঁর গ্রন্থে এও জানিয়েছেন, কেবল মুজিব হত্যা নয় মুজিবের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সহযোগী চার আওয়ামী লীগ নেতাকে কারাগারে হত্যার বিষয়টিও ভারত আগে থেকে অবহিত ছিল। জে এন দীক্ষিত স্পষ্ট করে বলছেন, ডেপুটি হাইকমিশনার (কিছু দিন তিনি ঢাকায় ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনারও ছিলেন) হিসেবে 'এসব মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর কাছে *নিশ্চিত খবর* ছিল। (তিনি) আগাম তা ভারতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে জানিয়েছিলেনও।' স্পষ্ট করেই তিনি লিখেছেন, 'I sent a message to New Delhi. But no action seems to have been taken on this vital advance information.'[৬৬৪] আর হ্যাঁ, মুজিব যে 'ক্ষমতা থেকে তাঁর অপসারণ প্রতিরোধ করতে পারবেন না' সেটা জে এন দীক্ষিতকে অবহিত করছেন মুজিবের অনেক নিকটজনের পাশাপাশি শেখ মণিও।[৬৬৫] প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য আমরা পাবো মুজিব শাসনামলের সবচেয়ে

---

৬৬৪ J. N. Dixit, *Ibid*, p.213-214. উল্লেখ্য, জনাব দীক্ষিতকে কেবল বাংলাদেশে একজন সাধারণ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে এবং তাঁর পাঠানো বার্তাকে স্রেফ 'ম্যাসেজ' হিসেবে দেখলে এ দেশের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর গভীর সংশ্লিষ্টতার প্রতি অবিচার করা হবে। নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি আরো বেশি কিছু ছিলেন। ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের 'সংকট'কালে বিষয়টি মোকাবেলা করার জন্য ভারতের বিদেশ মন্ত্রকে একটি 'বিশেষ বিভাগ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– যার পরিচালক ছিলেন দীক্ষিত। ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকায় তাঁর মাধ্যমেই ভারতীয় দূতাবাসের কার্যক্রমের শুরু। ১৯৯৪ সালে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সচিব হিসেবে চাকরি জীবন শেষ করেন তিনি।

৬৬৫ J. N. Dixit, *Ibid*, p.204. জনাব দীক্ষিতের এই তথ্যকে বাংলাদেশের লেখক মাহবুব তালুকদারের একটি বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে যে কোনো পাঠকের মনে বহু প্রশ্নের জন্ম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর মাহবুব তালুকদার দীর্ঘ সময় বঙ্গভবনে গণসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সূত্রে তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের দপ্তরে তথ্য বিষয়ক একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ (*বঙ্গভবনে পাঁচ বছর*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ১৪৪) থেকে জানা যায়, মুজিবের মৃত্যুর পূর্বে নিজের এক আত্মীয়ের (যিনি রাষ্ট্রীয় একটি গোয়েন্দা

উত্তাল দিনগুলোতে ঢাকায় দায়িত্ব পালন করে যাওয়া আরেক ভারতীয় কূটনীতিবিদ সমর সেনের কাছ থেকেও– যিনি ১৯৭৫-এর আগস্ট অভ্যুত্থানকে বলছেন 'a logical outcome'. এটা বলতে গিয়ে ভারতের প্রভাবশালী ইংরেজি সাপ্তাহিক ফ্রন্টলাইন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সমর সেন এও জানাচ্ছেন :

> We had been keeping in touch with all elements within Bangladesh. India's intelligence services- whose operations few of us know much about- retain contact with even elements hostile to Sheikh Mujib.[৬৬৬]

ভারতীয় কূটনীতিবিদদের এসব বক্তব্যের সূত্র ধরেই নিশ্চিতভাবেই শুরু হতে পারে ভাবীকালের অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও গবেষকদের পরবর্তী রোমাঞ্চকর যাত্রা– যা নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাহিত্যে পঁচাত্তর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দিনগুলো সম্পর্কে অনেক নতুন উপাদান যুক্ত করবে। তবে জ্ঞানতাত্ত্বিক গবেষণার সেই সম্ভাবনাকে নতুন প্রজন্মের হাতে সঁপে দিয়ে আমরা ইতোমধ্যে মুজিব বাহিনী সম্পর্কিত বর্তমান বর্ণনার কিছু আপাত উপসংহারে আসতে পারি।

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সম্পৃক্তি ১৯৭১ সালের মার্চে ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যাপর পর'– এইরূপ ধারণার যথার্থতা খতিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম আমরা বর্তমান অনুসন্ধানের শুরুতে এবং ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি, একাত্তরের বহু পূর্ব থেকে পাকিস্তানের পূর্বাংশকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে নিয়োজিত ছিল ভারত। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে তারা সকল স্তরে এবং সকল অর্থেই 'যোগাযোগ' গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের প্রতি শাসক এলিটদের ধারাবাহিক শোষণ ও উপেক্ষা ঐ যোগাযোগকে বাড়তি গতি দেয় এবং অর্থবহ করে তোলে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটেই– আমরা দেখেছি, একাত্তর ছিল বাংলাদেশের জন্য নিপীড়ক বাস্তবতা থেকে 'মুক্তি'র যুদ্ধ এবং ভারতের জন্য ছিল তা 'শতাব্দীর সেরা সুযোগ।' এই সুযোগ যাতে কোনোভাবে ব্যর্থ না হয় এবং এর ধারাবাহিকতা

সংস্থার জুনিয়র কর্মকর্তা ছিলেন এবং টেলিফোনে আড়িপাতা যার দায়িত্ব ছিল) কাছ থেকে তিনি এই হত্যার 'ষড়যন্ত্র' সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবহিত হন এবং বিষয়টি শেখ মণিকে জানান। মাহবুব তালুকদারের পূর্ব-পরিচিত বন্ধু ছিলেন মণি। কিন্তু শেখ মণি তাৎক্ষণিকভাবে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি 'অ্যাবসার্ড' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঐ পর্যায়ে মাহবুব তালুকদার এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুজিবকে অবহিত করার অনুরোধ জানালে তাও মণি এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, এগুলো *মনে মনে তৈরি করা কাল্পনিক ঘটনা*– এটা তাঁকে জানানোর প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য, মাহবুব তালুকদারের ঐ নিকটাত্মীয় তার প্রাপ্ত তথ্য নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক 'কাঠামোর মাধ্যমেও ঊর্ধ্বতনদের জানিয়েছিলেন বলে মাহবুব তালুকদারের বয়ান থেকে জানা যায়। কিন্তু তা 'যথাস্থানে' পৌছাত না বলেই তাঁর ধারণা ছিল।

৬৬৬ Samar Sen, Frontline, *Ibid.*

যাতে ভবিষ্যতেও কার্যকর থাকে সেই ভাবনারই এক ধরনের ফসল বলা যায় মুজিব বাহিনীকে– যদিও এই বাহিনীর সামান্য সংখ্যক সদস্যই হয়তো সেই ভাবনার খোঁজ জানতেন এবং আরও কম সংখ্যক হয়তো তার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ধরতে পেরেছিলেন। ইতিহাসের এই পর্যায়ে পূর্ব (এবং পশ্চিম) বাংলায় মাওবাদী অভ্যুত্থান মোকাবেলাও শাসক শক্তির একটি কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে আলোকেই 'মুজিব বাহিনী' নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার পেছনে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আমরা দেখেছি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর আলোচনায়। আবার যুদ্ধ পরবর্তীকালে এই বাহিনীর নতুন সংস্করণগুলোর মাওবাদ দমনমূলক কার্যক্রম যে সোভিয়েত ইউনিয়নের আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গেও খাপখাইয়ে গিয়েছিল তারও ইঙ্গিত পাবো ২২৭ নম্বর তথ্যসূত্রে সোভিয়েত তাত্ত্বিক উলিয়ানভস্কির মতাদর্শ সম্পর্কিত আলোচনায়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটলেও মুজিব বাহিনী যে ভিন্ন ও বিভিন্ন রূপে, দায়িত্বে ও রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সক্রিয় ছিল সেটা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে। মুজিব বাহিনীর এই জন্ম, বিস্তৃতি ও ভূমিকারই রাজনৈতিক ফল স্বাধীনতাকালীন বিভক্তি এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক প্রহেলিকা, গৃহযুদ্ধ-পরিস্থিতি, একদলীয় শাসনব্যবস্থা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অপহরণ, দুর্ভিক্ষ এবং সর্বশেষ দেশের কাণ্ডারি মুজিবের নির্মম মৃত্যু। এর মধ্যে সমাজতন্ত্রের কুহকের ফলই হয়েছিল সবচেয়ে বিধ্বংসী। মাওবাদী নকশাল ধারার সমাজতান্ত্রিক উত্থান মোকাবেলায় কীভাবে জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কীভাবে জনমানসে একটা ভীতিকর ধারণার গোড়াপত্তন হয়েছে– নয়টি জেলায় তার সরেজমিন চিত্রও দেখেছি আমরা।

কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চায় উপরোক্ত প্রসঙ্গগুলো বরাবর ভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে বিভ্রান্তি তৈরির লক্ষ্যে। আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্য কখনোই শেখ মুজিবুর রহমানের করুণ রাজনৈতিক পরিণতির সমাজতাত্ত্বিক কারণ হিসেবে স্বাধীনতা-উত্তর সমাজে মুজিব বাহিনীর ভূমিকা খতিয়ে দেখেনি। একইভাবে এবং একই সময়ে, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক অনিবার্যতাকে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে প্রবেশ করিয়ে তার চূড়ান্ত অবক্ষয় ত্বরান্বিত করতে রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী পুনর্গঠনকে নিশ্চিত করেছিল কারা– সেটাও অপ্রকাশ্য থেকেছে বরাবর। অথচ এই প্রক্রিয়ায় 'কমিউনিস্ট আদর্শ দিয়ে কমিউনিস্ট আদর্শকে মোকাবেলা'-এর তত্ত্বের প্রায় মহাকাব্যিক এক প্রয়োগ ঘটে ঐ সময়ের বাংলাদেশে। যুদ্ধোত্তর উপরোক্ত বাস্তবতারই উন্মোচন প্রচেষ্টা ছিল বর্তমান অনুসন্ধান।

খুব সংক্ষেপে এটাও তুলে ধরা হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা, আওয়ামী লীগের ছয়দফা, ছাত্রদের ১১ দফা কিংবা মহান স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রণয়নকারী রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও শক্তিসমূহ দলিলগুলোতে 'সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে কোনোরূপ স্পষ্ট কর্মসূচি উত্থাপন না করা সত্ত্বেও ১৬ ডিসেম্বরের পরপর কীভাবে সমাজতন্ত্র বিষয়ে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল এবং মুজিবের রাজনৈতিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে তা কীভাবে প্রধান এক ঘাতকের ভূমিকা পালন করেছিল।

যেখানে এসে এইমুহূর্তে চলতি অনুসন্ধানের সমাপ্তি ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই সেটা কোনো ঐতিহাসিক সমাপ্তি বিন্দু নয়। মুজিব বাহিনী সম্পর্কিত আমাদের পূর্ব-সিদ্ধান্তসমূহ এরপরও কার্যকর ছিল এবং আছে। ফলে চলতি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার প্রচলিত কোনো উপসংহারও অপ্রাসঙ্গিক। প্রয়োজন কেবল আরও অনুসন্ধান; আরও গবেষণা। বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার সমকালীন চ্যালেঞ্জ এখানেই।

৯

সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জি

২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭৫[৬৬৭]

১৯৭১

২৫ মার্চ : ঢাকায় গভীর রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযান শুরু। শেখ মুজিবুর রহমানকে নিজ বাসভবন থেকে আটক। বহু হতাহত।

২৬ মার্চ : পাকিস্তানের পূর্বাংশের স্বাধীনতা ঘোষণা; 'বাংলাদেশ'-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন নিহত।

১০ এপ্রিল : ভারতীয় বেতার 'আকাশবাণী'র শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার' গঠনের ঘোষণা।

১৭ এপ্রিল : প্রবাসে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠন। প্রবাসী সরকারের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠান 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' (বিএলএফ)-এর মুখ্য নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বয়কট।

২৫ এপ্রিল : 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'-এর কার্যক্রম শুরু।

০৩ জুন : পিরোজপুরের স্বরূপকাঠির পেয়ারা বাগানে 'পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি' গঠিত।

২৭ জুলাই : মেজর আবু তাহের ও মেজর মঞ্জুরের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান।

০৯ আগস্ট : ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে 'শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি' স্বাক্ষর।

১১ সেপ্টেম্বর : জাতীয় পরিষদ সদস্য এনায়েত হোসেন খানের সভাপতিত্বে খন্দকার মোশতাক আহমদ, শেখ মণি, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ আব্দুল আজিজ প্রমুখের সমর্থকদের এক সভায় তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ও দলের সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান।

২২ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্রেজনেভ, পদগর্নি ও কোসিগিনের আলাপ। বাংলাদেশ বিষয়ে ভারতীয় অবস্থানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে সহায়তার আশ্বাস।

---

৬৬৭ বর্তমান ঘটনাপঞ্জীটির পরিধি বিশেষ বিবেচনায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত রাখা হয়েছে– যদিও এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় তথা মুজিব বাহিনীর উদ্ভব ও তার বিকাশধারাকে কোনোভাবেই উপরোক্ত সময়ের পরিধিতে সীমিত করা যায় না। বর্তমান ঘটনাপঞ্জীতে কেবল সীমিত আকারে মুজিব বাহিনী, শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল, জাসদের উত্থান ও গণবাহিনী গঠনের সূচনাকালকে ধারণ করার চেষ্টা হয়েছে। এটা এই ঘটনাপঞ্জীর বিশেষ সীমাবদ্ধতা। এই পঞ্জিকা প্রস্তুতিতে এ এস এম সামছুল আরেফিন প্রণীত *বাংলাদেশের নির্বাচন : ১৯৭০-২০০১* [বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৩] শীর্ষক গ্রন্থ থেকে বিশেষ সহায়তা নেয়া হয়েছে।

০৬ ডিসেম্বর : স্বাধীন দেশ হিসেবে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি।
০৭ ডিসেম্বর : ভুটান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি।
১৪ ডিসেম্বর : ঢাকায় ভারতীয় বাহিনীর ব্যাপক বোমাবর্ষণ।
১৬ ডিসেম্বর : ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ।
১৮ ডিসেম্বর : ঢাকার রায়েরবাজার এলাকায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের মৃতদেহ উদ্ধার।
: কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে চার বেসামরিক বন্দি ব্যক্তিকে ঢাকায় প্রকাশ্যে বেয়নট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা।
: ডি পি ধরের সঙ্গে কলকাতায় প্রবাসী সরকারের বৈঠক শুরু। এই বৈঠক চলে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
১৯ ডিসেম্বর : বেতার বক্তৃতায় তাজউদ্দীন আহমদের ঘোষণা : 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পেতে আগ্রহী নয়।'
২১ ডিসেম্বর : মাহবুব আলম চাষীকে পররাষ্ট্রসচিবের পদ থেকে অপসারণ।
: পাকিস্তান বাহিনীকে সহায়তার অভিযোগে মৌলভী ফরিদ আহমেদকে পিটিয়ে হত্যা।
২২ ডিসেম্বর : পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের ছয় দিন পর কলকাতা থেকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিমানে চড়ে ঢাকা এলেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।
২৩ ডিসেম্বর : ঢাকায় মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক। জাতীয় মিলিশিয়া বোর্ড গঠন।
২৪ ডিসেম্বর : পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাক্ষাৎ।
২৬ ডিসেম্বর : ঢাকায় জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের ঘোষণা।
: মিলিশিয়া বাহিনীতে বিএলএফ বা 'মুজিব বাহিনী' সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি নির্বিঘ্ন করতে জেনারেল ওবানের ঢাকা আগমন।
: ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্তৃক ঢাকা-কলকাতা বাণিজ্যিক ফ্লাইটের ঘোষণা।
২৭ ডিসেম্বর : আওয়ামী লীগের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল নিরসনের লক্ষ্যে ৫ জন নেতাকে নতুন করে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি।
২৯ ডিসেম্বর : পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আবদুস সামাদ আজাদের দায়িত্ব প্রাপ্তি।
৩০ ডিসেম্বর : মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিলকে আটক।
৩১ ডিসেম্বর : সদ্যস্বাধীন দেশে পাকিস্তানি (উর্দুভাষী) মালিকাধীন কলকারখানা ও ব্যবসায়িক সংগঠনকে 'সরকারি মালিকানা'য় আনার রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত।
: তাজউদ্দীন আহমদসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের উপস্থিতিতে ঢাকায় সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয় উদ্বোধন।

১৯৭২

০২ জানুয়ারি : স্বাধীন দেশে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কমান্ডারদের প্রথম ফরমেশন বৈঠক শুরু।

: জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন; বোর্ডের ১১ সদস্যের মধ্যে 'মুজিব বাহিনী'র দু'জন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত।

০৩ জানুয়ারি : শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

০৫ জানুয়ারি : 'পরিত্যক্ত' শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণের জন্য অধ্যাদেশ (এপিও-১) জারি।

০৭ জানুয়ারি : ব্যাংক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানি রাষ্ট্রীয়করণ।

১০ জানুয়ারি : পাকিস্তান থেকে লন্ডন হয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় আগমন। পথে দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক।

: সাপ্তাহিক আকারে মুজিব বাহিনীর একাংশ কর্তৃক 'গণকণ্ঠ'-এর প্রকাশনা শুরু। চার সপ্তাহ পর সাপ্তাহিকটির দৈনিক রূপে প্রকাশ শুরু হয়।

১২ জানুয়ারি : প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের দায়িত্ব গ্রহণ।

: তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ছেড়ে অর্থমন্ত্রী হলেন।

১৭ জানুয়ারি : যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক পাকিস্তানের সৈনিকদের ভারতে স্থানান্তর।

২৪ জানুয়ারি : জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের প্রেসবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

: টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর অস্ত্রসমর্পণ।

০১ ফেব্রুয়ারি: জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ কার্যকর।

০২ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তান সরকারের খেতাবপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় অফিসারদের বরখাস্তের সিদ্ধান্ত।

০৬ ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের পশ্চিমবঙ্গ সফর। এটাই ছিল ক্ষমতাসীন হয়ে তাঁর প্রথম বিদেশ যাত্রা।

১৫ ফেব্রুয়ারি: জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীর সদস্য বাছাইয়ের জন্য পিলখানায় স্ক্রিনিং কমিটি গঠন।

১৬ ফেব্রুয়ারি: ঢাকার পিলখানায় জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীর সদস্যদের মাঝে গুলিবিনিময়। বাহিনী প্রধান মেজর নূরুজ্জামান আহত। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত।

২১ ফেব্রুয়ারি: শহীদ মিনারে তরুণদের উচ্ছৃঙ্খলতায় দেশবাসী স্তম্ভিত।

: শেখ ফজলুল হক মণি'র সম্পাদনায় দৈনিক বাংলার বাণীর প্রকাশনা শুরু।

০১ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় সফর; মস্কো গমন। পরদিন মুজিব-ব্রেজনেভ বৈঠক।

০৩ মার্চ : বাংলাদেশ রাইফেলস্ গঠনের লক্ষ্যে অধ্যাদেশ জারি। কর্নেল সি আর দত্তকে বাহিনীর মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ।

১০ মার্চ : দেশের বিভিন্ন স্থানে উর্দুভাষীদের ক্যাম্পগুলোর পাহারা থেকে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহার। ঐদিনই বিভিন্ন শহরে এরূপ ক্যাম্পে হামলা এবং বহু উর্দুভাষীকে হত্যার অভিযোগ।

১৪ মার্চ : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মহড়া।

১৫ মার্চ : 'জাতীয় সরকার' গঠনের পক্ষে সম্পাদকীয় লেখার কারণে বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক আবদুস সালামকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ।

১৬ মার্চ : ডাকসুর তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে আজীবন সদস্যপদ প্রদান।

১৭ মার্চ : ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফর।

১৯ মার্চ : বাংলাদেশ-ভারত ২৫ বছর মেয়াদি 'মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি' স্বাক্ষর।

২২ মার্চ : পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিরক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনী তলব।

২৮ মার্চ : বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর।

০৪ এপ্রিল : বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি।

০৬ এপ্রিল : দুর্নীতির অভিযোগে আওয়ামী লীগের ১৬ এমপিকে বহিষ্কার। ৯ এপ্রিল এবং ২২ সেপ্টেম্বর এভাবে আরও ২৬ জনকে বহিষ্কার করা হয়।

০৯ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছাত্র ইউনিয়নের ত্রয়োদশ জাতীয় কাউন্সিলের উদ্বোধন। সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি নূরুল ইসলামের ঘোষণা, 'সরকারের সঙ্গে ঐক্যের স্বার্থে সংগঠনের বিলুপ্তিতেও সম্মত রয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন।'

১১ এপ্রিল : সংবিধান প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন।

২৩ এপ্রিল : ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)-এর একটি প্রতিনিধি দলের ঢাকা আগমন। ২৮ এপ্রিল সিপিআই-সিপিবি'র যুক্ত ঘোষণায় 'বাংলাদেশ-ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান মৈত্রী'তে সন্তোষ প্রকাশ।

০৩ মে : ঢাকায় দুঃসাহসিক ব্যাংক ডাকাতি।

২৩ মে : সাতক্ষীরায় রিলিফ চুরির ঘটনায় প্রতিবেদন লেখায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক এস এম হাসানকে গ্রেফতার।

২৫ মে : মুজিব বাহিনীর তিন গুরুত্বপূর্ণ নেতা আ স ম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ ও শরীফ নুরুল আম্বিয়া এক বিবৃতিতে দেশে জরুরি অবস্থা জারি, গণপরিষদ ও মন্ত্রিসভা বাতিল এবং জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানান। মুজিব বাহিনীর ওই তিন নেতা সিরাজুল আলম খানের অনুসারী হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় উপরোক্ত বিবৃতিকে সিরাজুল আলম খানের রাজনৈতিক চিন্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। উল্লিখিত দাবি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রত্যাখ্যান।

২৯ মে : সিপিবি (মনি সিংহ, আবদুস সালাম) ও ন্যাপ (মোজাফফর আহমেদ ও পঙ্কজ ভট্টাচার্য)-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান-এর বৈঠক।

: ষড়যন্ত্রমূলকভাবে 'বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক' ক্ষতিগ্রস্ত করার দায়ে হককথা ও হলিডেসহ কয়েকটি পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মুজিব বাহিনীর অন্যতম নেতা আবদুর রাজ্জাকের বিবৃতি।

০৪ জুন : কমিউনিস্ট নেতা আবদুল মতিনকে আহত অবস্থায় আটক।

১৪ জুন : সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্ক্রীনিং বোর্ড গঠন।

২০ জুন : পত্রিকায় বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে সমালোচনামূলক লেখনির জন্য সাপ্তাহিক হককথার সম্পাদক ইরফানুল বারীকে আটক।

২১ জুন : জাতীয় রক্ষীবাহিনীর প্রথম ব্যাচের শিক্ষাসমাপনী কুচকাওয়াজে প্রধানমন্ত্রীর সালাম গ্রহণ।

২৫ জুন : ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে সান্ধ্য আইন জারি করে রক্ষীবাহিনীর তল্লাশি অভিযান।

২৭ জুন : নারায়ণগঞ্জের আদমজিতে শ্রমিক ধর্মঘট মোকাবেলায় রক্ষীবাহিনী মোতায়েন।

০১ জুলাই : আদমজিতে শ্রমিক সংঘর্ষ; চারজন নিহত। মিল বন্ধ ঘোষণা।

০২ জুলাই : পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ঐতিহাসিক সিমলাচুক্তি স্বাক্ষর।

০৪ জুলাই : বন্দি অবস্থা থেকে সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের মুক্তিলাভ।

১৯ জুলাই : ছাত্রলীগে সিরাজুল আলম খান ও ফজলুল হক মণি'র অনুসারীদের মাঝে আনুষ্ঠানিক বিভক্তি। ঢাকায় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের আলাদা সম্মেলন অনুষ্ঠানের ঘোষণা এবং ২১-২৩ জুলাই ওই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও পল্টন ময়দানে।

০২ আগস্ট : আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী সভায় 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠার শপথ।

২৫ আগস্ট : আদমজীতে আবার শ্রমিদের সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৫০। রক্ষীবাহিনী তলব। সান্ধ্য আইন জারি। মিল বন্ধ ঘোষণা।

: ভারত থেকে প্রশিক্ষণ শেষে রক্ষীবাহিনীর 'লিডার'দের প্রথম দলের ঢাকায় প্রত্যাবর্তন।

০৩ সেপ্টেম্বর: মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ভুখা মিছিল।

০৫ সেপ্টেম্বর: সাপ্তাহিক মুখপত্র ও স্পোকসম্যান-এর সম্পাদক ফয়জুর রহমানকে জননিরাপত্তা আইনে আটক।

২২ সেপ্টেম্বর: লে. কর্নেল আবু তাহের সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন।

: সরকার কর্তৃক সাপ্তাহিক 'হককথা', 'মুখপত্র' এবং 'স্পোকসম্যান' পত্রিকার লাইসেন্স বাতিল।

২৭ সেপ্টেম্বর: সাপ্তাহিক হককথা, মুখপত্র, স্পোকসম্যান-এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা।

৩১ অক্টোবর : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর আত্মপ্রকাশ।

০৪ নভেম্বর : গণপরিষদে দেশের সংবিধান গৃহীত।

০৬ ডিসেম্বর : রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত।

২৩ ডিসেম্বর : জাসদের প্রথম কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত। এটি অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী। সম্মেলন শেষে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা।

৩১ ডিসেম্বর : সরকারি চাপে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রধান সম্পাদকের পদ ছাড়তে হয় ফয়েজ আহমদকে।

১৯৭৩

০১ জানুয়ারি : ঢাকায় ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী মিছিলে গুলি। দুজন নিহত। ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন দেশে হরতাল পালন।

: ছাত্র মিছিলে গুলির ঘটনায় বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করায় দৈনিক বাংলার সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি কবি হাসান হাফিজুর রহমান এবং পত্রিকাটির সম্পাদক তোয়াব খানকে সরকার কর্তৃক অপসারণ করে 'ওএসডি' করা হয়। এ ঘটনাকে স্বাগত জানিয়ে জনসভায় ছাত্রলীগ সভাপতি শেখ শহিদুল ইসলামের মন্তব্য : 'পাকিস্তান সরকারের দু' জন সহযোগী দৈনিক বাংলা থেকে অপসারিত।'

১৪ জানুয়ারি : জাসদের ঘোষণাপত্র প্রকাশ।

০৪ ফেব্রুয়ারি: ভোলা লঞ্চঘাটে জাসদ সভাপতি মেজর জলিলের ওপর অতর্কিতে গুলিবর্ষণ। অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান তিনি।

২৮ ফেব্রুয়ারি: দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল লিবারেশন স্ট্রাগল (ইনডেমনিটি) অর্ডার, ১৯৭৩ জারি। এটা 'প্রেসিডেন্ট আদেশ ১৬' নামেও পরিচিতি পায়। এই আইনে ১ মার্চ ১৯৭১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় যা কিছু করা হয়েছে তাকে দায়মুক্তি দেওয়া হয়। এই আইন উর্দুভাষীদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থনার পথ বন্ধ করে।

০৭ মার্চ : নতুন সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর দেশে প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান।

০১ মে : ভারতে ছাপা ১০ ও ৫ টাকার বাংলাদেশি নোট প্রত্যাহার।

১২ মে : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী।

১৩ মে : 'স্বদেশ' পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ।

১৫ মে : তিনদফা দাবিতে মাওলানা ভাসানীর অনশন।

২৭ মে : আওয়ামী লীগের শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জাসদ কর্তৃক গণবিক্ষোভের ডাক। নরসিংদীতে তাদের মিছিলে গুলি। ঘটনাস্থলে নিহত নয়জন।

০৬ জুন : কর্নেল শফিউল্ল্যাহ এবং জিয়াউর রহমানের ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি।

২৮ জুন : চরফ্যাশন থানা লুট ও রামগড়ের জালিয়া ফাঁড়িতে হামলা।

০২ জুলাই : লালমোহন থানা লুট।

০৩ জুলাই : মোড়েলগঞ্জের তেলিগাতি ফাঁড়িতে হামলা।

০৮ জুলাই : পাথরঘাটার চরকুয়ানি ও বাউফলের বগা ফাঁড়িতে হামলা।

০৯ জুলাই : বৈদ্যেরবাজারের আলিপুর ফাঁড়িতে ও গোপালগঞ্জের পাটগাতিয়া ফাঁড়িতে হামলা।

২০ জুলাই : দেশব্যাপী তল্লাশি অভিযানে সেনাবাহিনী তলব।

২৩ জুলাই : ঢাকায় সান্ধ্যআইন জারি করে তল্লাশি।

২৭ জুলাই : রাজশাহী জেলে কয়েদিদের বিদ্রোহ।

০৩ আগস্ট : চট্টগ্রামে সান্ধ্যআইন জারি করে তল্লাশি অভিযান।

১০ আগস্ট : ঈশ্বরগঞ্জ ও সাতকানিয়া থানায় দুটি ফাঁড়িতে হামলা। এটা ছিল এ মাসে এরূপ ছয়টি হামলার দুটি।

১১ আগস্ট : চট্টগ্রামের 'দেশবাংলা' অফিসে সরকার কর্তৃক তালা এবং ১০ জনকে গ্রেফতার।

২৮ আগস্ট : বাংলাদেশের সম্মতিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর– যার আওতায় যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আটকেপড়া মানুষদের প্রত্যাবাসনের পথ সুগম হয়।

২৯ আগস্ট : তিনদফা দাবিতে মাওলানা ভাসানীর হরতাল আহ্বান।

০৩ সেপ্টেম্বর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জাসদ সমর্থক ছাত্র সংগঠনের বিজয় ঠেকাতে সরকার সমর্থক ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক ব্যালট বক্স ছিনতাই, ফলাফল বানচাল।

০৬ সেপ্টেম্বর: চার ব্যক্তিকে বাইরে থেকে ধরে এনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রাশফায়ার করে হত্যা।

১৯ সেপ্টম্বর : জেনেভাভিত্তিক রেডক্রস সোসাইটির তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে আটক বাংলাদেশিদের ঢাকায় প্রত্যাবর্তন শুরু। একইভাবে ঢাকা থেকে উর্দুভাষীদের পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনও শুরু।

: সংবাদমাধ্যমের ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন নিয়ন্ত্রণমূলক 'প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্ অর্ডিনেন্স' নামে নতুন আইন তৈরি।

২০ সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রপতিকে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দিয়ে বিল পাস।

২৪ সেপ্টেম্বর: দেশের ১৫০টি থানায় জাতীয় রক্ষীবাহিনী মোতায়েন।

০৩ অক্টোবর : পাবনার শাহজাদপুরে রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ; ৮ জন নিহত।

১০ অক্টোবর : ঢাকায় একদিনে ছয়জনকে পিটিয়ে হত্যা।

১২ অক্টোবর : চুয়াডাঙ্গা কারাগার ভেঙে ১৪ জনের পলায়ন।

১৪ অক্টোবর : আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের উদ্যোগে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠনের ঘোষণা।

১১ নভেম্বর : শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন।

২০ নভেম্বর : ঢাকার নাখালপাড়ায় মেজর এম এ জলিল কর্তৃক এক বৈঠকের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীতে জাসদের সংগঠন গড়ে তোলার কার্যক্রম শুরু।

২৯ নভেম্বর : কুমিল্লা জেলার মতলব থানা লুট।

০৪ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সিপিবি'র স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম রাজনৈতিক কংগ্রেসের উদ্বোধন। ৫ দিনের এই কংগ্রেস শেষে মনি সিংহকে সভাপতি এবং মোহাম্মদ ফরহাদকে সম্পাদক করে দলের ২৬ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন।

১৫ ডিসেম্বর : দেশের তিনটি থানায় সশস্ত্র হামলা। এটা ছিল এ মাসে অনুরূপ আরো দুটি হামলার অতিরিক্ত।

২৪ ডিসেম্বর : রাষ্ট্রপতি পদ থেকে আবু সাঈদ চৌধুরীর ইস্তফা। স্পিকার মুহম্মদ উল্ল্যাহ'র নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৭৪

০৮ জানুয়ারি : তিন দিনের সফরে ভারতের বৈদেশিক সচিব কেওয়াল সিংয়ের ঢাকা আগমন।

১০ জানুয়ারি : ভোলা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোতাহারউদ্দীন আহমেদ গুলিতে নিহত।

১৩ জানুয়ারি : ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে জনসভা অনুষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা।

০৩ ফেব্রুয়ারি: জাসদের সহ-সভাপতি এডভোকেট মোশারফ হোসেন অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত।

০৯ ফেব্রুয়ারি: সংসদে অনুমোদিত বিশেষ ক্ষমতা আইন গেজেট আকারে প্রকাশ।

২২ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্ক কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান।

২৩ ফেব্রুয়ারি: ইসলামি সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের লাহোর যাত্রা এবং সেখানে উষ্ণ সংবর্ধনা।

১৭ মার্চ : ঢাকায় মিন্টো রোডে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে জাসদের মিছিলে গুলি; বহু হতাহত। জাসদের মুখপত্র দৈনিক গণকণ্ঠ কার্যালয়ে আগুন। পরদিন সম্পাদক আল-মাহমুদকে গ্রেফতার। দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান– তবে তা খুব বেশি কার্যকার হয়নি। এই ঘটনায় ১৭ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত গণকণ্ঠের প্রকাশনা বন্ধ থাকে।

১৯ মার্চ : প্রধানমন্ত্রীর মস্কো যাত্রা। প্রায় ২০ দিনের সফর শেষে দিল্লিতে আগমন এবং সেখানে ৯ এপ্রিল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক।

৩১ মার্চ : সরকারি দমনপীড়নের বিরুদ্ধে করণীয় ঠিক করতে ড. আহমদ শরীফের নেতৃত্বে জাতীয় প্রেসক্লাবে শিক্ষক, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিকদের বৈঠক। কবি সিকান্দার আবু জাফরকে সভাপতি করে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট 'নাগরিক স্বাধীনতা ও আইন সহায়তা কমিটি' গঠন।

০৯ এপ্রিল : শেখ মুজিবুর রহমানের ভারত গমন। ২৮ মাসের মধ্যে এটা ভারতে তাঁর তৃতীয় সফর।

: দিল্লিতে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি; পাকিস্তানের সৈনিকদের যুদ্ধাপরাধের বিচার না করার ঘোষণা।

১৬ এপ্রিল : ১৭ সদস্য বিশিষ্ট সোভিয়েত অর্থনীতিবিদদের একটি দলের ঢাকা আগমন।

০৭ মে : শেখ ফজলুল হক মণি'র সম্পাদনায় দ্বিতীয় দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস্-এর আত্মপ্রকাশ।

১১ মে : জাতীয় সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার।

১৬ মে : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর। বাংলাদেশ কর্তৃক ভারতকে বেরুবাড়ি এলাকা প্রদান।

২১ মে : বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যচুক্তি স্বাক্ষর।

২৭ জুন : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা সফর, তিন দিন অবস্থান।

২৭ অক্টোবর : অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের পদত্যাগ। এসময় দেশজুড়ে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ চলছিল।

২৮ অক্টোবর : বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাংকের ২৭৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দানের ঘোষণা।

২৯ অক্টোবর : ১৯ ঘণ্টার এক সফরে হেনরি কিসিঞ্জারের ঢাকা আগমন। বাংলাদেশ কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে ঢাকা সফরের আমন্ত্রণ।

০১ নভেম্বর : রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ; ৯ জনকে গুলি করে হত্যা।
সন্ত্রাস ও দমনপীড়নের প্রতিবাদে ঢাকার বায়তুল মোকাররমে স্বাধীনতা ও আইন সহায়তা কমিটির উদ্যোগে শিক্ষক, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিকদের সমাবেশ।

১৭ নভেম্বর : ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী ও কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে 'ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি' নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা।

২৮ ডিসেম্বর : দেশে জরুরি অবস্থা জারি। মৌলিক অধিকার স্থগিত। ধর্মঘট, লকআউট নিষিদ্ধ ঘোষণা।

১৯৭৫

০২ জানুয়ারি : পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির প্রধান সিরাজ সিকদার আটকাবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত।

২১ জানুয়ারি : আওয়ামী লীগের সংসদীয় কমিটির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে 'যে কোনো পদক্ষেপ' গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান।

২৫ জানুয়ারি : দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত।

: শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হলেন।

২৭ জানুয়ারি : পুলিশ কর্তৃক দৈনিক 'গণকণ্ঠ' কার্যালয় দখল।

১১ ফেব্রুয়ারি: জেনারেল ওসমানী ও মঈনুল হোসেনের সংসদ সদস্যপদ ত্যাগ।

২৪ ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাকশাল নামে নতুন 'জাতীয় দল'-এর ঘোষণা। দেশের অন্যসব রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই 'জাতীয় দল' বাকশালের প্রধান হন।

০৮ মার্চ : টাঙ্গাইলে এক জনসভায় রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও মাওলানা ভাসানীর ভাষণ দান।

০৯ মার্চ : গণকণ্ঠ সম্পাদক কবি আল মাহমুদের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ।

২৮ এপ্রিল : সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ সরকার এবং মইনুদ্দিন আহমেদ মানিক বাকশালে যোগদান না করায় সংসদে তাদের আসন শূন্য ঘোষণা।

২৩ মে : একক জাতীয় দল বাকশালে যোগদানের জন্য ২২৪ জন সাংবাদিকের প্রথম ব্যাচের আবেদন। ৪ জুন ৩০২ জনের আরেকটি ব্যাচ একইভাবে বাকশালে যোগদানের সুযোগ চেয়ে আবেদন জানায়।

০৬ জুন : বাকশালের অঙ্গসংগঠন ও নেতৃবৃন্দের নাম ঘোষণা। মুজিব বাহিনীর দুই নেতা আবদুর রাজ্জাক ও শেখ ফজলুল হক মণি এই দলের সম্পাদক নির্বাচিত।

০৯ জুন : দেশের দৈনিকগুলোর নয়জন সম্পাদকের বাকশালে যোগদানের আবেদন।

১৬ জুন : সংবাদপত্র অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ ঘোষিত। কেবল চারটি দৈনিক পত্রিকা ছাড়া অন্যসব সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা। এই ঘোষণায় তাৎক্ষণিকভাবে ২৯টি দৈনিক ও ১৩৮টি সাপ্তাহিকের প্রকাশনা বন্ধ।

২৭ জুলাই : দেশের এক লাখ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর বাকশালের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন।

০৮ আগস্ট : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাকশাল শাসনে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত।

১১ আগস্ট : বাকশাল ব্যবস্থার মুখ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে বঙ্গভবনে জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন।

১২ আগস্ট : রক্ষীবাহিনীর পরিচালক এ এন এম নূরুজ্জামানের যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ।

১৪ আগস্ট : রাষ্ট্রপতিকে সংবর্ধনা দেওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি।

১৫ আগস্ট : সামরিক বাহিনীর সদস্যদের হামলায় রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসগৃহে পরিবারের ২১ জন সদস্যসহ নিহত। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বগ্রহণ। দেশে সামরিক আইন জারি। পূর্ববর্তী মন্ত্রিপরিষদের ১৬ মন্ত্রী বহাল।

২৪ আগস্ট : জেনারেল ওসমানী রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা নিযুক্ত।

: মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান হিসেবে নিয়োগ।

৩১ আগস্ট : বাংলাদেশকে চীনের স্বীকৃতি দান।

০১ সেপ্টেম্বর : প্রেসিডেন্টের আদেশ বলে বাকশাল ব্যবস্থা রহিত।

০৩ অক্টোবর : রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা।

০৪ অক্টোবর : রক্ষীবাহিনী বিলুপ্তি করে এর সদস্যদের সামরিক বাহিনীতে আত্তিকরণের ঘোষণা।

০৩ নভেম্বর : সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে বন্দি করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ কর্তৃক সামরিক অভ্যুত্থান। তাজউদ্দীন আহমদ ও অপর তিন জ্যেষ্ঠ আওয়ামী লীগ নেতা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকাবস্থায় নিহত। সর্বশেষ সামরিক অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়ে আওয়ামী লীগ-সিপিবি-ন্যাপ এর কর্মী-সমর্থকদের মিছিল।

০৪ নভেম্বর : অভ্যুত্থানকারীদের চাপে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি প্রদান ও সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ।

: কর্নেল আবু তাহেরের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কর্মীদের দেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে লিফলেট বিতরণ। লিফলেটে সৈনিকদের বিদ্রোহ করা এবং 'ভারতের দালাল ও বিশ্বাসঘাতক খালেদ চক্রকে' উৎখাত করার আহ্বান।

৫ নভেম্বর : বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ।

৬ নভেম্বর : জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা।

: জিয়াউর রহমানের তরফ থেকে আবু তাহেরের নিকট সহায়তার আবেদন।

: ঢাকায় প্রকৌশলী আনোয়ার সিদ্দিকীর বাসভবনে জাসদ ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতৃবৃন্দের বৈঠক। আখলাকুর রহমানসহ অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৭ নভেম্বর : সেনানিবাসগুলোতে কর্নেল আবু তাহেরের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈনিকদের অভ্যুত্থান; বন্দি জিয়াউর রহমানকে উদ্ধার।

: কারাগার থেকে বিপ্লবী সৈনিকরা জাসদ নেতা এম এ আউয়াল, মোহাম্মদ শাজাহান ও মির্জা সুলতান রাজাকে মুক্ত করে নিয়ে আসে।

: ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও তার দুই সামরিক সহযোগী অজ্ঞাতনামা বিদ্রোহী সৈনিকদের গুলিতে ঢাকার শেরেবাংলা নগরে নিহত।

: রাষ্ট্রপতি সায়েম কর্তৃক সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ। তিন বাহিনীর প্রধানদের উপ-সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত।

: রক্ষী বাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানের ভারত পলায়ন।

৮ নভেম্বর : শহীদ মিনারে জাসদের সমাবেশ সৈনিকদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ। আ ফ ম মাহবুবুল হক আহত।

: মুজিব শাসনামলে কারাগারে আটক আ স ম আব্দুর রব ও মেজর এম এ জলিলসহ জাসদ নেতৃবৃন্দের মুক্তি।

১৫ নভেম্বর : জিয়াউর রহমানের সঙ্গে জাসদ নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে জাসদ কর্তৃক সেনানিবাসে আবারও প্রচারপত্র বিলি। সেনাবাহিনীর জওয়ান, কৃষক, শ্রমিক সবাইকে নিয়ে দেশে বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের দাবি।

: জিয়াউর রহমান কর্তৃক সেনাবাহিনীর কিছু ইউনিটকে ঢাকা থেকে দেশের অন্যত্র স্থানান্তর।

২০ নভেম্বর : মেজর জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদকে সামরিক বাহিনীর উপ-প্রধান হিসেবে নিয়োগ।

২৩-২৪ নভে.: রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে মেজর এম এ জলিল, আ স ম আবদুর রব, কর্নেল আবু তাহেরসহ জাসদের বহু নেতা-কর্মী আটক।

২৬ নভেম্বর : জাসদের ঢাকা মহানগর গণবাহিনীর ছয়জন সদস্য কর্তৃক ধানমন্ডিতে ভারতীয় দূতাবাস থেকে হাইকমিশনার সমর সেনকে অপহরণের ব্যর্থ চেষ্টা। অপারেশনে চার গণবাহিনী সদস্য নিহত।

১০
সংযুক্তি

এক
বিশেষ গোপন বাহিনী*

রফিকুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধকালীন *সেক্টর কমান্ডার*

চমৎকার সফলতার সঙ্গে 'অপারেশন জ্যাক্‌পট্'[৬৬৮] সম্পন্ন করতে পেরে আমাদের মনে এই আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হল যে, সঠিক নেতৃত্ব এবং দিক-নির্দেশনা দিতে পারলে মুক্তিযোদ্ধারা দুঃসাধ্য অভিযানেও সফলতা লাভ করবে। স্বাধীনতা যুদ্ধে ওরা সবাই ছিল আন্তরিক। তাছাড়া প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তা থাকায় যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান চালিয়ে সফলতা অর্জন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। ওদের মানসিক উৎকর্ষতা নিঃসন্দেহে তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত পাকিস্তানি সৈন্যদের চেয়ে ছিল অনেক উন্নত। জাতি হিসাবে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, এই যুদ্ধে আমরা এমন একটা শিক্ষিত গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে পেরেছিলাম– যা যুদ্ধের প্রয়োজনে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ ছিল।

এই পর্যায়ে আমরা আবার নতুনভাবে রণকৌশলকে বিশ্লেষণ করলাম। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষবস্তুগুলোর ওপর আঘাত করার জন্য আমরা নতুন নতুন বিশেষ গেরিলা দলকে দেশের অভ্যন্তরে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেই। সেক্টর হেডকোয়ার্টারে এ ধরনের প্রতিটি গেরিলা গ্রুপকে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ব্রিফিং দেওয়া শুরু হয়। প্রতিটি দলের অভিযান পরিকল্পনা সেক্টর হেডকোয়ার্টারে করা হলেও অভিযানের জায়গায় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় রদবদলের দায়িত্ব গ্রুপ-কমান্ডারদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এই গেরিলা দলগুলোর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হই। গ্রুপ লিডার হিসেবে ট্রেনিং পাওয়ার মতো অনেক তরুণ এবং যুবক আমাদের যুব-শিবিরগুলোতে থাকলেও তারা আমাদের সামরিক কমান্ডের আওতায় ছিল না। আসলে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার দু'মাসের মধ্যেই আমরা এমন সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম যা আমাদের জন্য অস্বস্তি এবং উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জুন মাস থেকেই দেখা গেল, বিভিন্ন যুব-শিবিরে তারা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। যুবশিবিরগুলোতে নির্বাচিত কিছু তরুণ গোপন নির্দেশ পেয়ে যুব-শিবিরের বাইরে কোনো একটা স্থানে গিয়ে মিলিত হতো। সেখানে থেকে একটি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার

---

৬৬৮ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় মুক্তিবাহিনীর নৌ-সেক্টর পরিচালিত গেরিলা অপারেশন। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট পরিচালিত এই অপারেশনে চট্টগ্রাম, মংলাসহ দেশের বিভিন্ন নৌ বন্দরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন নৌযানে হামলা চালানো হয়। এই হামলায় নৌ-গেরিলাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় কমান্ডার এম এন সামানত।

সদস্যবৃন্দ তাদের নিয়ে যেত অন্যত্র। এই নির্বাচিত যুবকদের আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া এবং গোপনে অন্য কোনো ধরনের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা এতই সুপরিকল্পিত এবং বিস্তৃত ছিল যে, অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ বিমানে করে কঠোর নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার মাধ্যমে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হতো। তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানোর ব্যাপারেও ঐ সংস্থার সদস্যরা একই ধরনের অতি-গোপনীয়তা অবলম্বন করত। পরবর্তী সময়ে ওরা যেসব সেক্টরে অবস্থান নেবে সেসব সেক্টর কমান্ডারদের পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই জানতে দেওয়া হয়নি।

বিষয়টা যখন আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল, তখন আমরা এই ধরনের গোপন কার্যাবলি বন্ধ করার অনেক চেষ্টা করলাম। আমাদের বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট– যেহেতু এই যোদ্ধারা আমাদের সেক্টর এলাকাতেই বিভিন্ন তৎপরতায় লিপ্ত হবে, তাদের কর্মকাণ্ড আমাদের মূল পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বিত না হলে আমরা যেসব অভিযানের পরিকল্পনা করছিলাম, সেসব নস্যাৎ হয়ে যাবে। কিছুকিছু এলাকায় আমরা সামরিক অভিযান না চালাবারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কারণ সেই এলাকাসমূহে ছিল আমাদের অসংখ্য 'সেইফ্ বেইজ' বা গোপন আস্তানা। আমাদের শতশত গেরিলা আসা-যাওয়ার পথে সেখানে আশ্রয় নিত। কাজেই ঐসব এলাকায় কোনো তৎপরতা না চালালে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সেদিকে মনোযোগ দেবে না এবং আমাদের 'বেইজ'গুলো নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ঐ বিশেষ গোপন-বাহিনীর সদস্যরা এসব এলাকা এবং আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই জানত না। ফলে তারা ঐসব এলাকায় তাদের ইচ্ছেমতো তৎপরতা চালাত। অনেকক্ষেত্রে এগুলো ছিল নিজ দলের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, কখনো বা ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে। পরিণামে, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে সবাই সবকিছু জেনে ফেলত এবং সমস্ত এলাকা জুড়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের তল্লাশি অভিযান শুরু হয়ে যেত। তখন সেসব 'বেইজ' ব্যবহার করার আর কোনো উপায়ই থাকত না এবং ঐ 'বেইজ'সমূহ থেকে আমাদের সব যোদ্ধাই অন্যত্র সরে পড়তে বাধ্য হতো।

আমাদের মানবসম্পদ থেকে বাছাই করা কয়েকশ' বা কয়েক হাজার সদস্য দিয়ে এ ধরনের একটা বিশেষ গোপন বাহিনী গঠন করার ফলে আমরা পড়ে গেলাম মহাসমস্যায়। গেরিলা গ্রুপগুলোর নেতৃত্ব দেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় উপযুক্ত যোদ্ধা আর পাওয়া যাচ্ছিল না। যোগ্য নেতৃত্বদানের গুণাবলি থাকায় কি কোনো সরকার সব অফিসারদের দিয়েই একটা ডিভিশন তৈরি করবে, এবং বাকি পুরো সেনাবাহিনী চালানোর ভার ছেড়ে দেবে সুবেদার মেজর বা হাবিলদার মেজরদের ওপর? আমাদের গেরিলাবাহিনী গঠনে এ ধরনের ব্যাপারে ঘটেছিল। সেক্টর কমান্ডাররা সবাই এতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আর, এ ধরনের একটা বাহিনী এত লুকোচুরির মাধ্যমে গোপনে সৃষ্টি করার ফলে স্বভাবত আমরা সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ি। আমরা ভাবতে বাধ্য হলাম, কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো একটা ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারছে না। এই ধরনের একটা বিশেষ গোপনবাহিনী যেন না গড়া হয় সেজন্য কর্তৃপক্ষকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেও আমরা সফল হতে পারিনি। আবেগহীন, ঠান্ডা গলায় আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, 'এ ব্যাপারে নাক গলাবে না।' সেখানে নাক গলাবার অধিকার ছিল ভারত সরকারের কেবিনেট ডিভিশনের রিসার্চ এন্ড অ্যানালাইসিস্ উইং ('র')-এর। পরে জানতে পেরেছিলাম, আমাদের না জানিয়ে

গোপনে একটা ভিন্ন বাহিনী সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিল 'র'। তারাই ছিল এর মূল উদ্যোক্তা এবং এ ব্যাপারে তারা ভারতের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সমর্থন লাভ করেছিল।

'র'-এর পরিকল্পনায় নির্বাচিত তরুণ ও যুবকরা বিশেষ ধরনের ট্রেনিং, উন্নত ও আধুনিক অস্ত্র এবং যোগাযোগের অত্যাধুনিক এমন সব সরঞ্জামের সরবরাহ পেত যা আমাদের অনেকে কখনো দেখেনি। তাদের দেওয়া হতো বিস্তর সুযোগ সুবিধা। 'র'-এর পরিকল্পনা বাস্তবে ছিল এক ব্যর্থতার ইতিহাস এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক সর্বনাশী সিদ্ধান্ত। এ ধরনের গোপন পরিকল্পনার ফলে যুদ্ধের সময়েই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার এত বছর পরেও এর নেতিবাচক প্রভাব আমাদের রাজনৈতিক জীবনে এখনও বিদ্যমান। আগামী দিনগুলোতের এই পরিকল্পনা-উদ্ভূত সমস্যা এবং ভুল বোঝাবুঝির সহজ নিরসন হবে কি না এ ব্যাপারে কেউই নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারবে না।

এই বিশেষ বাহিনীর সবাই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আন্তরিক এবং উৎসর্গীকৃত প্রাণ, এ ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাদের দেশপ্রেম নিঃসন্দেহে প্রশ্নাতীত। বস্তুত, বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে এরাই ছিল মূলধারা। দেশপ্রেমের আদর্শে তারা ছিল উজ্জীবিত। বাংলাদেশের স্বার্থ এবং স্বাধীনতা তাদের কাছে ছিল সবার উর্ধ্বে। আমরা আপত্তি তুলেছিলাম অন্য কারণে– সেটা ছিল, এ ধরনের গোপন পরিকল্পনার মাধ্যমে অন্যেরা জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ আমাদের তরুণদের অপব্যবহার করতে পারবে। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের বিশাল মানবসম্পদের পুরোটাই সমন্বিতভাবে, একীভূত নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হোক, তার বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়– যুদ্ধের সময়ে, এমনকি যুদ্ধের পরেও নয়।

আমরা জানতে পেরেছিলাম, কিছু সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক বিবেচনাতেই এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছিল। তৎকালীন ছাত্রনেতা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি এ বিশেষ বাহিনী গঠনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হয়েছিল, যদিও এ ধরনের কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ সরকারের কোনো অনুমতি তার ছিল না। শেখ ফজলুল হক মণি বাংলাদেশ সরকারকে এই বাহিনী এবং তাদের গোপন তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই অবহিত করতেন না। অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারদের মতো আমিও এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাজউদ্দীন আহমদ এ বিষয়ে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করে আমাকে বাংলাদেশ বাহিনীর সিএনসি কর্নেল (অব.) এম. এ. জি. ওসমানীর সঙ্গে আলাপ করতে বলেন। আমি দেখলাম যে, কর্ণেল ওসমানীও বিষয়টি নিয়ে অসন্তুষ্ট। আমাদের সরকার বা ভারত সরকারের কাছ থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন।

প্রথমদিকে এ বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছিল 'বিএলএফ' (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স)। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ কিছুদিন পরেই এদের 'মুজিব বাহিনী' নামে অবহিত করতে শুরু করে। ভারতে মিজো এবং নাগা বিদ্রোহীদের নাশকতামূলক তৎপরতা প্রতিরোধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল উবানকে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিং দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা ভারতের গোপন সামরিক ঘাঁটিতে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ লাভ করে। এরপর ওদের দেওয়া হয় উন্নতমানের রেডিও যন্ত্রপাতি ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং তারপর গোপন কর্মতৎপরতা

চালানোর ব্রিফিং দিয়ে তাদের পাঠানো হয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে– যেসব 'মিশনের' বিস্তারিত তথ্য আমরা জানতে পারতাম না।

বাংলাদেশ সরকার, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের (আওয়ামী লীগ) সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমান্ডারগণ কেউই এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানতেন না। কী জন্য এই ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, বাংলাদেশের ভেতরে এসে তাদের কী ধরনের কাজ করতে বলা হয়েছে, এবং তারা যেসব অস্ত্র ও যোগাযোগ-যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে আসছে ঐ সমস্ত বিষয়ে কোনো কিছুই আমাদের জানানো হতো না। শুধু শেখ ফজলুল হক মণি এবং ভারত সরকারের অল্প কিছু লোক এই বাহিনী সম্পর্কে জানতেন– তাও পুরোটা নয়। আমরা শুধু এতটুকু জানতে পেরেছিলাম, এই বিশেষ বাহিনীর সদস্যদের এমনভাবে 'মোটিভেট' করা হয়েছে যে, ওদের আনুগত্য ছিল একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। যেহেতু শেখ মুজিব তখন পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি, তাই এই ধরনের আনুগত্যের অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল এই যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে কোনো এক পর্যায়ে তারা শেখ ফজলুল হক মণি'র কাছ থেকেই সমস্ত নির্দেশ নেবে এবং তাঁর আদেশ মেনে চলবে। এই সব তরুণ ও যুবকরা সবাই ছিল অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ এবং দেশপ্রেমিক। কিন্তু আমরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম যে, এরা সবাই 'রাজনীতির দাবা-খেলায়' গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা নিজেরাই যে পুরো ব্যাপারটায় সন্তুষ্ট ছিল, তা-ও নয়। ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কর্মরত ভারতীয় অন্যান্য সংস্থা ও বাহিনীসমূহের সবাই বিএলএফ বাহিনীর গঠন এবং এদের কার্যক্রমে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু আমরা সবাই ছিলাম অত্যন্ত অসহায়।

এই বাহিনীর সদস্যরা কখন, কোথায় কী ধরনের কাজ করবে এটা আমরা কেউই জানতাম না। তবে আমরা অনুভব করছিলাম, তাদের কার্যকলাপ এবং ভূমিকা সম্পর্কে সবার মনে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তার নিরসন অত্যন্ত প্রয়োজন। সার্বিক যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জড়িত সবাই জানতে চাইছিল, বিএলএফ কী ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে এবং সেটা তারা কীভাবে বাস্তবায়িত করবে। আমরা আরও বলতে চেয়েছিলাম, আমাদের জাতির চরম দুঃসময়ে ভারত পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কোনোদিন ভুলে যাওয়ার মতো নয়। ভারত এবং ভারতের জনগণ আমাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় যে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করেছে সেজন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ। এই বাহিনী সম্পর্কে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝি নিরসনের মাধ্যমে আমাদের দু'দেশের মধ্যে সে সম্পর্ক আরো দৃঢ় ও শক্তিশালী করা যায়।

কিন্তু কার্যত 'র'-এর এই পরিকল্পনার মাধ্যমে অদৃশ্য এবং কাল্পনিক কোনো এক শক্তির বিরুদ্ধে নতুন একটা ফ্রন্ট খোলা হলো। রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সেই চিরাচরিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল আবার। কিন্তু পরিকল্পনা প্রণেতারা কি তা বুঝতে পারছিলেন না যে, রাজনীতির এই সব জটিলতা নিয়ে ঐ সময় জনগণের কোনো উৎসাহ ছিল না। যুদ্ধের ঐ দিনগুলোতে আমাদের জনগণ পাকিস্তানিদের নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে শুধু তাই নিয়ে চিন্তিত ছিল। জনগণকে সেই নির্যাতনের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা করে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা যায়– সেই লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করাই ছিল আমাদের জন্য

সেই মুহূর্তের প্রধান কাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক বিবেচনাসমূহ তখন হঠাৎ করে ততধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল অনেকের কাছে এবং সে কারণেই আমাদের বিশাল জনশক্তির একটা বড় অংশ এই বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলার জন্য অপব্যবহৃত হয়। অথচ সে সময় এ বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে কোনো বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। কারণ, ওরা ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল প্রথম থেকে।

১৯৭১ সালের ২৯ আগস্ট ভারতে এ ধরনের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের জন্য উচ্চ পর্যায়ের এক 'কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। বিএলএফ বাহিনী সৃষ্টির ব্যাপারে জনাব তাজউদ্দীন আহমদের অনুমোদন ছিল না বিধায় এ নিয়ে বেশ উত্তেজিত আলোচনা হয়। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রতিনিধি মি. ডি. পি. ধর তাঁর স্বভাব-সুলভ কূটনৈতিক চালে বিতর্কিত ইস্যুতে বিস্তারিত সব আলোচনাই এড়িয়ে যান। তিনি বরং যুক্তি দিয়ে এটা বুঝাতে চাইলেন, এই বিশেষ বাহিনীর ব্যাপারে এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি অত্যন্ত দুঃখজনক। 'ওরা আপনাদেরই সন্তান এবং একই মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে। আমরা বিশেষ কতগুলো অভিযানের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি মাত্র', মি. ধর বললেন। এভাবে বিশেষ এই বাহিনী সম্পর্কে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত ছাড়াই ঐ 'কনফারেন্স' শেষ হয়ে যায়। তবে 'র'-এর পরিকল্পনার অধীনে বিশেষ বাহিনী গড়ার প্রক্রিয়া পুরাপুরি বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশের সরকার কোনোমতে সম্মানজনক একটা আপস ফর্মুলায় রাজি হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, বিশেষ বাহিনীর এসব সদস্যরা যখনই কোনো একটা সেক্টরে অপারেশনের জন্য যাবে তখন নিজেদের কর্মতৎপরতা ও গতিবিধি সংক্রান্ত সব ব্যাপার ওরা সেক্টর-কমান্ডারদের অবহিত করবে। নিঃসন্দেহে মি. ডি. পি. ধরের জন্য এটা এক ধরনের কূটনৈতিক সাফল্য। কারণ, এ ধরনের সম্মতি আদায় করতে পেরে বাস্তবে এই বিশেষ গোপন বাহিনীর ব্যাপারে তিনি বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতিই আদায় করে নিলেন। অবশ্য এটা ছাড়া সে সময়কার *বিপাকে-পড়া* বাংলাদেশ সরকার আর বেশি কিছু করতেও পারত না। (সংক্ষেপিত)

---

* বিস্তারিত দেখুন, রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৬। এখানে মূল লেখাকে সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে।

দুই

'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' একটা পর্যালোচনা

আ ফ ম মাহবুবুল হক[৬৬৯]

মুজিব বাহিনীর অন্যতম সংগঠক; আহ্বায়ক, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স বা বিএলএফ-কে বাদ দিলে বা তার রাজনৈতিক, আদর্শিক, সামরিক ভূমিকাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে পুরো পর্যালোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। '৭১-এর নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে যারা বিএলএফ সংগঠনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা দীর্ঘদিন থেকে ধারবাহিকভাবে গড়ে ওঠা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃস্থানীয় সংগঠন ও নিরলস আদর্শবাদী কর্মী হিসেবেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। বিএলএফ-এর প্রধান চার জন নেতা তথা সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ ষাটের দশক থেকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিলেন। যে রাজনৈতিক সংগঠন ও ছাত্র সংগঠনে তারা নেতৃত্ব প্রদান করেছেন সেই সংগঠন তথা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে কিছুটা উপলব্ধি না করলে বিএলএফ-কে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হবে না।

ষাটের দশক থেকে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে দুটো ধারা সক্রিয়ভাবে কাজ কারছে। একটি ছিল– পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। আরেকটি ধারা হলো, পাকিস্তানি প্রায়-উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ধারা; '৬৪ সাল থেকেই যাদের কার্যক্রমের শুরু। পরে এ দুটো ধারা রব-সিরাজ গ্রুপ ও মাখন-সিদ্দিকী গ্রুপ নামে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে নিহিত ও পরিচিত ছিল। রব-সিরাজ গ্রুপের শ্লোগান ছিল, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো,' '৬ ও ১১ দফা, না এক দফা'– এক দফা, এক দফা', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' ইত্যাদি। আর সিদ্দিকী-মাখন গ্রুপের ছিল 'বাঁশের লাঠি তৈরি করো, পাতি বিপ্লবী খতম করো' ইত্যাদি বক্তব্যের মাধ্যমে পাকিস্তানে বাঙালিরাজ প্রতিষ্ঠার শ্লোগান।

আপসহীন স্বাধীনতার পক্ষের ধারায় যারা যুক্ত ছিলেন তাঁরা '৭০-এর নির্বাচনের সময় বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে 'জয়বাংলা' পত্রিকা নিয়ে ও স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য প্রদান করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিরাগভাজনও হন। ঐ সময়ে কয়েক মাসের জন্য

---

৬৬৯ আ ফ ম মাহবুবুল হক জাসদ গঠনকালে অন্যতম মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। পরবর্তীকালে জাসদ ভেঙে বাসদ গঠনে নেতৃত্ব দেন। বর্তমানে স্থায়ীভাবে কানাডায় অবস্থান করছেন। তার এই লেখাটি সংগৃহীত হয়েছে *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা*, সম্পাদনা : মেসবাহ কামাল, গণপ্রকাশনী, ২০০১, ঢাকা, পৃ. ২৬০-২৬৫ থেকে।

আমাকেও সিরাজগঞ্জের প্রতিটি থানায় দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রার্থীদের সঙ্গে বিতর্কও করতে হয়েছিল।

'৭১-এর ১ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক শাসক কর্তৃক জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত ঘোষণা, ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে তৎকালীন ডাকসু ভিপি আ স ম রব কর্তৃক স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে তৎকালীন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ কর্তৃক স্বাধীন বাংলা ছাত্র সমাজের পক্ষে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, ৭ মার্চে রেসকোর্সে শেখ মুজিবের ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের নির্মম সামরিক হত্যাযজ্ঞের পর ২৭ মার্চ মেজর জিয়া কর্তৃক শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে 'স্বাধীনতার ঘোষণা'– সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার আহ্বান ইত্যাদি বাংলাদেশের জনগণকে দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মাওলানা ভাসানী ও সিরাজ সিকদারের অবদানও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রণিধানযোগ্য।

'৭১-এর ২৫ মার্চের পর ঢাকাসহ সারা দেশে পর্যায়ক্রমে পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে বাঙালিদের জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতার চেতনাকে যখন ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন বীর বাঙালি ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, সিপাহী জনতা যার যা শক্তি আছে তাই নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। '৭০ সালের আগস্টে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' গঠনের প্রস্তাবে আমরা যারা পক্ষে ছিলাম, তারা এই প্রতিরোধ যুদ্ধে দেশের ভিতরে ও বাইরে থেকে সর্বাত্মকভাবে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকা থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লাম। ঢাকা, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে দেওয়া নির্ধারিত দায়িত্ব পালন শেষে আমরা যারা ঢাকার জিঞ্জিরায় ফিরে এলাম, আমাদের বলা হলো নিজেদের দায়িত্বে কলকাতায় গিয়ে সামরিক ও অন্যান্য কাজে প্রশিক্ষণ নেয়ার লক্ষ্যে নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। ঢাকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের দিকে যাওয়ার পথে ফরিদপুরে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনিও একই কথা বললেন। দর্শনা দিয়ে ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে ট্রেনে যখন উঠলাম, কলকাতাগামী ট্রেনের কামরায় এক ভদ্রলোক আমাদের বললেন, 'কংগ্রেস ও ইন্দিরাজী পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের যেভাবে নির্মম উপায়ে দমন করছে, তারা আপনাদের 'জয়বাংলা'র সংগ্রামকে নিঃস্বার্থভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করবে, তা আশা করেন কীভাবে? সময়ই আপনাদের বলে দেবে ভারতের শাসক শ্রেণি আপনাদের সংগ্রামে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য কী। ভারতের মাটিতে প্রথমেই এ অভিজ্ঞতা আমাদেরকে আরেকটু সজাগ ও সচেতন করার ক্ষেত্রে বাস্তব ভূমিকা পালন করল। কলকাতায় গিয়ে নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে আসা আওয়ামী নেতাদের মন্তব্য, বক্তব্য ও আর্তচিৎকার শুনে হতচকিত হয়ে গেলাম। তাদের অনেকের বক্তব্য ছিল- 'ছাত্রদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ানো ও পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানোর কারণেই আজকে আমাদের কলকাতায় আসতে হলো।'

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার সংগ্রাম গড়ে তোলার 'নিউক্লিয়াস' নামে যে অংশটি পরিচিত ছিল, যাঁর প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক, এর

সঙ্গে শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদকে যুক্ত করা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে তোলা ও শেখ মুজিবর রহমানের কাছে একে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে। উপরোক্ত নেতাদের নেতৃত্বে বিএলএফ গড়ে ওঠে– প্রচলিত স্বাধীনতা যুদ্ধের বাহিনী অর্থাৎ এফএফ-এর পাশাপাশি একটি দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে ব্যাপক জনগণকে রাজনৈতিক, আদর্শিক ও সাংগঠনিকভাবে যুক্ত করে পরিপূর্ণ মুক্তিসংগ্রামে পরিণত করার লক্ষ্যে। দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির মাধ্যমে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট ও তার আওতায় রাজনৈতিক দলসমূহ, সিপাহী, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, জনতাকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে শরিক করার কাজটি না হওয়ায় আধাখেঁচড়া অবস্থায় এফএফ-এর মাধ্যমে যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন–তাদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ও নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত করা ও ব্যাপক জনগণকে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে রাজনৈতিক, নৈতিক, আদর্শিক ও সাংগঠনিকভাবে যুক্ত করে, প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করে জনগণের মুক্তির সংগ্রামকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই প্রধানত পরিপূরক ও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যভিত্তিক সংগঠন হিসেবে বিএলএফ-কে গড়ে তোলা হয়।

'৭০-এর নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে আওয়ামী লীগের বৃহৎ ভারী শিল্প জাতীয়করণসহ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি থাকলেও আওয়ামী লীগ শ্রেণিগত দার্শনিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সমাজতন্ত্রী, এমনকি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সংগঠনও ছিল না। বাঙালি উঠতি বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের স্বার্থ রক্ষাকারী সংগঠন হিসেবেই আওয়ামী লীগের উৎপত্তি ও বিকাশ। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন রব-সিরাজ গ্রুপ 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার ধারায় শ্রমিক-কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিটি তাঁদের কাছে স্বচ্ছ ছিল না। এঁরা বাস্তব সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় প্রথমে র‍্যাডিক্যাল পেটিবুর্জোয়া চিন্তাধারা ও পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী তথা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ধারায় পরিবর্তিত ও তৎপরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী চিন্তাভাবনা দ্বারা সাধারণভাবে প্রভাবিত হলেও দার্শনিক, রাজনৈতিক, আদর্শিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিকভাবে সব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের চিন্তাধারা দ্বারা পরিচালিত হতে পারেনি।

উপরোক্ত দুটো ধারার সংমিশ্রণে বিএলএফ গঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক দার্শনিক ভিত্তি একক ও স্পষ্টভাবে কখনো বিবৃত ও বিধৃত হয়নি। বিএলএফ-এর প্রথম ব্যাচ হিসেবে আমাদের সামনে বক্তব্য তুলে ধরা হলো– '৬২-এর চীন-ভারত যুদ্ধের পর্যুদস্ত অবস্থা থেকে উন্নীত হয়ে ভারত এই অঞ্চলের সামরিক শক্তি হিসেবে আস্থাযোগ্য অবস্থায় এসে পুনরায় দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধবিরোধী পরাশক্তিদের মোকাবেলা করে এ যুদ্ধে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করা ও তাকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া তার জন্য অসুবিধাজনক নয়। আমরা যারা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছি, তাদের যেমন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে, তেমনি কমিউনিস্টদেরও মোকাবিলা করতে হবে।'

আমরা কমিউনিস্ট মতাদর্শে তখনও পুরোপুরি পরিচালিত না হলেও কমিউনিস্ট বিরোধী তো নইই। এমতাবস্থায় মতাদর্শগতভাবে বিএলএফ-এর ভারতীয় প্রশিক্ষকদের ঘোষিত অবস্থান জেনে তার বিরোধিতা করতে না পারলেও আমরা নিজেরা দৃঢ়ভাবে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলাম যে, সামরিক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের মতাদর্শানুযায়ী

আমাদের দেশে আমরাই তো কাজ করবো, সুতরাং ভবিষ্যতে আমাদের স্বার্থে এ সংগঠনকে আমরাই পরিচালনা করবো। প্রথম ব্যাচের ট্রেনিং সমাপ্তির পর বিএলএফ-এর ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণের প্রশাসনিক দায়িত্ব হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়াসহ আমাদের হাতে এল। আমরা স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলাম বিধায় চতুর্দশ-পঞ্চদশ ব্যাচ পর্যন্ত যারা ভারতীয় প্রশিক্ষক ও আমাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল তারা মূলত আমাদের মতাদর্শ দ্বারাই প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়েছিল।

আমাদের তখন পাঠ্য ছিল চে'গুয়েভারা, নগুয়েন গিয়াপ, মাও সে তুঙ-এর গেরিলা যুদ্ধের ওপর লিখিত বক্তব্যসমূহ। এসব গেরিলা মিলিটারি স্ট্রাটেজিস্টদের বক্তব্যও আমাদের মতাদর্শের কাজকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছে। বিএলএফ-এর যে প্রধান চারটি সেক্টর ছিল তা নিম্নরূপ–

১. কেন্দ্রীয় সেক্টর। এলাকা : বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ। সেক্টর প্রধান : আবদুর রাজ্জাক, উপ-প্রধান : সৈয়দ মাহমুদ।[৬৭০]

২. পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টর। এলাকা : পার্বত্য চট্টগ্রাম, বৃহত্তর চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, নোয়াখালী ও ঢাকার কিছু অংশ। সেক্টর প্রধান ঃ শেখ ফজলুল হক মণি। উপ-প্রধান আ স ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন।

৩. দক্ষিণাঞ্চলীয় সেক্টর। এলাকা : বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী। সেক্টর প্রধান : তোফায়েল আহমেদ, উপ-প্রধান ঃ কাজী আরেফ আহমেদ।

৪. উত্তরাঞ্চলীয় সেক্টর। এলাকা : বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী। সেক্টর প্রধান : সিরাজুল আলম খান। উপ-প্রধান : মনিরুল ইসলাম।

বিভিন্ন সেক্টরে নেতৃত্বের বিন্যাস ও পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার প্রভাবের বৃদ্ধিও প্রমাণ করে বিএলএফ নেতৃত্বের বাস্তব অবস্থানের কারণেই সংগঠনটির প্রধান অংশ বলতে গেলে প্রায় পুরোটাই প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ব্যাচ প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর যখন দেশে ফিরে যেত তখন তাদের সামনে যে বক্তব্য, লক্ষ্য ও শ্লোগান তুলে ধরা হতো তাও ছিল দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-জনতাকে একাত্ম করে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ তথা জনযুদ্ধ সম্পর্কিত। তখন শ্লোগান ছিল 'মুজিববাদ'; যার ব্যাখ্যা ছিল এ রকম- 'শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে শ্রমিকরাজ-কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠাই হবে *মুজিববাদ*।' এই বক্তব্যে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকলেও তখনকার বাস্তবতায় এই বক্তব্য যুক্তিযুক্ত ছিল।

আমরা যারা বিএলএফ ক্যাম্পের প্রশাসনিক-রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলাম তারা শারীরিক-সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রাজনৈতিক আলোচনার সুযোগ পেলেই অংশ নিতাম এবং আমাদের দেশের মুক্তিসংগ্রামীদের সর্বদিক থেকে তৈরি করে দেশে পাঠিয়ে মুক্তিসংগ্রামকে পরিপূর্ণ রূপের দিকে নিয়ে যেতে নিরলসভাবে চেষ্টা চালাতাম। একবার নারায়ণগঞ্জ জেলার এক গ্রুপ রাজনৈতিক আলোচনা শুনে সারা রাত কেঁদেই অস্থির। তাদের বক্তব্য, আমরা তো যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে এসেছি, কিন্তু রাজনৈতিক-

---

[৬৭০] মূল লেখায় সৈয়দ মাহমুদ থাকলেও আসলে নামটি হবে সৈয়দ আহমদ।

আদর্শিক যে আলোচনা শুনছি সমাজতন্ত্র ও গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে, তা বাস্তবায়িত হলে আমাদের শিল্প, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, দুর্নীতি, চুরি, লুটপাট, এসবের কী হবে? এই গ্রুপ পরবর্তীকালে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় শেখ কামালের প্রাইভেট বাহিনীতে যুক্ত হয়ে যেসব অপকর্ম করেছিল, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

আমাদের রাজনৈতিক-আদর্শিক বিষয়বস্তু এক পর্যায়ে ভারতীয় সামরিক প্রশিক্ষকদের গোচরীভূত হয়। আমাদের প্রশিক্ষকদের সবাইকে ডেকে নিয়ে এসেম্বলী হলে একত্রিত করা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলো, বিএলএফ-এর যোদ্ধাদের নাকি কমিউনিস্ট বানানো হচ্ছে– যা কেন্দ্রীয় ভারতীয় সরকারের নীতিবিরুদ্ধ। সেই যাত্রায় মাও সেতুঙ-এর একটি উদ্ধৃতি ও ওখানকার প্রশিক্ষকদের একটা উদ্ধৃতি বলে রক্ষা পেলাম। মাও সেতুঙ-এর উদ্ধৃতিটি ছিল : বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধে অস্ত্র যুদ্ধ করে না, অস্ত্রের পিছনে যে মানুষটি ও মানুষের পেছনে যে আদর্শটি– তাই যুদ্ধ করে; সুতরাং আদর্শ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কায়েম করতে হলে রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়া বিকল্প নেই। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি ছিল : একজন কনভেনশনাল যোদ্ধা হবে রাফ, টাফ ও ফুল এবং একজন গেরিলা যোদ্ধা রাফ, টাফ ও ইন্টেলিজেন্ট; অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হওয়ার লক্ষ্যে তাকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের তৎকালীন ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের যে অংশটি বিএলএফ-এর মাধ্যমে তান্দুয়া ও হাফলঙে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তারাও সারা দেশে সবসময়ে প্রতিটি সংগ্রামের মধ্যে প্রধানত যে দুটো ধারা থাকে, তার থেকে কোনোক্রমে আলাদা ছিল না। একটি অংশ সুবিধাভোগী, সুবিধাবাদী ও আপসকামী; আরেকটি অংশ নিঃস্বার্থ, আদর্শবাদী ও আপসহীন।

নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে রাজনৈতিক-ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করা গেলেও প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ার আগেই ভারতের কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী এবং বাংলাদেশের উঠতি ধনিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী গোষ্ঠীর পারস্পরিক স্বার্থে তার দফারফা হয়ে যায়। মাও একবার চীনের বিপ্লবী যোদ্ধাদের ক্ষমতা দখলের অস্থিরতা দেখে বলেছিলেন, দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী যুদ্ধ জনগণের সঙ্গে একাত্মতার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী যোদ্ধাদের প্রকৃতই বিপ্লবী করে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামও একটা দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হলে বিএলএফসহ প্রকৃত যোদ্ধাদের সংগঠনসমূহ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে একত্রা হতো, সকল শোষণ-শাসন থেকে বাঙালি জাতি ও মেহনতী জনগণকে মুক্ত করার ঐতিহাসিক কাজটির সূচনা ঘটাত। বিএলএফ সেই মুক্তিসংগ্রামে অবগাহন করে প্রকৃত শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের জন্ম দিত।

আধাখেঁচড়া স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রাম আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে অপূর্ণ করে রাখল। সুবিধাবাদী, সুবিধাভোগী, আপসকামী বিএলএফ-এর যে ক্ষুদ্র অংশটি ক্ষমতায় ও ক্ষমতার বাইরে থেকে প্রতিক্রিয়াশীল লুটেরা ভূমিকা পালন করেছে, তা-ই 'বিএলএফ' নয়। বিএলএফ-এর প্রায় পুরো অংশটাই এখনও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম তথা বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পতাকাতলে জাসদ-বাসদ নামে সক্রিয়ভাবে লাগাতার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে চলছে। জনগণের বিজয় অবশ্যম্ভাবীভাবে জনগণই ছিনিয়ে আনবে। তৎকালীন বিএলএফ ও পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীরা ইতিহাস নির্দিষ্ট সত্য ও ন্যায়ের পথে মেহনতী জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভূমিকা রেখে যাবেন।

গেজেটে প্রকাশিত রক্ষীবাহিনী সম্পর্কিত প্রথম আইন[৬৭১]

Government of the Peoples Republic of Bangladesh

Ministry of Law and Parliamentary Affairs

(Law Division)

President's Order No. 21 of 1972

The Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972.

Whereas it is expedient to provide for the Constitution of Jatiya Rakkhi Bahini and matters ancillary thereto;

Now, Therefore, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased make the following Order : -

1. (*1*) This Order may be called the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972.

(*2*) It extends to the whole of Bangladesh.

(*3*) It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on the first day of February, 1972.

2. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(*a*) "Bahini" means the Jatiya Rakkhi Bahini constituted under this Order;

(*b*) "Commanding Officer" means an officer commanding a unit or a body of Rakkhis;

(*c*) "Director" means the Director of the Bahini appointed under Article 5;

(d) "Government" means the Government of the People's Republic of Bangladesh;

(e) "Officer" means a superior officer or a subordinate officer;

(f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Order;

(g) "Rakkhi" means a member of the Bahini other than an officer;

(h) "subordinate officer" means such officer as may be prescribed;

---

[৬৭১] Published in the *Bangladesh Gazette*, Extraordinary, dated 8th March, 1972.

(i) "superior officer" means the Director and such other officer as may be
prescribed;
(j) "unit" means a unit of the Bahini.

3. Every person appointed or enrolled under this Order shall be subject to this Order wherever he may be and shall remain so subject until his discharge in accordance with the provisions of this Order.

4. (*1*) There shall be raised and maintained in accordance with the provisions of this Order a Bahini to be called the Jatiya Rakkhi Bahini.

(*2*) The Bahini shall consist of such number and classes of officers and Rakkhis and shall be constituted in such manner as the Government may from time to time direct.

5. (*1*) The Government shall appoint a Director of the Bahini and may appoint such other officers as it may deem fit.

(*2*) The Director and the other officers shall be appointed in such manner, for such period and on such terms and conditions as may be prescribed.

(*3*) The Director and the other officers shall possess, and may exercise, such powers and authority over their subordinate officers and the Rakkhis for the time being under their command as is provided by or under this Order.

6. The Rakkhis shall be enrolled in such manner, for such period and on such terms and conditions as may be prescribed.

7. The superintendence of the Bahini shall vest in the Government and the Bahini shall be administered, commanded and controlled by the Director in accordance with the provisions of this Order and any rules made there under and such orders and instructions as may be made or issued by the Government from time to time.

8. (*1*) The Bahini shall be employed for the purpose of assisting the civil authority in the maintenance of internal security when required by such authority as may be prescribed.

(*2*) The Bahini shall render assistance to the Armed Forces when called upon by the Government to do so in such circumstances and in such manner as may be prescribed.

(*3*) The Bahini shall perform such other functions as the Government may direct.

9. It shall be the duty of every officer or Rakkhi promptly to obey and execute all orders and warrants lawfully issued to him by any competent authority and to apprehend all persons whom he is legally authorised to apprehend and for whose apprehension sufficient grounds exist and deliver such persons to the custody of the police.

10. Every person subject to this Order shall be entitled to receive his discharge from the Bahini on the expiration of the period for which he was appointed or enrolled and may, before the expiration of that period, be discharged from the Bahini by the Government, Director or such other officer and subject to such conditions as may be prescribed.

11. (*1*) Subject to such rules as the Government may make under this Order, the Director may, at any time, award any one or more of the following punishments to any subordinate officer or Rakkhi whom he finds to be guilty of disobedience, neglect of duty or remissness in the discharge of any duty, or of rendering himself unfit to discharge his duty, or of other misconduct in his capacity as a subordinate officer or Rakkhi, namely :-

(*a*) dismissal from service;
(*b*) removal from service;
(*c*) compulsory retirement;
(*d*) reduction in rank or grade;
(*e*) stoppage of promotion;
(*f*) forfeiture of seniority of not more than one year;
(*g*) forfeiture of pay and allowances for not exceeding twenty-eight days;
(*h*) forfeiture of increment in pay;
(*i*) fine to any amount not exceeding one month's pay;
(*j*) confinement to quarter-guard for a term not exceeding twenty-eight days;
(*k*) severe reprimand;
(*l*) reprimand;
(*m*) extra guard, picquets, patrol or fatigue;
(*n*) confinement to Lines for a term not exceeding one month, with or without
drill, extra guard, fatigue or other duty.

(*2*) The Director may place under suspension any subordinate officer or Rakkhi against whom action under clause (*1*) is required to be taken or against whom any investigation or inquiry is required to be made.

(3) Notwithstanding anything contained in clause (1), no subordinate officer or Rakkhi shall be awarded any punishment under this Article unless he has been given an opportunity of being heard.

(4) Any subordinate officer or Rakkhi aggrieved by any action taken under sub-clauses (a) to (i) of clause (1) may prefer an appeal to the prescribed authority in the prescribed manner.

12. Any person subject to this Order who deserts or attempts to desert the Bahini shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

13. Whenever any person subject to this Order deserts, his Commanding Officer shall give written information of the desertion to such civil authorities as in his opinion may be able to afford assistance towards the capture of the deserter and such authorities shall thereupon take steps for apprehension of the said deserter in like manner as if he were a person for whose apprehension a warrant had been issued by a Magistrate, and shall deliver the deserter, when apprehended, to the custody of the Bahini.

14. No person subject to this order shall be at liberty to resign his appointment or to withdraw himself from all or any of the duties of his appointment, without the sanction of the Commanding Officer with whom he is serving or of some other officer authorised by the Commanding Officer to grant such sanction.

15. Any person subject to this Order who is guilty of any violation of duty or willful breach or neglect of any rule or lawful order made by any competent authority, or who resigns his appointment or withdraws himself from all or any of the duties of his appointment in contravention of the provision of Article 14, or who, being absent on leave, fails, without reasonable cause, to report himself for duty on the expiration of such leave, or who is guilty of cowardice, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

16. The Director may delegate, to such extent and in respect of such subordinate officer or Rakkhi as he may think fit, the powers conferred upon him by any provision of this Order to any superior officer.

17. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Order.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may-

(a) prescribe the period for which and the manner in which persons may be appointed as officers or enrolled as Rakkhis;
(b) prescribe the training of officers and Rakkhis;
(c) prescribe the discharge of officers and Rakkhis;
(d) prescribe the terms and conditions of service of officers and Rakkhis ;
(e) regulate the powers and functions of the Director and other officers;
(f) regulate the classes of officers and Rakkhis;
(g) provide for any other matter necessary for the constitution, maintenance, administration, command, control and discipline of the Bahini and for carrying the provisions of this Order into effect.

Abu Sayeed Chowdhury
President of the Peoples Republic of Bangladesh

Azimuddin Ahmed
Deputy Secretary

Dacca;
The 7th March, 1972

রক্ষীবাহিনী আইনের প্রথম সংশোধনীর গেজেট

The Bangladesh Gazette
Extraordinary

Published by Authority
Monday, October 22, 1973
PART IIIA- Ordinance and Orders promulgated by the President of the Peoples Republic of Bangladesh.

Government of the Peoples Republic of Bangladesh
Ministry of Law and Parliamentary Affairs
(Law Division)

NOTIFICATION

no.684-Pub- 22nd October 1973-The following Ordinance made by the President of the Peoples Republic of Bangladesh on the 18th October, 1973 is hereby published for general information :

Government of the Peoples Republic of Bangladesh
Ministry of Law and Parliamentary Affairs
(Law Division)

The Jatiya Rakkhi Bahini (Amendment) Ordinance, 1973
Ordinance No.XXI of 1973

AN ORDINANCE
to amend the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972

Whereas it is expedient to amend the Jatiya Rakkhi Bahini Order 1972 (P.O. No. 21 of 1972), for the purposes hereinafter appearing;

AND WHEREAS, Parliament is not in session and the president is satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (I) of Article 93 of the constitution of the Peoples Republic of Bangladesh, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance :-

1. Short title and commencement-(I) This Ordinance may be called The Jatiya Rakkhi Bahini (Amendment) Ordinance, 1973.

(2) It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on the first day of February, 1972.

2. Insertion of the new Article 8A, P.O. No. 21 of 1972- In the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972 (P.O. No. 21 of 1972), hereafter referred to as the said Order, after Article 8, the following new Article 8A shall be inserted, namely :-

"8A. (I) Notwithstanding anything contained in the Code of criminal Procedure, 1898 (V of 1898), or in any other law for the time being in force, any officer may, while performing any function under Article 8, without warrant,-

(a) arrest any person whom he reasonably suspects of having committed a cognizable offence under any law;

(b) search any person, place, vehicle or vessel, and seize anything found in the possession of such person or in such place, vehicle or vessel in respect of which or by means of which he has reason to believe an offence punishable under any law has been committed.

(2) Any person arrested or anything seized under clause (I) shall forth with be, forwarded, together with a report of the circumstances nearest police station for taking such measures as may be necessary for the disposal according to law of such person or thing.

(3) The provisions of the Code of criminal Procedure, 1898 (V of 1898), shall apply, in so par as they are not inconsistent with the provisions of this Article, to all arrests, searches and seizures made under this Article."

3. Insertion of new Article 16A, P.O. No. 21 of 1972- In the said order after Article 16, the following new Article 16A shall be inserted, namely :-

"16A. No suit, prosecution or other legal proceeding shall be against any member of the bahini for anything which is in good faith done or intended to done in pursuance of this Order or any rule made there under."

Abu Sayeed Chowdhury
President of the Peoples Republic of Bangladesh

Justice M.H. Rahaman
Secretary

Dacca;
The 18th October, 1973

রক্ষীবাহিনী আইনের দ্বিতীয় সংশোধনী

Registered No. DA-1

The Bangladesh Gazette

Extraordinary

Published by Authority

Thursday, July 17, 1975

Part V- Acts, Bills, etc., of the Bangladesh Parliament

Bangladesh Parliament

Dacca, the 17th July, 1975

The following Acts of Parliament received the assent of the President on the 17th July, 1975, and are hereby published for general information.

Act No. XVIII of 1975

As Act further to amend the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972

WHERE it is expedient further to amend the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972 (P.O. No 21 of 1972) for the purposes hereinafter applicable;

It is hereby enacted as follows :

1. **Short title** : This Act may be called the Jatiya Rakkhi Bahini (Amendment) Act, 1975.
2. **Substitution of Article 2, P.O. No. 21 of 1972-** In the Jatiya Rakkhi Bahini Order 1972 (P.O. No 21 of 1972), hereinafter referred to as the said order, for the Article 2 the following shall be substituted, namely :

   "2 (I) In this order, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

   (a) "Bahini" means the Jatiya Rakkhi Bahini constituted under Article 4 of this order

   (b) "Battalion" means a Unit composed of several companies, forming part of or attached to a zone;

   (c) "commanding officer" means an officer commanding a Unit or a body of Rakkhis;

   (d) "Company" means a sub-unit composed of several platoons;

(e) "Director-General" means the Director-General of the Bahini appointed under Article 5

(f) "misconduct" means conduct prejudicial to good order or service discipline or unbecoming of an officer of gentleman and includes any act, commission or omission which is an offence under Article 10A or 10B;

(g) "officer" means a superior officer or a subordinate officer;

(h) "platoon" means a sub-unit consisting of three sections of Rakkhi

(i) "prescribed" means prescribed by rules made under this order

(j) "Rakkhi" means a member of the Bahini other than an officer;

(k) "Regiment" means a signal unit composed of several companies.

(l) "Special Court" means a Court consisting of not less than two superior officers constituted by the Director-General and presided over by an officer not below the rank of Deputy Director and assisted by a public prosecutor or his representative;

(m) "Special Summary Court" means a Court consisting of not less than two superior officers or one superior officer and one subordinate officer constituted by the Director-General and presided over by an officer not below the rank of Assistant Director;

(n) "subordinate officer" means a Senior Deputy Leader, Deputy Leader, Assistant Leader or Junior Leader;

(o) "superior officer" means the Director-General, Joint Director, Deputy Director, Assistant Director, Leader, Chief Medical Officer, Medical Officer, Dental Officer or Nursing Officer, and when used in relation to a subordinate officer or Rakkhi includes any officer who is senior to him in rank or length of service;

(p) "unit" means a unit of the Bahini;

(q) "Zone" means a formation composed of two or more Units

(2) The expressions "assault", "criminal force", "fraudulently", "reason", "to believe" and "voluntarily causing hurt" shall have the meanings respectively assigned to them in the penal Code (XLV of 1860)."

3. **Amendment of Article 4, P.O. No. 21 of 1972-** In the said order, in Article 4, after clause (2), the following new clause shall be added, namely :

"(3) The Bahini shall be disciplined force within the meaning of the definition of "disciplined force" as given in article 152(1) of the constitution."

4. **Substitution of Article 5, P.O. No. 21 of 1972-** In the said order, for Article 5 the following shall be substituted, namely :

"5 (1) There shall be a Director-General of the Bahini and may be all or any of the following classes of superior officers of the Bahini, namely :

(a) Joint Director
(b) Deputy Director
(c) Assistant Director
(d) Leader
(e) Chief Medical Officer
(f) Medical Officer
(g) Dental Officer
(h) Nursing Officer

(2) There may be all or any of the following classes of subordinate officers of the Bahini, namely :

(a) Senior Deputy Leader
(b) Deputy Leader
(c) Assistant Leader
(d) Junior Leader

(3) The Director-General and other superior officers shall be appointed by the Government, and the subordinate officers shall be appointed by the Director-General, in such manner and on such terms and condition as may be prescribed.

(4) The Director-General and other superior officers shall have, and may exercise such powers and authority over the officers subordinate to them and the Rakkhis for the time being under their command as are provided by or under this order."

5. **Amendment of Article 7, P.O. No. 21 of 1972.-** In the said Order, in Article 7, for the word "Director" the word "Director-General" shall be substituted.

6. **Amendment of Article 10, P.O. No. 21 of 1972.-** In the said Order, in Article 10, for the word "Director-General" shall be substituted.

7. **Insertion of new article 10A and 10B, P.O. No. 21 of 1972.-** In the said Order, after Article 10, the following new Articles shall be inserted, namely :

"10A (1) An officer, other than the Director-General, or a Rakkhi who-

(a) begins, excites, causes or joins in any mutiny or sedition or, being present at any mutiny or sedition, does not make his utmost

endeavors to suppress it, or, knowing, or having reason to believe in the existence, of any mutiny or sedition, does not, without delay, give information thereof to his commanding officer or superior officer;

(b) Uses, or attempts to use, criminal force to, or commits an assault on, his superior officer, knowing or having reason to believe him to be such whether on or off duty;

(c) abandons or delivers up any garrison, fortress, post or guard or wireless station which is committed to his charge or which it is his duty to defend;

(d) in the presence of an enemy or any person in arms against whom it is his duty to act, cast away his arms or his ammunition or intentionally uses words or any other means to induce any other subordinate officer or Rakkhi to abstain from acting against the enemy, or any person, or to discourage any such subordinate officer or Rakkhi from acting against the enemy or such person, or who otherwise misbehave;

(e) directly or indirectly holds correspondence with, or communicates intelligence to, or assists, or relieves, any enemy or person in arms against the State, or omits to disclose immediately to his commanding officer or superior officer any such correspondence or communication coming to his knowledge;

(f) directly or indirectly assists or relatives with money, victuals or ammunition, or knowingly harbours or protects any enemy or person in arms against the State;

(g) without authority leaves his commanding officer, or his post or party, to go in search of plunder;

(h) quits his guard, picquet, party or patrol without being regularly relieved or without leave;

(i) uses criminal force to, or commits an assault on, any person bringing provisions or other necessaries to camp or quarters, or safeguard, or without authority breaks into any house or any other place for plunder, or plunders, destroys or damages any property of any kind; or

(j) intentionally causes or spreads a false alarm in action, camp, garrison or quarters, shall, on conviction by a Special Court, be punished with rigorous imprisonment for a term which may extended to seven years, and shall also be liable to fine which may extended to five hundred taka.

(2) A Special Court shall take cognizance of an offence punishable under this Article in such manner and follow such procedure as may be prescribed.

(3) An officer of a Rakkhi accused of an offence under this Article shall have the right to conduct his own defence or to have assistance of any officer of the Bahini or of any legal practitioner of his own choice.

(4) An appeal from the judgment of a Special Court may be preferred to the Government within thirty days of the delivery thereof.

10B. (I) An officer, other than the Director-General, or a Rakkhi who-

(a) is in a state of intoxication when on or detailed for any duty, or on parade, or on the line of march;

(b) strikes, or forces or attempts to force, any sentry;

(c) being in command of a guard, picquet or patrol, refuses to receive any prisoner duly committed to his charge, or, whether in such command or not, releases any prisoner without proper authority or negligently suffers any prisoner to escape;

(d) being deputed to any guard, picquet or patrol, quits it without being regularly relieved or without leave;

(e) being in command of a guard, picquet or patrol, permits gambling or other behaviour prejudicial to good order and discipline;

(f) being under arrest or in confinement, leaves his arrest or confinement before he is set at liberty by proper authority;

(g) is grossly insubordinate or insolent to his superior officer in the executions of his office;

(h) refuses to superintend or assist in the making of any field work or others military work of any description ordered to be made either in quarters or in the field;

(i) strikes or otherwise ill-uses a subordinate officer or Rakkhi subordinate to him in rank or position;

(j) being in command at any post or on the march and receiving a complaint that any one under his command has beaten or otherwise maltreated or oppressed any person, or has committed any riot or trespass, fails, on proof of the truth of the complaint, to have due reparation made as far as possible to the injured person and to report the case to the proper authority;

(k) designedly or through neglect injures or loses or fraudulently or without due authority disposes of his arms, clothes, tools, equipment, ammunition, accoutrements, any means of transport or other necessaries, or any such articles entrusted to him or belonging to any other person;

(l) malingers, feigns or produces disease or infirmity in himself, or intentionally delays his cure or aggravates his disease or infirmity;
(m) with intent to render himself or any other person unfit for service, voluntarily causes hurt to himself or any other person;
(n) commits extortion, or without proper authority exacts from any person carriage, porter age or provisions;
(o) designedly or through neglect kills, injures, makes away with, ill-treats or loses his horse or any animal used in the public service;
(p) disobeys the lawful command of his superior officer;
(q) plunders, destroys or damages any property of any kind;
(r) being a sentry, sleeps at his post or quits it without being regularly relieved or without leave;
(s) deserts or attempts to deserts the service or absents himself without leave or, without sufficient cause, over stays leave granted to him;
(t) resigns his appointment or withdraws himself from all or any of the duties of his appointment in contravention of the provisions of the section 14.
(u) accepts illegal gratification from any person;
(v) designedly or through neglect fails to apprehend an offender;
(w) designedly or through neglect fails to perform his duties;
(x) makes a false accusation against any person subject to this Order knowing or having reason to believe such accusation to be false or
(y) neglects to obey Bahini Orders, Zonal Orders, Battalion Orders, Regiment Orders or Unit Orders or any other Order made under this Order or rules made there under or commits any act or omission prejudicial to good order and discipline, such act or omission not constituting any offence under the Penal Code (XLV of 1860), or any other law for the time being,
shall, on conviction by a Special Summary Court, be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine which may extend to two hundred taka.

(2) A Special Summary Court shall take cognizance of an offence punishable under this Article in such manner and follow such procedure as may be prescribed.

(3) An officer or a Rakkhi accused of an offence under this Article shall have the right to conduct his own defence or to have assistance of any officer of the Bahini of his own choice.

(4) An appeal from the judgement of a Special Summary Court may be referred to the Director-general or, where the Director-General presided over the Court, to the Government within thirty days of the delivery thereof"

8. **Amendment of Article 11, P.O. 21 of 1972.**- In the said Order in Article 11,-

(a) in clauses (1) and (2) for the word "Director" the word "Director-General" shall be substituted; and

(b) in clause (3), for the full-stop at the end a semi-colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely:

"Provided that this clause shall not apply where a subordinate officer or Rakkhi is dismissed or removed from service or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction of an offence under Article 10A or 10B or any other criminal offence."

9. **Insertion of new Article 11A, P.O. No. 21 of 1972.**- In the said Order after Article 11, the following new article shall be inserted, namely :

"11A, Any officer or Rakkhi sentenced under this Order to imprisonment shall be imprisoned in the nearest or such other jail as the government may, by general or special order, direct."

10. **Omission of Article 12, P.O. No. 21 of 1972.**- In the said order Article 12 shall be omitted.

11. **Amendment of Article 13, P.O. No. 21 of 1972.**- In the said Order Article 13 shall be renumbered, as clause (1) of that Article and, after clause (1) as so renumbered, the following new clause shall be added, namely-

"(2) It shall be lawful for any police officer to arrest without warrant any person whom he reasonably believes to be a member of the Bahini and to be a deserter or absentee without leave, and to bring him without delay before the nearest Magistrate to be dealt with according to law."

12. **Omission of Article 15, P.O. No. 21 of 1972.**- In the said Order, Article 15 shall be omitted.

13. **Amendment of Article 16, P.O. No. 21 of 1972.**- In the said Order, in Article 16, for the word "Director" the word "Director-General" shall be substituted.

14. **Insertion of new Article 16B, P.O. No. 21 of 1972.-** In the said Order, after Article 16A, the following new Article shall be inserted, namely :

"16B Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Government may invest the Director-General, with the power of a Magistrate of any class for the purpose of enquiring into or trying any offence committed by an officer or Rakkhi against the person or property of another officer or Rakkhi and punishable under any provision of the Penal Code (XLV of 1860), or of any other law for the time being in force."

15. **Amendment of Article 17, P.O. No. 21 of 1972.-** In the said Order, in Article 17,-

(a) in clause (2), in sub-clause (e), for the word "Director" the word "Director-General" shall be substituted; and

(b) after clause (2), the following new clause shall be added, namely :

"(3) Any rules under this Article may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this the Order."

16. **Repeal and Savings.**-(1) The Jatiya Rakkhi Bahini (Amendment) Ordinance, 1975 (IX of 1975), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Jatiya Rakkhi Bahini Order 1972 (P.O. No. 21 of 1972), as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the said Order, as amended by this Act.

সৈয়দ মাহবুবার রহমান
সচিব

ছয়

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর আত্তীকরণ সম্পর্কিত গেজেট

Registered No. DA-1

The Bangladesh Gazette

Extraordinary

Published by Authority

Thursday, October 9, 1975

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW, PARLIAMENTRY AFFAIRS AND JUSTICE

(Law and Parliamentary Affairs Division)

NOTIFICATION

Dacca, the 4th October, 1975

NO. 706.Pub-The following Ordinance made by the President of the People's Republic of Bangladesh, on 4th October, 1975, is hereby published for general information :

The Jatiya Rakkhi Bahini (Absorption in the Army) Ordinance, 1975

Ordinance No. LII of 1975

AN ORDINANCE

to provide for the absorption of the members of the Jatiya Rakkhi Bahini in the Bangladesh Army

Where it is expedient to provide for the absorption of the members of the Jatiya Rakkhi Bahini in the Bangladesh Army and for matters connected there with or ancillary thereto;

And WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exists which render immediate action necessary;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of the 20th August, 1975, and in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 93 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, the President is please to make and promulgate the following Ordinance :

1. **Short title and commencement.**- (1) The Ordinance may be called the Jatiya Rakkhi Bahini (Absorption in the Army) Ordinance, 1975.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 3rd day of September 1975.

2. **Definitions.**- In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "Bahini" means the Jatiya Rakkhi Bahini constituted under the Order;

(b) "commencement of this Ordinance" means the 3rd day of September 1975

(c) "member of the Bahini' means a person appointed or enrolled in the bahini under the Order;

(d) "Order" means the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972 (P.O. No. 21 of 1972).

3. **Ordinance to override other laws, etc.**- The provisions of this ordinance and any order made there under shall have effect notwithstanding anything contained in the Order or in any other law for the time being in force, or in any contract, agreement, document or other instrument.

4. **Absorption of members of the bahini in the Army.**-

On the commencement of this Ordinance,-

(a) all members of the Bahini, who are willing to serve in the Bangladesh Army and found suitable in all respects for such service, shall be appointed in the Bangladesh Army on such terms and conditions as the Government may determine;

(b) all rights and assets and all property, movable or immovable, cash and bank balances, funds, arms, ammunition, explosives, wireless sets, equipment, stores, vehicles, vessels, and work shops, and all rights and interests in or arising out of such property, of the Bahini shall be transferred to the Bangladesh Army, or to such other Defence Service or branch thereof, in such manner as the Government may, by order, specify;

(c) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into, all agreements made, and all matters and things engaged to be done, by, with or for the Bahini shall be deemed to have been incurred entered into, made or engaged to be done by, with or for the Bangladesh Army or such other Defence Service or branch thereof as the Government may, by order, specify;

(d) all deeds, bonds, agreements, powers of attorney, documents and other instruments of whatever nature to

which the Bahini is a party or which are in favour of the Bahini shall be enforceable and of effect by, against or in favour of the Bangladesh Army or such other Defence Service or branch thereof as the Government may, by order, specify as if in place of the Bahini the Bangladesh Army or the Defence Service or branch thereof specified in the order had been named therein;

(e) all budget, grants made and sums sanctioned for the bahini shall be deemed to be budget grants made and sums sanctioned for the Bangladesh Army;

(f) all projects and schemes of the Bahini shall be deemed to be projects of the Bangladesh army;

(g) all suits and other legal proceedings by or against the Bahini shall be deemed to be suits and proceedings by or against the Bangladesh Army and may be proceeded or otherwise dealt with accordingly.

5. **Abolition of Bahini Organization.-** As soon as may be after action under clauses (a) and (b) of section 4 has been taken and the accounts of the Bahini have been audited, the Government shall, by notification in the official Gazette appoint a date on which the Bahini Organization shall be stand abolished.

6. **Repeal of the Order.-** On the abolition of the Bahini Organization under section 5, the Order shall stand repealed.

7. **Responsibility of Director-general.-** (1) The Director-General of the Bahini shall, for the purpose of giving effect to the provisions of clauses (a) and (b) of section (4) and abolition of the Bahini Organization, take such steps as he deems necessary or as the Government may direct.

(2) The Government shall make available to the Director-General such staff and fund as may be necessary for the discharge of his functions under this Ordinance.

8. **Removal of difficulties.-** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Ordinance, the Government may, by order, do anything which appears to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty, and any such order shall be deemed to be, and given effect to as, part of the provisions of this Ordinance.

KHANDAKER MOSHTAQUE AHMED
President

Dacca
The 4th October, 1975

M. H. RAHMAN
Secretary

সাত

রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের তালিকা[৬৭২]

উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (১৯৭৫ পর্যন্ত)

১. পরিচালক : এ এন এম নূরুজ্জামান
২. উপ-পরিচালক (প্রশাসন) : আবুল হাসান খান
৩. উপ-পরিচালক (অপারেশন) : সারোয়ার হোসেন মোল্লা
৪. উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) : আনোয়ার উল আলম
৫. উপ-পরিচালক (সিগন্যাল) : সাবিহ উদ্দিন আহমেদ
৬. উপ-পরিচালক (জোনাল কমান্ডার, চট্টগ্রাম) : এ কে এম আজিজুল ইসলাম
৭. উপ-পরিচালক (মেডিক্যাল) : এ এম খান
৮. সহকারী-পরিচালক : শরিফ উদ্দিন আহমেদ
৯. সহকারী-পরিচালক : সালাহউদ্দিন
১০. সহকারী-পরিচালক : এম এ হাসনাৎ
১১. সহকারী-পরিচালক : ফকির মোহাম্মদ
১২. সহকারী-পরিচালক : তৈয়বুর রহমান

'লিডার' (১৯৭৫ পর্যন্ত)

১. মোজাফফর হোসেন, প্রথম ব্যাচ
২. লুৎফর রহমান, ঐ
৩. আকরাম হোসেন, ঐ
৪. নীতি ভূষণ সাহা, ঐ
৫. তৈয়ব উদ্দিন খান, ঐ
৬. রাখাল চন্দ্র সাহা, ঐ
৭. আলমগীর হাওলাদার, ঐ
৮. এস কে দলিল উদ্দিন, ঐ
৯. আক্তারুজ্জামান, ঐ
১০. সর্দার মিজানুর রহমান, ঐ
১১. এ কে এম নুরুল হোসেন, ঐ
১২. শরীফ ওয়ালিউর রহমান, ঐ
১৩. সৈয়দ রফিকুল ইসলাম, ঐ
১৪. গাজী বেলায়েত হোসেন, ঐ
১৫. মো. নুরুল হক তালুকদার, ঐ
১৬. মো. লিয়াকত আলী, ঐ

---

৬৭২ এই তালিকা সংগৃহীত হয়েছে আনোয়ার উল আলমের লেখা *'রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা'* গ্রন্থ থেকে; প্রথমা, ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ২২৪-২৩০। উৎস গ্রন্থে কর্মকর্তাদের সামরিক পদবি উল্লিখিত থাকলেও এখানে তা বাদ দেয়া হয়েছে।

১৭. মো. আলাউদ্দিন, ঐ
১৮. আবদুর রাজ্জাক, ঐ
১৯. মো. হাবিবুল্লাহ, ঐ
২০. সামছুল কবির, ঐ
২১. লিয়াকত আলম চন্দন, ঐ
২২. সিরাজুল হক দেওয়ান, **দ্বিতীয় ব্যাচ**
২৩. এ কে এম আবদুল আজিজ, ঐ
২৪. এস এম মহিউদ্দিন, ঐ
২৫. দীপক কুমার হালদার, ঐ
২৬. সোহরাব আলী, ঐ
২৭. মো. ওয়াসিকুল আজাদ, ঐ
২৮. সাখাওয়াত হোসেন, ঐ
২৯. আনোয়ারুল ইসলাম, ঐ
৩০. সাইদুর রহমান, ঐ
৩১. সারওয়ার হোসেন, ঐ
৩২. সিরাজুল ইসলাম, ঐ
৩৩. মঈনুদ্দিন চৌধুরী, ঐ
৩৪. হাবিবুর রহমান, ঐ
৩৫. আলীমুজ্জামান জোয়ার্দার, ঐ
৩৬. সবেদ আলী মিয়া, ঐ
৩৭. জাহিদুল ইসলাম, ঐ
৩৮. সাহাব আলী মিয়া, ঐ
৩৯. দেবনাথ শংকর প্রসাদ, ঐ
৪০. সৈয়দ মঞ্জুরুল আলম, ঐ
৪১. আবুল বাসার মোল্লা, ঐ
৪২. এ কে এম নুরুল বাহার, ঐ
৪৩. নুরুল ইসলাম, ঐ
৪৪. আবদুস সাত্তার, **তৃতীয় ব্যাচ**
৪৫. জাহাঙ্গীর আনোয়ার, ঐ
৪৬. কাজী আফতাব উদ্দিন, ঐ
৪৭. আবু তাহের সরকার, ঐ
৪৮. মো. খালেদ, ঐ
৪৯. আবু বকর সিদ্দিকী, **চতুর্থ ব্যাচ**
৫০. শরীফুল ইসলাম, ঐ
৫১. মঞ্জুরুল আলম, ঐ
৫২. এইচ এম সাদেক, ঐ
৫৩. শাহজাহান মিয়া, ঐ
৫৪. কে এ বি মঈনুদ্দিন, ঐ

৫৫. মহিউদ্দিন আহমেদ, ঐ
৫৬. আলতাফ হোসেন, ঐ
৫৭. আইনাল কামাল, ঐ
৫৮. শাহ জাকারিয়া, পঞ্চম ব্যাচ
৫৯. পরিতোষ কুমার রায়, ঐ
৬০. এন এ রফিকুল হোসেন, ঐ
৬১. এম এম ইকবাল আলম, ঐ
৬২. এস কে নুরুল আমিন, ঐ
৬৩. আবদুল হাকিম তালুকদার, ঐ
৬৪. এ জেড এম বজলুল হক, ঐ
৬৫. এস এম সাহাদাত হোসেন, ঐ
৬৬. মো. রেজাউল হক, ঐ
৬৭. আশরাফুল হাফিজ খান, ঐ
৬৮. বনমালী রায়, ঐ
৬৯. এস এম ইকবাল হোসেন, ঐ
৭০. আরশাদ আহমেদ খান, ঐ
৭১. সুনীল কুমার সরকার, ঐ
৭২. এস এম মহিউদ্দিন, ঐ
৭৩. মো. সানাউল্লাহ মিয়া, ঐ
৭৪. মো. হাবিবুল্লাহ, ঐ
৭৫. এ কে আজাদ, ঐ
৭৬. গোলাম আলী, ঐ
৭৭. সৈয়দ এ খুরশিদ রেজা, ঐ
৭৮. এস এম বদরুজ্জামান, ঐ
৭৯. এ এফ এম কামরুল হাসান, ঐ
৮০. মহসিন তালুকদার, ঐ
৮১. আশরাফ কামাল, ঐ
৮২. মোবারক হোসেন, ঐ
৮৩. ওয়াহিদুর রহমান, ঐ
৮৪. আবদুল লতিফ হাওলাদার, ঐ
৮৫. এ টি এম এ হালিম, ঐ
৮৬. রেজাউল করিম হেলাল, ঐ
৮৭. মহসিন সিকদার, ঐ
৮৮. মফিজুল হক সরকার, ঐ
৮৯. মজিবুর রহমান, ঐ
৯০. কাজী ইমদাদুল হক, ঐ
৯১. আবদুল আহাদ, ঐ
৯২. এম এ বারেক সিকদার, ঐ

৯৩. নুরুর রহমান, ঐ
৯৪. বিশ্বাস আবু বকর, ঐ
৯৫. নজরুল ইসলাম, ঐ
৯৬. মাসুদুল আলম, ঐ
৯৭. জোবেদ হোসেন, ঐ
৯৮. কাজী মাজেদুর রহমান, ঐ
৯৯. শহীদ ফারুক হোসেন, ঐ
১০০. সাইফুল আনোয়ার সরফু, ঐ
১০১. এনামুল হক, ঐ
১০২. ইলিয়াস হোসেন, **ষষ্ঠ ব্যাচ**
১০৩. মাসুদউদ্দিন চৌধুরী, ঐ
১০৪. শাহজাহান আলী, ঐ
১০৫. আসাদুল ইসলাম, ঐ
১০৬. দিলীপ কুমার অধিকারী, ঐ
১০৭. এম এ জাবের, ঐ
১০৮. কে এম এইচ আই চৌধুরী ফরিদ, ঐ
১০৯. এ বি এম মির কাসেম মিয়া, ঐ
১১০. দেলোয়ার হোসেন মিয়া, ঐ
১১১. এ এন এম মঈন উদ্দিন, ঐ
১১২. এ এইচ এম শহীদুল্লাহ, ঐ
১১৩. নুরুল বশির, ঐ
১১৪. হাবিবুর রহমান, ঐ
১১৫. মেসবাউর রহমান, ঐ
১১৬. মুকুল কুমার দে, ঐ
১১৭. আনিসুর রহমান, ঐ
১১৮. আবদুস সালাম খান, ঐ
১১৯. সাদেকুল ইসলাম, ঐ
১২০. এ বি এম নওশের আলম, ঐ
১২১. মনির ইকবাল হামিদ, ঐ
১২২. আলিমুজ্জামান মোল্লা, ঐ
১২৩. মাহমুদ আলী মন্ডল, ঐ
১২৪. মাহমুদ আলী, ঐ
১২৫. গোলাম কিবরিয়া খান চৌধুরী, ঐ
১২৬. সাইফুল আজম চৌধুরী, ঐ
১২৭. সৈয়দ মিজানুর রহমান, ঐ
১২৮. অনন্ত কুমার কর, ঐ
১২৯. মঈনুল হক, ঐ
১৩০. নূর আলমগীর, ঐ

১৩১. ইকবাল হোসেন, ঐ
১৩২. আবদুর রউফ, ঐ
১৩৩. এস এম শাহাবুদ্দিন, ঐ
১৩৪. মাহমুদুল হক, ঐ
১৩৫. মির হোসেন মিয়া, ঐ
১৩৬. সফিউদ্দিন মো. জাহিদ, ঐ
১৩৭. শামসুল হক, ঐ
১৩৮. মিজানুর রহমান সরকার, ঐ
১৩৯. খন্দকার আবু আলম, ঐ
১৪০. শাহ আলম, ঐ
১৪১. ও এফ এম নাজিমুদ্দিন, ঐ
১৪২. এ টি এম এ মান্নান, ঐ
১৪৩. আবদুর রহমান জোয়ার্দার, ঐ
১৪৪. হোসেন আহমেদ খান, ঐ
১৪৫. চৌধুরী মো. খালেকুজ্জামান, ঐ
১৪৬. মকবুল হোসেন, ঐ
১৪৭. আবদুল মান্নান মিয়া, ঐ
১৪৮. কে কে এম আবদুল আজিজ, ঐ
১৪৯. সিরাজুল ইসলাম, ঐ
১৫০. নুরুন নবী, ঐ
১৫১. এস কে লিয়াকত হোসেন, ঐ
১৫২. কাজী আবদুল ফরিদ, ঐ
১৫৩. ভবেশ চন্দ্র দে, ঐ
১৫৪. নুরুল কবির, ঐ
১৫৫. আবদুর রব, ঐ
১৫৬. মো. ফজলুল হক, **সপ্তম ব্যাচ**
১৫৭. আবদুস সালাম চৌধুরী, ঐ
১৫৮. সৈয়দ গোলাম মোকাদ্দাস, ঐ
১৫৯. এ কে মো. আলী সিকদার, ঐ
১৬০. সুরঞ্জন দাস, ঐ
১৬১. আকরাম উল্লাহ খান, ঐ
১৬২. মো. মকসুদুল হোসেন, ঐ
১৬৩. রবিউল আলম চৌধুরী, ঐ
১৬৪. আবদুল ওয়াদুদ, ঐ
১৬৫. গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, ঐ
১৬৬. শাহজাহান উদ্দিন ভূইয়া, ঐ
১৬৭. মো. জাফর ইকবাল, ঐ
১৬৮. মো. আবদুল রব, ঐ

১৬৯. খান মো. এনায়েত হোসেন, ঐ
১৭০. মো. সাইফুল ইসলাম, ঐ
১৭১. আকবর হোসেন, ঐ
১৭২. সৈয়দ মিজানুর রহমান, ঐ
১৭৩. মঈনুল হক চৌধুরী, ঐ
১৭৪. মো. আবদুস সবুর, ঐ
১৭৫. খুরশেদ আলম, ঐ
১৭৬. মো. ইউনুস খান, ঐ
১৭৭. রকিবুল হাসান খান, ঐ
১৭৮. মো. রফিকুল ইসলাম, ঐ
১৭৯. শাহ মো. আতিউর রহমান, ঐ
১৮০. মো. আওলাদ হোসেন, ঐ
১৮১. রাহাজুল আমিন, ঐ
১৮২. মো. মিজানুল ইসলাম, ঐ
১৮৩. এস এম শওকত আলী, ঐ
১৮৪. মো. আতাউর রহমান, ঐ
১৮৫. মো. শাহ আলম, ঐ
১৮৬. এ বি এম নাসের উদ্দিন, ঐ
১৮৭. মো. জাফরুল্লাহ খান, ঐ
১৮৮. আকতারুজ্জামান, ঐ
১৮৯. আজিজুল হক, ঐ
১৯০. মো. আজিজুর রহমান, ঐ
১৯১. এস এম উসমান হারুন, ঐ
১৯২. জি এম জমায়েত হোসেন, ঐ
১৯৩. পিনাক পানি সাহা, ঐ
১৯৪. মো. হাফিজুর রহমান, ঐ
১৯৫. খলিলুর রহমান, ঐ
১৯৬. এ কে এম শামসুল আলম, ঐ
১৯৭. মো. ইকবাল হায়দার, ঐ
১৯৮. মোহাম্মদ ওয়াহিদ, ঐ
১৯৯. মাহবুবুর রহমান, ঐ
২০০. মুন্সি মনিরুজ্জামান, ঐ
২০১. এ কে এম হামিদুর আর চৌধুরী, ঐ
২০২. মো. নাসিম উদ্দিন, ঐ
২০৩. আবুল কালাম মাহমুদ, ঐ
২০৪. এ বি এম হুমায়ুন কবির, ঐ
২০৫. আবুল কালাম আজাদ, ঐ
২০৬. আবদুল আজিজ মোল্লা, ঐ

২০৭. আবদুল মজিদ, ঐ
২০৮. হাবিবুর রহমান, ঐ
২০৯. মানস কুমার রায়, ঐ
২১০. আশরাফ, ঐ
২১১. জাহিদ, ঐ
২১২. মিজানুর রহমান, ঐ

আট

'জাতীয় মিলিশিয়া' সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা

বাংলাদেশ সরকার, দেশরক্ষা বিভাগ

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের সমগ্র জনসাধারণ ও সরকারের পক্ষ হইতে মুক্তিবাহিনীর (নিয়মিত ও গণবাহিনী) সকল সদস্যকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। সংগ্রামী শক্তিগুলির সদস্যবর্গ সম্মিলিত ও এককভাবে যে দেশপ্রেম, সাহস ও তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এবং মুক্তিযুদ্ধে যাঁহারা লড়াই করিয়াছেন তাহাদের রক্ত বৃথা যায় নাই।

স্বাধীনতার সংগ্রাম জয়যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এক্ষণে তদপেক্ষা গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমাদিগকে এখন দেশের পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্থনীতিকে দ্রুততার সহিত পুনর্গঠন করিলে এবং স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া আনিলেই কেবল চলিবে না, জাতির ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অবিলম্বে নবযুগের সূত্রপাত করিতে হইবে। আমাদিগকে এখনই গণতন্ত্র, আইনের শাসন, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিতে হইবে। ইহা একটি দুরূহ কার্য। যে দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, উৎসর্গ (উৎসাহ) ও কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ আমরা সকলে, বিশেষ করিয়া মুক্তিযোদ্ধারা, মুক্তিযুদ্ধে প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার মাধ্যমই কেবল ইহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

কাজেই গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নতুন সমাজ গঠনকল্পে মুক্তিবাহিনীর সকল সদস্যকে তাহাদের শক্তি ও প্রয়াসকে সঠিক খাতে প্রয়োগের আবেদন জানাইতেছেন। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সরকার অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করিবেন : দেশের স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণের জন্য আমাদের নিয়মিত সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রয়োজন আছে। আমাদের যে সমস্ত অফিসার এবং জওয়ানরা মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীরূপে অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে। নিয়মিত ব্যাটালিয়নের জন্য আমাদের আরও অফিসার ও জওয়ান প্রয়োজন রহিয়াছে। গণবাহিনীর মধ্যেই জনশক্তির এক উত্তম অংশ নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা ইতোমধ্যেই যুদ্ধে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক ট্রেনিং-এর প্রয়োজন আছে। গণবাহিনী হইতে অফিসার ও জওয়ান নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নতুন অফিসার ক্যাডার এবং অন্যান্যদের ট্রেনিং দিবার জন্য অচিরেই জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমী স্থাপিত হইবে। কমিশন্ড ও নন-কমিশন্ড অফিসার মনোনয়নের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে সিলেকশন বোর্ডসমূহ গঠন করা হইবে। মুক্তিসংগ্রামের বীর সেনানীরা বাংলাদেশের নবগঠিত স্থলবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনীতে নেতৃত্ব প্রদান করিবেন বলিয়া সরকার আন্তরিকতার সহিত আশা পোষণ করেন।

নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার আশু প্রয়োজন। শান্তি ও শৃঙ্খলা ছাড়া আমরা একটা নতুন সমাজ পুনর্গঠন করিতে পারি না। আমরা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই সংগ্রাম করিয়াছি। গণতন্ত্রের মূলনীতি বজায় রাখার জন্য শহীদেরা আত্মদান করিয়াছেন এবং আমরা যদি নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারি তবে গণতন্ত্র নিরর্থক। আমাদের আচরণ এখন অবশ্যই সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক হইতে হইবে এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইবে। আইনের শাসন মানিয়া চলে এইরূপ সকল নাগরিককে রক্ষা করিতে হইবে। দোষীকে শাস্তি দিতে হইবে; তবে উহা উপযুক্ত আইন-সম্মতভাবেই করিতে হইবে। আমাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল এবং আমাদের লোকদের উপর নৃশংসতা চালাইয়াছিল তাহাদেরও শাস্তি পাইতে হইবে। তাহাদের বিচার হইবে। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন একটি বিচার পদ্ধতি, একটি প্রশাসন-যন্ত্র ও জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে একটি পুলিশ বাহিনী।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি পুলিশ বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উহা জনগণেরই পুলিশ বাহিনী হইবে এবং পূর্বের মতো জনগণের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাইবার হাতিয়ার হইবে না। এইরূপ গণ-পুলিশ বাহিনী আমাদের বীর গণ-বাহিনীর লোক দ্বারাই উপযুক্তভাবে সংগঠন করিতে হইবে। সুতরাং সরকার পুলিশ অফিসার ও পুলিশ গণ-বাহিনীর সদস্যগণ হইতে নির্বাচন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে নির্বাচন বোর্ড গঠন করা হইবে।

আমাদের প্রিয় দেশকে অতি দ্রুত পুনর্গঠনের জন্য এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সকল প্রাপ্য সম্পদ (মাল-মসলা ও জনশক্তি) কাজে লাগাইবার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অবশ্যই বাড়াইতে হইবে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নক্সা তৈরির জন্য আমাদের বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, ডাক্তার, কারিগর এবং সর্বপ্রকার দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। বর্বর শত্রু আমাদের সমাজের রত্নস্বরূপ বুদ্ধিজীবীদিগকে– যাঁহারা আমাদের উন্নতির সোপানে পৌঁছাইতে পারিতেন– ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল। আমরা বহু অমূল্য জীবন হারাইয়াছি। আমাদের শুধু এই ক্ষতিই পূরণ করিতে হইবে না বরং উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে আমাদের নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে। যুদ্ধের ধ্বংসাবলি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মুছিয়া ফেলিতে হইবে যাহাতে আমরা নতুন সমাজ গঠনের কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করিতে পারি। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মনে করেন যে, মুক্তিবাহিনী প্রতিভাসমূহের এক অপূর্ব ভাণ্ডার– যাঁহারা দেশ পুনর্গঠন, উহার অর্থনৈতিক কাঠামো পুনরুদ্ধার এবং যথাশীঘ্র সম্ভব উন্নতি লাভের জন্য এক নতুন নেতৃত্ব দান করিতে সক্ষম। সরকার আশা করেন যে, মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ, বিশেষ করিয়া যাঁহারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য লেখাপড়া ছাড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের জাতীয় উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা উচিত। এই সমস্ত বিষয় স্মরণে রাখিয়া সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যেসমস্ত মুক্তিযোদ্ধা তাহাদের শিক্ষা ও ট্রেনিং সমাপ্ত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, পলিটেকনিক শিক্ষালয় ও অন্যান্য কারিগরি কেন্দ্রে ভর্তি হইতে আগ্রহী সরকার তাঁহাদিগকে সকল প্রকার সুযোগ দিবেন। সরকার দেশের সকল স্থানে নতুন নতুন কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করিতেছেন।

যাঁহারা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে অচিরেই উপযুক্ত পদে নিয়োগ করা হইবে। উপরোক্ত নীতিগুলি কার্যকরী করার জন্য সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে, তাঁহারা তালিকাভুক্ত হইয়া থাকুন বা না-ই থাকুন, একটি জাতীয় মিলিশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের পরিকল্পনা নিম্নরূপ হইবে :

(১) অনতিবিলম্বে একটি জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হইবে এবং তালিকাভুক্ত হউক বা না হউক, সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে ইহার আওতায় আনা হইবে।

(২) প্রত্যেক মহকুমায় সেই এলাকার গেরিলাবাহিনীর জন্য শিবির প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শিবিরগুলির পরিচালনা ব্যবস্থা এমনিভাবে করা হইবে যেন এসব যুবককে পুনর্গঠন কাজের উপযোগী করিয়া প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেওয়া সম্ভবপর হয়।

(৩) মহকুমা-ভিত্তিক শিবিরগুলি সেই এলাকার সমস্ত গেরিলাবাহিনীর মিলন-কেন্দ্র হইবে।

(৪) ঊর্ধ্বপক্ষে এগারোজন সদস্য লইয়া জাতীয় মিলিশিয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হইবে। বোর্ডের সদস্যগণকে সরকার মনোনয়ন দান করিবেন।

(৫) প্রত্যেক মহকুমা-শহরে জাতীয় মিলিশিয়ার জন্য মহকুমা বোর্ড থাকিবে। মহকুমা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা অনধিক এগারোজন হইবেন।

(৬) প্রতিটি শিবিরে অস্ত্রশস্ত্র কার্যোপযোগী অবস্থায় রাখা, গুদামজাত করা ও হিসাবপত্র রাখার জন্য একটি করিয়া অস্ত্রাগার থাকিবে।

(৭) ট্রেনিং-এর কার্যসূচি এমনভাবে প্রস্তুত করা হইবে যেন এসব যুবককে নিম্নেবর্ণিত ভূমিকা পালনের উপযোগী করিয়া তোলা যায় : [ক] যেন তাঁহারা দেশের দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ হইতে পারেন; [খ] যখনই নির্দিষ্টভাবে প্রয়োজন হইবে তখনই যেন তাহারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও পুনর্বহালে উপযোগী হইতে পারেন; [গ] দেশের পুনর্গঠন কার্যে সরাসরি সহায়তা হয় এমন বিভিন্ন কাজের উপযোগী হন।

(৮) অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, অপুষ্টিকর খাদ্য এবং অপর্যাপ্ত বেতন ও ভাতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গেরিলাদের এক বিরাট অংশ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। সেজন্যই, তাঁহাদের খাদ্য, বাসস্থান ও ভাতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইবে।

বিজিপি-১০৭৩এ-৭১/৭২-৫ হাজার।

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দেশরক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত ও সরকারি মুদ্রাণালয় মুদ্রিত।

সংগ্রহ ঃ কামাল হোসেন, *তাজউদ্দীন আহমদ : বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর*, পূর্বোক্ত।

নয়

রক্ষীবাহিনীর হাতে আটক থাকাকালীন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অরুণা সেন-এর বিবৃতি

[১৯৭৪ এর ১৭ মার্চ এই বিবৃতি প্রথম সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে একই বছরের জুনে তা 'সংস্কৃতি' নামে আরেকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৬৭৩] অরুণা সেন ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা শান্তি সেনের স্ত্রী। শান্তি সেন সাম্যবাদী দলের নেতা ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল চঞ্চল সেন। বর্তমানের শরিয়তপুর জেলায় শান্তি সেনের রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যই অরুণা সেন রক্ষীবাহিনীর নিগ্রহের শিকার হন। তাঁর নিম্নোক্ত বিবৃতি থেকে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে বিশেষ ধারণা পাওয়া যায়। ২০০৫ সালের ৫ জুন মিসেস অরুণা সেন মারা যান।]

অরুণা সেন-এর বিবৃতি

গত ১৭ আশ্বিন রক্ষীবাহিনীর লোকেরা আমাদের গ্রামের উপর হামলা করে। ঐদিন ছিল হিন্দুদের দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিন। খুব ভোরেই আমাকে গ্রেফতার করে। গ্রামের অনেক যুবককে ধরে মারপিট করে তারা। লক্ষণ নামে কলেজের এক ছাত্র এবং আমাকে তারা নড়িয়া রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার স্বামী শান্তি সেন এবং পুত্র চঞ্চল সেন কোথায়? তারা রাষ্ট্রদ্রোহী, তাদের ধরিয়ে দিন। আরো জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্ধ্যার দিকে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। লক্ষণকে সেদিন রেখে পরদিন ছেড়ে দেয়। সে যখন বাড়ি ফিরে, দেখি মারধোরের ফলে সে গুরুতর অসুস্থ। চার পাঁচদিন পর আবার তারা রাত্রিতে গ্রামের উপর হামলা করে। অনেক বাড়ি তল্লাশি করে। অনেককে মারধর করে। কৃষ্ণ ও ফজলু নামে দুই যুবককে মারতে মারতে নিয়ে যায়। আজও তারা বাড়ি ফিরে আসেনি। তাদের আত্মীয়রা ক্যাম্পে গেলে বলে দিয়েছে সেখানে নেই। তাদের মেরে ফেলেছে বলেই মনে হয়। এরপর থেকে রক্ষীবাহিনী মাঝে মাঝেই গ্রামে এসে যুবকদের খোঁজ করত। কিন্তু তেমন কোনো ব্যাপক হামলা হয়নি।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাত্রি থাকতে এসে রক্ষীবাহিনীর বিরাট একটি দল আমাদের সম্পূর্ণ গ্রামটিকে ঘিরে ফেলল। ভোরে আমাকে ধরে নদীর ধারে নিয়ে গেল। সেখানে দেখলাম গ্রামের প্রায় অধিকাংশ সক্ষমদেহী পুরুষ উপস্থিত– এমনকি বালকদের পর্যন্ত এনে হাজির করেছে। আওয়ামী লীগের থানা সম্পাদক হোসেন খাঁ তদারক করছে সব। আমার সামনে রক্ষীবাহিনী উপস্থিত সকলকে বেদম মারপিট করে। শুনলাম এদের সকলকে ধরতে গিয়ে বাড়ির মেয়েদেরও প্রচণ্ড মারপিট করেছে এবং অশ্লীল আচরণ করছে। তাদের একদফা মারপিট করে রক্ষীরা আমাকে বললো পানিতে নেমে দাঁড়াতে। সেখানে নাকি আমাকে গুলি করা হবে। আমি নিজেই পানির দিকে নেমে গেলাম। কিন্তু নদীর পানি দূরে সরে যাওয়ায়, হাঁটু সমান কাদাতেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। ওরা তাক করে

---

৬৭৩ সংস্কৃতি, ১ম বর্ষ ২য় সখ্যা, মে-জুন, ১৯৭৪, ঢাকা, পৃ. ৭৯-৮৭।

রাইফেল ধরল গুলি করবে বলে। কিন্তু পরস্পর কি যেন বলাবলি করে রাইফেল নামিয়ে নিল। কাদার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। কমান্ডার গ্রেফতার করা লোকদের হিন্দু-মুসলিম দুই ভাগ করে দুই কাতারে দাঁড় করালো। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে বললো, "মালাউনরা আমাদের দুশমন। তাদের ক্ষমা করা হবে না। তোমরা মুসলমানরা মালাউনদের সাথে থেকো না। তোমাদের এবারকার মতো মাফ করে দেওয়া হল।" এই বলে কলিমদ্দি ও মোস্তফা নামে দু'জন মুসলমান যুবককে রেখে আর সবাইকে এক এক বেতের বাড়ি দিয়ে বললো, "ছুটে পালাও"। তারা ছুটে পালিয়ে গেল। আমার পাকবাহিনীর কথা মনে হল। তারাও বিক্ষুব্ধ জনতাকে বিভক্ত করতে এমনি সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছিল। পার্থক্য তারা ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিত আর এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা ভণ্ডামির আশ্রয় নিচ্ছে।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওরা কলিমদ্দি ও মোস্তফাসহ ২০ জন হিন্দু যুবককে নিয়ে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হল। ৩ জন ছাড়া এরা সবাই জেলে। মাছ মেরে কোন রকমে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। আর তাদের মা-বাপ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা আকুল হয়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। সে এক মর্মবিদারী করুণ দৃশ্য। সন্ধ্যার সময় কলিমদ্দি, মোস্তফা, গোবিন্দ নাগ ও হরিপদ ঘোষ ছাড়া বাকি সবাই গ্রামে ফিরে এল। আমি গেলাম তাদের দেখতে। দেখলাম সবাই চলতে অক্ষম। সর্বাঙ্গ তাদের ফুলে গিয়েছে। বেত ও চাবুকের দাগ শরীরে কেটে কেটে বসে গেছে। চোখ মুখ ফোলা। হাত-পায়ের গিরাতে রক্ত জমে আছে। তাদের কাছে শুনলাম সারা দিন তাদের দফায় দফায় চাবুক মেরেছে। গলা ও পায়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে পানিতে বার বার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চুবিয়েছে। পিঠের নিচে ও বুকের উপর বাধ দিয়ে দু'দিক থেকে দু'জন লোক তাদের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। মই দিয়ে ডলেছে। এদের কাউকে ওদের আত্মীয়রা গিয়ে বয়ে এনেছে। অবস্থা দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম যারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করেও আজ একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, অনাহার, দুঃখ, দারিদ্র্যের জ্বালায় আজ অর্ধমৃত, তাদের "মরার উপর খাঁড়ার ঘা"র কবে অবসান হবে। যে শাসকরা মানুষের সামান্য প্রয়োজন, ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না; চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, শোষণ, নির্যাতন যারা বন্ধ করতে পারছে না, তারা কোন অধিকারে আজ নিঃস্ব মানুষের উপর চালাচ্ছে এই বর্বর নির্যাতন।

অবশেষে চরম নির্যাতন আমার ওপরও নেমে এল। ৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৪) রাত্রি ভোর না হতেই রক্ষীবাহিনী আমাকে ঘুম থেকে তুলল। আমাকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এলে দেখলাম সেখানে রীনাও রয়েছে। আমাদের নিয়ে তারা প্রায় দুই মাইল দূরে ভেদরগঞ্জ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হল। রাস্তায় রীনার প্রতি তারা নানা অশ্লীল উক্তি করছিল। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখলাম সেখানে কলিমদ্দি, মোস্তফা, গোবিন্দ নাগ ও হরিপদ ঘোষও রয়েছে। চেহারা দেখেই বোঝা গেল তাদের উপর গুরুতর দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে। বিশেষ করে কলিমদ্দি ও মোস্তফাকেই বেশি অসুস্থ দেখলাম। কলিমদ্দি, মোস্তফা– দুই ভাই; এদের সংসারে আর কোন সক্ষম ব্যক্তি নেই। অপরের জমি চাষ করে এরা কোনমতে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের রয়েছে স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

আমরা ক্যাম্পে আসতেই অনেক রক্ষীবাহিনী এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। শুরু হল রীনার উপর অপমান বৃষ্টি। কেউ অশ্লীল মন্তব্য করে, কেউ চুল ধরে টানে, কেউ চড়

মারে, কেউ খোঁচা দেয়, এমনি সব বর্বরতা। কিছুক্ষণ পর আমাদের রৌদ্রের মধ্যে বসিয়ে রেখে তারা চলে গেল। সন্ধ্যায় আমাদের একটি কামরায় ঢুকালো। অনেক রাত্রিতে রীনাকে তারা উপরের দোতলায় নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই শুনলাম রীনার হৃদয়বিদারী চীৎকার। প্রায় আধ ঘন্টা পর আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে থেমে গেল। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে রীনাকে যখন তারা এনে কামরার মধ্যে ফেলল, রাত্রি তখন কত জানি না। রীনার অর্ধচেতন দেহ বেতের ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত। রক্ত ঝরছে। রীনার জ্ঞান এলে পানি চাইল। আমি তাকে পানি খাওয়ালাম। রীনা আস্তে আস্তে কথা বলতে পারলো। রাত্রি তখন ভোর হয়ে এসেছে। রীনার মুখে শুনলাম উপরে ভেদরগঞ্জ ও ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সম্পাদকরা এবং এই দুই স্থানের ক্যাম্প কমান্ডাররা উপস্থিত ছিল। তারা শান্তি সেন ও চঞ্চল কোথায় আছে, তাদের ধরিয়ে দিতে বলে এবং অস্ত্র কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করে। রীনা কিছুই জানে না বলায় তাকে এমন সব অশ্লীল কথা বলে যা কোন সভ্য মানুষের পক্ষে বলা তো দূরের কথা, কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসা ও গালিবর্ষণের পর ভেদরগঞ্জ ক্যাম্পের কমান্ডার বেত নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোপাথাড়ি এমন পিটাতে থাকে যে পরপর তিনখানা বেত ভেঙে যায়। আবার জিজ্ঞাসা করে শান্তি সেন ও চঞ্চল কোথায়? অস্ত্র কোথায়? রীনার একই উত্তর। ক্ষিপ্ত হয়ে রীনাকে তারা সিলিং-এর সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় এবং দুই কমান্ডার দুইদিক থেকে একসঙ্গে চাবুক চালাতে থাকে। মারার সময় রীনা বলেছিল "আমাকে এভাবে না মেরে একেবারে গুলি করে মেরে ফেলুন।" জবাবে তারা বলে, "সরকারের একটা গুলির দাম আছে তোকে সাতদিন ধরে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলব। এখন পর্যন্ত মারার হয়েছে কি?" অল্প পরেই রীনা অচেতন হয়ে যায়। কিন্তু তারা ঐ দেহের উপরই চাবুক চালাতে থাকে। জ্ঞান এলে রীনা দেখে যে সে মেঝের উপর পড়ে আছে। পানি চাইলে তাকে পানিও দেওয়া হয়নি।

৮ ফেব্রুয়ারি রাতে প্রথম আমাকে এবং পরে রীনাকে দোতলায় নেয়া হয়। সেখানে দেখলাম ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী ফজলু মিয়া ও ভেদরগঞ্জের সেক্রেটারী হোসেন খাঁ চেম্বারে বসে আছে। আমাকে বলল, তোমার স্বামী ও ছেলেকে ধরিয়ে দাও। অস্ত্র কোথায় আছে বলে দাও। তারা ডাকাত, অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি করে। আমি বলি, 'তারা ডাকাত নয়, তারা সৎ, দেশপ্রেমিক। আমার স্বামী রাজনীতি করেন–একথা কে না জানে। তিনি এ দেশের সাধারণ লোকের অতি প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়।' রীনাকেও তারা একই প্রশ্ন করে। রীনা জানে না বলায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ডামুড্যা ক্যাম্পের কমান্ডার করম আলী এবং ভেদরগঞ্জের ক্যাম্প কমান্ডার ফজলুর রহমান এরা সবাই আমাদের অশ্লীল গালাগালি দিতে থাকে এবং আমাকে ও রীনাকে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে রীনার বস্ত্র খুলে নেয়। তারপর কমান্ডার দুজন দু'দিক থেকে চাবুক মারতে থাকে। আমরা অজ্ঞান হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফিরলে দেখি আমরা উভয়ে মেঝেতে পড়ে আছি। রীনার সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমার গায়ে কাপড় থাকায় অপেক্ষাকৃত কম আহত হয়েছি। তবু এই রুগ্ন বৃদ্ধ দেহে এই আঘাতই মর্মান্তিক। সর্বাঙ্গ ব্যথায় জর্জরিত। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। নড়বার ক্ষমতা নেই। ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে নারকীয় হাসি হাসছে। ওদের হুকুমে দু'জন সিপাই আমাকে টেনে তুলল। আমি অতি কষ্টে দাঁড়াতে পারলাম। রীনা পারল না। দু'জন রক্ষী তার দুই বগলের নিচে হাত দিয়ে তাকে টেনে তুলে তার গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিল ও টানতে টানতে নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। কমান্ডার পিছন থেকে নির্দেশ দেয়, "ওটাকে

ভালো করে হাঁটা, নয়ত মরে যাবে।" সকালে কমান্ডার কয়েকজন রক্ষী সিপাইসহ রীনাকে নিয়ে গ্রামের দিকে রওয়ানা হল। বলল, "বাঁচবি তো না, চল তোর মাকে দেখিয়ে আনি।"

রীনার সর্বাঙ্গ ফুলে কালো হয়ে গিয়েছে। একটি পা ফেলবার ক্ষমতা নেই। সে অবস্থায় তাকে দু'বাহুতে ধরে দু'জন রক্ষী প্রায় টানতে টানতে দু'মাইল দূরে বাড়ির দিকে নিয়ে চললো। ঠাট্টা করে বলছিল, "হাঁটলে গা ব্যথা কমে যাবে।" বাড়িতে নিয়ে রীনার মা তাকে দেখেই ফিট হয়ে যান। কমান্ডার রীনাকে তার মার মাথায় পানিতে দিতে বলে। রীনার মার জ্ঞান এলে, রীনার চেহারা এমন কেন জিজ্ঞেস করায় কমান্ডার বলে, "পুকুর ঘাটে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে।" রীনাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য রীনার মা কমান্ডারের কাছে অনুনয় করলে কমান্ডার বলে, "খাসি খাওয়ালে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।" রীনাকে তারা দু'মাইল রাস্তা পুনরায় টানতে টানতে নিয়ে এল। ঐ দিন ছিল ৯ ফেব্রুয়ারী। হনুফাকেও তারা ধরে নিয়ে এল ঐদিন। করিম নামে আরেকটি কৃষক যুবককেও তারা রামভদ্রপুর থেকে এনেছে দেখলাম। তাকে এতো মেরেছে যে অবস্থা তার সঙ্গীন। নড়িয়া থানার পণ্ডিতসার থেকেও একজন স্কুল শিক্ষক ও দুজন যুবককে এনেছে দেখলাম। বিপ্লব নামে একটি ছেলে নাকি মারের চোটে পথেই মারা যায়। রক্ষীবাহিনীর সিপাইরা বলাবলি করছিল। একজন জল্লাদ গর্ব করে বলছিল, দেখ এখনও হাতে রক্ত লেগে আছে। শুনেছি মতি নামে আর একটি যুবককেও তারা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। আর আমাদের ধরে আনার দু'একদিন আগে কৃষি ব্যাংকের পিয়ন আলতাফকে পিটাবার পর হাত পা বেঁধে দোতলার ছাদ থেকে ফেলে মেরে ফেলেছে।

নয় তারিখ দুপুরের অল্প পরে তারা হনুফা, রীনা ও আমাকে নিয়ে গেলে পুকুর ধারে। সেখানে আমাদের একদফা বেত দিয়ে পিটিয়ে চুবানোর জন্য পানিতে নামাল। প্রথম আমাদের ওরাই সাঁতরাতে বাধ্য করল। আমরা পথশ্রান্ত হয়ে কিনারায় উঠতে চেষ্টা করি, ওরা আমাদের বাঁশ দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। পরিশ্রান্ত হয়ে যখন আমরা আর সাঁতরাতে পারছিলাম না, তখন পানি থেকে তুলে আবার বেত মারতে থাকে। শেষের দিকে আমরা যখন সাঁতরাতে পারছিলাম না, তখন আমাদের পানিতে ডুবিয়ে আমাদের দেহের উপর দু'পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এমন তিনদফা আমাদের চুবানো ও পেটানো হয়। কিছুক্ষণ আগেই করিম মারের চোটে মরে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে আরো একটি অল্প বয়সের যুবককেও চুবিয়ে অচেতন করে ফেলেছিল। তাকে ঘাটলার উপর ফেলে রাখে। আমার আঁচল দিয়ে গা মুছানোর সময় হঠাৎ ছেলেটি চোখ মেলে তাকায়। "মা আপনি কে?" বলে করুণ কণ্ঠে ডেকে ওঠে। আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না। রক্ষীরা তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরে শুনেছি, ছেলেটিকে নাকি মেরে ফেলেছে।

সন্ধ্যার অল্প আগে আমাদের পানি থেকে তুলে ভিজা কাপড়েই থাকতে বাধ্য করল। দারুণ শীতে আমরা কাঁপছি। প্রচণ্ড জ্বর এসে গেছে সকলের। এমনি করেই রাতভর ছালার চটের উপর পড়ে থাকলাম। পরদিন রাতে রীনাকে আবার নিয়ে গেলো দোতলায়। সেখানে আবার তাকে ঝুলিয়ে বেত মারল। ১১ তারিখ রাতের আবার রীনার উপর চলল এই অত্যাচার। রীনা জ্ঞান হারাল। রক্ষী সিপাইদের বলাবলি করতে শুনলাম, রীনা মরে গিয়েছে। রীনার কাছে শুনলাম, তার যখন জ্ঞান হল তখন সে দেখে, তার পাশে ডাক্তার বসা। রীনা জিজ্ঞেস করে, আপনি কে, আমি কোথায়? ডাক্তার জবাব দেয়, আমি ডাক্তার,

তুমি কথা বলো না। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার চলে গেলে রীনাকে তারা ধরাধরি করে নিচে আমাদের কাছে নিয়ে এলো।

একজন সিপাই রীনা ও হনুফাকে বলে, তোরা তো মরেই যাবি, তার আগে আমরা প্রতি রাতে পাঁচজন করে তোদের ভোগ করব। তারা অবশ্য 'ভোগ' শব্দটি বলে নাই। বলেছিল অতি অশ্লীল কথা। একদিন রাতে দুটি রক্ষী সিপাই ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে দেয়। রীনা ও হনুফার মুখ চেপে ধরে। ধ্বস্তাধস্তি করে তারা ছুটে গিয়ে চিৎকার করে। চীৎকার শুনে, ক্যাম্পের অন্য রক্ষীরা ছুটে আসে। কমান্ডারও আসে। ওরা তাকে সব বললে সে বলে, খবরদার একথা প্রকাশ করো না, তাহলে মেরে ফেলবো। রক্ষী সিপাইদের কারো মধ্যে মাঝে মাঝে মানবতাবোধের লক্ষণ পাচ্ছিলাম। তারই একটি সিপাইকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছো?" প্রশ্ন শুনে সে যেন চমকে উঠল। বলল, "বাংলাদেশে লেখাপড়া শিখে কি করব? আমরা জল্লাদ, জল্লাদের আবার লেখাপড়ার দরকার কি?"-এই বলে সে দে ছুট। মনে হল যেন চাবুক খেয়ে একটি ছাগল ছুটে পালাল। রক্ষী সিপাইদের কানাঘুষায় শুনছিলাম, আমাকে ও হনুফাকে অন্যত্র কোথাও পাঠিয়ে দেবে, আর রীনা ও অন্যান্য পুরুষবন্দিদের মেরে ফেলা হবে। ১২ ফেব্রুয়ারি আমাকে ও হনুফাকে নিয়ে রক্ষীরা রওয়ানা দিল। আমরা রীনাকে ফেলে যেতে আপত্তি জানালাম। রীনাও আমাদের সঙ্গে যেতে খুব কান্নাকাটি করছিল, কমান্ডারের কাছে অনুনয় বিনয় করছিল। কমান্ডার তার সহকর্মীদের সঙ্গে কি যেন আলাপ করে সেদিন আমাদের পাঠানো স্থগিত রাখলো।

১২ তারিখেও ওরা রাত্রিতে আবার রীনাকে ঝুলিয়ে নিয়ে হান্টার দিয়ে পেটায়। ১৩ তারিখে তারা রীনাকে মারে না, কিন্তু নির্যাতনের নতুন কৌশল নেয়। দম বন্ধ করে রাখে, জোর করে ধরে নাকমুখ চেপে রাখে, এমনি করে জ্ঞান হারালে ওরা ছেড়ে দেয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে ওরা আমাদের তিনজনকে নিয়েই রওয়ানা দিল প্রায় চার মাইল দূর ডামুড্যা রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পের দিকে। কলিমদ্দি, মোস্তফা, গোবিন্দ ও হরিপদ থেকে গেল। রক্ষীরা বলাবলি করছিল, তাদের মেরে ফেলা হবে। আমরা কিছু দূরে এলে ক্যাম্পের দিক থেকে চারবার গুলীর আওয়াজ শুনলাম। ভাবলাম ওদের বুঝি মেরে ফেললো। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। তার ওপর আমাদের শরীরের অবস্থা এমন ছিল যে হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তবু আমরা বাধ্য হচ্ছিলাম হাঁটতে। বোধ হয় আমাদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে, বোধ হয় বেঁচে যাবো। এই চিন্তাই আমাদের হাঁটতে শক্তি যোগাচ্ছিল। অনেক রাতে ডামুড্যা রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সেখানে কিছুক্ষণ রেখে স্পীড বোটে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সমস্তক্ষণ আমাদের কম্বল চাপা দিয়ে মুরদার মত ঢেকে রাখা হল। বেদনা-জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত শরীর। তার উপর গরমে কম্বল চাপা থেকে শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম। যেন জ্যান্ত কবর। আমাদের মাদারীপুর রক্ষী ক্যাম্পে আনা হল। সেখানে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করল। সমস্ত দিন আমাদের ওখানেই রাখল। খেতে দিল না। শেষ রাতে জীপে করে আবার কম্বল চাপা দিয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা হল। আবার সেই সুদীর্ঘ পথ– জ্যান্ত কবরের যন্ত্রণা।

ঢাকায় আমাদের প্রথমে রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে গেল। সে আমাদের খুব ধমক লাগালো। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে গেল তেজগাঁ থানায়, তারপর লালবাগ থানায়। রাতে সেখানে থাকলাম। পরদিন পাঠাল সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে পাঁচদিন রাখার

পর আমাদের নিয়ে এল তেজগাঁ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে। সেখানে পাঁচদিন রেখে জিজ্ঞাসাবাদের পর আবার সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়।

জেলে আমাদের তৃতীয় শ্রেণির সাধারণ কয়েদিদের মতো রাখা হতো। একই আহার্য দেওয়া হতো। দিনরাত সেলে বন্দি। সেখানে রাজনৈতিক অভিযোগে আরও বন্দিনী আছেন। তার মধ্যে ১৭ মার্চ গ্রেফতার জাসদ নেত্রী মমতাজ বেগম আছেন। অস্ত্র আইনে সাজাপ্রাপ্ত পারভীন। আরো একজন নাম রুমা– আছেন। সবাইকে তৃতীয় শ্রেণির কয়েদি করে রাখা হয়েছে এবং সাধারণ কয়েদিদের মতো খাটুনীর কাজ করানো হচ্ছে। এর উপর জমাদারনীরা (মেয়ে সিপাই জমাদার) তাদের নিজেদের জামা কাপড় সেলাই, কাঁথা সেলাই, কাপড়-চোপড় ধোয়ানো সবকিছু মেয়ে কয়েদিদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। রাজনৈতিক বন্দিনীদেরও রেহাই দিচ্ছে না।[৬৭৪]

---

[৬৭৪] এই বিবৃতিটি ছিল অরুণা সেনের দুর্ভোগের অতি সংক্ষিপ্তসার। অন্যত্র তিনি ঐ নিপীড়িত দিনগুলোর আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেছেন :

> ...মাদারিপুর ক্যাম্পে আনার পর দেখি শেখ মণি বসে আছে। আসলে রীট হবার পর শেখ মুজিব নিজেও নজর রাখছিল ঘটনার উপর। তিনিই মণিকে মাদারিপুর পাঠিয়েছিলেন আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। মণি আমাকে বৌদি সম্বোধন করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বললো।...রীনার ওপর কী ধরনের অত্যাচার হয়েছে জানতে চাইলো।...পরদিন ঢাকা আনা হলো।...দেড় মাস পর মুক্তি পেলাম। মুক্তি পেয়ে গোপন জীবনে চলে গেলাম। না হয় মরতে হতো। আমাদের হত্যা করা হয়নি বলে আওয়ামী লীগের উচ্চমহল রক্ষীবাহিনীর উপর অসন্তুষ্ট ছিল।...
>
> বিস্তারিত দেখুন, আহমেদ মুসা, *ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, পরিবেশক: ডানা পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ৫৮-৬০।

দশ

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রথম ঘোষণাপত্র

৩১ অক্টোবর, ১৯৭২

প্রচণ্ড বিপ্লবীশক্তির অধিকারী বাঙালি জাতি আজ এক মহা অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। গত ২৫ বছরের গণআন্দোলন ও রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম বাঙালি জাতির জীবনে যে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে, যে বিপ্লবী চেতনা আবহমানকাল ধরে বিরাজমান সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবে প্রভাবান্বিত ঔপনিবেশিক শোষণের ভিত্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সাড়ে সাত কোটি মানুষের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে, স্বাধীনতা লাভের পর মাত্র দশ মাসের ব্যবধানে সমগ্র জাতির সে বিপ্লবী চেতনা আজ সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো স্তব্ধপ্রায়। কিন্তু কেন?

বাংলাদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বর্তমান শাসকশ্রেণীর সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চরিত্র, শাসনব্যবস্থার চরম অযোগ্যতার ফলে সারা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চরমভাবে অনিশ্চিত। শুধু তাই নয়, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আজকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা দ্রুত জটিলতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কারণ বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে এতটুকু পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করা হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতি বর্তমানে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অর্থনীতি শোষক সম্প্রদায়ের করায়ত্ত।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে দুর্বল নেতৃত্ব, স্বাধীনতা লাভের পর সশস্ত্র সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ব্যর্থতা ও বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে সারা দেশের অর্থনীতিতে যে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। গ্রামে গ্রামে মানুষের অন্নবস্ত্রের অভাব, নিম্ন আয়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনে অনিশ্চয়তা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির আবর্তে অরাজক শাসনব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতা সাধারণ মানুষের মনে যে সন্দেহ ও হতাশার সৃষ্টি করেছে, তা সমগ্র জাতিকেই দুষ্ট রাহুর মতো গ্রাস করতে উদ্যত।

অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা নির্দয়ভাবে অস্বীকৃত। সারা দেশে যুবশক্তি এমনভাবে নির্যাতিত, মনে হয় ক্ষমতাসীন দল গোটা যুবসমাজকেই তাদের চক্ষুশূল বলে ধরে নিয়েছে।

তাছাড়া মেহনতী শ্রমিক সমাজ উঠতি পুঁজিপতি ও শিল্প প্রশাসকগোষ্ঠীর শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে আর ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী প্রথার নিগড়ে কৃষক সমাজের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। একদিকে নির্যাতন ও শোষণের এই প্রক্রিয়ায় সরকার ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় পালিত এ দেশের সুবিধাবাদী রাজনৈতিক মহল, বিত্তশালী সম্প্রদায়, আমলা, পুঁজিপতি ও শিল্প প্রশাসকগোষ্ঠী সমবায়ে গঠিত সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ, যাদের সংখ্যা মাত্র ৮ ভাগ। অন্যদিকে শোষিত শ্রমিক ও কৃষক, বাস্তুহারা, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং ছাত্র সমবায়ে গঠিত দেশের গোটা জনসমষ্টির এক বৃহত্তর অংশ– যাদের সংখ্যা শতকরা ৯২ ভাগ।

এখানেই আমাদের দেশের শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব এবং এটাই শ্রেণীদ্বন্দ্ব। যতদিন এ দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি না ঘটবে, ততদিন শোষণ অব্যাহত থাকবে এবং শোষণকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই শোষক শ্রেণী শাসকের বেশে নির্যাতন, গুপ্তহত্যা, মিথ্যা মামলা, জেল-জুলুম ইত্যাদি তথাকথিত 'আইন-শৃঙ্খলা' রক্ষার নামে অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাবে। তাই যে পর্যন্ত এ শাসক শ্রেণী উৎখাত না হবে, যে পর্যন্ত কৃষক-শ্রমিক বুদ্ধিজীবীদের সঠিক নেতৃত্ব অধিষ্ঠিত না হবে ততদিন সাধারণ মানুষের জীবনে সুখ-শান্তির কল্পনা বিলাস মাত্র।

বিপ্লবী চিন্তার অধিকারী বাঙালি জাতির জীবনে কৃষক শ্রমিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমেই কেবল একটি সফল সামাজিক বিপ্লব সংঘটন ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সে ঈপ্সিত শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ ও কৃষক শ্রমিক-রাজ কায়েম করা যেতে পারে।

শ্রেণীদ্বন্দ্ব অবসানের জন্য শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য পরিস্থিতি ও পরিবেশগত কারণে সহায়ক শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক গণসংগঠনের যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন, তা উপলব্ধি করেই এবং বাংলাদেশের সর্বত্র লাখ লাখ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি লাভ করে 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' (JATIYA SAMAJTANTRIK DAL) বাংলাদেশের শোষিত-বঞ্চিত কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের নিজস্ব সংগঠন হিসেবে জনসম্মুখে প্রকাশ করছে এবং এই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক জনযুদ্ধ ঘোষণা করছে।

'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' নিম্নলিখিত আদর্শ বাস্তবায়িত করবে :

(১) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ ও কৃষক শ্রমিক-রাজ কায়েম।

(২) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সফল সামাজিক বিপ্লব সংঘটনে সর্বপ্রকার সহায়তা দান।

(৩) সমাজতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা।

(৪) বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনে বিপ্লবী চেতনার জন্ম দেওয়া ও বাঙালি কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্তা অক্ষুণ্ন রাখা এবং উপজাতীয়দের অধিকার সংরক্ষণ করা।

(৫) সাম্প্রদায়িকতার বিষদাঁত ভেঙে ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালি মনোভাবের ভিত্তিতে মেহনতী জনতার ঐক্য গড়ে তোলা।

(৬) যুদ্ধজোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হুমকি ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদাহানিকর সকল প্রকার গোপন ও প্রকাশ্য চুক্তি বাতিল। মানব সভ্যতার দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া ও চীনসহ যে কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং এসব দেশের যে কোন প্রকার অসৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দেশবাসীর জঙ্গী ঐক্য সৃষ্টি করা।

(৭) বিশ্বের সর্বপ্রকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা দান, বিশ্বের মেহনতী মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা।

(৮) সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সমভাবে সকল প্রকার পন্থা অবলম্বন করা।

তাই, জাতির এই যুগ-সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে এবং বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়ানক ও পুতুল সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে এবং আগামী দিনের সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ ও কৃষক শ্রমিকরাজ কায়েমের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে প্রবল জনমত সৃষ্টির নিমিত্তে 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের' পতাকাতলে জমায়েত হবার জন্য আমার দেশের ছাত্র, যুবশক্তি, মুক্তিযোদ্ধা, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বাস্তুহারা, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের নিকট উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আসুন, আমরা আমাদের মিলিত শক্তি নিয়ে শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে লিপ্ত হই। আমরা জানি, দীর্ঘদিনের শক্ত বুনিয়াদের ওপর এই শোষকগোষ্ঠী দাঁড়িয়ে। কারণ তাদের অর্থ আছে, অস্ত্র আছে, আছে সুসংগঠিত জঙ্গী কর্মী বাহিনী। কিন্তু জনতা আজ তাদের বিরুদ্ধে। প্রয়োজন জনতার বিপ্লবী শক্তিকে সংগঠিত করে সময়োচিত আঘাত হানা। যে আঘাতে ক্ষমতার দম্ভে স্ফীত শোষক শাসকের কায়েমী স্বার্থের ভিত্তিমূল ধসে পড়বে। আসবে জনতার বাঞ্ছিত মুক্তি।

সাথীরা, প্রতিমুহূর্তে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে আমাদের লড়াই শোষকের বিরুদ্ধে, শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে। এ লড়াই বাঁচা-মরার লড়াই। এ লড়াইয়ে জিততেই হবে।

জয় বাংলা, জয় বাংলার মেহনতী মানুষ।

এগারো

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রথম কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্মেলন

২৩ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সাল

আহ্বায়ক কমিটির বক্তব্য

সাথী সভাপতি
অতিথিবৃন্দ
বাংলাদেশের দূর দূরান্ত থেকে আগত সাথী ভাই বোনেরা,
আপনারা বিপ্লবী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

বিপ্লবের মৃত্যু নেই, বিপ্লব অনিবার্য।

জনতাকে অভুক্ত রেখে শান্তিতে ঘুমাবার কথা বলা, অস্ত্র হস্তান্তরের পর অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা বা অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করা শাসক ও শোষক শ্রেণীর একটা কৌশল মাত্র। আমাদের অতীত ইতিহাস প্রমাণ করে, রাজনীতির প্রয়োজনে রক্তচক্ষুর শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অস্ত্রই যেখানে একমাত্র অবলম্বন, বিপ্লবী চেতনার জন্ম এবং বিপ্লব সেখানেই অবশ্যম্ভাবী। তাই যত চেষ্ট করাই হোক না কেন, যত সহজ পন্থার কথাই উল্লেখ করা হোক না কেন, আর যত নির্যাতনের হুমকিই দেওয়া হোক না কেন অস্ত্র দিয়ে– স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশ ও জাতির জন্য বিপ্লব অনিবার্য। বিপ্লবীর মৃত্যু হতে পারে কিন্তু বিপ্লবের মৃত্যু নেই।

বাংলাদেশের বিপ্লবী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন এবং রায় নিয়ে মাত্র কিছুদিন আগে বাংলার মাটিতে আত্মপ্রকাশ ঘটে একটি রাজনৈতিক দলের, নাম জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। ব্যক্তি বিশেষের নিছক খেয়াল নয় বরং ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ ও মেহনতী জনতার দাবির ফলই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। অধিকার বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষের মতামত নিয়ে একটি দলের আত্মপ্রকাশ পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম। কোন নেতা সৃষ্টির জন্য নয় বা ক্ষমতা আরোহণ করে নেতৃত্ব কায়েমের জন্য এ দলের জন্ম হয়নি বরং ভবিষ্যতের অনিবার্য সামাজিক বিপ্লব সংঘটনে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নে বিপ্লবের সহায়ক শক্তি হিসেবে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্যই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের এই অভ্যুদয়।

আত্মপ্রকাশের মাত্র চব্বিশ দিন গত হয়েছে। এর মধ্যেই বাংলাদেশের প্রায় সবকটি জেলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে জনসভা। প্রতিটি সভায় আমরা দেশের মেহনতী মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরছি। রাজনীতি সচেতন বাংলার মানুষ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতি দিয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন।

জুলুম প্রতিরোধ দিবস

গোটা বাংলাদেশে বিরাজ করছে এক ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতি। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। সেবার পরিবর্তে ক্ষমতাসীন দল চালিয়ে যাচ্ছে জুলুমবাজি। গুপ্তভাবে হত্যা করছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে বিনাশর্তে

মুক্তিদানের চক্রান্ত চলছে। পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও বর্তমান সরকার ব্যর্থ। এ সকল অত্যাচার, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল দুই দুইবার 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দলের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করেছে।

জনগণের সংগঠনরূপে

এত অল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল যে গণজাগরণের সূচনা করেছে তা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে; অন্যদিকে এ জাগরণ কাঁপিয়ে দিয়েছে ক্ষমতাসীন সরকারের ভিত। গণশক্তির ভয়ে ভিত ক্ষমতাসীন মহল তাই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সম্পর্কে অরাজনৈতিক ও অশোভন মন্তব্য করছে এবং আমাদের দলের কর্মীদের অপহরণ ও হত্যা করছে। আন্দোলনবিমুখ অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের কোন সঠিক লক্ষ্য বা কর্মসূচি না থাকায় এসব দল জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল কম সময়ে বেশি পরিচিত, জনপ্রিয় হয়ে জনগণের সংগঠনে পরিগণিত হয়েছে।

২৫ মার্চের আগের রাজনীতি

পঁচিশে মার্চের আগে স্বাধীনতা সম্পর্কে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর কী মনোভাব ছিল তা দেশবাসীর সকলের জানা। নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের ক্ষমতার মসনদে আরোহণের স্বপ্নে ছিল বিভোর। স্বাধীনতার স্বপক্ষে কথা বলার জন্য বাংলাদেশের যুবসমাজ বিশেষ করে ছাত্রলীগের কর্মীদের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ চিহ্নিত করেছিল বিদেশী শক্তির এজেন্ট হিসেবে।

পঁচিশে মার্চ রাত্রি পর্যন্ত আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা সম্পর্কে জনগণকে কোন নির্দেশ তো দেয়নি বরং পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলেছিল। বস্তুত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার জন্য তারা কোন পদ্ধতি বা প্রস্তুতি গ্রহণ করার কথা চিন্তাও করতে পারেনি। তাই বাংলাদেশের সংগ্রামী যুবসমাজকেই গোপনভাবে আওয়ামী লীগের আপসমূলক আলোচনার আড়ালে যৎসামান্য প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলগুলো স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পর্কে পোষণ করতো নমনীয় ও আপসকামী মনোভাব। পরিণামে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছিল জাতিকে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে। তাই কোন প্রকার নেতৃত্ব বা নির্দেশ ছাড়াই স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের বিপ্লবী জনতা। যুব সমাজের নেতৃত্বে কারখানার শ্রমিক, গ্রামের কৃষক, ছাত্র-জনতা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

বিপ্লব অসম্পূর্ণ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক-ছাত্র মেহনতী মানুষ সশস্ত্র বিপ্লবী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল যুব সমাজের আহ্বানে। প্রচণ্ড লড়াই ও প্রচুর রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ যখন তার নিজস্ব গতিতে জনযুদ্ধের রূপ নিতে যাচ্ছিল তখনই ভারতীয় সেনাবাহিনী এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ ১৬ ডিসেম্বর পাক সেনাবাহিনী

আত্মসমর্পণ করে। বন্ধ হয়ে গেল আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধ। ভৌগোলিকভাবে স্বাধীন হলো বাংলাদেশ।

আমরা কী চেয়েছিলাম

উনিশ শত একাত্তর সালে বাংলাদেশের কৃষক, মেহনতী জনতা যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল ভৌগোলিক স্বাধীনতা ছিল না। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে কৃষক রাজত্ব কায়েম করাই ছিল বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য। বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে। প্রথমত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি; দ্বিতীয়ত পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন; তৃতীয়ত পাকিস্তানি উপনিবেশিকতাবাদের প্রতিভূ বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রতিক্রিয়াশীল মহল। বাংলাদেশের সুবিধাবাদী রাজনৈতিক মহল যুদ্ধকালে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এগিয়ে আসে, অন্য অংশটি আন্দোলনের বিরোধিতা করে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছিল অথচ যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর স্বীকৃতি, সাহায্য এবং আকাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের নাম নিয়ে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ আবার বাংলাদেশকে শোষণের জন্য এগিয়ে এসেছে। আর তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে নয়া উপনিবেশবাদী শক্তি এবং দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ও স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থনকারী সুবিধাবাদী রাজনৈতিক মহল অর্থাৎ বর্তমান ক্ষমতাসীন দল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের পর আমরা ভৌগোলিক স্বাধীনতা লাভ করেছি এবং উৎখাত করেছি পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ এবং তাদের বশংবদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহকে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের শূন্যস্থান পূরণ করেছে নয়া উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশীয় উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণী, শিল্প প্রশাসক গোষ্ঠী, জোতদার মহাজন, অসৎ ব্যবসায়ী মহল; সুবিধাবাদী রাজনৈতিক টাউট ও অতি অভিলাষী সামরিক ও আধা-সামরিক চক্র। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে এ সকল সাম্রাজ্যবাদী, নয়া উপনিবেশবাদী ও দেশীয় শোষক সম্প্রদায় বাংলাদেশের মেহনতী মানুষকে শোষণ করছে। বাংলাদেশ হয়ে ওঠেছে শোষণের একটি কেন্দ্রবিন্দু।

সাম্প্রতিক সফর অভিজ্ঞতা

গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। কাপড়ের অভাবে গ্রামের মা-বোনেরা ঘরের বাইরে বেরুতে পারছে না। সরকার যদিও প্রচার করে বেড়াচ্ছে, দেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে রিলিফ বিতরণ করা হয়েছে; কিন্তু মানুষের কাছে রিলিফের কণামাত্রও গিয়ে পৌছায়নি। এসব রিলিফ সামগ্রী আত্মসাৎ করেছে স্থানীয় এম.সি.এ এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক টাউটরা। সারা বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে আজ হাহাকার। অথচ এই গ্রামগুলো ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশ্রয়স্থল। গরিব কৃষকরা অভুক্ত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছে। শত্রুসৈন্যদের খবর আদান-প্রদান করেছে। নিজেদের জীবনের বিনিময়ে

মুক্তিসংগ্রামীদের আশ্রয় দিয়েছে। আজ স্বাধীনতার কণামাত্র সুফলও ভোগ করার সুযোগ হয়নি গ্রামীণ মানুষদের।

শ্রমিক অসন্তোষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

সুষ্ঠু শ্রমনীতির অভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র শ্রমিক অসন্তোষ চরমে উঠেছে। শিল্পাঞ্চলে আঞ্চলিকতার প্রশ্ন তুলে ক্ষমতাসীন মহল শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আত্মঘাতী হানাহানির বিষ ছড়িয়ে দিয়ে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। শ্রমিক শোষণের প্রতিক্রিয়াকে অব্যাহত রেখে এবং শ্রমিকে শ্রমিকে দাঙ্গা বাঁধিয়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার ব্যর্থ চেষ্টায় রত।

অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার বড় বড় বুলি আওড়ানোর অন্তরালে ক্ষমতাসীন দলের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন অংশ মুসলিম লীগ গঠন ও সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করছে এবং সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদদ যোগাচ্ছে তার পেছনে।

মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলিত

দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যারা হাতে তুলে নিয়েছিল মারণাস্ত্র; দীর্ঘ নয়টি মাস যারা নিজের জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে সেসব অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা আজ আবহেলিত– ক্ষমতার আসনে বসে ক্ষমতাসীন দল ভুলে গেছে তাদের। যুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সমাজের এক উচ্ছিষ্ট অংশের মতো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই মুক্তিযোদ্ধার দল।

জীবনযাত্রা ব্যাহত

সরকার সমস্ত লাইসেন্স, পারমিট তার দলীয় সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করার ফলে দেশের ব্যবসায়ীমহলকে বাধ্য হয়ে তিন-চারগুণ চড়া দামে পণ্য বিক্রি করতে হচ্ছে। সরকারের এই ঘৃণ্য নীতির ফলে দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীমহল এক অনিশ্চয়তার শিকারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে কালোবাজারী মুনাফাখোর অসৎ ব্যবাসায়ীমহল দিন দিন ফুলে ওঠছে। ফলে জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা হচ্ছে ব্যাহত। জিনিসপত্রের ক্রয়ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

মুদ্রাস্ফীতি

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর মাত্র তিনদিনের মধ্যে বাংলাদেশের মুদ্রামান হ্রাস, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাংক রিজার্ভ কারেন্সী চালু এবং উৎপাদনের সঙ্গে যোগাযোগহীন ফিনান্সিয়াল পলিসি বর্তমান সরকারের অযোগ্যতাই প্রমাণ করে। আজ সারা দেশে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি। সারা দেশ ছেয়ে গেছে কালো পয়সায়। তাই অর্থনীতির দিক থেকে বাংলাদেশ আজ দেউলিয়া।

সরকার পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থ

যে কোন দেশের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে সে দেশের (১) ভৌগোলিক এবং (২) মানুষের মন-মানসিকতা ও প্রয়োজন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে জনগণের কোন আত্মিক সম্পর্ক নেই, ছিল না কখনো। তাই বাংলাদেশের মানুষ কী চায়, কী তার প্রয়োজন এবং এ প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে বাধা কী, এ সকল দিক সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আওয়ামী লীগ সরকারের

নেই। তাই স্বাভাবিকভাবে আজ পর্যন্ত সরকার যতগুলো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সব পরিকল্পনা অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে এবং পরে বাতিল ঘোষিত হয়েছে। কোন ব্যাপারেই সরকার এখনো সঠিক পরিসংখ্যান নিতে পারেনি। তাই কর্মক্ষেত্রে পদে পদে সরকার তার ব্যর্থতা প্রমাণ করে যাচ্ছে। গত এক বছরের খতিয়ান দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, বর্তমান সরকার যে পরিকল্পনাই গ্রহণ করুক না কেন বাস্তব ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে

সরকার যদিও ঘোষণা করে থাকে যে তারা জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছেন, কিন্তু বাস্তবে বর্তমান সরকার সরাসরি পুতুল সরকারে পরিণত হয়েছে। যেখানে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করাই পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত ছিল সেখানে বর্তমান সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সরকারের পররাষ্ট্রনীতি চরমভাবে ব্যর্থ। জাতিসংঘে বাংলাদেশ আজও পায়নি তার ন্যায্য আসন। জাতিসংঘে আসন পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের যে দরকষাকষি চলছে তা প্রতিটি বাঙালির জন্য অপমানজনক।

যুদ্ধবন্দি ও আটক বাঙালি প্রসঙ্গে

যারা জাতি হিসেবে বাঙালি জাতিকে এবং দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য অস্ত্র ধরেছিল সেসব আটক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিনা বিচারে ছেড়ে দেওয়ার এক অশুভ পাঁয়তারা চলছে। পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের মানুষ সারা পৃথিবীর কাছ থেকে যে সম্মান অর্জন করেছিল, মাত্র একটি বছরের ব্যবধানে আমরা তা হারিয়ে ফেলেছি। আন্তর্জাতিক বিশ্বে আজ আমাদের স্থান এত নিচে।

অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

আওয়ামী লীগ সরকার মুখে বলছে আইনের শাসন, কিন্তু কার্যত দেশে চালু হয়েছে এক ব্যক্তির শাসন। প্রশাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিপূজার মাত্রা মধ্যযুগের নৃপতিদেরও ছাড়িয়ে গেছে। absolute power corrupts absolutely বাংলাদেশের অবস্থা বর্তমানে এই। গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে দিয়ে চলছে ব্যক্তিপূজার মহোৎসব– যার আশ্রয় হচ্ছে ফ্যাসিবাদ।

এদিকে জাতীয় অর্থনীতি একেবারে বিপর্যস্ত। ভয়াবহ বেকারসমস্যা পূর্বতন সমস্ত রেকর্ড ছড়িয়ে গেছে। কলকারখানাগুলোতে উৎপাদন হচ্ছে না। একদিকে খুচরা যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবিরোধী ব্যক্তিবর্গের হাতে জাতীয়করণকৃত কারখানার প্রশাসনভার অর্পণের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক নিচে নেমে গেছে। সুতরাং নতুন কর্মসংস্থানের দ্বার রুদ্ধ করেই পুরাতন শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন হচ্ছে দিন দিন। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পাক আমলে আওয়ামী লীগ নেতারা ক্রুগ মিশন পরিকল্পনা নিয়ে হইচই করতো। কিন্তু আজ এ ব্যাপারে তারা আশ্চার্যজনকভাবে নিশ্চুপ। ভয়াবহ বন্যা সমস্যা আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতির পথে প্রধান বাধা হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও মান্ধাতার আমলের। একটি দেশ কতটুকু উন্নত তা

নির্ভর করে তার যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সরকার সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে যে অসময়োচিত ছেদ পড়েছিল আমাদের বিপ্লব, তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ সোভিয়েত-ভারত ব্লকে ঢুকে পড়েছিল। ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক সাহায্যের পথ ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ থাবা বিস্তার করেছে দেশের বুকে। ফলে বাংলাদেশ সরকার মার্কিনীদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে শুরু হয়েছে এক অশুভ প্রতিযোগিতা এবং বাংলাদেশকে তারা ব্যবহার করছে দাবার ঘুঁটির মতো।

আজ দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিক্রিয়াশীলদের কুক্ষিগত। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহ-অবস্থানকারী উঠতি ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ বর্তমান সরকার এখনো ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র করে চলেছে। তাই আজকের সংগ্রাম হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও তাদের দেশীয় প্রতিনিধি উঠতি ধনিক শ্রেণী ও সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে। যারা তাদের কায়েমী স্বার্থের ভিত মজবুত করার জন্য আত্মসমর্পণ করেছে সাম্রাজ্যবাদের কাছে। সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করতে হবে সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়স্থিত সরকারকে। এজন্যে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের শ্রেণী সচেতন করে তাদের মধ্য থেকে সত্যিকারের নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে।

সংবিধান প্রশ্নে

বাংলাদেশ সরকার নতুন সংবিধান চালু করেছেন। আমরা আগেই বলেছি– এ সংবিধান একটি অকেজো সংবিধান। প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক শ্রেণীর সংবিধান মেহনতী মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু সংবিধানহীন একটি রাষ্ট্র চলতে পারে না। তাই আওয়ামী লীগ সরকার প্রদত্ত এই বাজে সংবিধানকে আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে গণ্য করি। আগামী দিনে সফল সামাজিক বিপ্লবের পর কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষের সত্যিকার প্রতিনিধিদের প্রদত্ত সংবিধান চালু হলেই মেহনতী মানুষ মুক্তির নিশ্চয়তা পাবে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে

জ্ঞানে অজ্ঞানে নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটা ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়। প্রথমত, নির্বাচনকে ক্ষমতা দখলের অস্ত্র হিসেবে, দ্বিতীয়ত, সংগঠনের বক্তব্যকে ব্যাপক জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়ে আন্দোলনের পর্যায় হিসেবে নির্বাচনকে গ্রহণ করা যায়। ১৯৩৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে জনগণ ভুল রায় দিয়েছে একথা বলা অন্যায় হবে। প্রতিটি নির্বাচনে জনতার রায় ছিল সঠিক। তবে জনগণের দায়িত্ব পালন করার দায়িত্ব নিয়ে যারা ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে তারাই জনগণকে ধোঁকা দিয়েছে। নির্বাচনের সময় বড় বড় ওয়াদা এবং ক্ষমতায় গিয়ে তা বেমালুম ভুলে গিয়ে জনগণকে ধোঁকা দেওয়াই হলো নির্বাচনে জয়লাভকারী দলগুলোর ইতিহাস।

একটি সশস্ত্র সংগ্রামের পর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথাটি বিতর্কমূলক। বস্তুত নির্বাচনকে কী চোখে দেখা হবে তার ওপরে নির্ভর করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা। যদি কেবল ক্ষমতা দখলের পর্যায় হিসেবে নির্বাচনকে গ্রহণ করা হয় তাহলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করাই শ্রেয়। কেননা নির্বাচন বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্বের সৃষ্টি করে যারা সব সময় তাদের শ্রেণী চরিত্রের খাতিরে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আর যদি নির্বাচনকে জনমত গঠন, সংগঠনকে সুদৃঢ় ও আন্দোলনের পর্যায় হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংগঠনের বক্তব্যকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানো এবং সংগঠনের কর্মক্ষেত্রকে দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তরে সম্প্রসারিত করে বিপ্লবী কর্মসূচিকে অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভবপর হয় এবং মূল কর্মসূচি অর্থাৎ সামাজিক বিপ্লবের জন্য জনমত গঠন করা যায়।

একদিকে দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ঢালাও শোষণ ও নির্যাতন, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া উপনিবেশবাদের কাছে ক্ষমতাসীন সরকারের আত্মসমর্পণ জাতিকে এক চরম সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দেশে বিরাজমান এই নৈরাজ্য ও হতাশাজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য একটি সফল সামাজিক বিপ্লব অপরিহার্য। এই সামাজিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা নতুন নেতৃত্ব। বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশে এই নতুন নেতৃত্বই বাস্তবায়ন করবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে উৎখাত হবে শোষণের সর্বশেষ প্রক্রিয়া ও শক্তিসমূহ। সমাজতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে গড়ে ওঠবে শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ। জনগণের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা আমরা লক্ষ্য করছি তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। অফুরন্ত বৈপ্লবিক চেতনার অধিকারী মেহনতী জনতাকে সংগঠিত করে তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে বর্তমান স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আসুন, আমরা সর্বাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান ক্ষমতাসীন গণবিরোধী সরকারকে উৎখাত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করি। মেহনতী জনতার জয় অবশ্যম্ভাবী।

জয় বাংলা; জয় বাংলার মেহনতী মানুষ।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।

কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির পক্ষে– আ স ম আব্দুর রব

বারো

সাম্যবাদ

প্রথম সংখ্যা

১৭ই মার্চের বিপ্লবী শিক্ষা

সাম্রাজ্যবাদের দালাল, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার বিগত ১৭ই মার্চ ঢাকার বুকে উদ্‌যাপন করেছে এক নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। এ হত্যাকাণ্ড বর্বর ইয়াহিয়া সরকারের একাত্তরের ২৫শে মার্চের নারকীয় হত্যা থেকেও ঘৃণ্য। ইয়াহিয়া সরকার ছিল বিজাতীয় ঔপনিবেশিক দস্যুদের প্রতিনিধি। তারা নরহত্যা শুরু করেছিল রাতের অন্ধকারে। মুজিব সরকার এ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করেছে দিনের আলোতে জনতার গণদাবর জবাবরূপে।

গণবিরোধী আওয়ামী লীগ সরকারের আড়াই বছরের দুঃশাসনে বাংলার আপামর জনসাধারণ আজ চরম নির্যাতন আর দুর্দশার শেষসীমায় উপনীত। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক নিস্পেষণ, সামাজিক দুরাচার ও বিশৃঙ্খলা, জানমালের নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চিয়তার নাগপাশে তারা অহরহ জর্জরিত। সমগ্র বাংলাদেশ আজ অনিবার্য ধ্বংসের পথে।

শোষিত, নিস্পেষিত জনসাধারণের মুক্তির ২২টি দাবির ভিত্তিতে গণআন্দোলন চালু করেছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থনে এ আন্দোলন হয়ে উঠছিল দুর্বার শক্তিশালী। তারই এক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত পল্টনের ঐতিহাসিক জনসভা থেকে লক্ষাধিক জনতার অনুমোদনে জাসদ নেতাদের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা করে গিয়েছিল ত্রিশ সহস্রাধিক জনতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সাড়ে সাত কোটি নিপীড়িত মানুষের পক্ষ থেকে সরাসরি গণদাবি পেশ করা। দুর্ভিক্ষ বন্ধ কর, মুদ্রাস্ফীতি রোধ কর, ন্যায্যমূল্যে ভাত-কাপড়ের বন্দোবস্ত কর, চোরাচালান, কালোবাজারী, মওজুদদারী, লাইসেন্স-পারমিটধারী খতম কর; দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি বন্ধ কর; পাটের গুদাম, শিল্প গুদাম পোড়ানো বন্ধ কর; রেল দুর্ঘটনা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রশমন কর; ছিনতাই, রাহাজানি, খুন, গুমখুন ও রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন বন্ধ কর– এ সব ছিল 'গণদাবি'র সারমর্ম।

গণদাবির জবাব দিয়েছে খুনী মুজিব সরকার নিরস্ত্র জনতার উপর অবিরাম গুলিবর্ষণের মাধ্যমে। সম্পূর্ণরূপে শান্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জনতার উপর অকারণে এবং অঘোষিতভাবে গুলি চালিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক নিস্পেষণযন্ত্র ঘৃণিত রক্ষীবাহিনী। ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন, ছাত্র, যুবক ও শ্রমিকসহ মেহনতী জনতার ৫০ জন মানুষ; আহত হয়েছেন জাসদ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ হাজার জনেরও বেশি লোক। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে জলিল-রবসহ শতাধিক লোককে। আওয়ামী লীগ সরকারের এ ঘৃণ্য ফ্যাসিবাদী আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সমগ্র বাংলাদেশে। হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও জনসভার মাধ্যমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পথে এগিয়ে যায় সংগ্রামী জনতা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর নেমে আসে নিদারুণ রাজনৈতিক নির্যাতন।

দেশব্যাপী প্রায় এক হাজারেরও বেশি জাসদ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শত শত জাসদ নেতা ও কর্মীর নামে বের করা হয়েছে হুলিয়া। অসংখ্য নেতা ও কর্মীর বাড়ি হামলা করে অত্যাচার করা হয়েছে তাদের আত্মীয়স্বজনদের ওপর। রক্ষীবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশের প্রহরায় ও আওয়ামী লীগ নেতাদের নেতৃত্বে ভস্মীভূত করা হয়েছে জাসদের কেন্দ্রীয় অফিস; অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে; হামলা করা হয়েছে শোষিত মানুষের মুখপত্র দৈনিক 'গণকণ্ঠ-এর' মুদ্রনালয়ে এবং গ্রেফতার করা হয়েছে তার সম্পাদক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি আল-মাহমুদকে। এক কথায় সমগ্র দেশে চালু করা হয়েছে আবার শ্বেতসন্ত্রাস।

এ হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক নির্যাতনের নিন্দা করে বক্তব্য রেখেছেন দেশের প্রবীণতম জননেতা মৌলানা ভাসানী, প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান খানসহ ৭টি বিরোধী দলের ১৪ জন নেতা, শতাধিক শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, আইনজ্ঞ ও সাংবাদিক। শ্রমিক, কৃষক ও সর্বশ্রেণীর মেহনতী জনতার পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন ও প্রতিরোধের জন্য উঠেছে সোচ্চার দাবি। সমগ্র দেশ আজ বিভক্ত হয়ে পড়েছে দু'টি শিবিরে : একদিকে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমর্থক সকল সংগ্রামী শোষিত শ্রেণীসহ সমগ্র মেহনতী জনতা, অন্যদিকে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল আওয়ামী লীগ সরকার এবং তার সমর্থক ধনিক কম্প্রাডর (মুৎসুদ্দি) সামাজিক ও রাজনৈতিক গুণ্ডাশ্রেণীসমূহ। সারা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপনীতি হয়েছে এক যুগসন্ধিক্ষণে, যার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য উপলব্ধির উপর নির্ভর করবে বিপ্লবী রাজনীতির সঠিক কর্ম-কৌশল। এতে সামান্যতম ভুলও হয়ে ওঠবে বিপ্লব সাফল্যের পরিপন্থী এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিজয়ের ভিত্তি।

দুই

১৭ই মার্চের হত্যাকাণ্ডের মূল্যায়ন ও বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যের বিশ্লেষণ অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশের বিপ্লবের 'আত্মমুখী' (সাংগঠনিক) শক্তিকে সংহত ও বলীয়ান করে তোলার জন্য এ মূল্যায়ন আজ অতি প্রয়োজনীয়। কারণ, এক দিকে যেমন সকল প্রগতিশীল দল এবং মুক্তিকামী জনতা সরকারের এ হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন, আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থক গুণ্ডাগোষ্ঠির ফ্যাসিস্ট কার্যকলাপের নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছে, অন্যদিকে তেমনি কিছু সংখ্যক তথাকথিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও কতিপয় পাতিবর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ১৭ মার্চের ঘটনাকে জাসদের অনভিজ্ঞ নেতৃত্বের হঠকারী এবং অতিবিপ্লবী পদক্ষেপ রূপে সমালোচনা করেছেন। এরূপ সমালোচনা স্বাভাবিকভাবে অনেকের মনে সন্দেহ, সংশয় ও বিভ্রান্তির সূচনা করতে পারে, ফলে বিপ্লবের আত্মমুখী শক্তি সামাজিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

লেনিন [১] বলেছেন, প্রত্যেকটি বিপ্লবী ঘটনা আমাদের শিক্ষা ও অনুধাবনকে ত্বরান্বিত করে এবং বিপ্লবী ঐক্য ও সংহতিকে দ্রুততর করে। বিকাশের পথে বিপ্লবের প্রত্যেকটি ধাপ জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং দুর্বার শক্তিতে বিপ্লবী কর্মসূচির পক্ষে আকর্ষণ করে কারণ কেবল বিপ্লবী কর্মসূচিই তাদের সত্যিকারের স্বার্থ প্রকাশ ও সংরক্ষণ করে। লেনিনদের এ উক্তি অভ্রান্ত। ১৭ই মার্চের প্রতিক্রিয়া এ সত্যকে যথাসময়ে প্রতিপন্ন করতে বাধ্য তবুও নির্ভুল বিশ্লেষণের মাধ্যমে ১৭ মার্চের বিপ্লবী শিক্ষাকে পরিষ্কারভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

সঠিক মার্কসবাদী বিশ্লেষণে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক জগতে কোন ঘটনাই আকস্মিক নয়। প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে থাকে তার নিজস্ব পরিস্থিতির বিকাশের মৌলিক কারণসমূহ অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বিরোধের প্রতিনিয়ত সংঘর্ষের বহিঃপ্রকাশ কখন এবং কেমন করে কোন ঘটনা ঘটবে– তা নির্ভর করে পরিস্থিতির তখনকার বাহ্যিক কারণসমূহের ওপর। কিন্তু এসব বাহ্যিক কারণসমূহকেও সক্রিয় করে তোলে অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ।

১৭ই মার্চের ঘটনার অভ্যন্তরীণ কারণ খুঁজতে হবে বাংলাদেশের বর্তমান সংকট-সমস্যাপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অপ্রতিরোধ্য দ্রুত অবনতির মূল কারণসমূহের মধ্যে। এ সব কারণের ব্যাপক ব্যাখ্যা অন্যত্র করা হয়েছে [২]। এখানে আমরা শুধু কয়েকটি প্রাথমিক বিরোধের নাতিদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে তার সারমর্ম বোঝার চেষ্টা করব।

প্রথমত, বাংলাদেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণতা ও ক্ষমতাসীন সরকারের সার্বভৌমত্বের আস্ফালনের মধ্যকার বিরোধ। ভারত ও রাশিয়ার সঙ্গে গুপ্তচুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সীমিত করা হয়েছে। ফলে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক নীতি এবং উন্নয়নমূলক কাজেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সীমিত। প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কখনও সরকারকে সঠিক সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ এবং কার্যকরী করতে দেবে না।

দ্বিতীয়ত, মুখে সমাজতন্ত্রের বুলী এবং কার্যত দেশী-বিদেশী পুঁজিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির সঙ্গে আঁতাতের প্রাণপণ প্রচেষ্টা।

তৃতীয়ত, বৃহৎ শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র বিরোধী আমলা ও টাউটদের নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যকার বিরোধ। এ বিরোধের ফলে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে; সমাজতন্ত্র অপদস্থ হচ্ছে অথচ সমাজতন্ত্রের নামে চালানো হচ্ছে শ্রমিক কৃষকের উপর ধনবাদী শোষণ ও ফ্যাসিবাদী নির্যাতন। এক দিকে চলছে উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান, অন্যদিকে সরকারি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পকেন্দ্রে ও শিল্প গুদামে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ।

চতুর্থত, সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ, অথচ আমদানি ও আমদানিকৃত পণ্য বণ্টনের মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে শহরে ও নগরে সরকার ও সরকারি দলের তাবেদাররূপে এক নতুন ও উঠতি পুঁজিবাদী শ্রেণী। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠির পৃষ্ঠপোষকতায় চালু করা হয়েছে অবাধ চোরাচালান। সমাজতন্ত্রের নামে পুঁজিবাদী তাঁবেদার সৃষ্টির এ প্রচেষ্টা দ্রব্যসংকট, চোরাচালান, চোরা আমদানি, দ্রব্যমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতিকে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি করে চলেছে।

পঞ্চমত, সমাজতান্ত্রিক কৃষি উন্নয়ন এবং সবুজ বিপ্লবের নামে কতিপয় ধনিক কৃষককে পুঁজিবাদী কৃষকে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টার মধ্যকার বিরোধ। এ বিরোধের ফলে ভূমি মালিকানার ধরনের কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন আওয়ামী লীগ সরকার করছে না। ধনবাদী কায়দায় ফসল বাড়ানোর প্রচেষ্টা, ভ্রান্ত মুদ্রা ও মূল্যনীতি শুধু কৃষি উৎপাদনের সরঞ্জামের দামই বাড়াচ্ছে– উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না। ফসলের ঘাটতি তীব্রতর হয়ে উঠছে; সারা দেশে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে আপামর জনসাধারণ।

ষষ্ঠত. ক্ষমতাসীন সরকারের ভ্রান্তনীতি, চরিত্রহীনতা ও দুঃশ্চরিত্রতার পৃষ্ঠপোষকতা একদিকে দারুণ দুর্ভিক্ষ; মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক সংকটের মাধ্যমে বাড়িয়ে দিয়েছে জনসাধারণের দারিদ্র্য, অন্যদিকে সরকার দলীয় ও সরকারি পৃষ্ঠপোষিত মুষ্ঠিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হচ্ছে সীমাহীন সম্পদ। ফলে গড়ে উঠছে এক উঠতি বুর্জোয়া ধনিকশ্রেণী এবং পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল শ্রেণী। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই পরিস্থিতি জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সূচনা করতে বাধ্য। এরূপ প্রতিক্রিয়ার অন্যতম অনিবার্য ফল সামাজিক নৈরাজ্য। শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, ব্যাংক লুট, বাজার লুট, হত্যা ও গুপ্তহত্যা এরই স্বাভাবিক পরাকাষ্ঠা। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠির রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ নৈরাজ্যবাদী সামাজিক দুষ্কৃতকারীদের সহায়ক হয়েছে। ফলে সামাজিক নৈরাজ্য সূচনা করছে আইন প্রবর্তক, আইনরক্ষাকারী ও আইন প্রয়োগকারীদের মধ্যে এক ধ্বংসাত্মক পারস্পরিক বিরোধ। এসবের প্রতিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ মিছিল, আওয়ামী লীগের দালাল ও রিলিফ চোরদের হত্যা, কৃষকদের দলবেঁধে ধান কেটে নেয়া, থানার উপর হামলা ও থানা লুট, আপসপন্থী, মতাদর্শহীন রাজনৈতিক দলের প্রতি জনসাধারণের ঘৃণা, সরকারি দলের প্রতি অনাস্থা এবং অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতি আস্থার মাধ্যমে।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এসেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল থেকে। বহু নির্যাতনের সম্মুখে জাসদ নেতা ও কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টায় জনসাধারণ এগিয়ে যায় আন্দোলনের পথে। ভয়ে কম্পিত হয়ে ওঠে শাসক শ্রেণী ও তাদের বৈদেশিক প্রভাব। ২০ জানুয়ারির প্রতিবাদ সভাকে পণ্ড করার জন্য হঠকারী নীতির আশ্রয় নেয় আওয়ামী লীগ সরকার ও তার দলীয় তাঁবেদাররা। ভূয়া অজুহাতে ঢাকায় জারী করা হয় ১৪৪ ধারা। জাসদ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের বহু অনুরোধেও সরকার ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করতে রাজি হয়নি। ফলে জাসদ এ ধারা অমান্য করতে বাধ্য হয়। ১৮ জানুয়ারি নেমে আসে জাসদের ওপর নির্যাতন। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে সমগ্র দেশে পালিত হয় ১৯ ও ২০ জানুয়ারি এবং ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে সার্বিক সাধারণ ধর্মঘট। ঢাকার সরকারি অফিস থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরের বাজার পর্যন্ত এমন ব্যাপক হরতাল বাংলাদেশে এর আগে পালিত হয়নি।

ভীত সন্ত্রস্ত সরকার ও তার রাজনৈতিক তাঁবেদাররা সরকারি ও দলীয় গুণ্ডা এবং রক্ষীবাহিনীর জুলুম তীব্র করে তোলে। জাসদ নেতাদের হত্যা করার জন্য স্কোয়াড নিযুক্ত করে। জাসদ নেতা ও কর্মী এবং অন্যান্য বামপন্থী বিরোধীদলের কর্মীদের ওপর চালু করে দানবীয় নির্যাতনের স্টিম রোলার। তীব্র হয়ে ওঠে জনতার বিক্ষোভ। নির্যাতনের মুখে বাধ্য হয় জাসদ তার গণআন্দোলনকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে। সর্বসাধারণের সমর্থিত 'গণদাবি'সমূহ মেনে নিয়ে কার্যকরী করার জন্য সরকারের ওপর জোরদার চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক ঘেরাও আন্দোলনের ডাক দেয় জাসদ। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জাসদের এ আহ্বান ছিল সর্বোতভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পদ্ধতি। এ ঘেরাও আন্দোলনের কর্মসূচি জাসদ ঘোষণা করেছিল ঐতিহাসিক পল্টনে ১৭ মার্চ লক্ষাধিক সংগ্রামী জনতার বিশাল সমাবেশে।

১৭ মার্চের ঘটনা তাই আকস্মিক অথবা বিচ্ছিন্ন ছিল না, তা বাংলাদেশের বিগত আড়াই বছরের রাজনৈতিক বিকাশেরই এক অনিবার্য ধাপ। একে জাসদের হঠকারিতা বলে আখ্যায়িত করতে পারে কেবল তারাই যারা মুখে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও বিপ্লবের বুলি আওড়ায়, অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে বিপ্লব সমাধা করতে চায়; অবস্থা বিশেষে সমস্ত দোষ অন্যের ওপর চাপিয়ে নিজের সাফাই বজায় রাখতে চায়; অথবা যারা জনসাধারণের সমর্থন ও সহায়তায় তোয়াক্কা না করে মুষ্টিমেয় অস্ত্রধারী ক্যাডারের মাধ্যমে বিপ্লব সম্পন্ন করার অতি বামপন্থী আত্মমুখীবাদ ও আত্মক্রিয়াবাদের ব্যাধিতে পীড়িত।

১৭ মার্চ তারিখে যদি কেউ হঠকারিতার প্রশ্রয় নিয়ে থাকে তবে তা নিয়েছে ক্ষমতাসীন অপদার্থ আওয়ামী লীগ সরকার। সরকার ইচ্ছা করলেই জাসদ নেতৃবৃন্দকে ১৭ মার্চের আগে গ্রেফতার করতে পারত; ১৭ মার্চের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় বাধা দান করতে পারতো, লাঠিচার্জ করে জনতার সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করতে পারতো। এমনকি সরকার কিছু না করলেও জনতা যথাসময়ে চলে যেতো। সবই সরকার জানতো। তবু এ সব না করে সরকার রক্ষীবাহিনীর অতি আধুনিক স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা উদ্‌যাপন করল এক নরমেধযজ্ঞ। এ কখনও আকস্মিক হতে পারে না। এ সম্পূর্ণরূপে পূর্বপরিকল্পিত ও পূর্বনির্ধারিত। ব্যাপক নরহত্যা, ধরপাকড় ও পরবর্তীকালীন রাজনৈতিক গুপ্তামীসুলভ নির্যাতনের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট কায়দায় গণআন্দোলনকে ধূলিস্যাৎ করাই ছিল ধূর্ত সরকারের আসল হঠকারী উদ্দেশ্য।

সরকারের এ হঠকারিতা জনসাধারণের চোখে ধরা পড়তে বাধ্য। এ নরহত্যা ও রাজনৈতিক নির্যাতনের তোড়জোড় সরকারি শক্তির বাহ্যিক রূপ মাত্র। ক্ষমতাসীন সরকার, রাজনৈতিক দল ও তাদের তাঁবেদার গোষ্ঠীর অন্তর্মুখী শক্তি আসলে অত্যন্ত দুর্বল– যে দুর্বলতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরে বর্ণিত অবনতির অনিবার্য প্রতিক্রিয়া রূপে।

তাই চিরাচরিত ফ্যাসিস্ট কায়দায় সরকার তার আত্মমুখী শক্তির দুর্বলতা ঢাকার অপচেষ্টা করছে হঠকারী নরহত্যা ও নির্যাতনের ঢংকানিনাদের মাধ্যমে। একাত্তর সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রির অন্ধকারে ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়া সরকারও করেছিল অনুরূপ অপচেষ্টা। ব্যর্থ হয়েছিল ইয়াহিয়া; তার হঠকারিতা খনন করেছিল তার নিজের কবর। ২৫ মার্চ তাই উন্নীত করেছিল বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ স্তরে।

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ঘটনা রাজনৈতিক আন্দোলনকে নতুন ও উন্নততর পর্যায়ে ঠেলে দেয়। এর অনেক নজির বাংলাদেশ তথা বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে লেখা হয়েছে স্বর্ণাক্ষরে। ১৯৪৮ সালে শুরু হয়েছিল যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৫২ সালে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি তাকে উন্নীত করেছিল বাংলার জাতিত্বের আন্দোলনে; ১৯৬২ সালের আন্দোলন তাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে ১৯৬৬ সালে রূপান্তরিত করেছিল সরাসরি স্বাধিকার আন্দোলনে; ১৯৬৯ সালের আন্দোলন গণতন্ত্র ও স্বাধিকার আন্দোলনকে মতাদর্শগত আন্দোলনের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনকে সজোর, ব্যাপক ও তীব্র করে তুলেছিল শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর ব্যাপক ঘেরাও অভ্যুত্থান। ১৯৭১ সালের ১ মার্চের ঘটনা বাঙালি জাতিকে উন্নীত করেছিল জাতীয়তাবোধের সর্বোচ্চ স্তরে যা রূপান্তরিত হয়েছিল ২৫ মার্চের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে।

১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চের ঘটনার গুরুত্ব আরও বেশি, গুণগতভাবে আরও উন্নততর। এ ঘটনার বাংলাদেশের রাজনীতিকে এমন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেছে যা ইতঃপূর্বে সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের অবশ্যম্ভাবী সমাজ বিপ্লবে ১৭ মার্চের ভূমিকা রাশিয়ার ১৯০৫ সালের ২২ জানুয়ারির প্রায় সমতুল্য। যে ঘটনাকে লেনিন [১, পৃ. ৪৮১] আখ্যায়িত করেছিলেন 'বিপ্লবের আরম্ভ' রূপে। যে সমস্ত স্ফুলিঙ্গ বিজয়ী বিপ্লবের লেলিহান দাবানল প্রজ্জলিত করেছিল, তার মধ্যে ১৯০৫ এর মস্কো অভ্যুত্থান [৩], চীনের ১৯১৯ এর ৪ঠা মে'র আন্দোলন ও ১৯২৫ এর ৩০ মে'র হত্যাকাণ্ড [৪] এবং কিউবার ১৯৫৩ এর ২৬ জুলাইয়ের [৫] মনকাডা দুর্গ আক্রমণ তার উজ্জলতম নিদর্শন। অবশ্য শেষোক্ত ঘটনাসমূহ এবং ঢাকার ১৭ মার্চের ঘটনার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে।

১৭ মার্চ রক্ষীবাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে গণদাবি পেশকারী নিরস্ত্র ছাত্র, যুবক, শ্রমিক ও মেহনতী জনতাকে। জনতা মৃত্যুবরণ করেছে, পাল্টা আক্রমণ করেনি, যেমন করেছিল রাশিয়া, চীন ও কিউবায়। সরাসরি সংগ্রাম জনতার উদ্দেশ্য ছিল না; পাল্টা আক্রমণের জন্য তারা তৈরিও ছিল না। তবুও তাদের উপর গুলি করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে তাদের ৫০ জনকে। ১৭ মার্চ তাই উৎপাদন করতে বাধ্য সে 'স্ফুলিঙ্গ' যা বিরাটাকার অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে।

তিন

১৭ মার্চের ঘটনা সত্যিই সেই স্ফুলিঙ্গ যা বাংলাদেশে বিজয়ী বিপ্লবের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করতে বাধ্য। কারণ ১৭ মার্চের শিক্ষা সর্বোতভাবে বিপ্লবী। প্রথমত, ১৭ মার্চ প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশের আজকের পরিস্থিতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সাধারণ হরতাল সংগ্রামের স্বাধীন ও প্রধান ধরন হিসাবে প্রায় অচল। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি বিপ্লবী ক্রিয়াই অনিবার্যভাবে জন্ম দেয় প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়া; শত্রু আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয় তার সবচেয়ে উগ্র এবং সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হতে। তৃতীয়ত, প্রতিক্রিয়ার একটি শেষসীমা আছে, যেখানে জনতা তার জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হতে বাধ্য সম্পূর্ণ বিপ্লবী পদ্ধতিতে আক্রমণের মাধ্যমে।

কেবল প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ মিছিল ও সাধারণ হরতালের মাধ্যমে যে শোষিত জনগণের মুক্তি আসতে পারে না তা নতুন কথা নয়, নতুন শিক্ষাও নয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গোড়ার কথা– দুনিয়ার প্রত্যেকটি বিপ্লবের মূল শিক্ষা। তবুও এ শিক্ষা বার বার গ্রহণ করতে হয়; এবং কেবল তাদের নিজেদের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জনগণ এ শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে আপামর জনসাধারণের সত্যিকারের শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। ১৭ মার্চের শিক্ষা প্রত্যক্ষ সংগ্রামী শিক্ষা– নির্ভুল বিপ্লবী শিক্ষা। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সে সত্যকে প্রত্যেকটি সচেতন বিপ্লবীর সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে, অথচ যা বাংলাদেশের অনেক বিপ্লবী এখনও উপলব্ধি করতে পারেননি, তা-ই জনতা উপলব্ধি করেছে ১৭ মার্চ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে।

মার্কসাবদ-লেনিনবাদের সঠিক নীতি অনুযায়ী সমাজতন্ত্র কায়েমের সংগ্রাম চালানো যায় দুটি উপায়ে; এক. বৈধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে এবং দুই. বিপ্লবী

কর্ম পদ্ধতিতে [৪]। প্রথম পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব শুধু বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিকাশের উন্নততর পর্যায়ে। অর্থাৎ যে সমস্ত ধনবাদী দেশ আজ সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে, সে সমস্ত দেশে পার্লামেন্ট, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির সহায়তায় পুঁজিবাদের চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য শ্রমিক ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণীকে শিক্ষা দেওয়া ও প্রস্তুত করা সম্ভব। কিন্তু যে সব দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এখনও সম্পূর্ণ হয়নি অর্থাৎ বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে জাতীয় স্বাধীনতা সীমিত এবং পার্লামেন্ট, ট্রেড ইউনিয়ন জাতীয় বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ নেই অথবা সে সুযোগ কার্যত অত্যন্ত সীমিত, সে সমস্ত দেশে দ্বিতীয় পদ্ধতি ছাড়া আর কোনো উপায় থাকতে পারে না। সঠিক বিশ্লেষণে বাংলাদেশে আজ বিপ্লবের দ্বিতীয় কার্যপদ্ধতিই যথোপযুক্ত।

প্রথমত, আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু কার্যত বৈদেশিক নীতি সম্পর্কীয় ব্যাপারে তার স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমিত। বাংলাদেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্পূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে সনাতন সামন্ততন্ত্র বিলুপ্ত। কৃষি ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক, কিন্তু অনুন্নত। জোতদারী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই এক রূপ; মহাজনী লগ্নির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যও মূলত ধনতান্ত্রিক। পশ্চাৎপদ অনুন্নত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মহাজনী লগ্নি অনেকদিন প্রচলিত থাকে, যেমন থাকে সামন্ততান্ত্রিক আচার ব্যবহার ও শোষণের অবশেষ।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্প-কারখানা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃহত্তম অংশ রাষ্ট্রীয়কৃত। এখানে ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রকে রূপান্তরিত করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রে এবং তারই ছত্রছায়ায় অপচেষ্টা চলছে সমাজতন্ত্রের নামে ক্ষুদে পুঁজিপতি সৃষ্টি করে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করার। ধনিক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল সরকার কখনো সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারে না।

চতুর্থত, বাংলাদেশের ভাওতাবাজ সরকারের বাহ্যিক রূপ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। এখানে পার্লামেন্ট আছে; রাজনৈতিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মঘট এবং নির্বাচন ইত্যাদির সাংবিধানিক অধিকার আছে। বাহ্যত এখানে আরও আছে ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা। কিন্তু কার্যত এই সবই অত্যন্ত সীমিত এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এ দেশে অত্যন্ত সুচতুরভাবে চালানো হচ্ছে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট শাসন ও শোষণ। এ সত্য প্রায় সর্বজনবিদিত।

বাংলাদেশে পার্লামেন্ট আছে, কিন্তু সেখানে বিরোধী দল নেই বললেই চলে। যে পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা চালু থাকলে পার্লামেন্টে কোনোদিন বিরোধী দলের অভ্যুদয় হবে কি না তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিগত প্রত্যেকটি উপনির্বাচনই তার প্রমাণ। জনসাধারণ ভোট দেয় একজনকে, জিতে যায় আরেকজন। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে বিরোধী দলীয় প্রার্থীর কোনো লোককে নির্বাচনকেন্দ্রে যেতে দেওয়া হয় না; বেগতিক অবস্থায় ব্যালট বাক্স ছিনতাই করা হয়। নির্বাচন জয় করা হয় টাকা, গুণ্ডামী ও অস্ত্রের মাধ্যমে। এ হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও তথাকথিত 'মুজিববাদী' গণতন্ত্রের ধরন।

শুধু জাতীয় সংসদের নির্বাচনই অস্ত্রবলে জেতা হয়নি, এ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিকাংশ কলেজের ছাত্র পরিষদ নির্বাচনে। এর একটু ব্যতিক্রম হয়েছে বিগত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে। তার প্রধান কারণ ছিল আওয়ামী

লীগ ও তার তাঁবেদার রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব– ফলে আওয়ামী লীগ সরাসরি কোনো প্রতিনিধি নির্বাচনে মনোনয়ন দান করতে পারেনি। পূর্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বিরোধী দলের পক্ষেও দলগতভাবে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। আওয়ামী লীগের তরফ থেকে সরাসরি প্রতিনিধি খাড়া না করানোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল জাতীয় পরিষদের তুলনায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচনী কেন্দ্র অনেক বেশি। এত কেন্দ্রে বলপ্রয়োগে নির্বাচন জেতা বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং আওয়ামী লীগ তা সমীচীনও মনে করেনি। কারণ সে চেষ্টা করলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিজয়ের পদ্ধতি ও রহস্য জনসমক্ষে অরও নগ্ন হয়ে পড়ত। তাই আইয়ুবখানী কায়দায় নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের ওপর কার্যত কর্তৃত্ব করার আশা ও সম্ভাবনায় আওয়ামী লীগ ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি দলগতভাবে অংশগ্রহণ করেনি। তার ফল অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। শতকরা দশ-বারোটি কেন্দ্রেও আওয়ামী লীগের লোক জয়ী হতে পারেনি (তা সত্ত্বেও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নিজস্ব দলীয় কোন্দলে আওয়ামী লীগ গুণ্ডামী ও অস্ত্রের খেলা কম খেলেনি।)

আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র, ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি যেমন প্রহসন তেমনি আওয়ামী লীগ সরকারের অনুষ্ঠিত নির্বাচনও একটি প্রহসনমাত্র। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রতিহত করার জন্য ক্ষমতাসীন সরকার ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক নিষ্পেষণ ও নিধন চালিয়ে যাচ্ছে। দলীয় গুণ্ডাবাহিনীকে মারাত্মক আধুনিক ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মী নিধনে। তদুপরি গঠন করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী– কুখ্যাত রক্ষীবাহিনী। এ বাহিনী গঠন করা হয়েছে বিদেশিদের পরামর্শে, বিদেশিদের সাহায্যে এবং বিদেশি উপদেষ্টা ও প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে। এদের প্রদান করা হয়েছে অশ্রুতপূর্ব ব্যাপক ক্ষমতা। এরা প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য কারও কাছে জবাবদিহি করে না। এরা যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময়ে যে কোনো মানুষকে বিনা ঘোষণায় বিনা কারণে গ্রেফতার করতে পারে, গুলি করে হত্যা করতে পারে, কোন লোকের মালামাল ছিনতাই ও ধ্বংস করতে পারে। হিটলারের গেষ্টাপোদের এরূপ ক্ষমতা ছিল কি না সন্দেহ।

অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত আওয়ামী লীগের দলীয় গুণ্ডাবাহিনী ও জনসাধারণের টাকায় পুষ্ট রক্ষীবাহিনী শহরে-নগরে গ্রামে-গঞ্জে দুষ্কৃতকারী দমনের নামে চালিয়ে যাচ্ছে নিদারুণ রাজনৈতিক নিষ্পেষণ। তারা বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের গুম করে ফেলে তাদের আত্মীয় নারী-পুরুষের ওপর চালায় অশ্রুতপূর্ব নির্যাতন। এক থানার যুবকের মাথা কেটে ফেলে আসে অন্য থানায়। একাত্তরের অধিকাংশ বীর মুক্তিযোদ্ধা দিবারাত্র আত্মগোপন করে থাকে তাদের ভয়ে। কারণ এদের নির্মূল করা রক্ষীবাহিনীর অন্যতম দায়িত্ব। এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকই আজ মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পেরেছে, কেবল জনসভায় প্রতিবাদ করে ও বিক্ষোভ মিছিল করে রক্ষীবাহিনীর রাজনৈতিক ও সামাজিক নির্যাতনের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

যে পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কথা বলে এবং আন্দোলন করে অস্ত্রের মাধ্যমে; যে দেশে ক্ষমতাসীন সরকার বিশেষ রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে চালায় দমননীতি; যে দেশে অস্ত্রের ঝংকারে ছিনতাই, রাহাজানি, রাজনৈতিক হত্যা, গুপ্ত খুন

ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার; যে দেশের সরকার সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ায় অথচ সমাজতন্ত্রের শত্রুদের আশ্রয় দেয় এবং পরিতুষ্ট করে অথচ সরকারি নিষ্পেষণযন্ত্রের মাধ্যমে নির্বিচারে হত্যা করে শ্রমিক কৃষক মেহনতী জনতা ও তাদের রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীদের, সে পরিস্থিতি ও সে দেশে তথাকথিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

বাংলাদেশের জনসাধারণের সার্বিক মুক্তি আসতে পারে কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে, পরিষদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। এ সত্য প্রত্যেকটি বিপ্লবী কর্মীকে অনুধাবন করতে হবে এবং বাংলাদেশের শ্রমিক কৃষক ও মেহনতী জনতাকে অনুধাবন করাতে হবে। এই হচ্ছে ১৭ মার্চের বিপ্লবী শিক্ষা।

চার

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সম্ভব নয়; বিপ্লবী অন্তর্মুখী শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এ সত্য ১৭ মার্চের মহান শিক্ষার একটি দিক মাত্র। শুধু বাহ্যিক অভিব্যক্তি দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তির বিচার করা যেমন অবৈজ্ঞানিক তেমনি ১৭ মার্চের ঘটনা থেকে বিপ্লবের অন্তর্মুখী শক্তির বিচার করাও অযৌক্তিক। ১৭ মার্চ একদিকে যেমন প্রমাণ করেছে বিপ্লবের অনিবার্যতা, তেমনি অপরদিকে তা প্রমাণ করেছে বিপ্লবীদের সংগঠনের দুর্বলতা। একথা অতি সত্য যে বিপ্লবী পরিস্থিতিতেও বিপ্লবীরা এখনও ১৭ মার্চের শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেনি।

বিপ্লবীদের এ সাংগঠনিক দুর্বলতাকে যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে অতিক্রম করতে হবে। ১৭ মার্চের বিপ্লবী শিক্ষার তাৎপর্য জনসাধারণকে সম্যক ও ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করাতে হবে। যেহেতু আন্দোলন এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমেই জনতার শিক্ষা ও উপলব্ধি গভীরতর ও ব্যাপকতর হয়, সেহেতু বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার জন্য এবং জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতির পাশাপাশি শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মেহনতী জনতার নিজস্ব সংগঠনসমূহের মাধ্যমে গণআন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে এবং তাকে প্রতিদিন বলিষ্ঠ ও তীক্ষ্ণ করে তুলতে হবে। বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণের কাছে থেকে গুপ্ত রাখা এবং বিপ্লবীদের আত্মপ্রতারণা একই কথা।

মার্কস আমাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন, বিপ্লবী অভ্যুত্থান একটি আর্ট; তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাহসী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আক্রমণ। প্রতিক্রিয়াশীলদের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবীদের বিপ্লবী রণকৌশলের কথা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ রাখতে হবে এবং তার জন্য সাংগঠনিক শক্তি দ্রুত গড়ে তুলতে হবে। বিপ্লবের আত্মমুখি শক্তি সম্পর্কীয় এই শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার অক্ষমতা হবে মহান ১৭ মার্চের মহান মূল্যায়নের ব্যর্থতা।

বিপ্লব অনিবার্য।
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।

টীকা

১. ভ. ই. লেনিন, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডিমোক্রেসির দুটি কর্মকৌশল, সিলেকটেড ওয়ার্কস, ভলিউম ১, মস্কো, ১৯৬০, পৃ. ৫২৩।
২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল; ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের ভিত্তি ও কর্মসূচি।
৩. ভ. ই. লেনিন; ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের বার্ষিকীতে বক্তৃতা, কালেকটেড ওয়ার্কস, ভলিউম ৩০, পৃ. ২৭৭।
৪. মাও সে তুঙ; যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা, বিদেশি ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং, ১৯৭০।
৫. একটি স্ফুলিঙ্গই বিরাটাকারের অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে, বিদেশি ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং, ১৯৬৮।
৬. গ্রানমা ২৬ জুলাই, ১৯৭৩।

রক্তাক্ত রবিবার : ১৯০৫ সালের ২২ জানুয়ারি 'রবিবার দিবসে' সেন্ট পিটার্সবার্গে স্বৈরাচারী জার হাজার হাজার নিরপরাধ নিরস্ত্র শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে। লেনিন এই ঘটনাকে রাশিয়ার বিপ্লবের আরম্ভ বলে আখ্যায়িত করেন এবং ইতিহাসে ঐ দিনটি 'রক্তাক্ত রবিবার' বলে পরিচিত হয়। ঐ দিনে ধর্মভীরু যাজক গেপনের নেতৃত্বে হাজার হাজার শ্রমিক ইউনটারপ্যালেশ-এর সম্মুখে সমবেত হয়েছিল রুশ সম্রাট জারের নিকট এক গণদরখাস্ত পেশ করতে। জার গণদরখাস্ত পেশকারী শ্রমিকদের দর্শন না দিয়ে তার সেনাবাহিনী ও ভাড়াটিয়া কজাক গুণ্ডাদের দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে।

মস্কো অভ্যুত্থান : ১৯০৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর মস্কোতে স্টিল শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে শ্রমিক ও জারের সামরিক বাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষ বাঁধে। ৯ দিনব্যাপি প্রায় ৮ হাজার শ্রমিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহী দল জারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করে। পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়িয়েছিল যে জার তার মস্কো গ্যারিসনকে বিশ্বাস করতে পারেনি, ইহাকে তালাবদ্ধ করে রাখে এবং বিদ্রোহকে দমন করার জন্য সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে সেমিওনভস্কি রেজিমেন্টকে আনয়ন করে। লেনিনের মতে 'মস্কো অভ্যুত্থান' ছিল সেই লাখ লাখ স্ফুলিঙ্গের একটি যা বিপ্লবের লেলিহান দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে।

চীনের ৪ ঠা মে'র আন্দোলন : এ আন্দোলনটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন, যা ১৯১৯ সালের ৪ মে তারিখে শুরু হয়েছিল। সেই বছরের প্রথমার্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীরা প্যারিসে এক বৈঠকে চীনের শানতোং প্রদেশে আগের দিনে জার্মানি যে সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করত সেগুলো জাপান পাবে বলে স্থির করেছিল। ৪ মে তারিখে পিকিংয়ের ছাত্ররা সর্বপ্রথম সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করে দৃঢ়ভাবে তার প্রতিবাদ করেছিল। উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার অসংখ্য ছাত্রকে গ্রেফতার করে। প্রতিবাদে পিকিং-এ এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছাত্ররা সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করে। জুন মাসে এ আন্দোলন সাংহাইসহ অন্যান্য বড় শহরে শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘট ও সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হয়ে ছাত্র আন্দোলনকে দেশব্যাপী স্বদেশপ্রেমী আন্দোলনে রূপান্তরিত করে।

চীনে ৩০ মে'র হত্যাকাণ্ড : এই দিনে সাংহাই-এ ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক চীনা জনগণকে হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য সারা দেশের জনগণ এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিল। ১৫ মে সাংহাইয়ে জাপানী সুতাকলের মালিক কুচেং-হোং নামক একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং ১০ জনের বেশি শ্রমিক আহত হয়। ২৮ তারিখে ছিং তাউ-এ সরকার ৮ জন শ্রমিককে হত্যা করে। ৩০ মে সাংহাই-এ দু'হাজারের বেশি ছাত্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বিদেশীদের এলাকাগুলোতে শ্রমিকদের পক্ষে প্রচার চালায় এবং এলাকা ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানায়। ব্রিটিশ এলাকার পুলিশ হেড কোয়ার্টারের সম্মুখে দশ হাজারের অধিক লোক

সমবেত হয় এবং বজ্র নিনাদে আওয়াজ তোলে 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালায়; ফলে শত শত ছাত্র আহত হয়। এই ঘটনাই *৩০ মে'র হত্যাকাণ্ড* বলে পরিচিত।

২৬ শে জুলাই : মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও তাঁবেদার বাতিস্তার গণনিষ্পেষণে কিউবার প্রতিটি মানুষ তখন অতিষ্ঠ। গণতান্ত্রিক বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাতিস্তা ও তার মার্কিন প্রভুদের কবল থেকে দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তি ছিনিয়ে আনা অসম্ভব একথা বুঝতে পেরে, সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা হিসেবে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে ১৬৫ জন তরুণ বিপ্লবী ১৯৫৩ সালের ২৬ জুলাই মনকাডা দুর্গ আক্রমণ করে। দক্ষিণাঞ্চলীয় সেন্টিয়াগো দ্য কিউবা শহরে অবস্থিত মনকাডা দুর্গ ছিল কিউবার দ্বিতীয় প্রধান সামরিক ঘাঁটি এবং ১ নম্বর এন্টোনিওম্যাসি ও রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টার্স। এই আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং বিপ্লবীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরদিন থেকে শুরু হয় বিপ্লবীদের ছেঁকে তোলার কাজ। ওই মনকাডা দুর্গের মধ্যেই ৫০ জন বিপ্লবী এবং কয়েকজন নিরীহ মানুষকে ধরে এনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পয়লা আগস্ট তারিখে সিয়েরা মায়েস্ত্রায় পালিয়ে যাওয়ার পথে ফিডেল ক্যাস্ট্রোও দুজন সঙ্গীসহ ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর জেল হয় এবং তাঁকে পাইনস দ্বীপের কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনকাডা দুর্গ আক্রমণ ছিল হঠকারী। কিন্তু তার সাড়ে পাঁচ বছর পর ১৯৫৯ সালের পয়লা জানুয়ারি যেদিন বাতিস্তার পতন ও বিপ্লবী জনতার বিজয় সূচিত হয় সেদিনই সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়– মনকাডা দুর্গের বিপ্লবী ঘটনা তাৎপর্যহীন নয়। এই দুর্গে আক্রমণের নেতা হিসেবে অভিযুক্ত ফিদেল আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর বিখ্যাত 'ইতিহাস আমাকে মুক্ত করবে' শীর্ষক জবানবন্দিতে বলেছিলেন, 'তৎকালীন বাস্তব ও সাংগঠনিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের চরম অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ একমাত্র এই উপায়েই সম্ভবপর ছিল।'

হুবহু উদ্ধৃত

তেরো

সাম্যবাদ দ্বিতীয় সংখ্যা

বিপ্লবীদের মুখপত্র

বিপ্লবী গণবাহিনী সম্পর্কে

১. গণবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা

শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী সংঘর্ষ শ্রেণীভিত্তিক সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের প্রধান চালিকা শক্তি। বিকাশের পথে সামাজিক বিবর্তন ঘটে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে। শ্রেণী বিরোধ এবং শ্রেণী সংঘর্ষ এমন এক পর্যায়ে উপস্থিত হতে পারে যেখানে শ্রেণীযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই লেনিন বলেছেন, যারা শ্রেণী সংগ্রাম স্বীকার করে তারা গৃহযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারে না, কারণ শ্রেণী বিভক্ত সমাজে গৃহযুদ্ধ শ্রেণী সংগ্রামেরই একটি স্বাভাবিক এবং কোনো কোনো পরিস্থিতিতে অনিবার্য পরিণতি (১, পৃ. ৭৮)। মাও সেতুঙ বলেছেন, যুদ্ধ হচ্ছে বিরোধ মীমাংসার জন্য সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ (২, পৃ. ১৮০)।

যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে, তাদের কাছে সমাজ বিপ্লব একটি সুনিশ্চিত এবং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য। স্মরণ রাখতে হবে, রাজনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সংগ্রাম এবং রাষ্ট্র হচ্ছে ক্ষমতাসীন শ্রেণীগুলোর আধিপত্য প্রয়োগ করার অপরিহার্য হাতিয়ার। সমাজে যতদিন শ্রেণী বিভেদ ও শ্রেণী দ্বন্দ্ব থাকবে, ততদিন রাষ্ট্র থাকবে, আর থাকবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সংগ্রাম।

রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম সর্বতোভাবে শ্রেণী সংগ্রাম। সময় সময় এ সংগ্রাম শ্রেণীযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। শ্রেণীযুদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রাম। সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ক্ষমতা ধ্বংস করা যেত না; পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে; সমাজ বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র এবং সমাজ বিপ্লব অবিচ্ছেদ্য।

পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন থাকে পুঁজিপতি তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিরা। রাষ্ট্রের সংগঠিত (সৈন্য ও পুলিশ) বাহিনীসমূহের সাহায্যে তারা নিজেদের কর্তৃত্ব, শাসন ও শোষণ টিকিয়ে রাখে। শোষিত শ্রেণীগুলোর একাংশকে তারা ছল, বল, কৌশল এবং ঘুষের মাধ্যমে নিজেদের পক্ষে রাখার চেষ্টা করে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র– সংসদীয় গণতন্ত্র হচ্ছে শোষিত শ্রেণীসমূহকে প্রতারণা করার যন্ত্র। কারণ শোষিত জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিরা বুর্জোয়া সংসদে নির্বাচিত হতে পারে না। তাই শোষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই বুর্জোয়া মেকী গণতন্ত্রের ভিতকে আক্রমণ করে। এরূপ আক্রমণের উন্নততর পর্যায়ে এসবকে রক্ষা করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের

সশস্ত্র বাহিনীসমূহ। এই হচ্ছে সকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শোষিত শ্রেণীসমূহের চিরন্তন অভিজ্ঞতা।

আজকের দুনিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এ যুগ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ। পুঁজিবাদ আজ মুমূর্ষু। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা আজ প্রতিক্রিয়াশীল ও অচল। পুঁজিবাদের ধ্বংস তাই অনিবার্য। পুঁজিবাদী সমাজে শোষিত শ্রেণীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীগুলোর হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া এবং ক্ষমতা দখল করে বুর্জোয়া শ্রেণীগুলোকে ধ্বংস করা।

রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শোষিত শ্রেণীসমূহের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম। এ সংগ্রামের পুরোভাগে থাকবে সর্বহারার অগ্রণী; অর্থাৎ সর্বহারা ও শোষিত শ্রেণীসমূহের রাজনৈতিক পার্টি। এ পার্টি নির্ধারণ করবে সংগ্রামের রাজনৈতিক লাইন, রণনীতি এবং রণকৌশল।

অতি উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মাধ্যমে সর্বহারার রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতা দখলের শেষ সংগ্রাম সশস্ত্র হতে বাধ্য। অনেক অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী এবং আধা-পুঁজিবাদী দেশের শোষিত জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু থেকেই সশস্ত্র হতে বাধ্য। কারণ এসব দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর এক অংশ রাষ্ট্রক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আঁতাত করে; সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় নিজেদের অস্ত্রশক্তি বৃদ্ধি করে, সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশ ও পরামর্শে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে এবং তাদের ওপর চালায় অমানুষিক রাজনৈতিক নিষ্পেষণ; নিদারুণ দমন নীতির মাধ্যমে শোষিত জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং তাদের রাজনৈতিক দলকে নিঃশেষ ও নির্মূল করার চেষ্টা করে।

তাই এসব দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম চালনা করার জন্য চাই সর্বহারার অগ্রণী নেতৃত্বে শোষিত শ্রেণীগুলোর সুসংগঠিত সশস্ত্র বাহিনী। এমনকি সর্বহারার অগ্রণীকেও হতে হবে সর্বতোভাবে একটি 'সামরিক পার্টি' (৩, পৃ. ২৫)। লেনিন বলেছেন, বিপ্লবী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন এজন্য যে, কেবল শক্তিবলেই বৃহত্তর ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং আধুনিক সংগ্রামে শক্তিবল সংগঠনের অর্থই হচ্ছে সামরিক সংগঠন (৪, পৃ. ৫৬৫)। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে যুদ্ধ অনিবার্য ও অপরিহার্য। যুদ্ধ বিরোধ মীমাংসার জন্য সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ। পুঁজিবাদী সমাজে জনগণের শোষণকারী ও নির্যাতনকারী শ্রেণীসমূহকে নির্মূল করার যুদ্ধই হচ্ছে একমাত্র আইনসঙ্গত যুদ্ধ (৪, পৃ. ৫৬৫)।

২. গণবাহিনীর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য

বিপ্লবী গণবাহিনীর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে গণবাহিনী ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাড়াটিয়া বাহিনীর প্রভেদ বোঝা প্রয়োজন। শোষক শ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য বিভিন্ন বাহিনী গড়ে তোলে। এসব ভাড়াটিয়া বাহিনী। এদের ব্যবহার করা হয় জনগণের আন্দোলনকে রোধ করার জন্য। শোষক শ্রেণীর সঙ্গে এ বাহিনীগুলোর কোনো আদর্শগত যোগাযোগ নেই।

তাই শোষক শ্রেণী একটি বাহিনীর উপর নির্ভর করতে পারে না। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা গঠন করে বিভিন্ন বিকল্প বাহিনী। এরূপ বাহিনীগুলোকে সযত্নে জনগণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। এরা ব্যারাকে থাকে; উৎপাদনের সঙ্গে তারা কোনোভাবেই জড়িত নয়, রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শোষক শ্রেণী দেশরক্ষা, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভাওতা দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখে।

গণবাহিনী হচ্ছে শোষিত শ্রেণীসমূহের রাজনৈতিক আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার, গণবিপ্লবের বাহক। গণবাহিনী সর্বহারার রাজনৈতিক পার্টির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শোষিত জনগণের অধিকার– রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং রক্ষা করাই এই বাহিনীর একমাত্র কর্তব্য। জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিবিড়। বিভিন্ন পর্যায়ে তারা জনগণের সঙ্গে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। জনগণের রাজনীতির সঙ্গে তারা সুপরিচিত এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তারা জনগণের রাজনৈতিক চেতনা তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে, নিজেদের রাজনৈতিক সচেতনতা অব্যাহতভাবে বিকশিত করে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে ধ্বংস করাই গণবাহিনীর সামরিক কর্তব্য।

৩. গণবাহিনী ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ

গণবাহিনী গড়ে ওঠে জনগণের সামগ্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনগুলো একসময় এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যখন সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া জনগণের সামনে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আর কোনো পথ থাকে না– সে পর্যায়ে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। জনগণের এই সশস্ত্র সংগ্রামকে সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক রূপ দিলেই গড়ে ওঠে গণবাহিনী। গণবাহিনী বিকাশের জন্য তাই প্রয়োজন পার্টি পরিচালিত বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলন।

রাজনীতিকে সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অবৈজ্ঞানিক। গণবাহিনীর সশস্ত্র সংগ্রাম শুধু সামরিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয়, জনগণের বিপ্লবী রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা তার প্রধান উদ্দেশ্য। যদি শুধু আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার জন্যই গণবাহিনী ব্যবহার করা হয় তবে তার বিকাশ ব্যাহত হবে, তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং সামরিক লক্ষ্য অর্জিত হলেও তারা পরিণামে একটি প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীতে রূপান্তরিত হবে।

অস্ত্র হাতে নিয়ে গণবাহিনীর সদস্য হওয়ার অর্থ রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়া নয়। পক্ষান্তরে গণবাহিনীর সদস্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে আরো ব্যাপকভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। কারণ গণবাহিনীর প্রত্যেকটি কার্যকলাপ জনগণ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে। অনাদিকাল থেকে অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা নানাভাবে জনগণকে উৎপীড়ন করেছে। তারা উৎপীড়িত হয়েছে অস্ত্রধারী ডাকাতের হাতে, উৎপীড়িত হয়েছে অস্ত্রধারী পুলিশের হাতে, উৎপীড়িত হয়েছে অস্ত্রধারী বিভিন্ন সামরিক বাহিনীর হাতে। তারা সেই উৎপীড়নকে ভয় করে। তারা অস্ত্রধারী ব্যক্তিদের ভয় করে।

তাই গণবাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যকে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হতে হবে যেন তাদের কোনো কার্যকলাপ জনগণের মনে ভয়ের উদ্রেক না করে। প্রত্যেকটি এলাকায় তাই প্রয়োজন গণবাহিনীর সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততার। সেই সম্পৃক্ততা আসবে শত্রু এবং

জনগণের ভিতরকার দ্বন্দ্বগুলোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক সচেতনতা ও মতাদর্শগত বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে।

মাও সেতুঙ বলেছেন, সৈন্যরা সামরিক বাহিনীর ভিত্তি, কিন্তু তারা যদি প্রগতিশীল রাজনৈতিক অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ না হয় এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে যদি তাদের মধ্যে এরূপ অনুপ্রেরণার উন্মেষ না হয়, তবে অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে সত্যিকার ঐক্য গড়ে উঠবে না; সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ করার উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে না (৫, পৃ. ১৮৫)। মাও সেতুঙ আরো বলেছেন, যুদ্ধ পরিচালনা করার শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস হচ্ছে জনসাধারণ (৯৫, পৃ. ১৮৬)। জনসাধারণের সঙ্গে মতাদর্শগত ঐক্য, জনসাধারণের সর্ববৃহৎ স্বার্থের সঙ্গে একাত্মবোধই হবে বিপ্লবী গণবাহিনীর গঠন, বিকাশ, সামর্থ্য, শক্তি ও বিজয়ের প্রাথমিক শর্ত।

৪. রাজনৈতিক কার্যকলাপের মূল নীতিমালা

মাও সেতুঙ বিপ্লবী গণবাহিনীর রাজনৈতিক কার্যকলাপের তিনটি নীতি (৫, পৃ. ৫৩, ১৮৬) নির্ধারণ করেছেন। এসব নীতি সার্বজনীন এবং যে কোনো দেশের গণবাহিনীর বেলায়ও অবশ্যই প্রযোজ্য।

এক. *অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে ঐক্য* : এ ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আবশ্যিক শর্তাবলি হচ্ছে : সেনাবাহিনীর পরিচালনা থেকে সকল প্রকারের সামন্তবাদী আচরণের উৎখাত, সচেতন শৃঙ্খলা গড়ে তোলা, বাহিনীর সকল সভ্যদের মধ্যে সুখ ও দুঃখ-দুর্দশায় অংশগ্রহণ করার মনোভাব ও অভ্যাসের প্রবর্তন করা।

দুই. *গণবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য* : এ ঐক্য গড়ে তোলার আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে– গণবাহিনীর সভ্যদের মধ্যে এমন শৃঙ্খলা গড়ে তোলা, যার ফলে গণস্বার্থের সামান্যতম ক্ষতিসাধন করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব; জনগণের মধ্যে মতাদর্শগত প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া; তাদের সংগঠিত ও সশস্ত্র করা; তাদের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা; তাদের আর্থিক ভার কমানো; তাদের উৎপাদন এবং অন্যান্য সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় কাজে সহায়তা করা; জনগণের শত্রুদের নিপাত করা।

তিন. *শত্রু বাহিনীতে ভাঙন ধরানো এবং যুদ্ধবন্দিদের প্রতি অমায়িক হওয়া* :

বুর্জোয়া সেনাবাহিনী ভাড়াটিয়া বাহিনী। কিন্তু সে বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের সন্তান। জনগণের সঙ্গে, জনগণের স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের বিরোধ নেই। শত্রুবাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে তাই মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে তাদের জনসাধারণের পক্ষে; গণবাহিনীর পক্ষে টেনে আনতে হবে। যুদ্ধবন্দিদের প্রতি অমায়িক ব্যবহার, ধৃত ও আহত শত্রু সৈন্যের যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা এবং তাদের সঙ্গে অবিরাম মতাদর্শগত আলোচনা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতাকে তীক্ষ্ণ করে, বিপ্লবী সৈন্যে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে।

বলা বাহুল্য, গণবাহিনীর মতাদর্শগত দীক্ষা ও শিক্ষা, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করা, এসব আন্দোলনেরত বিভিন্ন গণসংগঠনের কাজে সহায়তা করা, জনসাধারণের সঙ্গে এবং জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করা, জনসাধারণের সঙ্গে সর্বতোভাবে একাত্ম হওয়াই হচ্ছে বিপ্লবী গণবাহিনীর জীবনী শক্তি।

গণবাহিনীর রাজনৈতিক দীক্ষা, শিক্ষা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা কেবল তখনই সম্ভব যখন তারা সর্বহারার অগ্রণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, যখন তারা সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় এবং যখন তারা এরূপ রাজনৈতিক দলের প্রভাব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে চলে। স্মরণ রাখতে হবে, 'রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হচ্ছে বন্দুকের নল', কিন্তু বন্দুক অবশ্যই থাকবে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বে। 'পার্টি বন্দুককে পরিচালনা করে, বন্দুককে কোনো মতে পার্টির ওপর পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না।' (৬, পৃ. ১৬)।

৫. শৃঙ্খলা ও আচরণের আবশ্যিক নীতিমালা

বিপ্লবী গণবাহিনীর উপরে বর্ণিত চরিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ তখনই সম্ভব যখন গণবাহিনী কয়েকটি অপরিহার্য নীতির ভিত্তিতে তার শৃঙ্খলা ও আচরণ গড়ে তোলে। মাও সেতুঙ বর্ণিত (৬, পৃ. ১৫৫) নীতিগুলো প্রায় সার্বজনীন এবং বিপ্লবী গণবাহিনীর জন্য অবশ্য করণীয়।

শৃঙ্খলা নীতি

১। সকল কাজে আদেশ মেনে চলা;
২। জনসাধারণের একটি সূচও আত্মসাৎ না করা;
৩। ধৃত অথবা সংগৃহীত সবকিছু জমা দেওয়া।

আচরণের নীতি

১। নম্রভাবে কথা বলা;
২। খরিদে যথোপযুক্ত মূল্য প্রদান করা;
৩। কর্জ ফেরত দেওয়া;
৪। নিজে কোনো ক্ষতি সাধন করলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া;
৫। জনসাধারণকে আঘাত না করা;
৬। ফসল নষ্ট না করা;
৭। নারীর প্রতি অনাচার না করা; এবং
৮। বন্দিদের প্রতি অগ্ন্যবহার না করা।

৬. বাংলাদেশ ও বিপ্লবী যুদ্ধ

'বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল; যুদ্ধের দ্বারা সমস্যার সমাধান'– মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই বিপ্লবী নীতি সর্বত্রই প্রযোজ্য। কিন্তু নীতি এক হলেও সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি ভিন্ন পরিবেশে একে ভিন্নভাবেই প্রয়োগ করে' (৬, পৃ. ১)। মাও সেতুঙ বর্ণিত এ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি বাংলাদেশে আজ শুধু প্রযোজ্যই নয়, কার্যকরীও বটে। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন অথর্ব, প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্রাজ্যবাদ, সংশোধনবাদ ও আধিপত্যবাদীদের সঙ্গে আঁতাতকারী আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম চলে আসছে বিগত তিন বছর ধরে। অথচ এ বাস্তব সত্য থেকে সঠিক রাজনৈতিক শিক্ষা অধিকাংশ মার্কসবাদী সংগঠনই গ্রহণ করতে পারেনি। তার কারণও সুস্পষ্ট।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মার্কসবাদী দল এ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধে সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারেনি। কারণ তারা কেতাবী মার্কসবাদী। বাস্তবের

সঙ্গে তাদের সম্পর্কও কেতাবী। ফলে তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের সংগঠন গণভিত্তিক নয়। তাই জনসাধারণ তাদের শক্তির উৎস নয়। কিছু সংখ্যক মার্কসবাদী সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন চালনা করার চেষ্টা করেছেন অথবা করছেন। তাদের প্রয়াসও বিক্ষিপ্ত। যেহেতু তাদের রাজনৈতিক লাইন ভ্রান্ত সেহেতু তাদের রণনীতি ও রণকৌশলও ভ্রান্ত। তাদের প্রয়াস জনগণকে সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি, জনতাকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করতে পারেনি, সংগঠিত করতে পারেনি। স্থানে স্থানে তারা জনগণের নেতিবাচক সমর্থন পেয়েছেন বটে, কিন্তু তাদের প্রয়াস সন্ত্রাসবাদী দুঃসাহসিকতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এরূপ পেটি বুর্জোয়া অতি বিপ্লবী কার্যকলাপ সব সময় বিপ্লবের পরিপন্থী হয়ে ওঠে, প্রতিবিপ্লবীদের শক্তিশালী করার সহায়ক হয়; সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের দালালদের চক্রান্তকে কার্যকরী করতে সাহায্য করে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশে যে মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়েছিল তাকে এ দেশের উঠতি পুঁজিপতি ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধীরা সাম্রাজ্যবাদ, সংশোধনবাদ ও আধিপত্যবাদীদের সঙ্গে আঁতাত করে মাঝপথে থামিয়ে দেয়। বহিঃশক্তির সহায়তায় তারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করে এবং নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে অসম্পূর্ণ রেখে দেয়। সাম্রাজ্যবাদী যুগে সকল দেশের বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়ারা তাই করতে বাধ্য। এ যুগে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে পারে কেবল সর্বহারা এবং অন্যান্য শোষিত শ্রেণীসমূহ তাদের অগ্রণীর নেতৃত্বে।

বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্পূর্ণ রেখেই ক্ষান্ত হয়নি, বুর্জোয়া ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় এ দেশে পুঁজিবাদের বিকাশকে নিশ্চিত করার সুচতুর নীতি-কৌশল ও কর্মকৌশলও তারা গ্রহণ করেছে। তারা সমাজতন্ত্রের নামে বৃহৎ শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাংক ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত করেছে; কৃষি ও শিল্পে ছোট ও মধ্যম ব্যক্তিমালিকানাকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছে; রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় নব্য পুঁজিপতি শ্রেণী তৈরি করে পুঁজিবাদের অপ্রতিহত ও ত্বরান্বিত বিকাশের পূর্বশর্তসমূহ তৈরি করার চেষ্টা করছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কায়দায় সংবিধান প্রণয়ন করে 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেছে। বাস্তবে তারা এসব করেছে ফ্যাসিস্টসুলভ রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে, সরকারি এবং দলীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সহায়তায়।

এসব ধোঁকাবাজী প্রবর্তন করতে আওয়ামী লীগ সরকারকে আশ্রয় নিতে হয়েছে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক দুর্নীতিপরায়ণতার ছত্রছায়ায়। তার প্রতিক্রিয়া ক্ষমতাসীন দলের জন্য আত্মঘাতি হতে বাধ্য ছিল এবং হয়েছেও তা-ই। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়েছে। উৎপাদনে এসেছে নৈরাজ্য ও দুর্নীতি, উৎপাদন কমেছে; মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে প্রায় ৫-৬ গুণ; খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষে লক্ষ জনতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, বাস্তুহারা হয়েছে, দেশ দেউলিয়া হয়েছে; সাম্রাজ্যবাদের কাছে দেশকে বিক্রয় করা হচ্ছে। সামাজিক নৈরাজ্য অবর্ণনীয়, দেশে আইন নেই, শৃঙ্খলা নেই– নেই জানমালের নিরাপত্তা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চলছে অশ্রুতপূর্ব অনিশ্চয়তা ও নৈরাজ্য। আওয়ামী লীগ জনতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায়। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে নিদারুণ দমননীতির

মাধ্যমে। এ দমন নীতি চালানো হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি সশস্ত্রবাহিনীর সহায়তায়। ভ্রান্ত রাজনীতি ও সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য অধিকাংশ বিরোধী দল অবতীর্ণ হয়েছে সুবিধাবাদী ভূমিকায়। ফলে ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠি তার সুযোগ ওঠাচ্ছে রাজনৈতিক নিষ্পেষণকে আরো তীব্র ও ব্যাপক করে।

প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল ও সরকার যখন দুর্বল ও দুর্নীতিবাজ হয়ে পড়ে তখন তারা স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। নিজেদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য তারা দমন নীতিকে আরও তীব্র করে তোলে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সংকুচিত করে। বিগত তিনবছরে অপদার্থ ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে খুন করেছে, হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে জেলে পুরেছে; বিদেশি শক্তির সহায়তায় ঘৃণ্য রক্ষীবাহিনী ও গুপ্তঘাতক বাহিনী গঠন করে জনসাধারণের ওপর চালিয়েছে অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্পেষণ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসাধারণ এ দমননীতির মোকাবেলা করে আসছে।

আজ সামগ্রিক পরিস্থিতি এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। পতনোন্মুখ আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক ক্ষমতা বহাল রাখার জন্য মরিয়া হয়ে চালাচ্ছে শেষ প্রচেষ্টা। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে তারা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্র খতম করে ফ্যাসিস্ট কায়দায় একদলীয় একনায়কত্ব কায়েম করার ষড়যন্ত্র করছে। অস্ত্রবলে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও প্রতিরোধকে ভেঙে চুরমার করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

এসব করা হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে। মুজিব সরকার বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রকে প্রতিহত করে ধনতন্ত্র স্থাপনে বিশ্বাসী। এ সরকারের বড় বড় আমলারা সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় এ ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা স্বৈরাচারী 'আইয়ুবতন্ত্র'-এর কায়দায় বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এ প্রচেষ্টায় পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবীরাও তাদের সহায়তা করতে পারে।

বিপ্লবীদের আজ অবশ্যই এরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। বাংলাদেশের নিপীড়িত জনসাধারণ আজ মৌলিক পরিবর্তন চায়– চায় কার্যকরী পরিবর্তন। জনসাধারণের এ মনোভাবকে বিপ্লবের সপক্ষে টেনে আনতে হবে। তার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করতে হবে। যেখানে তথাকথিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার নেই, যেখানে জনগণের প্রত্যেকটি প্রতিবাদকে নিঃশব্দ করে দেওয়া হয় অস্ত্রের ঝংকারে, সেখানে অস্ত্রই হবে 'গণতান্ত্রিক' রাজনৈতিক আন্দোলনের একমাত্র রূপ। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই আমাদের 'সংগ্রামের প্রধান রূপ হচ্ছে যুদ্ধ আর সংগঠনের প্রধান রূপ হচ্ছে সৈন্যবাহিনী। গণসংগঠন ও গণসংগ্রামের মতো অন্যান্য সমস্ত কিছুও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত অপরিহার্য; কোনো অবস্থাতেই এদের উপেক্ষা করা উচিত নয়; কিন্তু এগুলো সবই যুদ্ধের জন্য'। (৬, পৃ. ৫)

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীর কর্তব্য হচ্ছে বিপ্লবী গণবাহিনীতে যোগ দেওয়া, এ বাহিনীকে গঠন করা, সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করা। বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের– অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে

সশস্ত্র করা; সশস্ত্র সংগ্রামের সম্মুখীন হওয়া; জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে সপক্ষে টেনে এনে সশস্ত্র যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো; বিপ্লবী গণবাহিনীকে সংগঠিত ও পরিচালনা করা। বিপ্লবী গণবাহিনীর কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির অংশ হিসেবে গড়ে তোলা, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া, জনসাধারণকে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে সংগঠিত করা, নিজেদের মতাদর্শ, সংগঠন, চরিত্র, রণকৌশল ও সামরিক শক্তির জোরে বিপ্লবী যুদ্ধে জয়ী হওয়া, বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের এ সংগ্রামে বিপ্লবী সরকারের প্রধানভিত্তি রূপে কাজ করা।

দুনিয়ার মজদুর এক হও
বিপ্লব অনিবার্য
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

টীকা

১. ভ. ই. লেনিন, 'সর্বহারা বিপ্লবের সামরিক কর্মসূচি', কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২৩, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।
২. মাও সেতুঙ, 'চীনের বিপ্লবী যুদ্ধে রণনীতির সমস্যা', নির্বাচিত রচনাবলি, খণ্ড ১, পিকিং ১৯৬৫।
৩. ভ. ই. লেনিন, 'মার্কসবাদ ও সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান', কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২৬, মস্কো, ১৯৬৪।
৪. ভ. ই. লেনিন, 'বিপ্লবী সেনাবাহিনী ও বিপ্লবী সরকার', কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ৮, মস্কো ১৯৬৫।
৫. মাও সেতুঙ, 'দীর্ঘায়িত যুদ্ধ সম্পর্কে', নির্বাচিত রচনাবলি, খণ্ড ২, পিকিং ১৯৬৫।
৬. মাও সেতুঙ, 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা', পিকিং, ১৯৭০।

The man behind the mask
Profile of Sirajul Alam Khan

June 1-15, 2002, Weekly ***Probe***

[*Political activists in Bangladesh know him as `dada'. Sirajul Alam Khan, Perhaps one of Bangladesh's most enigmatic politicians, has international connections far and wide. Just over 60 years old, he has almost become a living legend, to some extent because of his politics and also because of his offbeat lifestyle. He is part and parcel of this nation's history, but somehow no one knows much about him. There has been no research on the man and his life. He remains taciturn about himself and his colleagues too are reticent to speak about him. The following account on Sirajul Alam Khan has been drawn up on the basis of informal conversations with various persons.*]

There is a place in Noakhali named Khalifar Hat (the Caliph's marketplace). Whether it has any historical connotations to the Caliphs of Islam is hard to discern, but is was here that Sirajul Alam Khan, the uncrowned Khalifa of Bangladesh's politics, was born on January 6, 1941. A political power before even reaching 30, he perhaps is the only living legend of the country's' politics, other than perhaps Sheikh Mujibur Rahman.

His father Khurshed Alam Khan was a school inspector. His mother was Syeda Zakia Khatun. When their home was washed away by the river, the Khans moved on with their nine children to settle at Alipur of Begumganj upazila. Siraj's early education was at the local Kuripara Government Primary School and later at the Begumganj Government Pilot High School. He studied in Khulna for some time as well. In his childhood he was a good student and a good orator. He went on to study mathematics at Dhaka University.

SHAH MOAZZEM'S RECRUIT

Khan's life in university wasn't simply tied up in mathematics. This stocky, fair young man wasn't just another brilliant student at Dhaka University. While in college he began growing long hair and a beard. It was Shah Moazzem who `recruited' him to student politics. Moazzem and Obaidur Rahman sensed his potential and began grooming him, particularly as a buffer to Sheikh Moni. The Cuban revolution was an inspiration to Sirajul Alam Khan at the time. Though not a disciplined communist, he was driven by a sort of nationalist revolutionary spirit which was manifested on campus in the movement against the military ruler Ayub Khan. Sirajul Alam Khan was a product of the socialist wave that swept the world in 1960-61. He was a Marxist, lived a simple life, and was self-motivated. In achieving his political goal, he was 'not exactly a communist'.

...VERSUS SHEIKH MONI

Sirajul Alam Khan's study of mathematics didn't quite add up when the university authorities closed the doors of the department on him because of his

anti-Ayub movement. Not only did he lose his place in university, but he lost a bit of an ear too when government backed NSF hoodlums assaulted him. But all this entrenched him more firmly in politics. There was no looking back from then on.

His tussle with Sheikh Moni became 'official' when he became the General Secretary of the student front Chhatra League in 1962. Moni was backed by Mujib, while Sirajul Alam Khan proceeded forward with a secret nucleus comprising today's Awami League leader Abdur Razzak, the late JSD leader Kazi Arif Ahmed and trade union leader of primary school teachers Abul Kalam Azad.

At a time Sheikh Mujib and Awami League were in a dilemma over whether to translate their '6-point' demand into action, Siraj's nucleus 'passed' it in Chhatra League, adding the '11-point' demand as well. Chhatra League was gradually coming into control of those who were looking towards independence. With Iqbal Hall as his center, Sirajul Alam Khan had by then built an impenetrable stronghold in Dhaka. He could work tirelessly hour after hour, sometimes without food at all, and sometimes overeating. Politics had become his life. He had a propensity of picking up potential boys from processions and grooming them in politics. Abul Hasib Khan, a second generation JSD organizer, says, "He would not only inspire the boys in the movement to break Pakistan, but he could discern which person to use for particular tasks." He wielded a sort of organizational 'magic'.

Thus from 1962 till 1970 he maintained a hold over Chhatra League's overall activities. He even organized workers at Adamjee. He would spend the day at Adamjee, the night in campus. It had become a sort of routine to him. His Public contact grew steadily. It was through him that Justice Ibrahim, Professor Razzak, Rehman Sobhan, Akhlakur Rahman and others encouraged the students towards independence. The slogan Joy Bangla and the Joy Bangla Bahini (the armed force for independence) were the creations of the Siraj group.

SHEIKH MUJIB DIDN'T KEEP HIS WORD

Right up till March 25, 1971, Siraj had been Sheikh Mujib's main pillar of strength. Siraj felt that the nationalist movement would gain due coverage with Mujib in the forefront. Mujib would jokingly say, "He's my Castro. It had been decided that in the event of an army crackdown, even Mujib would go to India and the contact had been set up accordingly. But when Siraj and his people waited until March 27 at Keraniganj with no sign of Mujib's arrival, they realized that their 'leader' has decided to get caught. In the meantime, Tajuddin had officially taken leadership of the Liberation War. Sirajul Alam Khan had tripped up for the first time in his political career.

However he had already lined up a group of leaders before March 15. These included Abdur Razzak, Kazi Arif, Marshal Moni, Shahjahan Siraj, Rab, A F M Mahbubul Haq, Sharif Nurul Ambia and others. Other than Abdur Razzak, the rest remained loyal to him. They organized the Bangladesh Liberation Force (BLF) throughout 1971. Later he added the heroic commanders Major Jalil and Colonel Taher to this team.

Though BLF was formed with Tajuddin's involvement and the inclusion of Sheikh Moni, a large section of this armed force trained in Dera Doon came under Siraj's control. He would tell his close ones, I will come up with new politics in the new nation. And that is what he did in 1973 with the creation of JSD. But after 1971, he was never seen openly speaking at public meetings. His words and inspiration were manifest through his organizers. Till its inception to 1990 JSD was conducted according to his orders. However, he says, "I have only taken three political decisions in my life. One was to fight in the Liberation War, the second was to form JSD and the third was to give support and cooperation to Earshad.

It still remains a mystery as to why Sirajul Alam Khan and Moni formed BFL and why there was this investment of funds, arms and labour parallel to the mainstream Liberation War. It is generally felt that India was not willing to keep this large section of young men, who were against Tajuddin, out of their control. This was particularly true of the pro-US lobby in the Indian administration who felt it prudent to keep watch on the pro-Chinese freedom fighters and also to pick out chosen ones among them who had visible potential. Siraj was in charge of one of BLF's four sectors. He was also responsible for the political training of BLF.

HE COULD HAVE BEEN GENERAL SECRETARY OF AWAMI LIAGUE

There was dilemma in the relation between Mujib and Siraj, a sort of utilitarianism. After 1971, Siraj could no longer influence Mujib as much as he had done in pre-1969. Like Tajuddin, Siraj too was hurt by Mujib's attitude, particularly when Mujib refused to visit Mujibnagar, the site so significant for the War of Liberation. The 'US-oriented Mujib' refused to bend Siraj's 'radical' way. It is heard that Mujib had offered Siraj to become his political secretary and later General Secretary of Awami League. Why he didn't accept this offer, or whether this would have changed Bangladesh's history in any way, remains a million dollar question. Reportedly, twice before August 15, 1975. Awami League had asked Siraj to return to the fold, but at the time JSD was a force to contend with. Siraj perhaps wanted to take this force to its zenith.

BITTERNESS WITH INDIA AFTER NOVEMBER 7

There is no proof behind allegations that India backed the formation of JSD. But the Indian political party Socialist Unity Centre (SUC), had close ties with JSD. When JSD was gaining public footing in 1974, the party suddenly broke away from its people's movement and took on revolutionary programmes and attacked the residence of the Home Minister. If his disciples were taken aback by this display of arrogance, they remained silent in front of their charismatic leader Sirajul Alam Khan was careful to keep JSD's armed faction Gono Bahini free of SUC orientation. Like this incident of March 17, many of his decisions remain enshrouded in mystery. Some feel that India also lent its approval to the formation of Gono Bahini. (in 1977 when Sirajul Alam Khan was freed from jail, he forced pro-SUC elements out of the party. Just as he had built up JSD, he had direct involvement in its several break-ups too).

JSD was prepared to "do something" towards the end of 1975. But the international forces were not willing. Perhaps foreseeing the August 15 incident, Siraj went to India for two or three days at the time. But his relations with India began to crack after the November 7 uprising. This failed revolution was a grave upheaval in his political career. At the time, though he took the decision for a revolution under col. Taher's insistence, he simply disappeared from the scene for 48 hours.

While somehow coming to terms with the failure of November 7 by means of talks with Zia, the October 1977 army revolt threw him into the face of intensive interrogation, as a result of which he totally surrendered to Zia and the establishment for the rest of his term in jail. After that, his political agenda underwent a radical change. He would openly say, "Nothing can be done with this JSD."

THE POLITICAL THINKER

Prior to November 7, 1975, Sirajul Alam Khan had been an organizer. From 1962 to 1970 he was perhaps the most powerful organizer of the country and from 1971 to 1975 he was the second most powerful organizer of the country. But his organizer status died along with the failed revolution of November 7. He realized this more than anyone else. He gradually began to withdraw himself and finalized this process in 1990. From then on he has been a political thinker, not a politician. It is rather surprising that this hero of the 1969 mass movement, stood against the mass movement in 1990.

Since November 7, 1975, Siraj's connections with India were severed. Relations were so bitter that he even apprehended that he would be killed. At this juncture, Ittefaq's Anwar Hossain Manju came forward to help him grow international ties with the US. Later Professor Zillur Rahman Khan of Wisconsin University, close to Anwar Hossain Manju, helped him strengthen these ties. After the killing of Zia, Siraj managed to gain a hold in the army through the 'heroes' who had survived the Chittagong coup and who had been his followers in their student lives. This led to an alliance with General Ershad, his presence in Cabinet meetings, the formulation of the upazila system, etc. It is said that, sitting in Motijheel, he had designed the 'debate' in the House to lend credibility to the 1988 parliament.

Sirajul Alam Khan refrains from discussing current politics with journalists or others of similar standing. He remains completely tight-lipped about himself. However, he does engage in debate on political systems. He now likes to put forward an academic image. But the mysteries around him don't go away, which is why perhaps the BNP government had him jailed once after 1991. These four months were his last term in jail after 1976-77 when Ziaur Rahman sent him to prison. (He had previously been arrested in 1963). After the 'oppression and compromises in the Mymensingh jail, he changed his political ideology in 1980. He then began to say, instead of toppling the bourgeois government, they would have to reach a long-term understanding with it in order to gain a stronghold in state power. He refused to oppose the military rule. This attitude may have kept the future doors of politics open for him. It is difficult to say how he will be used in the future or how he will use the future. Among the major political parties, his relations with Awami League

are very bad at the moment, particularly with Sheikh Hasina. That is why he spent most of the past five years abroad. He returned on October 1 last year and voted in the election. "He knew BNP was going to win."

'HE CAN'T BE QUITE UNDERSTOOD'

All said and done, Sirajul Alam Khan's political career appears to be his legacy. The living members of his family are all in Dhaka. They meet together on their mother's death anniversary. A certain Basu Miah looks after their village home in Noakhali. This home consists of a small house, a tin shed and the family graves by a pond.

The people of the village do not often approach Sirajul Alam Khan. His close ones know that he does have a special place for the people of Noakhali. When asked about the distance he keeps from his home. Golam Moula who works in his Alipur house says, "He can't quite be understood." Even his political comrades share the same feeling, as they too find themselves distanced like the people of the village. He may not have cried at his mother's death, but he has never been able to check his tears at the death of his comrades. He has not severed relations with anyone, but then he doesn't open himself up to anyone either.

HE STILL DREAMS...

His lifestyle has perhaps made him as charismatic as his politics. His simple grab of panjabi pajama, his long hair and beard, his endless chats in the lobby of Sheraton for the past three decades, his walking for mile after mile down the streets, all of this has become a sort of trade mark for Sirajul Alam Khan. Press reports of his attending international seminars, complimentary copies of his books sent to important persons, all indicate that the political organizer may have 'died', but he still dreams... In a silent manner, be continues lobbying for his beliefs. Right now he has gone abroad to watch the World Cup live. Perhaps in between matches he is meeting up with those who are, in his words, "the actual policy makers of Bangladesh."

His political analysis is worlds apart from the traditionalist political thinkers and intellectuals of the country. What are his thoughts? A new political equation is in the offing and it is important to enter that new classification. Professional organizations will determine the politics of the future. Secondly, no important policy or strategy of this country is decided domestically, it is done by international powers. So it is through them that a role must be played in Bangladesh's future changes.

In the third place, in 1971 the students in Bangladesh were a striking force. Now there are only two institutions in Bangladesh that are conscious of their own interests--the army and the business community. If there is a threat to the country's sovereignty, it is only these two forces that will stand against it in their own interests. So political contacts should be with them. Lastly, the future changes in this region will be sub-regional and the people's economic interests will be prioritized. So political thinkers must concentrate on this. It is difficult to say how far the people of Bangladesh delve into political thought, but it would not be surprising to see attention turning once again to Sirajul Alam Khan in the coming wave of change to hit south Asia.

পনেরো

রাজনৈতিক সংঘাতে নিহত জাসদের নেতা-কর্মীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা

[এই তালিকায় প্রদত্ত জাসদের নিহত কর্মীদের নাম সংগৃহীত হয়েছে এই দলের প্রকাশনা 'প্রেরণার মুখ' থেকে। 'প্রেরণার মুখ' নামক প্রকাশনায় তথ্যগুলো যেভাবে ছিল সেভাবেই এখানে উপস্থাপিত হয়েছে– প্রায় হুবহু, *সম্পাদনা* বা ভাষাগত পরিবর্তন করা হয়েছে সামান্যই। লক্ষ্যণীয়, এই তালিকায় ১৯৭৫ সালের পরে নিহতদের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে সেই তথ্যকে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দৈনিক গণকণ্ঠ থেকে সংগৃহীত একটি তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে পরবর্তী সংযুক্তিতে উপস্থাপিত আওয়ামী লীগের নিহত কর্মীদের তালিকাটি সংগৃহীত হয়েছে সাংবাদিক আশরাফ কায়সারের 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড' (মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫) শীর্ষক গ্রন্থ থেকে। আশরাফ কায়সার এই তালিকাটি তৈরি করেছেন সেই সময়কার আওয়ামী লীগ সমর্থক পত্রিকা 'বাংলার বাণী' থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। বলা বাহুল্য, তালিকাগুলো নানাভাবে অসম্পূর্ণ।

উল্লেখ্য, জাসদের নিহত কর্মীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হলেও আওয়ামী লীগ কর্মীরা কেবল জাসদের হাতে নিহত হননি। সর্বহারা পার্টি, সাম্যবাদী দল, ইপিসিপিএমএল নামে পরিচিত 'পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে)' প্রভৃতি সংগঠনের হাতেও অনেক আওয়ামী কর্মী-সংগঠক মারা যায়। আবার সর্বহারা পার্টি, সাম্যবাদী দল ও ইপিসিপিএমএল-এর অনেক কর্মীও আওয়ামী লীগ এবং জাসদ কর্মীদের হাতে খুন হয়েছিল। স্থানাভাবে এই গ্রন্থের সংযুক্তিতে সকল তালিকা সন্নিবেশ করা হচ্ছে না। তিনটি তালিকা তুলে ধরা হচ্ছে।]

'প্রেরণার মুখ'

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল - জাসদ

ঢাকা

সিদ্দিকুর রহমান খান (সিদ্দিক মাস্টার) : সদস্য, জাতীয় কৃষক লীগ, কেন্দ্রীয় কমিটি ও নবাবগঞ্জ হাইস্কুলের শিক্ষক। ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে স্কুল হোস্টেলের বারান্দায় ওজু করার সময় মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা স্টেনগানের ব্রাশফায়ার করলে তাৎক্ষণিকভাবে শহীদ হন।

বাবুল : ছাত্রলীগের বিশিষ্ট নেতা ও সংগঠক, নবাবগঞ্জ : ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। ঢাকা থেকে রক্ষীবাহিনীর বিশেষ টিম নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা নবাবগঞ্জ যান, রাতে মুজিববাদীদের সঙ্গে বৈঠক করে পরদিন ১৭ সেপ্টেম্বর ভোর থেকে বাড়ি বাড়ি সার্চ শুরু করেন জাসদ-ছাত্রলীগ-কৃষক লীগ ও শ্রমিক লীগের নেতা কর্মীদের সন্ধানে। বিকেলে বাবুলকে ধরে ছাত্রলীগ কর্মী রবির দোকানে নিয়ে যায়, সেখানে রবি ও সম্পদকে পায়। বিকাল ৫টায় শত শত লোকের সামনে বাবুল, রবি ও সম্পদকে গুলি করে হত্যা করে। এ

দিন নবাবগঞ্জে আরো অনেককে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলা হয়, পুলিশ ৭ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে।

খালিদ হোসেন সম্পদ : সাধারণ সম্পাদক, থানা ছাত্রলীগ, নবাবগঞ্জ; উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।

রবি : ছাত্রলীগ কর্মী, এসএসসি পরীক্ষার্থী, নবাবগঞ্জ; উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।

এবাদত আলী : সভাপতি, আগলা হাইস্কুল ছাত্রলীগ, নবাবগঞ্জ; উপরোক্ত ঘটনার দিন গুলি করে হত্যা।

মোতালেব : জাসদ কর্মী, নবাবগঞ্জ; উপরোক্ত ঘটনার দিন গুলি করে হত্যা।

কালু, জাসদ কর্মী, নবাবগঞ্জ; উপরোক্ত ঘটনার দিন গুলি করে হত্যা।

এবাদত : জাসদ কর্মী, নবাবগঞ্জ; উপরোক্ত দিন রক্ষীবাহিনী কর্তৃক গুলি করে হত্যা।

মহানগর জাসদের সহ-সভাপতিকে ২ ফেব্রুয়ারি '৭৪ আওয়ামী লীগের জঙ্গী কর্মীরা গুলি করে হত্যা করে।

জাহাঙ্গীর হোসেন : ছাত্রলীগের বিশিষ্ট নেতা, সিটি কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা। ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ জাসদ ঘোষিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও কর্মসূচি চলাকালে রক্ষীবাহিনীর গুলিতে শহীদ। এদিন আরো ৫০ জন শহীদ হন, পুলিশ মাত্র ৬ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে।

আব্দুল কাইয়ুম : ২৬ নভেম্বর ১৯৭৪ তারিখে শহীদ।

দারাজ : গণবাহিনীর নেতা; ৭৪ সালে রক্ষীবাহিনীর গুলিতে শহীদ।

ময়ূর : গণবাহিনীর নেতা; ৭৪ সালে রক্ষীবাহিনীর গুলিতে শহীদ।

আসাদ : জাসদ কর্মী; কর্নেল তাহেরসহ জাসদ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে জিম্মি হিসেবে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারকে আটক করতে গিয়ে শহীদ। এটা সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে ঘটেনি। ২৬ নভেম্বর ৭৫-এর এই ঘটনায় মাসুদ, বাচ্চু ও হারুনও শহীদ হন।

বাচ্চু : জাসদ কর্মী, ঢাকা; উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ হন।

মাসুদ : জাসদ কর্মী, ঢাকা; উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ হন।

হারুন : জাসদ কর্মী, ঢাকা; উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ হন।

ইয়ার আহমদ : ১৮ জুন ১৯৭৬ তারিখে শহীদ হন।

কর্নেল আবু তাহের বীরউত্তম : সহ-সভাপতি, জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমান্ডার, কেন্দ্রীয় বিপ্লবী গণবাহিনী; গোপন সামরিক আদালতে বিচার প্রহসন করে ১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই ভোর চারটায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা।

তপন সাহা : ৩০ জুলাই ১৯৭৬ তারিখে শহীদ হন।

কর্পোরাল আলতাফ : সাধারণ সম্পাদক, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা, বিমান বাহিনী শাখা; ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ তারিখে টাঙ্গাইলে পুলিশ-সেনাবাহিনীর আক্রমণে শহীদ হন।

এছকান্দার আলী তুহীন : ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখে শহীদ হন।

ছলেমান : ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখে শহীদ হন।

লিয়াকত আলী : ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখে শহীদ হন।

আব্দুল আজিজ : ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখে শহীদ হন।

আব্দুল জলিল : প্রচার সম্পাদক, ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগ। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ তারিখে গাড়িতে কুমিল্লা যাওয়ার পথে বোমা হামলায় শহীদ হন। এই ঘটনায় আরো দু'জন শহীদ হন।

শামছুল আলম খান মিলন (ডা. মিলন) : জাসদ নেতা, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যাপক। ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের সংগঠক হিসেবে কাজ করার সময় ২৭ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে রিকসায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অতিক্রম করা কালে জেনারেল এরশাদের ভাড়াটে নীরু-অভি চক্রের গুলিতে শহীদ হন। তাঁর জীবনদান গণঅভ্যুত্থানকে দ্রুততর করে। এ ছাড়াও ঢাকায় আরো শহীদ হন মফিজুল ইসলাম, মীর মোস্তফা, আওয়াল, আব্দুল জলিলসহ অনেক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জয়নাল : ছাত্রলীগ নেতা। ১৯৮৩-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সামরিক আইন ভেঙে মিছিল করা কালে মিছিলে পুলিশ ট্রাক উঠিয়ে দিলে শহীদ হন।

মাসুদ আহমেদ মুন্না : শহীদুল্লাহ হলের ছাত্রলীগ নেতা। ১৯৮৭ সালের ১৯ জুলাই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জঙ্গী কর্মীদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে শহীদ। এ ঘটনায় একজন রিকসাচালকও শহীদ হন।

কফিলউদ্দিন কনক : মহানগর ছাত্রলীগ নেতা। ১৯৮৯-এর ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিজয় মিছিলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জঙ্গী কর্মীরা ৯ ফেব্রুয়ারি হামলা চালালে শহীদ হন। এ দিন ছাত্রীমিছিলে হামলা করে ছাত্রদলের কর্মীরা পাশবিক বর্বরতার পরিচয় দেয়।

আবু হাসান মুরাদ : ছাত্রলীগ নেতা। ১৯৯২-এর ২৩ জানুয়ারি রাতের আঁধারে গুপ্তঘাতকের গুলিতে শহীদ।

মাহবুবুর রহমান : ছাত্রলীগ মহসীন হল শাখার সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য। ১৯৯১-এর ২০ জুন বসুনিয়া তোরণের নিকট মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীদের গুলিতে শহীদ হন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শাহ বোরহান উদ্দিন রোকন : ছাত্রলীগ নেতা ও সাধারণ সম্পাদক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ-জাকসু। ১৯৭৩ সালের ৬ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের জাসদ অফিস থেকে বোনের বাসায় যাওয়ার পথে প্রকাশ্য রাস্তায় বন্দুক ঠেকিয়ে একজন ছাত্রলীগ কর্মীসহ তাঁকে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা অপহরণ করে। পরদিন ৭ অক্টোবর লক্ষীনারায়ণ কটন মিলের সামনে তাঁর লাশ ফেলে যায় ঘাতকরা।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

নিখিল চন্দ্র সাহা : সাবেক ছাত্রলীগ নেতা, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক। সরকারি বাহিনীর নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলনে ১৯৭৪ সালের ২৭ নভেম্বর শহীদ হন।

তাঁর নিজের উদ্ভাবিত বিশেষ ধরনের গ্রেনেড 'নিখিল' এই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

টাঙ্গাইল

মেহের আলী : সভাপতি, ভুঞাপুর থানা ছাত্রলীগ। ১৯৭৫ সালে শহীদ হন।
ইসমাইল হোসেন : সদস্য, মির্জাপুর থানা কৃষক লীগ। ১৯৭৫ সালে শহীদ হন।
খন্দকার সহিদুল ইসলাম (সহিদ) : সাধারণ সম্পাদক, শহর ছাত্রলীগ। ১৯৭৫-এ শহীদ।
আব্দুস সালাম খান : সভাপতি, কালিহাতি থানা জাসদ। ১৯৭৫ সালে শহীদ হন।
আলম মিয়া : সদস্য, কালিহাতি থানা কৃষক লীগ। ১৯৭৫ সালে শহীদ হন।
আব্দুর রউফ : সদস্য, মির্জাপুর থানা কৃষক লীগ। ১৯৭৫ সালে শহীদ হন।
আব্দুল হান্নান : প্রচার সম্পাদক, জেলা কৃষক লীগ। ১৭ এপ্রিল ১৯৭৭ সালে শহীদ।
আবুল কালাম : সহ-সভাপতি, জেলা কৃষক লীগ। ১৯৭৭ সালে শহীদ হন।
মো. শাহবাজ : সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ঘাটাইল থানা ছাত্রলীগ। ১৯৭৭ সালে শহীদ হন।
শাজাহান সাবুর : সদস্য, কালিহাতি থানা কৃষক লীগ। ১৯৭৭ সালে শহীদ হন।
ওমর আলী : সদস্য, কালিহাতি থানা কৃষক লীগ। ১৯৭৭ সালে শহীদ হন।
আব্দুর রশিদ : সভাপতি, কালিহাতি থানা কৃষক লীগ : ১৯৭৭ সালে শহীদ হন।
সালামত আলী খান : সাথী ফজলুর রহমানের বাবা। ১৯৭৭ সালে শহীদ হন।
অমূল্য কুমার সরকার : সদস্য, টাঙ্গাইল থানা জাসদ। ১৯৭৮ সালে শহীদ হন।
নূরু মিয়া : সদস্য, ঘাটাইল থানা কৃষক লীগ। ১৯৭৮ সালে শহীদ হন।
সামসু মোল্লা : ১৯৭৮ সালে শহীদ হন।
আব্দুল আজিজ : সদস্য, মির্জাপুর থানা ছাত্রলীগ। ১৯৭৮ সালে শহীদ হন।
খসরু মিয়া : সদস্য, ঘাটাইল থানা কৃষক লীগ। ১৯৮৯ সালে শহীদ হন।
রিয়াজউদ্দিন মিয়া : সদস্য, কালিহাতি থানা কৃষক লীগ। ১৯৭৯ সালে শহীদ হন।
নূরুজ্জামান শাজাহান হোসেন : সহ-সম্পাদক, জেলা ছাত্রলীগ। ১৯৮০ সালের ১২ অক্টোবর শহীদ হন।
বিল্লাল হোসেন : সদস্য, মির্জাপুর থানা কৃষক লীগ। ১৯৮১ সালে শহীদ হন।

এ ছাড়া ভাওয়াল গড়ে বিভিন্ন সময় শহীদ হন আলী হোসেন তালুকদার, আব্দুল কাদের, হাবিবুর রহমান।

নরসিংদী

মোহাম্মদ আলাউদ্দিন : কোষাধ্যক্ষ, থানা জাসদ। জাসদ আহুত গণবিক্ষোভ দিবসের মিছিলে আওয়ামী লীগের জঙ্গী কর্মীরা গুলি করলে তাৎক্ষণিকভাবে শহীদ। ২৭ মে ৭৩-এর এই ঘটনায় মোট ১০ জন শহীদ হন; ৭টি লাশ গুম করে ফেলা হয়।
আব্দুল মোমেন : ছাত্রলীগ কর্মী, উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।
অজ্ঞাতনামা জাসদকর্মী : উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।

গাজীপুর

আক্রাম : জাসদ কর্মী, কালিগঞ্জ। ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগের জঙ্গী কর্মীরা ধরে এনে টঙ্গিতে গুলি করে হত্যা করে।

জয়নাল : জাসদ কর্মী, কালিগঞ্জ। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।

সামসু : শ্রমিক লীগ নেতা, কালিগঞ্জ, ১৯৭২ সালে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা গুলি করে হত্যা করে। একই দিন আরো ১৪ জন জাসদ নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

বাদল : জাসদ কর্মী, কালিগঞ্জ। রক্ষীবাহিনী ১৯৭৪ সালে গুলি করে হত্যা করে।

আনোয়ার : জাসদ কর্মী, মান্দার। রক্ষীবাহিনী ১৯৭৪ সালে গুলি করে হত্যা করে। এ ছাড়াও কালীগঞ্জে আলী হোসেনসহ অনেকে শহীদ হন।

মানিকগঞ্জ

সাহাদৎ হোসেন বিশ্বাস বাদল : প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-আহ্বায়ক, জেলা জাসদ। ১৯৭৩-এর ১০ জানুয়ারি শহীদ হন।

দেলোয়ার হোসেন হারেজ : সভাপতি, সাটুরিয়া থানা ছাত্রলীগ। ১৯৭৩ সালের ২৬ আগস্ট দেবেন্দ্র কলেজে জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলন চলাকালে ৫ শতাধিক রক্ষীবাহিনী কলেজ ঘিরে ফেলে ও অনেককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে অনেককে মুক্তি দিলেও হারেজ ছাড়া পাননি। রক্ষীবাহিনী তার শরীর কেটে লবণ লাগিয়ে দেয়।

আব্দুল আউয়াল নাজু : জেলা ছাত্রলীগের সদস্য, কাপশাইল, দৌলতপুর। ১৯৭৪-এর ৩ ডিসেম্বর শহীদ হন।

নাজিমউদ্দিন নাজিম : কুশন্ডা, ঘিওর। ১৯৭৪-এর ৩ ডিসেম্বর শহীদ হন।

আনোয়ার হক বিশ্বাস : বরুন্ডী। ১৯৭৬-এর ১২ জুন শহীদ হন।

তারাচান : হরগজ। ১৯৭৭ সালে শহীদ হন।

এ ছাড়া ইয়াসীন মাঝি ও আবুজার হোসেন স্বপনসহ অজস্র সাথী শহীদ হন।

রাজবাড়ী

আব্দুর রব সুমন। ১৯৮০-এর ৩১ ডিসেম্বর শহীদ হন।

কাজী সরদার হোসেন। ১৯৮১-এর ১১ নভেম্বর শহীদ হন।

উদ্দীন। ১৯৮১-এর ২২ ফেব্রুয়ারি শহীদ হন।

আব্দুল জলিল। ১৯৮১-এর ১১ নভেম্বর শহীদ হন।

আব্দুস সাত্তার। ১৯৮১-এর ১১ নভেম্বর শহীদ হন।

জামালপুর

পেট্রোল: জাসদকর্মী। ১৯৭৩-এর নভেম্বরে রক্ষীবাহিনী তাকে ধরে স্কুল মাঠে নিয়ে আসে। স্কুলের ছাত্র শিক্ষকদের অস্ত্রের মুখে মাঠে জমায়েত করে এবং তাদের সামনে তাকে গুলি করে হত্যা করে।

গিয়াস উদ্দিন মাস্টার, কোষাধ্যক্ষ, খড়োড়া ইউনিয়ন জাসদ। রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনে শহীদ হন।

শেরপুর

অধ্যাপক সোলায়মান হোসেন: জাসদ নেতা, শ্রীবরদী। ১৯৭৪-এর ১১ মার্চ রক্ষীবাহিনী তাকে গ্রেফতার করে প্রচণ্ড নির্যাতন করে। নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় ২৬ মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শহীদ হন।

নেত্রকোণা

আব্দুর রশিদ : ডাউকি। ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে শহীদ হন।
হাছু মিয়া : বিক্রমশ্রী। ১৯৭৫-এর ১৫ জানুয়ারি শহীদ হন।
মো. সাদেক : নোয়াপাড়া। ১৯৭৬-এর ৫ সেপ্টেম্বর শহীদ হন।
আবু সাঈদ : আতিয়া। ১৯৭৬-এর ২৫ নভেম্বর শহীদ হন।

কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে শহীদ হন জনাব রোস্তম চৌধুরী ও মমজাত বেগম।

ময়মনসিংহ

মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান : ছাত্রলীগ নেতা, কান্দাপাড়া, গফরগাঁও। কলেজ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৯৭২-এর ১১ অক্টোবর মুজিববাদীরা প্রথমে তাকে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রহার করে, পরে রাতে বাসার দরজা ভেঙে গুলি করে হত্যা করে।
আব্দুল জব্বার : ১৯৭৪ সালে মুজিববাদী গুণ্ডাদের হামলার ঘটনায় শহীদ।
জাহাঙ্গীর : ছাত্রলীগ নেতা। ২৮ নভেম্বর ১৯৯০ জরুরি অবস্থা উপেক্ষা করে এরশাদ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে শহীদ হন।

গোপালগঞ্জ

আবুল হোসেন : নিজড়া গ্রাম। ১৯৭৬-এর ৩০ সেপ্টেম্বর শহীদ হন।
রফিকুল ইসলাম : ১৯৭৬-এর ৩০ সেপ্টেম্বর শহীদ হন।
প্রকাশ সরকার : ১৯৭৭ সালে শহীদ হন।
পিটার গাইন : কোটালীপাড়া। ১৯৭৭-এর ২৪ সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলিতে শহীদ হন।

মাদারীপুর

জাহাঙ্গীর হোসেন : ১৯৭৪-এর ১ জানুয়ারি শহীদ হন।
আব্দুস সামাদ : ১৯৭৪-এর ৩ জানুয়ারি শহীদ হন।
আলী হোসেন : ১৯৭৪-এর ৯ জানুয়ারি শহীদ হন।
মফিজুর রহমান : ১৯৭৪-এর ১৬ সেপ্টেম্বর শহীদ হন।
সাহাবুদ্দিন মোল্লা : ১৯৭৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি শহীদ হন।
হেলালুল ইসলাম : ১৯৭৯-এর ৮ জুন শহীদ হন।
আ. মজিদ ব্যাপারী : ১৯৭৯-এর ১৯ জুলাই শহীদ হন।
আসলাম চৌধুরী : ১৯৭৯-এর ১০ অক্টোবর শহীদ হন।
জামাল উদ্দিন : ১৯৭৯-এর ১ ডিসেম্বর শহীদ হন।
ফজলুর রহমান মনির : ১৯৭৯-এর ১৫ ডিসেম্বর শহীদ হন।
মো. হায়দার আলী খান : ১৯৮০-এর ১ জুন শহীদ হন।
আব্দুর রাজ্জাক : ১৯৮১-র ৪ জানুয়ারি শহীদ হন।

এছকান্দর দর্জি : ১৯৮০-র ১ ডিসেম্বর শহীদ হন।

এ ছাড়া বিভিন্ন সময় শহীদ হন সহিদুর রহমান, নুরুল ইসলাম, নূরুল হক, আইয়ূব আলী, সাকুয়া, আনোয়ার, জাহেদ মিয়া চেয়ারম্যান, মালেক মাতুব্বর, আজিজুল হক, হায়দার মাতুব্বর, মজিবর রহমান, এমজাল হোসেন, শামছুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, আনিছুর রহমান, জিন্নাত মাতুব্বর, আব্দুল হালিম, আব্দুল লতিফ, শাজাহান, রতন, মজিবর, সিরাজ, মনির, দাদন, মজিবর, সিরাজ, গদাই, মলিন, কাশেম, মানিক, ফালু, রুস্তমসহ অনেক।

ফরিদপুর

কামালুজ্জামান মোস্তাক : ছাত্রলীগ নেতা, গোয়ালন্দ। মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীদের দ্বারা ১৯৭৩-এর ২৭ জানুয়ারি অপহৃত ও শহীদ। পরদিন অম্বিকাপুরের নিকটবর্তী রেলওয়ে সেতুর কাছে জেলেদের জালে তার লাশ উঠে আসে।

আব্দুল হাকিম ; সাধারণ সম্পাদক, তালা থানা জাসদ। ১৯৭৪-এর ২৪ অক্টোবর মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা নির্যাতন করে হত্যা করে।

হাতেম আলী : তালা থানার কৃষক লীগ কর্মী। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ হন।

শরীয়তপুর

আলী হোসেন : ১৯৭৩-এর ৫ ফেব্রুয়ারী শহীদ হন।

আব্দুস সামাদ : ১৯৭৪-এর ৩ মার্চ শহীদ হন।

আব্দুস সাত্তার : ১৯৭৬ সালে শহীদ হন।

আব্দুল জব্বার : ১৯৭৯-এর ২৮ এপ্রিল শহীদ হন।

সিরাজুল হক : ১৯৮০-এর ৩ মার্চ শহীদ হন।

শাজাহান : ১৯৮০-এর ১০ জুন শহীদ হন।

আব্দুল হামিদ : ১৯৮১-এর ১০ জানুয়ারি শহীদ হন।

জাহাঙ্গীর : ১৯৮১-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি শহীদ হন।

রাজশাহী

মনিরুদ্দিন আহমেদ : সহ-সভাপতি, জেলা জাসদ ও সাধারণ সম্পাদক, বাগমারা থানা জাসদ, বাগমারা। ১৯৭৩ সালের ২১ অক্টোবর রক্ষীবাহিনীর হাতে শহীদ হন। একই ঘটনায় তাঁর ছোট ভাইও শহীদ হন।

সালাম মাস্টার ; সহ-সভাপতি, জেলা জাসদ, গোদাগাড়ি : ১৯৭৩ সালে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীদের হামলায় শহীদ হন।

রফিক উদ্দিন আহমেদ সেলিম : সাধারণ সম্পাদক, মহানগর ছাত্রলীগ, রাজশাহী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, দৈনিক গণকণ্ঠের রাজশাহী প্রতিনিধি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, কবি, গীতিকার। ১৯৭৪ সালের ৩ মার্চ রক্ষীবাহিনী ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাওয়া সেলিমকে ট্রাক চাপা দিয়ে হত্যা করে। এ ঘটনায় আরো একজন শহীদ হন।

শরীফুল ইসলাম সাবু : সদস্য, মহানগর ছাত্রলীগ। বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় শহীদ হন।

মুকিম : জাসদ নেতা, বুথপাড়া। জাতীয় সমন্বয় কমিটি আহুত হরতাল সংগঠিত করতে গিয়ে ১৯ জুন ১৯৯৩ জামাত শিবির চক্রের হামলায় আহত হয়ে ২১ জুন ১৯৯৩ তারিখে হাসপাতালে শহীদ হন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শাজাহান সিরাজ : সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রলীগ : ১৯৮৪-র ২২ ডিসেম্বর আহুত হরতালে পিকেটিং করার সময় বিডিআর-এর গুলিতে শহীদ হন।

ইয়াসির আরাফাত পিন্টু : জামাত শিবির চক্রের হামলায় শহীদ হন।

বগুড়া

আতা : শহর ছাত্রলীগ নেতা। ১৯৭৩-এর ৮ জুন মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা গুলি করে হত্যা করে।

রঞ্জু : শহর ছাত্রলীগ নেতা। ১৯৭৩-এর ৮ জুন মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা গুলি করে হত্যা করে।

মানিক দাশগুপ্ত : সদস্য, জেলা জাসদ, চেলোপাড়া। ৮ জুন ১৯৭৩ রাত ১০ টায় গ্রেফতার ও ধারাবাহিক নির্যাতন। সমস্ত আঙ্গুল কেটে ফেলা হয় । তারপর জেলখানায় অনাহারে রাখা হয়। ১৭ জুন ১৯৭৩ দুপুর ১২টায় শহীদ হন।

গোলাম কিবরিয়া : শহর ছাত্রলীগ নেতা, মালতিনগর মণ্ডলপাড়া। টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে বাসায় শয্যাশায়ী থাকা অবস্থায় ১৯৭৩-এর ২ সেপ্টেম্বর আওয়ামী যুবলীগের কর্মীরা বিকেল ২টায় গুলি করে হত্যা করে।

তোতা : শহর ছাত্রলীগ নেতা, সেওজগাড়ি। ১৯৭৩-এর ২১ সেপ্টেম্বর মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীদের দ্বারা অপহৃত ছাত্রলীগ কর্মী চঞ্চলসহ দুজনকে রিকসায় রুনু-রশিদের সঙ্গে খুঁজতে বের হলে বিকেল ৫টায় রহমান নগরের মোড়ে আওয়ামী লীগের কর্মীরা স্টেনগানের ব্রাশফায়ার করলে রুনু-রশিদ ঘটনাস্থলে ও তোতা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

রুনু : শহর ছাত্রলীগ নেতা, জলেশ্বরীতলা। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।

রশিদ : শহর ছাত্রলীগ নেতা, সূত্রাপুর। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।

চঞ্চল : সূত্রাপুর আঞ্চলিক শাখার সদস্য, ছাত্রলীগ। ১৯৭৩-এর ২১ সেপ্টেম্বর সকালে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা সকালে অপহরণ করে হত্যা করে। এদিন চঞ্চলের সঙ্গে আরো একজনকে গুম করা হয়।

রানা (কর্নেল) : শহর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি, সূত্রাপুর। ১৯৭৩ সালে আওয়ামী যুবলীগের জঙ্গী কর্মীরা গুলি করে হত্যা করে।

খলিল : প্রচার সম্পাদক, জেলা ছাত্রলীগ, চেলোপাড়া। ১৯৭৪ সালে আওয়ামী যুবলীগের কর্মীরা হাত-পা বেঁধে গলায় রড পেঁচিয়ে হত্যা করে ফট্‌কী ব্রিজের নিচে লাশ ফেলে দেয়।

রাজ্জাক (কক) : সদস্য, জেলা জাসদ, ধুনট। আওয়ামী যুবলীগের জঙ্গী কর্মীরা গুলি করে হত্যা করে। রাজ্জাকের পিতা ও ভাইকেও আওয়ামী যুবলীগের জঙ্গী কর্মীরা হত্যা করে ১৯৭৪ সালে।

সফো গাজী : সদর (উত্তর) থানা জাসদের সহ-সভাপতি : সেনাবাহিনীর সঙ্গে ১৯৭৬ সালে বন্দুকযুদ্ধে শহীদ হন।

আব্দুস সামাদ : জাসদ নেতা, তেলিয়াহাড়া। অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীর হাতে ১৯৭৬ সালে শহীদ হন।

আফরোজ : জেলা ছাত্রলীগের সদস্য, ফুলতলা : জাসদের বিশেষ কাউন্সিলে আসার পথে ১ অক্টোবর ১৯৮৬ ফুলছড়ি তিস্তামুখ ঘাটে বিডিআর-এর নির্যাতনে শহীদ। এ ছাড়া ছাত্রলীগ নেতা আমজাদকেও দুষ্কৃতকারীরা হত্যা করে।

নাটোর

নাসির উদ্দিন : গণবাহিনীর নেতা, গোপালপুর। ১৯৭২ সালে সাম্যবাদী দলের সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে গুম করে ফেলে।

শাহজাহান আলী : ১৯৭৩-এর ৮ মার্চ মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে।

আব্দুর রউফ : ১৯৭৩-এর ৮ মার্চ মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে।

এ ছাড়া গোলাম রব্বানীসহ অনেক শহীদ হন।

পাবনা

আসফাকুর রহমান কালু : দপ্তর সম্পাদক, জেলা জাসদ। ১৯৭৩-এর অক্টোবরে রক্ষীবাহিনী পিটিয়ে হত্যা করে।

ফারুক : জাসদ কর্মী। ১৯৭৩-এর অক্টোবরে রক্ষীবাহিনী পিটিয়ে হত্যা করে।

মাসুদ : সহ-সভাপতি, জেলা ছাত্রলীগ। ১৯৭৩-এর অক্টোবরে রক্ষীবাহিনী পিটিয়ে হত্যা করে।

সিদ্দিকুর রহমান : জাসদ কর্মী। ১৯৭৩-এর অক্টোবরে রক্ষীবাহিনী পিটিয়ে হত্যা করে।

মতিয়ার রহমান রুচি : ছাত্রলীগ নেতা, ঈশ্বরদী। ১৯৭৩-এর ১১ নভেম্বর 'পূর্বাশা বিতান' নামের দোকানে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা তাকে পরপর ছয়টি গুলি করে হত্যা করে। মাথায় ও বুকে এসএমজি থেকে ফায়ার করা হয়।

এ ছাড়াও পাবনার ঈশ্বরদীতে শহীদ হন রফিকুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, জাহাঙ্গীর ও রিয়াজউদ্দিন রিয়াজ।

সিরাজগঞ্জ

কোরবান আলী : জাসদ কর্মী ও সাধারণ সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ জেলা দোকান কর্মচারী সমিতি, শাহজাদপুর। ১৯৭২ সালের ৯ জুন শাহজাদপুর কলেজের ১৮ নম্বর কক্ষে কৃষক লীগের থানা কাউন্সিলে ব্রাশফায়ার করা হয়। পরে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা বাড়ি বাড়ি খুঁজে কোরবান আলীসহ সর্বমোট ছয় জনকে হত্যা করে।

মুন্সি সকিমুদ্দিন : ছাত্রলীগ নেতার বাবা, শাহজাদপুর। উপরোক্ত ঘটনায় নিহত হন।

আবুল কালাম : শাহজাদপুর। উপরোক্ত ঘটনার দিন কালাম ও দিলীপকে ধরে এনে স্থানীয় এমসিএ'র বাসায় নির্যাতন করা হয় ও পরে বাজারে এনে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়।

দিলীপ : শাহজাদপুর। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।
শহীদুজ্জামান হেলাল। সাধারণ সম্পাদক, থানা ছাত্রলীগ, সাধারণ সম্পাদক শাহজাদপুর কলেজ ছাত্র সংসদ ও দৈনিক গণকণ্ঠের সংবাদদাতা, শাহজাদপুর। উপরোক্ত ঘটনার দিন প্রথমে নির্যাতন করে দোতলা থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়। পরে গুলি করে হত্যা করে নদীতে লাশ ফেলে দেওয়া হয়।
ফরহাদ হোসেন : শাহজাদপুর। হেলালের সঙ্গে একইভাবে শহীদ হন।
মোসাদ্দেক হোসেন : শ্রমিক লীগ নেতা, হোসেনপুর। ১৯৭৩-এর মার্চে রায়পুরে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা গুলি করে হত্যা করে।
আব্দুস সালাম : নান্দিনামধু, সিরাজগঞ্জ। ১৯৭৩ সালে ঢাকা থেকে প্লেনে ফেরার পথে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা ঈশ্বরদী এয়ারপোর্ট থেকে অপহরণ করে পাবনা জজকোর্টের পাশে মুজাহিদ ক্লাবে এসিড দিয়ে পুড়িয়ে লাশ গুম করে ফেলে।
সেলিম হোসেন : আলোকদিয়ার, সিরাজগঞ্জ। উপরোক্ত ঘটনায় সালামের সঙ্গে শহীদ।
আব্দুস সালাম : চৌহালী। মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীদের হাতে ১৯৭৩ সালে শহীদ হন।
সাঈদ : চৌহালী। মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীদের হাতে ১৯৭৩ সালে শহীদ হন।
হাসিম : শাহজাদপুর। মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে।
মমিন : শাহজাদপুর। মুজিববাদীরা বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে।
নেজারাত সর্দার : জারিলা, সিরাজগঞ্জ। ১৯৭৪ সালে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীদের হামলায় শহীদ হন।
আব্দুল মুন্সী : কালিয়াকান্দা পাড়া। ১৯৭৪ সালে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীদের হামলায় শহীদ হন।
নজরুল ইসলাম : শাহেদনগর। ১৯৭৪ সালে মুজিববাদীরা হত্যা করে।
বদরুল : ১৯৭৪ সালে মুজিববাদীদের হাতে শহীদ হন।
বাহাদুর আলী : জামতৈল, কামারখন্দ। সিংগুলি চরে ১৯৭৪ সালে মুজিববাদীরা হত্যা করে।
নূরু : সমোশপুর, বেলকুচি। সিংগুলি চরে ১৯৭৪ সালে মুজিববাদীরা হত্যা করে।
আব্দুল বাছেত : ভাইয়ার চর, কামারখন্দ। মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা ১৯৭৪ সালে তাকে হত্যা করে জামতৈল রেলস্টেশনে লাশ ফেলে রাখে।
গিয়াস আহমেদ : কালীগঞ্জ, উল্লাপাড়া। ১৯৭৪ সালে রক্ষীবাহিনী হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলে।
আব্দুল আলীম : চাঁদপুর, কামারখন্দ। ১৯৭৬ সালে জেলখানায় পুলিশী নির্যাতনে শহীদ।
রবি নিয়োগী : তেঁতুলিয়া। ক্রমাগত পুলিশী নির্যাতনে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ১৯৮৭ সালে আত্মহত্যা করেন।
ইয়াকুব আলী চেয়ারম্যান : পিপুলবাদীয়া, বাগবাটি । অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে ১৯৮৮ সালে শহীদ হন।
জাহাঙ্গীর আলম জিন্নাহ : দিয়ারবৈদ্যনাথ। ক্যান্সারে আক্রান্ত অবস্থায় পুলিশী নির্যাতনে শহীদ হন।
আব্দুল্লাহ : চরটেংরাইল। অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীর হাতে শহীদ হন।

রংপুর

রহমান : থানা গণবাহিনীর সদস্য, রাজেন্দ্রপুর, সদর থানা। ১৯৭৫ সালে গণবাহিনীর অভিযানকালে গুলিতে শহীদ হন।

মাছির : থানা গণবাহিনীর সদস্য, রাজেন্দ্রপুর, সদর থানা। ১৯৭৫ সালে গুপ্তঘাতকের হাতে শহীদ হন।

সালাম : গণবাহিনী নেতা, বদরগঞ্জ। পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির জঙ্গী কর্মীরা ১৯৭৫ সালে বাড়িতে গুলি করে হত্যার করে।

আব্দুল জব্বার : গণবাহিনীর ইউনিয়ন কমান্ডার, রাজেন্দ্রপুর, সদর থানা। কর্নেল তাহেরসহ জাসদ নেতৃত্বের মুক্তির দাবিতে ১৯৭৬-এর ৩১ মার্চ মিছিল সংগঠিত করার পর সেনাবাহিনী তাদের সন্ধানে হরিদেবপুর ইউনিয়ন ঘেরার করে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে শহীদ হন।

আব্দুল কুদ্দুস : থানা গণবাহিনীর সদস্য, ধাপ, সদর থানা। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ হন।

কাইয়ুম : পীরগঞ্জ। ১৯৭৬ সালে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন।

ইদ্রিস : গণবাহিনীর ইউনিয়ন কমান্ডার, সাতগাড়া, সদর থানা। ১৯৭৬ সালে ঘুমন্ত অবস্থায় গুপ্তঘাতক ছুরিকাঘাতে হত্যা করে।

চাঁন : গণবাহিনীর সদস্য, গঙ্গাচড়া। ১৯৭৬ সালে গ্রেফতারের পর থানায় বেঁধে পলিথিনে আগুন লাগিয়ে তরল পলিথিনের ধারা তাঁর উপর ফেলে হত্যা করা হয়।

হাবিব : সাম্প্রতিক সময়ে বি.এন.পি ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জঙ্গী কর্মীদের হাতে শহীদ হন।

এ ছাড়া সাথী আনোয়ারের বাবাও ঘাতক চক্রের হাতে শহীদ হন।

গাইবান্ধা

সুজা (বীরবিক্রম) : সভাপতি, জাসদ, সদর থানা। ১৯৭৩-এর শুরুতে কালিবাড়ীতে প্রকাশ্য দিবালোকে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা গুলি করে হত্যা করে।

হামদি : জাসদ কর্মী, মনোহরপুর। ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে শহীদ হন।

জব্বার : মনোহরপুর। ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে শহীদ হন।

দুলাল : মনোহরপুর। ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে শহীদ হন।

রইসুদ্দিন প্রধান : জাসদ কর্মীর বাবা। ১৯৭৫-এ রক্ষীবাহিনী গাছে ঝুলিয়ে পিটানোর পর অসুস্থ অবস্থায় মারা যান।

আহসানউদ্দিন : জাসদ কর্মীর ভাই। ১৯৭৫-এ রক্ষীবাহিনী গাছে ঝুলিয়ে পিটানোর পর অসুস্থ অবস্থায় মারা যান।

খন্দকার রোস্তম আলী : বিপ্লবী গণবাহিনীর কমান্ডার, রামনগর, শাঘাটা। ১৯৭৬-এর আগস্টে আনসার ব্যাটালিয়ন মাঠে গুলি করে হত্যা করা হয়।

শওকত আলী : সদস্য, জাসদ। ১৯৭৬ সালে শহীদ হন।

হায়দার আলী : সুন্দরগঞ্জ। ১৯৭৬ সালে শহীদ হন।

ইফসুফ আলী : ১৯৭৬ সালে শহীদ হন।

লালু মিয়া : ১৯৭৬ সালে শহীদ হন।

অধ্যাপক মমতাজুল করিম : ১৯৭৬ সালে শহীদ হন।
জাহাঙ্গীর তারেক : সভাপতি, স্থানীয় কৃষক লীগ। ১৯৭৮ সালে শহীদ হন।
আব্দুস সোবহান : সুন্দরগঞ্জ। ১৯৭৯ সালে সংসদ নির্বাচনের পর বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তিনি ঐ নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন। এ ছাড়া নিহত হন সুন্দরগঞ্জের জাহাঙ্গীর।

দিনাজপুর

আব্দুল মালেক : ছাত্রলীগ নেতা, বিরল থানা। ১৯৭২-এ ছাত্রলীগের সম্মেলনে মুজিববাদপন্থীদের হামলায় শহীদ।
লোকেশ চন্দ রায় : বীরগঞ্জ থানা। ১৯৭৩-এ জেলা কারাগারে প্রচণ্ড নির্যাতনে শহীদ।
আব্দুল হালিম : সভাপতি, থানা ছাত্রলীগ, পার্বতীপুর। মুজিববাদপন্থীদের হামলায় শহীদ।
আবু তালেব : পার্বতীপুর। ১৯৮৬ সালে আততায়ীর গুলিতে নিহত।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

রুহুল মণ্ডল : বটতলা হাট। রক্ষীবাহিনীর ঘাতকরা ১৯৭৩ সালের ৮ নভেম্বর রাত ২টায় হত্যা করে।
আমিরুল ইসলাম জালাল : নেতৃস্থানীয় সংগঠক। ১০ জুলাই ১৯৮৭ সালে সকাল ১১টায় জামাত-শিবিরের কর্মীরা তাঁর বাসায় হামলা চালিয়ে সকলকে প্রহার করে ও তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে।

নওগাঁ

নার্গিস : তরুণ জাসদ নেতা। ১৯৭৪ সালে মুজিববাদপন্থীদের হামলায় শহীদ হন।

সিলেট

মুনীর : ছাত্রলীগ নেতা। ১৯৮৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগের মিছিলে জামায়াত শিবির কর্মীদের হামলায় শহীদ।
তপন : ছাত্রলীগ নেতা। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।
জুয়েল : ছাত্রলীগ নেতা। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ হন।

মৌলভীবাজার

মীর্জা হারুন আহমেদ : জাসদ কর্মী, মাথারপুর। ১৯৭৩ সালের ১৮ জানুয়ারি গভীর রাতে মুজিববাদপন্থী জঙ্গী কর্মীরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

ফেনী

আব্দুল রহিম : ছাত্রলীগ কর্মী, কালিগঞ্জ ইউনিয়ন। ১৯৭২ সালের ৩ আগস্ট ছাত্রলীগের সভায় স্থানীয় মুজিববাদী কর্মীরা হামলা চালালে ১০ জন আহত হন। ফেনী হাসপাতালে রহিম মারা যান।

নোয়াখালী

নজির আহমেদ ইঞ্জিনিয়ার : জাসদ নেতা। ১৯৭৫-এর ৯ জানুয়ারি মুজিববাদপন্থীরা তাঁকে হত্যা করে।

কুমিল্লা

শরীফ : জেলা ছাত্রলীগের সদস্য, বাগিচাগাঁও। ১৯৭৩ সালে সরকার সমর্থকরা মিছিলে গুলি করে হত্যা করে।

চাঁদপুর

জয়নাল আবেদীন চৌধুরী : ১৯৭৭-এর ১২ নভেম্বর শহীদ হন।

বরিশাল

ফারুক আলম : জাসদ কর্মী। ১৯৭৩ সালের ১৩ জুন আওয়ামী জঙ্গী কর্মীবাহিনী মিছিলে গুলি করে হত্যা করে।

সমরেশ কুমার মৃধা : প্রাক্তন সদস্য, জেলা ছাত্রলীগ। ১৯৭৩ সালের ১০ আগস্ট শহীদ হন।

সদরুল আলম ভূইয়া : প্রাক্তন সহ-সভাপতি, জেলা ছাত্রলীগ। ১৯৭৩ সালের ১০ আগস্ট শহীদ হন।

নজরুল ইসলাম : প্রাক্তন সহ-সভাপতি, জেলা ছাত্রলীগ। ১৯৭৩ সালের ১০ আগস্ট শহীদ হন।

গোলাম কবীর : সহ-সম্পাদক, জেলা ছাত্রলীগ। ১৯৭৪ সালের ১০ জানুয়ারি রক্ষীবাহিনী ধরে নিয়ে যায়।

রফিকুল ইসলাম জাফর : সাধারণ সম্পাদক, জেলা ছাত্রলীগ। ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ ঢাকায় শহীদ।

খুলনা

বাবর শেখ : ছাত্রলীগ সভাপতি। ১৯৭২ সালের ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীরা মশাল মিছিলে হামলা চালিয়ে প্রথমে আটক ও পরে এমপিএ আব্দুর রশিদের বাসায় নিয়ে নির্যাতন করে হত্যা ও গুম করে।

সিরাজ খান ঠাকুর : সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রলীগ। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।

মোশারফ হোসেন : সভাপতি, বাস্তহারা সমিতি। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ হন।

হাতেম আলী : আকড়চাটা, পাইকগাছা। ১৯৭৪-এর এপ্রিলে শহীদ হন।

হুমায়ুন কবীর : কাপাসাঙা, আশাশুনি। ১৯৭৪-এর এপ্রিলে শহীদ হন।

আবদুল বারী বাকী : বাজালী, পাইকগাছা। ১৯৭৪-এর এপ্রিলে শহীদ হন।

গোলাম সুরত : ঘুঘরাকাটা, কয়রা। ১৯৭৫ সালে শহীদ হন।

রবিউল ইসলাম : লালুয়াবাজার, পাইকগাছা। ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই শহীদ হন।

মোহাম্মদ সোলায়মান : বড়বাড়ী, কয়রা। ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই শহীদ হন।

অমল কৃষ্ণ মণ্ডল : উরাবেদকাশী, কয়রা। ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই শহীদ হন।

আব্দুল ওহাব বিদ্যুৎ : জোলখালী। ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই শহীদ হন।

বাগেরহাট

মৃণাল কান্তি দাশ : ১৯৭৪ সালে মুজিববাদ সমর্থক জঙ্গী কর্মীরা হত্যা করে।

আজম খান : জাসদ কর্মী। ১৯৭৪-এর ১১ নভেম্বর জাসদ আহুত হরতালের দিন রক্ষীবাহিনী গ্রেফতার করে নির্যাতন করে হত্যা করে।

যশোর

মোশারফ হোসেন : সহ-সভাপতি, জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি। ১৯৭৪-এর ৩ ফেব্রুয়ারি গুরুদাস বাবু লেনের দলীয় কার্যালয়ে আলাপরত অবস্থায় তাঁকে আওয়ামী লীগের জঙ্গী কর্মীরা ব্রাশফায়ার করলে শহীদ হন। তাঁর বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায়, অন্যরা আহত হন।

এ ছাড়া ওমর ফারুক ও মাহফুজুল হকসহ অনেকে শহীদ হন।

কুষ্টিয়া

আবুল হোসেন : ১৯৭৫-এর জুলাইয়ে শহীদ হন
আব্দুস সাত্তার : ১৯৭৫-এ শহীদ হন।
বাবুল : ১৯৭৬-এর ১৪ ডিসেম্বর শহীদ হন।
খন্দকার আলী : ১৯৭৭-এ শহীদ হন।
জামাত আলী: ১৯৭৭-এ শহীদ হন।
আলাউদ্দিন : ১৯৭৮-এ শহীদ হন।
আজম আলী : ১৯৭৯-এর অক্টোবরে শহীদ হন।
ইয়াছ উদ্দিন : ১৯৮০-এর এপ্রিল শহীদ হন।
আইজউদ্দিন মণ্ডল : ১৯৮০-এর এপ্রিলে শহীদ হন।
দীন মোহাম্মদ : ১৯৮০-এর আগস্টে শহীদ হন।
মুখলেছুর রহমান : ১৯৮১-এর জানুয়ারিতে শহীদ হন।

এ ছাড়া কুষ্টিয়ায় বিভিন্ন সময় যারা শহীদ হন : শামছুল হাদী, মুসা, উম্বাদ, সমর, নাড়ু, আজিজুল, মুকুল, মোস্তফাসহ অনেকে।[৬৭৫]

চুয়াডাঙ্গা

পান্না : জেলা ছাত্রলীগের সদস্য। ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে গাংনী থানা আক্রমণে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে শহীদ।
আবুল (মেম্বার) : থানা কৃষক লীগের সদস্য। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।
মন্টু : জেলা কৃষক লীগের সদস্য। ১৯৭৫-এর ১৯ মার্চ ট্রেজারি আক্রমণে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে শহীদ।
আন্টু : জেলা গণবাহিনীর কমান্ডার। ১৯৭৫-এ রক্ষীদের ক্যাম্পে নির্যাতনে শহীদ।
জামান : গণবাহিনীর সদস্য। ১৯৭৫-এ রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনে শহীদ হন।
নুরু মাস্টার : থানা কৃষক লীগের সদস্য। ১৯৭৫-এ রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনে শহীদ।
ফয়েজুর রহমান : থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৭৫-এ রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনে শহীদ।
লুৎফর : কৃষক লীগ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। ১৯৭৬ সালে পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা হত্যা করে।
হান্নান : ১৯৭৬ সালে শহীদ।

---

৬৭৫ এ ছাড়াও দৈনিক গণকণ্ঠের সূত্রে কুষ্টিয়ায় ১৯৭২ সালের নভেম্বরে হাবিবুর রহমান, ১৯৭৭ জয়নাল আবেদীন চৌধুরী এবং ১৯৮০ সালে শুকুর আলী নামে আরও তিনজন জাসদ কর্মী নিহত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। দেখুন: আশরাফ কায়সার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

বাবুল : ১৯৭৬ সালে শহীদ হন।
রওশন : ১৯৭৬ সালে শহীদ হন।
দুদু : ১৯৭৬ সালে শহীদ হন।
খালেক : ১৯৭৮ সালে শহীদ হন।
মফিজ : ১৯৭৯ সালে শহীদ হন।

এ ছাড়া বিভিন্ন সময় আবুল হোসেন, আজমসহ অনেকে শহীদ হন।

মেহেরপুর

মেহেরপুরে বিভিন্ন সময়ে শহীদ হন : আউয়াল, হাবীব, জাফরী, বাবুল, হান্নান, আনছার, মোমিন, খলিলসহ অনেকে।

ঝিনাইদহ

শেখ রবিউল ইসলাম : ছাত্রলীগ কর্মী। ১৯৭৩ সালে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীদের হামলায় শহীদ হন।
আব্দুর রশিদ : ছাত্রলীগ কর্মী। ১৯৭৩ সালে মুজিববাদী জঙ্গী কর্মীদের হামলায় শহীদ।
আলী হোসেন : শৈলকূপা। ১৯৮০-এর ১১ এপ্রিল শহীদ হন।
আক্কাস আলী : শৈলকূপা। ১৯৮০-এর ৫ জুন শহীদ হন।
ফজলুর রহমান : ১৯৮০-এর ৫ জুন শহীদ হন।

মাগুরা

মশিহুর রহমান : দাঘী। ১৯৭৫ সালে শহীদ হন।
আজিম হোসেন : যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, জেলা জাসদ, গৌরীচরণপুর। ১৯৭৮ সালের ১৯ নভেম্বর আলমখালী বাজারে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের গুলিতে শহীদ হন।
শেখ জমিরুদ্দিন : বালিয়াডাঙ্গা। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।
সহিদুর রহমান ধনী : আলাইপুর। উপরোক্ত ঘটনায় শহীদ।
তোবারক হোসেন : কাজলী। ১৯৭৯-র ১৩ জানুয়ারি শহীদ হন।
জহির উদ্দিন কটা : আমতইল, শ্রীপুর। ১৯৭৯-র ১৯ জানুয়ারি শহীদ হন।
মোহাম্মদ আলী : সাচানী। ১৯৭৯-এর ২৪ মে শহীদ হন।
শাহাদৎ হোসেন মোল্লা : ১৯৭৯-এর ২৪ মে শহীদ হন।
গোলাম মোস্তফা : সভাপতি, নোয়াটা ইউনিয়ন জাসদ, মশাখালী, মহম্মদপুর। ১৯৮৯-এর ৬ আগস্ট হিজলতলায় জাতীয় পার্টির জঙ্গী কর্মীদের হামলায় শহীদ হন।

নড়াইল

আতিয়ার রহমান : ১৯৭৮ সালে শহীদ হন।
খায়রুজ্জামান : ১৯৮০ সালে শহীদ হন।

সাতক্ষীরা

আব্দুল লতিফ : জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৭৪ সালে শহীদ হন।
নওশের আলী : বুড়ি গোয়ালিনী। ১৯৭৫-এ শহীদ হন।
আরশাদ আলী : ১৯৭৫-এ শহীদ হন।

ষোলো

১৯৭২-'৭৫ সময়ে নিহত আওয়ামী লীগ কর্মীদের তালিকা

[এই তালিকাটি প্রণীত হয়েছে মুজিব শাসনামলে আওয়ামী লীগের মুখপত্র 'বাংলার বাণী'তে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে এবং তা এখানে উপস্থাপিত হচ্ছে সাংবাদিক আশরাফ কায়সারের 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড' (মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫) শীর্ষক গ্রন্থ থেকে। এ তালিকায় অন্তর্ভুক্তরা যে সবাই আওয়ামী লীগ বিরোধিদের দ্বারা নিহত হয়েছে তা নয়; অনেকে দলীয় কোন্দলেও মারা গেছেন।]

১৯৭২

২৯ ফেব্রুয়ারি : বরিশালের উজিরপুরের যুবলীগ কর্মী ও মুজিব বাহিনীর সদস্য আব্দুল লতিফ একদল দুষ্কৃতকারীর হাতে নিহত।

২০ মার্চ : ভোলা মহকুমা ছাত্রলীগ সভাপতি ও ভোলা কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি সালেহ আহম্মেদ, ছাত্রলীগ নেতা শফিউল্লাহ ও জুলফিকার আলী জুলুকে নৃশংসভাবে হত্যা।

২৮ মার্চ : বৈদ্যেরবাজার থানার বারদা ইউনিয়ন ছাত্রলীগ কর্মী ফজলুল হক, আব্দুল হক, আব্দুল মতিন ও হোসেন আলী অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে নিহত।

০৮ এপ্রিল : টাঙ্গাইলে ছাত্রলীগের মিছিলে বোমা হামলায় আহত আজিজুল হকের মৃত্যু।

০৬ জুন : খুলনায় গণপরিষদ সদস্য আব্দুল গফুর ও তাঁর দুই সঙ্গী কামাল ও রিয়াজ উদ্দিন একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্তের হাতে অপহৃত ও নৃশংসভাবে খুন।

১৫ জুন : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একই পরিবারের ৩ জনসহ ৪ জন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত। এরা হচ্ছেন ওই এলাকার রিলিফ কমিটির সদস্য ও আওয়ামী লীগ কর্মী আব্দুস সাত্তার, তাঁর পুত্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান নূরুজ্জামান, কন্যা মাছিলপুর আওয়ামী মহিলা সমিতির সভানেত্রী রওশন আরা বেগম ও সুরেশ চন্দ্র দাস। ভোরে বাড়ি ঘেরাও করে তাদের ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়।

১২ জুলাই : পাবনা বুলবুল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছাত্রলীগ নেতা আব্দুস সাত্তার লালু অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১৯ জুলাই : চৌমুহনীর আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ সফিউল্লাহ নিজ বাসভবনে দুষ্কৃতকারীদের ছুরিকাঘাতে নিহত।

: নড়াইলে আওয়ামী লীগ কর্মী বিনয় কুমার মিত্র দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত।

২৬ জুলাই : কেরানীগঞ্জের আওয়ামী লীগ কর্মী আবু সাঈদ গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত।

০৪ আগস্ট : নড়াইল জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ এম সোলায়মানকে কয়েকজন আততায়ী রূপগঞ্জ বাজারে দোকানে বসা অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে।

০৭ সেপ্টেম্বর : লৌহজংয়ে মুজিব বাহিনীর ইউনিট কমান্ডার গিয়াসউদ্দিন আহমেদ দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত।

১১ সেপ্টেম্বর : ন্যাশনাল জুটমিলের শ্রমিক লীগ কর্মী আব্দুল কাদের নিহত।

০৭ অক্টোবর : খুলনার ফুলতলায় আওয়ামী লীগ কর্মী সরদার খলিলুর রহমান নিজ বাড়িতে আততায়ীদের গুলিতে নিহত।

১৩ নভেম্বর : কক্সবাজারের মহেশখালীতে আওয়ামী লীগ কর্মী আব্দুর রহিম দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত।

১৪ নভেম্বর : ঝালকাঠি শহরে শ্রমিক লীগ নেতা সঞ্জীব কুমার বোসকে গুলি করে হত্যা।

২৮ ডিসেম্বর : খুলনা দৌলতপুরে শ্রমিক লীগ নেতা আবু সুফিয়ানকে হত্যা।

১৯৭৩

০২ জানুয়ারী : পটুয়াখালীতে ছাত্রলীগ নেতা মীর জাহানকে অপহরণ ও হত্যা। একই দিনে ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ কর্মী মোসলেম উদ্দিনকে গুলি করে হত্যা।

০৩ জানুয়ারী : বাকেরগঞ্জের মঠবাড়িয়ায় সাবেক গণপরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা সওগাতুল আলম সগীর আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১১ জানুয়ারী : মানিকগঞ্জের ঘিওরে আওয়ামী লীগ নেতা শ্রী সন্তোষ চক্রবর্তী ও তাঁর ছোট ভাই মনোতোষ চক্রবর্তী দুষ্কৃতকারীদের হতে নিহত।

২১ জানুয়ারী : বরিশালে ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল বারিক নিহত।

২৭ জানুয়ারী : কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার চিথলিয়া ইউনিয়নের রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান নিহত।

২৮ জানুয়ারী : কুমিল্লার মুরাদনগরে আওয়ামী লীগ কর্মী দীপক দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত।

১১ ফেব্রুয়ারী : কুষ্টিয়ার বাহাদুরপুর ইউনিয়ন কর্মী নূরুজ্জামান নিহত।

০২ মার্চ : কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতা ফকির মোহাম্মদ গুলিতে নিহত।

০৯ মার্চ : নেত্রকোণার তেলিগাতী কৃষক লীগ কার্যালয়ে প্রতিপক্ষের বোমায় ৩ জন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত।

১০ মার্চ : গজারিয়া থানার আওয়ামী লীগ কর্মী মোশাররফ হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত।

০৬-০৮ মার্চ : জয়পুরহাটে ৩ জন আওয়ামী লীগ কর্মী হত্যা।

১২ মার্চ : মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালাম আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত।

১৮ মার্চ : আওয়ামী যুবলীগের সাংগঠনিক কমিটির সদস্য আতাউল আল ফারুক নিহত। একই দিনে নোয়াখালীতে আবুল বাশার ও দিনাজপুরে ছাত্রলীগ নেতা কবিরউদ্দিন আততায়ীর গুলিতে নিহত।

০১ এপ্রিল : মনোহরদিতে আওয়ামী লীগ কর্মী আব্দুল মজিদ নিহত।

০৮ এপ্রিল : কিশোরগঞ্জের কাটিয়াদী থানার আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ জামিল (রমু মিয়া) আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১৮ এপ্রিল : শালিখায় আওয়ামী লীগ কর্মী আব্দুল গণি নিহত।

৩০ মে : ফরিদপুর জেলার নড়িয়া এলাকা থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য নুরুল হক আততায়ীর গুলিতে নিহত।

০৩ জুন : বগুড়া আওয়ামী যুবলীগের সদস্য আব্দুর রহমান নিহত।

০৫ জুন : বৈদ্যেরবাজার যুবলীগ আহ্বায়ক আব্দুল বাতেন নিহত।

১০ জুন : নীলফামারীর খোকশা-পলাশবারী ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা তনুভূষণ রায়কে গুলি করে হত্যা।

০৩ জুলাই : রমনা যুবলীগ নেতা আনোয়ার হোসেনকে পিটিয়ে হত্যা।

০৬ জুলাই : ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জমির উদ্দিন আহমদকে গলা কেটে হত্যা।

১০ জুলাই : চাঁপাইনবাবগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা মোজাফফর হোসেন নিহত।

০১ আগস্ট : বেলকুচি থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত। একই দিনে রাজশাহীর বাঘমারায় আওয়ামী লীগ কর্মী আজাহার আলী গুলিতে নিহত।

১৬ আগস্ট : রাজবাড়ী জেলা আওয়ামী লীগ নেতা, রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান অমলকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে মুখোশধারীরা হত্যা করে। একই দিনে বৈদ্যেরবাজারে ছাত্রলীগ কর্মী শিবু চন্দ্রকে হত্যা করা হয়।

১৮ আগস্ট : গাইবান্ধায় আওয়ামী লীগ কর্মী খলিলুর রহমান নিহত, একই দিনে ফতুল্লায় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রহমান নিহত।

২১ আগস্ট : পাবনার শাহজাদপুরে আওয়ামী লীগ নেতা ফখরুল ইসলামসহ ২ জন গুলিতে নিহত।

২৩ আগস্ট : দিনাজপুরে ৩ জন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত। এরা হচ্ছেন নরেন্দ্রনাথ শীল, বিপিন সাহা ও নজিবুর রহমান।

২৫ সেপ্টেম্বর : পালং থানা যুবলীগ সভাপতি ইদ্রিস আলী নিহত।

২৯ সেপ্টেম্বর : মাদারীপুরে ছাত্রলীগ কর্মী আব্দুল মোতালেব নিহত।

১১ অক্টোবর : বাকেরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগ কর্মী আব্দুল মোতালেব নিহত।

১৩ অক্টোবর : মাধবপুর থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি দুলাল মিয়াকে হত্যা করা হয়েছে।

২০ অক্টোবর : নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ কর্মী আলাউদ্দিন নিহত।

০৩ নভেম্বর : যশোরের ফুলতলা থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তোবারক হোসেন নিহত।

০৬ নভেম্বর : রংপুর জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম আততায়ীর হাতে নিহত।

১০ নভেম্বর : সীতাকুণ্ড থানা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি আমিরুজ্জামান ছুরিকাঘাতে নিহত।

২৪ ডিসেম্বর : দোহারে ছাত্রলীগ কর্মী হারুন নিহত।

২৮ ডিসেম্বর : চাঁপাইনবাবগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজুল হক নিহত।

১৯৭৪

১০ জানুয়ারী : জাতীয় সংসদ সদস্য ও ভোলা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোতাহের উদ্দিন আহমেদ আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১১ জানুয়ারী : মাদারীপুর জেলার ছাত্রলীগ নেতা সেকান্দর আলী দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত।

১২ জানুয়ারী : মানিকগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি সম্পাদক আমজাদ হোসেন ও পাবনার আওয়ামী লীগ নেতা নকিব আলী গুলিতে নিহত।

৩০ জানুয়ারী : মানিকগঞ্জ জেলা যুবলীগ সদস্য আব্দুল খালেককে গুলি করে হত্যা।

১৩ ফেব্রুয়ারী : মাদারীপুরের আওয়ামী লীগ নেতা সরদার শাজাহান দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত।

০১ মার্চ : যশোর জেলা ছাত্রলীগ নেতা একরামুল কবির গুলিতে নিহত।

০৭ মার্চ : পটুয়াখালীতে আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম আততায়ীর হাতে নিহত।

১৬ মার্চ : মনোহরদী থানার সংসদ সদস্য গাজী ফজলুর রহমান মুখোশধারীদের গুলিতে নিহত।

২৩ মার্চ : শ্রীপুরে আওয়ামী লীগ নেতা শাহাবুদ্দিন মণ্ডল গুলিতে নিহত।

৩০ মার্চ : হবিগঞ্জ জেলা যুবলীগ সভাপতি আব্দুল মতিন নিহত।

০৫ এপ্রিল : মহসীন হলে ৭ জন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত।

২০ মে : মাদারীপুরে গোসাইরহাট থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জামালউদ্দিন আততায়ীর গুলিতে নিহত।

২২ মে : বরিশালে যুবলীগ নেতা এস এম ইলিয়াস হিরু ও মঞ্জুরুল হক ফিরোজ এবং রাজবাড়ীর পাংশায় যুবলীগ নেতা মানস কুমার সাহা নিহত।

০৮ জুন : নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম মহিউদ্দিন শাহাজাহান গুলিতে নিহত।

১৩ জুন : মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগ নেতা হারুনুর রশিদ (নীরু) আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১০ জুলাই : বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সরদার জালাল উদ্দিন আততায়ীর গুলিতে নিহত।

০১ আগস্ট : ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ প্রাক্তন এমসিএ এডভোকেট ঈমান আলী গুলিতে নিহত। দৌলতপুর থানার আওয়ামী লীগ নেতা মারা গেছেন ছুরিকাঘাতে।

১২ আগস্ট : মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ গুলিতে নিহত। রেজিস্ট্রি অফিসে ১২-১৩ জনের একটি দল নৌকায় করে এসে তাকে হত্যা করে। দুর্বৃত্ত দলে একজন মহিলাও ছিলেন। মাদারীপুরে ছাত্রলীগ নেতা সিরাজ সরদার ও ওমর আলী টেপাকে গুলি করে হত্যা।

১৪ সেপ্টেম্বর : শালিখা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি মধুসুদন কুণ্ডু গুলিতে নিহত।

০৬ অক্টোবর : টাঙ্গাইল মধুপুর থানা আওয়ামী লীগ নেতা মহেন্দ্র লাল বর্মন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির গুলিতে নিহত।

২০ অক্টোবর : গৌরনদীতে আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল হক বিশ্বাসসহ পরিবারের ৪ জন নিহত।

২৯ অক্টোবর : ঝালকাঠির কাঠালিয়া থানা আওয়ামী লীগ সম্পাদক রহমান লস্কর আততায়ীর গুলিতে নিহত।

০৩ ডিসেম্বর : রাজবাড়ীতে ছাত্রলীগ কর্মী শাজাহান নিহত।

০৪ ডিসেম্বর : ফরিদপুর জেলার আওয়ামী লীগ নেতা আবু ইউসুফ আমিনুদ্দিন গুলিতে নিহত।

০৮ ডিসেম্বর : নরসিংদী কলেজের ভিপি হারুনুর রশিদ নিহত।

১০ ডিসেম্বর : মোহাম্মদপুর থানা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান আলী আজম গুলিতে নিহত।

২৭ ডিসেম্বর : কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ঈদের নামাজ আদায়কালে সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়া নিহত।

৩০ ডিসেম্বর : চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রলীগ নেতা এহসানুল হক নিহত।

৩১ ডিসেম্বর : চুয়াডাঙ্গায় আওয়ামী লীগ কর্মী কামরুল ইসলাম নিহত।

১৯৭৫

০২ জানুয়ারী : পাবনার কাশীনাথপুরে যুবলীগ নেতা মো. কোরবান আলী নিহত। পাবনায় আওয়ামী লীগ কর্মী শাহ আলম গুলিতে নিহত।

০৯ জানুয়ারী : নড়িয়া থানা আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল গনি শেখ গুলিতে নিহত। উজিরপুরে যুবলীগ সভাপতি আব্দুল রহমান নিহত।

১৩ জানুয়ারী : দোহারে আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজউদ্দিন হোসেন গুলিতে নিহত।

০৭ ফেব্রুয়ারী : নাটোরে আওয়ামী লীগ কর্মী সাবের আলী নিহত।

০৮ ফেব্রুয়ারী : ময়মনসিংহে যুবলীগ কর্মী আব্দুস সোবহান নিহত।

২৪ ফেব্রুয়ারী : নেত্রকোণার সংসদ সদস্য আব্দুল খালেক দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত।

১২ মার্চ : সাতকানিয়ায় বাকশাল কর্মী আশুতোষ মহাজন খুন।

১৮ মার্চ : পাংশা থানা বাকশাল সভাপতি জোনাব আলী ও কর্মী ইয়াকুব আলী গুলিতে নিহত।

: চাটমোহর বাকশাল নেতা আব্দুল কাসেম গুলিতে নিহত।

২০ মার্চ : সিরাজগঞ্জে যুবলীগ নেতা আব্দুল হামিদ খুন।

২১ মার্চ : বগুড়ায় যুবলীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান নিহত।

১২ এপ্রিল : নড়াইল বাকশাল নেতা অমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস নিহত।

১৩ এপ্রিল : ময়মনসিংহের যুবলীগ নেতা মাজহারুল ইসলাম গুলিতে নিহত।

: রাজবাড়ীর বাকশাল নেতা শাহ মোহাম্মদ হোসেন আততায়ীর গুলিতে নিহত।

২৫ এপ্রিল : কুষ্টিয়ায় বাকশাল নেতা মমতাজ আলী নিহত।

০৮ মে : নোয়াখালীতে ছাত্রলীগ নেতা কামাল আহমেদ নিহত। আঠারবাড়ীতে বাকশাল কর্মী ফজলুল হক নিহত।

১১ মে : নোয়াখালীতে ছাত্রলীগ নেতা কামালুদ্দিন খুন।

১৬ মে : হরিণাকুণ্ডে বাকশাল কর্মী ডা. গিরিন্দ্রনাথ নিহত।

২৮ মে : পাকুটিয়ায় বাকশাল কর্মী তোতামিয়া ও থানা যুবলীগ কর্মী ইলিয়াস হোসেন গুলিতে নিহত। বামইলে বাকশালের সম্পাদক কলিমুর রহমান বাঙালি ব্রাশফায়ারে নিহত।

০১ জুন : চুয়াডাঙ্গা বাকশালের কোষাধ্যক্ষ দোস্ত মোহাম্মদ আনসারী গুলিতে নিহত।

০২ জুন : বৈদ্যেরবাজারে বাকশাল কর্মী রহমান আলী মিয়া নিহত। টুঙ্গীপাড়ার বাকশাল নেতা সোহরাব হোসেন নিহত।

০৮ জুন : কোম্পানীগঞ্জে বাকশাল সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম গুলিতে নিহত।

১৬ জুন : জাতীয় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আবদুর রশীদ লেবু আততায়ীর গুলিতে নিহত।

১৮ জুন : দিনাজপুরে বাকশাল নেতা শহিদুল হক বুলু নিহত।

২৫ জুন : জয়দেবপুর থানা বাকশাল নেতা কফিলউদ্দিন ও কর্মী শহর আলী নিহত।

০৪ জুলাই : শ্রীপুর থানা বাকশাল নেতা মনিরউদ্দিন ফকির ও কর্মী আব্দুর হালিম মাস্টারকে গুলি করে হত্যা।

১৭ জুলাই : পাঁচবিবি বাকশাল নেতা আলাউদ্দিন আহমেদ গুলিতে নিহত।

০১ আগস্ট : রামু থানা বাকশাল নেতা আজিজুল ইসলাম নিহত।

০৩ আগস্ট : বগুড়ায় বাকশাল কর্মী আফতাফউদ্দিন নিহত।

সতেরো

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে তানোরে নিহত মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক কর্মীদের তালিকা

১৯৭৩ সালের ১১ ডিসেম্বর রাজশাহী জেলার তানোর থানায় রক্ষীবাহিনীর নেতৃত্বাধীন সরকারি বাহিনী বন্দি অবস্থায় যেসব মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক কর্মীকে গুলি করে হত্যা করে গণকবর দেয় তাদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম ও পরিচয় সংগ্রহ করা গেছে :

ক্রম নং	নাম	পিতা	গ্রাম
১	মো. এরাদ আলী	মো. এলাহী বক্স	মোহাম্মদপুর, পাচোন্দর, তানোর, রাজশাহী
২	মো. এমদাদুল হক বাবু	সংগ্রহ করা যায়নি	পাঠানপাড়া, রাজশাহী
৩	মাহমুদুর রহমান উজ্জ্বল	সংগ্রহ করা যায়নি	শিরইল, রাজশাহী
৪	মো. আব্দুর রশিদ	সংগ্রহ করা যায়নি	বিনোদপুর, রাজশাহী
৫	মো. মনিরুজ্জামান	মো. তসিম উদ্দীন	মহিষবাথান, রাজশাহী কোর্ট
৬	মো. হযরত আলী	মো. ইয়াকুব আলী	মোহাম্মদপুর, তানোর
৭	মো. মহিরউদ্দিন	মো. তাহির উদ্দিন	মোহাম্মদপুর, তানোর
৮	মো. মনসুর আলী	মো. আশরাফ আলী	মোহাম্মদপুর, তানোর
৯	মো. আজাদ আলী	মো. আমজাদ হোসেন	মোহাম্মদপুর, তানোর
১০	মো. আলাউদ্দিন	মো. পাতান মণ্ডল	মোহাম্মদপুর, তানোর
১১	মো. আজাহার আলী	মো. সৈয়দ আলী	মোহাম্মদপুর, তানোর
১২	মো. নজিবুর রহমান	মো. আলিম উদ্দিন	মোহাম্মদপুর, তানোর
১৩	মো. ছলেমান	মো. মানু	মোহাম্মদপুর, তানোর
১৪	মো. আনসার আলী লাদু	মো. জয়নাল মণ্ডল	ডাঙ্গাপাড়া, তানোর
১৫	মো. আবছার আলী	মো. রুস্তম আলী	ডাঙ্গাপাড়া, তানোর
১৬	মো. আব্দুল মজিদ	মো. জহন মণ্ডল	ডাঙ্গাপাড়া, তানোর
১৭	মো. রিয়াজ উদ্দিন	মো. জহন মণ্ডল	ডাঙ্গাপাড়া, তানোর
১৮	মো. মোজাফফর হোসেন	মোহাম্মদ আলী	ডাঙ্গাপাড়া, তানোর
১৯	মো. আলাউদ্দিন	মো. হুর মণ্ডল	ডাঙ্গাপাড়া, তানোর
২০	মো. এমাজউদ্দিন	মো. আজিজ মৃধা	ডাঙ্গাপাড়া, তানোর

২১	মো. রবিবুর রহমান রবু	মো. ইসলাম মণ্ডল	দেউল, তানোর
২২	মো. খোকা মণ্ডল	মো. নূর মণ্ডল	তাতিহাটি, তানোর
২৩	মো. আহাদ মণ্ডল	মো. আসাদ মণ্ডল	তাতিহাটি, তানোর
২৪	মো. সৈয়দ আলী দেওয়ান	মো. শুদু দেওয়ান	কাজিজিয়া, তানোর
২৫	মো. তৈয়ব আলী	মো. নাদের মণ্ডল	কাজিজিয়া, তানোর
২৬	মো. নাজিম উদ্দিন	মো. আবির উদ্দিন	কৃষপুর, তানোর
২৭	মো. এরাজউদ্দিন	মো. খিদির মণ্ডল	পরানপুর, পাঠাকাটা, তানোর
২৮	মো. আমির হোসেন	মো. নিয়াজ উদ্দিন	পরানপুর, পাঠাকাটা, তানোর
২৯	মো. আছের শাহ	মো. ঝলিম শাহ	পরানপুর, পাঠাকাটা, তানোর
৩০	মো. ঝিন্দা ফকির	মো. শুকুর মোল্লা	কচুয়া, তানোর
৩১	মো. ওয়াজউদ্দিন	মো. ইদার আলী	দুবইল, তানোর
৩২	মো. শামসুদ্দিন	মো. ফেলু উদ্দিন	যশপুর, তানোর
৩৩	মো. সিদ্দিক আলী	হাজী মো. আজিজ সরকার	যশপুর, তানোর
৩৪	মো. আব্দুল জব্বার	মো. সৈয়দ আলী	প্রসাদপাড়া, তানোর
৩৫	মো. হারুন অর রশীদ	মো. বাসারত মন্ডল	প্রসাদপাড়া, তানোর
৩৬	মো. উমর আলী	মো. মনছুর আলী	প্রসাদপাড়া, তানোর
৩৭	মো. ইসহাক আলী	মো. ছদের আলী	প্রসাদপাড়া, তানোর
৩৮	মো. তৈয়ব আলী	মো. ছলিম মণ্ডল	প্রসাদপাড়া, তানোর
৩৯	মো. আমির মণ্ডল	মো. পড়া মণ্ডল	প্রসাদপাড়া, তানোর
৪০	মো. আব্দুর রশিদ	মো. গরীব মণ্ডল	রাতইল, তানোর
৪১	মো. আব্দুল কুদ্দুস শেখ	মো. গরীব মণ্ডল	রাতইল, তানোর
৪২	মো. শফিউদ্দিন	মো. আয়েন শেখ	রাতইল, তানোর
৪৩	মো. আবুল হোসেন	সংগ্রহ করা যায়নি	প্রকাশনগর
৪৪	মো. এমাজউদ্দিন	সংগ্রহ করা যায়নি	কামারগা

আঠারো

পিটার কাস্টার্স-এর সাক্ষাৎকার[৬৭৬]

‘গণবাহিনী গঠনে কেন্দ্রীয় যারা অনুমোদন দিয়েছে এবং বাস্তবে এটা যারা পরিচালনা করতেন– উভয়ের সকল চিন্তা ও পরিকল্পনা এক রকম ছিল এমন বলা যাবে না’

বাংলাদেশ আপনাকে এক রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবেই জানে। কিন্তু আপনার জীবনের শুরুটা সম্পর্কে তেমন জানি না আমরা–

হল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে গ্রামীণ পরিবেশে ১৯৪৯-এ আমার জন্ম। আমার বাবা সেখানে একটি ছোট শহরের মেয়র ছিলেন। তিনি খ্রিস্টান ডেমোক্রেট পার্টির সঙ্গে ছিলেন। রক্ষণশীল পরিবেশে একটি বুর্জোয়া পরিবারে আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে। কিছুটা ইচ্ছা করেই কৈশোরের পরিবেশ থেকে দূরে গিয়ে ১৯৬৭ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। প্রথমে মিউজিক নিয়ে উচ্চতর লেখাপড়া শুরু করেছিলাম। পিয়ানো, গিটার, অর্কেস্ট্রা এসবে আকর্ষণ ছিল। ছয় মাস পরই অবশ্য আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি। বাবা-মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এরপর আমি লেখাপড়া শুরু করি আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, রুশ ভাষা ইত্যাদি নিয়ে। এসময়টি একারণেও উল্লেখ করার মতো যে, তখনি শুরু হয়েছে ইয়োরোপ-আমেরিকায় যুদ্ধ বিরোধী লাগাতার বিপ্লবী বিক্ষোভ। হল্যান্ডেও সেই ঢেউ আঘাত হেনেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ গণতন্ত্রায়নের দাবিতে সেখানেও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এসবই আমাকে প্রভাবিত করছিল। পুরোপুরি মার্কসবাদী না হয়ে গেলেও প্রগতিশীল চিন্তা আমাকে গ্রাস করে ফেলেছিল ততদিনে। ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বরে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য আমি যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসি।

বাংলাদেশের সঙ্গে জড়ালেন কীভাবে আপনি?

এর পেছনে সূত্র হিসেবে কাজ করেছে এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ। ঐ সময় আমি যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইনস্টিটিউটে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পিএইচডি করছিলাম। আমার একাডেমিক মনোযোগের ক্ষেত্র ছিল এশিয়ার দেশগুলো– বিশেষত চীন ও ভারত। প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর চীনের বৈদেশিক নীতি বিষয়ে আমাকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয় থিসিসের প্রয়োজনে। পাশাপাশি এসময় আমি এমন একদল বন্ধুকে পেলাম, যাদের অনেকে ছিল জার্মান– তারা বিশ্বের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করতেন। ওরা ছিল অনেক উদার ও অগ্রসর। ওদের সঙ্গে আমি তখন হো চি মিন, চে গুয়েভারা এদের নিয়েও পড়ছি। মার্কসবাদী অর্থনীতি নিয়ে গভীর অধ্যয়নও এসময়ই। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে শত শত প্রতিবাদ সমাবেশ হচ্ছিল এসময়। কিউবার বিপ্লব নিয়ে শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদেরও সমাবেশ

[৬৭৬] ২০১৩ সালের বিভিন্ন সময় অন্তত তিন দফায় এই সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয়।

হচ্ছিলো। এভাবে কার্যত আমি দু ধরনের শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে তখন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি চীন-ভারতকে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পড়ছি বিশ্বের বিপ্লবী সাহিত্য। এসময়ই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু। এর স্বপক্ষে সেখানে যেসব সংহতি কার্যক্রম শুরু হয় তাতে যোগ দিতাম। আমার সংহতির প্রাথমিক কারণ ছিল মানবিক। পাকিস্তানিদের গণহত্যায় আমার ভেতরে ঐ মানবিক প্রতিক্রিয়া ঘটে। এ ছাড়া হল্যান্ডে থাকতেই বাংলাদেশে তখনকার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়ে জেনেছিলাম। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অনেক বাঙালি শিক্ষার্থী ও বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ওদের থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে আরও কিছু জানলাম। রেহমান সোবহানের সঙ্গে তখনই আমার পরিচয়। এ রকম আরও অনেকের কাছ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে আমার আগ্রহ মেটানোর সুযোগ ঘটে। প্রায় আড়াই বছরের মধ্যে আমি পিএইচডি'র কাজও শেষ করে এনেছিলাম। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে ভারতীয় সৈন্যরা যখন পূর্ববাংলায় ঢুকে পড়ে আমি তখন নিউ ইয়র্কে। সোজা জাতিসংঘে চলে গেলাম। বাংলাদেশ বিষয়ে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর অবস্থা সরাসরি জানতে আগ্রহী ছিলাম আমি।

পূর্ববাংলা স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর আমার বাঙালি বন্ধুরা তখন দেশে ফিরতে শুরু করেছে। ভারতীয় হস্তক্ষেপে দেখলাম বামপন্থীরা উদ্বিগ্ন। ততদিনে বাংলাদেশের বামদের বিষয়ে আমার একধরনের সহানুভূতি তৈরি হয়ে গেছে। ওদের কাছে জানালাম– আমি বাংলাদেশে যাবো। ওরা উৎসাহ দিল। একজন তার বাড়িতে থাকার নিমন্ত্রণও দিয়ে রাখলো।

১৯৭৩-এর জানুয়ারিতে, ৭ কিংবা ৮ তারিখে আমি বাংলাদেশে আসি। এই প্রথম এশিয়ার একটা দেশে আসা। ওয়াশিংটন থেকে দিল্লি। তারপর সড়ক পথে কলকাতা-বেনাপোল হয়ে ঢাকা। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নতুন দেশটির অনেক গ্রাম ও নগরে ঘুরেছি আমি ঐ সফরে। এসময়ই আমার মনে হয়েছে–এখানে শোষিত শ্রেণীসমূহের বিপ্লবী সংগ্রামের জরুরি প্রয়োজন এবং তার সম্ভাবনাও দেখেছিলাম আমি। চে গুয়েভারার আন্তর্জাতিকতাবাদও এসময় আমাকে প্রভাবিত করে থাকবে। তিন মাসের সেই সফরের মধ্য দিয়ে আমার মাঝে এখানকার বিপ্লবী সংগ্রামে অবদান রাখার অপ্রতিরোধ্য দৃঢ়তা তৈরি হয়ে যায়। বলা যায়, শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক– অনেক ধরনের পরিবর্তনই ঘটে গেল আমার মাঝে ঐ সফরের মধ্য দিয়ে। প্রায় পুরো দেশ ঘুরলাম। ইতোমধ্যে গরমকাল চলে এল। আপাতত সফর সমাপ্ত করে এপ্রিলে হল্যান্ডে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নিশ্চয়ই প্রধান মনোযোগ ছিল আপনার? কী দেখতে পেলেন?

আমার জন্য এটা ছিল পুরোপুরি এক ভিন্ন সংস্কৃতির জনপদ। বাংলাদেশে তখন প্রচুর রাজনৈতিক ঘটনা ঘটছিল। আমি সবার সঙ্গেই দেখা করছিলাম। বিশেষ করে বামপন্থী সবার সঙ্গে। তখন নির্বাচন হচ্ছিল এ দেশে। দেখছিলাম সরকারের প্রতি জনসমর্থন পাল্টে যাচ্ছে। নানামুখী সফর ও সাক্ষাৎ থেকে লেখালেখির প্রচুর রসদও পেলাম আমি। ইতোমধ্যে বলেছি, এপ্রিলে শেষ হয়েছিল আমার প্রথম সফর। আমি এই আস্থা পেয়েছিলাম যে, বাংলাদেশে কাজ শুরু করতে পারবো আমি। বাস্তবে প্লেনে বসেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বাংলাদেশেই কাজ করবো আমি এবং সেটা হবে রাজনৈতিক

পরিবর্তনের জন্য কাজ। ১৯৭৩-এর জুলাইয়ে ওয়াশিংটনের পাঠ চুকিয়ে দিলাম। হল্যান্ড গেলাম তারপর। বাংলাদেশের ওপর লেখালেখির মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে সেখানে সাংবাদিক হিসেবে আমার পরিচয় দাঁড়িয়ে গেল। আরও কাজের তাগিদও আসছিল। ঐ বছরই সেপ্টেম্বরে আবার বাংলাদেশে এলাম। ততদিনে চে'র জীবন আমাকে গভীরভাবে আছন্ন করে ফেলেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় এবং বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ও অবদান; তাঁর পদ্ধতি– আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করছিল। চে'র বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদই আমার মাঝে মূল অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

আপনি তো রাজনৈতিক কাজের জন্যই বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছিলেন? সাংবাদিক পরিচয় কেন?

রাজনীতির জন্যই সাংবাদিকতাকে একটা কাভারেজ হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম। রাজনৈতিক কাজের জন্য নিশ্চয়ই প্রকাশ্যে আমি অনুমোদন পেতাম না। তাছাড়া বাংলাদেশে প্রচুর সামাজিক তদন্ত প্রয়োজন ছিল আমার। এখানকার সমাজ বিন্যাস, শ্রেণী বিন্যাস ইত্যাদি বোঝার ক্ষেত্রেও সাংবাদিক পরিচয় প্রয়োজন ছিল। সাংবাদিক হিসেবে একটা ছদ্মনামও নিয়েছিলাম। ঐ নামেই আমি হল্যান্ডের কাগজগুলোতে লিখতাম। বাংলাদেশে এসময় প্রচুর বিদেশি সাংবাদিক আসত। যেহেতু আমি প্রথম থেকে এখানে ব্যাপক সফরের মাধ্যমে অনেককিছু জানতাম সে কারণে বিদেশি সাংবাদিকরাও শুরুতে আমার কাছে আসত প্রাথমিক ধারণার জন্য। এখানকার গ্রামীণ শ্রেণী কাঠামোটি ততদিনে আমি বুঝে নিয়েছিলাম।

দ্বিতীয় দফায় আপনি কতদিন ছিলেন এখানে? মূলত কী করেছেন তখন?

প্রায় এক বছর ছিলাম। এ দফায় এখানকার সমাজ বিশ্লেষণের জন্য আমাকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। পল্লি এলাকায় ব্যাপক সফর করি আমি। গ্রামীণ শ্রেণী-সম্পর্কের ওপর তুলনামূলক গবেষণা করেছিলাম আমি– যেগুলোর সঙ্গে একাডেমিক জগতের তথ্য-উপাত্ত মিলিয়ে দেখতে হয়েছে এবং যা আমাকে এখানকার শ্রেণী-সম্পর্ক বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহায়তা করেছে। আমার মূল রাজনৈতিক দলিল তৈরির জন্য কাজ করতে হয়েছে এসময়। চুয়াত্তরের মাঝামাঝি এ বিষয়ে লেখা শুরু করেছিলাম আমি। তারপর বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে কথা বলছিলাম। ওদের দলিলগুলো সংগ্রহ করেছি। জাসদ, সর্বহারা পার্টি, অন্যান্য মাওবাদী পার্টির দলিল দেখেছি।

সিপিবি?

ওদেরটাও দেখেছি। তবে ওদের আমার প্রথম থেকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে।

মাওবাদীদের অবস্থানই সঠিক মনে হচ্ছিল আপনার কাছে?

ওরা অনেকে লড়ছিল। বিশেষত সর্বহারা পার্টি। কিন্তু তাদের অনেকের মাঝে অতিমাত্রায় অস্ত্রবাদিতা দেখেছি। মাওবাদী রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে গভীর প্রশ্ন ছিল আমার। বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিশেষত্ব তাদের কাছে যথাযথ মনোযোগ পাচ্ছিলো না। গণভিত্তি ছাড়াই জনযুদ্ধ করার চেষ্টা ছিল।

জাতীয় রাজনীতির চেহারাটা তখন কেমন ছিল?

এসময় উদীয়মান বুর্জোয়ারা দেশটি শাসন করছিল। তাদের একধরনের প্রগতিশীল ভঙ্গি ছিল। কিন্তু ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে এরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছিল। তাছাড়া সরকার সমাজতন্ত্রের কথা বললেও– ঐসময়ের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো রয়ে গিয়েছিল একেবারে স্বাধীনতার পূর্বের আদলে। জোতদাররাই ছিল প্রধান শ্রেণী। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ও ক্ষমতা কাঠামো মাও সেতুঙয়ের সময়কার চীনের মতোই ছিল– বিশেষত পল্লি এলাকায়। এখানকার সমাজ বিশ্লেষণে মাওয়ের পর্যবেক্ষণগুলোই সঠিক মনে হচ্ছিল। তবে বাড়তি একটা ব্যাপার ছিল– উদীয়মান একদল বুর্জোয়ার উত্থান। যারা নানান ধরনের ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করে যাচ্ছিল। স্বাধীনতার পর শ্রেণী বৈরিতা কমার বদলে আরও বাড়ছিল– সেটাও আমার চোখে পড়ে। বিশেষ করে গরিব চাষিদের সংখ্যা বাড়ছিল। তবে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। রাজনৈতিক দায়িত্ব ছিল একে ধারণ করা।

বাংলাদেশ সফরের একেবারে শুরুর সময়ের কোনো ইন্টারেস্টিং ঘটনা কি আপনার মনে পড়ে?

ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তিয়াত্তরের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে আসার পরই আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম কাগমারী গিয়ে। তিনি এই বিদেশি সাংবাদিককে ১৫ মিনিট সময় দিলেন। কিন্তু পুরো সময়টা কথা বললেন বামপন্থী মত ও পথ নিয়ে। আমি জানি না কেন তিনি এটা করেছিলেন। সেখানে মেনন ও অন্যান্য ন্যাপ নেতাদেরও দেখেছি।

কিন্তু জাসদকে কেন আপনি বেছে নিলেন বিপ্লবী সংগ্রামের মঞ্চ হিসেবে– এখানে তো আরও অনেক বামপন্থী দল ছিল তখন? একই প্রসঙ্গে জানতে চাইছি, জাসদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের ধরনটি কীরূপ ছিল?

এখনও অনেকে, বিশেষত বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনের অনেকে ভাবেন, ১৯৭৪-৭৫ সময়ে জাসদ নেতৃত্বের সঙ্গে আমার বোধহয় অনেক নিবিড় যোগাযোগ ছিল। আসলে বাংলাদেশে আমার মতো করে কাজ শুরুর আগে আমি নেদারল্যান্ডের অনেক গণমাধ্যম থেকে নতুন দেশটিতে সাংবাদিক হিসেবে কাজের অনেক এসাইনমেন্ট পেয়েছিলাম। করছিলামও সেগুলো। ফলে সকলের সঙ্গেই দেখা হতো আমার। জাসদের অনেক নেতার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি; নানান বিষয়ে আলোচনা করেছি।

রব ও জলিলের সঙ্গে ১৯৭৩-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রথম সফরের সময়ই দেখা হয়েছিল। ঐ দলের অন্যদের সঙ্গে প্রথমবার কোনো যোগাযোগ ঘটেনি। বৈধ দল হিসেবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজই ছিল। তবে জাসদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ধরনটি সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তি আছে। আসলে কাজ শুরুর প্রথম বছরেই আমি নিজের মতো করে দেশটির আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে এখানকার জন্য উপযোগী একটি বিপ্লবী রণকৌশল বিকশিত করার তাগিদ বোধ করছিলাম। সে বিষয়ে আগেই বলেছি।

এসময় বাংলাদেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অনেক গোপন বামপন্থী দল রণকৌশল হিসেবে চীনা ধাঁচের গেরিলা যুদ্ধের পথ অনুসরণ করছিল। কিন্তু আমি মনে করতাম এবং

এখনও করি, এরূপ প্রায় সমতল একটি ভূ-ভাগের জন্য ঐ কৌশল উপযোগী নয়। আমার বিবেচনায় বাংলাদেশের বিপ্লবী সফলতার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় পথ হলো গণঅভ্যুত্থান। এরূপ কৌশলের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে ঐ সময় আমি দলিলও তৈরি করেছিলাম। সামরিক নীতি-কৌশল সম্পর্কিত এইরূপ একটি দলিল ছিল 'battle hunger or armed dedication.' ঐসময় আমি জাসদের রাজনীতি সম্পর্কে সমালোচনামূলক পর্যালোচনাও দাঁড় করিয়েছিলাম। তিয়াত্তর-চুয়াত্তরে তারা যেভাবে শহরকেন্দ্রিক শক্তি সমাবেশের কৌশল নিয়েছিল আমি তার বিপদ সম্পকে বিস্তারিত লিখেছিলাম।

ঐ সময় প্রকাশিত জাসদের খসড়া থিসিসে দলটি বাংলাদেশে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করেছিল 'সমাজতান্ত্রিক'। তার সমালোচনা করে আমি লিখেছিলাম, এখানে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য কাজ করতে হবে। অর্থাৎ বিপ্লবের স্তর নিয়ে ওদের সঙ্গে একমত ছিলাম না আমি। বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক বলা মানে এখানে যে মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলো ছিল তাদের ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করা। এই ভাবনাটিই পরে 'সর্বহারা ঐক্যের ইশতেহার' নামে একটি দলিলে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয় এবং তার ভিত্তিতেই আমি এবং আমার কমরেডদের সম্পৃক্তিতে পঁচাত্তর নাগাদ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক কাজ শুরু হয়।

তবে এও স্বীকার করতে হবে, জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন সদস্য কর্নেল আবু তাহেরের সঙ্গে আমার একটি বিশেষ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব ছিল। নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশে আমি তখন আমার ভাবনার মিত্র খুঁজছিলাম। বাংলাদেশের জন্য উপযোগী বিপ্লবী রণকৌশল নিয়ে আমাদের মাঝে অনেক আলোচনা হতো। আমাদের বন্ধুত্বটি বিকশিত হয়েছিল কারণ এখানে বিপ্লবের পথ যে বিপ্লবী অভ্যুত্থান বা গণ-অভ্যুত্থানমূলক– সে বিষয়ে আমাদের ভাবনায় মিল ছিল। তবে দীর্ঘ আলাপ শেষে বুঝেছিলাম গণ-অভ্যুত্থান বলতে তাহের ও আমি যা ভাবছি তা অভিন্ন নয়। সৈনিকদের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের আগে কৃষক সমাজে সংগঠন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কতটা মনোযোগ ও শক্তি ব্যয় করা উচিত এ নিয়ে আমাদের চিন্তায় স্পষ্ট ভিন্নতা ছিল।

তখনকার বামপন্থী চিন্তাবিদ বদরুদ্দীন উমর-এর সঙ্গেও আপনার সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়?

বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে ঐরূপ সম্পর্ক বিকশিত হওয়ার কোনো উপলক্ষ তৈরি হয়নি। বাংলাদেশে রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরুর মুহূর্ত থেকে তাঁকে আমি উচ্চমূল্য দিতাম। বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর লেখাগুলো দেশটি সম্পর্কে আমার ধারণা লাভে প্রাথমিকভাবে সাহায্য করে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় উমর এক প্রবন্ধে লেখেন, যেহেতু আপাতত এখানে কোনো বিপ্লবী পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই সে কারণে বামপন্থীদের উচিত এখানকার শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 'সৎ পুঁজিপতি'দের সাহায্য করা। বিষয়টি আমাকে বিমূঢ় করে তোলে এবং তার একটি প্রতিক্রিয়া লিখি আমি একই কাগজে ১৯৭৪ সালের ১৪ জুলাই। তখন থেকে আমি ভাবতাম তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এখানকার বামপন্থীদের প্রকৃত শত্রু থেকে প্রয়োজনীয় নজর সরিয়ে নেবে। ঐ লেখার পর থেকে বদরুদ্দীন উমর আমাকে 'বিদেশী চর' হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করেন।

আবু তাহেরের সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে আপনার যোগসূত্র তৈরি হয় কখন এবং কীভাবে?

পঁচাত্তরের সৈনিক অভ্যুত্থানের নেতা শহীদ আবু তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে ১৯৭৪ সালে। তিনি অসুস্থ হয়ে কোনো এক সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই আমাদের দেখা হয়। সেনাবাহিনীকে উৎপাদনমুখী শক্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে তাঁর ভাবধারার কথা আগেই শুনেছিলাম। চুয়াত্তরের মাঝামাঝি দেখা হয়। তাঁর নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারেই তাঁকে আমার প্রকৃত এক বিপ্লবী মনে হয়েছে। সে আসলে বুলিবাগিশ ছিল না। সে কাজের লোক ছিল এবং অনুশীলনে আগ্রহী ছিল। বলা যায়, প্রথম সাক্ষাতের পর আমি তাঁর সম্পর্কে আরও আগ্রহী হয়ে উঠি। আমরা নিয়মিতই আলাপ করতাম। পঁচাত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এভাবে চলেছে। ওনার বাসায়, ওনার ভাইয়ের বাসায় বৈঠক হতো। আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছিলাম, এখানে বিপ্লবের ধরন হবে রাশিয়ার মডেলে। চীনের মডেলে নয়। যদিও এখানকার পল্লি সমাজের গঠন চীনের মতোই ছিল। কিন্তু এখানে বিপ্লব হবে গণঅভ্যুত্থানমূলক।

আবু তাহেরের সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গির প্রচুর পার্থক্যও ছিল এবং সেই পার্থক্যও ছিল মৌলিক। তাহের মনে করতেন গণঅভ্যুত্থান হবে মূলত ঢাকাভিত্তিক, শহরভিত্তিক। শহরভিত্তিক সামরিক প্রস্তুতিকে গুরুত্ব দিতেন তিনি। গ্রামীণ কৃষি মজুরদের সংগঠিত করার কাজকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না। আমার কাছে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে হয়েছিল। আমার বিবেচনায় এরাই হবে গণঅভ্যুত্থানের মূলশক্তি। তাহের যা ভাবছিলেন সেটা নিয়ে উনি কাজ করে যাচ্ছিলেন। যেহেতু আমাদের চিন্তায় পার্থক্য ছিল সে কারণে আমিও পৃথকভাবে কাজে নামার কথাই ভেবেছি। স্বতন্ত্রভাবে কাজের বাস্তবতা তৈরি হয় এভাবেই। তারপরও তাঁকে আমি একজন সত্যিকারের বিপ্লবী মনে করতাম এবং এখনও করি। তবে তখনি মনে হচ্ছিল সামাজিক বিপ্লবের জন্য তাঁর প্রস্তুতিতে অনেক অপূর্ণাঙ্গতা রয়ে যাচ্ছে।

সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না আপনার?

দেখা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আমাকে খুব বেশি আকর্ষিত করেননি। আমার মনে হয়েছে তাঁর মাঝে চিন্তার গভীরতা কম। তবে সমাজে তাঁর ব্যাপক ইমেজ ছিল।

সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ও গণবাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে তো আপনি জানতেন?

আমি জানছিলাম। গণবাহিনীর কাজ সম্পর্কে আমি অবহিত ছিলাম। এর সংগঠকরা দ্রুতলয়ে এগোচ্ছিলেন। কিন্তু দলটির মাঝে লাইনগত সমস্যা ছিল। গ্রামে সংগঠন করার কাজকে তারা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করত না। এটাকে পাশ কাটিয়ে নগরভিত্তিক গেরিলা দল গড়ে তোলাকেই তারা সবচেয়ে জরুরি কাজ মনে করত। গণবাহিনী গঠনে দলের কেন্দ্রীয় যারা অনুমোদন দিয়েছে এবং বাস্তবে এটা যারা পরিচালনা করতেন – উভয়ের সকল চিন্তা ও পরিকল্পনা এক রকম ছিল এমন বলা যাবে না। এডভেনচারিস্ট লাইন প্রাধান্য পাচ্ছিল। গ্রামে ওদের সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল অতি দুর্বল। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম ওদের ভুল রণকৌশল সংশোধন করাতে ভূমিকা রাখবো। অর্থাৎ ভূল রণকৌশল সম্পর্কে বিতর্ক করাই কর্তব্য মনে করেছিলাম। আমাদের বিবেচনায় তখন কোন একটি পার্টি গঠনের চেয়েও জরুরি প্রয়োজন ছিল বামদের ঐক্য। জাসদ ও

সর্বহারা পার্টির মাঝামাঝি থেকে আমরা তখন তাদের কাছাকাছি আনারও চেষ্টা করেছি। কিন্তু জাসদের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মতাদর্শিক বিতর্কের সুযোগ ছিল না। ফলে গণবাহিনীর সকল বিষয় অবহিত থাকার পরও আমার মাঝে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে দোদুল্যমানতা কাজ করতো।

আপনি তখন কী করলেন?

গণবাহিনী যখন চূড়ান্ত কার্যক্রমের দিকে এগোচ্ছে– তখন আমার ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সামনে প্রশ্ন ছিল আমরা কি করবো? আমাদের তো কিছু না করে উপায় ছিল না। তখন আমরা আলাদা সংগঠন করে ফেলেছি। পঁচাত্তরের শুরু থেকে আমরা স্বতন্ত্র উদ্যোগ নিতে শুরু করি। জাসদের কিছু কর্মী তখন আমাদের সঙ্গে চলেও এসেছে। সর্বহারা পার্টিরও কিছু কর্মী এসেছিল। দীর্ঘ ধারাবাহিক বৈঠকের পর 'সর্বহারা ঐক্য আন্দোলন' নামে কাজ করতে শুরু করি আমরা। এটা ছিল এক ধরনের গণসংগঠন। আমরা নিজেদের পার্টি বলতাম না। ভাবতাম এটা একটা অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা।

তবে আমাদের অগ্রসর সংগঠকরা 'কেন্দ্রীয় বিকাশ গ্রুপ' নামে একটি কাঠামোর সদস্য ছিলেন। আমাদের কাজের কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী কাঠামো বলা যায় একে। আমি যে পলিটিক্যাল লাইনের বিকাশ ঘটিয়েছিলাম– সেটাই ওখানে গৃহীত হলো। মূল ডকুমেন্টটা ইংরেজিতে ছিল। পরে সেটা বাংলাও করা হয়। এপ্রিল থেকে আমাদের আনুষ্ঠানিক বৈঠক ইত্যাদি শুরু হয়। নোয়াখালী, বরিশাল ইত্যাদি জায়গায় বেশ ভালোভাবে কাজ শুরু হলো। আরও কিছু পকেটে। আর পুরো রাজনৈতিক কার্যক্রম যাতে সরাসরি সরকারের চোখে না পড়ে তার জন্য আমরা একটা এনজিও-এর মাধ্যমে শিক্ষা বিষয়ে কাজেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তাছাড়া গ্রামীণ পরিসরে ভূমিহীন কৃষকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার জন্য নিরক্ষরতা দূর করারও প্রয়োজন ছিল। পাওলো ফ্রেইরীর আদর্শ থেকে এটা করা হয়। আমাদের ঐ এনজিও'র নাম ছিল *বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন ফর ফাংশনাল এজুকেশন* বা বিওএফই। তবে আমাদের সাংগঠনিক কাজ ভালোভাবে শুরু হয় পচাঁত্তরের আগস্টে, আর ডিসেম্বরেই আমরা আটক হয়ে যাই।

এর আগের একটি বিষয় জানতে চাইছি– গণবাহিনীকে আপনি কীভাবে সহায়তা দিয়েছিলেন?

তাদের আমার তরফ থেকে কোনো ধরনের বস্তুগত সহায়তা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়নি বা প্রদানও করা হয়নি।

আমরা কি এটা বলতে পারি, জাসদের অভ্যন্তরে মতাদর্শিক বিতর্কে পরাজিত হয়েই আপনাকে পৃথক সাংগঠনিক কাজে নামতে হয়?

এটা জয়-পরাজয়ের ব্যাপার ছিল না। ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সঠিক বিপ্লবী মতাদর্শ ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি দলিল তৈরি করেছিলাম আমরা– যাতে আমার ব্যাপক সংশ্লিষ্টতা ছিল। তাকে কেন্দ্র করে অনেক বাম দলের কর্মীরা একত্রিত হতে শুরু করেছিল। তারই অভিব্যক্তি ঘটেছিল 'সর্বহারা ঐক্য আন্দোলন' নামে। এই দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য ইতোমধ্যে জাসদে কাজের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিলেন। প্রায় সমসংখ্যক পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টিরও অনুসারী ছিলেন। আমাদের সকলের মধ্যে

একটা সাধারণ ঐকমত্য ছিল– জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য কাজ করবো আমরা, আর ঐ মুহূর্তে পল্লি সমাজের আধা-সর্বহারা বা ভূমিহীন কৃষকদের রাজনৈতিক সচেতনতায়নই হবে মূল কাজ। সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী না করে গেরিলা যুদ্ধ সম্প্রসারিত করা– যা করে যাচ্ছিলো তখন অনেকে, আমরা তার সমালোচক ছিলাম। কর্নেল তাহেরের রাজনীতিকেও আমরা প্রশ্ন করেছিলাম ঐ অবস্থান থেকেই। এ বিষয়ে আমাদের ডকুমেন্টের নাম ছিল–'On Insurrection – Battle Hunger or Armed Dedication?'

তার মানে কি জাসদকে সঠিক মতাদর্শিক ধারায় আনার কাজে যথেষ্ট সময় দিয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন আপনি?

জাসদের মধ্যে অনেক সংগঠকের মাঝেই '৭৪-'৭৫ নাগাদ নানা ধরনের বিভ্রান্তি, প্রশ্ন, অসন্তুষ্টি কাজ করছিল। আমি সেটাকে বিতর্ক আকারে আরও উসকে দিতে চেয়েছিলাম। অনেকগুলো রাজনৈতিক দলিল লিখে এই কাজটি করা হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে এই দলের ভুল লাইনের সংশোধন হওয়া দরকার ছিল। যেজন্য জাসদের খসড়া থিসিসের বিপরীতে আমি একটি দলিল তৈরি করেছিলাম– 'wrong line is the main problem' নামে। জাসদের খসড়া থিসিসে এমন কিছু বিষয় ছিল যা আমার বিবেচনায় ছিল ভুল।

আদর্শগতভাবে জাসদে আপনি প্রধান ভুলটি কী দেখছিলেন?

বাংলাদেশে তখন পুজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব প্রধান ছিল না– যেমনটি বলছিল জাসদ। আসলে তা ছিল ট্রেডার ও মহাজনী পুঁজির সঙ্গে কৃষি ও শিল্প সমাজের উৎপাদিকা শক্তির দ্বন্দ্ব। জাসদ বিপ্লবের গণতান্ত্রিক স্তরকে অগ্রাহ্য করে যেতে চাচ্ছিল।

১৯৭৫-এর কিছু তারিখ ও ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে বার বার আলোচিত হয়। আপনিও সেগুলোর সাক্ষী। ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বরের মাঝের ঘটনাবলির আসলে নায়ক ও প্রতি-নায়ক কারা? কী ঘটেছিল সেই দিনগুলোতে?

আপনি আমাকে ঐসব ঘটনাবলির সাক্ষী বলেছেন। বাস্তবতা হলো, জেলে গিয়েই কেবল আমি পূর্ণাঙ্গভাবে ঐ দিনগুলোর সত্যিকারের কাহিনী জেনেছি। যখন বাইরে ছিলাম, তখনি ঘটনা ঘটেছে– কিন্তু তখন যেভাবে জেনেছি তার মাঝে প্রচুর গুজব, প্রচুর অনুমান যুক্ত ছিল। ঢাকা তখন প্রকৃতই গুজবের শহর ছিল। যেহেতু সাংবাদিক হিসেবেও আমার কাজ বরাবরই আমি চালিয়ে গিয়েছি– সে কারণে আটক হওয়ার পর জেলে আমি ঐ দিনগুলোর পুঙ্খানুপুংখ বিবরণ সংগ্রহ করি। ঐসব অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত শত শত জনকে আমি কারাগারে পেয়ে গিয়েছিলাম। ১৯৭৭ সালে মুক্তি পাওয়ার পর স্মৃতি থেকে ঐসব কাহিনী নিয়ে লিখতে চেষ্টা করেছি। বিশেষত ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে। সেটা এখনো প্রকাশিত হয়নি।

এতে কোনো সন্দেহ নেই, তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানটি একটা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের অধিক কিছু ছিল না। খালেদা মোশাররফের নেতৃত্বে ঐ ঘটনার মূল চরিত্র ছিল বিমান বাহিনীর কিছু অফিসার। অভ্যুত্থানটি তখনকার ঢাকার মধ্যবিত্ত সমাজে এই ধারণা দিয়েছিল যে, এর মাধ্যমে বাকশাল সমর্থকরা আবার রাষ্ট্র ক্ষমতা পুনর্দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানও অনুরূপ এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান ঐ দুটির তুলনায় একেবারে পৃথক চরিত্রের। এটা ছিল উর্দি পরা নির্যাতিত কৃষক

সন্তানদের ব্যাপকভিত্তিক বিদ্রোহ– যার নেতৃত্বে ছিলেন আবু তাহের। এই অভ্যুত্থান রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুরোপুরি অকার্যকর করে দিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু এই অভ্যুত্থান দেশের অন্যান্য নির্যাতিত শ্রেণীগুলোর সঙ্গে সঠিক সমন্বয় গড়ে তুলতে পারেনি এবং অভ্যুত্থানের নেতারা আগে থেকেই যে কাজে অবহেলা করেছিলেন সে কারণেই তা ব্যর্থ হয়। তাহের বাংলাদেশের বিপ্লবীদের জন্য যেমন বিরাট অনুপ্রেরণা – তেমনি তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।

আপনার আটক ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলুন–

১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে সামরিক আদালতের ঐ বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আমাদের আটক করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ৮ ডিসেম্বর এলিফ্যান্ট রোড থেকে। মাঝখানের সময়টিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো নিয়মিত। সিপাহী অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার পর থেকে আমাদের উপর নজরদারি করা হচ্ছিল– সেটা বুঝতে পারছিলাম। আমরা তখন জাসদ নই– পৃথক সংগঠনে। তারপরও নজরদারি হচ্ছিল। আমরাও তখন সতর্ক হতে শুরু করলাম– যদিও আগে থেকে আমাদের এক্ষেত্রে দারুণ গাফিলতি ছিল। যাই হোক, নজরদারির পর থেকে রাজনৈতিক কাগজপত্র সরিয়ে ফেলতে শুরু করলাম। প্রচুর প্রচার-পুস্তিকা ছিল, যেগুলো সরানোও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ৬ ডিসেম্বর স্পেশাল ব্রাঞ্চে আমাকে ডাকা হলো। হলিডে কাগজে যেসব লেখা লিখেছিলাম সেগুলোকে কেন্দ্র করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। আবার ছেড়েও দেওয়া হলো। একদিন পরই আবার আটক করা হলো। তারপর শুরু হলো মামলা ও বিচার। দীর্ঘ আট মাস পর চার্জশীটের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

সরকারি তরফ থেকে বলা হচ্ছিল, এটা একটা 'ষড়যন্ত্র মামলা।' ঐ সময়ে এটা ছিল এ রকম দ্বিতীয় মামলা– যেখানে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরকার উৎখাতের অভিযোগ আনা হয়। প্রথমটি ছিল সিপাহী অভ্যুত্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে। আমাদের (যে মামলায় মোট ১১ জন অভিযুক্ত ছিল) বিচার প্রক্রিয়া প্রথমটির মতো কারাগারে হয়নি। তবে কোর্টে আমাদেরও এক ধরনের লোহার খাঁচাতেই রাখা হতো। আমাদের, অর্থাৎ 'সর্বহারা ঐক্য আন্দোলন'-এর নেতাদের, ঐ বিচারে (আমিসহ) ১৪ বছর করে সাজা দেওয়া হয়। সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে আমি ব্যতীত অন্যান্য যারা জেলে ছিলেন তারা ১৪ বছরের সাজা শেষ করে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন।

এটা একটা প্রহসনের বিচার ছিল। আমার পক্ষে যুক্তি-তর্কের জন্য একজন ব্রিটিশ আইনজীবী আগ্রহ প্রকাশ করলেও তাঁকে কাজের সুযোগ দেওয়া হয়নি। বিচার সম্পর্কিত সকল সংবাদ সেন্সর হতো। দেশবাসী সত্যিকারের কিছুই জানতে পারছিল না। আমাদের যেখান থেকে আটক করা হয় সেখানে সংগঠনের কিছু রাজনৈতিক দলিলপত্র পাওয়া গিয়েছিল– এটাই ছিল মামলায় প্রধান সাক্ষ্য-প্রমাণ। বাংলাদেশের এলিটরা যে সমাজ পরিবর্তনের ভাবাদর্শকে কতটা ভয় পায় সেটাই প্রমাণিত হয় ঐ মামলায়।

রায়ের আগে-পরে আন্তর্জাতিকভাবে এবং বিশেষভাবে নেদারল্যান্ডের গণমাধ্যমে আমার মুক্তি চেয়ে লেখালেখি হচ্ছিল। অন্যদিকে রায়ের আগেই কারাগারে সামরিক আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অনশনও চালিয়েছিলাম আমি। সামরিক কর্তৃপক্ষ তখন নির্যাতনমূলকভাবে ফোর্স ফিডিং করিয়েছিল। নেদারল্যাণ্ড সরকার এসময়

বাংলাদেশ সরকারের ওপর আমার মুক্তির বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করে। এসবের মিলিত ফল হিসেবে আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

জাসদ ও তাহের সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল। সেটা এখন শুধুই ইতিহাস। অতীতের সেই অভিজ্ঞতাকে আপনি তাত্ত্বিকভাবে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

এ ধরনের অভ্যুত্থান প্রশ্নে পঁচাত্তরে আমি যা ভেবেছি, এখনও তাই ভাবি। এধরনের অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহ দুটি কারণে ঘটে। প্রথমত, সৈনিকদের নিজেদের অর্থনৈতিক, পেশাগত বা সামাজিক কোনো দাবি নিয়ে। দ্বিতীয়ত. বৃহত্তর সমাজের রূপান্তর বা গণতন্ত্রায়নের লক্ষ্যে। যেভাবেই ঘটুক এবং যে দাবিতেই ঘটুক – তার সাফল্য নির্ভর করে এবং তার মাধ্যমে সমাজে সত্যিকারের পরিবর্তন আসতে পারে কেবল তখনি– যখন ঐ অভ্যুত্থানের সঙ্গে শহুরে শ্রমিক ও গ্রামীণ দরিদ্রদের ব্যাপক বিদ্রোহ যুক্ত থাকে। অর্থাৎ অভ্যুত্থানে উর্দিধারী এবং উর্দিহীন– উভয় পরিসরের নির্যাতিতদের সম্মিলন ঘটা জরুরি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে, উর্দিধারীদের নির্যাতিত অংশ শাসক এলিটদের ওপর নানান সময় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। নানান কারণেই তাদের মাঝে বঞ্চনার বোধ তৈরি হয়েছিল। তবে যখনি তারা বিদ্রোহ করেছে– তখন পাল্টা আঘাত এসেছে।

ফলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসেনি। সমাজে যে বিভিন্ন পেশায়, বিভিন্ন পরিসরে নির্যাতিত জনসমাজ রয়েছে– তাদের মাঝে সংগ্রামের সমন্বয় ঘটানোর কাজটি এ দেশের বামপন্থীরা এখন পর্যন্ত করতে পারেনি। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার সুযোগগুলোও তাই এখানকার নির্যাতিত শক্তিগুলো কাজে লাগাতে পারেনি। তবে এখনও সেটা সম্ভব। যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হন।

উনিশ

বাহাত্তরে কর্নেল জিয়াউদ্দিনের যে লেখা সেনাবাহিনীতে আলোড়ন তুলেছিল

[এই লেখার পর সরকারের সর্বোচ্চ মহলের নির্দেশে লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। সেনাবাহিনী ছাড়ার পর তিনি সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টিতে যোগ দেন।]

Hidden Prize
Lt. Col. Ziauddin

Today I wish to convey to the freedom fighters in particular and the people in general something, which I feel, is due to them and is being held back for very, very selfish motives by those in power. This independence has become an agony for the people of this country. Stand on the street and you see purposeless, spiritless, lifeless faces going through the machines of life. Generally after a liberation war the `new spirit' carries the people through and the country builds itself out of nothing. For everyone life becomes a challenge, and they meet it fearlessly. In Bangladesh today the story is simply the other way round. The whole of Bangladesh is either begging or singing the sad songs or shouting without awareness. The whole country can be dissected into the various disjointed parts as follows:

a. The intellectuals are busy `hair splitting'.
b. Those who have read a little are engrossed in self-destructive criticism. They must have somebody to blame everyday, in the office or at home.
c. Those who have a little money are making the best out of what they can, but they, too, are feeling unsteady.
d. Those in adminstration are trying to run a redundant system that is holding back `progress.'
e. Those in power have already compromised the national sovereignty and are busy guarding the nation's prize.
f. The hungry and the poor are totally lost and begging charity. The so-called `friends of Bangladesh are showing sympathy and are ex-ploting them for a mean end.

This country is on the verge of falling into the abyss. Everyone has to be united, infused with pride and made to `move.' Talking about pride, what has happened to our pride? Did we have it? Have we lost it or is it hidden? In these case, the nation's pride remain hidden in `secret treaty.' We had pride and we found it on 26th March. Those who are signatories to it must give it out to the people. The prize belong to them. Those who know of such a treaty must tell the people that there is such an act of `betrayal.' If they do not do it, they are enemies of the people and the freedom fighters have a right to demand it. All outward manifestations of that treaty in any form are trying to guard what belongs to the people. They, too, are enemies of the people. If the Bangabandhu loves his people he must let the people know. Why should he be afraid? We fought without him and won, and now if need be, we will fight again, nothing can beat us. We can be destroyed but not defeated.

Weekly Holiday, 20 August 1972

বিশ

I Can't Die Twice

Major M A Jaleel

I can't die twice, because I jumped into the fire of liberation, I embraced death. And if today I am a living soul, it's mere the weakness of death that it has failed to reciprocate my gesture. My life is just a bonus and so are the dedicated lives of all the freedom fighters of Bangladesh who are now trudging along lifelessly experiencing the bitterness and curses of life. But dedication has a meaning. Dedication is a dynamic force, a force that can shatter and shackle, however strong that may be.

And we have seen that, how 90,000 well-trained heads of Yahya's hordes bowed in front of the dedication of our young freedom fighters.

Bangladesh achived independence after tremendous splashing of blood, humiliation and sufferings with the greatest hope of the freedom fighters and the people of Bangladesh looked forward to breathing afresh; with cupped hands to god, on the ashes of their burnt out houses.

Where is the change? What is the change? Are the questions burning in every heart, for the taste of independence has been rather too sour? What meaning has this independence brought to our people when they have no security and other rights like freedom of speech, freedom of press and the certainly of justice?

The law and order situation in the country is such that even a child of yesterday can jump over it. Administrative organs of the government are ineffectual because it seems that the government has elected inefficient, ineffective and wrong people to manage the administrative machinery. They have almost been made impotent in the delivery of their goods to the needy public due to the constant irritable promptings and threats by certain M.C.A's, ministers and other people of influence.

Panicky Queries

How long this way will the cart of Bangladesh government proceed and where to? These are the panicky queries made by the people who are now passing their days in complete agony, anxiety and uncertainty. The technocrats and intelligentsia are the most unfortunate and miserable lot today, because despite their best wishes to render services for the reconstruction of our devastated country they are kept away, for one reason or another.

Secondly, the rising prices of daily necessities in their turn are breeding bribery, robbery, murder and lawlessness with borders open, Bangladesh has metamorphosed into an earthen pot with a big hole in its bottom which can retain nothing despite regular flow of relief and foodgrains. Answer to this problem is the strong desire of sealing off our borders, which must be

implemented forthwith, or else there is every likelihood of entire Bangladesh being smuggled out!

If the soldiers of Bangladesh Rifles (BDR) are not enough to check this smuggling, a people's volunteer corps might be of help.

Thirdly, the collaborators who are now in captivity and under custody of the government must be tried speedily, so that only the real culprits are punished and the rest, some of whom are belived to be victims of old enmity, must be released immediately.

Fourthly, because the people have lost all faith and confidence in the MCAs, the Assembly should be dissolved and the cabinet be dismissed. In its place the government should form an Advisory council with people selected from all parties till the next election. However, the constitution, as promised earlier, should be delivered to the people as early as possible.

Freedom Fighters

Fifthly, I sincerely feel and have also realized during the liberation war that among the freedom fighters is lying a dormant gigantic force; a hidden treasure of wealth for war-torn Bangladesh. That dynamic force, if not harnessed in time and activated for the reconstruction of this country, may, in the near future, divert itself towards channels which will bring about disaster and complete anarchy. This force springs from the spirit of patriotism and the spirit of patriotism, if not honoured and utilized in time, turns into a devilish wrath for vengeance.

I can foresee an internal turmoil and I do fear it indeed for that shall only pollute our sense of glory and destroy mercilessly the fame that we earned by our liberation struggle. I would like to request the government to make an all-out effort to absorb the freedom fighters by formulating some plan immediately.

Freedom fighters are too willing, and forever ready, to serve and sacrifice their lives and belongings for the welfare, reconstruction and sovereignty of this land.

Freedom fighters have died once, and twice shall never come. Let us understand each other and live for a change with mutual respect. So far, my discussions with Sheikh Mujibur Rahman, President Justice Abu Sayeed Chowdhury and Syed Nazrul Islam have centered on the problems written above, but unfortunately on these have had no progress as yet. The people of this democratic country have the right to demand to know as to where we are heading _ toward anarchism or socialism?

September 24, 1972, Weekly Holiday.

একুশ

মুজিব শাসন : একজন লেখকের অনুভব

আহমদ ছফা

[এই লেখায় উল্লিখিত মতামত একান্তই প্রয়াত লেখকের। এখানে লেখাটি সংযুক্ত হয়েছে তৎকালীন আর্থসামাজিক প্রসঙ্গগুলো বোঝা ও তার বিরোধিতার স্বরূপ আঁচ করার উদ্দেশ্যে। *আ.পা.*]

চৌদ্দই আগস্টের রাতে আমি নতুন ঢাকার ধানমন্ডি এলাকার সাতাশ নম্বর সড়কের একটি হোস্টেলে এক বন্ধুর সঙ্গে ঘুমোতে গিয়েছিলাম। সাতাশ নম্বর আর বত্রিশ নম্বর সড়কের ব্যবধান বড় জোর তিন থেকে চার শ' গজ। এই বত্রিশ নম্বরেই দারা পুত্র পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। আনুমানিক রাত এগারোটা হবে হয়তো। বত্রিশ নম্বর পেরোবার সময় খাকি পোশাক পরা আট দশজন পুলিশ দেখলাম। কয়েকজন অফিসার, বাকিরা সেপাই। বন্দুক উচিয়ে রাষ্ট্রপতির বাসভবনের সামনের সড়কের মুখে পাহারারত। এই পথে বেশ ক'দিন থেকে যাওয়া আসা করছি। প্রায়ই দেখতাম ঘুণটি ঘরে দু' থেকে তিনজন সেপাই দাঁড়িয়ে। কোনো অফিসার দেখেছি মনে পড়ে না। আজ পাহারাদারদের দল ভারি দেখেও মনে কোনোরকম ভাবান্তর আসেনি। আগামীকাল পনেরো আগস্ট বেলা দশটার দিকে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এককালের বাংলাদেশের আগ্নেয়আত্মার জ্বালামুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আগমন করছেন। হয়তো সেজন্য এই অধিকসংখ্যক সেপাই-সান্ত্রীর আনাগোনা। এখন পর্যন্ত সবকিছু পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘটে আসছে। কোথাও কোনো ঝঞ্জাট ঘটেনি। শেখ মুজিবুর রহমানের আগমনোপলক্ষে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়ানো-ছিটানো বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে সাজানো গোছানোর পালা। রাস্তার এবড়ো-থেবড়ো গর্তগুলোতে সুরকি পড়েছে। রোলার ঘুরছে, পীচের আস্তরণ বসেছে। গত এক পক্ষকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে, কলাভবনে, বাণিজ্যভবনে, বিজ্ঞানভবনে জোর মেরামতির কাজ চলছে। অনেকদিন অনাদরে মৃত জন্তুর কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে থাকা ন্যাড়ামুড়ো দেয়ালগুলো চুন, সুরকির প্রসাধন স্পর্শে হেসে উঠেছে। সমস্ত এলাকাটায় একটা সাজ সাজ রব, তাড়াহুড়ো ব্যস্ততা এসব তো আছেই।

রাতের আঁধারে শক্তহাতে আলকাতরা দিয়ে দাবড়া করে লেখা শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে চ্যালেঞ্জ করা দেয়াল লিখনসমূহ নবীন চুনের প্রলেপের তলায় ঢাকা পড়েছে। সুন্দরীর ললাটে সিন্দুর বিন্দুর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সুইচ্চ শুভ্র প্রাচীরের কপোলদেশে শিল্পীর নিপুণ তুলিতে লেখা সুন্দর লিখনমালা দৃষ্টিকে দূর থেকে টেনে নিয়ে যায়। শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের মহানায়ক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লৌহমানব ইত্যাদি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন, তাই বিশ্ববিদ্যালয় নানান রঙের চিত্রলেখায় সেজে সুন্দর হয়ে উঠেছে। চারদিকে একটা উৎসবের হাওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়াঢাকা কালো কালো সাপের শরীরের মত চেকন বাঁকা রাস্তাগুলোর মোড়ে মোড়ে উল্লসিত অভিনন্দনের বাণী বুকে ধারণ করে রাতারাতি ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে নানান রঙের প্ল্যাকার্ড। তোরণরাজি

মাথা তুলেছে। সর্বত্র একটা উৎকণ্ঠার ভাব আগামীকাল কাঁটায় কাঁটায় বেলা দশটায় তিনি আসছেন।

প্রায় একপক্ষকাল ধরে দিনে রাতে কাজ চলছে। উপাচার্যের আহার নেই, নিদ্রা নেই। সাড়ে সাত লাখ টাকা নগদে বিলিয়ে দিয়েও মনে মনে তিনি স্বস্তিবোধ করতে পারছেন না। দৈবাৎ যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায়, আর সেখানেই যদি মহামানবের দৃষ্টি আটকে যায়, তিনি মুখ দেখাবেন কেমন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতির এটা প্রথম আনুষ্ঠানিক আগমন। তিনি শুধু রাষ্ট্রপতি নন, বাঙালি জাতির পিতা, মুক্তিদাতা, বাংলার হাটের মানুষ, ঘাটের মানুষ, মাঠের মানুষের বন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সরকার সমর্থক ছাত্রদলটির হোমরা-চোমরা কর্মীদের বেশ ব্যস্তদিন কাটছে। তারা দিবসে কাজের তদারক করে, রাজনীতির পাহারায় থাকে। বাংলাদেশে দুষ্ট লোকের অভাব নেই। রাষ্ট্রপতির আগমনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন অলক্ষুণে কোনো দেয়াল লিখন কেউ লিখে যেতে পারে, অনেক অর্থব্যয়ের শ্রমের শিল্পকর্মগুলোর অঙ্গহানি ঘটাতে পারে, সুন্দর চিত্রলেখাসমূহের লাবণ্যহানি করতে পারে, এ রকম কিছু ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাই আগেভাগে এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। পুরো দায়িত্বটা রাষ্ট্রপতির জ্যেষ্ঠপুত্র গ্রহণ করেছেন। তিনি তার দীর্ঘ দেহ এবং বহু বিশিষ্ট বন্ধুদের নিয়ে অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের গোঁড়া সমর্থক ছাত্র এবং শিক্ষকদের মনোভঙ্গিটা এ রকম, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে চরণ ফেলামাত্র বাংলাদেশে একটি অভিনব যুগের অভ্যুদয় ঘটবে।

*　　*　　*

শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনটা ছিল কৌশলগত দিক দিয়ে তাঁর নতুন শাসনতান্ত্রিক বিধি চালু করার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ। উনিশ শ' পঁচাত্তর সালের শুরুর দিকে তিনি বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের বেশকিছুকে জেলে ভরেছেন। তাঁর একনায়কত্বের প্রতিস্পর্ধী তরুণ বয়স্ক রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীদের খুশিমাফিক হত্যা করা হয়েছে এবং সে কথা বলে প্রকাশ্যে গর্ববোধ করতেও তাঁকে দেখা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর স্থলে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি হয়ে বসেছেন তিনি। তাঁর নিজের দল আওয়ামী লীগ, অন্য দুটো সমর্থক দল বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেউ কোনো ওজর আপত্তি উত্থাপন করেননি। বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত এই তিনটি দলের প্রত্যেকটিরই টিকে থাকার জন্য শেখ মুজিবের ছত্রছায়ায় দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল একেবারে অপরিহার্য। মুজিব থাকলে তারা সবাই আছেন, তিনি নেই তো কেউই নেই। তাই তাঁদের কারো পক্ষে এই জনগণনন্দিত অধিনায়কের কোনো সিদ্ধান্তকে দলীয় কিংবা আন্তঃদলীয় শৃঙ্খলা প্রয়োগ করে রাশ টেনে ধরা অসম্ভব ছিল।

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি তার প্রতি সমর্থনবিমুখ পত্র-পত্রিকাসমূহের মুখ প্রায় বন্ধ করে নিয়ে আসছিলেন। বিরোধী পত্রিকাগুলোতে সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়ে, সাংবাদিকদের গ্রেফতার করে, সম্পাদকদের জেলে পুরে, ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে ইত্যাদি নানা ছলছুতোর সাহায্যে অনেকগুলো দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক পত্রিকার প্রকাশ সাফল্যজনকভাবে বন্ধ করে দিতে পেরেছিলেন। এই চরম মার হজম করেও যে

গুটিকয় পত্রিকা প্রাণ নিয়ে কোন রকমে বেঁচেছিল, সেগুলোর বিরুদ্ধে কোনো রকমের অভিযোগহীনতাকেই অভিযোগ হিসেবে দাঁড় করিয়ে সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে বন্ধ করে দিলেন।

তারপরে বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরোধী কোন দলের মালিকানাধীন কোনো পত্রিকা ছিল না। ব্যক্তিমালিকানাধীন পত্রপত্রিকার সংখ্যাও ছিল একেবারে অল্প। শেখ সাহেবের নিজের দল আওয়ামী লীগ এবং তাঁর সমর্থক দুটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এই তিনটি রাজনৈতিক দলকে তিনি অঙ্গুলি হেলেনে সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে ইচ্ছে পরিচালনা করতেন। এই দলগুলোর ঘোষিত রাজনৈতিক দর্শন যা-ই হোক না কেন, কার্যত তারা শেখ মুজিবুর রহমানের সব রকম নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলত। অঙ্গদলসমূহের পরামর্শে নাকি নিজের বিবেচনা অনুসারে বলা খুব মুশকিল– তিনি সরকারি দল এবং সরকারের অন্ধ সমর্থক দল দুটিকে ভেঙে একটিমাত্র জাতীয় দল গঠন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। আর নতুন জাতীয় দলের নামকরণ করলেন 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' সংক্ষেপে বাকশাল। বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণার পরে তখন পর্যন্ত যে কয়টি ব্যক্তি বা দলীয় মালিকানাধীন পত্রিকা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আপসরফা করে বেঁচেছিল, সেগুলোকে পুরোপুরি সরকারি আওতায় নিয়ে আসার জন্য তিনি সুদীর্ঘ বাহু প্রসারিত করলেন।

বাংলাদেশে ব্যক্তি বা দলীয় মালিকানাধীন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ছিল একেবারে স্বল্প। অনেকগুলোই সরকারি কোপানলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। আইয়ুবের আমলে প্রত্যক্ষভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল মাত্র দুটি। একটি বাংলা, অন্যটি ইংরেজি। বাংলা পত্রিকাটির নাম ছিল 'দৈনিক পাকিস্তান'। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর 'দৈনিক বাংলা' নামে আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজি পত্রিকাটির নাম 'মর্নিং নিউজ'। এ পত্রিকা দুটি ছাড়া স্বাধীনতার পর সরকারের প্রত্যক্ষ এখতিয়ারে আরো তিনটি পত্রিকা চলে আসে। তার দুটি দৈনিকের মধ্যে একটি বাংলা এবং একটি সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র পত্রিকা। ইংরেজি দৈনিকটির পাকিস্তান আমলে নাম ছিল 'পাকিস্তান অবজার্ভার'। স্বাধীনতার পর 'বাংলাদেশ অবজার্ভার' নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা কাগজটি আগে থেকে 'দৈনিক পূর্বদেশ' নামে পরিচিত ছিল এবং চলচ্চিত্র পত্রিকাটির নাম ছিল 'চিত্রালী'। এই পত্রিকা তিনটির মালিক জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, যিনি ন'মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যদের কার্যকলাপ সমর্থন করেছেন এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের আগে পাকিস্তানে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। তাই পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে পত্রিকা তিনটির প্রকাশনার দায়িত্ব সরাসরি সরকারকে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে বাংলাদেশ যুব আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সভাপতি কেন্দ্রীয় বাকশালের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা এবং রাষ্ট্রপতির বুদ্ধিবিবেচনার একমাত্র ভরসা বলে কথিত জনাব শেখ ফজলুল হক মণি স্বাধীনতার পরে একেবারে শূন্যাবস্থা থেকেই তিন তিনটি পত্রিকার জন্মদান করেছিলেন। একটি ছিল বাংলাদেশের বিচারে ঈর্ষাযোগ্য মানের অধিকারী ইংরেজি দৈনিক, নাম 'বাংলাদেশ টাইমস', বাংলা দৈনিকটির নাম 'বাংলার বাণী' এবং চলচ্চিত্র পত্রিকাটি 'সিনেমা' নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতার

আগে তিনি স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় সাব এডিটরের কাজ করতেন। শেখ মুজিবুর রহমানের তিন বছরের শাসনকালে জনাব ফজলুল হক মণির মতো অনেকে এ রকম সামান্য অবস্থা থেকে অকল্পনীয় অর্থ-সম্পদের মালিক হতে পেরেছেন। অবশ্য তাদের বেশিরভাগেরই রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না বলে টাকা-পয়সাকে এমন সুন্দর লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করতে পারেননি। ওপরে বর্ণিত তিনটি বাংলা এবং তিনটি দৈনিকের প্রত্যেকটিই সরকার সমর্থন করে যেত। এই সমর্থন অনেক সময় এত দাসোচিত এবং অমার্জিত রূপ গ্রহণ করত যে, রুচিবান মানুষদের পীড়িত না-করে ছাড়ত না। এই সকল পত্রিকার সম্পাদক এবং সাংবাদিকরা সরকারের সুনজরে পড়ার জন্য তোষামোদ এবং তোয়াজে কে কার চেয়ে অধিক দূর যেতে পারেন সেজন্য রীতিমত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। যদিও সেসব লেখা পাঠ করে বিবমিষা ছাড়া নিরপেক্ষ পাঠকের মনে আর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারত না।

রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত উল্লিখিত ছয়টি পত্রিকা ছাড়া আরো কয়েকটি পত্রিকা তখনো ছিল। তার মধ্যে জনপ্রিয়তায় যেটি সবগুলোকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সে পত্রিকার নাম 'দৈনিক ইত্তেফাক'। এই পত্রিকাটির সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নানা উত্থান-পতন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আওয়ামী লীগের প্রথম সভাপতি মাওলনা ভাসানী এই কাগজটির প্রতিষ্ঠাতা হলেও প্রখ্যাত সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়া ছিলেন পত্রিকাটির মালিক এবং সম্পাদক। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রাতিস্বিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী তফাজ্জল হোসেন সাহেব নিজেও ছিলেন একজন আওয়ামী লীগার, শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর পরামর্শ-বুদ্ধি-বিবেচনা আওয়ামী লীগ মহলে অপরিসীম মর্যাদা এবং গুরুত্বসহকারে গৃহীত হতো। জন্মের শুরু থেকে এই পত্রিকাটি আওয়ামী লীগকে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দান করে আসছিল। উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয় করার পেছনে শেখ মুজিবুর রহমান যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, 'ইত্তেফাক' পত্রিকা এবং সম্পাদক তফাজ্জল হোসেনের অনন্য সাংবাদিকতার প্রতিভা তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেননি। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের প্রতি জোরাল সমর্থন প্রকাশ করার অভিযোগে আইয়ুব খান সরকারের গভর্নর মোনেম খান পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করেছিলেন এবং ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলেন। উনিশ শ' উনসত্তর সালের আইয়ুব বিরোধী অভ্যুত্থানের সময়ে প্রবল জনমতের চাপে সামরিক সরকারকে বাধ্য হয়ে এই জনপ্রিয় পত্রিকাটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে হয়। এই 'ইত্তেফাক'ও স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগকে অকুণ্ঠ সমর্থন করে আসছিল– তবে ইত্তেফাকের ভূমিকাটি অতটা মর্যাদাবিবর্জিত ছিল না। এই কাগজ মাঝে মাঝে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশ্নটি তুলে ধরার চেষ্টা করত। ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের শাসন, নাগরিক অধিকার ইত্যাদির সপক্ষে কখনো-কখনো, দু'চার কথা নরমে-গরমে সাহস করে লিখে বসত। 'ইত্তেফাক' ছাড়া অপর প্রাচীন দৈনিক পত্রিকাটির নাম 'আজাদ'। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা, মুসলিম লীগের পুরোধা, কৃতবিদ্য পণ্ডিত এবং এক সময়ের বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে নাম করা সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক মওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকে এই প্রাচীনতম পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি

ছিল রক্ষণশীল এবং সরকার ঘেঁষা। বাংলাভাষা আন্দোলন ছাড়া তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান এবং কেন্দ্রের মধ্যে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে যখনই বিরোধ উপস্থিত হতো সব সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করত। মাওলানা আকরাম খাঁ যতদিন বেঁচেছিলেন এই সুচিহ্নিত ভূমিকা 'আজাদ' পত্রিকা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে। মওলানা সাহেবের মৃত্যুর পর আজাদের প্রাক্তন ভূমিকার অনেক পরিবর্তন ঘটলেও পত্রিকা হিসেবে আগের জনপ্রিয়তা হারিয়ে বসেছিল। পরিচালনার ত্রুটিই সম্ভবত এর মুখ্য কারণ। স্বাধীন বাংলাদেশে কোনো রকমে ধারদেনা করে আজাদ পত্রিকার দিন চলছিল। সরকারের বিরোধিতা করার তো প্রশ্নই ওঠে না। মাঝখানে একবার সরকার পত্রিকাটিকে নিয়েও গিয়েছিলেন।

মোজাফফর আহমদের বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পত্রিকাটির নাম 'সংবাদ'। এই কাগজ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছাড়াও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করত। দুটি দলই যৌথভাবে ভারত থেকে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে কিংবা বলা যায় তারও আগে থেকে অধিকাংশ বিষয়ে আওয়ামী লীগকে ছায়ার মত অনুসরণ করে আসছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এই পার্থক্য কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোটায় এসে ঠেকেছিল। অধিকন্তু মুজিবুর রহমানের যাবতীয় কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন যোগানো পত্রিকাটির একটি নৈতিক কর্তব্যও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পত্রিকাটিতেও সরকারি কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হতো। স্বাধীনতার পর 'জনপদ' নামে আরেকটি বাংলা দৈনিক ঢাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। আওয়ামী লীগের এককালীন সভাপতি এবং পরবর্তীকালে শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভার সদস্য কামরুজ্জামান ছিলেন পত্রিকাটির নেপথ্য মালিক। এটিও ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থক পত্রিকা। 'দি পিপল' নামে একটি দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছুকাল আগে জন্মলাভ করেছিল। জনৈক উঠতি বাঙালি ধনী ছিলেন পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী। উনিশ শ' একাত্তর সালের মার্চের রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আগুন লাগিয়ে কাগজটি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালীন ভারতে গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে কাগজটির পুনঃপ্রকাশ ঘটে। বাংলাদেশে পুনরায় কাগজটির প্রকাশ ঘটার পর থেকে সরকারকেই সমর্থন দান করেছিল। উনিশ শ' একাত্তর সালের পয়লা জানুয়ারি একবার মাত্র সরকারি গুলিবর্ষণ করার প্রতিবাদ করে গরম সংবাদ পরিবেশন করেছিল বলে প্রচণ্ড হুমকির মুখে ভাল ছেলের মতো সুর পাল্টাতে বাধ্য হয়।

উনিশ শ' পঁচাত্তর সালের শুরুর দিকে বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ একেবারে পুরোপুরি বন্ধ ঘোষণার পরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সমর্থক পত্রিকা গণকণ্ঠের প্রকাশ রুদ্ধ, সম্পাদক দেশের খ্যাতিমান কবি আল মাহমুদ কারারুদ্ধ এবং ছাপাখানায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর আগেও 'গণকণ্ঠ' পত্রিকাটি বন্ধ করার জন্য সরকার নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। পত্রিকাটিতে সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া হত না। দুয়েকবার ডিক্লারেশনও বাতিল করা হয়েছে। মাঝখানে একবার বন্ধও করে দেওয়া হয়েছিল। সাংবাদিকদের সমবেত দাবির মুখে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ রহিত হয়ে গেল। গণকণ্ঠের পিছু পিছু সরকার বিরোধী ইংরেজি 'সাপ্তাহিক ওয়েভ' এবং 'হলিডে' কিছুদিন পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল। পরে দুটিকেই বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং 'আপত্তিজনক' সংবাদ পরিবেশনের

দায়ে 'হলিডে' সম্পাদক জনাব এনায়েতুল্লাহ খানকে জেলখানায় প্রেরণ করা হয়। জনাব আলী আশরাফ সম্পাদিত বাংলা 'সাপ্তাহিক অভিমত'-এরও একই পরিণতি ঘটে।

বিরোধীদল তো ছিলই না। বিরোধীদলীয় পত্রপত্রিকাগুলোকেও নির্মমভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সরকারসমর্থক পত্রিকাসমূহ এবং সরকারের অন্য দুটো অঙ্গদলের মুখপত্রগুলো প্রতিটি স্বৈরাচারী পদক্ষেপকে একেবারে নির্লজ্জভাবে অভিনন্দিত করে যাচ্ছিল। তথাপি শেখ মুজিবুর রহমান একদলীয় শাসন চালু করার প্রাক্কালে বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা একেবারে কমিয়ে এনে গণমতের বাহনগুলোর কর্তৃত্ব নির্ভরযোগ্য হস্তে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র চারটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হবে ঠিক হলো। দুটি বাংলা এবং দুটি ইংরেজি। এটাও ঠিক হলো যে বাদ বাকি পত্রিকাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। 'ইত্তেফাক' কাগজটিকে পুরোপুরিভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হল। 'ইত্তেফাক' ছাড়া অপর যে বাংলা কাগজটি বেঁচে থাকবে সেটির নাম 'দৈনিক বাংলা'। ইংরেজি কাগজ দুটির নাম 'বাংলাদেশ অবজার্ভার' এবং 'বাংলাদেশ টাইমস'। এ পত্রিকাগুলো একেবারে সরকারি পত্রিকা এবং সাংবাদিকেরা সরকারি কর্মচারীরূপে চিহ্নিত হবেন বলে ঘোষণা দেওয়া হলো।

একসঙ্গে অনেকগুলো পত্রপত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে গোটা দেশের সাংবাদিকবৃন্দ ভয়াবহ সংকটে নিপতিত হন। এই নির্মম অর্থসংকটের দিনে সাংবাদিকেরা সবান্ধবে বেকার হয়ে পড়ার ফলে তাদের সামনে বেঁচে থাকার দ্বিতীয় কোনো পন্থা উন্মুক্ত রইল না। যে চারটি পত্রিকা প্রকাশিত হবার সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে গেছে, সেগুলোতে কোনো রকমে স্থান করে নেয়ার জন্য প্রত্যেক সাংবাদিক মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের কাছ থেকে ভিন্ন আচরণ আশা করাও বোধহয় সম্ভব ছিল না। অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার তাঁদের কর্মসংস্থান করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দান করেছিল এবং সরকার থেকে তাঁরা অল্প-স্বল্প মাইনেও পাচ্ছিলেন। এই অনিশ্চিত শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সাংবাদিকদের মাথায় যে চিন্তাটা প্রথমে এসেছিল তাতে বাহ্যত দাসোচিত আত্মসমর্পণ এবং সুবিধাবাদী চরিত্রের পরিচয় স্পষ্টভাবে ফুঠে উঠলেও বাংলাদেশের পরিস্থিতির বিচারে তাই-ই ছিল একান্ত বাস্তব এবং যুক্তিসঙ্গত। প্রতিটি আলাদা আলাদা পত্রিকার সাংবাদিকেরা ভাবলেন তারা আগেভাগে যদি সরকারি দলে যোগ দেওয়ার আবেদনপত্রে সই দিয়ে বসেন, সরকার অনুকম্পা করে তাঁদের কথাটি বিবেচনা করে দেখবেন। এই ধরনের মনোভাবের বশবর্তী হয়ে বন্ধ হয়ে যাবার বেশ কয়েকদিন আগে 'দৈনিক পূর্বদেশ' পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ সদলবলে বাকশালের কেন্দ্রীয় দফতরে গমন করে সই করা আবেদনপত্রসমূহ জমা দিয়ে এসে মনে করলেন, যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এই ঘটনার পর থেকে অন্যান্য চালু এবং বাতিল পত্রিকার কর্মরত সাংবাদিকদেরও বোধদয় ঘটল। তাঁরা ভাবলেন, পূর্বদেশের সাংবাদিকদের মতো তাঁরাও যেয়ে যদি বাকশালের সদস্যপদের আবেদনপত্রে সই না করেন, তাহলে তাদের চাকুরি হবে না এবং চালু পত্রিকায় কর্মরত থাকলে চাকরিটি টিকবে না। সরকারি পত্রিকায় সরকারিদলের লোকদের কাজ পাবার নৈতিক দাবিই সবচেয়ে বেশি। তারপর থেকে সাংবাদিকেরা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দল বেঁধে নিয়মিত বাকশাল অফিসে ধাওয়া করতে থাকলেন। প্রতিটি পত্রিকার সরকার সমর্থক সাংবাদিকেরা উদ্যোগী হয়ে সহযোগী এবং কলাকুশলীদের টেনে নিয়ে

জাতীয় দলের অফিসে হাজিরা দিতে আরম্ভ করলেন। রাষ্ট্রের তৃতীয় স্তম্ভ বলে কথিত সংবাদপত্রের কারিগরদের একাংশ পেশাগত মর্যাদা, স্বাধীনতাস্পৃহা, সত্য এবং ন্যায়-সাংবাদিকতাবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইত্যাদি মহৎ অনুষঙ্গসমূহ বাদ দিয়ে যে নাটকের অবতারণা করেছিলেন বাংলাদেশের সমাজে অনতিবিলম্বে তার প্রভাব অনুভূত হতে শুরু করে। অবশ্য সাংবাদিক মাত্রেই যে বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য লালায়িত ছিলেন তেমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। চাপের মুখে বাকশাল সদস্যপদের আবেদনপত্রে সই করে একজন সাংবাদিককে আমি সত্যি সত্যি নিজের চোখে কাঁদতে দেখেছি। বেশ ক'জন সাংবাদিক ভয়ভীতি অগ্রাহ্য করে শেষপর্যন্ত সাংবাদিকতার আদর্শ এবং নীতিতে অটল ছিলেন। 'ইত্তেফাক' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আসাফউদ্দৌলা রেজা আবেদনপত্রে সই করেননি। এই অভিযোগে সরকারি ব্যবস্থাপনায় 'ইত্তেফাক' নতুনভাবে প্রকাশ পাওয়ার সময় তাঁর চাকরি চলে যায়।

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সভাপতি ঘোষণা করেছিলেন, আমলা, কর্মরত সাংবাদিক, স্বায়ত্তশাসিত এবং আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীবৃন্দ, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক যে কেউ বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। অবশ্য কাকে সদস্যপদ দেওয়া হবে, কাকে হবে না সেটি সম্পূর্ণ কর্তৃপক্ষের বিবেচনার বিষয়।

যেকেউ ইচ্ছা করলে সরকারি দলে যোগদান করতে পারবে, এটা ছিল সরকারি ঘোষণা। আসলে যোগ না দিয়ে কারো নিস্তার পাবার উপায় ছিল না। ভেতরে ভেতরে সমস্ত সরকারি বেসরকারি দফতর স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পত্রিকার সাংবাদিক, লেখক, কবি, সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে চাচ্ছিলেন, সবাইকে জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার আবেদনপত্রে সই করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যাকে বিপজ্জনক মনে করেন সদস্যপদ দেবেন না, কিন্তু বাংলাদেশে বাস করে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেঁচে-বর্তে থাকতে চাইলে জাতীয় দলের সদস্যপদের আবেদনপত্রে সই করতেই হবে। সর্বত্র বাকশালে যোগ দেওয়ার একটা হিড়িক পড়ে গেল। শেখ মুজিবুর রহমান যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বাকশালের কেন্দ্রীয় দফতর উদ্বোধন করতে এলেন তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গোটা দেশের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, শ্রমিক, কৃষক সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে হাজির থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেদিন ছিল মুষলধারে বৃষ্টি। অবিরাম ধারাস্রোতে প্লাবিত হয়ে ভেজা কাকের মতো সুদীর্ঘ মানুষের সারি কীভাবে রাস্তায় তারা অপেক্ষা করছিলেন, যারা এ দৃশ্য দেখেছেন ভুলবেন না। মহিলাদের গাত্রবস্ত্র ভিজে শরীরের সঙ্গে একশা হয়ে গিয়েছিল। এই সুবিশাল জনারণ্যে আমাদের দেশের নারীকুলকে লজ্জা-শরম জলাঞ্জলি দিয়ে সশংকিত চিত্তে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করতে হচ্ছিল।

নাগরিক জীবনের সর্বত্র একটা আতঙ্কের কৃষ্ণছায়া প্রসারিত হয়ে আসছিল। এ ধরনের চিন্তা, বুদ্ধি এবং সাহসরোধী পরিবেশে যেখানে মানুষের বিচার-বুদ্ধি কাজ করে না, বেঁচে থাকা বলতে শুধু বোঝায় কোনো রকমে পশু অস্তিত্বের সংরক্ষণ– নৈতিক সাহস, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাকার সুসভ্য জীবনের বোধগুলো সর্বপ্রকারের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। সবখানে আতঙ্ক, উদ্বেগ। এ তো গেল একদিকের চিত্র। অন্যদিকে গ্রাম-বাংলার মানুষদের অবস্থা দুর্দশার শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। নিত্য

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে। দেশে অভাব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ক্ষুধার তাড়নায় মা সন্তান বিক্রি করছে। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করছে। বিনা কাফনে লাশ কবরে নামছে। সৎকারবিহীন অবস্থায় লাশ শৃগাল-কুকুরের আহার্য হওয়ার জন্য পথে পথে পড়ে থাকছে। চারদিকে জ্বলন্ত বিভীষিকা, চারদিকে হা-অন্ন, হা-অন্ন রব। এই অন্নহীন বস্ত্রহীন মানুষের দঙ্গল একমুঠো ভাত, এক ফোঁটা ফেনের আশায় ঢাকা শহরে এসে শহরের ফুটপাতে চিৎ হয়ে মরে থাকছে।

একদিকে উদ্ধত উলঙ্গ স্বৈরাচার, অন্যদিকে নির্মম দারিদ্র্য, বুভুক্ষা– এই দুইয়ের মাঝখানে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অতি কষ্টে, অতি সন্তর্পণে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হচ্ছিল। অর্থনৈতিক অন্তর্দাহের আঁচ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতেও লেগেছে। অনেকগুলো পরিবার মাছ-মাংস স্পর্শ করা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে। কোনো কোনো পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যারা দু'বেলা ভাত খেত দু'বেলা আটা খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে। আবার অনেক পরিবারের দু'বেলা আটাও জোটে না।

অথচ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনক্ষমতার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের সুযোগ-সুবিধার অন্ত নেই। তাঁদের হাতে টাকা, ক্ষমতা সবকিছু যেন স্বাভাবিক নিয়মে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। আইন তাঁদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির সহায়, সরকারি আমলারা আজ্ঞাবহ মাত্র, সামাজিক সুনীতি, ন্যায়-অন্যায়, নিয়ম-কানুন কোনো কিছুর পরোয়া না করলেও তাঁদের চলে। উনিশ শ' একাত্তর সালের যুদ্ধের পর থেকে এই শ্রেণীটি বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নৈরাজ্য থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করে ডাঁটো হয়ে মাথা তুলছিল। ঢাকা শহরের প্রশস্ত রাজপথ থেকে শুরু করে সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ীর আড়ত, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, রেডিও-টেলিভিশন, লেখক-সাহিত্যিকদের আড্ডা, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মন্দির এমনকি দূর-দূরান্তের পল্লিগ্রামের মহল্লায় মহল্লায় এই হঠাৎ জন্মানো নব্যনবাবদের সীমাহীন প্রতিপত্তি। এদের অনুমোদন ছাড়া মরণোন্মুখ রোগী এক ফোটা ওষুধ পেত না, শীতার্ত উলঙ্গ অসহায় মানুষের পরনে রিলিফের একখানি বস্ত্র উঠত না, এক সের রেশনের চাল কি আটা বিলি হতে পারত না। বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জনগণের সাহায্যার্থে যে দেশ থেকেই সাহায্য আসুক না কেন এই শ্রেণীটির দুষ্ট ক্ষুধার চাহিদা মিটাতে সবকিছু শেষ হয়ে যেত। এদের অনুমোদন ছাড়া কোন অফিসে একজন সামান্য পিয়নের নিয়োগপত্র পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, যোগ্যতা যা-ই হোক না কেন। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো যেত না, ছাত্রকে স্কুলে। বেবাক দেশের দশদিকে এরা ছড়িয়েছিল। আমলাদের মধ্যে, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে, শিক্ষকদের মধ্যে, গায়ক-শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে, কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে অন্তরীক্ষে অবস্থান করে একজন মাত্র মানুষ সবকিছুর সুতো ধরে রয়েছেন তিনি বাংলাদেশর রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতার তিন বছর সময়ের মধ্যে সার্বিক পরিস্থিতি এ রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বাংলাদেশ এবং শেখ মুজিব এ দু'টো শব্দ পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেখ মুজিব যদি বলতেন আমিই হলাম গিয়ে বাংলাদেশ, তাহলে তিনি এতটুকুও মিথ্যে বলতেন না। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দেশে ফিরে ক্ষমতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে একে একে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর গলা টিপে ধরেছিলেন। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাদের

ঘরবাড়ি ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন, পরিবার-পরিজনদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার চালিয়েছেন। তাদের কাউকে কাউকে গ্রেফতার করে কারাগারের উদরে নিক্ষেপ করেছেন। দেদার নেতা এবং কর্মী হত্যা করেছে রক্ষীবাহিনী। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী দমন করার নামে সরল মানুষদের পাখির মতো গুলি করে, গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। শেখ মুজিব বিরোধী কোনো কিছুর আভাস পাওয়ামাত্র রক্ষীবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ছুটে গেছে। সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, ভেঙে-চুরে তছনছ লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়েছে। পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতা তিরিশ বছর বয়স্ক সিরাজ সিকদারকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান পরিষদকক্ষে উল্লসিত উদ্‌ঘোষণায় ফেটে পড়ে বলেছিলেন, এখন কোথায় সিরাজ সিকদার? গ্রেফতার, নির্যাতন এসব শেখ মুজিব প্রশাসনের একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি মেজর জলিল, সম্পাদক আ স ম আবদুর রবসহ অসংখ্য নেতা এবং কর্মী, জাতীয় লীগের অলি আহাদসহ অনেককে তিনি কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন। বিপ্লবী মতাদর্শী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের কথা বাদ দিয়েও তিনি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিকবোধে আস্থাশীল রাজনৈতিক দলগুলোর উপস্থিতিও বরদাশত করতে পারতেন না।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফেরার পর তিনি দেশের বিপর্যস্ত অবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য সময়ে অসময়ে হুঙ্কার দেওয়া ছাড়া কোন বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে তাঁর বিরোধীদের সমূলে বিনাশ করার এক সর্বনেশে খেলায় মেতে উঠেছেন। এমনকি সে বিরোধিতা নিজের দলের লোক থেকে এলেও এবং একান্ত ন্যায়সঙ্গত হলেও তিনি সহ্য করেননি। দৃশ্যত বিরোধীদলবিহীন খোলা ময়দানের তিন তিনটি দলের সর্বময় কর্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিশ্চিন্তবোধ করতে পারছিলেন না। তিনটি দলকে এক করে একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রাখার জন্য রাতারাতি প্রধানমন্ত্রী থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে বসলেন। সংবিধান বাতিল ঘোষণা করলেন। জাতীয় পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে বয়-বেয়ারার মতো আচরণ করলেন। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সময়ের পরিসরে নিজেকে বাঙালি জাতির সংগ্রামী প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে নিতে পেরেছিলেন এবং বাঙালি জাতির মুক্তি-সংগ্রামের নায়করূপে সারাবিশ্বে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তিন বছর যেতে না যেতেই আওয়ামী লীগ দলটির অস্তিত্ব বিলীন করে দিলেন। উনিশ শ' উনসত্তর সালের পর থেকে এ পর্যন্ত তাকে ভাগ্যদেবতা অযাচিতভাবে কৃপা করে আসছে। উনিশ শ' উনসত্তর সালে আইয়ুব বিরোধী অভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উঠিয়ে নিতে হয়। কারাগার থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন বাঙালি জাতির জনক এবং অদ্বিতীয় নেতা হিসেবে। তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা ভালোবাসা তাঁর মস্তকে হিমালয় পর্বতের চূড়োর মতো উত্তুঙ্গ মহিমায় বিভূষিত করেছে। গোটা জাতি তার পেছনে। এর আগে কোনো বাঙালি নায়কের পেছনে মানুষ অকৃত্রিম আস্থা এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা এমন করে বিলিয়ে দেয়নি। তাঁর আগেও এ রকমটি ঘটেছে বারবার। যে কোনো বড় ধরনের রাজনৈতিক বিপ্লব, উপবিপ্লব শুরু হবার আগে শেখ মুজিব কোনো জাদুমন্ত্র বলে কারাগারে ঢুকে পড়েছেন। ঘটনার নিয়মে ঘটনাটি ঘটে যাবার পর বিজয়ী বীরের মতো শেখ সাহেব দৃপ্ত পদক্ষেপে প্রকাশ্য সূর্যালোকে বেরিয়ে এসে নেতার আসনটিতে বিনাদ্বিধায় বসে পড়েছেন। শেখ মুজিবকেই

ঘটনাটির নায়ক বলে লোকে বিনাদ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। তার নিজের দলের মধ্যেও এ নিয়ে বোধকরি কোন প্রশ্ন কখনো উঠেনি। উনিশ শ' একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ তারিখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁকে আপন বাসভবন থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং উনিশ শ' বাহাত্তর সালের দশই জানুয়ারি তারিখে বাংলাদেশে এসে এমন একটি আসন পেয়ে গেলেন, বাঙালি জাতির ইতিহাসে কোনো মানুষ সে রকম মর্যাদা, ভালোবাসা এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার আসনে উপবেশন করতে পারেনি। তাঁর তেজ, বীর্য এবং বাক্যের মন্ত্রশক্তিতে বিস্ময়াবিষ্ট দেশবাসী বহুকাল আগেই তাঁকে বঙ্গবন্ধু এবং বাঙালি জাতির পিতা ইত্যাদি দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার আসনে তিনি রাজচক্রবর্তী হিসেবে বহুকাল আগে থেকে আসীন ছিলেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে বাঙালি হৃদয়ের সিংহাসনের রাজা বাস্তবের সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি তার দুঃশাসনে যতই বিপর্যয়ের শেষ সীমানায় নেমে আসুক-না কেন, বন্যা, মহামারী, চোরাচালানী, ছিনতাইকারী, টাউট, স্বজনতোষণকারীরা বাংলাদেশে যে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশারই সৃষ্টি করুক-না কেন তাঁর গোচরেই সবকিছু ঘটে আসছিল। যৌবনবতী মেয়ে মানুষ তার প্রেমিককে যে রকম বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসে, বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে সেই অকৃত্রিম অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত বিশ্বাস এবং ভালোবাসা দিয়েছিল। তিনি এলেন, প্রধানমন্ত্রী হলেন। নতুন সংবিধান রচনা করলেন, নির্বাচন ডাকলেন এবং নির্বাচিত হওয়ার পর বছর ঘুরে না আসতেই প্রধানমন্ত্রীর পদ তাঁর পছন্দ হলো না। তাঁরই নির্দেশে রচিত সংবিধানের বিধানগুলো আঁটোসাটো জামার মতো ক্রমাগত তাঁর বিরক্তিই উৎপাদন করছিল। তাই তিনি নিজের হাতে গড়া অনুশাসনের নিগড় ছিন্ন করে ফেললেন। সংবিধান বাতিল ঘোষণা করলেন। যে সংসদীয় গণতন্ত্রের বাঁধানো সড়ক বেয়ে আকাশস্পর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষার নির্দেশে একটি সবল, স্বাস্থ্য এবং দরাজ কণ্ঠস্বর মাত্র সম্বল করে এতদূর ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছেন সেই সংসদীয় গণতন্ত্র শেখ মুজিবের হাতেই জখম হয়ে হয়ে লাশটি তাঁরই হাতে কবরস্থ হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। অবিলম্বে তিনি কর্তব্যকর্ম সমাপন করলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের লাশটি কবর দিলেন। একদলীয় সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নতুন পরিচয়ে তিনি নিজেকে পরিচিত করলেন। শেখ মুজিব যা করেন সব নিখুঁত। ইতিহাসের সঙ্গোপন আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রতি কর্মে অভিব্যক্তি লাভ করে। এ হচ্ছে তাঁর পরিষদের ধারণা। কথাটি তিনিও আপন দল এবং বন্ধুদলের মানুষদের কাছ থেকে এতবেশি শুনেছেন যে নিজেও প্রায় অতিমানব বলে বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন। তিনিও মনে করতে আরম্ভ করলেন, যা কিছু হও বলবেন, অমনি হয়ে যাবে। এ যেন শেক্সপিয়ারের নাটকের নায়ক জুলিয়াস সিজার। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডল বারেবারে শুভ-সংকেত বয়ে নিয়ে আসে। শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রে সিজারের বীরত্ব এবং গুণপনা বর্তমান ছিল কিনা বিচার করবেন আগামীদিনের ঐতিহাসিক। তবে একথা সত্য, পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ বাংলাদেশে তিনি যা পেয়োছেন, যা আদায় করেছেন, অনুরূপ ভাগ্য কোনো রোমান সিজারের কোনোদিন হয়নি।

সব শক্তিদর্পী মানুষের যেমন হয়ে থাকে তেমনি শেখ মুজিবুর রহমানের মনে কিছু নিরীহ বস্তু না পাওয়ার ক্ষোভ বারবার পীড়ন করেছে। শক্তিদর্পী মানুষেরাও চায় মানুষ তাদের ভালোবাসুক বন্ধুর মতো, আবার যমের মতো ভয় করুক। আকাশের দেবতাকে

যে রকম ভীতিমিশ্রিত ভালোবাসা দিয়ে বিচার করে, শেখ মুজিবুর রহমানের মনেও অবিকল সে রকম একটি বাসনার উদয় হয়েছিল।

তিনি বিলক্ষণ জানতেন, পাণ্ডিত্যাভিমানী শিক্ষিত সমাজের মানুষ তাঁকে অন্তর থেকে অবজ্ঞা করে। এই শ্রেণীটির চরিত্রের খাঁজগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন তিনি। উনিশ শ' ঊনসত্তর সালের পূর্ব পর্যন্ত এই শ্রেণীর লোকেরা তাঁকে বাগড়ম্বর সর্বস্ব অমার্জিত হামবাগ ছাড়া কিছু মনে করতেন না, তা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। বিভিন্ন বিবৃতি, বক্তৃতা, ঘরোয়া বৈঠক এবং আলাপ-আলোচনায় এঁদের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঘৃণা এবং বিরক্তি তিনি কুণ্ঠাহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন। তা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষিত আমলা, লেখক-সাহিত্যিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সম্ভ্রান্ত সমাজের একাংশ তাঁকে বঙ্গবন্ধু বলে যে সম্বোধন কেন করতেন শেখ মুজিব তা বুঝতেন এবং তা তার ক্ষমতার স্বাভাবিক প্রাপ্য হিসেবেই গ্রহণ করতেন। তাছাড়া বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী বলে কথিত শ্রেণীটির হীনমন্যতাবোধ এবং চারিত্রিক দাস্যতা অনেকটা প্রবাদের শামিল। যে-কোনো নতুন শাসক এলেই সকলে মিলে তার গুণপনা ব্যাখ্যা করা এখানকার বহুদিনের একটি প্রচলিত প্রথা। কচিত কদাচিত ব্যতিক্রমী কণ্ঠ শোনা যায়। এর কারণ নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সমাজ শরীরের মধ্যে সংগুপ্ত রয়েছে।

শক্তিদর্পী মানুষেরাও যে শেষপর্যন্ত একেকটা দিকে কাঙাল থেকে যান শেখ মুজিবের মধ্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। যে বস্তুটি সহজভাবে পাওয়া যায় না তাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য এঁদের অনেক সময় নিয়মমত খাওয়া-শোয়ার ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। তার আসন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমণের ঘটনাটিকেও এ পর্যায়ে ফেলা যায়। যদিও তিনি দেশের একচ্ছত্র অধিপতি তথাপি তাঁর অন্তরে একটা মর্মান্তিক ক্ষোভ সব সময়ে প্রবাহমান ছিল। দেশের সকল জ্ঞানী এবং গুণী পণ্ডিত সমাজে তিনি শ্রদ্ধার আসন লাভ করতে পারেননি। মোসাহেবেরা তার কানের কাছে অনেক উচ্চকণ্ঠ চিৎকার করেছে, বাচাল ও অর্বাচীনেরা অনেক কথা লিখেছে, কিন্তু পণ্ডিতেরা বারবার নিশ্চুপ থেকেছেন। এই অর্থবোধক নিশ্চুপতা তার বুকে শেলের মতো বেজেছে। সেজন্যই তার অত ঘটা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা। যে লোকেরা সহজভাবে তাঁকে স্বীকার করে নেয়নি, তাদের তাঁর মহিমা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন। নইলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে শেখ মুজিব সকাল-সন্ধে ভাঙা কাপে চা খেয়েছেন, সেখানে আসার জন্য সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? বিশেষত বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠেও এক-তৃতীয়াংশ ছাত্রের পয়সার অভাবে সকালবেলার টিফিন জোটে না।

তাছাড়া আরেকটি কারণে বিশ্ববিদ্যালয় আসা তার পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। যতই তিনি জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন ততই তার চরিত্রের স্বৈরাচারী লক্ষণসমূহ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। ক্ষমতার নির্মম একাকীত্ব তাঁকে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে গণতন্ত্রের ধারাস্রোতে বাহিত হয়ে তিনি এসেছিলেন, তাতে তার পুনরায় অবগাহন করার কোনো উপায় নেই। কেননা এই তিন বছরে শরীর অনেক ভারি হয়ে গিয়েছে এবং সাঁতারও প্রায় ভুলে গিয়েছেন। যদি তাঁকে বেঁচে থাকতে হয় একজন মানুষ হিসেবেই বেঁচে থাকতে হবে– জনতা তার শাসন সাংঘাতিক রকম অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। সংবিধান, জাতীয় পরিষদ, পরিষদের সদস্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি

সবকিছু দাবার বোর্ডের মতো এই লক্ষ্যেই চালনা করে আসছিলেন। তবু তিনি বলতেন, তিনি জনগণকে ভালোবাসেন এটা তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। আর জনগণ তাঁকে দেখতে ভিড় করতেন, তাঁর বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, তাঁর কথায় হাত উঠাতেন– এটাও জনগণের দীর্ঘদিনের অভ্যাস। বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘদিন থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা শুনে এবং কথায় কথায় হাত উঠিয়ে অভ্যস্ত। আসলে জনগণ অনেকদিন থেকেই তাঁর ওপর ভয়ানকরকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। কারণ বাংলাদেশের যে দুর্দশা বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি ধরে নিয়েও বলা যায় তার আশি ভাগই মনুষের সৃষ্টি এবং তার জন্য মুখ্যত দায়ী তার পরিচালিত তৎকালীন সরকার। গ্রামের সরল মানুষকে, অনাহারক্লিষ্টা বিধবাকে আমি নিজের কানে তাদের তাবৎ অভাব অভিযোগের জন্য দায়ী করে অভিসম্পাতের বাণী উচ্চারণ করতে শুনেছি। তিনি যে ধীরে ধীরে স্বখাত সলিলে ডুবে যাচ্ছেন খুবই টের পাচ্ছিলেন। জনগণের রুদ্ররোষ কি বস্তু উপলব্ধি করতে সময় লাগেনি। এই জনগণই আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করিয়ে শেখ মুজিবকে আইয়ুব খানের কারাগার থেকে মুক্তমানব হিসেবে প্রসন্ন দিবালোকে বের করে এনেছে। উনিশ শ' একাত্তর সালের মার্চ মাসের দিনগুলোতে জনগণের সঙ্গবদ্ধ শক্তির গভীরতা, তীব্রতা কতদূর হতে পারে, বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মত রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে কি অঘটন ঘটিয়ে তুলতে পারে সে জ্ঞান তিনি হাতে কলমেই লাভ করেছেন। তাই তিনি ক্রমে জনগণের ক্ষোভ আক্রোশ বন্ধ করার পন্থা হিসেবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুখে বালির বাঁধ রচনা করে যাচ্ছিলেন। তিনি তিনদল ভেঙ্গে একদল করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী থেকে সরাসরি একনায়ক সেজে বসেছেন।

তিনদল ভেঙে একদল করার পর তাঁর হাতে প্রভূত ক্ষমতা সঞ্চিত হয়েছিলে বটে, কিন্তু তিনি রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ পরঠিকানার মানুষ হয়ে পড়েছিলেন। সম্মিলিতভাবে তিনি তিনদলেরই কর্তা, কিন্তু আসলে কোনো দলের কেউ নন। এই ঠিকানাহীনতা তাঁকে একনায়কত্বের দিকে আরো জোরে ঠেলে দিচ্ছিল। জনগণমন অধিনায়ক নেতার পক্ষে একনায়ক পরিচয়ের পথে রাজার পরিচয় আরো প্রীতিপদ এবং সম্মানের। বিশেষত তিনি দেশ এবং বিদেশের সামনে প্রমাণ যখন করতে পেরেছেন, তিনি চাননি তবু জনগণ তাঁকে রাজার আসনে বসিয়েছে। এই রাজকীয় পরিচয়টা দেশের মানুষের মনে ভালোভাবে দাগ কাটে মত বসিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে যাচ্ছেন। একদলীয় শাসন কায়েম করেছেন, জাঁকালো রাষ্ট্রপতি হয়ে বসেছেন, উপবেশনের সুবিধার জন্য দিনাজপুরের মহারাজার সিংহাসনটা আনিয়ে নিয়েছেন। ব্রিটিশ আমলের ঘুণে ধরা প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেছেন। পূর্বের জেলা এবং বিভাগগুলোর সীমানা চিহ্ন মুছে দিয়ে গোটা দেশকে একষট্টিটি নতুন প্রশাসনিক এলাকা তথা জেলায় বিভক্ত করে, প্রতি জেলায় একজন করে গভর্নরও মনোনয়ন দান করেছেন। গভর্নররা যাতে সর্বেসর্বা হয়ে বসতে না পারে সেজন্য বৈরী গ্রুপ থেকে একজন বাকশাল সাধারণ সম্পাদককে মনোনয়ন দান করা হয়েছে। শাসনব্যবস্থাকে নতুনভাবে ঢালাই করার নামে আইয়ুবের মত শেখ মুজিবও তাঁর সিংহাসনে থাকার পথটি পাকাপোক্ত করেছেন। আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রের মৌলিক বস্তুটির সঙ্গে জনগণের চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছে। মুজিবের মৌলিক বস্তুটিরও প্রয়োজনীয়তা কতদূর ছিল আগামীদিনের প্রশাসনবিদরা বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন। আমার বক্তব্য হলো, আইয়ুব সরকার এবং মুজিব সরকার

নিজেদের ক্ষমতায় অটুট থাকবার জন্য উদ্ভাবিত পথটিকেই শাসনতান্ত্রিক বিপ্লব বলে আখ্যা দিয়েছেন। জেলাসমূহের গভর্নর এবং বাকশালের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করার ব্যাপারেও শেখ সাহেব রাজকীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের শাসক নেতৃশ্রেণীতে যত ধরনের চাপ প্রয়োগক্ষম গ্রুপ রয়েছে, সব গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি গ্রহণ করেছেন– রাজনৈতিক দল ও ন্যাপ থেকে, আমলাদের থেকে, আইনজীবী শ্রেণী থেকে, সেনাবাহিনী থেকে আনুপাতিকহারে গভর্নর ও সম্পাদক নিয়োগ করার পেছনের কারণ ছিল সার্বিকভাবে গোটা শাসক নেতৃশ্রেণীটার কাছে তার শাসনটা গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

ব্যাবহারিক দিক দিয়েও তিনি রাজার মতো আচরণ করে যাচ্ছিলেন। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের কেউ তাঁর সামনে টু-শব্দটি উচ্চারণ করতে সাহস পেতেন না। তাঁকে বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারে মতো কেউ ছিলেন না। তিনি যদি কখনো মন্ত্রিসভার সদস্যদের ডাকার প্রয়োজন মনে করতেন, ডাকতেন। এ কারণে যে তাঁরা যেন সকলে স্বীকার করে নেন তাঁর মতটিই চূড়ান্ত। এ ছাড়া তাঁর নিজস্ব পরিবারটিকে কেন্দ্র করে একটি রাজপরিবারের ছবি ক্রমে লক্ষ্যগোচর হয়ে উঠেছিল। তাঁর ছেলে, তাঁর ভাগ্নে, ভগ্নিপতি, ভাই সকলে সত্যি সত্যি দুধের সরের মতো বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর পুরোভাগে ভেসে উঠছিলেন। বাকি ছিল রাজমুকুটটা মস্তকে ধারণ করা এবং রাজউত্তরীয়খানি অঙ্গে চড়িয়ে দেওয়া। এই জন্যই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নেপোলিয়নের মতো বিশ্ববিখ্যাত বীরযোদ্ধার হাতে প্রভূত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাজমুকুটটি নিজে নিজে পরে বসেননি। রোম থেকে পোপকে আসতে হয়েছিল। এই সমস্ত শক্তিধর মানুষেরা শক্তি দিয়ে সব কাজ করে আনলেও শেষের কাজটি করাবার জন্য এমন কাউকে খোঁজ করে আনেন, যাঁর প্রতি মানবসাধারণের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা রয়েছে এবং যা ঐতিহ্যসম্মত।

নেপোলিয়নের যুগ গেছে, পোপের যুগ গেছে। কিন্তু মানুষের অন্তরের আগুন সে রকম আছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্ধত হয়ে এখনো আকাশ ফুঁড়ে ফেলতে চায়। তাই শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন। একক হাতে বেবাক ক্ষমতা তুলে নেয়ার সপক্ষে সারস্বত সমাজের রায় গ্রহণ করবেন। তাছাড়া আরেকটি গোপন অভিলাষ তার মনের কোণে থাকার বিচিত্র কী। উচ্চশিক্ষাভিমানী পণ্ডিতম্মন্য লোকেরা যাঁদের তিনি মনে মনে অপরিসীম তাচ্ছিল্য করেন, তাঁরা সকলে একযোগে এসে তার বিরাটত্ব ও মহত্বের সামনে দণ্ডবত হবেন। একজন শিক্ষকও যাতে অনুপস্থিত না থাকতে পারেন এবং একজনও যাতে অর্থহীন নিরীহ একগুঁয়েমিকে আশ্রয় করে কাগুজে বীর হিসেবে পরিচিত না হতে পারেন আগেভাগে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সরকারসমর্থক ছাত্রদের যাবতীয় দুর্নীতির আখড়াতে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসনামলে সামরিক সরকারের আরোপিত হাজারো বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে বাঙালি মনীষা পাথরের ভেতর দিয়ে পথ কেটে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হচ্ছিল। কী সংস্কৃতি চর্চায়, কী রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে, কী মননশীলতার লাবণ্য সঞ্চারে পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে ভূমিকা পালন করেছে তা বাঙালির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলাভাষা আন্দোলনের প্রথম শহীদ, বাংলার জাতীয় জাগরণের প্রথম আন্দোলন, উনিশ শ' উনসত্তরের আইয়ুব বিরোধী বিক্ষোভ, একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ এ সকল জাতীয় জীবনে অপরিসীম প্রভাববিস্তারী ঘটনাগুলো ঘটিয়ে তোলার উদ্যোগে পূর্বে

নেতৃত্বদান করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহের রাজনীতিতে ছাত্ররা অনিবার্যভাবে কোনো ভূমিকা পালন করে থাকে শেখ মুজিব তা জানতেন। তিনি নিজেও এ রকম ছাত্র আন্দোলনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাই তাঁকে শুরু থেকে ছাত্রদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়টি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ভাবতে হয়েছে।

তিনি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করার কিছুদিন পরেই, যে ছাত্রপ্রতিষ্ঠানটির পেশল সমর্থন তাঁর একমাত্র রাজনৈতিক মূলধন ছিল সেই ছাত্রলীগকে চোখের সামনে দু'টুকরো হয়ে যেতে দেখেছেন। তাদের তাঁর ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়া ও ছাত্রলীগের একাংশের সক্রিয় সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে অপর একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখে নিশ্চয়ই হতবাক হয়েছেন তিনি। উনিশ শ' তিয়াত্তর সালের পয়লা জানুয়ারির ঘটনা। ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হামলার প্রতিবাদ করে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যকেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। ফলে একজন ছাত্র ঘটনাস্থলে নিহত হয়, কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়। তার প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন সমস্ত ঢাকা শহরে প্রতিবাদ সভা এবং মিছিলের আয়োজন করে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যাকারী আখ্যায় ভূষিত করে। সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চালিত 'ন্যাপ' এবং 'বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি'র সমর্থক ছাত্র ইউনিয়নের দখলে ছিল। গুলিবর্ষণের প্রতিবাদস্বরূপ বিক্ষুব্ধ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা ছাত্রসংসদের খাতার যে পৃষ্ঠাটিতে শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের আজীবন সদস্য হিসেবে স্বাক্ষর করেছিলেন সেই পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে ফেলে। অথচ এই ছাত্র ইউনিয়নই পদে পদে শেখ মুজিবুর রহমানকে তাদের মূল রাজনৈতিক দল দু'টোর মতো অন্ধভাবে সমর্থন দান করে যাচ্ছিল। নিজের সমর্থক ছাত্ররা যখন এ অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়ে তুলতে পারে, বিরোধীদলীয় ছাত্ররা যে প্রতিবাদে কতদূর মারমুখী হতে পারে, একটি সম্যক ধারণা তাঁর হয়েছিল। তাই শক্তহাতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর ছাত্রসমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

উনিশ শ' বাহাত্তর সালের পর থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে চার পাঁচজন ছাত্রই স্টেনগান হাতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ চালাত। উপাচার্যবৃন্দ এই অস্ত্রধারী ছাত্রদের কথাতে উঠতেন, বসতেন। স্বাধীনতার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মুক্তির দুর্গ হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেবাক পরিবেশ কলুষিত করে তোলা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন চিন্তা, কল্পনা, নিরপেক্ষ গবেষণার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সরকার সমর্থক ছাত্ররা প্রকাশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করত। দরকারবোধে তারা এগুলো ব্যবহার করতে কোনো রকম কুণ্ঠা বা সংকোচবোধ করত না। বর্তমানে ঢাকা জেলার জেলা জজের কোর্টে একটি লোমহর্ষক হত্যামামলার বিচার চলছে। সরকার সমর্থক দু'দল ছাত্রের মধ্যে মতামতের গরমিল হওয়ায় অবাধে রাতের বেলা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে সাতজন সতীর্থকে হত্যা করা হয়েছে। আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে হাজী মুহম্মদ মুহসীন ছাত্রাবাসের টিভিকক্ষের সামনে এই শোকাবহ ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারসমর্থক ছাত্ররাই যখন মতামতের গরমিলের জন্য স্বদলীয় ছাত্রের হাতে এভাবে বেঘোরে প্রাণ হারাতে পারে, সাধারণ ছাত্র এবং শিক্ষকদের অবস্থা কী হতে পারে

সহজেই অনুমান করা যায়। সরকারসমর্থক ছাত্রের মতো শিক্ষকদেরও অবশ্য বিশেষ অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। এঁদের অনেকে পূর্ব থেকে ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর সেবা করে আসছেন। সুতরাং এই নতুন শাসনামলেও তাঁরা বস্তু-সম্পদের দিক দিয়ে কিঞ্চিত লাভবান হওয়ার সাধনা করে যাচ্ছিলেন এবং নানাভাবে সরকারসমর্থক ছাত্রদের সক্রিয় সহায়তা দান করে যাচ্ছিলেন। আর সরকার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর কোনো মতামত এবং প্রতিষ্ঠান যাতে মাথা তুলতে না পারে সেজন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করে আসছিল। বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি মতামতের লালনক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে এমন একটা অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হলো, যার সঙ্গে অধিকাংশ শিক্ষক এবং ছাত্র মিলিয়ে নিতে পারলেন না। শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা এবং রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতিকে মুজিববাদ আখ্যা দিয়ে, তার প্রচার, প্রসার এবং বাস্তবায়নের জন্য সরকারসমর্থক ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এমন একটা সুসংগঠিত অভিযান পরিচালনা করলেন, কোনো স্বাধীনচেতা, ন্যায়বান ছাত্র কিংবা শিক্ষক তার সঙ্গে অন্তরের সামান্য সংযোগও অনুভব করতে পারলেন না। এই না পারার কারণেই সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ শিক্ষকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁরা অপরিসীম মানসিক উৎকণ্ঠা নিয়ে শঙ্কা, ত্রাস এবং ভীতির মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হলেন। অতি শিগ্‌গির গোটা দেশের তাবত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই মুজিববাদী ছাত্রদের এবং তাদের পেছনে বুদ্ধি-পরামর্শ যোগানো শিক্ষকদের প্রভাব ঘূর্ণিহাওয়ার মতো অপ্রতিরোধ্য বেগে ছড়িয়ে পড়ল।

যে সমস্ত শিক্ষক চরিত্র এবং বিদ্যাবত্তার জন্য ছাত্রদের মধ্যে শ্রদ্ধা এবং সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন মুশকিল হলো তাঁদেরই। তাঁরা তাঁদের পরিবারবর্গ নিতান্ত ভয়ে ভয়েই দিবস রজনী পার করতেন। যে কোনো সময়, যে কোনো বিবাদ এসে ঘাড়ে আশ্রয় করতে পারে। সে সময়ে আমি নিজে বিশ্ববিদ্যালয় কম্পাউন্ডে বাস করেছি। এই সন্ত্রাসজনক পরিস্থিতির ভয়াবহতা কিছুকিছু অনুভব করেছি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার দু'বছর পরেও দেখেছি শিক্ষকরা ফ্ল্যাটে বাইরের দিক থেকে তালা লাগিয়ে রাখতেন। কোনো অচেনা লোক খোঁজ-খবর করতে গেলে বাড়ির লোকেরা জবাব দিতেন, তিনি বাসায় নেই। যে মুষ্টিমেয় ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছু শক্তহাতে নিয়ন্ত্রণ করত সংখ্যায় ছিল তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনরত মোট ছাত্রছাত্রীর এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। সরকারি পুলিশ সব সময়ে তাদের সাহায্যে মোতায়েন থাকত। ছাত্রাবাসের ভোজনকক্ষে খাওয়ার জন্য তাদের কোনো অর্থ দিতে হতো না। অধিকন্তু মন্বন্তরের সময় ছাত্রাবাসের প্রভোস্ট এবং হাউজ টিউটরের সঙ্গে মিলেমিশে রেশনে পাওয়া চাল, ডাল কালোবাজারে বেচে দিয়ে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করার সুযোগ তারা পেত। তাছাড়া সরকারদলীয় লোকদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি-বাকরি বণ্টন করার সুযোগগুলো তো ছিলই।

বিশ্ববিদ্যারয় কিংবা কলেজের ছাত্রসংসদসমূহের নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করত, ভীতি এবং ত্রাস সৃষ্টি করে ছাত্র সাধারণের কাছ থেকে ভোট আদায়ের চেষ্টা করত। তারপরেও যখন দেখা যেত নির্বাচনে তারা শতকরা বিশটি ভোটও লাভ করতে পারেনি এবং পরাজয় অবধারিত, রাতের বেলা আলো নিভিয়ে ভোটের বাক্সগুলো লুট করে নিয়ে যেত। তাদের অনুমোদন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রভর্তি হতে পারত না, ছাত্রাবাসসমূহে থাকবার জায়গা পেত না। শিক্ষকদের নিয়োগ বরখাস্তও অনেকটা তাদের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভরশীল ছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান তার একদলীয় শাসন চালু করে দেশে যে নতুন শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে ক্ষমতার অংশভাগী করে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির একশো পনেরোজন সদস্যের মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যত্রয় এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালিকা ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষাকে স্থান দিয়েছিলেন। জাতীয়দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের স্থান দিয়ে সরাসরি বিধিবদ্ধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন। অর্থাৎ এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ঘোরপ্যাঁচ ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষভাবে সরকারি শাসন বলবৎ করা হবে। পূর্বেকার সরকারসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব করতেন বটে, কিন্তু সে পন্থাটি ছিল গোপন এবং অদৃশ্য। বাইরের দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকার প্রশাসন কিংবা পরিচালনায় প্রকাশ্যত কোনো হস্তক্ষেপ করেন না। শেখ মুজিবই প্রথম যিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষমতার অংশীদার করলেন।

প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আলাদা অস্তিত্ব, আলাদা আইন-কানুন এগুলোকে তিনি ক্রমে ক্রমে ভেঙে নতুন করে সাজিয়ে, তার মধ্যে সরকারি বিরোধিতার বীজকে উপড়ে ফেলতে পারবেন। দ্বিতীয়ত যে আধুনিক শিক্ষাভিমানী পণ্ডিতসমাজ তাঁকে অবজ্ঞা করেন, তাঁদের অন্তরলালিত অহংকার চূর্ণ করতে পারবেন। নতুন পদ্ধতিটা এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদেরও তাঁর আওতার বাইরে থাকার উপায় নেই এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সিংহাসনের পেছনে না দাঁড়িয়ে তাদের গত্যন্তর থাকবে না। তৃতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজের হাতের মুঠোতে পুরে তিনি দেশের মানুষ এবং বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করতে পারবেন যে তিনি মন্দ অর্থে একনায়ক নন। দেশের কৃষকসমাজ থেকে শুরু করে সারস্বত সমাজ পর্যন্ত তাঁকে এত অনুরোধ উপরোধ করেছেন যে, বাধ্য হয়েই তিনি দেশের কল্যাণ চান এবং বাংলার মানুষকে ভালোবাসেন। সমস্ত দেশের মানুষের সমবেত প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাঁর দিক থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ভুল চিন্তা করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ উপাচার্য পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেই বসলেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এমন একজন বলিষ্ঠ নেতা হাজার বছরে জন্মগ্রহণ করেননি। শেখ মুজিবুর রহমান যে বলিষ্ঠ নেতা সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করার জন্য ওই সময়কে বেছে নিয়েছিলেন কেন তা অনেকের কাছেই খুব তাৎপর্যবহ মনে হয়েছে। বাস্তবেও তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়ে কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় দলে যোগদানের আবেদনপত্রসহ তাদের নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে আসলেন। সেই ছবি কাগজে ফলাও করে প্রকাশিত হলো।

এই উপাচার্য ভদ্রলোককে দেশের মানুষ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে জানতেন। অতটুকু দাসত্ব তার কাছ থেকে কেউ প্রত্যাশা করেননি। তার এ ধরনের কার্যকলাপের দু' রকম প্রতিক্রিয়া হলো। তার মতো লোকের পক্ষে তথাকথিত জাতীয়দলের এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন তোষামোদ দেখে জ্ঞানীগুণী সমাজের একাংশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন, আরেক অংশের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে এল। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তার এ দহরম-মহরম

অন্যান্য উপাচার্য এবং সরকার সমর্থক শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত নেতৃশ্রেণীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তিনি যদি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে অতবেশি মাখামাখি করার সুযোগ আদায় করে ফেলেন, অন্যান্যদের সুযোগ-সুবিধে মাঠে মারা যাবার সম্ভাবনা। তাই অন্যান্যরাও উঠে পড়ে লাগলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক আবুল ফজল ছাড়া আর সকল উপাচার্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং শিক্ষকদের জাতীয়দলে যোগ দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে সরকার সমর্থক ছাত্রদল উপাচার্যদের সহায়তা দিয়ে আসছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয়দলে যোগদানের জন্য যে ভয়ভীতি এবং নানামুখী চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা আমি খুব কাছে থেকে নিজের চোখে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। অধ্যক্ষরা বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে আবেদনপত্র বিলি করেছিলেন এবং সরকারি প্ররোচনায় তরুণতর শিক্ষকদের সই করতে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য করেছিলেন। অনেক শিক্ষক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সই করতে চাননি। কিন্তু হুমকি, ভীতি এবং চাপের মুখে তাঁদের বেশিরভাগ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। যে সকল শিক্ষক সই করেননি, তাঁদের নাম বাকশাল কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সরকার সমর্থক ছাত্রদল এই বিদ্রোহী শিক্ষকদের দেশদ্রোহী হিসেবে শিগ্‌গির ধরে নেয়া হবে বলে হুমকি দিয়ে গুজব ছড়াতে শুরু করল। এই জোর-জুলুম, ভয়-ভীতি, সন্ত্রাসের মধ্যে চৌদ্দ আগস্ট সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল মাত্র পনেরোজন শিক্ষক জাতীয়দলে সদস্যপদের আবেদন করে সই করেননি। বাকি সকল শিক্ষকের সই সম্বলিত আবেদনপত্র সংগৃহীত হয়ে গেছে। আগামীকাল যখন রাষ্ট্রপতি আসবেন, তখন প্রায় হাজারখানেক শিক্ষকের আবেদনপত্র তাঁর সকাশে দাখিল করা হবে। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি একনিষ্ঠ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি চাইবেন এবং শিক্ষকরাও হাত তুলে তিনি যা বলবেন তার প্রতি সমর্থন জানাতে বাধ্য হবেন। এই পর্যন্ত সকলে তাই করছে।

বাংলাদেশের আগ্নেয়আত্মার জ্বালামুখ বলে কথিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিন্তা, ভাবনা, বুদ্ধি এবং মননশীলতার নেতৃত্বদানকারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোন শক্তিধর মানুষকে যা দেয়নি শেখ মুজিবুর রহমানকে সেই অকুণ্ঠ আনুগত্য স্বেচ্ছায় প্রদান করবে। গোটা দেশের মানুষ অবাক বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখার জন্য বেদনাহত চিত্তে প্রতীক্ষা করছিল। রাষ্ট্রপতির বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষ্যে জাতীয় দৈনিকগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছিল। রেডিও ঘনঘন সংবাদ দিচ্ছিল। টেলিভিশনে উপাচার্যের বিশেষ সাক্ষাৎকার দেখানো হচ্ছিল। এ উপলক্ষ্যে কী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়কে কীভাবে সাজানো গোছানো হয়েছে আনুপূর্বিক সমস্ত বিবরণ রেডিও, টেলিভিশন প্রচার করছিল। এই দিনটিকে ভাবগম্ভীর, পবিত্র এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণরূপে দেশের মানুষের দৃষ্টিতে চিত্রিত করার জন্য পূর্ণপ্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছিল। সরকারি প্রচারণার ধরনটা এমন ছিল, কোনো রকমের বাধ্যবাধকতা ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে এই ঐতিহাসিক সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে। পূর্বে একনায়করা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে যেরকম ছাত্রদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, আক্রোশ কোনো না কোনো পথে ফেটে পড়ে, খুন, জখম, রক্তারক্তি কাণ্ড অবধারিত ঘটে যেত এবার সে সবের কোনো লক্ষণ নেই। তিনি তো আর ঔপনিবেশিক শাসনকর্তা নন, তিনি স্বয়ং বাঙালি জাতির পিতা। সুতরাং তিনি

বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করছেন, তাঁর জন্য কেন বিক্ষোভ এবং অশান্তি হবে। বরঞ্চ এই মহানায়ককে আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা তাদের মধ্যে পাবেন এ আনন্দে সকলে বিভোর হয়ে আছেন। আগামীকাল উনিশ শ' পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে বিরাজ করবে।

* * *

চৌদ্দই আগস্ট সন্ধ্যের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। শুনলাম কার্জন হলে এবং লাইব্রেরিতে বোমা ফুটেছে। পরিবেশটা থমথমে হয়ে এসেছে। উৎসবমুখর পরিবেশ হঠাৎ যেন কেমন থিতিয়ে এসেছে। মিনিটে মিনিটে পুলিশের গাড়ি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সকলের চোখেমুখে আশঙ্কা। ছাত্রদের সিংহভাগ যারা এই সুবিশাল এলাহিকাণ্ডের নীরব নিরুপায় দর্শকমাত্র ছিলেন, তাদের মনের গতিটা অনুসরণ করতে চেষ্টা করলাম। তাদের চোখমুখ দেখে মনে হলো এ রকম একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটায় সকলে যেন মনের গভীরে খুশি হয়েছে। হাতে পায়ে শেকল, শেকলের পর শেকল পরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বারুদ এবং আগুনের ভাষায় শেষপর্যন্ত আসন্ন মুহূর্তটিতেই কথা কয়েছে। অর্থাৎ কোনো স্বেচ্ছাচারীকেই এই পবিত্র বিদ্যাপীঠ কোনোদিন অতীতে বরণ করেনি এবং ভবিষ্যতের বরণ করতে প্রস্তুত নয়।

কথাগুলো ভেবে নিয়েছিলাম আমি। মনের ভেতরে একটা ভয়ার্ত আশঙ্কাও দুলে উঠেছিল। দুয়েকটা বোমা ফুটেছে এই ভয়ে শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা স্থগিত রাখবেন তিনি তেমন মানুষ নন। তিনি নিশ্চিতভাবে আসবেনই। অপার শক্তিবলে মুখরা নগরীর স্পর্ধিত জিহ্বা যিনি স্তব্ধ করে দিয়েছেন, দুয়েকটি বোমা ফুটলে কি তিনি সেই ভয়ে ঘরের কোণে চুপটি করে বসে থাকবেন? তার প্রতি সবচেয়ে বিরূপ শ্রেণীটি আগামীকাল সকালে সদলবলে নতমস্তকে আস্থা নিবেদন করতে যাচ্ছেন। নাটকের এই রোমাঞ্চকর দৃশ্যে তিনি কী করে অনুপস্থিত থাকতে পারেন? হয়তো আরো বোমা ফুটবে। পুলিশ ছাত্রাবাসসমূহের কক্ষে কক্ষে খানাতল্লাসী চালাবে, সন্দেহজনক ছাত্রদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর আসা বন্ধ হবে না।

রাতে হেঁটে ফিরছিলাম সাতাশ নম্বর সড়কের দিকে। মনে এসব কথা তোলপাড় করছিল ভয়ংকরভাবে। শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘবাহু প্রসারিত করে সমস্ত দেশটাকে কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করছেন, যা কিছু বাধা দিচ্ছে, প্রতিবাদ করছে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই শক্তিদর্পী মানুষটি যা করতে চাইছেন বাস্তবে তার অবিকলটি ঠিক ঠিক ঘটে যাচ্ছে। কোথাও কোনো কথা নেই, কোনো বাধা নেই। বাংলাদেশে কণ্ঠ একটি, সেটি শেখ মুজিবুর রহমানের– মানুষ ওই একজন, তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। ভয়ে দুরুদুরু করছিল বুক। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পনেরোজন বাকশালের যোগদানপত্রে সই করেননি, তাঁদের অনেকেই আমার চেনাজানা বন্ধু-বান্ধব। তাঁদের অবস্থার কথা চিন্তা করছিলাম। তাঁদের কী হবে? তাঁদের কি চাকরি চলে যাবে? তাঁরা কী খাবেন? এই বাজারে বউ ছেলে নিয়ে কীভাবে জীবনধারণ করবেন? তাঁদের কি পুলিশ তুলে নিয়ে যাবে? কী হতে পারে এই রাজদ্রোহিতার পুরস্কার?

ভয়ংকর চাপ অনুভব করছিলাম। একা একা হাঁটছিলাম। ভয়ানক একা বোধ করছিলাম। চারপাশের লোকজনের কারো সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, যেন কোনকালে ছিলও না। একা একা আমি যেন সুড়ঙ্গ পথে বিচরণ করছি। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আমি ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমি দেখে আসছি,

কীভাবে আমার লালিত মূল্যবোধগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। লোভীর লোভ, প্রবলের অন্যায়কে এমনভাবে রূপ ধরে জেগে উঠতে আমি কোনোদিন দেখিনি। এত অশ্রুতে ভেজা, এত গাঢ়রক্তে রঞ্জিত আমাদের স্বাধীনতা আমাদের এমনভাবে প্রতারিত করছে প্রতিদিন, সে কথা কার কাছে যেয়ে বোঝাই। যাদের মনের কথা ব্যক্ত করতে যাবো, তাঁদের অবস্থাও আমার মতো। এ কেমন স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা আমাদের গোটা জাতিকে সম্পূর্ণ ভিখিরীতে পরিণত করে? এ কেমন স্বাধীনতা যে স্বাধীনতায় আমরা একটা কথাও বলতে পারবো না।

চোখের সামনে সত্য মিথ্যের আকার নিচ্ছে। জলজ্যন্ত মিথ্যে নধর তাজা সত্যি হিসেবে এসে প্রতিদিন হাজির হচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের গোটা জাতিটাকে নিয়ে কী করতে চান? তার কথায় কথায় উঠে বসে এ জাতির তো আর কোনোকিছু অবশিষ্ট নেই। এত অত্যাচার দেখেছি, এত জমাট দুঃখ দেখেছি, এত কাপুরুষতা দেখেছি এ জাতি আর মানুষের পর্যায়ে নেই। ক্রমে পশুর নিচে চলে যাচ্ছি আমরা। দুর্নীতির জাতীয়করণ করে সমাজজীবনের প্রতিটি স্তর তিনি বিষিয়ে তুলেছেন। এই জাতির যা কিছু গভীর, যা কিছু পবিত্র, উজ্জ্বল এবং গরীয়ান বিগত তিন বছরে সমস্ত কিছু কলুষিত করে ফেলতে পেরেছেন।

তার বাহিনী অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের মতো যেদিকেই গেছে সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলেছে। শেষমেষ ছিল আমাদের একটা বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা ভাবতে শিখেছি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ই স্বাধীনতা, শান্তি, কল্যাণ, প্রগতি, সাম্য এবং হরিৎবরণ আশা-আকাঙ্ক্ষার লালনক্ষেত্র। এইখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন এক শঙ্কাহীন স্বাধীনতা নিবাস করেন, বিরাজ করেন এমন এক সুস্থশালীনতা আমাদের জ্ঞানদায়িনী মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গে অঙ্গে এমন এক প্রসন্ন পবিত্রতার স্রোত প্রবাহিত হয়, কোনো রাজন্য, কোনো সমরনায়ক, কোনো শক্তিদর্পী মানুষ কোনোদিন তা স্থূল হস্তের অবলেপে কলঙ্কিত করতে পারেনি। আকাশের মতো উদার, বাতাসের মতো নির্ভর, অনির্বার ঝরনার উৎসের মতো স্বচ্ছ এবং সুনির্মল স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা এইখানে প্রতিদিন, প্রতিদিন বসন্তের নতুন মুকুলের আবেগে অঙ্কুরিত হয়। এই অঙ্কুরিত স্বাধীনতার পরশমণির ছোঁয়ায় প্রতিটি আপদকালে এই জাতি বারেবারে নবীন হয়ে উঠে। এর প্রতিষ্ঠাকালের পর থেকে আমাদের জন্মভূমির ওপর দিয়ে কতই না ঝড় বয়ে গেছে। কতবার ঘোড়ার খুরে, বন্দুকের আওয়াজে কেঁপে উঠেছে আকাশ, গর্বিত মিলিটারির বুটের সদম্ভ পদবিক্ষেপে চমকে উঠেছে রাত্রির হৃদয়। কত শাসক এল, কত মানুষ প্রাণ দিল। আমাদের এই ধৈর্যশীলা জ্ঞানদায়িনী মা সংহত মর্যাদার শক্তি, সাহস, বলবীর্য সবকিছু ফুরিয়ে যাবার পরেও শিখিয়েছে কী করে প্রতীক্ষা করতে হয়। নীরব ভাষায় মৌন আকাশের কানে কানে বারেবারে জানতে চেয়ে গেছে শক্তি, ক্ষমতা, দম্ভ এসবের পরিণতি কোথায়? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অতন্দ্রপ্রহরীর দল, তারা কোথায়? কোথায় মি. জিন্নাহ, কোথায় নাজিমুদ্দিন, কোথায় নুরুল আমিন? জেনারেল আইয়ুব খান, আবদুল মোনেম খান, ইয়াহিয়া খান এই সমস্ত শক্তিদর্পী মানুষেরা আজ কোথায়? তাঁরা যে আতঙ্ক, যে ঘৃণা, যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এ দেশের জনপদবাসীর জীবনধারায় ঘূর্ণিঝড়ের সূচনা করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কি আপন সন্তানদের তার আর্তি থেকে বেরিয়ে আসার প্রেরণা দেয়নি?

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫; সেইসব লেখা (২০০৮),
খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১১, ঢাকা।

বাইশ

'জাতির পিতা'র বুলেট-বৃষ্টি নববর্ষে

মাসুদ রানা

[এই লেখায় উল্লিখিত মতামত একান্তই লেখকের। এখানে লেখাটি সংযুক্ত হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ঘটনার পূর্বাপর জানার উদ্দেশ্যে। *আ.পা.*]

নিহত-আহত ও স্মৃতি-বিস্মৃতি

ইতিহাস-খ্যাত সংগ্রামে যাঁরা নিহত, তাঁদের কথা আমরা জানি। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধা জানাই, পুষ্পার্ঘ্য দিই। কিন্তু আহতদের কথা কি আমরা মনে রাখি? নিহতরা চলে যান সব দুঃখ-কষ্টের ঊর্ধ্বে, সে কথা আমরা স্বভাবত জানি। কিন্তু যাঁরা আহত হয়ে বেঁচে থেকে স্বাভাবিকতার চেয়ে অনেক-অনেক কষ্টকর জীবন সংগ্রাম করেন, তাঁদের কথা আমরা কতটুকু জানি?

ঠিক চলিশ বছর আগে ১ জানুয়ারি, নববর্ষে, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের নির্দেশে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে নিহত হন মতিউল ইসলাম ও মির্জা কাদিরুল ইসলাম। আহত হন অনেক ছাত্র-ছাত্রী, যাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ১৪ বছরের স্কুল-ছাত্র পরাগ।

গতকাল লন্ডনে সিপিবি-বাসদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংহতি দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হয়ে এসেছিলেন সেদিনের সেই চতুর্দশবর্ষীয় কিশোর আর আজকের চতুর্পঞ্চদশবর্ষীয় মীর মাহফুজ আলী ওরফে পরাগ মাহমুদ। বাংলাদেশের মানুষ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারিতে স্বাধীন দেশে প্রথম ছাত্র-হত্যার ঘটনাটি। সম্ভবত দিবসটির যথার্থ উদ্‌যাপনের অভাবে। গতকাল লন্ডনে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংহতি দিবসের অনুষ্ঠানটি পুরনো বইয়ের ধুলিধূসর মলাটের উপর ফুঁৎকারে প্রচ্ছদ দেখার মতো জাগিয়ে তুলেছিল সেই দিনটির ছবি।

১৯৭৩-এর নববর্ষে বুলেট-বৃষ্টি

আজ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির যিনি সভাপতি, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, তিনি ৪০ বছর আগে ১৯৭৩ সালে ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ 'ডাকসু'র নির্বাচিত সহ-সভাপতি। সেদিন সেলিমের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা ভিয়েতনামে মার্কিন হামলা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঢাকায় মার্কিন তথ্যকেন্দ্র'র সামনে বিক্ষোভ জানাতে গিয়েছিলেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ যেমনটি করছে আফগানিস্তানে কিংবা যেমনটি করেছে লিবিয়াতে ও ইরাকে, তেমনি ভিয়েতনামে চার দশক আগে গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল 'নাপাম' বোমার আঘাতে। লাখ-লাখ ভিয়েতনামী নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ প্রাণ হারিয়েছেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র আক্রমণে।

কিন্তু ভিয়েতনামি জনগণ কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সে-দিন এক অভূতপূর্ব গেরিলা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে।

শেষপর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিলেন কমিউনিস্টরা। কারণ তাঁরা জনগণের মধ্যে থেকে জনগণকে নিয়ে লড়াই করেছিলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় দালালদের বিরুদ্ধে। সে-দিন পৃথিবীর দেশে-দেশে, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও, ভিয়েতনামের মুক্তিকামী লড়াকু মানুষের পক্ষে মিছিল হয়েছে। প্রতিবাদ হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। বিশ্বব্যাপী এই সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিল ছাত্রসমাজ– ইয়োরোপে, আমেরিকায়, লাতিন আমেরিকায়, আফ্রিকায় ও এশিয়ায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল সুদূর বাংলাদেশের ছাত্রসমাজও।

বুলেট-বেঁধা কিশোর পরাগ

সেদিন বাড়ি থেকে নাস্তা না করে পরাগ মাত্র ৫ পয়সা পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। সেই ৫ পয়সায় বাসভাড়া দিয়ে তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হয়েছিল নিউমার্কেট পর্যন্ত। তারপর বাকি পথ পায়ে হেঁটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন পরাগ। সেখান থেকে মিছিলের সঙ্গে গিয়েছিলেন বর্তমান ঢাকা প্রেসক্লাবের বিপরীতে অবস্থিত তৎকালীন 'যুক্তরাষ্ট্র তথ্য কেন্দ্র'র সামনে।

মুক্তিযোদ্ধা সেলিম কিংবা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কিশোর পরাগ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে বিক্ষোভের জবাবে মিলবে বুলেট-বৃষ্টি। চল্লিশ বছর আগের ১ জানুয়ারির ঘটনা আজও পরাগের স্মৃতিতে দুঃস্বপ্নের মতো জেগে আছে। পরাগ বললেন, তিনি ছিলেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের সাথে-সাথে। তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে জানালেন, কিছু উত্তেজিত ছাত্র পুলিশের দিকে ছুঁড়বেন বলে ঢিল কুড়োচ্ছিলেন। তখন সেলিম নির্দেশ দিলেন, 'কোনো ঢিল ছোঁড়া যাবে না। শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে।'

পরাগ নিশ্চিত করেন, সেলিমকে তিনি এ-কথা বলতে নিজ কানে শুনেছেন। সুতরাং কোনো প্রকারের উস্কানি ছিল না ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। কিন্তু এ-সময়েই এক পুলিশ সদস্য এসে সেলিমের মাথায় থ্রী-নট-থ্রী রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করেন। মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষিত সেলিম দু'হাত তুলে নিজের মাথাটা বাঁচাতে পারলেও হাতে আঘাত পেয়েছিলেন।

স্বভাবত ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের প্রিয়তম নেতার উপর পুলিশের আক্রমণ দেখে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং পুলিসের দিকে ঢিল ছুঁড়তে থাকেন। সে-দিন মিছিলে না-ছিল চাপাতি, না ছিল বোমা, না ছিল মলোটভ ককটেইল। শুধু ছিল ঢিল-ছোঁড়া ও শ্লোগান-দেওয়া প্রতিবাদ। এর জবাবে আসতে পারতো লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস কিংবা আকাশের দিকে ফাঁকা গুলি।

যে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা তাঁদের শান্তিপ্রিয়তার জন্য প্রায়ই 'হারমোনিয়াম পার্টি' বলে উপহাসিত হয়ে থাকেন, সেই সংগঠনের কর্মীদের হটিয়ে দেবার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার গুলিবর্ষণের হুকুম দিল। দীর্ঘ ২৫ মিনিট গুলিবর্ষণ হলো! পরাগ জানান, এটি ছিল তাঁর কল্পনারও বাইরে– অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। তিনি জানালেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধা বাবা ও মামার কাছ থেকে 'ক্রলিং' শিখেছিলেন বলে সেই শিক্ষা ব্যবহার করে বুলেট-বৃষ্টির মধ্যে রাস্তা থেকে 'ক্রল' করে প্রেসক্লাবের সামনের বাস-ছাউনিতে তিনি

আশ্রয় নিয়েছিলেন। গুলি সেখানেও আসছিল। কৈশোরের দুঃস্বপ্নের স্মৃতি থেকে পরাগ বললেন :

> 'মামা সাংবাদিক ছিলেন বলে জানতাম, যুদ্ধের মধ্যে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ করা হয় না। তাই প্রেসক্লাবের প্রাঙ্গনে ঢুকে প্রেসক্লাব ভবনের দিকে ছুটতে লাগলাম। ঠিক তখনই দেখলাম পুলিশ আমাকে তাক করে গুলি ছুঁড়লো। আমি পড়ে গেলাম। স্বপ্নে সাপ দেখে ভয় পেয়ে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করলে যেমন আওয়াজ আসে না, তেমনি শ'তো চিৎকার করেও আমার কণ্ঠ থেকে কোনো আওয়াজ বের করে আনতে পারছিলাম না।'

এক সময় জ্ঞান হারান পরাগ। অনেকের সঙ্গে তাঁকে নেয়া হয় হাসপাতালে। মৃত্যুর হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান পরাগ।

মার্কিন-নীতি ও শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ তখন কেবল সদ্য স্বাধীন দেশ। মাত্র এক বছর ১৫ দিন আগে এসেছে বিজয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে। জাতি যুদ্ধ করেছে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে। কারণ তিনি 'যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা' করার কথা বলে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। কিন্তু সেই যুদ্ধে তিনি সশরীরে নেতৃত্ব দেবার চেয়ে শত্রুসেনার হাতে বন্দি হওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন কোনো এক অঘোষিত সমীকরণে।

সেই নেতাই যে শত্রু-দেশের কারাবন্দিত্ব থেকে ফিরে এসে মুক্ত-দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছাত্র-মিছিলে গুলি চালানোর নির্দেশ দিবেন, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পরাগ কিংবা স্বয়ং মুক্তিযোদ্ধা সেলিম। সেলিমেরা কমিউনিস্ট আদর্শের কারণে ছিলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। আর শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর গুরু হোসেন সোহরাওয়ার্দী পুঁজিবাদী আদর্শিক কারণেই ছিলেন মার্কিন-সহযোগী। এই মেরুকরণ আকস্মিক নয়। এর ইতিহাস আছে। এ-নিয়ে আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবলয় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইয়োরোপে যেমন প্রতিষ্ঠা করেছিল ন্যাটো (নর্থ আটলান্টিক ট্রীটি অর্গেনাইজেশন), তেমনি এশিয়াতে প্রতিষ্ঠা করেছিল সিয়েটো (সাউথঈস্ট এশিয়ান ট্রীটি অর্গেনাইজেশন) ও সেন্টো (সেন্ট্র্যাল ঈস্টার্ণ ট্রীটি অর্গেনাইজেশন)। এশিয়াতে পাকিস্তান ছিল নির্ভরযোগ্য মার্কিন-বান্ধব।

সেই সময়ে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মার্কিন-সহযোগী অংশের নেতা ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান। আর মার্কিন-বিরোধী ছিলেন আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। ১৯৫৭ সালে মার্কিন চুক্তিতে পাকিস্তানের স্বাক্ষর করা না-করা নিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল আওয়ামী লীগ। খোদ আওয়ামী লীগের ভেতরে চুক্তি-বিরোধীদের শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমা করেননি। নির্মমভাবে পেটানো হয়েছিল পাক-মার্কিন চুক্তি-বিরোধী আওয়ামী লীগ কর্মীদের। সেদিন ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমানের গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বলেছিলেন :

'শহীদ, তুমি আজ আমাকে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সমর্থন করতে বলছো। তুমি যদি আমাকে বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাস করো, আমি বলবো, 'না'! তুমি যদি আমাকে কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাস করো– আমি বলবো 'না'! 'না'! তুমি আমাকে যদি আমার কবরে গিয়েও জিজ্ঞাস করো সেখান থেকে আমি চিৎকার করে বলবো, 'না'! 'না'! 'না'!

কোনো ব্যক্তিকে তাঁর বিকাশের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা ভুল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তাঁর উত্তরসূরি শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আদর্শিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক। শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো প্রয়োজন ছিল, ভিয়েতনাম প্রশ্নে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশে পাকিস্তান আমলেও দাঁড়িয়েছিলেন এবং বাংলাদেশ আমলেও দাঁড়াবেন। কারণ, তিনি সমর্থক ছিলেন সেই সিয়েটো চুক্তির, যে চুক্তিতে ভিয়েতনামকে 'রক্ষা'র নামে আক্রমণ করার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সিয়েটো চুক্তির উল্লেখ করেই ভিয়েতনামে মার্কিন অভিযানের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শেখ মুজিবুর রহমান যেখানে ১৯৫৭ সালে নেতা হয়ে নিজদলের কর্মীদের মার্কিন-বিরোধিতা সহ্য করেননি, সেই তিনি ১৯৭৩ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে 'কমিউনিস্ট-ছানাপোনাদের' মার্কিন-বিরোধিতা সহ্য করবেন, এটি হতেই পারে না। ১৯৭৩ সালের প্রথম দিবসে ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে গুলিবর্ষণ করে শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রকে বুঝিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পুরনো অবস্থান পরিবর্তন করেননি। শেখ মুজিবুর রহমান সেই মার্কিন আস্থা লাভ করতে চেয়েছিলেন, যা হারাবার আশঙ্কায় তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সশরীরে উপস্থিত থেকে ভিয়েতনামের মতো 'গেরিলা' নামে চিহ্নিত হতে চাননি।

শ্রেণীর উর্ধ্বে ব্যক্তির কোনো রাজনৈতিক অবস্থান হতে পারে না। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ সেই শ্রেণীর দল, যাঁরা বিকাশোন্মুখ কিংবা বিকশিত বাঙালী ধনিক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সচল ও রক্ষাকল্পে, বিশ্ব-পুঁজিবাদের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আস্থা ও সহযোগিতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করতে পারে। এই বোধ সে-দিন যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনই সত্য আছে। ভিয়েতনামে যেমন আদি ফরাসী উপনিবেশ রক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, পূর্ব-বাংলায়ও সেদিন পাকিস্তানি উপনিবেশ রক্ষার জন্য তার প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু সে পারেনি সোভিয়েত ইউনিয়নের কারণে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পক্ষে বঙ্গোপসাগরের দিকে 'সেভেন্থ ফ্লীট' পাঠালো, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের 'টেন্থ অপারেটিভ ব্যাটল গ্রুপ'-এর কমান্ডার ভ্লাদিমির ক্রুগলিয়াকভ জাহাজ-বিধ্বংসী মিসাইল সজ্জিত ক্রুইজার, ডেস্ট্রয়ার ও আণবিক সাবমেরিন নিয়ে মার্কিনীদের পথ রোধ করেন। তিনি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ 'এন্টারপ্রাইজ'-এর উপর মিসাইল তাক করে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলে মার্কিনীরা টু শব্দটি না করে ফিরে যায়।

একাত্তর সালে নয় মাসে পাকিস্তানি হানাদারেরা যা করেছিল, মার্কিন সামরিক উপস্থিতিতে সেটি আরও দীর্ঘতর হতে পারত। হত্যা-ধর্ষণ-ধ্বংসের পরিমাণ হতে পারত

অনেক-অনেক গুণ বেশি, যদি না সেদিন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দাঁড়াতো।

সমাজতান্ত্রিক এই বিশ্ববোধ ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের অগ্রগামী অংশ বুঝেছিল, স্বাধীনতাকে অর্থবহ ও টিকিয়ে রাখতে গেলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা ও সংগ্রাম জারি রাখা জরুরি। সেই বোধেই ছাত্র ইউনিয়ন ও ডাকসু সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঢাকায় মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার।

ছাত্র ইউনিয়নের মুজিব-অনুভূতি

সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের উপলব্ধি কী ছিল, তা বুঝার জন্য 'দৈনিক সংবাদ'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের পুনর্পাঠ করা যেতে পারে :

> গতকাল মঙ্গলবার পল্টন ময়দানের জনসমাবেশে শহীদ মতিউল ইসলাম ও শহীদ মির্জা কাদিরুল ইসলামের লাশকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম নিম্নোক্ত ঘোষণা পাঠ করেন :
>
> "এই সমাবেশের সামনে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি যে, বিগত ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে ডাকসু'র পক্ষ থেকে আমরা যে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিলাম ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আজ সেই 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রত্যাহার করে নিলাম। আমরা দেশের আপামর জনসাধারণ, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, আজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে তার বঙ্গবন্ধু বিশেষণ ব্যবহার করবেন না। একদিন ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা শেখ মুজিবকে জাতির পিতা আখ্যা দিয়েছিলাম। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে আবার ছাত্রের রক্তে তার হাত কলঙ্কিত করায় আমরা ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি, আজ থেকে কেউ আর জাতির পিতা বলবেন না। শেখ মুজিবুর রহমানকে একদিন ডাকসু'র আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল। আজকের এই সমাবেশ থেকে ডাকসু'র পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি, আজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকসু'র আজীবন সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়া হলো।"
> (৩ জানুয়ারী ১৯৭৩, দৈনিক সংবাদ)

সেদিন হরতাল হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদের দালালী ও দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার। ছাত্র ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতিশীল পত্রিকাটি লেখে :

> গতকাল বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় পুলিশের বর্বর গুলি ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এতে সভাপতিত্ব করেন। সভা শেষে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের নির্মম গুলির শিকার শহীদ মতিউল ইসলাম ও মির্জা কাদেরের লাশ নিয়ে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন শ্লোগানসহ শহরের প্রধান

রাজপথগুলো প্রদক্ষিণ করে বায়তুল মোকাররমে এসে সমাপ্ত হয়। বায়তুল মোকাররমে এক বিক্ষোভসভায় বক্তৃতা করেন ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ও ডাকসুর সহ-সভাপতি জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। বিক্ষোভ মিছিলে ছাত্রছাত্রী ছাড়াও শ্রমিক জনতা যোগদান করে। তারা সোচ্চার কণ্ঠে হত্যার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়।

বিক্ষোভ মিছিলে উচ্চারিত শ্লোগানগুলো হচ্ছে 'নিক্সন-মুজিব ভাই ভাই–এক রশিতে ফাঁসি চাই,' 'সাম্রাজ্যবাদের মরণ ফাঁদ–১৯৭৩ সাল,' 'শহীদ মতিউল-কাদেরের রক্ত–বৃথা যেতে দেব না,' 'খুনি মান্নানের ফাঁসি চাই,' 'ভিয়েতনামের বদলা নেব–বাংলাদেশের মাটিতে, 'আগামীকাল হরতাল–গাড়ির চাকা ঘুরবে না,' 'খুনিশাহী–মুজিবশাহী ধ্বংস হোক, 'নিক্সনের দালালি করা চলবে না–সমাজতন্ত্রের নামে ভাওতা দেওয়া চলবে না,' 'বাংলার মীরজাফর–শেখ মুজিব।'

(২ জানুয়ারি ১৯৭৩, দৈনিক সংবাদ)।

সময়ের ব্যবধানে, অবস্থানের পরিবর্তনে, মানুষের চেতনা কীভাবে পাল্টে যায়, তা উপরের সংবাদ প্রতিবেদনের সঙ্গে বর্তমান সংবাদ প্রতিবেদনগুলোর তুলনা করলে উপলব্ধি করা যায়। ১৯৭৩ সালের মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বাধীন ছাত্র ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার প্রকাশের সঙ্গে ২০১৩ সালে তাঁরই নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র কী অবাক পার্থক্য!

পরাগের কণ্ঠে বুলেটের শিস

চল্লিশ বছর আগে পুলিশ ১৪ বছরের পরাগকে লক্ষ্য করে যে গুলিটি ছুঁড়েছিল, সেটি পরাগের কণ্ঠ ভেদ করে চলে গিয়েছিল। সেদিন পরাগ মরতে পারতেন। অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া পরাগকে লোক দেখানো কর্তব্যের খাতিরে চিকিৎসার নামে লন্ডনে পাঠানো হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর আর কোনো খোঁজ-খবর নেয়া হয়নি। সেদিন লন্ডনে কিশোর পরাগের জীবন-সংগ্রাম কীভাবে শুরু হয় এবং পরিণতি লাভ করে সেটির বর্ণনা হতে পারে একটি পুরোদস্তুর উপন্যাস, যার স্থান এটি নয়।

তবে এটুকু না বললেই নয় যে, অসহায় কিশোর পরাগ তাঁর মুক্তিযোদ্ধা মামার এক গ্রামাত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কিন্তু অচিরেই পরাগ জানতে পারেন, তাঁর আশ্রয়দাতা ছিলেন পাকিস্তানপন্থী দালাল। পরাগের মুক্তিযোদ্ধা মামার প্রতি ঘৃণার প্রকাশ ঘটিয়ে ঐ আশ্রয়দাতাটি পরাগকে নির্যাতন করতেন, গালাগালি করতেন, অভিসম্পাত করতেন–এমনকি খাদ্য বঞ্চনায়ও রাখতেন। পরাগ জানালেন, তিনি হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিলেন না খেতে পেয়ে।

পরাগের বাঁচার স্পৃহা তাঁকে বের করে নিয়ে আসে সেই আশ্রয় থেকে। তিনি এবার আশ্রয় পান বাঙালি মালিকানাধীন এক রেস্টুরেন্টে। সেখানে তিনি পেট ভরে খেতে পেতেন বটে, কিন্তু অমানবিক শোষণ চলত তাঁর শ্রমের। তাঁকে বেতন দেওয়া হতো মাত্র ৫০ পেন্স। এরই মধ্যে পরাগ নিজেকে দক্ষ শ্রমিকে পরিণত করেন। তিনি রেস্টুরেন্টের শেফ্ হয়ে ওঠেন। এতে তাঁর আয় বাড়ে এবং শ্বাস ফেলার পরিধি তৈরি হয়।

পরাগের বাবা ছিলেন ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপের ঢাকা জেলার সম্পাদক। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র ইউনিয়ন করা কিশোর পরাগের জীবন ছিল সম্ভাবনাময়। সেই সম্ভাবনার দরজা অবারিত করতেই তাঁর বাবা মুক্তিযুদ্ধে করেছিলেন। কিন্তু হায় :

নিজের পিতার যুদ্ধে জেতার এক স্বাধীন দেশে
বুলেট ছুঁড়ে কণ্ঠ ছিঁড়ে 'জাতির পিতা' নববর্ষে

কিন্তু আশা ছাড়েননি ভিন্ দেশে বিচ্ছিন্ন কিশোর পরাগ। রেস্টুরেন্টে কাজ করতে-করতেই তিনি ও-লেভেল, এ-লেভেল পাস করলেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করলেন। নিজেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেন পরাগ। পরাগের বিশ্ববোধ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা লোপ পায়নি। বুলেটে বিক্ষত কণ্ঠ নিয়েও আজ মীর মাহফুজ আলী পরাগ ব্রিটেইনের ইংরেজি ভাষার পরিচিত কবি ও আবৃত্তিকার। এর প্রমাণ তিনি দিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংহতি দিবসের স্মরণসভায় নিজের কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করে।

পাশে বসে লক্ষ্য করলাম, পরাগের কণ্ঠ উচ্চকিত কিন্তু স্বাভাবিক নয়। বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত পরাগের কণ্ঠের আওয়াজ এখনও তেজস্বী কিন্তু একটু ফ্যাঁসফ্যাঁসে। কারণ, 'জাতির পিতা'র বর্ষিত বুলেট এখনও শিস্ দেয় পরাগের প্রতিটি উচ্চারিত শব্দে, প্রতিটি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, প্রতি মুহূর্তে, গত চল্লিশটি বছর ধরে।

বুধবার, ২ জানুয়ারি ২০১৩
নিউবারী পার্ক
এসেক্স, ইংল্যান্ড
masudrana1@gmail.com

সূত্র :
http://portal.ukbengali.com/columns/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87 (৬ জুন ২০১৪)

তেইশ

১৯৭২ সালে সাপ্তাহিক 'নিউজউইক'-এর একটি প্রচ্ছদ রচনা

'বাংলাদেশ : বেঁচে থাকার সংগ্রাম'

[আন্তর্জাতিক পরিসরে ঐ সময় নিউজউইক খুবই প্রভাবশালী পত্রিকা ছিল। এটা অস্বাভাবিক নয় যে, এই পত্রিকায় মার্কিন ভাবাদর্শিক প্রভাব ছিল– যা এই প্রতিবেদনেও লক্ষ্য করা যাবে এবং বাংলাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে বিশ্বের অন্যতম ঐ পরাশক্তির মনোভাবটিও বোঝা যাবে এ থেকে। তবে ঐ সময়ের বাংলাদেশকে এবং তখনকার আঞ্চলিক পরিস্থিতি বোঝার ক্ষেত্রেও এই প্রতিবেদন বিশেষ সহায়ক। উপরোক্ত দ্বিবিধ লক্ষ্য থেকেই সংযুক্তিতে প্রতিবেদনটির বাংলা অনুবাদ তুলে ধরা হচ্ছে। এটি সংগৃহীত হয়েছে **'নিউজউইক-এ বাংলাদেশ : মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় এবং তারপর'**[৬৭৭] শীষক গ্রন্থ থেকে। যদিও প্রতিবেদনের শুরু কিংবা শেষে প্রতিবেদকের নাম উল্লেখ নেই– তবে ধারণা করা যায়, পত্রিকাটির হংকংস্থ তৎকালীন ব্যুরো চিফ **টনি ক্লিফটন** প্রচ্ছদ রচনাটি তৈরি করেছিলেন।]

কবিরা যে দেশকে 'সোনার বাংলা' বলে আখ্যায়িত করেছেন বা প্রশংসা করেছেন সেই দেশটি আজ বসবাসের জন্য নরকে পরিণত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেশটিতে মৌসুমী বন্যার মতো দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি এবং গৃহযুদ্ধ লেগেই আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যে দুর্দশা বাঙালিদের ওপর পতিত হয়েছে অতীতে এ দেশের জনগণ তা প্রত্যক্ষ করেনি: একটি প্রলঙ্করী সাইক্লোন বয়ে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানের দখলদার সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এবং সর্বশেষ একটি নৃশংস যুদ্ধ। সদ্য স্বাধীন দেশটির গর্বিত উত্তরসূরিরা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আবির্ভূত হলেও বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশা যেন দিন দিন বাড়ছে। এখন নতুন করে আরেক দুর্দশার আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে– তা হলো দেশটির অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়। *এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে দেশটি বিপ্লব, নৈরাজ্য ও ধ্বংসের দিকে চলে যেতে পারে।*

দেশের মানুষের কষ্ট লাগবের পরিবর্তে স্বাধীনতা যেন বাঙালিদের নতুন করে একটি দুর্দশায় নিপতিত করেছে। যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ যেন একটি ধ্বংসস্তূপের জাতিতে পরিণত হয়েছে। এর অর্থনীতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এর উন্নত ও উর্বর কৃষিভূমি পদদলিত ও অনুর্বর হচ্ছে এবং দেশটির কোষাগার দেউলিয়াত্বের দিকে যাচ্ছে। পনেরো লাখেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড চলছে। নতুন বাংলাদেশের গর্ব এবং জাতীয় বীর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হলেও দেশের এত বড় দায়িত্ব এখন পর্যন্ত দক্ষ হাতে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি এবং তার সম্ভাবনাও নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নই একমাত্র দেশ যে বাংলাদেশে নতুন প্রভাববলয় বিস্তারের চেষ্টা

---

৬৭৭ হাসান শাহরিয়ার, উৎস প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১০৫-১১০।

চালাচ্ছে। এ ছাড়া, বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশের দুর্দশা মোচনের ক্ষেত্রে উদাসীন রয়েছে।

বিশ্বের কোনো কোনো সম্মানিত ব্যক্তি দেশটির পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। তবে এটা হতবুদ্ধিজনক যে সামগ্রিকভাবে বিশ্বের সব দেশ বাংলার নতুন সমস্যা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি বাঙালিদের জন্য হুমকিস্বরূপ। 'সাড়ে সাত কোটি মানুষ এই পরিবর্তনের শিকার', এই মন্তব্য করে ঢাকায় জাতিসঙ্ঘের ত্রাণ কার্যক্রমের পরিচালক সুইজারল্যান্ডের টনি হেগেন বলেন, 'এটি পরিমাপের কোনো মাপকাঠি নেই। অতীতে বিশ্বে এ ধরনের ভয়াবহতা লক্ষ্য করা যায়নি।'

এরপরও যুক্তরাষ্ট্র বলছে, বড় ধরনের কোনো বিপর্যয়ের আশঙ্কা নেই। তবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত মানবিক সাহায্যের ৬০ শতাংশ বাতিল করেছে। গত সপ্তাহের প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান এত নিম্ন পর্যায়ের যে, অর্থনৈতিক সমস্যা তাদের ওপর প্রভাব ফেলবে না।' আর প্রশাসনের এই ধরনের বক্তব্য এডওয়ার্ড এম কেনেডির মতো সমালোচকদের ক্ষুব্ধ করেছে। 'প্রশাসনের এই নীতি সত্যকে বুঝতে অস্বীকার করে', গত সপ্তাহে নিউজউইকের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে কেনেডি বলেন, 'প্রতিদিন প্রশাসন ত্রাণ বরাদ্দ আটকে রাখছে। এর অর্থ প্রতিদিনই দুর্দশার মাত্রা বাড়ছে।'

নিক্সন প্রশাসন মনে করছে, বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত জরুরি সাহায্যের প্রয়োজন নেই। কারণ বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নেই। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জীবনযাত্রা খুঁড়িয়ে চলছে। শিল্প কারখানা অলস হয়ে পড়ে আছে। অধিকাংশ কলকারখানার যন্ত্রপাতি ধ্বংস ও তছনছ করে দেয়া হয়েছে। যেসব কারখানা চালু করা যায় সেগুলো কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বপর্যন্ত চার শত কারখানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের পক্ষীয়দের নিয়ন্ত্রণে। পরিত্যক্ত এই কারখানাগুলো চালানোর মতো দক্ষ লোক বাংলাদেশে নেই। প্রকৃতপক্ষে দেশটির পরিবহন এবং যোগাযোগ অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে। যুদ্ধে পাঁচ শত সড়ক এবং রেল সেতু ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আঁ হাজার ট্রাকের মধ্যে সাত হাজারই ভেঙে চুরমার করে দেয়া হয়েছে। এমন কোন পথ নেই যেখান দিয়ে দেশব্যাপী খাদ্যদ্রব্য বিতরণের কাজটি সহজে করা যায়। হেগেন বলেন, 'অবস্থা খুবই হতাশাজনক এবং এটা ততোদিনই থাকবে যতদিন পর্যন্ত না আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে না পারি। তবে এই কাজটি করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

শখ : অবস্থার আরেকটি খারাপ দিক হলো, বাংলাদেশে যে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়েছে কিংবা যেসব দ্রব্য সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলো কোনো কাজে আসবে না। পশ্চিম জার্মানি থেকে দামি ২ লাখ ৫০ হাজার উলের তৈরি আন্ডারওয়ার এসেছে যা বাংলার এই দুঃসহ গরমে ব্যবহারের অযোগ্য। নরওয়ে থেকে আসা শীতের কাপড়গুলো কেবল গুদামঘরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিমান ভর্তি সামুদ্রিক মাছ আসছে নদী বিধৌত মৎস্যসমৃদ্ধ এই দেশে। তাছাড়া, অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে অর্থের অপচয় হচ্ছে। দেশের বৃহত্তম দু'টি সেতুর পুনঃনির্মাণে ছয় মিলিয়ন ডলার হলেই যথেষ্ট। কিন্তু সেই পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে কম্বল কিনতে। একইভাবে দু'লাখ ডলার দিয়ে

হাজার হাজার কূপের পানি বিশুদ্ধকরণে হ্যান্ডপাম্প কেনা যেত। কিন্তু সেই অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে ঔষধ কেনার জন্য বিমানের ভাড়া পরিশোধ করতে।

দেশটিতে প্রতিদিনই কলেরার প্রকোপ বাড়ছে। আর এর কারণ দূষিত পানি। হেগেন বলেন, 'বাংলাদেশ শৌখিন দাতব্য কাজের এক খেলার মাঠ। আপনি শিশুখাদ্য দিয়ে সেতু নির্মাণ করতে পারেন না এবং কম্বল দিয়ে খাদ্য পরিবহণ করতে পারবেন না। আমাদের প্রয়োজন নগদ অর্থ।'

শরণার্থী : বাংলাদেশে অরাজক পরিস্থিতি শক্ত হাতে দমন না করলে কেবল ভাগ্যপীড়িত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যুক্তরাষ্ট্রের ৪০ শতাংশ লোককে যদি অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডায় জড়ো করা হয়, তাহলে জনসংখ্যার যে ঘনত্ব হবে তা বাংলাদেশের সমান। আর প্রতি সপ্তাহেই অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী এক কোটি বাংলাদেশি শরণার্থীর মধ্যে ৯৭ লাখ দেশে ফিরেছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের দেশে ফিরে আসাটা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। জাতিসঙ্ঘের হিসাব মতে, ১৬ লাখ বাসগৃহে পরিবার প্রতি গড়ে সাত জন করে সদস্য আছে। এগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। বাংলাদেশের শহরগুলোতে হাজার হাজার শরণার্থী ফিরে এসে ভাসমান অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত সপ্তাহে এক লাখ ৭৫ হাজারেরও বেশি বেকার যুবক রাজধানী ঢাকায় এসেছে। তাদের অনেকে দখল করা কিংবা ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়ির নিচে অথবা অগ্নিদগ্ধ রেলকারে ইট মাথা দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

বেকারত্ব ও অপুষ্টিজনিত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে আগামী মাসগুলোতে পরিস্থিতি খারাপ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটা হলে একটি মানবিক বিপর্যয় ঘটবে। আগামী জুন মাসে গ্রীষ্মকালীন বন্যায় দেশটির তিন-পঞ্চমাংশ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। ফলে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা অবশ্য এ ব্যাপারে সন্দিহান। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়ে বলেন, এটা সম্ভব হলেও সম্ভাব্য নয়। তিনি বলেন, আমি এই দফতরে গণদুর্ভিক্ষের কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। কিংবা উদ্বেগ লক্ষ্য করছি না। কিন্তু অন্যরা এতটা আশাবাদী নন। প্রায় দুই লাখ ৩০ হাজার টন খাদ্য চালনা বন্দরে পড়ে আছে। বণ্টন না করায় সেগুলো এভাবে রয়েছে। এখন থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা বাঁধতে পারে বলে হেগেন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

সহিংসতা : এই ধরনের দাঙ্গা বাঁধলে তা হবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি। এই ধরনের একটি আশঙ্কা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সকলের মনে। প্রধান শহরগুলোতে রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। নিত্যদিনই লুটপাট হচ্ছে। (এককালের ধনাঢ্য এক লোক সম্প্রতি থানায় আসেন আণ্ডারওয়্যার পরিহিত অবস্থায়। তার বাড়ি সাতবার লুট করার পর তার কাছে আর কিছুই ছিল না।) এর চেয়ে জটিল হলো উত্তর ভারতের ঘৃণিত ১৫ লাখ বিহারি মুসলমানকে নির্যাতন। এরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল। স্বাধীনতার পর দুই সপ্তাহের কিছু কম সময়ের মধ্যে একটা মারাত্মক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। খুলনার কাছে একদল বাঙালি বিহারিদের ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। তারা নির্বিচারে এদের শত শত লোককে হত্যা করে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এই চরম অবনতির একটা কারণ আছে। তা হলো মুক্তিবাহিনীর অনেক গেরিলা এখনো

অস্ত্রসমর্পণ করেনি। অন্যতম সহিংস চরমপন্থী আব্দুল কাদের সিদ্দিকী আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি পাকিস্তানি বন্দিদের জনতার সম্মুখে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করেছেন। তিনি এখনও ব্যক্তিগত বাহিনী পরিচালনা করছেন।

এই ধরনের অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন ব্যর্থ হয়েছে। অথচ মুজিব দিনে আঠারো ঘণ্টা কাজ করে বাহ্যত এক ব্যক্তির শাসন পরিচালনা করছেন। তার বাড়িতে সব সময় সাহায্য প্রার্থীদের ভীড় থাকে। এমনকি তাঁর পোশাক পরার সময় এবং নাস্তা পরার সময়ও তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অফিসে ছাত্ররা বইয়ের জন্য আসছে। কর্মকর্তারা কাগজপত্র স্বাক্ষরের জন্য অপেক্ষা করছেন। আবার কেউ আসছেন হারানো ট্রাক খুঁজে পেতে। দুঃখজনক বিষয়, সদয় প্রধানমন্ত্রী কাউকে অসন্তুষ্ট করতে চান না। এই কাজটি করতে তিনি অক্ষম। এজন্য কোনো কিছুই হয় না। অনেকে তিক্তভাবে হতাশা প্রকাশ করেন। 'এইভাবে কেমন করে এক লোক দেশ পরিচালনা করতে পারেন', ঢাকার এক কূটনীতিক এমন প্রশ্ন করে বলেন, 'এটা যেন একটা পাগলা গারদ।'

তা-ই হবে। দেশের সমস্যার সমাধান নয়, মুজিবের রোজনামচায় অনেকের ব্যক্তিগত চাহিদা মিটানোর চেষ্টা। গত সপ্তাহে তিনি নিউজউইকের সিনিয়র এডিটর আরনড ডি বর্শগ্রেভকে জানান, তিনি তাঁর বামবাহুতে এবং বক্ষস্থলে ব্যথা অনুভব করছেন। 'কিন্তু আমি কী করে বিশ্রাম নেব? আপনি দেখেন এসব লোক আমার সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছে। যখন তারা চলে যাবে তখন অন্যকিছু হবে।' তিনি অপর একজন বিদেশি সফরকারীর কাছে অভিযোগের সুরে বলেন, 'এই কাজের চেয়ে পাকিস্তানের কারাগার মন্দ ছিল না।'

এটা নিশ্চিত, মুজিবের প্রশাসন তার মিত্রদের কাছ থেকে, বিশেষ করে ভারতের সহায়তা পাচ্ছে। ভারতের সেনাবাহিনী বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। গত সপ্তাহে একদিকে ভারতীয় সর্বশেষ সেনাদলটি বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে এবং অন্যদিকে মুজিব ভারতের সঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে একমত হয়েছেন। একটি হলো তাঁর সরকার ঐসব পাকিস্তানি কারাবন্দির বিচার করতে পারবে যাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে নৃশংসতার অভিযোগ রয়েছে এবং আরেকটি দাবি ছিল, অন্য যুদ্ধবন্দিদের প্রত্যাবর্তনের আগে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে।

তবে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্কের কিছুটা ভাটা পড়েছে। গত সপ্তাহে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য বাংলাদেশে আসেন তখন তাঁকে দেওয়া অভ্যর্থনা জৌলুসপূর্ণ ছিল না। পাকিস্তানি শাসনের শেষ দিনগুলোতে ভারতীয়রা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পাট নিয়ে যায় এবং বাংলাদেশ এর ফলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া, ভারত পাকিস্তানের সব অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে যায়। বাংলা যখন পাকিস্তানের অংশ ছিল তখন এই সব অস্ত্রের জন্য কর পরিশোধ করতে হয়েছে এই বাংলার টাকায়। বাংলাদেশের একজন কর্মকর্তা অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'যুদ্ধে লুণ্ঠিত যেসব জিনিসপত্র ভারত নিয়েছে সেগুলো আমাদের।'

বৈরিতা : যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বাঙালিরা যে বৈরি ভাব পোষণ করে, সেই তুলনায় বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কে ঠান্ডাভাব খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। এই দেশটি ছাড়া অপর বৃহৎশক্তি চীনও একই কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানান, ৯ কোটি ৭০ লাখ ডলার সহায়তার যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল তা পরে বাতিল করা হয়। কারণ ওয়াশিংটন ও ঢাকার মধ্যে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা বললেন, 'এখন পর্যন্ত আমরা রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দিইনি। অতএব আমরা সাহায্য দিতে পারি না।' কিন্তু এই যুক্তি অনেকের কাছেই যৌক্তিক মনে হচ্ছে না। মিশিগানের লেনসিং জরুরি ত্রাণ তহবিল ইনকরপোরেটেড-এর ৭০ সদস্যের একটি তহবিল সংগ্রহকারী দল গত সপ্তাহে বাংলাদেশ থেকে ফিরেছে। তারা ত্রাণের সংকটাপন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছে। একজন সদস্য বিরক্ত প্রকাশ করে বলেন, 'সম্পূর্ণ ভুলবশত আমাদের সরকার এই কাজে সাড়া দিচ্ছে না।' অন্যরা বলেন, গত এক পক্ষকাল যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র ত্রাণের বিষয়টি নিয়ে ভাবছে। তারা মনে করেন, পাকিস্তানকে সমর্থন এবং ত্রাণ আটকে রাখার কারণে যুক্তরাষ্ট্র এখন মুখ দেখাতে পারছে না। এটি করলে তাদের হয়তো ভুল স্বীকার করা হবে। এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে, যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশকে আর্থিক সাহায্য দানের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন আরও বেশি আগ্রহী হয়। 'ভারত এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রাশিয়া চ্যাম্পিয়নের ভূমিকা পালন করেছে', এই মন্তব্য করে এক কর্মকর্তা বলেন, 'তারাই এখন অর্থ যোগান দিক' এবং ডি বর্শগ্রেভ যখন গত সপ্তাহে বাংলাদেশ সফর করেন তখন তিনি দেখেছেন রাশিয়া সেই কাজটিই করছে। নিম্নে তার প্রতিবেদন :

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রাশিয়া সময়ের কোনো অপচয় করেনি এবং চেষ্টার কোনো ত্রুটিও করেনি। তিন সপ্তাহ আগে মুজিব মস্কো যাওয়ার আগে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভ্যালেন্তিন পপভ রিলিফ সরবরাহ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পোতাশ্রয় পরিষ্কার করার কাজটি রাশিয়াকে দিতে অনুরোধ জানান। নিমজ্জিত ২৯টি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে চলাচল ব্যাহত করছে এবং ১০০টি ছোট জাহাজ অপর বন্দর চালনাকে অক্ষম করে তুলেছে। ঢাকার কাছে এই প্রকল্পটি অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে ছিল। কিন্তু মুজিব এখন পর্যন্ত আশা করছেন, জাতিসঙ্ঘই কাজটি করে দিবে। জাতিসঙ্ঘের ত্রাণ কার্যক্রমের প্রশাসক হেগেন আশ্বস্ত করেছিলেন, জাতিসঙ্ঘ এই প্রকল্পটি অনুমোদন দিবে। বাঙালির এই নেতা রাশিয়াকে কাজটি দেয়ার বিষয় থামিয়ে রাখেন। কিন্তু মুজিব মস্কো থেকে ফেরার পর দেখলেন নিউ ইয়র্কে অবস্থিত জাতিসঙ্ঘ সদরদপ্তর প্রকল্পটির অনুমোদন দেয়নি। 'জাতিসঙ্ঘকে এই উদ্ধারকার্যটির বিষয় ভুলে যেতে বলুন,' প্রধানমন্ত্রী তখন হেগেনকে বললেন। 'আমরা সোভিয়েতের প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। আলোচনার এখানেই সমাপ্তি।'

সোভিয়েত ইউনিয়ন এটা সুস্পষ্টভাবে আশা করেছিল, পোতাশ্রয় পরিষ্কারকরণের কাজটি করতে পারলে তারা দীর্ঘদিনের জন্য বঙ্গোপসাগরের দুটি বন্দরের কাজ পেতে পারে এবং ভারত মহাসাগরে তাদের রণতরী মোতায়েন করতে পারবে। কিন্তু রাশিয়া অন্যভাবেও বঙ্গোপসাগরে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। তারা নতুন এই জাতিকে মিগ বিমানবহর এবং ছোট পরিবহন বিমান কেনার প্রস্তাব দেয়। তারা তাদের দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৯০ জনে উন্নীত করে। এদের মধ্যে অনেকে অনর্গল

বাংলা বলতে পারে। তাদের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রকে হাত করে তারা যে কোনো কাজ করিয়ে নিতে পারে। সোভিয়েত গাড়িগুলো কূটনীতিক নম্বরপ্লেটের লাইসেন্স পায়। বাংলাদেশের সর্বত্র এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের উপস্থিতি দৃশ্যমান। কমিউনিজম প্রচারণার ছবি টেলিভিশনে দেখানো হয়। বিভিন্ন শহরে কমিউনিজমের ওপর সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়।

তদবির : *সামান্য গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে বাংলাদেশে রাশিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা যায়। সোভিয়েতরা বিশ্বাস করে এবং নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনায় বলে, বাংলাদেশে সত্যিকারের বিপ্লব এখনো আসেনি। যখন আসবে, তখন যেন এর ধরন হয় রাশিয়ার মতো, চীনের মতো নয়।* সোভিয়েত দৃশ্যপট অনুযায়ী, বাংলাদেশের দুঃখ-দুর্দশা ও অস্থিরতাকে সম্বল করে তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল মুজিবকে আরও বামের দিকে ফেরানো যাবে। বাংলাদেশ যদি কোনোভাবেই সেই লক্ষ্যের দিকে না যায় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তদবির করবে। তারা তাদের স্থানীয় সহানুভূতিশীলদের বলেছে, বাংলাদেশের মেহনতী মানুষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুফল পায়নি। অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পকেট ভারী হচ্ছে।

মুজিব ব্যতীত অনেক বাঙালিই মনে করে, যুক্তরাষ্ট্র পাশে থাকলে তাদের সমস্যা থাকবে না। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আপনারা (আমেরিকানরা) যদি চাঁদে মানুষ পাঠাতে পারেন, তাহলে আপনারা সবকিছুই করতে পারেন। আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা আমার জনগণকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসুন।' আসছে সপ্তাহে নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশকে কূটনীতিক স্বীকৃতি দিতে পারে। এর ফলে আমেরিকার সাহায্য বাড়বে। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, যুক্তরাষ্ট্র আরেকটি এশীয় অঙ্গীকারে সায় দেবে। যদি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বহুবিদ সমস্যায় সম্পৃক্ত না হয়, তাহলে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ আরও হ্রাস পাবে। ওয়াশিংটন বিশ্বাস করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন অমীমাংসিত সমস্যা কাঁধে নিয়েছে এবং তা দেশটির জন্য দুঃখের কারণ হতে পারে। কিন্তু এই আর্থিক ও ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনা বড় ধরনের মানবিক সাহায্যের ক্ষেত্রে বাধা হলে তা সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনোভাবেই তা সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। গত সপ্তাহে ঢাকায় এক বিদেশি বলেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে উদার জাতি এতটা উদাসীন হবে না। লাখ লাখ লোক যখন ক্ষুধার্ত, তখন অবশ্যই তাদের পাশে দাড়াবে।'

নিউজউইক
২৭ মার্চ ১৯৭২

চব্বিশ

[চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষকালে খ্যাতি পাওয়া রফিক আজাদের কবিতা]

ভাত দে হারামজাদা

রফিক আজাদ

ভীষণ ক্ষুধার্ত আছি: উদরে, শরীরবৃত্ত ব্যেপে
অনুভূত হতে থাকে-প্রতিপলে-সর্বগ্রাসী ক্ষুধা
অনাবৃষ্টি–যেমন চৈত্রের শস্যক্ষেত্রে জ্বলে দ্যায়
প্রভূত দাহন–তেমনি ক্ষুধার জ্বালা, জ্বলে দেহ

দু'বেলা দু'মুঠো পেলে মোটে নেই অন্য কোন দাবি
অনেকে অনেককিছু চেয়ে নিচ্ছে, সকলেই চায়;
বাড়ি, গাড়ি, টাকা কড়ি–কারো বা খ্যাতির লোভ আছে
আমার সামান্য দাবি পুড়ে যাচ্ছে পেটের প্রান্তর-
ভাত চাই–এই চাওয়া সরাসরি–ঠান্ডা বা গরম
সরু বা দারুণ মোটা রেশনের লাল চাল হ'লে
কোন ক্ষতি নেই–মাটির শানকি ভর্তি ভাত চাই;
দু'বেলা দু'মুঠো পেলে ছেড়ে দেবো অন্য-সব দাবি।

অযৌক্তিক লোভ নেই, এমনকি নেই যৌন ক্ষুধা
চাইনিতো: নাভি নিম্নে পরা শাড়ি, শাড়ির মালিক;
যে চায় সে নিয়ে যাক–যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দাও
জেনে রাখো: আমার ওসবের প্রয়োজন নেই।
যদি না মেটাতে পারো আমার সামান্য এই দাবি
তোমার সমস্ত রাজ্যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটে যাবে
ক্ষুধার্তের কাছে নেই ইষ্টানিষ্ট, আইন কানুন–
সম্মুখে যা কিছু পাবো খেয়ে যাবো অবলীলাক্রমে:
থাকবে না কিছু বাকি–চলে যাবে হা ভাতের গ্রাসে।
যদি বা দৈবাৎ সম্মুখে তোমাকে ধরো পেয়ে যাই-
রাক্ষুসে ক্ষুধার কাছে উপাদেয় উপাচার হবে।

সর্বপরিবেশগ্রাসী হলে সামান্য ভাতের ক্ষুধা
ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে নিমন্ত্রণ করে।

দৃশ্য থেকে দ্রষ্টা অব্দি ধারাবাহিকতা খেয়ে ফেলে
অবশেষে যথাক্রমে খাবো: গাছপালা, নদী-নালা
গ্রাম-গঞ্জ, ফুটপাত, নর্দমার জলের প্রপাত
চলাচলকারী পথচারী, নিতম্ব-প্রধান নারী
উড্ডীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়ি
আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ

ভাত দে হারামজাদা
তা না হলে মানচিত্র খাবো।

(রফিক আজাদ; জন্ম: ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল; এই কবিতা লিখে মুক্তিযোদ্ধা এই কবিকে তৎকালে আত্মগোপনে যেতে হয়েছিল।)

পঁচিশ

১৯৭৫-এর আগস্টের পর সীমান্তে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর কমান্ডার ও নিহত যোদ্ধাদের তালিকা

ক.

অধিনায়কের পরবর্তী স্তরে নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন উপরোক্ত বাহিনীর 'কমান্ডার':

সুনীল কুমার গুহ, ফারুক আহমেদ, আ হ সেলিম তালুকদার, সৈয়দ নূরুল ইসলাম, আরিফ আহমেদ দুলাল, কবিরুল ইসলাম বেগ, সাইদুর রহমান মহারাজ, খোরশেদ আলম, মাহবুব আহমেদ, আলী হোসেন, মীর দেলোয়ার, আবদুল বাতেন, জয়নাল আবেদীন, বিজন সাহা, নাসিম ওসমান, অলোক দত্ত, দীপংকর তালুকদার, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পংকজ আজিম, আবদুল হক, জীতেন ভৌমিক, বাবুল হক, লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ আমান উল্লাহ, তমছের আলী, আলবার্ট স্রং, গাজী লুৎফর, সুকুমার সরকার, হাসেমী মাসুদ জামিল, জগলুল পাশা, বিজন সরকার, আবদুল হালিম, এম এ মান্নান, আবদুর রব, সুলতান মুহাম্মদ, এম এ জলিল ও প্রবোধ দিও।[৬৭৮]

খ.

নিহত যোদ্ধাদের তালিকা

(ঢাকাভিত্তিক দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ২০১৩ সালের ১৫ আগস্ট নিম্নোক্ত নামের তালিকা প্রকাশ করে। পত্রিকাটির মতে, এই তালিকাটি অসম্পূর্ণ। আরও অনেক যোদ্ধা ১৯৭৫-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। অন্তর্কলহেও অনেকে মারা গেছে। লক্ষ্যণীয়, নিহতদের মধ্যে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ও আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। কাদের সিদ্দিকী আলোচ্য বাহিনীর নাম দিয়েছিলেন 'জাতীয় মুক্তিবাহিনী'।]

---

৬৭৮ এ বিষয়ে আরও ধারণার জন্য নিম্নোক্ত লেখাগুলো দেখা যেতে পারে:
[ক] http://ns.bdnews24.com/details.php?id=147425&cid=35 [২০-০৮-২০১৩];
[খ] http://dnewsbd.com/single.php?id=41284; [২৯-১০-২০১৩]
[গ] http://www.bostonbanglanews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25723:2013-08-15-01-48-02&catid=86:2011-03-28-17-55-11&Itemid=70 [২০-০৮-২০১৩];
[ঘ] http://www.somewhereinblog.net/blog/Shahnawaz/29770077 [২০-০৮-২০১৩]

১. (বগুড়া) আবদুল খালেক খসরু, নজিবুর রহমান নীহার;
২. (গাইবান্ধা) ইবনে সাউদ, রেজাউল করিম, মিজানুল হক মুকুল, মোহাম্মদ আলী, আবদুর রাজ্জাক, আলী আযম আলমগীর, মো. বাবুল, মো. সোলায়মান, আবদুর রহিম আজাদ;
৩. (কুড়িগ্রাম) রেজাউল করিম, নুরুল ইসলাম, নুরুল আমিন;
৪. (নেত্রকোণা) আবদুল খালেক, রাধারমণ রায় ঝন্টু, বামুন সরকার, রজব আলী, আবুল কাশেম, হামিদুল ইসলাম, ফজর আলী, শান্তি বিকাশ সাহা পল্টু, আবদুল হেকিম, মুসলিম উদ্দিন তালুকদার, সুব্রত, হেনরি সাংমা, পংকজ আজিম;
৫. (টাঙ্গাইল) সাখাওয়াত হোসেন মান্নান, সৈয়দ নুরুল ইসলাম;
৬. (চট্টগ্রাম) মৌলভী সৈয়দ আহমেদ;
৭. (কুমিল্লা) সুশীল ভৌমিক বেলু;
৮. (সুনামগঞ্জ) নিরানন্দ দাশ, মতিলাল দাশ, আখলমন মাঝি, বলরাম সরকার;
৯. (শেরপুর) বিপ্লব কুমার দে দুলাল, দুলাল মিয়া, মনোরঞ্জন সরকার, হাবিবুর রহমান, বীরেন্দ্র চন্দ্র পাল, কছর আলী, আলী হোসেন, শওকত আলী, মোতালেব, বীরেন্দ্র চন্দ্র শীল, রুস্তম আলী, মোজাম্মেল হক, রঞ্জিত সাংমা, অনন্ত বর্মণ, জয়েশ্বর বর্মণ, সপ্রন্ন সাংমা, কাশেম সাংমা, নিরঞ্জম সাংমা, পিটারসন সাংমা, প্রাণবল্লভ বর্মণ, প্রটিন দিও, শ্রীদাম রিছিল, চিত্তরঞ্জন ডালু, সম্রাট সাংমা;
১০. (জামালপুর) নজরুল ইসলাম, আলতাফুর রহমান;
১১. (ময়মনসিংহ) আবদুল হামিদ, আবদুল আজিজ, সুশীল চন্দ্র দত্ত, রঞ্জিত কুমার, এস, মজিবুর রহমান খান, সুবোধ চন্দ্র ধর, আলকাস উদ্দিন সরকার, দীপাল চন্দ্র দাশ, জোবেদ আলী, সিরাজুল ইসলাম, ফনেস সাংমা, তপন সাম্বুগং, আলিসন মারাক, গোবিনিক মারাক, সুদর্শন মানকিন, হারু সাংমা, হযরত সাংমা, জবনীশ তেলসী, অগাস্টিন চিছিম, সুধীন কুবি, ডমিনিক চাম্বুগং।

ছাব্বিশ

মুক্তিযোদ্ধাদের কেবল মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশাসনের উচ্চতর পদে নিয়োগের লক্ষ্যে পিএসসির বিজ্ঞাপন

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস (১ম) কমিশন

বিজ্ঞপ্তি

নম্বর-৪, তারিখ ২৩ শে জুন, ১৯৭২ ইং

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য হইতে ৩৫০টি শিক্ষানবীশ অফিসারের পদ পূরণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক উর্ধ্বতন কর্মচারী নিয়োগ (বিশেষ) পরীক্ষা (Special Superior Service Competitive Examination) অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

এই পরীক্ষা মৌখিক পদ্ধতিতে গৃহীত হইবে এবং প্রয়োজন হইলে পরীক্ষা কার্যে মনস্তত্ত্ববিদের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে।

প্রার্থীদের নিম্নতম যোগ্যতাঃ

১। বাংলাদেশের বা অন্য কোন দেশের অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি।

২। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ। (ইহার নিদর্শনস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক কিংবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট হইতে সার্টিফিকেট অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।)

৩। বাংলাদেশের নাগরিক এবং স্থায়ী বাসিন্দা। বয়সসীমা ১ লা জুন, ১৯৭২ তারিখে ২১ হইতে ৩৫ বৎসর।

প্রার্থীদিগকে কমিশনের নিকট নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্তের ফিস বাবদ XXXI Misc. Application Fee for Special Superior Service Examination প্রদত্ত ৫ (পাঁচ) টাকার চালানসহ দরখাস্ত করিতে হইবে।

দরখাস্তের ফরম কমিশনের অফিস হইতে ডাকযোগে পাইতে হইলে শিরোনামা লিখিত এক টাকা বিশ পয়সার ডাকটিকিট যুক্ত বড় লেফাফা পাঠাইতে হইবে। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ২৫ শে জুলাই, ১৯৭২।

মৌখিক পরীক্ষার পর শিক্ষানবীশ হিসেবে নির্বাচিত হইলে প্রার্থীকে ১২ সপ্তাহকাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রশিক্ষণকালে তাঁহাকে মাসিক ৩০০ (তিনশত) টাকা ভাতা এবং পোশাকের জন্য এককালীন ২৫০ (দুই শত পঞ্চাশ) টাকা দেওয়া হইবে।

প্রশিক্ষণকাল শেষ হইলে আরেকটি লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। এই পরীক্ষায় পাঠক্রম যথাসময়ে শিক্ষানবীশদিগকে জানানো হইবে। শিক্ষানবীশদের মধ্যে যাঁহারা এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবেন তাঁহাদিগকে স্ব স্ব উপযুক্ততা অনুসারে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হইবে। এইভাবে কোন কোন পদ পূরণ করা হইবে তাহা তখনই স্থির করা হইবে।

সানোয়ার হোসেন খান

সচিব

সাতাশ

মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা সৃষ্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (আইএমএস) সম্পর্কে পিএসসি'র মন্তব্য

বিশেষ বাহক মারফত

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন
৯৭ তোপখানা রোড
(চামেলী হাউস)
ঢাকা-২

নম্বর এস, ইআর-২-১৫/৮২/২৪০১ পিএসসি তারিখঃ ১৫-৬-১৯৮২

প্রেরক : শেখ আনওয়ার আহমদ
সচিব
বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন

প্রাপক : সচিব
সংস্থাপন বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণঃ রিক্রুটমেন্ট শাখা)

বিষয় : আইএমএস ক্যাডার বিলুপ্ত করিয়া ক্যাডারভুক্ত অফিসারদের অন্যান্য ক্যাডারে আত্মীকরণ প্রসঙ্গে

জনাব,

আদিষ্ট হইয়া উপরোক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ২৪-০৫-৮২ তারিখে লিখিত এস এ আর ২-১৫/৮২/২০৯৩-পিএসপি নম্বর চিঠির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানাইতেছি যে, বিগত ১০-৬-৮২ তারিখ এবং ১৪-৬-৮২ তারিখে সংস্থাপন বিভাগ, শিল্প বিভাগ এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধিদের সহিত কমিশনের এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হইয়াছে। আলোচনার সময় আইএমএস গঠন সংক্রান্ত ১৯৭৩ সালের রেগুলেশন, ১৯৭৬ সালে জারিকৃত ইহার গঠন ও নিয়োগবিধি এবং অন্যান্য যেসব কাগজপত্র সংস্থাপন বিভাগ এবং শিল্প বিভাগ হইতে সরবরাহ করা হইয়াছে সেইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। এই পরীক্ষার সময় দেখা যায় যে, ১৯৭৬ সালে আইএমএস গঠন ও নিয়োগবিধি জারি করা হয় অথচ তাহার ৩ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালেই আলোচ্য সার্ভিসে লোক নিয়োগ করা হয়। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত নিয়োগবিধি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহিত আলোচনা ব্যতীতই জারি করা হইয়াছে যদিও সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের সহিত আলোচনার পরই নিয়োগবিধি জারি করা প্রয়োজন ছিল।

২। কোন সম্মিলিত পরীক্ষার মাধ্যমে যখন কোন ক্যাডারে লোক নিয়োগ করা হয় তখন মেধা, বিভিন্ন ক্যাডার/পদের জন্য প্রার্থীর পছন্দ এবং সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কোটার ভিত্তিতে কমিশন বিভিন্ন পদ/ক্যাডার/সার্ভিসে প্রার্থী মনোনয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে কমিশন শুধু মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া মেধাতালিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কমিশনকে উক্ত দুই দিনের আলোচনার সময় বলা হয় যে, একটি সেক্রেটারীস্ কমিটি বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস ও পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করিয়াছিলেন। কোন বিধি এবং কি পদ্ধতি অনুযায়ী আলোচ্য কমিটি প্রার্থী মনোনয়ন করিয়াছেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। এইভাবে প্রার্থী মনোনয়ন এবং নিয়োগ নিশ্চিতভাবে ব্যতিক্রমধর্মী ও অস্বাভাবিক। ইহাতে প্রজাতন্ত্রের চাকুরিতে প্রার্থী নির্বাচন সংক্রান্ত সংবিধানের ধারাও লংঘিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা আইনে এই সকল পদকে কমিশনের আওতা বহির্ভূত করা হইয়াছে কি না তাহাও কমিশনের জানা নেই।

৩। কমিশন এখানে উল্লেখ করিতে চান যে, যখনই এই রকম অনিয়মিত নিয়োগ করা হয় তখনই ব্রিবতকর অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নানাবিধ জটিলতা দেখা দেয়। পরবর্তীকলে এই জটিলতার নিরসন দুরূহ হইয়া পড়ে।

৪। ১৯৭৩ সালের রেজুলেশন, ১৯৭৬ সালের নিয়োগবিধি এবং নিয়োগপত্র পরীক্ষান্তে আরো দেখা যায় যে, এই গুলিতে পরস্পরবিরোধী নিয়মাদি রহিয়াছে। আইএমএস-এ নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ ব্যক্তিগতভাবে স্থায়ী হইয়াছেন এবং বিভিন্ন সময়ে কীভাবে তাহাদের সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট নয়। আইএমএস কর্মকর্তারা সরকারি কর্মকর্তা কি না সে সম্পর্কেও আলোচনা হয়। কারণ বিধিগুলোর কোন কোন জায়গায় এমন সব বক্তব্য রহিয়াছে যাহা নিয়মিত ক্যাডার বা যে কোন সরকারি চাকুরির বিধিতে কখনোই সংযোজিত থাকে না। যেমন- (১) ১৯৭৩ সালের রেজুলেশনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে সকল বাস্তব কারণে তাহারা সরকারি কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন (to intents and purposes)। সরকারি কর্মচারীদের বেলায় এইরূপ উল্লেখ থাকে না; (২) ১৯৭৬ সালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী তাহাদিগকে শুধু কর্পোরেশনে নিয়োগ করা হইবে এবং কর্পোরেশনের উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য তাহারা যোগ্য হইবেন। আইএমএস-এ নিযুক্ত কর্মকর্তারা যে প্রকৃতই সর্ব অর্থে সরকারি কর্মচারী সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন– অবশ্য সরকার যদি তাহাদিগকে নিয়মিত সরকারি চাকুরে বলিয়া গ্রহণ করিতে চান।

৫। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষান্তে মনে হয় যে, কর্পোরেশনগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সরকার একটি বিশেষ স্বতন্ত্র সার্ভিস গঠন করিয়াছিলেন। এই সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শুধু কর্পোরেশনে নিযুক্ত করা হইবে। তবে মাত্র একবারই এই সার্ভিসে লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল এবং তাহাও নিয়োগবিধি প্রণয়নের অনেক পূর্বে। ১৯৭৩-এর পরে এই সার্ভিসে কোন নিয়োগ করা হয় নাই। দীর্ঘকাল আলোচনার পর সরকার বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে নতুন বিসিএস ক্যাডার গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে উহার নিয়মাবলি প্রণয়নও সমাপ্ত করা হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনই আইএমএস নামক সার্ভিসের বিষয় কখনও আলোচনায় উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া কমিশন অবগত নহেন এবং আইএমএস সমন্বিত বিসিএস-এর

অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের ন্যায় আইএমএস-কে নিয়মিত ক্যাডার সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা যায় না।

৬। কি কারণে এখন আইএমএস বিলুপ্ত করার প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহা কমিশন অবগত নহেন। আইএমএস অফিসারদের অভিমত ভিন্ন ধরনের। বিসিএস-এর বিভিন্ন ক্যাডারে তাহাদের আত্মীকরণ করিলে সংশ্লিষ্ট বিসিএস ক্যাডারের চাকুরির মান হ্রাস পাইবে এবং ঐসব ক্যাডারে যাহারা নিয়োজিত আছেন তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইবে। সুষ্ঠু প্রশাসনব্যবস্থার খাতিরে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না।

৭। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আইএমএস ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বিসিএস ক্যাডারে আত্মীকরণ করা হইলে এইরূপ আত্মীকরণের দাবি অন্যান্য চাকুরিতে বিযুক্ত ব্যক্তিদের তরফ হইতেও উঠিতে পারে। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত সুপিরিয়র পদ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে নিয়োগের জন্যও প্রার্থী মনোনয়ন করা হয়েছে। জানা যাইতেছে যে, তাহাদের তরফ হইতেও বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে আত্মীকরণের দাবি উঠিয়াছে। কাজেই বিভিন্ন বিসিএস ক্যাডারে আইএমএস কর্মকর্তাদের আত্মীকরণের ফলে অন্যত্র ইহার কী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা দেখা দরকার।

৮। উপরের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আলোচ্য সমস্যা সমাধান কল্পে সরকার নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারেন:

(১) যে কারণে আইএমএস গঠন করা হইয়াছিল সে কারণ এখনও বলবৎ থাকিলে কর্পোরেশনসমূহে নিম্নতর হইতে উচ্চতর পর্যায়ে পদ সৃষ্টির মাধ্যমে এইরূপ একটি স্বতন্ত্র সার্ভিস তাহাদের জন্য চালু রাখা এবং ইহাতে নিয়মিত নিয়োগ অব্যাহত রাখা;

(২) সরকার যদি মনে করেন কর্পোরেশনগুলির জন্য একটি স্বতন্ত্র সার্ভিস বহাল রাখার প্রয়োজন নাই তবে আইএমএস-এ নিয়োজিত ১৯৬ জন কর্মকর্তাকে এককালীন ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্পোরেশনে আত্মীকরণ করা। আইএমএস-এর কর্মকর্তারা যদি সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃত হন তবে তাহারা সরকারি কর্মচারির মর্যাদায় তথায় নিয়োজিত থাকিবেন এবং কর্পোরেশনের উচ্চতর পদে পদোন্নতিরও সুযোগ পাইবেন। পানি উন্নয়ন বোর্ড/বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে বিলুপ্ত বিদ্যুৎ ও সেচ পরিদপ্তরের কর্মকর্তারা নিয়োজিত আছেন এবং তাহারা অদ্যাবধি সরকারি কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হইতেছেন। এই ব্যবস্থার ফলে আইএমএস কর্মকর্তাগণ যে অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ লাভ করিয়াছেন তাহারও সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব হইবে।

(৩) যদি সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আইএমএস ক্যাডার বিলুপ্ত করিয়া বিসিএস ক্যাডারে তাহাদের আত্মীকরণ করা হইবে তবে বিসিএস (ইকনমিক এন্ড ট্রেড) ক্যাডারের অধীনে (ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট) নামে একটি সাব-ক্যাডার সৃষ্টি করিয়া উক্ত ক্যাডারে তাহাদের আত্মীকরণ করা যাইতে পারে।

বিনীত
স্বাঃ/জা. আহমদ
সচিব

[হুবহু সংযুক্ত]

আটাশ

মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের তালিকা প্রণয়নে ব্যর্থতায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের হতাশা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
উদ্বৃত্ত কর্মচারী শাখা

নম্বর- এমই (এসপি)-৯২/৮৩-২৯৭(২৫০) তারিখ: ৮-২-৯৫ বাং, ২২-৫-৮৮ ইং

বিষয় : প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন

১। উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, বাংলাদেশের প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে সভাপতি করিয়া একটি উচ্চপর্যায়ের জাতীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি বহু পূর্বেই তালিকা প্রস্তুতির কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৭২/৭৩ সালে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত সুপিরিয়র সার্ভিসেস পরীক্ষায় (মৌখিক) মুক্তিযোদ্ধা কোটায় অংশগ্রহণকারী মনোনীত ও বিসিএস (প্রশাসন) ও বিসিএস (সচিবালয়) ক্যাডারসহ অন্যান্য ক্যাডারে চাকুরিরত ১৩১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তার নাম, পিতার নামসহ বিস্তারিত ঠিকানা সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত জাতীয় কমিটিতে প্রেরণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৮১ সন হইতে আজ পর্যন্ত সেই তালিকা সংগ্রহের জন্য তাঁহার দপ্তরসহ সকলের নিকট বিভিন্ন সময় পত্র প্রেরণ করা হয়। ১৯৮৬ সনের ১৩ অক্টোবর সংস্থাপন সচিবের তরফ হইতে তাঁহার বরাবরে একটি আধাসরকারি পত্র প্রেরিত হয়। সর্বশেষ পত্রটি প্রেরণ করা হইয়াছিল ১৭-১১-১৯৮৬ তারিখে। কিন্তু খুব কমসংখ্যক স্থান হইতে পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশ দফতর হইতে তালিকা প্রেরিত হয় নাই এবং যাহা প্রেরিত হইয়াছে তাহা ত্রুটিপূর্ণ। ফলে ১৩১৪ জন মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে ৩৭৮ জন, বিসিএস (সচিবালয়) ক্যাডারে ৪২ জন, বাকি ৮৯৪ জন আইএমএসসহ অন্যান্য ক্যাডারের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কমিটিতে প্রেরণ করা এখনও সম্ভব হয় নাই। ফলে জাতীয় পর্যায়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন অস্বাভাবিকভাবে ব্যাহত হইতেছে।

২। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার দপ্তর বা ঐ দপ্তরের অধীনস্থ সকল অফিসে (দপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ (অফিস) ১৯৭২/৭৩ সনের বিসিএস মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও মনোনীত হইয়া বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা কর্মরত থাকিলে অথবা পূর্বে কর্মরত ছিলেন কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণে (অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু, চাকুরিচ্যুতি ইত্যাদি) কর্মরত নাই তাহার পূর্ণ তথ্য এতদসঙ্গে প্রেরিত ছক পূরণের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট

উপ-সচিব ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তালিকা প্রণয়ন জাতীয় কমিটির সদস্য-সচিব জনাব সারোয়ার-ই-আলম (ফোনঃ ২৩৮৪২৭) এর নিকট প্রেরণ করিয়া ঐ তালিকার এক প্রস্থ অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিতে তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। যদি এমন কোন মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা তাঁহার দপ্তর বা অধীনস্ত অফিসে কর্মরত না থাকেন (অথবা পূর্বে চাকুরিতে ছিলেন না) তাহা হইলে একটি শূন্য প্রতিবেদন পাঠানো যাইতে পারে।

৩। বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি জরুরি।

স্বাঃ/

সংযুক্তঃ একটি ছক

(কাজী খলিলুর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ২৪১৮৩০, ২৪৬৫

বিতরণঃ-

১। সচিব (সকল) মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
২। জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ জেলা।

[হুবহু সংযুক্ত]

উনত্রিশ

প্যালেস্টাইনের যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলে ইসরায়েলের বিপক্ষে লড়াইয়ে অংশ নিতে লে. কর্নেল তাহের-এর আবেদনপত্র

9

M. A. TAHER, BU.,
LT.COL(RETD.)
MANAGER,
SEA-TRUCK UNIT,
30,R.K.DAS ROAD,
NETAIGANJ,NARAYANGANJ,
D A C C A.

Dt. 13th October,1973.

P.O.No. 006

Mr. Prime Minister,

Your desire to send a group of freedom fighters to fight sholder to sholder with our Arab brethern against the Zionist aggressors has been greatly appreciated by the freedom fighters. I as a freedom fighter wish to volunteer myself to fight for our brethern in faith at this hour of their trial.

About my credentials, I have got two war experiences to my credit. I took part in 1965 Indo-Pak war in Sialkot sector against the Indian aggression to Pakistan. In 1971 I had the honour to Command the largest sector in our liberation war. My sector boys were first ones to reach Dacca and liberate Dacca city.

My present disability may please not be taken as a dis-qualification to fight for the cause of justice and liberation of subjugated mankind. You are aware sir, of the heros like Maj. Gen. Sam Brown of the British Army, Gen. Count Von Stauffenberg of German Army, Duglas Bader of British Air Forces, who inspite of their serious physical disabilities gave excellent account of themselves in the battle fields. It may also be mentioned here that Gen. Moshe Dayan, over all Commander of the Zionist Forces also suffers from physical disability.

I shall be very grateful to you sir, if you kindly allow me to proceed to Middle-East so that I could be of any help to our Arab brethern.

Yours truely,

Abu Taher

(M. ABU TAHER, BU.)
LT.COL.(RETD.)

The Prime Minister,
People's Republic of Bangladesh,
Dacca.

১১
নির্ঘণ্ট

ব্যক্তি

অনিকেত
১৭৭
অরুণা সেন
৩২, ২৯২-৩, ৪৬৮
অরোরা, লে. জে.
৭৬, ৯১, ১৬০, ২২৪-৫
অলি আহাদ
১৭৩, ২৩৬-৭,৫৫৩
অলোক সরকার
৩৩৫, ৩৫৫
আখলাকুর রহমান, ড.
৯৭, ৩৩৬, ৩৩৮, ৪২৯
আতাউর রহমান খান
২৯৯, ৪০০, ৪৮৫
আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক
২০৬, ৩৩২, ৩৪২
আনোয়ার হোসেন বাবলু, রংপুর
৩৮৯-৯১
আনোয়ার হোসেন মঞ্জু
১৪৪
আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক
৬০, ১৩২, ২১৬, ২১৮, ৪০৪
আনিসুর রহমান, অধ্যাপক
৯৮-৯, ১৯৮, ৩৩৯, ৩৫১
আনিসুর রহমান মল্লিক
৩৬৩, ৩৬৭, ৩৬৯-৭০, ৩৭২
আনোয়ারুল ইসলাম বাবু
৩৬৯-৭০, ৩৯৮
আনোয়ার উল আলম শহীদ
২৭, ১৬৭, ২২১-২, ২২৪, ২২৬, ২৩০-৬, ২৪৩-৪, ২৬৩, ২৯৮, ৪৫৮
আফতাব আহমাদ
১০৩, ২১০-১৩, ২৪৮-৯, ২১২-৩
আ ফ ম মাহবুবুল হক
১১, ৩২, ৪১, ১০২, ১১৯, ১৯০, ২০৫, ২০৭, ২১২-৩, ২৪৯, ২৫৫, ৩১৭, ৪২৯, ৪৩৫
আবু ইউসুফ খান
২০৬, ৩২৩-৩
আবদুর রউফ পাতা
৪২, ২০৩, ৩২৭, ৩৭৭-৮০, ৩৯৫
আবদুল কাদের সিদ্দিকী
১২, ১৫০, ১৯৫, ২১২, ২২২, ২৩১-২, ৩৩৪, ৪১০-২, ৪১৪, ৪২০, ৫৭৪
আবদুল মান্নান ভূইয়া
২০৯, ২৮১
আবদুল্লাহ সরকার
১৩৯, ৪০০-১, ৪২৭
আবু তাহের বীরউত্তম, লে. কর্নেল
১২-১৩, ২০, ২২, ২০৬, ২৫৮-৫৯, ২৬২-৬৩, ৩৩৪-৩৬, ৩৪১-৪২, ৩৪৪-৪৫, ৪১৯, ৪২৩, ৪২৯, ৫০৯, ৫১৮, ৫৩৫-৩৬, ৫৩৯-৪০
আবদুস সাত্তার, বিচারপতি
৩৩৩
আবুল বাশার, শ্রমিক নেতা
৪৪, ২০৬
আবু মাহমুদ, অধ্যাপক
৯৮
আল মাহমুদ
১৯-২০, ২০২, ২৪৮-২৫২, ৩১৮, ৫৪৯
আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক
১৭৯-৮
আবদুল মালেক উকিল

৩৫৪, ৪০০
আবদুল হক, কমিউনিস্ট নেতা
৪৪, ৩৯৬
আবু হেনা, ডা.
৪৪, ৫৫, ২০৯
আবুল ফজল
১৩, ২৮, ১৭৯, ৫৬১
আবু সাঈদ চৌধুরী, বিচারপতি
১২৫, ১৩৯, ২৬৬, ২৬৮, ৩৮৪-৫, ৪২১, ৪২৫, ৪২৮
আমীরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার
৬৪, ৬৫, ৭১, ৮৬, ৯১, ২১৮, ৩৬২
আয়েশা ফয়েজ
২৭৩
আর এন কাও
৭, ৫৪, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭৩-৭৪, ৭৬, ১০২, ১০৮-০৯, ১১১, ১৬৩
আলেয়া
৩৬৯
আসাফোদ্দৌলা
১৮০-১
আস্‌হাব উদ্দীন আহমেদ, অধ্যাপক
১৮২
আহমেদ কামাল
৫৮-৯, ১৭৯
আহমদ ছফা
১৪, ৩২, ৫৮, ৭০, ১৪৪, ২৫১, ২৭৩, ৫৪৫
আহমদ শরীফ
১৯-২০, ১৭৯
ইন্দিরা গান্ধী
৫৩-৪, ৫৭, ৬০-১, ৬৪, ৬৬-৭, ৭৩, ৭৬-৯, ৮৩, ৮৭, ৯১, ১০৯, ১১১, ১৩৩, ১৪২, ১৭১, ২১৩, ২১৮, ২৫১, ২৯৯, ৪০৯-১১, ৪১৪, ৪১৯, ৪২১-২২, ৪৩৬, ৫৭৪
ইয়াকুব আলী
২৬৯, ২৮১-৩
ইয়াসির আরাফাত
৩৪৪
উলিয়ানভস্কি
১৫৩-৪, ৪১৭
একরামুল হক
৪১, ১৯৫, ২০৭
এনায়েতুল্লা খান
২৭-৮, ৮৫, ১৩৫-৬, ১৬০-১, ১৭৬, ১৮০, ৩০০, ৩৫১-২, ৩৩৯, ৫৫০
এম এ জলিল
২০-২২, ১০০, ১২৮-৩০, ১৩৬, ১৬৫, ১৯৭, ২০৫, ২৫৪, ৩০৬, ৩১৪, ৩১৬, ৩২৯, ৩৩৫-৬, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৭৭, ৩৮৪, ৪২০, ৪২৫, ৪২৯, ৪৮৪, ৫৫৩
এম জি তওয়াব
২৬৩
এস এস উবান
২৬, ৪০, ৬৩-৬৬, ৭১-৭২, ৭৬-৭৭, ৭৯, ৮৪, ৮৮, ১০২, ১০৯, ১১৬, ১২০, ১৫৭, ১৯০, ২২৩, ২৫৭, ২৯১, ৪৩২
ওয়াজিউল্লাহ, লে. কর্নেল
২৩২
ওসমানী, এম এ জি
২১, ২২, ৬০, ৬৩, ৬৬, ৮৭, ৯০, ৯২, ১৩৪, ১৩৬, ১৪৩, ২৩৩
কাজী জাফর আহমেদ
৪৪, ৬৪, ১৪৮, ১৫০, ১৮৩, ২০০, ২০৯, ২১৪, ৩৩৬, ৪১৭

কালীদাস বৈদ্য, ডা.
৬৮
কার্লোস ম্যারিগেল্লা
১০, ৩০৩, ৩৩১-২, ৩৩৪
খোন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লাহ
১৮৯, ১৯৫-৭
খন্দকার মোশতাক আহমেদ
৫৬, ৭৮, ৯০-১, ১২৫, ১৩৬, ১৫৬, ২২৭, ২৫৯, ২৬১, ৩০৫, ৩৪৪, ৩৮৯, ৪০১-২, ৪০৬, ৪০৯, ৪১৯, ৪২৮
খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া
৯৫-৬, ৩৪২
গাজী গোলাম মোস্তফা
১৫৭, ৩১৮, ৩২৫, ৩৫০
গোলক মজুমদার
১১৮
চঞ্চল সেন
১০, ২৯১-৫, ৪৬৮
চারু মজুমদার
৮১-২, ২৯৭
চিয়াং ছিং
২৫৫
জি এম সাঈদ
৩০৫
জেকব, মেজর জেনারেল
৭৩-৪
জে এন দীক্ষিত
২২৫, ৪০৫, ৪০৭, ৪০৯, ৪১৪-৫
জিনাত আলী
২০০
জিয়াউদ্দীন, লে. কর্নেল
৩২, ১৮৭-৮, ২৫৮, ২৬৫, ৩৩৬
জিয়াউদ্দিন, মেজর
১৯৭, ৩৬১
জিয়ারুল ইসলাম
৪৩, ৯২, ১০৫, ১১৭-৮, ২১১
জুলফিকার আলী ভুট্টো
৫০-২, ৪০৩-৬, ৪১৪, ৪২০
ডেভিড যোহর
৭৬
ডি পি ধর
৫৪, ৫৭, ৬৬, ৭৯, ১৩১-২
তাজউদ্দীন আহমদ
২৩-২৪, ৩০, ৪০, ৪৩, ৫৩, ৫৫-৬, ৬০, ৬৩, ৭০, ৭৮, ৮৬-৯০, ৯১, ৯৮, ১০০, ১১৫, ১২১-৪, ১২৮, ১৩৩-৫, ১৩৯, ১৫৪-৫, ১৫৬-৯, ১৬৫, ১৮৮-৯, ১৯৩, ২১৫-৭, ২৩৬-৭, ২৪৯, ৩২১, ৩৯৯, ৪০৪, ৪১৬-৮, ৪১৯-২০, ৪২১, ৪২৮, ৪৩২, ৪৩৪, ৪৬৭
তোয়াহা, মোহাম্মদ
৪৪, ১৮৫, ২৫৩, ২৮১, ২৮৫, ২৮৭, ২৯২, ৩৮৬, ৩৯৩
তাহেরা বেগম জলি
৩৭৩, ৩৭৫, ৪০০
দীপংকর তালুকদার
৪১১, ৫৭৮
দেবেশ ভট্টাচার্য, বিচারপতি
২৭৫, ২৯৪
দালাইলামা
১০৭-৯
নঈম জাহাঙ্গীর
১০৪, ১৫৮
নাজমুল হুদা, কর্নেল
২৬৩, ২৭১
ন্যাভাল সিরাজ
২০৯
নির্মলেন্দু গুণ
২৫১-২, ৩১৮
নির্মল সেন
২৮, ১৩১, ১৪০, ১৪৩-৪, ১৫৩, ১৭১, ১৭৭, ১৮৩, ১৯২, ২৪৫, ৩২৮, ৩৪৮

নেপাল নাহা
২৪৫
নৃপেন চক্রবর্তী [ত্রিপুরা]
২১৩
নূরুজ্জামান, এ এন এম [রক্ষীবাহিনী প্রধান, ব্রিগেডিয়ার]
১৬১-৩, ২১৯, ২২১, ২২৩-৪, ২২৯, ২৩৩-৬, ২৫৯, ২৬১-৪, ৩৮৫, ৪২১, ৪৫৮
নূরুজ্জামান, কাজী [সেক্টর কমাণ্ডার, কর্নেল]
৮১, ১৩০, ২১৭
নীলুফার হুদা
২৬৩-৪, ২৭১
নেহেরু, জওহরলাল
৫৩, ৬৬, ৭৫, ১০৮-৯, ২১৬
পি এন হাকসার
৫৩-৪, ৫৭, ৬৬, ৭৫, ১৭০
পাকিস্তান প্রত্যাগত
১৭৮, ২২৪
পিটার কাস্টার্স
১২, ৩১, ৩৩৬-৯, ৫৩১-৪০
ফণিভূষণ মজুমদার
২২০, ৪০৪
ফিদেল ক্যাস্ট্রো
৫৯, ৪৯৪
ফারুক আজিজ খান
৮৯, ১২২
বি এন সরকার
১২৯
বি. রমন
২৬, ৬৮, ৭৩-৪, ৭৬
ব্রেজনেভ
৪১৯, ৪২১
বদিউল আলম
৪১, ২০৫, ২০৭, ৩৯৩
বদরুদ্দীন উমর
৯৪, ২০৬, ২৫১, ২৯৩, ৩৩৯, ৪০৩, ৫৩৫
বাদল বিশ্বাস
১৬৫, ৩৫৮, ৩৬০
[মাওলানা] ভাসানী
৫৯, ১০০, ১৭২, ১৮৩, ২৫৩, ২৭০, ২৭৯, ২৮৮, ৩২৭, ৩৬৩, ৩৮৬, ৩৯১-২, ৪২৩-৫, ৪৩৬, ৪৮৫, ৫৩৪, ৫৪৮, ৫৬৬
ভি সি শুক্লা
৪১০
মইনুল হোসেন চৌধুরী, মে. জেনারেল
২৮, ১৬২, ২২০, ২২৭, ২৩২
মওদুদ আহমেদ
২৭, ১১৭, ২৬৬, ২৭৪, ২৯৩, ২৯৯, ৩৫০
মাও সেতুঙ
১৮, ৪৫, ১২৪, ৩২৯, ৪৩৯, ৪৯৫, ৪৯৮-৯, ৫৩৪
মির্জা সুলতান রাজা
১৯১, ১৯৭, ৩৬৮-৯, ৩৭১, ৩৯৫, ৪২৯
মানেক শ', ফিল্ড মার্শাল
৫৪, ৬৮, ৭৬
মনি সিং
৪৪, ৬৪-৫, ১৩৩, ১৪১, ১৫৭, ১৬৩, ১৮৩-৪, ৪০০, ৪২২, ৪২৫
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা
১২০, ২৯১, ৪০০
[মার্শাল] মনিরুল ইসলাম
৯২, ১০২-৪, ১২৪-৫, ১৩৪, ১৯৫, ২০১, ২৪৯, ২৫১, ২৫৫, ৩২৯, ৩৪২, ৩৮৩, ৪৩৮
মনিরুল হক চৌধুরী

১০২, ৩২৩, ৩৮৭, ২০১, ২১০-১
মফিজুল ইসলাম খান কামাল
১০৪, ১১৭, ৩৫৭, ৩৫৯
মুবিনুল হায়দার চৌধুরী
৯৩-৮, ১৩৭, ৩১০, ৩১২-৩
মমতাজ বেগম
১০৩, ১৯৭, ২০১, ৪২৬, ৪৭৩
মমতাজুর রহমান তরফদার
১৭৯
মমিনুল হক খোকা
২০, ৩৮-৯, ৫৬
মোয়াজ্জেম হোসেন, কমাণ্ডার
৩৭, ৪১৯
ম্যারিগেল্লা, কার্লোস
১০, ৩০৩, ৩৩১-২
মীর জাফর
২২৯
মোরারজি দেশাই
৬৭, ৪১১-২
মারফত আলী
৩৬৩-৪, ৩৬৬, ৩৬৮-৯, ৩৭২, ৩৭৬
মাহবুব তালুকদার
৪১৫-৬
মাহবুবুর রহমান সাদী
৪২, ১০০-১, ১৩৮, ৩১৫, ৩৪৪
মাহমুদুর রহমান মান্না
২৪, ৯৮, ১৮৬, ১৯৫, ২০৭, ৩১৫, ৩৩০, ৩৫৬
যুক্তরাষ্ট্র
২৩, ৩৬, ৮৩, ৮৯, ১০৬, ২৭৭-৯, ৩২১, ৩৩৭, ৪০৭, ৪২৬, ৫৩২, ৫৬৫-৭, ৫৭২, ৫৭৫
রইসউদ্দিন আরিফ
২৬৫, ২৯৭, ৩৮৬
রাজীব গান্ধী
৩০৫
রবার্ট ম্যাকনারা
৪০৮
রাবেয়া সিরাজ
১৯৭
রায়হান ফেরদৌস মধু
৪১, ২৪৯, ২৭০, ৩৪২
রেহমান সোবহান, অধ্যাপক
৪৮, ৯৮-৯, ১২৭, ৩৫১
রুহুল কুদ্দুস
৩৮, ২৪৩-৪
[ভ. ই.] লেনিন
৯৭, ১৮৫, ১৯০, ২০৭, ৩০৭-৮, ৩৪৭, ৩৫৭, ৩৯৪, ৩৯৬-৭, ৪৮৫, ৪৮৯, ৪৯৩, ৪৯৫, ৪৯৯, ৫৩৪
শেখ মুজিবুর রহমান;
৯-১০, ২২-৩, ২৭-৩২, ৩৬-৪০, ৪৭-৫১, ৫৫-৯, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭৮, ৮৮, ১১৫, ১২১, ১২৪, ১৩৪-৫, ১৩৮, ১৪১-৫, ১৫০-৪, ১৫৯, ১৬১, ১৬৫, ১৭১, ১৭৯-৮২, ১৮৬-৯০, ১৯৫, ২০২, ২০৯, ২২৩, ২২৮, ২৩২, ২৩৬, ২৪৫-৮, ২৫১-২, ২৫৮, ২৬৩, ২৬৭, ২৭৬-৭, ২৯৬, ৩০৪, ৩১০, ৩১৬, ৩২০-১, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৫৫, ৩৬০, ৩৭০, ৩৮৮, ৩৯৮-৪০৩, ৪০৬-৯, ৪১৪, ৪১৭-২৮, ৪৩৩-৩, ৪৩৬, ৫৪৫-৫৬৯, ৫৭১, ৫৭৬
শেখ ফজলুল হক মণি
৯, ২৩, ২৭, ৩০, ৩৪-৫, ৩৯-৪১, ৪৩, ৫৫, ৬২-৩, ৬৮, ৭১-২, ৮০, ৮৫-৮, ১০২, ১০৬, ১১৪-২২, ১৩৫, ১৩৭-৮, ১৫৪, ১৬৩, ১৮১, ১৮৩, ১৮৬-৭, ১৮৯, ১৯১, ১৯৪, ১৯৯-২০২, ২০৫, ২০৮-৯, ২১৩, ২২১, ২৩৮, ২৪৩-৫, ২৪৮, ২৫০, ৩১১, ৩১৯, ৩২৩-৫, ৩৪০, ৩৪৮, ৩৫৯, ৩৭৩, ৩৮৪, ৩৮৭, ৩৯৮-৯, ৪০১-৩, ৪১৫, ৪১৯, ৪২১, ৪২৩, ৪২৬-৭, ৪৩২-৩, ৪৩৫-৬, ৪৩৮, ৫৪৭-৮, ৫৬৩

শাজাহান সিরাজ
১০২-৩, ১২৪, ১২৬-৭, ১৪৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯৮, ২০১, ২৪৯, ৩১৪, ৩২৯, ৩৭১, ৩৯৭, ৪২২, ৪২৯, ৪৩৬
শান্তি সেন
২৮৭, ২৯২, ৪৬৮, ৪৭০
শফিউল আলম প্রধান
২০৫, ৩২৩, ৩২৪
শফিকুর রহমান মজুমদার
২০০
শাফায়াত জামিল
১৬২, ২৩৫, ২৬১
শিবদাস ঘোষ
৯৩-৬, ২৫৪
শামসুন্নাহার ইকু
১৯৭
শংকরণ নারায়ণ
৬৭, ১৬২, ২৫৯
সুখেন্দু দস্তিদার
৪৪, ২৮১, ২৮৭, ২৯২, ৩৯৩
সিদ্দিক মাস্টার
১৬৫-৭, ৩৫৯-৬০, ৫০৮
স্বপন আদনান
১৭৯
সফিউল্ল্যাহ, মেজর জেনারেল
২৬২
সুব্রানিয়াম, কে
৮০
সুবিমল দত্ত
২২৪-৫, ৪০৫-৭
সমর সেন
১৬৩, ২৬০, ৩৩২-৩৪, ৪০৫-৬, ৪০৯-১০, ৪১৬, ৪২৯
সৈয়দ আলী আহসান
২৮, ৮৫, ১৩২, ১৬৬, ১৮০-১
সিরাজুল আলম খান
৯, ১৫, ২০, ২৭, ৩০, ৩৪-৩৫, ৩৯-৪১, ৪৩-৫, ৫০, ৫৫, ৬৩, ৬৮, ৮৫, ৯৪, ১০০, ১০২-৩, ১১৪-৫, ১১৮-৯, ১২১-৪, ১২৭-৮, ১৩৫-৬, ১৩৯, ১৬৩-৪, ১৬৬, ১৮২-৩, ১৯০-৩, ১৯৫, ১৯৭-৮, ২০০-২, ২০৫, ২১০-২, ২১৭-৮, ২২৬, ২৪৫, ২৪৮, ২৫৫-৬, ৩১১, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৫৯, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৮৪, ৩৮৭-৯, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৮৪, ৩৮৭-৯, ৪২৩, ৪৩৫-৬, ৪৩৮
সিরাজ সিকদার
১০, ৪০, ৪৫-৬, ৮২, ১০১, ২৬৫, ২৯১, ২৯৬-৭, ২৯৮, ৩৯৬, ৪২৭, ৫৫৩
সারোয়ার হোসেন মোল্লা
৩৫, ১৭৩, ২১৯-২১, ২২৪, ২৩০, ২৩৪-৫, ২৪৪, ৩৮৪, ৪৫৮
সুলতান মুহাম্মদ মনসুর
৪১১
হাবিবুল্লাহ চৌধুরী
৯৩-৫, ৩২৬, ৩২৯, ৩৬১, ৩৯৩
হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী
২৩৭
হাসনাত কাইয়ূম
২৬৬, ২৮২-৩, ২৮৫
হায়দার আকবর খান জুনো
২০৯
হায়দার আকবর খান রনো
৪৪, ১৩৮, ১৪৮, ১৮৫, ২০০, ২১৩, ২৪৪, ২৬৭, ২৭১, ৩৩৬, ৩৫৬, ৩৯৬-৭, ৩৯৯
হায়দার, এ টি এম; মেজর
১৬৪, ১৮৪, ২১২
হাসানুল হক ইনু
১০২, ১১৮, ১৮৬, ১৮৯, ১৯৫, ১৮৭, ২৫৫, ৩২৯, ৩৩৬, ৩৪১-৪৩, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৮৫, ৪৩৮

বিষয়-ঘটনা-সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠান

অক্সফাম
৭৬

অপারেশন মাউন্ট ঈগল
৯, ১০২, ১০৯, ১১১, ৪১১

আইএসআই
৭, ৭৩, ১১২, ৩০৫

আটকেপড়া বাংলাদেশী
১৭০, ৪২৫

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস
১২, ২৪১, ৫৮১, ৫৮৩

ইত্তেফাক
১৪৪, ২৪৩, ২৭৬, ৩২৩, ৩৪৮, ৩৯৮, ৪০৩, ৫৪৮, ৫৫০-১

ইস্টার্ন কমান্ড
৭৩, ১০৫, ১২৯, ১৫৭, ১৮৬, ২২১, ২২৪-৫, ১৭৩

ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট
১৬১, ২০৭, ২১৯, ২৬৪

উর্দুভাষী
৪৯, ১৬৭-৯, ২৫০, ২৬৮

এডজুটেন্ট জেনারেল
৭, ২০, ১৬২, ২০৫, ২৩২

এপিও-১
৩৪৯

এসইউসি-আই
৯৪, ২৫৪, ৩০৮-৯, ৩১৩

এস্টাবলিশমেন্ট ২২
১০৯

কাজী জহিরুল কাইউম
৭৮

কাদেরিয়া বাহিনী
২২১, ২২৪, ২৩১, ২৭৩, ৪২১

কৃষি অর্থনীতি
৩১৩

কৃষক লীগ
১৮৯, ১৯৬-৭, ২০৪, ২৫৫, ৩৬৫, ৫০৮, ৫১১

কেসস্টাডি
১০, ২৭৪, ২৮০, ২৮৫, ২৯১, ৩০৩, ৩১৯, ৩৫৮, ৩৭০, ৩৮৩, ৩৯৩-৪, ৩৯৭

খাজনা রেয়াত
১৭৬

খাদ (KhAD)
৩০৫

খালিস্তান আন্দোলন
৩০৫

[ত্রিদলীয়] গণ-ঐক্যজোট
১৪৬, ৩৯৯, ৪২৫

গণকণ্ঠ
১০, ১৯, ৩১, ১৪৫, ২০২, ২৪৭-৫৩, ৩১৮, ৩৫৪, ৪২১, ৪২৬-৭, ৪৮৫, ৫০৮

গ্রাণমা
২৫১

গুপ্তহত্যা
৩৬, ১৭৮, ৪৭৫, ৪৮৭

গেরিলা যুদ্ধ
৩৩৪, ৩৬৬, ৩৯৭, ৪৩৮, ৫৩৮

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী
১৩৯, ১৪১, ১৪৩, ১৪৫-৬, ১৭৭, ৩৪০, ৩৫৪, ৪০০, ৪০২, ৪০৮, ৪২৭

চোরাচালান

১৭৩, ১৭৭, ৩৪৮, ৩৫৩, ৩৬৮, ৪৮৪, ৪৮৬, ৫৫৪
চাষী সমাজ
১৭৬
ছয়দফা
৩৬, ৪৭-৮, ৫০-১, ১৫৮, ১৯১-২, ২৪৫, ৪১৭, ৫৪৮
জাতীয়করণ
১২৬, ২৪১, ৩২২, ৩৪৮, ৩৫০-৩, ৪৩৭, ৪৮১, ৫৬৩
জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী
৯, ৩০, ১৫৬-৭, ২২২, ৩৪৬, ৩৫৬-৯, ৪২০-১, ৪৬৭
জাতীয় সমাজতন্ত্র
১৯৫, ৩১১
জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব
৪৫, ৩০৭, ৫৩৫, ৫৩৮
জন নিরাপত্তা আইন
২৯৯
জনতা প্রিন্টিং প্রেস
২৪৮-৯, ২৫১
জনতা বিমুক্তি পেরামুনা, শ্রীলংকা
৩০৬
জনযুদ্ধ
৫৯, ৮০, ৩১৪, ৩১৬, ৩৬৯, ৪৩৮, ৪৭৫, ৪৭৮, ৫৩৩
'টু ইকোনমি থিওরি'
৯৮-৯
ট্রেজারি লুট
৩৬৯, ৩৭২
ট্রেড ইউনিয়ন
১৯২, ১৯৪-৫, ২৯৯, ৩৬৩, ৪৯০-১
ডাকাতি
১৭৭-৮, ২৭৬, ২৯৪, ৩৮৩, ৩৮৭, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭৪, ৪৮৭
ডাকসু
১৫০-১, ২০০, ৪২২, ৪৩৬, ৫১০, ৫৬৪, ৫৬৮-৯
ডিপলোম্যাটিক ক্যাবল
৭৮
ডিলারশীপ
১৭২
তামিল
১১৩, ৩০৫
তালিবান
১১১
তেসরা নভেম্বর [১৯৭৫]
২৮, ৩২, ২১৯, ২৩৪-৫, ২৫৯-৬৫, ২৭১, ৫৩৮
তাহের সংসদ
১৯
'দ্বিতীয় বিপ্লব'
১৪০, ১৮২, ২০৪, ৩৪৮, ৪০০, ৪০৯
দুর্ভিক্ষ
১২, ৮৩, ১৪৭-৮, ২৭৭-৮০, ২৯২, ২৯৮, ৪৮৪, ৪৮৬-৭, ৫৭১
দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ
৩৫৯
দ্য হিন্দু
৫৩, ১১৪
নিউজপ্রিন্ট
১৩০, ১৭২, ২৫১
ন্যাপ
৭, ১১৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৪০, ১৪৬-৭, ১৪৯-৫১, ১৫৩-৪, ২০৩, ২১৩, ২৮৩, ২৮৮, ৩২২, ৩৪৯, ৩৫৮,

৩৬৭, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯১-২, ৪২২, ৪২৮, ৫৩৪, ৫৫৭-৮, ৫৬৯

নাৎসি
৩১১-২

পাট
৪৭, ১৩১, ১৬৯, ১৭৫, ৩২২-৩, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫৩, ৫৭৪

প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা
২৩৩

পরিত্যক্ত সম্পত্তি
১২৯-৩০, ১৭৪, ২৪৯-৫১, ৩৪৮-৫১, ৪২১, ৫৪৭, ৫৭২

পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি
১০১, ১৬৭, ২৬৫, ২৬৯, ৩৩৬, ৩৫৮, ৩৭৬, ৪১৯, ৪২৭, ৫৩৭, ৫৪১

পবিত্র যুদ্ধ
৭৯

পাবলিক সার্ভিস কমিশন
২৪, ২৪১-২, ৫৮১, ৫৮৪

পরিকল্পনা কমিশন
৯৯, ১৭৬, ২৩৮, ৩২৫, ৩৫১-২

পলিটিক্যাল কমিশার
৯৫, ২৩৫, ২৮৩, ২৮৮, ৩৪২, ৩৫৫, ৩৭০, ৩৮৫, ৩৮৯, ৩৯৭

প্রলেতারিয়েত
৩০৭, ৩৩৮

প্রেসনোট
৩১৬

ফৌজদারী দণ্ডবিধি
২৯৮

বিএসএফ
৬৮, ৭৬-৭, ৪১২

বাকশাল
৩১, ৩৪, ৬৯, ১৩৫-৪০, ১৪২-৭, ১৫৩-৪, ২১৯, ২৪৩, ২৪৬, ৩৪৮, ২৪৬, ৩৪৮, ৩৫১, ৩৬০, ৩৮০, ৪১১, ৪২৭, ৫২৭-৮, ৫৩৮, ৫৪৭, ৫৫৬

বিডিআর
২১, ২১৯, ২৭৬, ২৮৫, ২৮৮, ৪১০, ৪১৩, ৫১৪-৫

বিবিসি
১১১, ১৬৮, ২৯৮

বৈদেশিক মুদ্রা
৩২৩, ৩৪৮, ৩৫৩, ৩৭৪

ব্যাংক ডাকাতি
১৭৮, ৪২২, ৪৮৭

ব্রাদার্স প্লাটুন
২০৬

বিনিয়োগ সীমা
১৭৫, ৩৫১

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৩০৩, ৩৪৬-৭

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন
১১৯, ১৩৩, ১৫১, ২০০, ২০৩, ২০৭, ২৫৯, ৩৮৯, ৩৯৯, ৫৫৮, ৫৬৮, ৫৭০

বাংলার বাণী
৯, ৩১, ৩৫, ৭১, ১২৬, ১৭২, ১৮১, ১৯৯, ২০৪, ২৩৭-৮, ২৪৭-৮, ২৫০-১, ২৯৭, ৩১৭, ৩৪৮, ৩৯৯, ৪২১, ৫০৮, ৫২৩, ৫৪৭

বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা
২০, ৩৩০, ৩৩৪-৫, ৩৭১, ৩৯০, ৪২৮, ৪২৯, ৫০৯

বিশেষ ক্ষমতা আইন
১০, ১৪৭, ১৭৬, ২৫২, ২৯১, ২৯৮-৯, ৩০০, ৩৫৪, ৪২৬

বাঁশখালী হত্যাকাণ্ড
১৮২
বিশ্বব্যাংক
৪০৭-৮, ৪২৭
বিসিএস
২৪১, ৫৮২-৪
বিহারি
১৬৮, ১৭০, ২৪৫, ৫৭৩
বাড়বকুণ্ড
২৪৬-৭
ভূমি রাজস্ব
২৩৯
ভূমি সংস্কার
১৮৫, ১৭৬, ৩৫১
মাউন্টেন ব্রিগেড
১০৯
মাওবাদ
৪৫, ৭৯-৮০, ৮২, ১৪৯, ১৫৪, ২০৩, ২৬৯, ২৯৬, ৩০৭, ৩১৫, ৩১৯, ৩৪৪, ৩৫৬, ৩৭১, ৩৮০, ৩৯৪, ৩৯৬, ৪১৭, ৫৩৩
মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ
১৯৭
মুজিববাদ
৯, ১০১, ১১৪, ১২২, ১৩৪, ১৩৯, ১৪০, ১৬৭, ১৮১, ১৯৯, ২০১, ২০৪, ২০৭-৮, ২১২, ২৫১, ৩১১, ৩১৩, ৩৪৭, ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮১, ৩৯২, ৪২৩, ৪৩৮, ৪৯০, ৫০৮
ম্যাজিস্ট্রেট
২৩৭
মাঝি-মাল্লা সমিতি
২৮১, ২৮৩
মৃত্যুদণ্ড
২৮৮, ৩০০
মশাল [পত্রিকা]
২৫৩
মুসলমান
৪৭, ১৭৪, ৪৬৯, ৫৭৩
মোসাদ
৭, ৭৩-৪
যুদ্ধাপরাধ
১৭০, ৪০৪
রাজাকার
১৮৫, ২১৩, ২১৫, ২৪৫, ২৯৫, ৩৪০, ৩৫৩, ৩৬৮, ৩৮১
রোহানা উইজেউইরা
৩০৬
লিডার
১০৫, ১১৬, ১৩৪, ২১৫, ২২৩, ২২৬, ২৪৪, ২৫৭, ২৭৪, ৩৬৪, ৪২৩, ৪৩০, ৪৫৮
লাল ইশতেহার [পত্রিকা]
২৫৩-৪
লাল পতাকা [পত্রিকা]
২৫৩
লাল বাহিনী
১১৭, ১৬০, ১৯২, ২০০, ২৪৫-৭, ৩৬০
লড়াই [পত্রিকা]
২৫৩
শান্তিবাহিনী
১২০, ৩০৫, ৪১১
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল
১৯৯
শ্রমিক জোট
১৯৫
শরণার্থী
২৫, ১০৮, ১৭৪, ৫৭৩

সিআরপিএফ
৭, ৮২-৩
সিওসি
১৬৪, ২৫৫-৬
সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স
২১৫
সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ
১২, ১৮, ২০, ৮৮, ১১৭, ১৫৮, ১৬২, ১৮৭-৮, ২০৫-৭, ২১৬, ২১৯, ২২০, ২২৭, ২৩৪, ২৫৮-৯, ২৬২, ২৭০-১, ২৯১
সেনাবাহিনী, পাকিস্তান
২০-১, ২৫, ৩৭, ৫০-১, ৫৮-৯, ৭৩, ৮২, ৮৬, ১২০, ১৩১, ৪৩০
সেনাবাহিনী, ভারতীয়
৫৪, ৭২, ৭৭, ১০৭, ১২১, ১২৮-৯, ১৩১, ১৫৭, ২১৯, ২২৬, ২২৯, ৩০৫, ৪২২, ৪৩২, ৪৭৮
সেনাবাহিনী, ইরাক
১২৯
সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ
৭৪, ৭৭
'সোনার বাংলা'
১২৭, ১৭১, ১৮১, ২১০, ২৩৭, ৫৭১
সিপিআই
৮০, ৯৪, ১৪১, ৪১৩, ৪২২
সংবিধান
১৪৭-৯, ১৭৫-৬, ২৫৯, ২৯১, ২৯৯, ৪০১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪৮২, ৫০০, ৫৫৩-৪, ৫৫৭
সিপাহি বিপ্লব/অভ্যুত্থান
১৯৫, ২৬২, ৩৯০
সিপিআই-এমএল
৮০
সিপিবি
৭, ৮৩, ১৩৫, ১৩৭, ১৪০, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০-১, ১৫৩-৪, ১৬৩, ২০৩, ২৬৭, ২৭৭-৮, ৩৩৭, ৩৪৯, ৩৬০, ৩৮১-২, ৩৯৫, ৪০৮, ৪১৩, ৪২০, ৪২২, ৪২৫, ৪২৮, ৫৩৩, ৫৬০
সুপ্রিম কোর্ট
৩০২
সমাজতান্ত্রিক কৃষি বিপ্লব
১৯৫-৬
সুমন মাহমুদ
২৫৩
সাম্যবাদ [পত্রিকা]
২৫৩-৫, ৩১৬, ৩২৯, ৪৮৪
সাম্যবাদী দল
৯৫, ২৫৪, ২৮২-৩, ২৮৫-৮, ২৯২, ২৯৫, ৩৯৩, ৫০৮
সাম্প্রদায়িকতা
১৭৪, ৪৬৯, ৪৭৫
সিরাজ সিকদার পরিষদ
২৯৮
হককথা [পত্রিকা]
১৭১, ১৭৬, ২৭৯, ৪২২-৩
হিন্দু
৬৮-৯, ১১৩, ১৭৪-৫, ৪৬৮-৯, ৫৭৮
হিন্দুস্তান টাইমস
৭৫
হলিডে
২৭, ১৮০, ১৮৮, ২৯৩, ৩০০, ৩৫২, ৪২২, ৪৬৮, ৫৩৫, ৫৩৯, ৫৪৯, ৫৫০

স্থান

আগরতলা
২১, ৩৬-৯, ৫৬-৭, ৬৭-৭০, ৮৭-৮, ১০৪, ১৬২, ১৬৫, ২১২-৪, ২৪৬, ৩৮৪, ৫৫৩, ৫৫৬,

ইসরায়েল
৭, ৯, ৬১, ৭৩-৬

ঈশ্বরদী
৩৮১-২, ৫২৬-৭

কিউবা
২৫১, ৩০৬, ৩২৭, ৩৩১, ৪৮৯, ৪৯৪, ৫৩১

কুমিল্লা
৯৩, ৯৫, ৯৭, ১০৪, ১১৯, ১৩২, ১৭২, ১৮৩, ২৪৭, ২৬৩

কলাকোপা-বান্দুরা
৪১২

কলকাতা
৪০-১, ৫৫, ৬৮-৭১, ৮৪, ৯৪, ১১০, ১২৯, ১৩৩, ১৫৭, ১৮০, ১৮৮-৯, ২১২, ২৪৮-৯, ২৮৯, ৩৫১, ৪০৯, ৪৩৬, ৫৩২

কালিগঞ্জ
৯, ৪৬, ২৮০, ২৮৮-৯

কালিহাতি
৫১১

কালার বাজার
২৮৯

কিশোরগঞ্জ
৪৬, ২৮২, ৫১৩, ৫২৫

কুষ্টিয়া
৯২, ১১৭, ১৭৭, ২১১, ২৭৬, ৩৪২-৩, ৩৫৭, ৩৬২-৭২, ৩৭৬, ৩৮০, ৩৮২-৩, ৪০১, ৪৩৮, ৫২১, ৫২৪, ৫২৭

খুলনা
২১, ৪৩, ১০৪, ১২৪, ১৩০-১, ১৬৮, ১৮৩, ২০৫, ২২৮-৯, ২৭৬, ৩৪২, ৩৭৪, ৪৩৮, ৫২০, ৫২৩-৪, ৫৭৩

গাজিপুর
৯০, ৩৬০

গোপালগঞ্জ
১৫০, ১৫২-৩, ৩৯৯, ৪২৪, ৫১৩

চুয়াডাঙ্গা
৩৬৫-৭২, ৩৯৫, ৩৯৭-৮, ৪২৫, ৫২১, ৫২৮

চৌহালী
৫১৭

জেনেভা
৭৪-৫, ৪০৯, ৪২৫

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
২৮, ৯৭, ১৬৬, ১৭৯, ২০৮, ৫১০, ৫৬০

ঝিনাইদহ
৩৫৮, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৮০, ৩৯৪, ৫২২

টঙ্গী
২০০, ২৪৬

তানোর
১০, ২৮০, ২৮৬-৮, ৩৯২-৩, ৫২৯

দার্জিলিং
৮০

দামুড়হুদা
৩৭১

দেরা দুন
৭২, ৯২, ১০৪-৫, ১০৮, ১১৩, ১১৫-৬, ১১৮-৯, ২১০, ২১৫, ২২৩

নকশালবাড়ি

৪৫, ৮০-১, ২১৬, ২৮৮, ৩০৭, ৩৬৩
নাগাল্যান্ড
৭২-৩, ৭৯-৮০, ১০৭, ১১০, ২৯৯, ৩০৫, ৪৩২,
নেত্রকোণা
২৭৬-৭, ৪১০-১, ৫১৩, ৫২৪, ৫২৭, ৫৭৯
নবাবগঞ্জ
১৬৫, ৫০৮-৯
নরসিংদী
২০৯, ২৭৬, ২৮১, ৪২৪, ৫১১, ৫২৭
নেপাল
৮০, ১১৩
নড়িয়া
২৭৫, ৪৬৮, ৪৭১, ৫২৫
পাবনা
১৮৩, ২৬৯, ৩৫৭, ৩৮০-৩, ৩৯৫, ৪১১, ৪২৫, ৪৩৮, ৫১৬, ৫২৩, ৫২৫-৬
পিরোজপুর
৬৮-৯, ৪১৯
প্যারিস
৪০৯, ৪৯৩
পিলখানা
১১৮, ১৫৯, ১৬১, ২২২, ২৯৩, ৩৪৬, ৪২১
পশ্চিমবঙ্গ
২৫, ৮০, ১০৭, ১৫৯, ১৬১, ৩০৭, ৩১৩, ৪২১,
ফজলে এলাহী
১৯৩, ১৯৫
ফরিদপুর
১০৩, ১১৫, ১৫২, ১৭৫, ২৭৫, ২৯২, ৩২৬, ৩৫৮, ৩৮৩-৬, ৪০০, ৫১৪, ৫২৫, ৫২৭
ফতেহবাদ
২০৬
বাগডোগরা
৯০, ৯১
বগুড়া
২৬৪, ৩৪৩-৪, ৩৫৮, ৩৬৭, ৩৬৯, ৪১১, ৪৩৮, ৫১৫, ৫২৫, ৫২৮, ৫৭৯
বাজিতপুর
১০, ৪৬, ২৬৯, ২৮০-২
ব্রাজিল
৩৩১-২
ভুটান
৪২০
ভবানীপুর
৪০-১, ৭০
ভিয়েতনাম
৪১, ২৫০, ২৩৫, ৩০৬, ৩১৪, ৪২৪, ৫৩১, ৫৬৪, ৫৬৭
মুক্তাগাছা
১৯৫, ১৯৭
মিজোরাম
৭২, ১১০, ২৯৯, ৩০৫, ৪৩২
মির্জাপুর
৫১১

মাদারিপুর
২২০, ২২৪, ২৯৫, ৩২৬, ৩৭৬, ৩৮৫-৬, ৪৭৩
মানিকগঞ্জ
১১৭, ১৫৮, ৩৪২, ৩৫৭-৮, ৩৬০, ৩৬২, ৪৩৬, ৫১২, ৫২৬
ময়মনসিংহ
২০, ৪৪, ১৯৬, ২৭৬, ৩৩০, ৪১০-১, ৪৩৮, ৫১৩, ৫২৭, ৫৭৯
মেসবাহ্উদ্দীন আহমেদ
১৯১, ১৯৪, ২৪৬, ৩২৬
মেহেরপুর
৩৬৯-৭০, ৫২২
মোহাম্মদপুর, ঢাকা
১৭০, ২৯৩
যমুনা
৩৭৮, ৪১১
রাজবাড়ী
২৯২, ৩৮৫-৬, ৩৯৫, ৫১২, ৫২৫, ৫২৭
রংপুর
২০, ১০৩, ২৭৭, ৩৩৫, ৩৫৫, ৩৮৬-৯, ৪৩৮, ৫১৭, ৫২৬
লেবানন
৩৪৫
লাহোর
৫১, ৩২১, ৪০৩-৪, ৪০৬, ৪২৬
শিকারপুর
২১১
শিবপুর
৪৫, ২০৯, ২৬৭
শরণখোলা
৩৬১
শৈলকূপা
৩৭৩, ৫২২
শ্রীলংকা
১১৩, ৩০৬
শাহজাদপুর
৩৭৯, ৪২৫, ৫১৬-৭, ৫২৫
সাভার
২২২, ২২৬, ২২৮-৯, ২৩২, ২৩৬, ২৪৪, ২৬০-১, ২৯৬-৭, ৩১২
সোভিয়েত ইউনিয়ন
৮৩, ১০৮, ১১২, ১২৭, ১৫৩-৫, ১৬৩, ২৭৮, ৩৫২, ৪০৭, ৪১৩, ৪১৭, ৪১৯, ৪২২, ৪২৬, ৪৮২, ৫৬৭-৮, ৫৭১, ৫৭৫
সেনানিবাস
২৫৯, ২৬১, ২৭২, ৩৪১, ৩৬১, ৩৮৬, ৩৯০, ৪২৯
সিরাজগঞ্জ
২৬৯, ৩৫৭, ৩৭৬-৮, ৩৮০, ৩৮২-৩, ৫১৬
সিলেট
১০৩, ৩৪৪, ৪১১. ৪৩৮, ৫১৯
হাফলঙ
১০৫, ১০৭, ১১৫